

Jagannath University Journal of Arts

Volume 13, Number 2, July–December 2023

ISSN 2519-5816



Jagannath University

Jagannath University Journal of Arts

Volume 13, Number 2, July–December 2023

Published in : December, 2023

All views and ideas expressed in articles published in the journal are solely belong to the author(s). The Editor, the Editorial Board and the Publisher have no responsibility or liability in such cases.

Published by: Dean, Faculty of Arts
Jagannath University
Dhaka-1100, Bangladesh

Printed at : DS Printing and Packaging
234/D New Elephant Road, Dhaka-1205
Cell : 01817078796

Subscription : BDT 300/- (Three Hundred Taka) per issue

ISSN : 2519-5816

Chief Editor
Professor Dr. Md. Rais Uddin

Faculty of Arts
Jagannath University, Dhaka-1100
www.jnu.ac.bd

Advisory Board

1. **Professor Dr. A.K.M Yakub Ali**
Professor Emeritus
Department of Islamic History and Culture
Rajshahi University, Rajshahi
2. **Professor Dr. Fakrul Alam**
UGC Professor & Director
Bangabandhu Sheikh Mujib Research Institute
University of Dhaka, Dhaka-1000
3. **Professor Dr. Sharif Uddin Ahmed**
Department of History
University of Dhaka, Dhaka-1000
4. **Professor Dr. Syed Azizul Haque**
Department of Bangla
University of Dhaka, Dhaka-1000
5. **Professor Dr. Rashidunnabi**
Department of Music
Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University
Trishal, Mymensingh.
6. **Professor Nisar Hossain**
Dean, Faculty of Fine Arts
University of Dhaka, Dhaka-1000
7. **Professor Dr. Lutfur Rahman**
Department of Drama & Dramatics
Jahangirnagar University, Savar, Dhaka
8. **Professor Dr. M. Matiur Rahman**
Department of Philosophy
University of Dhaka, Dhaka-1000
9. **Professor Dr. Anirudha Kahaly**
Department of Bangla
Jahangirnagar University, Savar, Dhaka
10. **Professor Dr. Muhammad Shafiq Ahmad**
Department of Islamic Studies
University of Dhaka, Dhaka-1000

Editorial Board

- Chief Editor** : **Professor Dr. Md. Rais Uddin**
Dean
Faculty of Arts, Jagannath University, Dhaka
- Associate Editor** : **Fazle Elahi Chawdhury**
Professor, Dept. of Bangla
Jagannath University, Dhaka
- Dr. Musarrat Shameem**
Associate Professor, Dept. of English
Jagannath University, Dhaka
- Members** : **Professor Dr. Milton Biswas**
Chairman
Department of Bangla, Jagannath University, Dhaka
- Professor Dr. Md. Momin Uddin**
Chairman
Department of English, Jagannath University, Dhaka
- Professor Dr. Murshida Bintey Rahman**
Chairman
Department of Hisroty, Jagannath University, Dhaka
- Professor Dr. Md. Atiar Rahman**
Chairman
Department of Islamic History and Culture
Jagannath University, Dhaka
- Professor Dr. Muhammad Abdul Wadud**
Chairman
Department of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka
- Professor Dr. Mohammad Hafizul Islam**
Chairman
Department of Philosophy, Jagannath University, Dhaka
- Dr. Jhumur Ahmed**
Chairman
Department of Music, Jagannath University, Dhaka
- Professor Md. Aloptogin**
Chairman
Department of Fine Arts, Jagannath University, Dhaka
- Katharin Purification**
Chairman
Department of Theatre, Jagannath University, Dhaka
- Editorial Assistant** : **S.M. Enamul Haque**
Assistant Registrar
Faculty of Arts, Jagannath University, Dhaka

সম্পাদকীয়

জমাকৃত সকল প্রবন্ধের মূল্যায়ন-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে গিয়ে Jagannath University Journal of Arts (Volume 13, Number 2) প্রকাশে কিছুটা বিলম্ব হলো। মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, চিত্রকলা, সংগীত, চলচ্চিত্র, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সভ্যতা, ধর্ম ও জীবন— এমন বিচিত্র বিষয়ের অনুভবী গবেষণা এবারের সংখ্যায় ঠাঁই পেয়েছে। অনুমদ প্রকাশিত জার্নাল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অপেক্ষাকৃত স্বীকৃত হওয়ায় ক্রমে গবেষকগণের আগ্রহের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সংগত কারণেই এবারের কলেবরটি পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে আরো বড়ো হয়েছে। জার্নালের নির্বাহী কমিটি ও বিদগ্ধ মূল্যায়নকারীগণ সম্পাদকের কাজকে সহজ করে দিয়েছেন। প্রবন্ধ বাছাই থেকে শুরু করে প্রকাশনার প্রতিটি পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

সম্পাদনার গুণে নয়, প্রবন্ধ সংবর্ধিত হয়ে থাকে স্বকীয়তা-গুণে। জার্নাল অব আর্টস-এর চলতি সংখ্যাটির যদি কোনো তাৎপর্য থাকে, তা সম্মানিত গবেষকগণের সক্ষমতার ফল। তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রইল।



(অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদদীন)

প্রধান সম্পাদক

Jagannath University Journal of Arts
Volume 13, Number 2, July–December 2023
Jagannath University
Dhaka-1100

সূচি

১.	জীবন গঠনে নৈতিকতার গুরুত্ব: ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আরিফা সুলতানা	১
২.	ব্যক্তির নৈতিকমান উন্নয়নে নীতিশিক্ষা এফ. এম. এনায়েত হোসেন	১৪
৩.	পূর্ববঙ্গীয় ইতিহাস (১৯৪৭-৭১) লিখনে মার্কসীয় দর্শনের ভূমিকা: একটি বিশ্লেষণ খান মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম	৩৪
৪.	চিহ্নগীতিতে রাগসংগীতের ব্যবহার ও এর প্রতিফলন জেরীনা আহমেদ	৪৪
৫.	রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের গানের স্বরূপ সন্ধান বুমুর আহমেদ	৭০
৬.	পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র ও গণমাধ্যমের আন্তঃসম্পর্ক: অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক চক্রের মিথস্ক্রিয়া তারিক হোসেন খান	৮৫
৭.	১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে চট্টগ্রাম শহর: নাগরিক সমাজের ভূমিকা তাসলিমা ইসলাম	১১১
৮.	বাংলাদেশের মুদ্রিত বিজ্ঞাপন শিল্প: অতীত, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা মারুফ আদনান	১২৩
৯.	দেবিদার বিনির্মাণ: একটি বিশ্লেষণ মুহাম্মাদ আবদুস সালাম	১৪০
১০.	বাঙালি সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা মুহাম্মাদ খাইরুল ইসলাম এবং মুহাম্মাদ শাহিদুল ইসলাম	১৫০
১১.	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা: পরিপ্রেক্ষিত ইসলামি নির্দেশনা মুহাম্মাদ ছালেহ উদ্দিন	১৭১
১২.	পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা নিরসনে ইসলামি নির্দেশনা: পরিপ্রেক্ষিত পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ মোহাম্মাদ ইসমাইল	১৯০
১৩.	সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে মুসলমানি নাগরী লিপির প্রভাব: পরিপ্রেক্ষিত বৃহত্তর সিলেট জেলা মোহাম্মাদ ওমর ফারুক এবং ফাতেহা বেগম	২১০
১৪.	ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ঢাকা নগরীর আধুনিকায়ন ও জন-জীবনে এর প্রভাব মোহাম্মাদ জাহাঙ্গীর হোসেন	২২৩
১৫.	ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯: ইসলামি নির্দেশনার আলোকে একটি পর্যালোচনা মোহাম্মাদ নুরুল আমিন এবং মোহাম্মাদ মোফাজ্জল হোসাইন রাসেল	২৩৬
১৬.	ইসলামি শরিয়তের সহজীকরণ নীতি ও তার প্রয়োগ পদ্ধতি: একটি পর্যালোচনা মোহাম্মাদ হারুনুর রশীদ এবং আবু তৈয়ব মোঃ নাজমুছছাকিব ভূঁইয়া	২৫৬

১৭.	ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিনোদন: ইসলামি দৃষ্টিকোণ মোহাম্মদ রেজাউল হোসাইন	২৭০
১৮.	জাপানের 'উকিইয়ো-এ' কাঠখোদাই চিত্রের ধারা: বিষয়বস্তু ও নান্দনিকতা মোহাম্মদ রেজাউল সাদাত	২৮৬
১৯.	গরার এর স্বরূপ ও আর্থিক লেনদেনের ওপর এর প্রভাব: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ মো: আব্দুর রউফ	৩০০
২০.	পূর্ববাংলার ভূ-রাজনৈতিক ইতিহাস ও স্বাধিকার আন্দোলন: একটি কালো মেয়ের কথা মোঃ আসাদুল্লাহিল গালিব	৩২৩
২১.	সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মসজিদের ভূমিকা : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি মূল্যায়ন মোঃ ইব্রাহীম খলিল	৩৩৫
২২.	উনিশ শতকে বাংলায় মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তার বিবর্তন মোঃ কামাল হোসেন	৩৫৩
২৩.	মধ্যযুগের বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে প্রভুর খোদাইয়ে শিকল-ঘণ্টা শৈলীর অলঙ্করণ মো. মিন্টু আলী বিশ্বাস	৩৭৩
২৪.	বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড: সংজ্ঞা, সংখ্যা ও স্বরূপ শহীদ কাদের চৌধুরী	৩৯৯
২৫.	বন্ধনহীন গ্রন্থি : রবীন্দ্রনাটকের উত্তরকাঠামোবাদী বিনির্মাণসূত্র শরীফ সিরাজ	৪১৯
২৬.	একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সম্মুখ সমর, গণহত্যা ও নির্যাতন: পরিত্রাঙ্কিত লক্ষ্মীপুর জেলা অধ্যাপক ড. শামছুল কবির	৪৩২
২৭.	কারা সংস্কৃতির স্বরূপ অনুসন্ধান: প্রেক্ষিত কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, টঙ্গী, গাজীপুর সাবিনা শরমীন এবং শ্যামলী শীল	৪৫৪
২৮.	দিনাজপুরের সাঁওতাল নারীর আর্থ-সামাজিক জীবন: একটি পর্যালোচনা সুফিয়া খাতুন	৪৭১
২৯.	হাঁসুলী বাঁকের উপকথা: প্রান্তিক নারীর স্বতন্ত্র স্বর সোনিয়া পারভীন	৪৮৬

জীবন গঠনে নৈতিকতার গুরুত্ব: ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

আরিফা সুলতানা*

Abstract

Everyone living in a society naturally practices truthfulness, justice, charity, humanity etc, and at the same time tries to refrain from some immoral acts such as injustice, falsehood, and many sorts of inhuman activities. All of these human practices are mainly motivated by the urge to live a sound, peaceful and worthy life. Nevertheless, our societies are facing many moral degradations because of lacking the perfect moral codes to practice. Almost all the living religions in the world and the human doctrines in this regard generate a lot of guidelines. But these guidelines or standards of living are not always practised rightly. This paper is an endeavour to search for an effective and fruitful moral code for a good life. Here, there is an endeavour to show that Islamic moral teachings are sufficient to make an ideal life for everyone living in a society. The method of this research is mainly analytic and also deductive in some cases, especially in drawing conclusive results from some general principles.

চাবিশব্দ: নৈতিকতা, আদর্শজীবন, ধর্ম, ইসলাম, কুরআন, হাদিস, ন্যায়বিচার, বৈষয়িকজীবন

মানবজীবনের কল্যাণ চিন্তার সাথে বৈষয়িকজীবন যেমন সম্পর্কিত ঠিক তেমনি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়াবলিও আদর্শজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। এমনকি বৈষয়িকজীবনকে সঠিকভাবে বা যথার্থভাবে পরিচালনা করতে হলেও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্তি আবশ্যিক হয়ে পড়ে। মানবজীবন সাধারণ জীবজগতের অন্যান্য প্রাণীর থেকে উচ্চতর। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা এই শ্রেষ্ঠত্বের মূল ভিত্তি। বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ যেমন যৌক্তিকভাবে চিন্তা করতে পারে ঠিক তেমনিভাবে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি পরিমাপ করে একটি বিশুদ্ধ নৈতিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রেও অগ্রসর হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে আদর্শমানবজীবন বলতে আমরা এমন একটি জীবনকে বুঝি যে জীবন তার আবশ্যিক নিয়ামক হিসেবে যৌক্তিকতা ও নৈতিকতাকে চর্চা করে।

মানুষকে নৈতিক করে তোলার জন্য বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন রকমের উপদেশ প্রদান করেছেন। দার্শনিকরা প্রদান করেছেন বিভিন্ন মানদণ্ড। কিন্তু এ সবেরও পুরোনো ঐতিহ্য হিসেবে আমরা ধর্মকে দেখতে পাই। মানব ইতিহাসের সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে শুরু করে আজ অবধি ধর্মীয় শিক্ষা নৈতিকতার একটি প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করেছে। বিশেষকরে আমাদের পারিবারিক শিক্ষার সিংহভাগই ধর্মীয় নৈতিক নির্দেশনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। আদর্শজীবনের পথে আবশ্যিক শর্ত হিসেবে নৈতিকতার পঠন-পাঠন ও অনুশীলনের যাত্রা পারিবারিকভাবে ও ধর্মীয় সংস্কৃতির ছত্রছায়ায়ই যেহেতু সূচিত হয়, তাই এই পর্যায়টিতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান জরুরি বলে মনে হয়। নৈতিক তত্ত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রেও ধর্ম দিক-নির্দেশনা দিয়ে আসছে। অর্থাৎ উন্নত মানবজীবনের জন্য কোনো মানদণ্ড নির্মাণের বিষয়ে যেসকল নৈতিক সূত্র প্রয়োজন হয় পৃথিবীতে আবির্ভূত প্রধান প্রধান

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

ধর্মগুলো সে ধরনের শিক্ষার পর্যাণ্ড পাঠই প্রদান করে থাকে। উদাহরণ হিসেবে এখানে ইসলাম ধর্মের কথা বলা যায়। এই ধর্মটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়— এ কারণে যে একটি আদর্শজীবন গঠনের সবধরনের নীতিমালাই এ ধর্ম প্রদান করে থাকে।

বর্তমান গবেষণায় আদর্শজীবন গঠনের ক্ষেত্রে নৈতিকতার ভূমিকাকে চিহ্নিত করে ইসলামের ভিত্তিতে কীভাবে আদর্শজীবন গঠন করা যায় তার একটি পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে। এই গবেষণায় বর্ণনামূলক অংশে আদর্শজীবন, নৈতিকতা, ইতিহাসের আলোকে মানুষের নৈতিক অভিযাত্রা এবং প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মের আদর্শমানব গঠনের প্রচেষ্টাকে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীতে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, ইসলাম ধর্মের নৈতিক নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে উচ্চতর নৈতিকজীবন তথা আদর্শজীবন গঠন করা সম্ভব। গবেষণা-পদ্ধতি হিসেবে এখানে বিশ্লেষণমূলক ও মূল্যায়ণধর্মী পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

নৈতিকতা বলতে সাধারণত একটি আচরণ বিধিকে বোঝায়। অন্য কথায় নৈতিকতা হলো নৈতিক চেতনা তথা সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ বিচারের বোধ। নৈতিকতা সামাজিক মানুষের বোধের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সত্যগুলোর ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের সমষ্টি। অর্থাৎ কাজ-কর্মে, কথাবার্তায় নীতি ও আদর্শের অনুশীলনই হলো নৈতিকতা। একটি সুষ্ঠু সুন্দর সমাজ ব্যবস্থার জন্য নৈতিকতা প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রতিটি সমাজ কাঠামোর ভিন্নতার প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন নৈতিক মানদণ্ড চর্চা করতে দেখা যায়, এবং এ অর্থে নৈতিকতা অনেকটা আপেক্ষিক বিষয় বলে অনেকে মনে করে থাকেন। সকল সমাজে সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দের মানদণ্ডগুলোর মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে ভিন্নতা থাকলেও এদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু সংগতিও লক্ষ করা যায়, যেমন— সত্যবাদিতা, পরোপকার, বিনয় ইত্যাদি সব সমাজেই কম-বেশি ভালো বলে মনে করা হয়। নৈতিক শিক্ষা প্রদানের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উৎসগুলির মধ্যে ধর্ম অন্যতম। প্রতিটি ধর্মের কিছু আদর্শ বা নির্দেশনা থাকে যার প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা নৈতিকতা দ্বারা সমাজের মানুষ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। এমনকি মানুষের সামগ্রিক জীবনাচারের একটি বিরাট অংশ ধর্মীয় সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত। এ কারণে কোনো কোনো ধর্মতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক মানুষকে বা মানব জাতিকে জানতে হলে ধর্মকে জানার আবশ্যিকতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাই কেবল নৈতিকতা নয়, সমাজের সামগ্রিক জীবনাচার জানতে ধর্মীয় নীতি-আদর্শ জানা প্রয়োজন বলে মনে হয়। তাই বলা যায় “...the study of man can never be complete unless it includes the study of religion, for there is no more widespread, impressive, or significant thing in his history than religion.”^১

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান যা মানুষের আদর্শ জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় বর্ণনা করে। কারণ মানুষের জীবনযাপন করা উচিত একটি মূল্যবোধ অনুযায়ী, আর ইসলাম ধর্ম মতে, যা সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। পবিত্র কুরআন ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিকতাকে বিবেচনা করেছে যাতে মানুষ জীবনের সকল ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা পেতে পারে। আর এই সব নির্দেশনা তাকে সুখের দিকে পরিচালিত করে যা নৈতিকতার চূড়ান্ত ফল হিসেবেও দেখা যায়। নৈতিকতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করার পূর্বে নৈতিকতা সম্পর্কে পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদের দর্শন কী, সে সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

মিশরীয়দের ধর্ম চিন্তায় পারলৌকিক চেতনা প্রাধান্য লাভ করে। মিশরীয়দের বিশ্বাস মতে, মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবিত ব্যক্তিকে তাঁর পাপ-পুণ্যের বিচারের জন্য দেবতা ওসাইরাসের (osirus) সামনে হাজির করা হয় এবং তিনটি পর্যায়ে এই বিচার নিষ্পত্তি করা হয়। মিশরীয়রা খুন, চুরি, মিথ্যাচার, লোভ, ক্রোধ, অহংকার, ব্যবসায় অসাধুতা প্রভৃতি ৪২টি অনৈতিক কর্মকাণ্ডকে পাপকাজ বলে বিবেচনা করে। এ ধর্মে দেবতাদের নির্দেশ মান্য করা, ক্ষুধার্তকে অন্নদান করা, পিপাসার্তকে পানি পান করানো, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র প্রদান করার মাধ্যমে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে।^২ তাই দেখা যায়, এই ধর্ম বিশ্বাসে পরকালে সুখ লাভের জন্য পার্থিব জীবনের নৈতিক কর্মকাণ্ডকেই গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

পারস্যের ধর্মীয় প্রবক্তা জরথুষ্ট্র (Zarathustra) পারসীয়দের কাছে আধ্যাত্মিক, নৈতিক ধর্ম ও আদর্শের কথা প্রচার করেছেন। এই ধর্ম মতে, সৎ কাজকে পুণ্য এবং অহংকার, লোভ, আলস্য, ক্রোধ, কামপ্রবৃত্তি, ব্যাভিচার, গর্ভপাত, কুৎসা রচনা, মিথ্যাচার, অপব্যয় করা ইত্যাদি অসৎ কাজকে পাপ বলে বিবেচনা করা হতো। জরথুষ্ট্রবাদ দৃঢ়ভাবে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করে। এই মতের অনুসারীগণ মনে করে, শেষ বিচারের দিনে মৃতদের পুনরুত্থান ঘটবে। পাপী ব্যক্তির স্বল্পকালের জন্য নরকবাসী হবে। অতঃপর সকলেই স্বর্গে বাস করবে।^৩

ইহুদি ধর্মে একত্ববাদের কঠোর নির্দেশনার সাথে সাথে নৈতিক বিধি-নিষেধেরও সুস্পষ্ট নির্দেশনা বিদ্যমান। এই ধর্মে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যায়ের পথে চলা, অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, এতিমের প্রতি দয়া করা এবং বিধবার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করার কথা বলা হয়েছে।^৪

খ্রিস্ট ধর্মে মানবপ্রীতি, অহিংসা এবং মানবসেবাকে অতি উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। যীশু বলেন, অনন্ত জীবন পেতে হলে খুন করা, ব্যাভিচার করা, চুরি করা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যাবে না। পিতা-মাতাকে সম্মান করতে হবে এবং প্রতিবেশীকে নিজের মত মহব্বত করতে হবে। তিনি ভ্রাতৃত্ব ও সমতা প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন।^৫

হিন্দু ধর্ম মতে, ভগবদগীতায় উপদেশ হচ্ছে ফল লাভের আশা ত্যাগ করে ব্যক্তিকে প্রতিনিয়ত কাজ করে যেতে হবে। কর্মেই রয়েছে ব্যক্তিমানুষের অধিকার, কর্তব্য ও মুক্তি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিক্ষেপ কর্মের নির্দেশনা দিয়েছেন এবং দুনিয়ার মোহ-মায়া থেকে মুক্ত হয়ে নিঃস্বার্থপূর্ণ কাজের মাধ্যমেই মোক্ষ বা মুক্তি রয়েছে বলে নির্দেশনা দিয়েছেন। যেমন শ্রীকৃষ্ণ বলেন, “Therefore always do without attachment the work you have to do; for a man who does his work without attachment attains the supreme.”^৬ এই শিক্ষাই হলো গীতার মূল নৈতিক শিক্ষা।

চৈনিক দার্শনিক কনফুসিয়াস চীনাাদের মধ্যে আদর্শ ও নৈতিক জীবনের অধিকারী হওয়ার জন্য Five Chings নামে পরিচিত পাঁচটি কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলো হলো: প্রাচীন ঐতিহ্যকে মনোযোগের সাথে ধারণ করা; শিক্ষা অব্যাহত করা, সৎকর্মশীল হওয়া, পিতা-মাতা, পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি সদয় হওয়া এবং নিজের জন্য অপছন্দ কোনো কাজ অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া থেকে বিরত থাকা।^৭

সমতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, মানবপ্রেম এবং অহিংসা ছিল গৌতম বুদ্ধের নৈতিকতার মূল বিষয়। বুদ্ধের বাণী হলো— ‘অহিংসা পরম ধর্ম’। বুদ্ধ বাণীর সারকথা সর্বজনীন শান্তি, অহিংসা, প্রেম-ভালোবাসা,

পরমত সহিষ্ণুতা, উদারতা এবং সর্বজীবে মৈত্রী। বুদ্ধের উপদেশাবলিতে এমন সব উপাদান আছে যা সর্বকালে সবলোকের জন্য প্রযোজ্য।^{১৮} কুশল কর্ম সম্পর্কে বুদ্ধ বলেন, “সকল প্রকার পাপকর্ম থেকে বিরত থাকা, কুশল সম্পাদন করা এবং স্বীয় চিত্ত শুদ্ধিকরণ ইহাই বুদ্ধের অনুশাসন”।^{১৯}

গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস এর মতে, জ্ঞানই বাস্তব, জ্ঞানই সত্য। তিনি সত্য লাভের জন্য মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে প্রত্যেকটি বস্তুকে বিচার করতে বলেছেন। তিনি মনে করেন, বিচার ক্ষেত্রে আবেগ বর্জন করতে হবে এবং বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী সৎ কাজ করতে হবে। সক্রেটিসের নীতিতত্ত্বের মূল কথাই হলো ‘জ্ঞানই পুণ্য’। জ্ঞান বা সত্য এবং সদগুণ পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। কেননা জ্ঞানই সকল সদাচরণের উৎস আর অমঙ্গল, পাপ ও মিথ্যাচার আসে অজ্ঞানতা থেকে। সক্রেটিস আরও বলেন, “নিজেকে জানো”। সক্রেটিস মনে করেন, বিবেকের অনুমোদন ছাড়া শুধু কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা সৎ নাগরিকের বৈশিষ্ট্য নয়। তাই তিনি এথেন্সের যুবকদের খেলা ময়দানে ডেকে এনে নৈতিকতা শিক্ষা দিতেন এবং তাদের সুন্দর ও ন্যায্যনিষ্ঠ জীবন-যাপনে উৎসাহিত করতেন। তিনি মনে করেন, পরিবার বা রাষ্ট্রের বিধান নয় নিজের বুদ্ধিবিবেচনায় যা সঠিক বলে মনে হবে, একজন জ্ঞানী নাগরিকের তা অনুসরণ করা কর্তব্য।^{২০}

নৈতিক মূল্যবোধ ও আচরণের ক্ষেত্রে দার্শনিক প্লেটো ন্যায় ও শুভের অপেক্ষা মর্যাদায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি সমাজের প্রতিটি সদস্যের পূর্ণমাত্রায় ন্যায়বিচার পাওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি নাগরিকদের মধ্যে স্বাধীনতা, ঐক্য, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব নিশ্চিত করে রাষ্ট্রের প্রত্যেকের জীবন পূর্ণমাত্রায় বিকাশের ওপর জোড় দেন এবং নাগরিকের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তাই প্লেটো তাঁর *Republic* গ্রন্থে বলেন, রাষ্ট্রের প্রজাদের নৈতিক আদর্শে বলীয়ান করার চেষ্টা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, প্রজাদের পবিত্র, সত্য ও মঙ্গলময় বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে মর্যাদাশীল জাতি গঠনে সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে।^{২১}

ইসলাম নতুন কোনো ধর্ম নয়। ইসলাম ধর্ম অনুসারে, ইব্রাহিম (আঃ) ও ঈসা (আঃ) প্রমুখ নবিগণ মানবতা ও নৈতিকতার বাণী প্রচার করে যে একেশ্বরবাদী ধর্ম প্রচার করেন ইসলাম তারই পথ অনুসরণ করেছে। তবে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রচারিত এই ধর্মের ছিল নতুন ব্যাখ্যা ও শক্তি। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী মহান আল্লাহর বাণী ও তাঁর রাসুলের আদর্শই হলো নৈতিকতার উৎস। ইসলামে ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। চিন্তা, বাক্য ও কার্যের মধ্যে সংগতি বিধানই ইসলামি জীবনের লক্ষ্য। ইহলৌকিক জীবনে মহান আল্লাহ ও তাঁর বিধান মেনে চললে পারলৌকিক জীবনে চিরশান্তি লাভ করা যাবে। আর অমান্য করলে পারলৌকিক জীবনে ভোগ করতে হবে কঠিন শাস্তি। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, “জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। অতঃপর তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে জন্মান্তরে সুউচ্চ প্রাসাদে স্থান দেব, যার তলদেশে প্রশ্রবণসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।”^{২২} তাই মানুষকে পার্থিব জীবনের স্বল্পকালীন সময়ে নৈতিকতার সাথে জীবনযাপন করে অনন্ত জীবনের পথে যাত্রা করতে হবে। পারলৌকিক জীবনে জবাবদিহিতার বিধান আছে বলেই জীবনের পূর্ণতম বিকাশের মাধ্যমে জীবনের উপলব্ধির জন্য ইসলাম জীবনের বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে। আলোচনার সুবিধার্থে নৈতিকতার গুরুত্বকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক জীবনব্যবস্থা এই সকল ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে।

ব্যক্তিজীবন

ইসলাম দাবি করে যে, ইসলামের বিধান অনুসারে জীবনযাপন করা ব্যক্তির দায়িত্ব। ব্যক্তিগত দায়িত্ব ইসলামের একটি ভিত্তি। ইসলাম ও ইসলামি ধর্মতত্ত্বের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষ তার সকল কাজের জন্য স্রষ্টার কাছে দায়বদ্ধ। দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ তাকেই দিতে হবে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়াল্লা বলেন, “প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী। কেউ বহন করবে না অন্যের বোঝা।”^{১৩} আল্লাহ্‌তায়াল্লা আরও বলেন, “তোমরা যদি ভালো কিছু উপার্জন কর, তবে নিজেদেরই ভালো করবে এবং যদি মন্দ কিছু উপার্জন কর তবে তাও নিজেদের জন্যই।”^{১৪} “যে মন্দ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে।”^{১৫} তাই একজন মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর একটি হলো উচ্চ নৈতিক মানসম্পন্ন হওয়া। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি হলো তার নৈতিক চরিত্র। ইসলামে ব্যক্তিগত নৈতিকতার অনেকগুলো দিক রয়েছে। যেমন-সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, ক্ষমা, পরস্পর সহযোগিতা, সাম্য-মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি। ইসলাম মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও আখিরাতের মুক্তির একমাত্র শর্ত হিসেবে উত্তম ও পবিত্র চরিত্রকে নির্ধারণ করে দিয়েছে। মহানবি (সা.) বলেন, “উত্তম চরিত্রই হলো সকল নেক কাজের মূল কথা।”^{১৬} কেয়ামতের দিন দুনিয়ার ধন-সম্পদ কাজে আসবে না। কাজে আসবে সুন্দর নৈতিক চরিত্র। মহানবি (সা.) বলেন, “কেয়ামতে মু’মিনের দাড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারি জিনিস হবে উত্তম নৈতিক চরিত্র।”^{১৭}

মানুষকে নৈতিক দিক থেকে পবিত্র ও শুদ্ধ রাখার ব্যাপারে ইসলাম ব্যাপক গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলামি বিধান মতে, ভালো কাজের পুরস্কার এবং অন্যায় ও অসৎ কাজের কঠোর ও কঠিন শাস্তির ঘোষণা রয়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, “মু’মিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয় উত্তম জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রদান করব।”^{১৮} আল্লাহ্‌তায়াল্লা আরও বলেন, “যে পুণ্য নিয়ে আসবে, তার জন্য রয়েছে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান এবং যে খারাপ কাজ নিয়ে আসবে সে তার কর্ম অনুপাতেই প্রতিফল পাবে।”^{১৯} পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছে, “কেউ কোনো পুণ্য কাজ করলে সে তার দশ গুণ পাবে এবং কেউ কোন মন্দ কাজ করলে সে ততটুকুই শাস্তি পাবে এবং তারা অত্যাচারিত হবে না।”^{২০} ইসলামে ব্যক্তি পর্যায়ে সততা ও ন্যায়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে সত্য বলা ও ওয়াদা পালনে সর্বোচ্চ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে ঘোষণা হয়েছে, “মু’মিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল? তোমরা যা কর না, তা বলা মহান আল্লাহ্র কাছে খুবই অসন্তোষজনক।”^{২১} অর্থাৎ কেবল কথায় নয়, কাজের মাধ্যমে ইসলাম মানুষকে নৈতিক জীবন গড়ে তোলার নির্দেশনা দিয়েছে। কথা ও কাজের মধ্যে অমিল ইসলামি নৈতিকতায় একটি অন্যায় কাজ বলেই বিবেচিত।

পারিবারিক জীবন

ইসলাম মানুষের জৈবিক চাহিদা পূরণের প্রবৃত্তিকে সুন্দর ও পরিচছন্ন পথে পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেছে। ইসলাম বিবাহের মাধ্যমে পারিবারিক জীবন ব্যবস্থার ওপর গুরুত্বারোপ করে। পরিবারভিত্তিক জীবনব্যবস্থায় মানুষ জীবনকে সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করতে পারে। তাই এ জীবনই সর্বোত্তম জীবন। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: “আল্লাহ্‌ যে সকল পুরুষের জন্য যে সকল স্ত্রী লোককে হালাল করেছেন তাদের মধ্যে সে সামর্থানুযায়ী চারজনকে পর্যন্ত বিবাহ

করতে পারবে। কিন্তু সামর্থ্য না থাকলে মাত্র একজনকে বিবাহ করবে। এছাড়া অন্যসব স্ত্রী-ই তার জন্য হারাম করা হয়েছে।”^{২২} তবে কেউ যদি মহান আল্লাহর এই নিয়মকে লঙ্ঘন করে তাহলে পরকালে তার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মে এ রকম পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর জীবনের নির্দেশনা দেয়া হয়নি। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছে— “আর নারীদের মধ্যে যারা তোমাদের মালিকানাধীন হয়েছে তাদের ব্যতীত সকল সধবা মহিলা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। ... আর উল্লেখিত নারীগণ ছাড়া অন্য সব নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো যদি তোমরা অর্থের বিনিময়ে ব্যভিচারের উদ্দেশ্য ছাড়া তাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাও।”^{২৩}

বিয়ে-শাদির মাধ্যমে সম্মানজনক পন্থায় প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ ও তা ফলপ্রদ করার পুণ্যময় রীতি প্রণয়ন করেছে শরি’আত। মানব জীবনের কল্যাণ ও স্থিতিশীলতার জন্যে বিয়ে এক গভীর তাৎপর্যময় সত্য। ইসলামি বিধান মতে, পিতা-মাতার দায়িত্ব হচ্ছে, সন্তানকে পূর্ণ বয়সে বিবাহ দেয়া। এটা সামাজিক দায়িত্বও বটে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত মহানবি (সা.) বলেছেন, “পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের হক হচ্ছে প্রথমত তিনটি: জন্মের পরপরই তার জন্য উত্তম একটি নাম রাখতে হবে, জ্ঞান-বুদ্ধি বাড়লে তাকে আল কুরআন তথা ইসলামি শিক্ষা দিতে হবে। আর সে যখন পূর্ণ বয়স্ক হবে, তখন তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।”^{২৪} নর-নারীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে ইসলাম সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জীবন সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে-শাদীর গুরুত্ব অসামান্য। মহানবি (সা.) ইরশাদ করেছেন, “কোন বান্দা যখন বিয়ে করল তখন তো সে দ্বীনের অর্ধেকটা পূর্ণ করে ফেলল। অতঃপর সে যেন অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে।”^{২৫}

শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ ও পবিত্রতা নির্ভর জীবনব্যবস্থাই কেবল মানুষকে পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ও সুখময় জীবনের নিশ্চয়তা দিতে পারে। এ ধরনের আইন-কানুন ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মে নেই।

ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনব্যবস্থার এতটা ব্যাপক নির্দেশনা নেই। বিশ্বের অনেক দেশেই মুক্ত ও অবাধ যৌন জীবন চর্চা পরিলক্ষিত হয়। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যভিচার-পতিতাবৃত্তি প্রভৃতি অনাচার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অবাধে চলছে। কেননা সেসব দেশের পারিবারিক ও সামাজিক সুদৃঢ় বন্ধন নেই। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসনও নেই। ইসলামে মুক্ত ও অবাধ যৌনাচার অর্থাৎ ব্যভিচার কবিরী গুনাহ। পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে— “এবং তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, নিশ্চয় এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।”^{২৬} “(হে রাসুল!) মু’মিনদের বল, তারা যেন তাদের নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফায়ত করে।”^{২৭} যদি তারা এই নির্দেশনা অমান্য করে তাদের শাস্তির বিধান রয়েছে। “ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী এদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করবে।”^{২৮} আল-কুরআনের বিধান অনুযায়ী মহানবি (সা.) ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকর করতেন। বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার করলে তাকে ‘রজম’ বা প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড এবং অবিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার করলে ৮০টি কশাঘাতের শাস্তি দিতেন। সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে ব্যভিচার চিরতরে উৎখাতের জন্য মহানবি (সা.) বলেন, “হে লোক সকল! তোমরা ব্যভিচারকে ভয় কর, কেননা তার ছয়টি পরিণাম রয়েছে। তিনটি পৃথিবীতে এবং তিনটি আখিরাতে। পৃথিবীর তিনটি হলো: ১.

সৌন্দর্যহানি ২. দারিদ্র্য এবং ৩. অকাল মৃত্যু। আর আখিরাতে তিনটি হলো: ১. দোষখের শাস্তি ২. হিসাবে মন্দ পরিণাম এবং ৩. আল্লাহর অসন্তুষ্টি।” ২৯

ইসলাম সুন্দর ও আদর্শ জীবন গঠন করার জন্য সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে— “নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।” ৩০ মহান আল্লাহর পছন্দকে প্রাধান্য দিয়ে সীমার মধ্যে থেকে একজন মুসলমান পার্থিব জীবনে ধর্ম ও নৈতিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে পারলৌকিক জীবনকে সফল করতে পারে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, “যে সব লোক পার্থিব জীবন ও উহার সৌন্দর্য কামনা করে তাদের কাজকর্মের যাবতীয় ফল আমি দুনিয়াতেই দান করি এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না। কিন্তু পরকালে তাদের জন্য আগুন ছাড়া অন্য কিছুই নাই, তারা দুনিয়ায় যা কিছু করেছে, তা নিষ্ফল হবে এবং তারা যা কিছু করে থাকে তা নিরর্থক।” ৩১

ইসলাম মানুষের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের কল্যাণ সাধনে প্রয়াসী। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কেউ অন্যায় ও অসৎ পথে অগ্রসর হয় তাহলে তার পারলৌকিক শাস্তি ছাড়াও পার্থিব শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, “প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখমের বিনিময়ে অনুরূপ যখম।” ৩২ এই আয়াতের মাধ্যমে ইসলামে জাগতিক জীবনের পাপ কার্যের যথাযথ শাস্তির ভয়াবহতার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে মানুষ অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে দূরে থাকে। মানুষ যাতে পার্থিব জীবনে ধর্ম ও নৈতিকতাকে বেশি বেশি গুরুত্ব প্রদান করে নৈতিক ও সৎ জীবনযাপনে আগ্রহী হয় এবং পারলৌকিক জীবনকে সুন্দর ও অর্থবহ করে তোলে।

সামাজিক নৈতিকতা

একটি সুসংগঠিত, সুষ্ঠু সমাজ জীবনযাপনের মাধ্যমেই মানুষ কল্যাণের পথে পরিচালিত হতে পারে। একটি সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা নির্ভর করে সেই সমাজের প্রতিটি সদস্যের একই নৈতিক নীতি এবং অনুশীলনগুলো মেনে চলার ওপর। সামাজিক নৈতিকতার মধ্যে রয়েছে সমতা, ন্যায়বিচার, ন্যায্যতা, ভ্রাতৃত্ব, করুণা, সহানুভূতি, সংহতি ইত্যাদি। মানুষের মঙ্গলের জন্য ভালো কাজের প্রতিষ্ঠা ও মন্দ কাজের প্রতিরোধ করা, সত্যের সাক্ষ্য দেওয়া আর দুনিয়াতে মহান আল্লাহর নৈতিক নীতির বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে মানবজাতির সত্যিকার কল্যাণ সাধন করাই ইসলামি সমাজের উদ্দেশ্য। ইসলামে সামাজিক বন্ধন প্রতিষ্ঠার প্রতি দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান বিশ্ব আজ চরম অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন। সম্পদের অসম বণ্টন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। কারণ বিশ্বের ধনী দেশগুলো অর্থের পাহাড় গড়ে তুলছে, আর অপর দিকে অন্য শ্রেণি অর্থের অভাবে অসহায়ভাবে জীবন-যাপন করছে। তাঁরা তাদের জীবনের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের কোনো ব্যবস্থা করতে পারছে না। আর এর ফলে সমাজে শোষণ ও শোষিত দু’টি শ্রেণির উদ্ভব হচ্ছে। ফলে সামাজিক বৈষম্য চরম আকার ধারণ করছে। সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য রোধ করতে হলে ব্যক্তিমানুষকে নৈতিক হতে হবে, অন্যের প্রতি দায়িত্ববোধ থাকতে হবে। ইসলাম এই দায়িত্ববোধের শিক্ষা দেয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, “আর যারা স্বর্ণ ও রপা

জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে (সেদিন বলা হবে), এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করেছিলে; সুতরাং এক্ষণে আত্মদান গ্রহণ কর পুঞ্জীভূত রাখার।”^{৩৩} এছাড়া আল-কুরআনে আরও বলা হয়েছে, “তোমরা অন্যায়রূপে একে অপরের সম্পদ গ্রাস করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দাংশ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে শাসন করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দাংশ জেনে শুনে অন্যায়রূপে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিওনা।”^{৩৪} সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনের জন্য ইসলামে যাকাত ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। একজনের হাতে বিপুল অর্থ-সম্পদ জমা হওয়াকে ইসলাম পছন্দ করে না। ইসলাম চায় ধনী-গরীব সবাই স্বাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করুক। তাই দরিদ্রের প্রতি লক্ষ করে যাকাতের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। যাকাত গরিবের প্রতি কোন করুণা নয় বরং তার হক— যা ধনী ব্যক্তিকে অবশ্যই আদায় করতে হবে। এ ব্যাপারে আল-কুরআনে বলা হয়েছে— “তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে অভাবহস্ত ও বঞ্চিতের হক রয়েছে।”^{৩৫}

ইসলামি বিধান মতে, যাকাত রাষ্ট্রীয় আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ধনী ব্যক্তিগণ তাদের সম্পদের আড়াই শতাংশ রাষ্ট্রের যাকাত তহবিলে জমা দিয়ে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বুনியাদ সুদৃঢ় করতে ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু সমকালীন বিশ্বে ইসলামি অনুশাসন না থাকায় কোথাও যাকাতভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু নেই। যার কারণে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায়ের কোনো ব্যবস্থা নেই এমনকি ব্যক্তি পর্যায়েও যাকাত আদায়ের ব্যাপারে উদাসীনতা দেখা যায়। কিন্তু যাকাত ব্যবস্থা একটি সমাজ বা দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও গতিশীলতাকে স্বাভাবিক রাখার নিশ্চয়তা বিধান করে। যাকাত ব্যবস্থা মজদুরদারী প্রথার বিলোপ সাধনে ভূমিকা রাখতে পারে। এই ব্যবস্থা অর্থনীতিতে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তা অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করে ও অর্থনৈতিক শোষণের মুক্তি ঘটাতে সহায়ক হয়। যাকাত দানের ফলে আত্মশুদ্ধি ঘটে, আত্মত্যাগের জন্ম দেয় এবং সম্পদ পুঞ্জীভূত করার মানসিকতা দূরীভূত হয় ও সম্পদের পরিশুদ্ধি হয়। প্রকৃত পক্ষে যাকাত মানুষকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করে মানবতা প্রতিষ্ঠা করে। যাকাত ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বা ভারসাম্য রক্ষা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর ব্যবস্থা। এছাড়া যাকাত দানের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর রহমত ও আনুগত্য সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, “হিদায়াত ও রহমত সৎকর্ম পরায়নদের জন্য। যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আখিরাত সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। সেসব লোকই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে আছে এবং তারাই সফলকাম।”^{৩৬}

বৈষয়িক জীবনে নৈতিকতা

মানুষের বৈষয়িক জীবনের নানা দিকে ইসলাম যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। ইসলাম হালাল পথে উপার্জন ও সঠিক পথে ব্যয়ের নির্দেশনা দিয়েছে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হলো: “আল্লাহ ব্যবসাকে (ক্রয়-বিক্রয়) হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। কাজেই যে ব্যক্তির নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে অনন্তর সে বিরত রয়েছে, তবে পূর্বে যা হয়ে গেছে তা তার এবং তার ব্যাপারটি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত। আর যারা নির্দেশ পাওয়ার পরও এর পুনরাবৃত্তি করবে, তারা জাহান্নামী হবে; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।”^{৩৭} সমাজের এক

শ্রেণির মানুষ সুদী কারবারির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে সম্পদের পাহাড় গড়ছে। সুদের ফলে সমাজের কিছু লোক উপকৃত হলেও সুদখোর ব্যক্তির আত্মিক ও নৈতিক বিপর্যয় ঘটছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড সমগ্র মানব সমাজের জন্য অনিষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এমনকি অর্থনৈতিকভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষতি হচ্ছে। তাই ইসলাম এই অন্যায় ও অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনে বিরোধিতা করে। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে— “হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহর ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারো।”^{৩৮}

ইসলাম ব্যবসা ও অর্থ আয়-ব্যয়ের ওপরও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে ওজনে কম দেওয়া, খারাপ বস্তুকে ভালো বলে বিক্রি করা, দ্রব্যে ভেজাল দেয়া প্রভৃতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর এই নির্দেশনা অমান্যকারীর জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, “মেপে দেওয়ার সময় পূর্ণ মাপ দেবে এবং সঠিক পাল্লায় ওজন করবে। এটা উত্তম; এর পরিণাম শুভ।”^{৩৯} উপার্জিত অর্থ ও সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও ইসলামে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হলো এরূপ যে, “এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।”^{৪০} মানুষকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করতে ও অপচয় করতে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে। ইসলামে রয়েছে নিয়ন্ত্রিত ধনতত্ত্ব, যেখানে সুদ, জুয়া, অন্যায়, অনিয়ম ও বৈষম্যের কোনো স্থান নেই। তাই সামাজিক পর্যায়ে কোন বৈষম্য থাকবে না। এভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থ আয়-ব্যয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে ইসলাম মানুষের জীবন গঠনে সহযোগিতা করেছে। অন্যান্য পেশাগত ক্ষেত্রেও ইসলাম নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতি আহ্বান জানায়।

পর্যালোচনা

ব্যক্তি ও সমাজ ইত্যাদির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি জাতির উন্নয়নের জন্য তার প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈতিকতার চর্চা গুরুত্বপূর্ণ। একটি জাতি যদি সত্যিকার অর্থে নৈতিক চরিত্রে উন্নত না হয় তাহলে সে জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনে যে সুস্পষ্ট ও অনুকূল পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টির নির্দেশনা প্রদান করেছে তা একটি পূর্ণাঙ্গ নৈতিক জীবনব্যবস্থার নির্দেশনা বলা যায়। পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামি নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনে জোর তাগিদ দেয়। কেননা ব্যক্তিজীবনের নৈতিকতার ওপর সামাজিক নৈতিকতা নির্ভর করে। ব্যক্তি নৈতিকতা সামাজিক নৈতিকতার ভিত্তি। ইসলামি নৈতিক আদর্শে যারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন তারা আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সব কিছু উৎসর্গ করতে দ্বিধা করবে না। কেননা তাঁদের কাছে ব্যক্তিগত স্বার্থ বলে কিছুই থাকবে না। যার কারণে তাঁরা জীবন উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। ইসলামের নৈতিক উৎকর্ষের কারণেই মুসলমানরা বিশ্বসভ্যতায় বিস্ময়কর অবদান রেখে আদর্শ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল।

কিন্তু ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়নের সাম্প্রতিক যুগে মূল্যবোধ, নীতি ও নৈতিকতার ব্যাপক অবক্ষয় ঘটেছে। উচ্চ শিক্ষার প্রভাবে মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য ভাবধারা ও বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, ফলে পাশ্চাত্য জগতের মত অনেকটা স্বেচ্ছাচার, মিথ্যাচার, লোভ-লালসা, ভোগ-বিলাস, অপরের অধিকার হরণ ইত্যাদি অসৎ ও অন্যায় পন্থা অবলম্বন করছে। মানুষের মধ্যে কোনো সহনশীলতা নেই যার ফলে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। নীতিহীনতার কারণে মানুষ মানবতা ও

নৈতিকতা বিবর্জিত প্রাণী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। মানুষ মুখে বিভিন্ন সভা-সমিতি ও সেমিনারে সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, সততা ও মানবতার কথা বলে কিন্তু বাস্তবে তার প্রমাণ রাখে না।

নৈতিকতাহীন মানুষ অমানবিক ও অপ্রীতিকর কার্যকলাপের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করছে। তারা মুখে বলছে শান্তির কথা কিন্তু তারাই অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, “আর যখন তাদের বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না তখন তারা বলে, আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি।”^{৪১} অশান্তি সৃষ্টিকারীদের সতর্ক করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, “যে দিন গোপন বিষয়াদি পরীক্ষিত হবে, সেদিন তার কোন শক্তি থাকবে না এবং সাহায্যকারীও থাকবে না।”^{৪২} “সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে। অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সংকর্ম করলে তা দেখতে পাবে, এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করলেও তাও দেখতে পাবে।”^{৪৩} মহান আল্লাহ্‌তায়াল্লা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।^{৪৪}

মানুষ পবিত্র কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে যাওয়ায় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এ সব সমস্যার কোন সমাধান তারা খুঁজে পাচ্ছে না। ধর্মীয় বিধি-নিষেধ ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ নিজেদেরকে অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। পবিত্র কুরআন ও রাসুলের সুন্যাহ্‌ই মানুষকে দিতে পারে পথের দিশা, যাতে রয়েছে মানুষের জীবনের নানা সমস্যার সমাধান। মহানবি (সা.) এ ব্যাপারে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, “আমি তোমাদের নিকট যাহা রাখিয়া যাইতেছি, দৃঢ়তার সহিত তাহা অবলম্বন করিয়া থাকিলে তোমরা কদাচিৎ পথভ্রষ্ট হইবে না। তাহা হইতেছে আল্লাহ্র কেতাব ও তাঁহার রাসুলের আদর্শ।”^{৪৫} সর্বোপরি নৈতিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও শক্তিশালী হওয়ার জন্য মহান আল্লাহ্র কাছে মানুষ প্রার্থনা করতে পারে। “আল্লাহ সরল পথ দেখাও।”^{৪৬} পবিত্র কুরআন ও হাদিসের নৈতিক শিক্ষার আলোকে মানুষ তাঁর জীবন দর্শনের মূল্যবোধকে জাহত করতে পারে যাতে ঐতিহ্যগত ও আধুনিক জীবন ধারার দ্বন্দ্ব এড়ানো যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর সংকটগুলোকে ধর্মীয় নির্দেশনা অনুযায়ী দূর করা যেতে পারে। নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে মানুষের মনন, কর্ম ও ব্যবহারিক জীবন প্রতিষ্ঠায় নৈতিকতা শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। তাছাড়া সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। ব্যক্তিজীবনের আদর্শ গড়ে তুলতে মানুষের মধ্যে সর্বজনীন আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জাহত করা যেতে পারে। কেননা আধ্যাত্মিক বিষয় মানুষকে সং করে তুলবে। এক্ষেত্রে পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে হবে এবং পরিবারে নৈতিক শিক্ষাকে প্রসারিত ও শক্তিশালী করা যেতে পারে। সমাজ থেকে অসমতা দূরীকরণে ইসলামি নির্দেশনা অনুযায়ী ভারসাম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। যাতে করে একটি সর্বোত্তম নৈতিকতাসমৃদ্ধ ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবন নিশ্চিত করা যায়। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, “তোমরাই হলে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সংকাজের আদেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে।”^{৪৭}

ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, মানুষের জীবনকে সুন্দর, সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে গঠন ও পরিচালনা করার প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানে যুগে যুগে পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের আবির্ভাব ঘটেছে। সকল ধর্ম ও মতবাদের মধ্যে নানা ধরনের মতভেদ থাকলেও নৈতিকতার ব্যাপারে বেশকিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তবে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা যদি তাদের ধর্মের মৌলিক কিছু

নৈতিক শিক্ষাকে গভীরভাবে অনুশীলন করে, (যা অন্য ধর্মেও আবশ্যিক করা হয়েছে) তাহলে তা সমাজে সংহতি আনয়নে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। ইসলামি নৈতিকতা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনাচরণ প্রদান করে। এই জীবনাচরণ মুসলিমদের জন্য প্রকারান্তরে পালনীয় আদর্শ হিসেবে ইসলাম নির্দেশনা দেয়।

মানুষের জীবন ও সমাজকে সুন্দর করতে হলে নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শ চরিত্রের অনুসরণ অপরিহার্য। উত্তম চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ ব্যতীত কোন ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির উন্নতি হতে পারে না। পরকালে জবাবদিহিতার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে ধর্মীয় নির্দেশনা অনুযায়ী জীবনযাপন করলে নৈতিকতা অর্জন করা সম্ভব। আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যক্তিজীবনে নৈতিকতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং এটা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, ব্যক্তিমানুষ নৈতিকতা অর্জন করলে পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্র নৈতিকতার আবর্তে আসতে বাধ্য। গ্রিক দার্শনিক প্লেটো রাষ্ট্রীয় নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে ব্যক্তি নৈতিকতার কথা বলেন। তিনি মনে করেন, ব্যক্তিজীবনে একজন মানুষ নৈতিক হলেই রাষ্ট্রে নৈতিকতা তথা ন্যায়বিচার সম্ভব। ইসলামের নৈতিক শিক্ষাকে কেবলমাত্র ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে না নিয়ে নির্দেশনা পালন, আচার-অনুষ্ঠান ও ইবাদতের সাথে মহান আল্লাহর ওপর দৃঢ় বিশ্বাসকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে যে, পর্যাপ্ত বিশ্বাস ছাড়া এসব নৈতিক অনুশীলন এমনকি ইবাদতও মানুষের মুক্তি দিতে পারে না। এ সম্পর্কে মুহাম্মদ আবুল কাশেম বলেন,

“From the entry into Islam through faith he [the ybeliever] has to make progress and develop the faith through action performed in the light of the Qur’an and Tradition... thus faith and action taken together perfect the life and bring about salvation”^{১১}

এই বিষয়টি ইসলামি নীতিবিদ্যার একটি সীমাবদ্ধতা হিসেবে দেখানো যেতে পারে। কেননা পর্যাপ্ত বিশ্বাস ছাড়া এই নৈতিকতা অর্থহীন। তবে যেকোনো ধর্মের নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রেই বিষয়টি কমবেশি প্রযোজ্য।

তথ্যনির্দেশ

১. D. Mial Edward, *The Philosophy of Religion* (India: Progressive Publishers,1993), p.3.
২. এ. কে. এম., শাহনাওয়াজ, *বিশ্বসভ্যতা: প্রাচীন যুগ* (ঢাকা: সূচন প্রকাশন, ১৯৯৩), পৃ. ৫২-৫৪।
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১-১২৩।
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪।
৫. T. Walter Wallbank and Alastair M.Taylor, *Civilization Past and Present*, (USA: Foreseman and Company, 1962), p. 226-232.
৬. Swami Nikhilananda, translated, *The Bhagavad Gita*,3:19 (USA: The Haddon Craftsmen, Ins.,1944), p.112.

৭. এ. কে. এম. শাহনাওয়াজ, প্রাণ্ডু, পৃ. ১৩৮-৩৯।
৮. নিরুপকুমার চাকমা, বুদ্ধ: তাঁর ধর্ম ও দর্শন (ঢাকা: অবসর প্রকাশনী, ১৯৯৬) পৃ. ৯৮।
৯. নিরুপকুমার চাকমা, প্রাণ্ডু, পৃ. ৯৯-১০৩।
১০. আমিনুল ইসলাম, প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শন (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৮), পৃ. ৯৪-৯৫।
১১. আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া, নীতিবিদ্যা (ঢাকা: অবসর প্রকাশনী, ২০০৩), পৃ. ২৮।
১২. আল কুরআন, ৩ : ১৮৫।
১৩. আল কুরআন, ৬ : ১৬৪।
১৪. আল কুরআন, ১৭ : ৭।
১৫. আল কুরআন, ৪ : ১২৩।
১৬. আল হাদিস, মুসলিম।
১৭. আল হাদিস, তিরমিযি।
১৮. আল কুরআন, ১৬ : ৯৭।
১৯. আল কুরআন, ২৮ : ৮৪।
২০. আল কুরআন, ৬ : ১৬০।
২১. আল কুরআন, ৬১ : ২-৩।
২২. আল কুরআন, ৪ : ৩।
২৩. আল কুরআন, ৪ : ২৪।
২৪. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ), পরিবার ও পারিবারিক জীবন (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৩) পৃ. ৩৪২।
২৫. আল হাদিস, মিশকাত: ২৬৮-৩৮৯।
২৬. আল কুরআন, ১৭ : ৩২।
২৭. আল কুরআন, ২৪ : ৩০।
২৮. আল কুরআন, ২৪ : ২।
২৯. আল হাদিস, মুসলিম।
৩০. আল কুরআন, ২ : ১৯০।
৩১. আল কুরআন, ১১ : ১৫-১৬।

৩২. আল কুরআন, ৫ : ৪৫ ।
৩৩. আল কুরআন, ৯ : ৩৪-৩৫ ।
৩৪. আল কুরআন, ২ : ১৮৮ ।
৩৫. আল কুরআন, ৫১ : ১৯ ।
৩৬. আল কুরআন, ২ : ২৭৭ ।
৩৭. আল কুরআন, ২ : ২৭৫ ।
৩৮. আল কুরআন, ৩ : ১৩০ ।
৩৯. আল কুরআন, ১৭ : ৩৫ ।
৪০. আল কুরআন, ১৭ : ২৬-২৭ ।
৪১. আল কুরআন, ২ : ১১ ।
৪২. আল কুরআন, ৮৬ : ৯-১০ ।
৪৩. আল কুরআন, ৯৯ : ৬-৮ ।
৪৪. আল কুরআন, ২ : ২০৫ ।
৪৫. আল হাদিস, মুসলিম ।
৪৬. আল কুরআন, ১ : ৫ ।
৪৭. আল কুরআন, ৩ : ১১০ ।
৪৮. Muhammad Abul Quasem, *Salvation of the soul and Islamic Devotions* (London:Kegan Paul, 1981), p. 35.

ব্যক্তির নৈতিকমান উন্নয়নে নীতিশিক্ষা

এফ. এম. এনায়েত হোসেন*

Abstract

Along with improving the quality of life of the individual, it is very important to improve moral standard. The importance of moral education are developing moral standards can not be denied. Moral education is the basic foundation in shaping the mind of a person. The nature of moral education is to make people morally aware and distinguish between right and wrong, good and bad etc. Good-bad, right-wrong is the back-and-forth of moral and immoral. The pursuit of any good human purpose requires adherence to moral principles, because man's existence depends on his good deeds. The development of society is possible with the mutual exchange of people if morality is used in the proper arrangement of all resources. Moreover, the presence of morality helps people to solve moral problems by developing the human mind. In this case ethics plays an effective role in the development of professional work and preserving of dignity. Because of the lack of professional ethics, people's work life collapses. A person can be freed from this collapse of life if he earns money by applying conscience and accepting moral truths. Moral education is essential to sustain our social, familiar, economic even professional life. The main purpose of this article will be to discuss how people can lead a better life through moral education.

চাবিশব্দ: নীতিবিদ্যা, ব্যক্তি, সমাজ, সদৃশ্য এবং নৈতিক আদর্শ

ভূমিকা

নীতিবিদ্যার সমসাময়িক ধ্যান-ধারণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি সুখী সুন্দর মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এবং চরিত্রবান, সুশিক্ষিত, সুনামগরিক সৃষ্টির মাধ্যমে কীভাবে আমরা সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারি তা অনুসন্ধানের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মে আত্মনিয়োগ করি। সাম্প্রতিক সময়ে দেশে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নীতিশিক্ষার আলোচনার প্রাসঙ্গিকতাকে আরো বাড়িয়ে তুলছে। মানুষের স্বাভাবিক জীবনের মত নৈতিক জীবনেরও একটি বিশেষ আদর্শ আছে। এই আদর্শকে সামনে রেখে মানুষ স্বীয় কর্ম সম্পাদন করে এবং ক্রমান্বয়ে সে এই আদর্শের দিকে এগিয়ে যায়। এভাবে মানুষের নৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়। নৈতিক অগ্রগতি যত এগিয়ে যাবে, নৈতিক আদর্শ ততই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। মানুষের নৈতিক অধঃপতন যেমন সমাজের অবনতি ঘটায় তেমনি নৈতিক চরিত্র সুগঠিত হলেই সমাজের উন্নয়ন সাধিত হয়। কোন সমাজ কতটুকু উন্নত, তা নির্ভর করে ঐ সমাজে বসবাসকারী মানুষের নৈতিক মানদণ্ড কতটুকু মজবুত তার ওপর। বর্তমান বিশ্বে মানুষ-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে যে দ্বন্দ্ব, হিংসা-বিদ্বেষ দেখা যায় তার মূলে রয়েছে মানুষের নৈতিক আদর্শচ্যুতি অর্থাৎ মন থেকে নীতিবোধ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া। ধনসম্পদ, বিদ্যাবুদ্ধি, সামাজিক অবস্থান সবকিছু থাকা সত্ত্বেও মানুষের জীবন যদি সু নীতি দ্বারা চালিত না হয়, তাহলে অনেক অশুভ ঘটনাই মানুষ

* অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

ঘটাতে পারে। এমনকি আইন প্রয়োগ করেও নীতিব্রষ্ট মানুষকে সর্বদা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হয় না। নৈতিক চেতনা জাহত না হলে মানুষ পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট কাজ করতে পারে। আর পশুবৃত্তি দ্বারা তাড়িত হয়ে মানুষ যখন কোনো কাজ করে তখন সেই সমাজকে নৈতিক সংকটপূর্ণ সমাজ বলা হয়।

১.২. গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

বর্তমানে বাংলাদেশ শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, অর্থনীতি, ক্রীড়া ইত্যাদি দিক থেকে প্রভূত অগ্রগতি লাভ করলেও ব্যক্তির দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে কাজক্ষিত নৈতিক অগ্রগতি ঘটেছে বলে মনে হয় না; বরং দিন দিন সবাই নীতিহীনতার অন্ধ গলিতে নিপতিত হচ্ছে। আলোচ্য প্রবন্ধে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে নীতিশিক্ষা যে মানুষকে নৈতিক, মানবিক ও যুক্তিবোধসম্পন্ন মানুষে পরিণত করতে পারে সেসব উদ্ঘাটনের প্রয়াস রয়েছে। গবেষণার এ গুরুত্ব উপলব্ধি করে গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি নিম্নে তুলে ধরা হলো:

- i) যে শিক্ষার মধ্যে পর্যাপ্ত নৈতিকতার অভাব থাকে সে শিক্ষা সমাজে দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বয়ে আনে। নৈতিক চেতনা জাহত না হলে মানুষ পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট হতে পারে। আর পশুবৃত্তি দ্বারা তাড়িত হয়ে মানুষ যখন কোনো কাজ করে তখন সেই সমাজকে নৈতিক সংকটপূর্ণ সমাজ বলা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষ যদি তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সঠিকভাবে নীতিশিক্ষার প্রয়োগ ঘটান তাহলে সমাজে কাজক্ষিত উন্নতি সম্ভব বলে আমরা মনে করি। গবেষণার এ দিকটি গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছে।
- ii) অন্ধ-কুসংস্কারের পরিবর্তে ব্যক্তির নৈতিক জীবন মান উন্নয়নের জন্য যে অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন নীতিশিক্ষা পাঠের মাধ্যমে তা অর্জন করা সম্ভব কি-না তা তুলে ধরা।
- iii) সত্য ও ন্যায়পথে জীবনযাপনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা ও মানুষের মানবীয় গুণাবলি বিকাশে নীতিশিক্ষার তাৎপর্যের অনুসন্ধান চালানো।
- iv) মানুষের আচরণ মূল্যায়নের জন্য কিছু নৈতিক নিয়ম ও মানদণ্ডের প্রয়োজন। নীতিশিক্ষা মানুষের নৈতিক নিয়মাবলি ও মানদণ্ডের অনুসন্ধান, ব্যাখ্যা ও বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক নৈতিক মানদণ্ড গ্রহণ ও তা প্রয়োগের চেষ্টা চালায়, যা গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে।
- v) বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সংকটের সমাধানে এমনকি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় নীতিশিক্ষা যে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে তার অনুসন্ধান চালানো।
- vi) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন অনেক ক্ষেত্রে মানুষের জীবনকে করে তুলছে সংকটাপন্ন যা মানব জাতির জন্য হুমকিস্বরূপ। এ ক্ষেত্রে নৈতিক দর্শন চর্চার কোনো বিকল্প নেই। নীতিশিক্ষাই পারে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে মানবিক প্রয়োজনে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর পথ উন্মুক্ত করতে।

১.৩. গবেষণা পদ্ধতি:

আলোচ্য প্রবন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য সংশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি (synthetic method), বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি (analytical method) ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি (historical method) ব্যবহার করা

হয়েছে। প্রথমে গবেষণা সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট বই, পুস্তক, জার্নাল, স্মারকগ্রন্থ, নৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন নিবন্ধমালা ও বক্তৃতামালা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণী পদ্ধতি (analytical method) এর সাহায্যে বিশ্লেষণ করে গবেষণা কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সংগতকারণে প্রবন্ধটিতে গুণগত (qualitative) ও পরিমাণগত (quantitative) উভয় ধরনের পদ্ধতিই অনুসরণের প্রয়াস রয়েছে।

১.৪. নীতিশিক্ষা ও সমাজজীবন:

একটি সমাজের গঠন, প্রকৃতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক আলোচনার মাধ্যমে সামাজিক আচরণের প্রকৃতি নির্ভর করে। মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে সমাজ ছাড়া সে প্রকৃত জীবন-যাপন করতে পারে না। সামাজিক কর্মকাণ্ড ব্যতিরেকে তার আচরণ মূল্যায়ন অর্থহীন। সমাজের বিধি-বিধানই তাকে সহজ-সরল নৈতিক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করে তোলে। ভালো কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের তিরস্কার সমাজেই করা হয়, কারণ মানুষ সমাজেরই অংশবিশেষ। সমাজ ছাড়া মানুষের সামাজিক জীবন ও নৈতিক আচরণ অর্থহীন, তেমনি মানুষ ছাড়াও সমাজের কথা চিন্তা করা যায় না। তাই বলা যায়, নীতিবিদ্যা যেমন ব্যক্তির নৈতিক আদর্শকে প্রভাবিত করে তেমনি সমাজও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে ব্যক্তির নৈতিক আদর্শ উন্নয়নে সহায়তা করে।^১ সমাজে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে স্বার্থঘটিত নানা বিরোধ দেখা দেয় এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট জনসমষ্টি নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী কোনো না কোনো ভাবে বিরোধের মীমাংসা করে। এভাবে স্বার্থে সংঘাত ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে মানুষের সামাজিক ইতিহাস বিকশিত হয়। এই প্রক্রিয়া কখনো শান্তিপূর্ণ আবার কখনো সংঘাতপূর্ণ হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, নীতিশিক্ষা ব্যক্তির নৈতিকমান উন্নত করে সমাজের অনিষ্টকর কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে বিরত রাখে এবং সে ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে প্রকৃতি ও সমাজকে প্রভাবিত করে আত্মশক্তিকেও ইচ্ছানুযায়ী পরিমার্জিত, পরিশীলিত ও উন্নত করতে পারে। প্রত্যেক জাতির অভ্যন্তরেই জনগণের মধ্যে স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা বিরোধ থাকে। সে বিরোধ মীমাংসা করে জাতিকে এগুতে হয়। যত দীর্ঘ গতিতেই হোক, জেনারেশনের পর জেনারেশন ধরে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে মানুষের নৈতিক চেতনা বিকশিত হয়ে চলছে। প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিকযুগে মানুষের নৈতিক চেতনা সমানভাবে বিকশিত না হলেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমান সময়ে নীতিশিক্ষার ব্যাপক প্রচার এবং প্রসার মানুষকে প্রশান্তি এনে দিচ্ছে যা ভুলার নয়।

মানুষের চেতনায় আর একটি শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, যাকে বলা হয় বিবেক। বিবেক হলো মানুষের চেতনার অন্তর্গত সেই শক্তি যা মানুষকে তাড়িত করে অসত্য, অন্যায়, অকল্যাণ, অপ্রেম, নিষ্ঠুরতা ও কুৎসিতের পথ পরিহার করে সত্য, ন্যায়, কল্যাণ, সম্প্রীতি ও সুন্দরের পথ ধরে চলতে। বিবেক চালিত বিচারবোধই হলো নৈতিক চেতনা। বাস্তবের স্পর্শে আপন সত্তায় জাগ্রত প্রবৃত্তি, আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, ক্ষোভ, ক্রোধ, লোভ, ভয় ইত্যাদি দ্বারা তাড়িত হয়ে মানুষ যখন কোনো কর্মে ধাবিত হয়, তখন সেই কর্মের ঔচিত্য-অনৌচিত্য, ভালো-মন্দ ফলাফল সম্পর্কে এবং উদ্দেশ্য সাধনের প্রকৃত উপায় সম্পর্কে তার মনে প্রশ্ন জাগে। প্রশ্নের পর উত্তর, উত্তরের পর প্রশ্ন, আবার উত্তর, আবার প্রশ্ন...এভাবে চলতে চলতে একসময় হয় এর মীমাংসা। এ ধরনের প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্ন ও উত্তর-প্রতিউত্তরই হলো যুক্তি। যুক্তির মধ্য দিয়ে মানুষের নৈতিক চেতনা বিকশিত হতে পারে। মানুষ যখন বদ্ধ, অচল, অন্ধ, বিকাশহীন বিশ্বাসে স্থিত হয়, তখন সে তার

বিবেক ও যুক্তিবোধকে সচেতন চেষ্টা দ্বারা বিশ্বাসের অনুকূলে এক মুখি করে তোলে; স্থান-কাল-পাত্রের পার্থক্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলে; তার নৈতিক চেতনা বিকারপ্রাপ্ত হয়। জগত বিকাশমান থাকলেও তার নৈতিক চেতনা বিকাশহীন বিশ্বাসে বন্দি থাকে। গঠনমূলক-দৃষ্টিভঙ্গিহীন, বিচার-বিবেচনাহীন মুক্তবুদ্ধির চর্চা (nihilist exercise of free thinking) দ্বারা এ সমস্যার সমাধান হয় না। বরং, সার্বিক কল্যাণের জন্য নীতি-নৈতিকতার যথার্থ প্রয়োগ ও এর প্রয়োজন অপরিহার্যতায় রূপ নেয়।

নীতিবিদ্যা কিছু স্বীকার্য সত্যের সন্ধান দিয়ে মানুষকে ন্যায় কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে মানুষ ন্যায়, সুন্দর, শুভ, শ্রেয় ও কর্তব্য নির্ধারণে মীমাংসায় পৌঁছার চেষ্টা করে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, গোষ্ঠীগত, দলীয়, প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নীতিশিক্ষাকে যথাসম্ভব পরিচালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ করে; যুক্তির দ্বারা আবেগকে পরিচালিত করে চিন্তা ও কাজ করার পদ্ধতিই হলো নৈতিক অনুশীলন।^২ ব্যক্তি জীবনের মতো সামষ্টিক জীবনেও নৈতিক অনুশীলন অপরিহার্য। ব্যক্তিগত সাফল্য, সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রীয় সকল কাজে নৈতিক অনুশীলনের কোনো বিকল্প নেই। বিবেকবান মানুষ কোনো অন্ধ বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করে নয়, বরং সমাজে যা কিছু সত্য, সুন্দর ও কল্যাণকর এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত প্রয়াসে ন্যায়, সুন্দর, শুভ কর্তব্য নির্ধারণ করা; প্রকৃষ্ট সাধন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা এবং তা অবলম্বন করে কর্তব্য সম্পাদন করা আমাদের কর্তব্য। মানুষের জেগে ওঠা চেতনায় নীতি-নৈতিকতা নামক যে প্রবণতা প্রকাশ পায় তাই মানুষকে চালিত করে ন্যায়, সুন্দর, শুভ ও কর্তব্যের পথে। স্বাভাবিক অবস্থায় নীতিশিক্ষা ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের দিক-নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। সামাজিক, সাংগঠনিক, প্রাতিষ্ঠানিক, দলীয় প্রভৃতি সমষ্টিগত কর্মকাণ্ডে ক্রিয়াশীল থাকে সংশ্লিষ্ট জনসমষ্টির যৌথ বিবেক যা নীতিশিক্ষা অধ্যয়নের মাধ্যমে জানা যায়।

অবক্ষয়ক্লিষ্ট সমাজের দুর্নীতির সমস্যা সমাধানের জন্য নৈতিক জাগরণ ও রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন উন্নত করার প্রয়োজন সর্বমহলে স্বীকৃত। আর্থ-সামাজিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা উন্নত না করে কেবল দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচারকার্য ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা দ্বারা সমাজের সামগ্রিক অবস্থার কোনো উন্নতি আদৌ হবে না। আইনের পরিবর্তন দ্বারা ন্যায়বোধ সমাজের সর্বস্তরকরণে জোরদার করতে হবে, অন্যায়কে বর্জন করতে হবে অর্থাৎ অন্যায় বন্ধ করতে হবে। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কৌশলে নৈতিক উন্নয়নের বিষয়কে সক্রিয় বিবেচনায় রাখতে হবে। শোষিত-বঞ্চিত ও নির্যাতিত মুক্তিকামী মানুষ যদি স্থায়ী সামাজিক উন্নতি অর্জন করতে চায়, তাহলে তাদের ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত সকল কাজের মর্মমূলে নৈতিক অনুশীলন বাড়াতে হবে। নৈতিক জাগরণই পারে ব্যক্তিকে, সমাজকে, রাষ্ট্রকে কলুষমুক্ত করে সমাজে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিতে। তাছাড়া, রাষ্ট্রে প্রচলিত সামাজিক ব্যাধি থেকে গণমানুষকে মুক্তি দিতে হলে যেমন দীর্ঘমেয়াদি আর্থ-সামাজিক, রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা দরকার তেমনি দরকার তা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য উন্নত নৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ দক্ষ জনবল, যা কেবলমাত্র নৈতিক অনুশীলনের মাধ্যমে সম্ভব। প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই মানুষ দলগতভাবে বসবাস করত বটে,^৩ কিন্তু সে সময়কার সমাজব্যবস্থা বর্তমান সময়ের সমাজব্যবস্থার মতো এতটা উন্নত ছিল না। আদিম সমাজে মানুষ তার নিজের খেয়াল খুশি মতো চলতো; সম্পূর্ণভাবে তার নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত, কারণ সে সময়ে জীবনধারায় কোনো সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বা ধারণা গড়ে উঠেনি। তবে এটা স্পষ্ট যে, একটি আদর্শ সমাজ কাঠামোর গভীরে যেমন সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ রীতি-নীতি থাকা দরকার তেমনি দরকার উন্নত

নীতিমান জনসমষ্টি; যা শুধু নিজের জন্য নয় বরং উন্নত জাতি গঠনের জন্যও অপরিহার্য। সমাজের এমন সমষ্টিগত রূপই হলো ব্যক্তিমানুষের জীবনধারা গঠনের ও ব্যক্তির সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তৈরির অন্যতম ক্ষেত্র। একথা সত্য যে, মানুষের সাংস্কৃতিক বিষয়াদি হলো মানুষের দৈনন্দিন শিক্ষার বিষয়। কারণ, সংস্কৃতির সাথে যুক্ত দিকগুলো হলো জ্ঞান, শিল্পকলা, নৈতিকতা, আইন ইত্যাদি; আর এ প্রতিটি দিকই হলো মানুষের শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত।^৪ এ বিষয়গুলো শিক্ষার্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি যেমন তার নৈতিক চেতনার পরিস্ফুটন ঘটাতে পারে, তেমনি উন্নত নৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ জাতি গঠনের মাধ্যমে নিজ দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটাতেও কার্যকর উদ্যোগ নেয়া সম্ভব— জাতি হিসেবে এটি আমাদের সকলেরই প্রত্যাশা।

মানুষের জীবন, তার ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, সম্ভাবনা-বাস্তবতা সবই জোরালোভাবে নির্ভর করে সমাজ-সংস্কৃতির উন্নয়নের উপর। এক্ষেত্রে, নীতিশিক্ষার গুরুত্বকে অবজ্ঞা করে সামাজিক সম্ভাবনাগুলোকে বাস্তবে জিয়ায়ে রাখা সম্ভবপর নয়, কারণ সম্ভাবনাগুলো সামাজিক প্রথা ও ধরণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কাজেই এটা স্পষ্ট যে, সমাজের ঐতিহ্য এবং প্রথা হলো মানুষের আচরণ, অভ্যাস এবং চিন্তাধারার ভিত্তি— যার সূচনা হয় শৈশব থেকেই।^৫ উল্লেখ্য, এই বাস্তবতা কেবলমাত্র মানব শিশুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বরং অন্যান্য প্রাণি সত্তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কাজেই বলা যায়, সমাজের ভিত্তি থেকে শুরু করে শৈশবকালের এবং কৈশোর ও যৌবনকালের শিক্ষার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতিকে অর্জন করার এই যে বাস্তবতা তা অনস্বীকার্য। সমাজ যদি মানুষের সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হয়, যে ভিত্তি থেকে মানুষ সাংস্কৃতিক শিক্ষাসহ বিভিন্ন নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে তাহলে সভ্যতার উন্নয়নসহ সমাজ, সংস্কৃতির উন্নয়নে নীতিশিক্ষার ভূমিকা তাৎপর্য বহন করে। সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ যখন সমাজের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় মিলিত হয় তখন সেখানে ঘটে চিন্তা, আবেগ, ভালো-মন্দ, সাফল্য এবং এমন অনেক নানান দিক। উল্লেখ্য, ব্যক্তির এ বোধগুলি চালিত হয় মানুষের আদর্শ ও মূল্যবোধ দ্বারা। সংস্কৃতির এ দিকটিকে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় মূল্যবোধের দিক। কিন্তু, মূল্যবোধভিত্তিক এ দিকের জন্য আবশ্যিক কিছু নীতিমালা ও বিধিমালা প্রয়োজন, যার মধ্য দিয়ে মানুষের আচরণের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় এবং উচিত-অনুচিতের দিকগুলো সঠিক ভাবে ফুটে ওঠে।

১.৫. আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠায় নীতিশিক্ষা

আজকের সমাজ প্রধানত দুটি ধারায় বহমান, একটি শহুরে সমাজ এবং অন্যটি গ্রাম্য সমাজ। শহুরে সমাজ আবার অভিজাত শ্রেণি এবং উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত এই তিনটি প্রতিনিধিত্বকারী শ্রেণিতে বিভক্ত। গ্রাম্য সমাজেও বর্তমানে উপশহর গড়ে উঠায় বিভিন্ন শ্রেণি বিভাজন পরিলক্ষিত হয়। একই সমাজে বসবাস করলেও প্রত্যেক শ্রেণির মানুষের সামাজিক মর্যাদা ও মূল্যবোধ একরকম নয়। সামাজিক মূল্যবোধের বর্তমান স্তরে গ্রাম্য সমাজে একজন ধর্মীয় শিক্ষককে মোটামুটি আদর্শ স্থানীয় ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অথচ, শহুরে সমাজব্যবস্থায় তেমনটি দেখা যায় না। এক্ষেত্রে, শহুরে সমাজে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্যাপ্ত নীতিশিক্ষা পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো আশু প্রয়োজন। বর্তমান অত্যাধুনিক নগর জীবনে, যেখানে সবকিছু পরিমাপ করা হয় অর্থনৈতিক মানদণ্ডে, সেখানে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ প্রতিপত্তি লাভে নীতিশিক্ষার গুরুত্বকে খাটো করে দেখা আদৌ ঠিক হবে না।^৬ বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করতে এবং শিক্ষার্থীদের নৈতিক জীবন গড়ার ব্যাপারে উচ্চ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের গুরুত্বকে খাটো করে দেখাও ঠিক নয়। কারণ, শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে বিবেচনা না করে বরং সম্পদ উৎপাদনের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এ জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে টেলে সাজাতে হবে এবং শিক্ষার প্রতিটি স্তরে নীতিশিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনায় নিতে হবে। শিক্ষাঙ্গনগুলোকে সন্ত্রাসমুক্ত করা এবং বাঙালি সংস্কৃতি বিরোধী আদর্শহীন নীতি-নৈতিকতাবিমুখ রাজনীতির অগুণ্ড থাবা থেকে প্রতিষ্ঠানগুলোকে মুক্ত রাখা একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের এমন শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যে শিক্ষা সমাজের সব পাশাচার দূর করে সমাজকে সঠিক পথের নির্দেশনা দিতে পারে। আমরা যদি প্রাচীনকালের সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালের মিল, কান্ট, কার্ল মার্কস, রাসেল, সার্ত্রে প্রমুখ চিন্তাবিদদের নীতিদর্শন পর্যালোচনা করি এবং তা থেকে নির্যাস বের করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে ঋণ পরিশোধ করা, সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা করা,^৭ অপরের কাজে হস্তক্ষেপ না করে যার যা কাজ তা তাকে করতে দেয়া, যোগ্যতা অনুসারে কাজে নিয়োগ করা, জীবন ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু নিশ্চিত করা, যোগ্যতা অনুসারে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, অপরের সম্পদ লুণ্ঠন তথা হরণ না করা, সং পথে চলা, নৈতিক জীবন-যাপন করা, সকল মানুষের কল্যাণ কামনা করা, মানুষকে উপায় হিসেবে গ্রহণ না করে বরং উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করা, মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা, প্রতিটি মানুষের নিজ নিজ অস্তিত্ব নিশ্চিত করে সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ করা, মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, সমগ্র মানব সমাজকে সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করা প্রভৃতি বিষয়ে নৈতিক শিক্ষা গ্রহণই হচ্ছে মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার প্রকৃত শিক্ষা এবং তা বাস্তবে যথাযথ প্রতিপালনের মাধ্যমে পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রে শান্তি বজায় থাকবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। শ্রেণিকক্ষের পাঠ্যক্রম এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট উপরিউক্ত বিষয়ের শিক্ষাকে যদি প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করে শিক্ষার্থী তার ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে তাহলে তার প্রভাব পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপরও পড়বে এবং এভাবে গোটা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে বাধ্য। এভাবে সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ একটি সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা অনেকটা সহজতর হবে।^৮ শিক্ষকগণের শেখানো ও প্রচারিত সু-নীতি, আদর্শ, নৈতিকতা, মূল্যবোধ প্রভৃতি ছাত্র-শিক্ষক উভয়কেই প্রথমে নিজেদের কৃতকর্মে চর্চা করতে হবে। তারপর, সমাজ তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণীতে তা প্রতিপালনে জনগণকে উৎসাহিত করা হলে এগুলো বাস্তবায়ন অনেকটা সহজতর হতে পারে; এভাবে একটি সুন্দর বাসযোগ্য সমাজ গড়ে উঠতে পারে।

এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যথার্থ নৈতিক শিক্ষা লাভ করে সে অর্জিত জ্ঞানকে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিয়োজিত করতে পারলে সমাজ কাজক্ষিত উন্নতি লাভ করতে পারবে। দেশের প্রতিটি নাগরিককে আদর্শ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে দেশ যেমন সমৃদ্ধশালী হবে তেমনি দেশের উন্নয়নও ত্বরান্বিত হবে। শুধুমাত্র সার্টিফিকেট সর্বস্ব শিক্ষা লাভ করে শুধু চাকুরি গ্রহণই শিক্ষার্থীর মূখ্য উদ্দেশ্য হতে পারে না, সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশপ্রেমিক আদর্শ নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা প্রতিটি নাগরিকেরই কর্তব্য।^৯ শৈশবের শিক্ষার ছাপ শিক্ষার্থীর মন থেকে একেবারে মুছে যায় না। ছোটবেলা থেকে প্রতিটি ছাত্রকে নিজ নিজ চরিত্র গঠনের উপর জোর দিতে হবে। প্লেটো সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।^{১০} তিনি শৈশবকালে শিশুদের সামনে উন্নত নৈতিক আচরণ সম্পর্কীয় গল্প উপস্থাপনের কথা বলেছেন যার দ্বারা শিশুরা সুন্দর চারিত্রিক

বৈশিষ্ট্য অর্জনে উৎসাহিত হতে পারে। নৈতিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের অনুকরণের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষাজীবন আরম্ভ হবে এবং এ শিক্ষার্জন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাজে প্রয়োগ ঘটিয়ে সমাজে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিতে পারে এ প্রত্যাশা আমাদের। যথার্থ জ্ঞানে সমৃদ্ধ, প্রজ্ঞার আলোতে আলোকিত মানুষ পরার্থপরতারবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানব কল্যাণে নিবেদিত হবেন। নিজ নিজ স্বার্থদ্বন্দের উর্ধ্বে থেকে দেশ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্লেটো তাঁর রাষ্ট্রব্যবস্থায় দার্শনিক রাজার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রশাসনে নিযুক্ত ও রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের স্বচ্ছ ও আদর্শ জীবন-যাপনের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন বহুবার।

একথা অনস্বীকার্য যে, প্রচলিত শিক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্র গঠনের দিকেও বিশেষ মনযোগী হতে হবে। দর্শনের জ্ঞানরাজ্যে দ্বিতীয় শিক্ষক হিসেবে পরিচিত প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক আল-ফারাবী মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। আরেক বাঙালি জ্ঞান তাপস মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ^{১১} শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বলেন, শ্রেণিকক্ষের একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্রদের নৈতির চরিত্র গঠন ও তদনুযায়ী নীতিশিক্ষা গ্রহণের উপর জোর দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের মাঝে দেশপ্রেমের উন্মেষ ঘটাতে হবে, সময়ে সময়ে জাতীয় প্রয়োজনে মানব সেবায় নিয়োজিত হবার দীক্ষা দিতে হবে। শিক্ষার লক্ষ্য হলো, শিক্ষার্থীদের জ্ঞানবান, চরিত্রবান ও সৎমানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। কেবল বহুসংখ্যক মানুষকে অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন করলেই তারা কেবল মানুষ হয় বটে, কিন্তু আদর্শ মানুষ বলা যাবে না। কেননা, মানুষের মধ্যে যেমন পাশবিক স্বভাব আছে তেমনি রয়েছে ঐশ্বরিক গুণও। পাশবিক স্বভাবকে দমন করে যদি ঐশ্বরিক গুণ ফুটিয়ে তোলা যায়, তবেই তাকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে অভিহিত করা যায়।

সচরিত্রবান, সুশিক্ষিত, সুনাগরিকগণ সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলে সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ‘কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য সাধন করা’^{১২} ইমানুয়েল কান্টের এই মতকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে সমাজ ও রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকগণ নিজেদেরকে পরিচালিত করতে পারলে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। কর্তব্য কাজে লাভ-ক্ষতির হিসাব না করে বরং, কর্তব্যই বড় এটিকে প্রাধান্য দিতে হবে। কোনো রকমের অন্যায়-অবিচারকে প্রশ্রয় না দিয়ে ব্যক্তিগত লাভ লালসার উর্ধ্বে থাকার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো নীতিশিক্ষা গ্রহণের উপর শিক্ষার্থীদের জোর দিবেন এবং এ ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবেন। প্রায় অবক্ষয়প্রাপ্ত মূল্যবোধগুলোকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গকে আন্তরিক হতে হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের মাঝে এ আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে, যাতে প্রতিটি মানুষ নৈতিক জীবন-যাপন করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়। কর্মে ও চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারে যেন সে সর্বদা সত্যতার পথ অনুসরণ করে। নীতিশিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে মানুষ যেন চরিত্রবান, নির্লোভ ও পরোপকারী হয়ে ওঠে এবং সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত হয়। যুব মনে মূল্যবোধ সৃষ্টি ও তাদের চরিত্র গঠনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের শিক্ষাক্রম তৈরি ও তা বাস্তবায়ন করে শিক্ষার্থীদের মনে নৈতিক চেতনাবোধের জাগরণ ঘটিয়ে সমাজ ও দেশ থেকে অন্যায়-অবিচার দূর করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈতিকতার যথার্থ প্রয়োগ না ঘটালে মানুষ, জাতি এমনকি রাষ্ট্রের কল্যাণ ব্যাহত হবে। তাই বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিকতার যথাযথ প্রয়োগ নীতিবান মানবসম্পদ সৃষ্টির অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ; এর ফলে একদিকে ব্যক্তিগত কল্যাণ, দলগত কল্যাণ সাধিত হবে, অন্যদিকে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী উপকৃত হবে।^{১৩} তাই প্রতিটি মানুষকেই

ন্যূনতম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি পর্যাপ্ত নীতিশিক্ষা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। যে সমাজে এ ত্রিবিধের সম্মিলন বেশি, সে সমাজ তত বেশি উন্নত হবার দাবি রাখে।

১.৬. মানব প্রকৃতিতে নৈতিক শিক্ষার বাস্তবায়ন

মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে তাকে সমাজবদ্ধভাবে সামাজিক বিধি-বিধান মেনে একত্রে বসবাস করতে হয়। ব্যক্তির এ বৈশিষ্ট্যের ফলে, ব্যক্তি তার নিজের খামখেয়ালির পরিবর্তে অন্যের অধিকার ও কর্তব্য কাজের প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল থাকে। এ শ্রদ্ধাবোধের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির নিজের সামাজিক মর্যাদা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি সমাজে নৈতিকতা বাস্তবায়নের পথও সহজতর হয়। এটা সত্য যে, আমরা আমাদের কাজের ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত বিচার করব কল্যাণমুখী দৃষ্টিকোণ থেকে। কল্যাণ চিন্তাকে সামনে রেখে আমরা আমাদের কর্তব্য কাজ করে যাব। কারণ, নীতিবিদ্যায় নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ভিত্তি হলো কল্যাণমুখী কর্তব্যবাদ। এখন প্রশ্ন হলো, কল্যাণমুখী কর্তব্যবাদ সমাজে বাস্তবায়নের উপায় কী? উত্তরে বলা যায়, সমাজে বসবাসকারী মানুষের নানা বৈচিত্র্য যেমন দেহ-মনের বৈচিত্র্য; শিক্ষা-সংস্কৃতির বৈচিত্র্য, কামনা-বাসনার বৈচিত্র্য ভ্রূতি দিক দিয়ে মানব প্রকৃতিকে জোরালো করে তোলে। মানব প্রকৃতির বৈচিত্র্যের এই ভিত্তি থেকে সমাজেও গড়ে ওঠে নানা মাত্রিকতা। উল্লেখ্য, বৈচিত্র্যের এই ধারাবাহিক ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়েই বর্তমান প্রজন্মের নিকট সমাজে যথার্থ ও সময়পোযোগী নৈতিক শিক্ষার ভিত মজবুত করা সম্ভব।^{১৪}

মানুষ কীভাবে কাজ করে, কাজের ভালো-মন্দের মূল্যায়ন কী হবে তা বহুলাংশে নির্ভর করে একজন মানুষের কর্মকাণ্ডের ওপর। একজন মানুষ বেশি কথা বলতে গিয়ে ভুল কথা বলে বেশি, এটি ব্যক্তির মানব প্রকৃতির সাথে যুক্ত; ব্যক্তিটি প্রকৃতিগতভাবে একদ্রোভাট ধরনের এবং তার বুদ্ধির মাত্রা উঁচু স্তরের নয় অথবা ব্যক্তিটি ভুলকে ভালোবাসে। বাস্তবে এমন অনেক মানুষ আছে যারা ভুল পথে চলতে আনন্দ পায়, অন্যকে দুঃখ দিয়ে আনন্দ পায়। আবার এমনও অনেক মানুষ আছে যে সত্য বলে দুঃখকে মেনে নিবে, কিন্তু কখনোই মিথ্যা বলবে না। ভারতীয় চার্বাক দর্শনের আলোচনা ও চর্চা থেকে মনে হয় যে, এমন মানুষ আছে যারা ঋণ করে ঘি খাবার পক্ষে; কিন্তু বাস্তবে এমন মানুষও আছেন যারা অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটালেও খাবার কেনার জন্য ঋণ করবেন না। এ সব বিবিধ বিষয়বস্তু ব্যক্তির জীবনদর্শন ও তার নিজ প্রকৃতির সাথে যুক্ত থাকে। সব মানুষ এবং তার বৈশিষ্ট্য এক রকম নয়। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, মানুষ তার নিজ প্রকৃতি দিয়ে কাজ করে। এখানে মানব প্রকৃতি বলতে মানুষের জীবতাত্ত্বিক দিকের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যা জৈব-দৈহিক প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। তবে, ব্যক্তির এ প্রকৃতিকে নৈতিক শিক্ষা বা আদর্শ শিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন করা সম্ভব।^{১৫} আর এ পরিবর্তনের দ্বারা মানুষের ব্যক্তিত্বকে নৈতিকভাবে শক্ত ভিত্তির উপর গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই সমাজে নৈতিক শিক্ষার বাস্তবায়ন সম্ভব।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে অন্যতম দিক হলো ব্যক্তির পারিবারিক শিক্ষা; এ শিক্ষাই ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে অধিক মানবিক হতে সাহায্য করে। তাছাড়া সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত যেসব দিক ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে, সমাজের সে সব ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণ নৈতিক ও মানবিক শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রেও উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজস্ব অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সঠিক পাঠ্যক্রম প্রণয়নের মাধ্যমে নীতিশিক্ষার সঠিক বাস্তবায়নের পথ সুপ্রশস্ত করতে পারে। মানুষ কী কাজ করে;

কেমন কাজ করে; কাজটি করা উচিত হয়েছে কি-না এসব প্রশ্নের সাথে নীতি-নৈতিকতার বিষয়টি আবশ্যিকভাবে যুক্ত।^{১৬} দৈহিক শক্তি মানুষকে অনেক সময় খ্যাতি অর্জনে প্রেরণা যোগায় বটে, কিন্তু নৈতিক ভিত মজবুত না হলে ব্যক্তির সেই খ্যাতি স্থায়ী হয় না। এককথায়, খ্যাতির চেয়ে অপবাদই বেশি হয়। নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেহ-মনের সম্পর্ককে অস্বীকার করা যায় না। কারণ, ব্যক্তির আচরণের দৈহিক প্রকাশ এবং গঠনের জন্য মানসিক দিককে নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। মানসিক দিকের নিয়ন্ত্রণ এবং গঠন মূলত শিক্ষার মধ্য দিয়েই হয়ে থাকে। নৈতিক শিক্ষার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মনের ভূমিকা থাকবে মূখ্য, অথচ নৈতিক শিক্ষার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে দেহ-মন উভয়েরই জোরালো ভূমিকা থাকবে এবং এটা হবে দেহ-মনের নিম্ন পর্যায়ের গুণগত মান নিয়ে। যে ব্যক্তি জৈব-দৈহিক প্রবৃত্তি দিয়ে চলবে বা যে ব্যক্তির মন সংকীর্ণতার বেড়া জালে আবদ্ধ তারা নৈতিক শিক্ষা গ্রহণে অনেকটাই উদাসীন থাকে। অথচ, আমাদের উচিত নৈতিক শিক্ষাকে গ্রহণ এবং ধারণ করা মন ও মননশীলতায়। এদিক থেকে বলা যায়, পরিবার, সমাজ এবং দেশে নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনি এ শিক্ষা গ্রহণে ব্যক্তির ইতিবাচক মানসিকতার গুরুত্বকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। মানুষ মন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দেহকে সঠিক ভাবে পরিচালনা করতে পারলে একদিকে মানুষের আচরণ যেমন সুন্দর, সঠিক ও ভালো হয়; অন্যদিকে তার কর্মকাণ্ড সমাজ উন্নয়নেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।^{১৭}

মানব প্রকৃতিতে নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নে দার্শনিক প্লেটো দু'টি দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি হলো জীবতাত্ত্বিক দিক এবং অন্যটি হলো মননশীলতার দিক। প্লেটো তার আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থায় সমাজে যে শ্রেণি বিভক্তির কথা বলেছেন, সেখানে ব্যক্তির আত্মার তিনটি দিকের উল্লেখ আছে; সেগুলো হলো-প্রবৃত্তি, বিজ্ঞতা এবং প্রজ্ঞা। মানব প্রকৃতি অনুযায়ী একজন ব্যক্তি শিশুকালে জৈব-দৈহিক প্রবৃত্তি দিয়ে জীবন শুরু করে। এ সময়ে মানব জীবনের ভিত্তিমূলক মৌলিক শিক্ষার শুভ সূচনা হয়, যা শিশুকালে সূচিত না হলে জীবনে আর কখনোই তা আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। নৈতিক শিক্ষাও জীবনের ভিত্তিমূলক একটি মৌলিক শিক্ষা; এটা মৌলিক এ কারণে যে, এই শিক্ষার শূন্যতা জৈবপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন মানুষকে অমানুষে পরিণত করতে পারে। এটা অনস্বীকার্য যে, নৈতিক শিক্ষার সূচনা শিশুকালে শুরু না হলে, পরবর্তী কালে সেটা যে আর কখনোই হয় না যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো কথা বলতে শেখা।^{১৮} শিশুকালে যে কথা বলতে শিখতে পারে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় জীবনের কোনো স্তরেই সে আর কখনোই কথা বলতে পারে না, অর্থাৎ সে হয় বাকপ্রতিবন্ধী। আর একটি দৃষ্টান্ত হলো- শিশুকালে যে হাঁটতে শিখতে পারে না, সে-ও হয় এক ধরনের দৈহিক প্রতিবন্ধী। স্বাভাবিক হাঁটা-চলা করা কখনোই তার পক্ষে আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। যুক্তির ধারাবাহিকতায় এ কথা বলা যায় যে, শিশুকালে যে স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষা পায় না, প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় তার সেই শিক্ষা গ্রহণ আর কখনোই হয়ে ওঠে না। কাজেই আদব-কায়দা, রুচি-সংস্কৃতি, ন্যায়-অন্যায়বোধ, ভালো-মন্দেরবোধ এগুলোও এক ধরনের মৌলিক শিক্ষা যা শিশুকালেই আরম্ভ করতে হয় এবং ধীরে ধীরে বয়স বাড়ার সাথে সাথে তা আরও অধিক পরিপক্ব হয়ে ওঠে। শিশুকালে যাকে চেষ্টা করেও আদব-কায়দা, ন্যায়-অন্যায়, নীতি-নৈতিকতা শেখানো যায় না, প্রকৃতিগতভাবেই সে হয় আদব-কায়দা বর্জিত, নীতিবিমুখ একজন মানুষ; যে পরিবার, সমাজ, জাতি তথা দেশের কোনো উপকারেই আসে না বরং এরা জাতির জন্য হয়ে ওঠে বোঝা।

সমাজের এমন ব্যতিক্রমী কিন্তু স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির কথা না বলে যদি সমাজের সাধারণ বৃহত্তর শ্রেণির কথা বলি, তাহলে বলব যে, তাদের জীবন পরিপূর্ণভাবেই নির্ধারিত হয় সমাজ, সমাজের প্রথা, বিধিমালা, সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি, নৈতিকতা ইত্যাদি দিয়ে। এমন বাস্তবতায় সমাজের সকল সাধারণ মানুষই বাস করে প্রচলিত প্রথা, রীতি-নীতি, নৈতিকতা ইত্যাদি গণ্ডির মধ্যে, যার মধ্যে থেকে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত নৈতিক বিধি-বিধান আয়ত্ত্ব করে। একইভাবে ধর্মীয় গণ্ডি, রাজনৈতিক গণ্ডি, সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক গণ্ডি ইত্যাদির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে মানুষ বসবাস করে এবং সে মূল্যবোধের শিক্ষা নিয়ে থাকে, যা তাকে ন্যায়বান হতে সহায়তা করে।^{১৯} সমাজের প্রতিটি মানুষই এমন গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের অধিকারী; স্বল্পসংখ্যক মানুষ ব্যতিত অধিকাংশ মানুষই বাস করে সংকট ও সমস্যার অন্তহীন পরম্পরার হতাশা নিয়ে। এতদসত্ত্বেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, ব্যক্তির জীবনে নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি একাডেমিক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্বকে খাটো করে দেখা চলে না। তাইতো এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মানব প্রকৃতিতে নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ শিশুকালে শুরু হলেও এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন যৌবনকালে অর্থাৎ একাডেমিক পরিসরেই বেশি প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

১.৭. ব্যক্তিত্ব গঠনের মূল ভিত্তি শিক্ষা: প্রসঙ্গ জন ডিউই

শিক্ষার লক্ষ্যের সাথে মূল্যবোধের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। জন ডিউই বলেন, শিক্ষার লক্ষ্যেরই একটি অংশ হলো মূল্যবোধ। একটি সমাজের সংহতি ও স্থায়িত্ব এবং সমাজস্থ মানুষের উন্নতি, প্রগতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে সমাজের মূল্যবোধ কাঠামোর উপর। এই মূল্যবোধ কী প্রকারের এবং তা ভালো কি মন্দ তা বড় কথা নয়, বরং বড় কথা হলো সেই মূল্যবোধের কাঠামোটি কতটা সুদৃঢ় ও সুসংহত; এক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। যথাযথ শিক্ষা পদ্ধতি ও তা বাস্তবায়নের দ্বারাই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সম্ভব বলে ডিউই মনে করেন। নীতিশিক্ষা বা ধর্ম কেবল মসজিদ, মন্দির, চার্চ, প্যাগোডা কিংবা শুধুমাত্র উপাসনালয়ের বিষয় নয়, এটি আমাদের ব্যবহারিক জীবনেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।^{২০} অর্থাৎ, উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিয়মিত কার্যক্রমের সমন্বিত অংশ হিসেবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়াবলির প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দিলে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক, শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বিত বিকাশ সম্ভব।

মূল্যবোধের সাধারণ ধারণার মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও কিছু কিছু মূল্যবোধ রয়েছে যার আবেদন, প্রয়োজন ও ভূমিকা সকল সমাজে সমানভাবে স্বীকৃত। এগুলোকে শাস্ত্রত মূল্যবোধও বলা হয়। এগুলো শাস্ত্রত এ জন্য যে, মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন-যাপনের মৌলিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াগুলির সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক কার্যাবলি এ মূল্যবোধগুলির উপর নির্ভর করে। সকল সমাজের মানুষই এ সত্যটি উপলব্ধি করছে যে, তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে অধিক সুন্দর ও অর্থবহ করার জন্য নৈতিক মূল্যবোধ অনুযায়ী আচরণ ও কর্ম আবশ্যিক। ব্যক্তির এ মূল্যবোধগুলির মধ্যে অন্যতম হলো— সত্যবাদিতা, সততা, সৌন্দর্যবোধ, কৃতজ্ঞতা, দয়া ইত্যাদি। পৃথিবীর সকল যুগে সকল সমাজে এ মূল্যবোধগুলিকে মানবজীবনের উত্তম অনুসরণীয় নির্ধারক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও, আরও অনেকগুলো মূল্যবোধের উল্লেখ করা যায় যেগুলো শাস্ত্রত মূল্যবোধের মতো স্থায়ী না হলেও উন্নত জীবন যাপনের সাথে তা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: দেশপ্রেম, গণতান্ত্রিক আদর্শ, সমাজচেতনা,

জাতীয়তাবোধ, আন্তর্জাতিকতাবোধ ইত্যাদি যা উন্নত নৈতিক চেতনা গঠনের মাধ্যমে সম্ভব।^{২১} সমাজ অনুমোদিত মূল্যবোধসমূহের অনুশীলন এবং ব্যবহারিক ও কর্মজীবনে সেগুলির যথাযথ প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভর করে একটি সমাজের সামাজিক অগ্রগতি ও উন্নতি। এজন্য, নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের সকল নাগরিকদের মূল্যবোধের শিক্ষা দেবার প্রয়োজনীয়তা সকল মহলেই সমানভাবে স্বীকৃত। উল্লেখ্য, এ শিক্ষা শুরু করা প্রয়োজন প্রাথমিক স্তর থেকেই; কেননা এ স্তরই একজন শিক্ষার্থীর মূল্যবোধ আহরণের এবং গঠনের উপযুক্ত সময়; এ সময়ই শিশুর মন থাকে সাদা কাগজের মতো। আর এই উপযোগী মানসিক সংগঠন বা মনোভাব শিক্ষার্থীর সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব।

তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, মূল্যবোধের শিক্ষাই যে কেবলমাত্র মূল্যবোধের সংকট নিরসনের জন্য একমাত্র উপায় তা-ই নয় বরং একাডেমিক শিক্ষা এবং পারিবারিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও একেবারে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু, তাই বলে এ সংকট নিরসনে শিক্ষার কার্যকর ভূমিকা নেই তা-ও বলা অনুচিত। বর্তমান সমাজে বিদ্যমান মূল্যবোধের সংকট দূর করতে হলে শিক্ষাকে সমাজ বিনির্মাণের হাতিয়ার হিসেবে যুগোপযোগী করতে হবে। মানুষের জীবনের মূল্যবোধগুলি যদি সমাজে বিদ্যমান সমস্যার অনুরূপ হয়, তবে সমাজজীবন ও মূল্যবোধগুলির মধ্যকার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো সম্ভব। এ জন্য উপযুক্ত শিক্ষানীতি প্রণয়নের মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনে গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে, শিক্ষার্থীর মনে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা সম্ভব। অর্থাৎ, শিক্ষায় আবশ্যিকভাবে প্রকৃত ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে।^{২২} এসকল কাজে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি শিক্ষকের ভূমিকাকেও বিবেচনায় নিতে হবে। শিক্ষককে সমাজে বিবেচনা করা হয় সমাজের নৈতিক মানদণ্ড হিসেবে। কাজেই, উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি নৈতিক ও আদর্শিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে মূল্যবোধের ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত করা। বর্তমানে আমাদের জাতীয় জীবনের একটি বড় সংকট হলো অধিকাংশ শিক্ষার্থী তথা যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থায়ী ও অনুসরণযোগ্য আদর্শের বড়ই অভাব। অথচ, জাতীয় জীবনে জাতীয় ঐক্যের সংকটের কারণে জাতীয় আদর্শের এমন কোনো মডেল নেই যাকে শিক্ষার্থীরা অনুসরণ করতে পারে। রাষ্ট্রের এ অবস্থায় শিক্ষার্থীদের বড় প্রয়োজন এমন আদর্শচরিত্র যাকে শিক্ষার্থীরা অনুসরণ করবে, যাদের প্রেরণায় নতুন প্রজন্ম গঠন করবে বাসযোগ্য একটি আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র। যে রাষ্ট্রে সাধারণের কর্মকাণ্ডে, জীবন-জীবিকায় ন্যায়, সততা, ধর্মপরায়ণতা, অহিংসা, দৃঢ়চেতা, সাহস, সেবা করার মনোভাব, মানব কল্যাণ প্রভৃতি সং গুণাবলি শিক্ষার্থীরা তাদের সঠিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও তা শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। এটি শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ শিক্ষার সঠিক বুনয়াদ রচনা করতে পারে।

জন ডিউই বলেন, শিশুকালে নৈতিক শিক্ষার শুরু হবে একজন শিশুর আচরণ এবং ব্যক্তিত্ব গঠনের মধ্য দিয়ে এবং ধীরে ধীরে উচ্চতর শিক্ষার মধ্য দিয়ে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে।^{২৩} আচরণ এবং ব্যক্তিত্বের গঠন যেমন শিশুকাল থেকে শুরু হয়, একইভাবে আচরণের ও ব্যক্তিত্বের মূল্যবোধের দিকটির গঠনও শিশুকাল থেকে শুরু হয়। জন ডিউই-এর শিক্ষা ভাবনা বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের মূল ভিত্তিই হলো শিক্ষা;^{২৪} তবে এ শিক্ষা হতে হবে আধুনিক ও যুগোপযোগী ও নীতিভিত্তিক; যাতে করে শিক্ষার্থীরা তাদের অর্জিত জ্ঞান দেশ মাতৃকার কাজে ব্যবহার করতে পারে। ভালো সমাজ গঠনের জন্য মানুষের মধ্যে

যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার প্রয়োজন হয়, তা নৈতিক শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সম্ভব। শিশুকালে যদি আমরা শিশুদেরকে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারি তাহলে পরবর্তী জীবনে তারা তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সঠিক নীতি ও আদর্শ প্রয়োগ করে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতে পারবে, এভাবে তাদের পুরো জীবনটাই গড়ে উঠবে নৈতিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে। মনোবিজ্ঞানের চিরায়ত সাপেক্ষীকরণ তত্ত্ব বা ক্ল্যাসিক্যাল কন্ডিশনিং তত্ত্ব অনুযায়ী যদি নৈতিকভাবে শিক্ষার্থীদেরকে নীতিশিক্ষা গ্রহণের জন্য কন্ডিশন করে দেয়া যায়, তাহলে সেটাই হবে তাদের দেহ-মনের গঠন এবং ভবিষ্যৎ জীবন পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। নৈতিক সাপেক্ষীকরণ তখন চলবে চিরায়তভাবে। 'রিপাবলিক' গ্রন্থে প্লেটো যে শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলেছেন, সেখানেও এই আদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে। সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশের জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থায় ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রশ্নে মতপার্থক্য ও বিতর্কের অন্তহীন সুযোগ থাকলেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় অন্যায় ও অ-বিবেচনা যেমন ক্রমবর্ধমান, তেমনি প্রত্যেক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও অন্যায় ও অ-বিবেচনা ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর রূপ পরিগ্রহ করছে। কোথাও মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ রাষ্ট্রযন্ত্র চোখে পড়লেও শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে পুরোপুরি নীতিশিক্ষার চর্চা করা হচ্ছে বলে মনে হয় না। তাইতো বলা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে উৎকৃষ্ট জীবনযাত্রার জন্য মানবজাতির নৈতিক চেতনার উন্নতি আজ সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে। সেই সাথে দরকার বিশ্বব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার আইন-কানুন, রীতিনীতি, প্রথা ও পদ্ধতির বিস্তৃত উন্নয়ন। উন্নত আর্থিক জীবনের সাথে চাই উন্নত মানসিক জীবনব্যবস্থা, যা টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। তাই বলা যায়, নৈতিক অনুশীলনে ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টার সাথে সাথে সংগঠিত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টারও প্রয়োজন পড়ে।^{২৫} চিন্তা ও কাজের মধ্য দিয়ে বিকাশমান সুস্থ নৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে ন্যায়স্বার্থ ও হীনস্বার্থের পার্থক্য সম্পর্কে সজাগ করে এবং বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ন্যায়ের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। কেবল নিজের সুখ নয়, বরং সকলকে নিয়েই সুখি হতে হয়, সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হয়- উপযোগবাদীদের এ নীতিও সঠিক এবং তাও আদর্শিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। এটা সত্য যে, সার্বজনীন কল্যাণের মধ্যেই নিহিত থাকে ব্যক্তিগত কল্যাণের যাবতীয় আদর্শ। মানুষের কল্যাণের জন্য আর্থ-সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্তনে সীমাহীন গুরুত্ব দিয়েছেন ফ্রয়েড, এডলার প্রমুখ। এঁরা মানুষের স্বরূপ ও চেতনার উন্মোচন ঘটিয়েছেন। মাহাত্মা গান্ধি মানুষকে মহৎ সব সম্ভাবনার আকাররূপে দেখেছেন। তিনি মনে করেন, অহিংসার দর্শন অবলম্বন করে মানুষ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পৃথিবীকে শান্তির আবাসস্থলে উন্নীত করার সামর্থ্য রাখে। কারণ, মানুষ মনুষ্যত্ব নিয়ে জন্মে না, বরং মনুষ্যত্ব নামক গুণটি সে অর্জন করে। মানুষ ধর্ম কিংবা যুক্তি নিয়ে জন্মে না, জৈবিক সামর্থ্য কিংবা এর অন্তর্গত সম্ভাবনা অবলম্বন করে ধর্ম, আদর্শ এমনকি যুক্তিতর্ক তাকে অর্জন করতে হয়। মানুষকে মানুষ হতে হয় মানবিকীকরণের মধ্য দিয়ে, মনুষ্যত্ব অর্জন করে। এই অর্জনে মানুষের অভ্যন্তরীণ ইচ্ছাশক্তির, চিন্তাশক্তির, শ্রমশক্তির এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। উন্নত জীবন, উন্নত সমাজ, উন্নত রাষ্ট্র ও উন্নত বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে তার ভিত্তিভূমি হিসেবে নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।^{২৬}

১.৮. শিক্ষার নৈতিক ও মানবিক গুরুত্ব

প্রখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন,^{৯৭} শিক্ষার লক্ষ্য হলো ক্রমোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করা; আর উক্ত সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে এমন প্রভাব দূর করা। তাঁর মতে, ব্যক্তির ক্রমোন্নতি ব্যক্তির আত্মপোলন্ধি ও আত্মবিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ লাভের সম্ভাবনা শিক্ষায় থাকা বাঞ্ছনীয়। তাছাড়াও, নৈতিকতাবিহীন শিক্ষা ব্যক্তির সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটাতে ব্যর্থ বলে এ ধরনের শিক্ষা দার্শনিকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। মানুষের পক্ষে আত্মনির্ধারণ, আত্মোপলন্ধি ও আত্মবিকাশ এ তিনটি অনন্য গুণ ব্যতিরেকে একজন মানুষ পরিপূর্ণ শিক্ষিত ও আদর্শ মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। কাজেই, শিক্ষা লাভের মূল প্রেরণা হচ্ছে নীতিবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে আত্মসত্তার বিকাশের পথ উন্মোচন করা। মোতাহের হোসেন চৌধুরী তাঁর ‘শিক্ষার লক্ষ্য’^{৯৮} প্রবন্ধে বলেন, মানুষ স্বভাবত দ্বিজ। অর্থাৎ, শিক্ষা লাভের মধ্য দিয়ে মানুষ দ্বিতীয় বার জন্ম নেয়। এই দ্বিতীয় বার জন্মগ্রহণকারী মানুষ এক স্ব-সৃষ্ট মানুষ; যিনি স্বকীয় ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন ঘটান স্ব-শাসনের মধ্য দিয়ে। কান্টের দৃষ্টিতে, এই মানুষ একইসঙ্গে নিজেই আইনপ্রণেতা ও আইন মান্যকারী। তিনি মনে করেন, এখানেই মানুষের উচ্চতর মর্যাদা নিহিত। কারণ, মানুষ নিজেই নিজেকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করার যোগ্যতা রাখে। এই স্বনিয়ন্ত্রিত মানুষই পারে সামাজিক সকল অনিয়ম, অন্যায়কে ‘না’ বলতে। এজন্যই এ উপমহাদেশের নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কাজ হচ্ছে, না বলতে শেখানো অর্থাৎ ভালো-মন্দের ব্যবধান শেখানো।^{৯৯} রাসেল মনে করেন, রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে মানুষের মনে নাগরিকত্ববোধ জাগ্রত করা।^{১০০} এটি এমন একটি মানসিক অনুভূতি বা চেতনা যা আত্মজাগরণ বা মূল্যবোধের শিক্ষা ছাড়া অর্জন সম্ভব নয়। এ শিক্ষা এক ধরনের সামাজিক সংহতি তথা জাতীয় সংহতি তৈরি করবে যা পরবর্তী আন্তর্জাতিক সংহতিতে রূপান্তরিত হবে। সুতরাং, সমবায়িক চেতনা শিক্ষার অন্যতম মূলমন্ত্র হওয়া উচিত যা শিক্ষার্থীর মনে সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন মানবিকতাবোধ সৃষ্টি করবে।^{১০১} অর্থাৎ, স্বজাত্যবোধ থেকে জাগ্রিত হবে বিশ্ব নাগরিকত্ববোধ যা সার্বজনীন মানবিকতার উদ্বোধন ঘটাবে সর্বত্র।

মানুষের মানবিকতাবোধ বা চেতনা হলো মানুষের ভেতরের এক ধরনের কাক্সিকৃত আচরণ যা আদর্শনিষ্ঠার সাথে সম্পৃক্ত। মানুষ নৈতিক হয়ে জন্ম নেয় না বরং শিক্ষা লাভের মাধ্যমে নৈতিক চেতনাবোধ তার মধ্যে জাগ্রত হয়। কোনটি ‘সঠিক’ তা না জেনে সে কখনোই সঠিক আচরণটি নির্বাচন করতে পারবে না। ‘প্রতিজ্ঞা’ কী তা না বুঝলে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে শিখবে না। তাই, শিক্ষার মধ্যে অনিবার্যভাবে যে দুটি উপলব্ধি আছে তা হলো, প্রথমত— শিক্ষার্থীকে নৈতিক ভাষার সাথে পরিচিত ঘটাতে হবে এবং তাকে নৈতিক ধারণাগুলো আত্মস্থ করা ও নিয়মাবলি শেখানো; এবং দ্বিতীয়ত— শিশু জন্মের পর থেকেই তাকে পর্যাপ্ত নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রের একান্ত কর্তব্য। শিশুর বৌদ্ধিক জীবনের^{১০২} (intellectual life) বিভিন্ন স্তরে নৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে। প্রথমে একটি ন-নৈতিক স্তরে একজন শিশু নৈতিক নিয়মাবলি ও বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে সচেতন থাকে না। অতঃপর ধীরে ধীরে তার বিভিন্ন সামাজিক নিয়ম-কানূনের সাথে পরিচিতি ঘটে এবং তার মনে নৈতিক ধারণা সম্পর্কে সাধারণ আনুগত্য জাগ্রত হয়। কিন্তু এ স্তরেও নিয়মগুলো শিশুর কাছে আগোছালো মনে হয় এবং নিছক না বুঝে-শুনে সে তার প্রতি আনুগত্য পোষণ করে। তৃতীয় স্তরে এটি তার কাছে একটি অলঙ্ঘনীয় নিয়ম হিসেবে গৃহীত হয় যা গোষ্ঠীগত বা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল। সবশেষে, চূড়ান্ত স্তরে শিশু বুঝতে শেখে এ সব নীতিমালা সমাজ জীবনকে সার্থক ও সম্ভব করে তোলে। এভাবে একটি ন-নৈতিক স্তর

থেকে নৈতিক প্রগতির উল্লেখিত ধাপসমূহে উত্তরণের প্রক্রিয়াকে ম্যুর তাঁর নীতিবিদ্যায় বর্হিনিয়ন্ত্রণ থেকে নৈতিক স্বনিয়ন্ত্রণ অর্জনের ধাপ বলে অভিহিত করেছেন।

অপরদিকে পিগেট বলেন, শিশুর এ নৈতিক প্রগতি অনেকাংশে নির্ভর করে পরিণত বোধশক্তি অর্জনের ওপর। কোহেলবার্গের মতে, এ অগ্রগতি সামাজিক অনুমোদন ও প্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষার্থীর পরিচিতি লাভের মধ্য দিয়ে ঘটে থাকে। এখানে লক্ষণীয় যে, প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিটি নীতিশিক্ষার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ অনুমোদনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে; আর দ্বিতীয়টি বাহ্যিক অনুমোদনকেই নীতিজ্ঞান অর্জনের প্রধান বাহন বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাছাড়া অনেক শিক্ষা দার্শনিক মনে করেন যে, এ দু'য়ের সমন্বয়েই নীতিশিক্ষা অর্জিত হয়। তবে নীতিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে যে আত্মোপলব্ধি ও স্বনিয়ন্ত্রিতবোধ জাগ্রত হয় তা অভ্যন্তরীণ ধীশক্তি ও বিবেকের কারণেই হয়ে থাকে। এ কারণে কান্টের নীতিদর্শনে কেবল অভ্যন্তরীণ অনুমোদনেরই স্বীকৃতি আছে। অন্যদিকে, জে. এস. মিল^{১০} বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় অনুমোদনকে স্বীকার করলেও বিবেকের রায়কে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে নীতিশিক্ষার অনুশীলন যেহেতু বৌদ্ধিক অনুশীলনের মতোই এক পরিনতবোধ বা আত্মবিকাশের প্রক্রিয়া, তাই একে একটি অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া বলাই যুক্তিযুক্ত।

শিক্ষা পদ্ধতিতে নৈতিকতার ব্যবহার একদিনে কার্যকর করা সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং তদনুযায়ী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা। শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হবে মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের ও অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক ও কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। শিক্ষার এই উদ্দেশ্য এবং নীতিগত সিদ্ধান্তই হলো শিক্ষা লাভের নৈতিক ভিত্তি। এই নীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পাঠপত্রিকল্পনা গ্রহণ করলে এবং তদানুযায়ী শিক্ষা দিলে শিক্ষার্থীরা নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা গ্রহণ করে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দেশ সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে। অথচ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার ব্যবহারিক এ ভাবনার বাস্তব প্রতিফলন এখনো দৃশ্যমান হয়নি। শিক্ষার নীতিগত দিকের পাশাপাশি এর বৈষয়িক স্বার্থসংশ্লিষ্টতা, দক্ষতা ও যোগ্যতাসহ যুগোপযোগী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও অপরিহার্য। কিন্তু একথা সত্য যে, নৈতিক ভিত্তি ছাড়া কোনো শিক্ষাই মানবিক হতে পারে না। আজ আমাদের দেশে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ চলছে। যার ফলে শিক্ষার ধসসহ সমাজের সর্বস্তরে নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে।^{১১} শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য এ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে হবে, শিক্ষার নৈতিক ভিত্তির উপর জোর দিতে হবে। সমাজের সব স্তরে নীতি-নৈতিকতা ও অবক্ষয় রোধ করতে হলে আমাদের শিক্ষানীতির নৈতিক দিকটির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈতিক জাগরণ (moral awariness) সৃষ্টি করা আজ সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে।^{১২} যার মূল ভূমিকায় থাকবে দেশের উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সহায়ক ভূমিকায় থাকবেন শিক্ষকগণ। শিক্ষক শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষে পাঠদান, উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং শুধুমাত্র ডিগ্রি প্রদান করেই ক্ষান্ত হবেন না, বরং শিক্ষার্থীর অন্তরে নৈতিক চেতনা জাগ্রত করা, তাকে নীতিবোধ ও যুক্তিবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাও শিক্ষকের কাজের আওতাভুক্ত।

১.৯. যুক্তিবোধ ও নীতিবোধসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টিতে নীতিশিক্ষা

শিক্ষার লক্ষ্য আলোকিত মানুষ তৈরি করা। তবে এ শিক্ষায় অবশ্যই শিক্ষার্থীর পর্যাপ্ত নৈতিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকতে হবে। আলোকিত মানুষ বলতে বোঝায় যুক্তিবোধ ও নীতিবোধসম্পন্ন মানুষ, উদার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মুক্ত মনের মানুষ। শিক্ষার উদ্দেশ্য উচ্চতরবৃত্তি তথা বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তিবৃত্তির বিকাশ, জীবনের সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ; যার মাধ্যমে জীবনকে অর্থবহ করে তোলা যায়। এভাবে দর্শন, মানবজীবন এবং শিক্ষা এক ও অভিন্ন সূত্রে গাঁথা। জীবনকে অর্থপূর্ণ করার জন্য নৈতিক বিচার, নৈতিক সিদ্ধান্ত, নৈতিক অনুশীলন ও নৈতিক শিক্ষা অপরিহার্য। উত্তম জীবন ও উত্তম সমাজ গড়ার জন্য প্রয়োজন যথার্থ নৈতিক শিক্ষা অর্থাৎ নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষা। যে শিক্ষা মানবকল্যাণ ও সমাজের সত্য, সুন্দর ও শুভত্বের উদ্বোধন ঘটাবে; যে শিক্ষা অসত্য, অন্যায় ও অশুভ এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শেখাবে এমন শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা যা বাস্তবায়ন করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ।^{১৬} উল্লেখ্য, এ জাতীয় শিক্ষাগ্রহণ এবং শিক্ষাদান ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের একান্ত দায়িত্ব। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় শিক্ষার্থীর মনে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মশুদ্ধি জাহ্নত করা, মানবকল্যাণের স্বপ্ন জাগিয়ে তোলা, অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মন ও সাহসী প্রত্যয় সৃষ্টি করা এবং জগতে যা কিছু মহৎ, কল্যাণকর তার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করা; লোভ-লালসা ও ভয় ভীতির উর্ধ্বে উঠে চারিত্রিক দৃঢ়তা সৃষ্টি করা তাহলে এ সব গুণ শিক্ষকের উন্নত নৈতিক গুণাবলি ও সচ্চরিত্র ছাড়া শিক্ষার্থীর মনে প্রতিষ্ঠা করানো কখনোই সম্ভব নয়।

একথা সর্বজনগ্রাহ্য সত্য যে, যুক্তিবোধ ও নীতিবোধসম্পন্ন সমাজ গঠনের জন্য নীতিচর্চার প্রয়োজন তথা নীতিশিক্ষার প্রয়োজন। সমাজ গঠিত হয় বহু মানুষের সমন্বয়ে; আর এ সব ব্যক্তিকে একসূত্রে বাঁধতে পারলে সমাজ টিকে থাকে। নানা মানুষের নানারকম প্রবণতা; ন্যায়-নীতির তোয়াক্কা না করে যার যা ইচ্ছা সে মোতাবেক চলতে দিলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সম্ভাবনাই অধিক। সামাজিক শৃঙ্খলাবিধানের জন্যে তাই রীতি-নীতি আবশ্যিক। রাষ্ট্র গঠনের জন্যেও রীতি-নীতি দরকার। কারণ, রাষ্ট্রের মূল ভিত্তিতে থাকা প্রয়োজন নৈতিকতার শক্ত অবস্থান। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের নাগরিক একজন অন্য জনের কাছে দায়বদ্ধ। নৈতিক শিক্ষা মানুষকে নৈতিক সচেতনতা ও ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করে তার কার্যক্রমের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত, ভালো-মন্দ ইত্যাদি বিষয়ের পার্থক্য করতে শেখায় এবং ব্যক্তির জীবনধারাকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে সহায়তা করে। দর্শনের আদিকাল থেকে এ বিষয়ে আলোচনা পর্যালোচনা চলে আসছে এবং সফ্রেটিস এটি করেছিলেন— ন্যায়বিচার কাকে বলে, এই চিন্তা থেকে। পরবর্তী সময়ে ন্যায়বিচারের চিন্তা থেকে প্লেটো রচনা করেছিলেন তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণা; যদিও ক্ষেত্র বিশেষ প্লেটোর সে তত্ত্ব সমালোচিতও হয়েছে। একইভাবে, এরিস্টটল বলেছিলেন বন্ধুত্বের কথা, আর বন্ধুত্ব হলো সদৃশ বা ভালোর ধারণা।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুক্তিবোধসম্পন্ন মানুষ নীতিবোধকে সমর্থন করে; কারণ যুক্তিবিদ্যা পাঠ করে আমরা জানতে পারি কোনটি বৈধ যুক্তি এবং কোনটি অবৈধ যুক্তি; ঠিক তেমনি নীতিশিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে একজন মানুষ জানতে পারে কোনটি ভালো এবং কোনটি মন্দ; কোনটি শুভ এবং কোনটি অশুভ; কোনটি ন্যায় এবং কোনটি অন্যায় ইত্যাদি। মানুষ যখন নীতিবিদ্যক বই, পুস্তক অধ্যয়ন করে তখন কিছুটা হলেও তার অন্তরে সৎ চিন্তা, সৎ আদর্শ, সৎ কর্ম জাহ্নত হয়। ফলে, সে

যেকোনো ধরনের মন্দ বা অন্যায় কাজ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। একথা অনস্বীকার্য যে, আমাদের শিক্ষানীতির প্রতিটি স্তরে যদি পর্যাপ্ত নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা থাকে এবং তদনুযায়ী যদি শিক্ষা দেয়া যায় তাহলে ব্যক্তির ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডসহ তার আচরণের উপর কিছুটা হলেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত নৈতিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে যখন কোনো ব্যক্তি কর্মজীবনে পদার্পণ করবে তখন সে সংকর্ম তথা সু-শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াই সংগত।^{৩৭} এভাবে, আমাদের সমাজে প্রবাহিত হতে পারে শান্তির সুবাতাস এবং মানুষ মহত্তম সব মূল্যবোধের বিকাশ ঘটিয়ে সমাজকে আলোকিত করতে পারে।

যেকোনো শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে যদি শিক্ষার্থীর মনে দেশের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত ও জাতীয় মূল্যবোধের সৃষ্টি না হয় তবে সে শিক্ষা দেশের কোনো কাজে আসবে না। শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ ও সাধারণ সততাবোধ সৃষ্টি করতে হবে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা নিজেরা দল, সমিতি ও ক্লাব গঠন করে এগুলো পরিচালনার জন্য তারা যেন স্ব স্ব দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ পায় এবং তারা নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের সুযোগ পায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার্থীর কর্তব্যবোধ, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদার উপর বেশি জোর দিতে হবে এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেখানে সততা ও দায়িত্বজ্ঞানের প্রয়োজন পড়ে। এভাবে, শিক্ষিতজনেরা পুরো সমাজব্যবস্থাকে একটি নৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে পারেন; সমাজ কাঠামোকে পরিবর্তন করে নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে পারেন। শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন সামাজিক আচার-আচরণ, প্রথা, রীতি-নীতি ইত্যাদির সঞ্চালন ঘটিয়ে সমাজকে কলুষমুক্ত করতে পারেন। এক্ষেত্রে নীতিশিক্ষাই পারে সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখতে। চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াসের শিক্ষাতত্ত্বের মূল কথা হলো, শিক্ষা নানাগুণে গুণাবিত উন্নত চরিত্রের ‘ভদ্রলোক’ তৈরি করবে, ‘যে’ হীনতা জয় করে সত্য অনুসন্ধানে নিয়োজিত থাকবে। তাত্ত্বিক বিতর্কের পরিবেশ থেকে দার্শনিকগণ বের হয়ে তাত্ত্বিক দিককে বাদ দিয়ে দর্শনের ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক দিকের ওপর অধিক গুরুত্ব দিবেন। এভাবে, ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক দিক থেকে নীতিশিক্ষা ও নীতিদর্শনের বাস্তবায়ন বর্তমান বিশ্বে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। নৈতিক শিক্ষার লক্ষ্য কল্যাণমুখী কর্তব্যবাদ। এ মতে সুখের চেয়ে কল্যাণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুখের মধ্য দিয়ে কল্যাণ হতে পারে; আবার ব্যক্তি সুখ না থাকলেও কেবল দুঃখ মোচনের মধ্য দিয়েও কল্যাণ হতে পারে। আমরা আমাদের কাজের ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত বিচার করব কল্যাণমুখী দৃষ্টিকোণ থেকে। কল্যাণ চিন্তাকে সামনে রেখে আমরা কর্তব্য করে যাব। তাই নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ কল্যাণমুখী কর্তব্যবাদ সম্পন্ন করে যুক্তিবোধ ও নীতিবোধসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখে চলছে।

১.১০. নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপসমূহ

নৈতিক কর্মকাণ্ড যখন সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হয়, তখন তা সামাজিক নীতিমালায় পরিণত হয়। কিন্তু, সব সামাজিক নীতিমালা নৈতিক নিয়মকে অনুসরণ করে না। যেমন- যে সমাজ সতীদাহ প্রথাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, সে সমাজ নৈতিক অনুশাসন বা বিবেকের রায় মেনে চলেনি। অন্যদিকে, এক্ষিমো সমাজে বৃদ্ধদের হাত-পাঁ বেঁধে পানিতে ফেলে হত্যার যে প্রথা চালু আছে তা নৈতিক নিয়মের অনুগামী নয়। কারণ, এসব কর্মকাণ্ডে মানব মনের স্বতঃমূল্যকে উপেক্ষা করা হয়েছে, যা নৈতিকতার অপরিহার্য মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃত। সম্পূর্ণ নৈতিক ও মানবিক চেতনায় উজ্জীবিত

হয়েই রাজা রামমোহন রায় এরকম সামাজিক কু-প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। এটাই ‘না’ বলতে পারার নৈতিক শক্তি যা অভ্যন্তরিন প্রেরণা বা বিবেক থেকে জাগরিত। এই প্রেরণা থেকে বান্টার্ড রাসেল রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কাজেই, প্রকৃত নৈতিক শিক্ষা তাই যা মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানবিক করে তোলে। নীতিবিদ্যায় প্রথমত কোনো কাজের যৌক্তিকতার ধারণা দেয়া হয়, যাতে ব্যক্তি উপলব্ধি করতে শেখে কেন এটি ‘কর্তব্য কাজ’। এ শিক্ষার মাধ্যমে, শিক্ষার্থীরা নৈতিক কর্তব্যটি সহজে গ্রহণ করার পক্ষে যথার্থ যৌক্তিক ভিত্তি খুঁজে পায়। কাজেই, একজন শিক্ষার্থীকে নীতিশিক্ষা দেবার সময় তিনটি ধাপ অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।^{৩৮} যথা-

প্রথমত- তাকে অবশ্যই নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে সে ঠিকিত্য ও অনৌচিত্য, ভালো-মন্দ কাজের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখে;

দ্বিতীয়ত- শিক্ষার্থীকে কাজের যৌক্তিকতা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে যাতে সে বুঝতে সক্ষম হয় কেনো এবং কোন বিশেষ আচরণটি তাকে আয়ত্ত্ব করতে হবে; এবং

তৃতীয়ত- তাকে সাধারণ কাজ ও নৈতিক কাজের মধ্যে পার্থক্য শেখাতে হবে, যাতে সে শান্তির ভয়ে নয় বরং নৈতিক চেতনায় উজ্জীবিত হয়েই যথার্থ নৈতিক কাজটি করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

উল্লেখ্য, নীতিবিদ্যার মূল তাৎপর্য তৃতীয় ধাপের মধ্যেই নিহিত। এজন্যই এরিস্টটল বলেন,^{৩৯} মানুষ আইনের ভয়ে যা করে, দর্শন আমাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা পালন করতে শিখিয়েছে। এখন প্রশ্ন: এ স্বতঃস্ফূর্ত নৈতিক জ্ঞান ব্যক্তি কীভাবে অর্জন করবে? অনেক শিক্ষা দার্শনিক দাবি করেন যে, ধর্ম ও নৈতিকতা উভয়ই কোনো না কোনোভাবে শিক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত। তাঁদের দাবি হলো, ধর্ম শিক্ষার সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক রয়েছে; কারণ, ধর্মীয় বিধিবদ্ধ রীতি-নীতি ছাড়া নৈতিকতা অর্জন অসম্ভব। এখানে ধর্ম ও নৈতিকতাকে এমনভাবে সম্পর্কিত করা হয় যে, কেউ যদি সত্যিকার ধার্মিক হয়, তবেই সে নৈতিক হতে পারবে। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিককালে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি কেউই গ্রহণ করে না। তবে, একথা অনস্বীকার্য যে, ধর্মতত্ত্ব ও নৈতিকতা উভয়ই সত্য, সুন্দর, বাস্তবতা ও মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনা করে। অর্থনীতি ও রাজনীতির বিভিন্ন তত্ত্বের মতো ধর্ম ও নৈতিকতার বিভিন্ন তত্ত্বও শিক্ষাগ্রহণ ও তা অনুশীলনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষায় নৈতিকতার এ প্রায়োগিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে এটিকে বেছে নিয়েছি। কেউ কেউ ধর্মকে বৃহত্তর মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, কেউ আবার অতি-প্রাকৃত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধর্মকে গ্রহণ করে। সবার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য একই- যা কিছু সত্য, সুন্দর এবং কল্যাণকর তা গ্রহণ করার মানসিকতা নিজের মধ্যে আয়ত্ত্ব করা এবং অন্যকে তা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

১.১১. উপসংহার

নৈতিক শিক্ষার বাস্তবায়ন যেহেতু আচরণ এবং ব্যক্তিত্ব গঠনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়, তাই শিশুকালে এটি শুরু করতে হবে প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে এবং বয়োঃসঙ্গিকগোলে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি থাকবে নৈতিক শিক্ষা অর্জন করার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে, শিক্ষার প্রতিটি স্তরে পর্যাপ্ত নৈতিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রাখতে হবে। নৈতিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর মন ও মননশীলতার পরিপূর্ণতা ঘটে। তাছাড়া, ব্যক্তির দৈহিক আচরণের গঠন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার মানসিক বিকাশ ঘটে।^{৪০} মানব প্রকৃতির জীবতাত্ত্বিক ও মানবিক (যা মননশীলতার ও মনুষ্যত্ববোধের প্রকাশ) দিক

নৈতিকভাবে বেড়ে ওঠে। এ স্তরে শৃঙ্খলা, সংযম, শিষ্টাচার, অধ্যবসায় ও সততা প্রাধান্য পায়। যারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী নয় কিংবা অর্থ সংকটের কারণে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না তাদেরকে কীভাবে নীতিমান মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা যায় তা-ও সংশ্লিষ্ট মহলের বিবেচনায় রাখতে হবে। একবিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তি নির্ভর এ যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে মানুষ নতুন নতুন মানবিক ও নৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছে। শিথিল হয়ে যাচ্ছে পারিবারিক তথা সামাজিক বন্ধন, সেই সাথে হারিয়ে যাচ্ছে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি। নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ নিরপেক্ষ প্রচলিত শিক্ষা এই সংকট থেকে উত্তরণের কোনো যথার্থ পন্থা হতে পারে না। আগামী দিনের পৃথিবী বৈষয়িক উন্নতির উঁচু শিখরে পৌঁছাতে পারলেও নৈতিক, মানবিক ও মূল্যবোধের শিক্ষা ছাড়া মানব সভ্যতাকে বিদ্যমান সংকটের হাত থেকে রক্ষা করার কোনো বিকল্প পথ খোলা নেই। যে শিক্ষা মানুষকে মুক্তভাবে চিন্তা করতে শেখায় না, মুক্তচিন্তার প্রেরণা দেয় না, সে শিক্ষা মানবিক বিকাশে কোনো কাজে আসে না, যা প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্য বার্ত্তাও রাসেল বলেন, আমাদের উচিত মানবতা অর্জনের জন্য জ্ঞান, আবেগ ও ক্ষমতাকে যতদূর সম্ভব সম্প্রসারিত করা। নৈতিক শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে মানুষ মানবীয় গুণাবলি আয়ত্ত করে মানবিক আচরণ করতে শেখে। এভাবে মানুষ মানবকল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করলে সমাজ ও দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধানে যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক আন্দোলন (Logical and intellectual movement) এর মাধ্যমে শোষণহীন সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সহজতর হয়।

তথ্যনির্দেশ

1. Henry Sidgwick, *Outline of the History of Ethics* (London: Macmillan Co. & Ltd., 1954), পৃ. ১০৫-১১১
2. হাসনা বেগম (অনূদিত), *নীতিবিদ্যার মূলনীতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫), পৃ. ১২-১৯
3. আল্লাদাশংকর রায়, *আধুনিকতা* (কলকাতা: ডি.এম. লাইব্রেরি, ১৯৫৩), পৃ. ৬৯
4. আমিনুল ইসলাম, *নীতিবিজ্ঞান ও মানবজীবন* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০২), পৃ. ৬৩-৬৪; ১১১-১১৯
5. এ.এস.এম. আবদুল খালেক, *প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা* (ঢাকা: অনন্যা প্রকাশন, ২০০৩), পৃ. ৩-১১
6. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯-২৭
7. হাসনা বেগম (অনূদিত), *নীতিবিদ্যার মূলনীতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮-২৭
8. হারুন রশীদ, “শিক্ষাদর্শন ও প্রাইভেটাইজেশন”, *শিক্ষা সম্মেলন স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২২৩-২২৭
9. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৫
10. সরদার ফজলুল করিম (অনূদিত), *প্রেটোর সংলাপ* [সক্রেটিসের বিচার এবং মৃত্যুর কাহিনী সংবলিত], ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৮, পৃ. ৯৫-৯৯
11. আরশাদ আজিজ (সম্পাদিত), *শিক্ষা ও সমাজ কাঠামো*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯-২১
12. সাইয়েদ আবদুল হাই (অনূদিত), *নীতিকথার দার্শনিকতত্ত্ব ও মূলনীতি*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮২) পৃ. ২৯-৩৬

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩-১৩
১৪. আয়েশা সুলতানা, “বাংলাদেশে নারী সমাজ ও নৈতিক সংকট,” স্মারক সংকলন, বাংলাদেশ দর্শন সমিতির পত্রিকা, প্রথম খন্ড, বাংলাদেশ দর্শন সমিতি, ঢাকা: ১৯৮৫, পৃ. ১৭-২৯
১৫. S.N. Dasgupta, *Obscure Religions Cults*, (Calcutta: Firma K.L.M. Ltd. 1946), পৃ. ১৭-২৯
১৬. Ibid, পৃ. ৯-১৭
১৭. Philippa Foot (ed.), *Theories of Ethics*, (London: Oxford University Press, 1968), পৃ. ১৯-২১
১৮. মমতাজুর রহমান তরফদার, *বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ ও সম্ভাবনা*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃ. ১৯-২৭।
১৯. টম. বটোমোর (অনুবাদক-হিমাচল চক্রবর্তী), *সমাজবিদ্যা, তত্ত্ব ও সমস্যার রূপরেখা*, (ঢাকা: সাফা পাবলিকেশন্স, ২০০১), পৃ. ৯৯-১০৭।
২০. সত্যনারায়ন দাশ, *বঙ্গদর্শন ও বাঙালির মনন সাধনা*, (কলিকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৭৪), পৃ. ১৯-২৩
২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯
২২. রবীন্দ্র রচনাবলী, *লক্ষ্য ও শিক্ষা*, (কলিকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৯৮), পৃ. ৭০০-৭০৭
২৩. John Dewey, *Philosophy of Education*, (New York: Pappya, 1984), পৃ. ৩৩-৩৪
২৪. শেখ আবদুল ওয়াহাব, *কান্টের নীতিদর্শন*, (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৮২), পৃ. ১১১-১১৯
২৫. আবুল কাশেম ফজলুল হক, *জাতীয় শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কিছু জরুরী বিবেচ্য*, গণতান্ত্রিক ছাত্র কেন্দ্র, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৯
২৬. John S. Brubachr, *Modern Philosophy of Education*, (New York: MacGraw Hill Book Company), 1950, পৃ. ২২১-২২৯
২৭. দ্রষ্টব্য, B. Russell, *An Outline of Philosophy*, (London: Allen and Unwine Ltd. 1961), পৃ. ২০১-২১৯
২৮. মোতাহের হোসেন চৌধুরী, *শিক্ষার লক্ষ্য: নির্বাচিত প্রবন্ধ*, ঢাকা, পৃ. ১৩-২৯
২৯. Amartya Sen, *The Idea of Justice*, (U.K.: Belknap Publishers Company, 2009), পৃ. ৪৩-৪৯; ৬৯-৭৯
৩০. B. Russell, *An Outline of Philosophy*, op.cit; পৃ. ৬৩-৭২
৩১. Ibid, পৃ. ২৬-৩৩
৩২. Williams, *Morality: An Introduction to Ethics*, (New York: Allen Books, 1972), পৃ. ৭-১৬
৩৩. J.S. Mill, *Utilitarianism*, London, 1863, পৃ. ১৩-১৯
৩৪. J.O Urmson, *The Emotive Theory of Ethics*, London, 1968, পৃ. ১৯-২২
৩৫. Colderwood, *A Handbook of Moral Philosophy*, London, 1953, পৃ. ২০৩-২০৬
৩৬. F.H. Bradley, *Ethical Studies*, Oxford, 1962, পৃ. ১৬০-১৭৬
৩৭. প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, *নীতিবিজ্ঞান*, (কলকাতা: ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ১৯৮০), পৃ. ১১১-১১৯

৩৮. খালেদুজ্জামান, শিক্ষানীতি ও শিক্ষা সংকট প্রসঙ্গে, শিক্ষা সম্মেলন স্মারক গ্রন্থ, সমাজচিন্তা ছাত্র ফ্রন্ট, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৪৭-৪৮
৩৯. সরদার ফজলুল করিম, দর্শন কোষ, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৩), পৃ. ১১১-১১৭
৪০. এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, খন্ড-৭, ১১, পৃ. ১৯; ২৭

জমা প্রদানের তারিখ : ১০.১০.২০২২

গ্রহীত হবার তারিখ : ১৩.০৮.২০২৩

পূর্ববঙ্গীয় ইতিহাস (১৯৪৭-৭১) লিখনে মার্কসীয় দর্শনের ভূমিকা: একটি বিশ্লেষণ

খান মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম*

Abstract

The purpose of this article is to analyze how Marxist philosophy can play a role in writing the history of East Bengal (1947-1971). In the discussion period, the emergence of the bourgeois class in East Bengal, has been investigated by explaining with Marx's class struggle and conflicting materialist philosophy. I have come to the conclusion that the emergence of independent Bangladesh was not based on the theory of discrimination, but due to the emergence of the bourgeois class in the above period.

চাবিশব্দ: পূর্ববঙ্গ, মার্কসীয় দর্শন, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, শ্রেণি সংগ্রাম, বুর্জোয়া শ্রেণি

১

বাংলায় মুসলমান জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ, এটা জানা গেল ১৮৭২-এর জনশুমারিতে^১। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ১৯০৫ সালে যখন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন পূর্ববঙ্গীয়^২ মুসলিম জনগোষ্ঠী এটাতে ব্যাপক সমর্থন যুগিয়েছিল। কিন্তু বাংলার হিন্দু ভদ্রলোক^৩ শ্রেণি এটার তীব্র বিরোধিতা করেছিল। মূলতঃ হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণির বিরোধিতার কারণেই ১৯১১ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়। মজার ব্যাপার হলো, যে ভদ্রলোক শ্রেণি ১৯০৫ সালের ভঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিল তারাই দ্বিতীয়বার ১৯৪৭ সালের বাংলা ভাগকে সমর্থন করেছিল। বাংলা থেকেই মুসলমান জনগোষ্ঠী চল্লিশের দশকের পাকিস্তান আন্দোলনে সবচেয়ে সোচ্চার ভূমিকা নিয়েছিল। কেন বাংলার মুসলমানরা ব্যাপকভাবে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন এ বিষয়ে ক্লাসিক গবেষণা করেছেন— তাজুল ইসলাম হাশমি।^৪ পাকিস্তান আন্দোলনের উন্মাদনা এতটাই প্রভাব বিস্তারকারী হয়েছিল যে, বাংলার মুসলমানরা হয়ে যান ‘মুসলমান বাঙালি’। কিন্তু ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে ‘মুসলমান বাঙালি’ ধীরে ধীরে ‘বাঙালি মুসলমান’ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। ১৯৪৭-৭১ কালপর্বে পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম মানসে ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদ’-এর উত্থান হলো, যার মাধ্যমে ‘বাংলাদেশের’ অভ্যুদয় হলো। বর্তমান প্রবন্ধে ১৯৪৭-৭১ কালপর্বে একটি নতুন জাতির আত্মপ্রকাশ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মার্কসীয় বীক্ষা কিভাবে অনুসন্ধানে ভূমিকা রাখতে পারে; সেটির সম্ভাব্য ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হবে।

প্রবন্ধটিতে প্রথমে মার্কসের সামাজিক কাঠামোর পরম্পরা শ্রেণি সংগ্রাম, উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কের ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করতে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনের সামগ্রিক পরম্পরা আলোচনা করা হবে। মার্কসের ভারত সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত

* সহযোগী অধ্যাপক (ইতিহাস), সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

করে পরিশেষে ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে কেন ও কিভাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হল, মার্কসীয় ধীক্ষার সাহায্যে তার একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দাড়া করানো হবে।

২

মার্কস ছিলেন আধুনিক পুঁজিবাদের বিশ্লেষক। তাঁর অনুসন্ধানের মূল বিষয় ইউরোপে পুঁজিবাদের উদ্ভব, তাঁর কাঠামো আর গতিবিধি। মার্কস ও এঙ্গেলস পুঁজিবাদ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শ্রেণি সংগ্রামকে অন্যতম অনুসঙ্গ হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে বলেছেন— আজ পর্যন্ত বিদ্যমান সকল সমাজের ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। ... অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত শ্রেণী অবিরাম পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে থেকে, অব্যাহত লড়াই চালিয়েছে কখনও আড়ালে, কখনও প্রকাশ্যে।^৭ মার্কস সিদ্ধান্তে আসছেন— সামন্ত সমাজের অবসানের পরও শ্রেণীবিরোধ লোপ পায়নি বরং নতুন শ্রেণী, অত্যাচারের নতুন ব্যবস্থা-নতুন রূপে ফিরে আসছে গোটা সমাজে দু'টি শ্রেণীতে—বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত-এ ভাগ হয়ে যাচ্ছে। মধ্যযুগের ভূমিদাসের ভিতর থেকে প্রথম শহরগুলির স্বাধীন নাগরিকদের উদ্ভব হয়। এই নাগরিকদের মধ্য থেকে আবার বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রথম উপাদানগুলি বিকশিত হয়।^৮ প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন এবং বিনিময় পদ্ধতি ধারাবাহিকতাতেই বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।^৯ উৎপাদন প্রণালী ও বিনিময় ব্যবস্থার প্রশ্ন উঠলে স্বাভাবিকভাবে সামাজিক কাঠামো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে। বিভাজিত শ্রেণীগুলোর শ্রেণী সংগ্রামই সামাজিক কাঠামোটি ঠিক করে দেয়। সামাজিক কাঠামোটির ক্রম পরস্পরাটি এরকম— আদিম সাম্যবাদ—দাসতন্ত্র—সামন্তপ্রথা—পুঁজিবাদ—সমাজতন্ত্র।^{১০} এখন প্রশ্ন হলো— অনুক্রমটি কি সার্বজনীন? সম্ভবত না। ডিডি কোসাম্বী ও রামশরণ শার্মার যুক্তিতে, দ্বিতীয় অনুক্রম ‘দাসতন্ত্র’র অস্তিত্ব ভারতে ছিল না। হাজার খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগ বা অনুরূপ কাল থেকে উপনিবেশিক শক্তির আগমন ও বিজয় পর্যন্ত নানারূপে সামন্ততন্ত্রই অধিষ্ঠিত ছিল।^{১১} কারণ, সামন্তযুগের শেষদিকে বড় বণিক লগ্নিকারী বা একচেটিয়া ব্যবসার মালিকরা নতুন ভারতীয় বুর্জোয়াতে রূপান্তরিত হননি। যে সামন্ততান্ত্রিক প্রাদেশিক শাসকদের ছায়ায় তারা তাদের লাভজনক ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল ইংরেজরা সেই শাসকদের উচ্ছেদ করে নিজেরা শাসক হওয়ার সংগে সঙ্গেই তাদেরও উপড়ে দিয়েছিল। ভারতে যারা প্রথমদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সমানে সমান কারবার করে মুনাফা করেছিল, তাদের তখন ষোলকলা হয়ে গেছে, এরপর অনেকে আপেক্ষিকভাবে গুরুত্বহীন জমিদারে রূপান্তরিত হতে হল। ফলে, ভারতীয় প্রাক-পুঁজিবাদী মূলধন নিজের থেকে সরাসরি যন্ত্রসভ্যতার দিকে যেতে পারেনি, ফলে অগ্রগামী সর্বহারা শ্রেণিরও বিকাশ ঘটেনি।— যেমনটা ঘটেছিল ইংল্যান্ডে। যন্ত্রপাতি; কৃৎকৌশলে এবং প্রথম কৃৎকৌশলীদেরও ইংল্যান্ড থেকে আনতে হয়েছিল।^{১২}

সুতরাং ভারতের ক্ষেত্রে সামাজিক কাঠামোর পরস্পরাটি খাপ খাচ্ছে না কারণ, সামন্ত প্রথা থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণ পর্বে ভারতে পুঁজির বিকাশ ইউরোপীয় পদ্ধতিতে হচ্ছে না। পুঁজির বিকাশের ক্ষেত্রে ইউরোপ যে সুবিধাগুলো-বাণিজ্য, লুণ্ঠন, ক্রীতদাস ব্যবসা, বৈজ্ঞানিক বিপ্লব-সবই জরুরি। এগুলোর অভাবে ভারত তার সামাজিক কাঠামোর মধ্যে সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ধারণ করলেও পুঁজিবাদে উত্তরণ ঘটাতে ব্যর্থ হয় মূলত ঔপনিবেশিক পুঁজির কারণে। এই ঔপনিবেশিক পুঁজির ক্ষেত্রে রেল ব্যবস্থা বাদ দিলে ভারতে ব্রিটিশ পুঁজির বেশির ভাগই আমদানি হয়নি। ভারতস্থিত

ইংরেজদের আনুষ্ঠানিক বেতন ও ব্যবসায়িক কাজকর্ম থেকেই এই পুঁজির উৎপন্ন হয়েছিল। পরবর্তীকালে ভারত থেকে বৃটেনে এর স্থানান্তর পুঁজির নির্গমন।^{১১}

আমরা জানি আধুনিক পুঁজিবাদ বুঝতে মার্কস ভারত সম্পর্কে বিস্তৃত নোটস নিয়েছিলেন। মার্কসের অনুসন্ধিৎসায় ছিল— ভারতীয় সমাজের ঐতিহাসিক প্রগতির সম্ভাবনা কি? কোন পথে অগ্রগতি সম্ভব? এই অনুসন্ধান কর্ম তিনি ১৮৫০ এর দশকে শুরু করেন সেটি ১৮৮১-৮২ অবধি চলেছিল। চিন্তা কিন্তু এক জায়গায় থেমে থাকেনি, বরং যতই খোঁজ খবর করেছেন, ততই প্রাচ্য সমাজের বিবর্তনের স্বকীয় রূপগুলি সম্পর্কেও তাঁর ধারণা, বিশেষ করে ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক অনুপ্রবেশের ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে তাঁর মতামতও ‘মৌলিকভাবে পাল্টে’ গেছে।^{১২} প্রথম দিকে মার্কসের ধারণা ছিল প্রাচ্য সমাজ তথা ভারতের ঐতিহাসিক বিবর্তন হাজার হাজার বছর ধরে অপরিবর্তনীয়, অনড় ও স্থানুতে অবস্থান করছে। ঔপনিবেশিক শাসন ভারতে পরিবর্তনের বিপ্লবের বার্তা নিয়ে আসছে। পরবর্তীতে মার্কস যতই পড়াশুনা করছেন ততই কিন্তু তার ঔপনিবেশিক শাসনের বৈপ্লবিক ভূমিকার কথা মুছে যাচ্ছে তাঁর চিন্তা থেকে। তিনি উপলব্ধি করছেন—ব্রিটিশ শাসন ভারতের সমাজ কাঠামোকে ভেঙ্গে তছনছ করে দিচ্ছে, কিন্তু পরিবর্তে কোনোও বৈপ্লবিক গতিশীলতার সৃষ্টি হচ্ছেনা। আধুনিক ইউরোপের পুঁজিবাদী রীতিনীতি, আইনকানুন ধ্যান-ধারণা সেখানে চাপিয়ে দিলেও দেশজ সমাজ কাঠামোও সংমিশ্রণে উদ্ভট চেহারা নিচ্ছে। ফলে ঔপনিবেশিক শোষণের চাপ বৃদ্ধি পেলেও পরিবর্তে ভারতে অগ্রসর সমাজ কাঠামো গড়ে উঠছে না।^{১৩}

আমরা পূর্বে যেমনটি আলোচনা করলাম, মার্কসবাদ ক্ল্যাসিক সামাজিক কাঠামোটি, যেটি ইউরোপীয় সামাজিক কাঠামোকে প্রতিনিধিত্ব করে, ঠিক ভারতের ক্ষেত্রে খাপ খায় না। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের যে বিস্তার ঘটেছিল, সেটির সুবিধা ও প্রভাব সরাসরি ভারতবর্ষে প্রতিফলিত হয়নি। কারণ, ঔপনিবেশিক পুঁজির ‘নির্গমন’ হয়েছিল। তাহলে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হলো ১৯৪৭ পরবর্তী পূর্ববঙ্গীয় ইতিহাস লিখন কি মার্কসীয় পদ্ধতিতে সম্ভব? এটা ঠিক যে, যেমনটি আমরা আলোচনা করলাম, ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্র ও সেটা থেকে পুঁজিবাদ উত্তরণ পর্বটি ঠিক ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যায় না। সেটি মার্কস ও দেরিতে হলেও উপলব্ধি করেছেন। উত্তরণ পর্বটি ঘিরে ইউরোপীয় ও ভারতীয় সমাজ কাঠামোর মৌলিক প্রভেদ থাকলেও বিশ্লেষণ পদ্ধতি হিসেবে ‘মার্কসীয় পদ্ধতি’ নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ সীমিত। এ সম্পর্কে সমাধান বাতলেছেন—ডিডি কোসাম্বি (২০০২)। ইতিহাস পুনর্নির্মাণে ‘উৎপাদন পদ্ধতি’ও ‘উৎপাদন সম্পর্ক’—এ ক্রমবিকাশের কালানুক্রমিক বিবরণীর উপস্থাপনের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।^{১৪} উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কে ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করতে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন খুবই প্রাসঙ্গিক। কার্ল মার্কস তাঁর Critic of Political Economy (1859)-এর মুখবন্ধে এক অসাধারণ বক্তব্য বিবৃত করেছেন—

মানুষ তার অস্তিত্বের প্রয়োজনে সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইচ্ছা-নিরপেক্ষ, সুনির্দিষ্ট এক আবশ্যিক সম্পর্কের জগতে প্রবেশ করে—যাকে বলা হয় উৎপাদন সম্পর্ক এবং তা আবার বস্তুগত উৎপাদনী শক্তির কোন নির্দিষ্ট স্তরের বিকাশের সঙ্গেও সম্বন্ধিত। এই উৎপাদন-সম্পর্কগুলির সমষ্টিই-সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি করে—যা আইন ও রাষ্ট্রনৈতিক উপরিসৌধের মূল ভিত্তি এবং সামাজিক-চেতনার যেকোনো রূপের সঙ্গে নিবিড় যোগসূত্র গ্রথিত। মানুষের সামাজিক,

রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় তার বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত নিমিত্তগুলির উৎপাদন পদ্ধতির দ্বারা। মানুষের চেতনা তার অস্তিত্বের নির্ধারক নয়, বরং বিপরীতে, সামাজিক অস্তিত্বই তার চেতনাকে নির্ধারণ করে। সমাজের বৈষয়িক উৎপাদনী শক্তিগুলি বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে এসে পৌঁছলে বিদ্যমান উৎপাদন সম্পর্কসমূহ বা সেগুলির অইনি অভিব্যক্তি অর্থাৎ সম্পত্তি-সম্পর্কসমূহ, যার মধ্যে এতদিন তারা কাটিয়েছে, সেগুলির সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। উৎপাদনী শক্তির বিকশিত রূপ যখন উৎপাদন-সম্পর্কগুলিকে শৃঙ্খলে পরিণত করে তখনই সূচিত হয় সামাজিক বিপ্লবের এক নবযুগ। অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিবর্তনের সাথে সাথে সমগ্র উপরিসৌধেও কমবেশি রূপান্তর ঘটে। এই ধরনের বিপ্লবে সম্যক অনুধাবনের জন্য যে পৃথকীকরণটা সবসময়ই প্রয়োজন, তা হল— উৎপাদনের অর্থনৈতিক শর্তগুলির বস্তুগত আমূল পরিবর্তন— যা বিজ্ঞানসম্মত নির্ভুলতায় নিরূপণ করা যায়; এবং আইনগত, রাজনৈতিক, ধর্মীয়নন্দনতাত্ত্বিক, দার্শনিক— বা এককথায় ভাবাদর্শগত রূপ, যার মধ্য দিয়ে মানুষ দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে ও দ্বন্দের বিলোপ ঘটাতে চায়। উৎপাদনী শক্তিগুলির যেখানে যথেষ্ট পরিমাণে বিকশিত হবার সুযোগ আছে তেমন কোন সমাজ ব্যবস্থা কখনই হঠাৎ বিলুপ্ত হতে পারে না এবং নতুন উন্নত উৎপাদন সম্পর্কগুলিও কখনও বাস্তবায়িত হতে পারে না যতক্ষণ না তাদের রূপ পরিগ্রহের বস্তুগত শর্তগুলি পুরনো সমাজের গর্ভে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাই মানুষ চিরকাল সেই সমস্যাসমূহেরই সমাধান করতে এগোয়— যা তারা পারে; আরো তলিয়ে দেখলে, সর্বক্ষেত্রেই সমস্যাসমূহ তখনই জেগে ওঠে যখন সেগুলি সমাধানের বস্তুগত শর্তগুলি ইতিমধ্যেই অস্তিত্ব পেয়েছে অথবা নিদেনপক্ষে অস্তিত্ব পেতে চলেছে। একটি বৃহত্তর রূপরেখায় এশীয়, প্রাচীন, সামন্ততান্ত্রিক এবং আধুনিক বুর্জোয়া উৎপাদন রীতিগুলিকে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রগতি অভিমুখীন এক একটি যুগারম্ভ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

মার্কসের উপরিউক্ত বক্তব্যের সার্বজনীন ব্যাঞ্জনা রয়েছে। এটিকে পূর্ববঙ্গীয় ইতিহাস লিখনে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ইতিহাসবিদদের স্বাভাবিক সতর্কতা জরুরি। শ্রেণি দ্বন্দের প্রতি স্থির দৃষ্টি রেখেই ইরফান হাবিব দুটি মৌলিক দ্বন্দের সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করেছেন—

প্রথমত: কায়িক ও মানসিক শ্রম এর দ্বন্দ্ব: আমলা কর্মকর্তা, বুদ্ধিজীবী ইত্যাদি শ্রেণির উচ্চতর বেতন ও কর্তৃত্ব অনিবার্যভাবে একটি দ্বন্দের জন্ম দেয়, যেহেতু দীর্ঘকাল ধরে উচ্চতর উৎপাদনের স্বার্থে সমাজতন্ত্রে এই শ্রেণীগুলিকে বহাল রাখতে হয়।

দ্বিতীয়ত: গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্ব: কৃষির ওপর শিল্পের প্রাধান্যরূপে সমাজতান্ত্রিক দেশে এ দ্বন্দ্ব দেখা যায়। সামাজিক আদিম সঞ্চয়ের তত্ত্বটি কাগজে কলমে নিষিদ্ধ হলেও শিল্পায়নে উৎসাহ দেয়ার জন্য প্রায়শই এটি কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।^{১৫} ইরফান হাবিব যে দ্বন্দের কথা উপস্থাপন করেছেন; সেটি অবশ্যই সার্বজনীন নয়। এটি তিনি সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভেতরকার দ্বন্দ্ব হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাহলেও 'শ্রেণি দ্বন্দ্ব'— অবশ্যই সার্বজনীন; এটির ব্যাপারে দ্বিমত পোষণকারীর অভাবে হবে, সেটা মোটামুটি নিশ্চিত। তবে সমাজতান্ত্রিক সমাজের বাইরে, বিশেষত, যেখানে পুঁজিবাদের বিকাশের ব্যাপারেই আমরা নিশ্চিত নই, সেখানে মার্কসীয় দর্শনে ইতিহাস লিখন নিঃসন্দেহে সরল নয়। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিককে নতুন একটি পথরেখা গড়ে পিটে নিতে হবে।

৩

১৯৪৭-৭১ কালপর্বে পূর্ববঙ্গীয় ইতিহাস পাঠে গভীর মনোযোগ ও সতর্কতা জরুরি। ঐ পূর্ববঙ্গীয় জনগণ ঔপনিবেসিক শক্তির বিরুদ্ধে চল্লিশের দশকে ‘পাকিস্তান আন্দোলন’ করেছিল। এরাই আবার বিশেষ করে ৬০,র দশকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের উত্থানকে প্রায়শই ব্যাখ্যা করা হয়-দুই পাকিস্তানের মধ্যে ‘বৈষম্যতত্ত্ব’ দিয়ে।^{১৬} এই বৈষম্যতত্ত্ব দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে ব্যাখ্যা করাটা সম্ভবত খুবই অগভীর। পাকিস্তান সরকারের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৬৫-১৯৭০) বৈষম্য কমে আসছিল। আর পাকিস্তান অর্থনৈতিক পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭০-৭৫) দেখা যায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ হচ্ছে ৬০% আর পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ৪০%। টাকার অঙ্কে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ২৯,৪০০ মিলিয়ন আর পশ্চিম পাকিস্তানের পণ্য বরাদ্দ ১৯৬০০ মিলিয়ন।^{১৭} তাছাড়া, যে কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ‘উন্নয়ন’ সমভাবে হয় না। উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় নীতি ছাড়াও অবকাঠামোসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিক বিষয়াদির উপস্থিতি অত্যাাবশ্যক, উদাহরণ হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ‘উন্নয়ন বা উন্নয়ন বাজেটের’ তারতম্য বিরাজমান সত্ত্বেও ‘বৈষম্যতত্ত্ব’ দিয়ে কেউ স্বাধীন হয়ে যায়নি। তাই ‘বৈষম্যতত্ত্ব’ পূর্ববঙ্গীয় জনগণের উত্থানের পুরো গল্পটির প্রতিনিধিত্ব করে না। এর জন্য একটু গভীরে অনুসন্ধান চালানো সমীচীন হবে।

প্রথমেই দৃষ্টি দেয়া যাক ১৯৪৭ পূর্ববর্তী সময়ে ঔপনিবেশ বিরোধী পাকিস্তান আন্দোলন পর্বে। পূর্ববঙ্গ পাকিস্তান আন্দোলন বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে আদর্শের চেয়ে অনেক বেশি অর্থ-সামাজিক উপাদান দ্বারা সঞ্চারিত ছিল। জমিদারের প্রভাব এসব জেলায় সমান ছিল না। ছোট জমিদার বা জোতদার প্রভাবিত জেলা ছিল রংপুর ও দিনাজপুর। আবার মুসলিম মধ্যবিত্ত কৃষকদের প্রভাব ছিল নোয়াখালী কুমিল্লায়। নোয়াখালী এবং কুমিল্লায় ভারতীয় কংগ্রেসের সমর্থন বেশি ছিল তার কৃষক প্রজা পাটি মুসলিম লিগে যোগ দিলে নোয়াখালী ও কুমিল্লায় মুসলিম লিগের জনসমর্থন বেড়ে যায়।^{১৮}সাধারণ মুসলমান জনগণের জন্য বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন এবং জমিদারী ও মহাজনি প্রথার বিলোপের দাবীর বিরুদ্ধে বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকদের বিরোধিতাই দেশভাগের পথরেখা তৈরি করেছিল। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে স্বরণে রাখা দরকার, মুসলিম লিগ ও কৃষক প্রজা পাটি জমিদারি প্রথা বিলোপে বেশি সোচ্চার ছিল।^{১৯}

এপ্রসঙ্গে আর আলোচনা না বাড়িয়ে মোদ্দা কথায় বলা যায়-পূর্ব বাংলার মুসলিম কৃষকরা দলে দলে পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। এই জন্য যে, ‘পাকিস্তান’ অর্জন তাদের হিন্দু ‘জমিদার’ ও ‘মহাজন’ শ্রেণি থেকে মুক্তি দেবে।^{২০} কিন্তু ‘পাকিস্তান’ অর্জনের পর দেখা গেল হিন্দু জমিদার, ভদ্রলোক ও মহাজনদের মূলে মুসলিম কৃষকদের নেতৃত্বদানকারী আশরাফ, উলামা ও জোতদার শ্রেণিটি সেই স্থান দখল করেছে।^{২১}

এবার, পূর্ববঙ্গীয় জনগণের ‘পাকিস্তান’ হাসিলের সময়কালীন সময়ে দৃষ্টি দেয়া যাক- পূর্ব ও পশ্চিম নামে যে ‘পাকিস্তান’ রাষ্ট্রের পথ চলা আরম্ভ হলো, সেটা কোনোভাবেই ভারসাম্যপূর্ণ ছিলনা। পশ্চিম পাকিস্তান বেশি সম্পদশালি ছিল, কারণগুলো হলো-প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে ছিল এক্ষেত্রে। পশ্চিম পাকিস্তান আয়তনের দিক দিয়ে বৃহত্তম-৩১০,০০০ বর্গমাইল পূর্ব পাকিস্তানের আয়তন ৫৫০০০ বর্গ মাইল। আবার জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক দিয়ে পূর্ব

পাকিস্তানে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬% লোকের বসবাস। প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান অনেক বেশি সম্পদশালী। ব্রিটিশদের তৈরি করা আধুনিক সেচ ব্যবস্থা ছিল পাকিস্তানে। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষাকৃত বেশি উন্নত ছিল-নগরায়ন ও শিল্পায়নের ক্ষেত্রে। এছাড়াও বড় ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, শিল্পপতি, ভূস্বামী, ধনী কৃষক এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক আমলা, ১৮৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় এবং এক ডজন ভালো মানের কলেজ যা ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি তৈরি হয়েছিল।^{১২২} ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে আইসিএস অফিসার ছিল ৯৫ জন আর পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ০১ জন।^{১২৩} করাচিতে ছিল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ও সমুদ্রবন্দর, পূর্ব পাকিস্তানে বিমানবন্দর ও সমুদ্রবন্দর ছিল না।^{১২৪} ১৯৪৭-৫০ কালপর্বে প্রায় সব হিন্দু পেশাজীবী, শিক্ষক, অভিজাত হিন্দুরা ভারতে চলে যায়। পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতে যাওয়া হিন্দুদের মধ্যে মাত্র ৪% ছিল কৃষক, ৩৮% ছিল ব্যবসায়ী ও শিল্পোপতি, ১২% চিকিৎসক, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষিত পেশাজীবী।^{১২৫} দেশভাগের পরিণতিতে হিন্দু পেশাজীবী, ব্যবসায়ী প্রভৃতির দেশত্যাগের ফলে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণ করে পূর্ব পাকিস্তানের অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতা সম্পন্ন মুসলমান প্রশাসক, শিক্ষক ও পেশাজীবীদের দিয়ে। অনেক মুসলমান কলেজ শিক্ষক একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন। আবার, পূর্ব পাকিস্তানের শূন্যতা পূরণে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অপেক্ষাকৃত গোছালো ও দক্ষ পেশাজীবীর এগিয়ে এলেন। উপরিউক্ত আলোচনায় আমরা দেখলাম, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ঐতিহাসিক, প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট ভারসাম্যহীনতায় ভারতে হিন্দু পেশাজীবীদের দেশত্যাগে সৃষ্ট শূন্যস্থান পশ্চিম পাকিস্তানী বুর্জোয়া ও অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ পেশাজীবী বুর্জোয়া শ্রেণিটি সেই জায়গা নিচ্ছে। এবার আমরা অভিবাসি মুসলমানদের দিকে দৃষ্টি দেই। অভিবাসী মুসলিমদের মধ্যে-উত্তর ভারতের উর্দুভাষী শিক্ষিত ব্যবসায়ী শ্রেণিটি পশ্চিম পাকিস্তানে যায়, আর পূর্ব পাকিস্তানে আসে কম শিক্ষিত দরিদ্র মুসলিমরা, যারা মূলত বিহার ও পশ্চিম বাংলা থেকে আগত।^{১২৬} পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দুভাষী মোহাজের মুসলিমরা পুঁজি বিনিয়োগ করল।^{১২৭} এই পুঁজির সাথে পরবর্তী কালে মেট্রোপলিটন পুঁজির সংযোগ ঘটে। পশ্চিম পাকিস্তানে বুর্জোয়াদের হাত ধরে প্রাথমিকভাবে এভাবে পুঁজির বিকাশ হয়।

১৯৪৭ সালে যে ‘পূর্ববঙ্গীয় সমাজটি’ পূর্ব পাকিস্তান হলো সেটি বিভাগপর্বে বাংলায় ছিল প্রধানত শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহকারী কৃষিপণ্য উৎপাদনকারী অঞ্চল। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উজ্জল উদাহরণ ‘পাট’। পূর্ব বঙ্গে পৃথিবীর ৮০% পাট উৎপাদিত হলেও এ অঞ্চলে কোনো পাটকল ছিল না। পাটকলগুলো ছিল কলকাতা ও তৎসন্নিহিত এলাকায়। দেশভাগের ফলে পূর্ব বঙ্গীয় পাটের তাৎক্ষণিক গন্তব্যস্থল হয় পশ্চিম পাকিস্তানে, কারণ পূর্ববঙ্গে পাটকল স্থাপিত হয় ১৯৫০ সালে নারায়ণগঞ্জে।^{১২৮}

এবার ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে সংস্কৃতির জগতে পরিবর্তনকারী ঘটনার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দেই। স্বাধীনতার পরপরই ১৯৪৮ এ ভাষার প্রশ্নে জিন্নাহর বক্তব্যে তাৎক্ষণিক ও প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ করেছিল ছাত্র-ছাত্রীরা। এই ছাত্র-ছাত্রী কারা? এরা তারাই ঔপনিবেশিক আমলে হিন্দুদের থেকে চাকুরী, ব্যবসা বা অন্যান্য পেশায় প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার ভয়ে থাকত। ১৯৪৭ পরবর্তী সময়েও ভাষার প্রশ্নে অন্যভাষার (উর্দু) আধিপত্যে পিছিয়ে পড়ার শঙ্কাতেই সেই শ্রেণিটি প্রতিবাদ করল। এই শ্রেণিটিই ঔপনিবেশিক আমলে ‘পাকিস্তানের’ স্বপ্ন দেখেছিল মূলত হিন্দু জমিদার, ভদ্রলোক ও মহাজনদের থেকে মুক্তির। ভাষার প্রশ্নটি সামনে আসতে গোটা চল্লিশের দশকে, পাকিস্তানআন্দোলনের জোয়ার ভাসতে থাকা পূর্ববঙ্গের ‘মুসলমান বাঙালি’র পরিচয় বাঙালি

মুসলমান পরিচয়নকালের সূচনা বিন্দু সৃষ্টি করল। বদরউদ্দিন উমর সেটাকে বলছেন-বাঙালি মুসলমানদের ‘ঘরে ফেরা’।^{১৯} ‘মুসলিম বাঙালি’র এই ‘বাঙালি মুসলমান’ হওয়া দীর্ঘ মেয়াদে গোটা পূর্ববঙ্গকে প্রভাবিত করেছিল। এই দশকের মাঝামাঝি সময়ে সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের সঙ্গে সংখ্যাগুরু ভাষাভাষীদের ‘শ্রেণি সংঘাতে’ই ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদে’র উত্থান। ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে ‘ভাষা প্রশ্নে’ বাঙালি মুসলমানের সরব প্রতিবাদ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পরিণতি লাভ করে। উদীয়মান শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির শ্রেণি চেতনার সেই শুরু। এরপর ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নিকট মুসলিম লিগের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ‘মুসলিম’ রাজনীতির ‘শেষের শুরু’ বলা যেতে পারে।

স্বাধীনতার প্রথম দশকে পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ‘ভার্নাকুলার এলিটের’ উত্থান। বাঙালি মুসলমানদের আধুনিক যুগে প্রবেশের ঘটনাটি ঘটে একটু দেরিতে। স্বাধীনতার পূর্বে বাঙালি মুসলমানদের যারা নেতৃত্ব দিত, তারা ছিল মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক অবাঙালি (ননভার্নাকুলার)। কিন্তু স্বাধীনতার পর প্রথম দশকেই ভার্নাকুলার এলিটরা ভাষাকে ভিত্তি করে রাজনৈতিক দল ও প্লাটফর্ম গঠন করে। ১৯৫৪ এর নির্বাচনে জয়ের মাধ্যমে ভার্নাকুলার এলিটরা পুরাতন অবাঙালি অভিজাত শ্রেণিকে ক্ষমতার রাজনীতিতে হারিয়ে দেন।^{২০} আওয়ামী লিগ ‘আওয়ামী মুসলিম লিগ’ থেকে ‘মুসলিম’ বাদ দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সূচনা করে ১৯৫৬ সালে। এর মাধ্যমে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের সেকুলার রাজনীতির সূচনা হয়।

স্বাধীনতার প্রথম দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উত্থান ছাড়াও আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো-বাঙালি ও অবাঙালি দ্বন্দ্ব। আমরা পূর্বে আলোচনায় দেখিয়েছিলাম, হিন্দু ভদ্রলোক, জমিদার ও মহাজন শ্রেণির দেশত্যাগের ফলে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণ করে অবাঙালি পশ্চিম পাকিস্তানি ও ভারতীয় অভিবাসি মুসলিমরা। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাঙালি মুসলমান শ্রেণি এটাকে দেখল বৈষম্য হিসেবে। তারা দেখল নবসৃষ্ট কলকারখানার মালিকানায় অবাঙালি, এই অবাঙালি শিল্পমালিকরা অবাঙালি শ্রমিকদের কারখানায় চাকুরি দিচ্ছে। এতে বঞ্চিতের ক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। ‘বাঙালি ও ‘অবাঙালি’ যথাক্রমে ‘আমরা ও ‘তারা’ হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই বাঙালি ও অবাঙালি দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত পরিণতিতে পঞ্চাশের দশকে মাঝামাঝি সময়ে আদমজি পাটকল বাঙালি ও অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গায় কয়েকশত শ্রমিক নিহত হয়। পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তান শাসনের ‘শেষের শুরু’ তখনই।^{২১}

এবার আসা যাক, ষাটের দশকে। এটা স্বীকৃত যে, পূর্ব বাংলার জন্য স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম দশক ছিল ‘স্থবিরতার পর্ব’।^{২২} ষাটের দশকে এই স্থবিরতায় গতিশীলতার সৃষ্টি হয়। ১৯৫৯-৬৫ কালপর্বে মাথাপিছু আয় বেড়ে হয় ২.৬%। এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে ১৫৪৮ মাইল রাস্তা তৈরি হয়, ১৯২৯ জন নতুন ডাক্তার যেমন তৈরি হয় তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রে ১১৫৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরি হয়। হাইস্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে ৪১৯০০১, ৮১১০৩ এবং ৫০৬৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়।^{২৩} যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে পূর্ববঙ্গীয় কৃষকরা তাদের পণ্য সামগ্রী পরিবহণে অভূতপূর্ব সুবিধা পায়। এর প্রত্যক্ষ ফল হলো- কৃষকের হাতে নগদ টাকার প্রবাহ। এই কৃষকের সন্তানরাই ষাটের দশকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভিড় করছে। ফলে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির হার বেড়ে যাওয়া এই শিক্ষার্থীরাই সেই শ্রেণির জন্য দিল, যে শ্রেণি হলো ‘শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি’।

এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভূমিকা রেখেছিল।

৪

এই প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে আমরা পূর্ববঙ্গীয় জনগণের ‘বাংলাদেশ’ হাসিলের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা নিয়ে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছি মাত্র। এই ব্যাখ্যা উপস্থাপনে প্রথমেই আমরা ‘বৈষম্যতত্ত্ব’কে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছি; সম্ভাব্য ব্যাখ্যার মাধ্যমে পূর্ববঙ্গের কোন শ্রেণিটি ‘পাকিস্তান’ রাষ্ট্রের শ্রেণি কাঠামোর মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল? শ্রেণি কাঠামোর কোন দ্বন্দ্বগুলো রাষ্ট্রকে পরিচালিত করেছিল; সে এই প্রশ্নগুলো তুলতেই হবে। কারণ, প্রামাণ্য নথিগুলো একমাত্র সঠিকভাবে প্রশ্ন করলে তবেই সাড়া দেয়।^{১০} সামাজিক কাঠামোর পরম্পরা, শ্রেণিসংগ্রাম, উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কে ক্রমাগত প্রশ্ন উত্থাপন করতেই হবে। মার্কসই বলেছেন— আমাদের সমকালীনদের নিশ্চিতভাবেই একটি কাজই করা উচিত, সেটা হলো— বিদ্যমান সবকিছুর আপোষহীন সমালোচনা। এক্ষেত্রে ইএইচ কারের বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ— ঐতিহাসিকের কাজই হলো শুধু কী হয়েছিল, আর কেন হয়েছিল তার ব্যাখ্যা দিয়ে যাওয়া।^{১১} বুর্জোয়া শ্রেণির অনুপস্থিতিতে ঔপনিবেশিক শক্তির অবসানের পরও ১৯৪৭ পূর্ববঙ্গীয় জনগণের মুক্তি মেলেনি। অপেক্ষাকৃত গোছালো ও দক্ষ বুর্জোয়া শ্রেণি থাকায় পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের ওপর আধিপত্য করেছে এবং প্রথমে প্রান্তস্থ পুঁজি পরে মেট্রোপলিটন পুঁজি উৎপাদন ও উৎপাদন সম্পর্কে নির্ধারণ করেছে। পুঁজির প্রবাহেই পূর্ব পাকিস্তানেও বুর্জোয়া শ্রেণির উত্থান ঘটে গোটা ৬০-র দশক জুড়ে। ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে মৃদুতালে, ৫০র দশকে অনেকটা নীরবে, আবার ৬০-র দশকে পূর্ববঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণির সরব উত্থানই ‘বাংলাদেশ’ এর অভ্যুদয়ে ভূমিকা রেখেছিল। উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কের ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতাই পূর্ববঙ্গীয় ইতিহাস লিখন সম্পূর্ণ ও যৌক্তিক হতে পারে। আর পর্যালোচনার তাত্ত্বিক ভিত্তিটা হবে মার্কসবাদী।

টীকা ও তথ্যসূত্র

- ১ Akbar Ali Khan, *Discovery of Bangladesh* (Dhaka: The University Press Limited-2009), P. 84.
- ২ ১৯৪৭ সালে বাংলা ভাগ হয়ে পূর্ব বঙ্গ ‘পাকিস্তানে’ পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে ১৯৫৬ সাল থেকে পরিচিতি পায়। এই পূর্ব বঙ্গ, পূর্ব পাকিস্তানই ১৯৭১ সালের ‘বাংলাদেশ’।
- ৩ ভদ্রলোক কারা? ...তারা ছিল খাজনা আদায়কারী শ্রেণির প্রতিকল্প; জমির পতনি স্বত্ব দেওয়া অধিকার ভোগকারী। ভদ্রলোক শ্রেণির মধ্যে অবশ্য অনেক পার্থক্য ছিল, ভূমির পরিমাণ, আকার, উর্বরতার পার্থক্য এবং উর্ধ্বতনদের কাছ থেকে পাওয়া শর্তাধীন জমির অভিন্ন শর্তে অধস্তনদের কাছে লিজ দেওয়া ও মধ্যবর্তী স্বত্ব ভাগাভাগির সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এই পার্থক্য সৃষ্টি হয়। ... তারা জমিতে কাজ করত না; জমি থেকে প্রাপ্ত খাজনা দিয়েই তারা তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করত। ভদ্রলোক হলো দেশের অনুভূতিহীন মাটির সন্তানদের ঠিক বিপরীত, কায়িক পরিশ্রম থেকে বিরত থাকাকে এই ‘বাবু’ শ্রেণির লোকেরা নিজেদের ও সমাজের নিম্নশ্রেণির লোকদের মধ্যে একটা সামাজিক দূরত্বের জন্য অপরিহার্য উপাদান বলে বিবেচনা করত। ... মনোজ্ঞ আলোচনার জন্য দেখুন— জয়া চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হলো* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ২০০২), পৃ. ৩-১২।

- ৪ দেখুন, Tajul Islam Hasmi, *Peasant Utopia The Communalization of Class Politics In East Bengal, 1920-1947*, 1994)
- ৫ মার্কস ও এঙ্গেলস, *কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার* (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট, লিমিটেড-২০১৮), পৃ. ২৭।
- ৬ মার্কস ও এঙ্গেলস, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮।
- ৭ মার্কস ও এঙ্গেলস, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯।
- ৮ আব্দুল হালিম, *নতুন দৃষ্টিতে ইতিহাস* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৫), পৃ. ৩৮।
- ৯ ইরফান হাবিব, *ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে* (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০০২), পৃ. ৫।
- ১০ দামোদর ধরমানন্দ কোসাম্বি, *ভারতবর্ষের ইতিহাসের চর্চার ভূমিকা* (কলকাতা: কেপি বাগচি এন্ড কোম্পানি, ২০০২), পৃ. ৩৩৯-৩৪০।
- ১১ ইরফান হাবিব, *ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে*, পৃ. :৯।
- ১২ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *ইতিহাসের উত্তরাধিকার* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৬), পৃ. ১০১।
- ১৩ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২।
- ১৪ ডিডি কোসাম্বি, *ভারতবর্ষের ইতিহাসের চর্চার ভূমিকা*, পৃ. ১-১৪।
- ১৫ ইরফান হাবিব, *ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে*, পৃ. ১১।
- ১৬ দেখুন, Rounaq Jahan, *Pakistan; Failure in national Integration* (Dhaka: University press limited, 1994).
- ১৭ G.W. Choudhury, *The Last Days of United Pakistan* (Dhaka: University Press, 1994), pp. 62-63.
- ১৮ Taj Hashmi, *Fifty years of Bangladesh 1971-2021 Crises of Culture, Development, Governance and Identity*, (Palgrave macmillan, 2022), p. 49.
- ১৯ দেখুন, Taj Hashmi, *Fifty years of Bangladesh 1971-2021 Crises of Culture, Development, Governance and Identity*, p. 50.
- ২০ Tajul Islam Hashmi, *Peasant Utopia; Communalization of class politics in East Bengal, 1920-47*, pp. 248-256.
- ২১ দেখুন, Taj Hashmi, *Fifty years of Bangladesh 1971-2021 Crises of Culture, Development, Governance and Identity*, p. 50.
- ২২ দেখুন, Taj Hashmi, *Ibid*, p. 50.
- ২৩ Taj Hashmi, *Ibid*, p. 66.
- ২৪ Taj Hashmi, *Ibid*, p. 53.
- ২৫ Sirajul Islam (Ed.), 1997, *History of Bangladesh Vol. 1*, (Dhaka: Asiatic society of Bangladesh, 1997), p. 116.
- ২৬ পশ্চিম বাংলা থেকে আগত মুসলিম অভিবাসিরা খুলনা, সাতক্ষীরা ও যশোরে রিফুইজি মুসলিম হিসেবে হিসেবে স্থানীয়ভাবে পরিচিত।

- ২৭ Rounaq Jahan, *Pakistan; Failure in national Integration*, pp. 31-32.
- ২৮ Taj Hashmi, *Fifty years of Bangladesh 1971-2021 Crises of Culture, Development, Governance and Identity*, p. 53.
- ২৯ বদরউদ্দীন উমর, *সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়িকতা* (ঢাকা: গ্রহনা, ১৯৬৯), পৃ. ৮-১১।
- ৩০ Rounaq Jahan, *Pakistan; Failure in national Integration*, pp. 38-39.
- ৩১ Taj Hashmi, *Fifty years of Bangladesh 1971-2021 Crises of Culture, Development, Governance and Identity*, p. 63.
- ৩২ Rounaq Jahan, *Pakistan; Failure in national Integration*, p. 30.
- ৩৩ Rounaq Jahan, *Ibid*, PP. 81-82.
- ৩৪ Marc Bloch, *The Historian's Craft*, (Manchester University Press, 1965), p.64.
- ৩৫ ই.এইচ কার, *কাকে বলে ইতিহাস* (কলকাতা: কেপি বাগচি এন্ড কোম্পানী, ২০০৬), পৃ. ৮১।

চিহ্নগীতিতে রাগসংগীতের ব্যবহার ও এর প্রতিফলন

জেরীনা আহমেদ*

Abstract

Classical Music has not attained the requisite fame in comparison to the level of support and attention that the film music industry has gotten. In all branches of music or in any type of music, the reflection of classical music, directly or indirectly, is perceptible. Classical music is not as easily imprinted in people's mind as film music is. As a result, emphasizing on classical music inside film music will assist to educate people about this area as the title suggests, this comprehensive discussion will be centred on this issue. Further more, it is conspicuous that classical music is required to produce the captivating film sound track. In general, we are aware that classical music is referred to as "Raag Sangeet". The uses of raag in film music will be covered in this journal. Many popular and uphonic songs which appear mesmerising to the general audience have become deeply rooted in people's minds since early ages; and the cause for this is yet to be revealed. Usually songs which have a reflection of raag in them (songs) turn out to be everlasting.

চাবিশব্দ: রাগসংগীত, চলচ্চিত্রসংগীত, সুরকার, অবদান, প্রতিফলন

ভূমিকা

চলচ্চিত্রসংগীত বা সিনেমাসংগীত যতটা সমাদৃত ও সর্বজনবিদিত হয়েছে সংগীত জগতে, প্রকৃতপক্ষে অন্য ধারার সকল সংগীতের ব্যাপকতা তুলনামূলকভাবে মৃদু পরিসরে দৃষ্টিগোচর হয়, বিশেষভাবে শাস্ত্রীয়সংগীত। যদিও ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস অনুধাবন করলে খুব সহজেই বোধগম্য হয় যে, প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে শাস্ত্রীয়সংগীতের অনুশীলন হয়ে আসছে। কিন্তু এর যথাযথ প্রচার-প্রসার যখন অজ্ঞতার কারণে প্রশ্নবিদ্ধ হয়, তখনই এর প্রায়োগিক জটিলতা পরিলক্ষিত হয়। অপর পক্ষে, লঘুসংগীত ও সিনেমাসংগীত সর্ব-সাধারণকে যতটা আকৃষ্ট করতে সক্ষম, শাস্ত্রীয়সংগীত এক্ষেত্রে ততটাই অপারগ, যদিও সিনেমায় যেকোনো সংগীতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে রাগ বা রাগ-সংগতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অতএব, এই নিবন্ধের আলোকে শাস্ত্রীয় সংগীতকে পরিচিত করার লক্ষ্যে সিনেমাসংগীতে রাগের ব্যবহারের সমীক্ষণিক আলোচনা করার প্রয়াস করা হবে। কারণ, একথা অনস্বীকার্য যে শিল্প যতটা সহজে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তার প্রচার বিজ্ঞজন কর্তৃক সুগম হওয়া সমীচীন। সুতরাং সিনেমা বা যেকোনো সংগীতই শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রভাবমুক্ত হতে পারে না। এই সহজসত্য উক্তিটির যথার্থতা প্রমাণের পাশাপাশি শাস্ত্রীয়সংগীত শুধুমাত্র সংগীত বোদ্ধাদের কাছেই নয়, বরং সর্বসাধারণের কাছেও সহজবোধ্য, আকর্ষণীয় ও লোকপ্রিয় করে তোলাই এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য। পক্ষান্তরে, এও প্রতীয়মান হবে যে, সুকুমার ও কালজয়ী চিত্রগীতি তৈরির নিমিত্তে রাগ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা। তাই শাস্ত্রীয়সংগীত প্রচারের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে শাস্ত্রীয় নিয়মাবদ্ধ সংগীতের প্রচলন ঘটিয়ে এর গভীরতা ও সৌন্দর্যবোধকে ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজন।

* প্রভাষক, সংগীত বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং গবেষণা পদ্ধতি

চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত সংগীতকে বিশ্লেষণ করে সেখানে রাগের যথাযথ ব্যবহার, প্রয়োজনীয়তা ও কী করে রাগসংগীতের সাহায্যে মানসম্মত ও কালজয়ী গান তৈরি করা যায় এবং অপরপক্ষে আপামর জন-সাধারণকে রাগসংগীতের প্রতি কিভাবে আকর্ষিত ও উৎসাহিত করা যায়, তার বিস্তারিত আলোচনা করাই এই গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কেননা, শাস্ত্রীয়সংগীতের গভীরতা উপলব্ধি করতে ও তা সমস্ত ধরনের শ্রোতাদের কাছে সহজবোধ্য করে তুলতে চলচ্চিত্রসংগীতের কোন বিকল্প নেই। এই গবেষণায় ‘গুণগত’, ‘অনুসন্ধানী’ ও ‘ব্যখ্যামূলক’ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথমেই অনুসন্ধান করা হয়েছে রাগসংগীত ও চলচ্চিত্রসংগীতের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র কোথায় এবং কতখানি। এরপর রাগসংগীত ও চলচ্চিত্রসংগীতের গঠনপ্রক্রিয়া ও গীতরীতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এবং চলচ্চিত্রে রাগসংগীত কতটুকু প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হল, তা যাচাই করেই মতামত প্রকাশ করা হয়েছে এই গবেষণায়।

গবেষণা কর্মের তাৎপর্য

চলচ্চিত্র বিষয়ক গান সংক্রান্ত বহু পত্র-পত্রিকা, জার্নাল প্রকাশিত হয়েছে যাদের মধ্যে অন্যতম হল ‘চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার’ এবং ‘সংগীত ও চলচ্চিত্র’। এ দুটি প্রকাশনায় বাংলা চলচ্চিত্রে মানসম্মত গানের প্রয়োজন তথা চলচ্চিত্রে সংগীতের ব্যবহার কতটা ইতিবাচক এবং ব্যাপক, তা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু চলচ্চিত্রে রাগসংগীতের ব্যবহারের তাৎপর্য ও এর মাধ্যমে মানসম্মত এবং পরিমার্জিত গান কিভাবে তৈরি করা যায় ও সাধারণ মানুষকে কীভাবে রাগসংগীত শোনার প্রতি উৎসাহিত করা যায়, সে সম্পর্কে কোনো আলোচনা নেই। পাশাপাশি রাগসংগীতের উৎপত্তি তথা গঠনপ্রক্রিয়া ও গীতরীতি সম্পর্কিত কোনো বিবরণও নেই। পক্ষান্তরে, চলচ্চিত্রসংগীতের গঠন প্রক্রিয়া, গীতরীতি তথা একজন সুরকারের সুর রচনার বৈশিষ্ট্য ও কৌশল সম্পর্কে আলোচনাও অনুপস্থিত। এখানে বিভিন্ন ধরনের শাস্ত্রীয় তথা উপশাস্ত্রীয় সংগীতের ব্যবহার প্রসঙ্গে আলোচনা উপস্থিত থাকলেও চলচ্চিত্রে রাগসংগীতের প্রতিফলন ও এর অবস্থান কতটা সুদৃঢ় এবং সাধারণ সংগীত প্রেমী মানুষের মধ্যে রাগসংগীতের অদমনীয় পদ্ধতি কতটা সহজবোধ্য, আকর্ষিত ও বিকশিত করা যায় তার অনুসন্ধানই এই প্রবন্ধের মূল আলোচিত বিষয়বস্তু।

বিষয় বিবরণ

শাস্ত্রীয়সংগীত রাগ আধারিত শিল্প, যার সংস্কৃত অর্থ রং বা আবেগ। গায়কের গায়নশৈলী ও ঘরানার বৈশিষ্ট্যের কারণে একটি রাগের প্রতিটি পরিবেশনা হয় একে অন্যের থেকে আলাদা (বাণী সহিত ও বাণী রহিত)। একটি রাগ কিছু নির্দিষ্ট স্বর-সমষ্টিসহ একটি স্কেল ভিত্তিতে তৈরি হয়, যার সুর এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ তাল মাত্রা সহযোগে সাধারণ ক্রম অনুযায়ী পরিবেশিত হয়। শাস্ত্রীয়সংগীত রাগ এবং তাল এই দুটি উপাঙ্গের উপর আধারিত। আমাদের উত্তরী রাগসংগীত বহুধর্মী নয়, বরং একক সত্তার অধিকারী। এই রাগসমূহ কোনো সুরকার দ্বারা রচিত হয়নি, বরং বহু শতাব্দী যাবৎ সময়ের দীর্ঘ বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ আমাদের আজকের এই রাগসংগীত সৃষ্টি। উত্তর ভারতীয় রাগগুলি নির্দিষ্ট সময় এবং ঋতুতে নির্ধারিত হয়। শাস্ত্রীয়সংগীতে শিল্পী তার অনন্য সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটিয়ে সুর ও জ্ঞানের বিকাশ করতে পারেন। একজন গায়ক রাগের শুদ্ধতা বজায় রেখে গান রচনা ও পরিবেশন করতে পারেন এবং শ্রোতাদের কাছে সংগীতকে আরও শ্রুতিমধুর, আনন্দদায়ক ও

মনোমুগ্ধকর করে তুলতে সুরকে পরিবর্তনও করতে পারেন। তবে সাংগীতিক জ্ঞান, পরিবেশ ও ব্যক্তিত্বের পার্থক্যের কারণেও সংগীত নির্মাণ অনন্য হয়ে ওঠে।

ভারতীয় শাস্ত্রীয়সংগীতটি প্রাচীনতম এবং সর্বাধিক ছড়িয়ে পড়া এই সংগীতের শক্তিশালী প্রভাব প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগেও পরিলক্ষিত হয়েছে। সংগীতের এই ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে লোকসংগীত, ফিল্মসংগীত, প্রয়োগসংগীত, থিম্যাটিকসংগীত, কোরালসংগীত, অর্কেস্ট্রাল সংগীত ইত্যাদি। বিভিন্ন সংগীতের এই ক্ষেত্রগুলির মধ্যে ফিল্মসংগীত খুব দৃঢ়তার সাথে তার বিকাশ ঘটিয়েছে।

সংগীতের ইতিহাস সুপ্রাচীন। তবে সংগীতের তুলনায় চলচ্চিত্র অত্যন্ত অর্বাচীনকালের^১। চলচ্চিত্র নির্মাণের সূচনা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে। তখনও সে সময়ের নির্মাতাদের প্রে-ব্যাক শব্দটির সাথে পরিচয় ঘটেনি। প্রে-ব্যাক না থাকলেও প্রেক্ষাগৃহের একপ্রান্তে থেকে পরিচালকদের কণ্ঠে নিঃসৃত হওয়া গান দর্শক শ্রোতাদের আমোদিত করত^২।

চলচ্চিত্রসংগীতের মূল লক্ষ্য হল শ্রোতাদের বিনোদন দেয়া। এতে স্বর, তাল ও রচনার একটি নিখুঁত সংমিশ্রণও রয়েছে। ফিল্মসংগীতে নানা ধরনের বিভাগের মধ্যে কিছু হৃদকেন্দ্রিক, কিছু রাগ-কেন্দ্রিক এবং কিছু আছে স্বর-তাল-রচনার মিশ্রণকেন্দ্রিক। সত্যিকার অর্থে ফিল্মসংগীত লঘু সংগীতেরই অংশবিশেষ। যেহেতু ফিল্ম ও লঘু সংগীতে রাগের শুদ্ধতার পরিবর্তে শ্রুতিমধুরতারই বিশেষ স্থান রয়েছে, তাই এ কারণেই চলচ্চিত্রসংগীতে বিভিন্ন রাগ-সমূহের সংমিশ্রণ ঘটে। অতএব চলচ্চিত্রসংগীতে শুদ্ধ শাস্ত্রীয়সংগীতের পরিচয় একটু কমই পাওয়া যায়। যদিও চিহ্নগীতিতে বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীর পদচারণা সেই আদিকাল থেকেই ছিল। অনেক ছবিতেই ছোট খেয়াল বা ঠুমরীও পরিবেশিত হত। বোম্বে টকিজের স্বরস্বতী বাঈ তাদের ঘরানার ঢঙ ও বাণীতে গৌড়সারংগ, জয়জয়ন্তী ইত্যাদি রাগ গেয়ে গেছেন^৩। ‘দামিনী দমকে ডর মোহে লাগে’ বা ‘ঝুঁকি আইরে বাদরওয়া সাবন কী’ ইত্যাদি বন্দিশ যেমনটি তারা কোন সংগীতাসরে পরিবেশন করেছেন, ঠিক তেমনি করেছেন চলচ্চিত্রেও। কদরপিয়ার কিছু ঠুমরী এবং ‘বাবুল মেরে নাইহারে ছুট যা’ এর মতো বিখ্যাত ভৈরবী^৪ ঠুমরীও সাইগলের কণ্ঠে আমরা শুনতে পেয়েছি^৫। এছাড়াও ভৈরব অংগের রাগ এবং প্রসিদ্ধ পাঞ্জাবি লোকধুন আহিরী গীতের শৈলীতে সাজানো জনপ্রিয় রাগ ‘আহির ভৈরব’ এর জনপ্রিয় বন্দিশ “অলবেলা সজন আয়োরী” সুপারহিট হিন্দি সিনেমা “হুম দিল দে চুকে সনম” ছবিতে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। এই রাগের রূপ পূর্বাংগে ভৈরব ও উত্তরাংগে কাফি বা খামাজ অংগে স্পষ্ট হয়। এছাড়াও ‘দেবদাস’ ছবিতে তারানা^৬র বন্দিশ, এমনকি সাজন, সরফারোশ ইত্যাদি ছবিতে ‘গজল’ পরিবেশিত হয়েছে। অপরদিকে, অনেক ছবিতে শাস্ত্রীয়সংগীতের বন্দিশগুলোকে পুনরায় মিশ্রিত ও পরিবর্তিত করে পরিবেশিত হয়েছে এবং অনেক রকমারি ফিউশনও শোনা গেছে। এছাড়াও অনেক বাংলা চলচ্চিত্র যেমন ‘চারুলতা’য় রামমোহন রায় রচিত ধ্রুপদ পরিবেশনের পাশাপাশি নিধুবাবুর টপ্পা ব্যবহার করা হয়েছিল, যেখানে সত্যজিৎ রায় উনিশ শতকের বাবু কালচার কে সিনেমায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন^৭। রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে নিধুবাবুর এ টপ্পাগুলিই ছিল এই ছবির সম্পদ^৮। রাগ সংগীতের খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব রবিশংকর, আলি আকবর খান, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, তিমির বরণ, বাহাদুর খান এমন অনেক শাস্ত্রীয়সংগীতজ্ঞগণ বাংলা ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন, যার ফলশ্রুতিতে তৎকালীন চলচ্চিত্রসংগীত বর্তমান সময়ের তুলনায় উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিল^৯। যদুভট্ট, বসন্তবাহার, ছাড়াও আরও কয়েকটি ছবিতে

ধ্রুপদীয় সংগীতের মেজাজ যুক্ত হওয়ায় কিছু শ্রুতি সুখকর চমৎকার গান শোনা গেছে^৮। বাংলা ছবির সীমাবদ্ধ জগৎকে এই সকল দিকপাল শাস্ত্রীয়সংগীতকারগণ আরো প্রসারিত করে চলচ্চিত্র সংগীত জগৎকে নতুনতর ব্যাপ্তি দিয়েছেন। তবে একালের অধিকাংশ ছবির গল্পই সাহিত্য নির্ভর নয়, বরং মন ভোলানো গল্পে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে যেমন-তেমন করে গান জুড়ে দেয়া হয়, যেখানে সাহিত্যের লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া যায়না এবং প্রায়শই শ্রীলতার সীমা লঙ্ঘিত হতে দেখা যায়। অতি নিম্নমানসম্পন্ন কথার সঙ্গে রকমারি বাদ্য-বাজনা বাজিয়ে জোরপূর্বক কাঠামো দাঁড় করানো হয়, যা কখনোই হৃদয়গ্রাহী ও সুদূর-প্রসারী হয়ে ওঠে না। শুধু গানের জন্য গান চিত্রায়ণ নয়। কোনো কোনো দৃশ্যে গান এতটাই অপরিহার্য যে, সে গান সমস্ত গল্পকে জড়িয়ে কাহিনির ভাবমূর্তি দর্শকশ্রোতার কাছে তুলে ধরতে সহায়তা করে, যদিও তার সঠিক চিত্রায়ণ রাগসংগীতের সহায়তা ছাড়া অসম্ভব। এটা আমাদের অজানা নয় যে, রাগসংগীতের সাথে মানব মনের বিভিন্ন আবেগ, রস ও ভাবের প্রকারভেদের সাদৃশ্য রয়েছে। শুধু তাই নয়, রাগসংগীত পরিবেশনে সময়ের মাহাত্ম্যের বিষয়টিও যথেষ্ট সংগতিপূর্ণ ভাব প্রকাশ করে সিনেমাংগীতেও। সংগীত পরিচালকের কাজ শুধু দু'একটি গানে ভালো সুর দেয়ার চেষ্টা নয়, বরং গোটা কাহিনি-কাঠামোর অর্থবহ আবহসংগীত সৃষ্টি করাও তার দায়িত্বের মধ্যে বর্তায়। কিন্তু এই ব্যাপারে তারা যথেষ্ট উদাসীন, যদিও যন্ত্রসংগীতের বিকাশ ও প্রসার ঘটেছে চলচ্চিত্রে সেই প্রাচীনকাল থেকেই। এছাড়াও ছবিতে কাহিনির সংযোগ বিনাই অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে অসংগতিপূর্ণ সাংগীতিক ধ্বনির প্রয়োগ দেখা যায়। বাদ্যযন্ত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রাগ ও সংগতির নির্বাচন এবং চিত্রখণ্ড অনুযায়ী তার ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। যেমন 'শ্রী' রাগ সেতারে বা বাঁশিতে তোলা বেশ কষ্টসাধ্য, আবার সারেঙ্গী ও সেতারে অর্থাৎ তন্ত্রবাদ্যে তান খুব ভাল হয়, যা একটু মনোযোগী কান বুঝতে পারে^৯। কিন্তু এই প্রয়োগকৌশল সংগীত পরিচালকদের বোধগম্যে থাকা প্রয়োজন।

কিছু রাগ রাগিণী রয়েছে, যা চলচ্চিত্রসংগীতে প্রায়শই ব্যবহৃত হয়। যেমন : রাগ-বাহার, রাগ-ভৈরবী, কির্বাণী, পিলু, পাহাড়ী, মাড, গারা, শিবরঞ্জনী, ইমন, দরবারি ইত্যাদি। অনেক সিনেমাতেই শিল্পীদের কণ্ঠে 'মাড' নামে একটি বিখ্যাত রাগ শোনা গেছে। যেমন বিখ্যাত রাজস্বানী গীত 'কেসরিয়া বালমা মোরে'। এছাড়াও ঠুমরীতে সাধারণত যে সকল রাগ শোনা যায়, তা হল রাগ পিলু, পাহাড়ী, খামাজ, তিলং, গারা, মাড, ভৈরবী ইত্যাদি। কিছু খ্যাতনামা শিল্পীগণ এদেরকে রাগের পরিবর্তে 'ধুন' নামেও সম্বোধন করেন, এমনকি এই রাগগুলির একটি ছোট অংশ ব্যবহার করে ফিল্মগানের গভীর উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়। চলচ্চিত্রসংগীতে ব্যবহার যোগ্য নির্দিষ্ট রাগগুলির কোনো নির্ধারিত কৌশল নেই। অনেক রচনাতেই একক এবং দুই বা ততোধিক রাগ বা রাগের মিশ্রণ শোনা যায়। উপরোল্লিখিত রাগ পিলু এবং বাহার কাফি ঠাটের অন্তর্গত, রাগ পাহাড়ী এবং মাড বিলাবল ঠাটের, রাগ গারা খামাজ ঠাটের, ভৈরবী রাগ ভৈরবী ঠাটের, ইমন রাগ কল্যাণ ঠাটের এবং কির্বাণী রাগের কিছু অংশ কাফি অংগের হলেও একে কির্বাণী ঠাটের অন্তর্গত মানা হয়। বেশির ভাগ রাগভিত্তিক ফিল্ম গানগুলো পুরোনো বাংলা ও হিন্দী চলচ্চিত্রেই শোনা যায়। এটি বেশ আক্ষেপের বিষয় যে, আজকের কিছু সংগীত পরিচালকগণ শাস্ত্রীয়সংগীতের ঐতিহ্যের আধারে সংগীত পরিচালনা খুব কমই করে থাকেন। তবে ফিল্মসংগীতের মধ্যে এমন অনেক অগণিত রচনা রয়েছে, যা বিভিন্ন রাগ-সমূহের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত।

সংগীত, রাগসংগীত, রাগসংগীতের গঠন প্রক্রিয়া ও গীতিরীতি

সুর, স্বর, তাল, ছন্দ, মাত্রা ও লয়ের পাশাপাশি শিল্পীর ভাবের বা অনুভূতির বিষয়টিও সংগীতকলার একটি অপরিহার্য উপাদান। তাই বলা যায়, সুর, তাল, লয় ও বাণী বেষ্টিত ছন্দোবদ্ধ কোন রচনা দ্বারা যখন কোন শিল্পী কণ্ঠের সহযোগীতায় তার মনের ভাব বা কল্পনা, অনুভূতি ইত্যাদি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়, তাই যথার্থ সংগীত। অন্যদিকে, শাস্ত্রীয় নিয়মাদি অনুসরণাত্মক সংগীতই হল শাস্ত্রীয়সংগীত। সংগীতকে যে সকল নিয়ম-নীতি আঁকড়ে ধরে পথ চলতে হয় তার অধিকতর অধ্যয়ন শাস্ত্র আধারিত। যেমন- শাস্ত্রীয় বিধি-পূর্বক আবদ্ধ রাগ-সংগীত- ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুমরী, টপ্পা ইত্যাদি। এই রাগসংগীত উচ্চাঙ্গ, ধ্রুপদী বা শুদ্ধসংগীত নামেও পরিচিত।

রাগ হলো ভারতীয় সংগীতের প্রাণ^{১০}। যে সকল স্বর সমুদয় রঞ্জনশক্তির সহায়তায় প্রাণীর মনোরঞ্জন বা চিত্ত বিনোদনে সক্ষম, সে সকল স্বর সমূহকেই ‘রাগ’ বলে^{১১}। অর্থাৎ স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত যে সকল ধ্বনিতরঙ্গসমূহ মানুষের মনে রঞ্জনার সৃষ্টি করে তাকেই ‘রাগ’ বলে। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল চিত্তকে রঞ্জিত করে বলেই এর নাম রাগ। বর্ণসমূহে সুরযোজনার দ্বারা পরিপূর্ণ রাগ রূপের প্রকাশ অসম্ভব হলেও ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি স্বরসমূহের বিস্তারের সহিত গ্রহ, অংশ, ন্যাস, বাদী, সমবাদী ইত্যাদির প্রলেপে রাগ-রূপ প্রকাশ সম্ভব। তাই বলা হয়, রাগে স্বর-সম্বাদের উপযোগিতা রয়েছে^{১২}। এদেশের সংস্কৃতির অন্যতম মৌলিক অবদান হল রাগ-সংগীত। ‘রাগ’ শব্দের আবির্ভাব সম্পর্কিত তথ্য থেকে জানা যায় শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে অতীতে রাগ শব্দের প্রচলন হয়েছিল। প্রাচীন যুগে গান্ধার-মার্গ সংগীত, মার্গ-দেশী সংগীত, মধ্যযুগে উত্তরী ও দক্ষিণী সংগীত এবং বিগত শতকে ‘রাগদারী সংগীত’ শাস্ত্রীয়সংগীত (৫০ দশক) এই সকল সংগীতকলার ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয়সংগীত নাম তথা পরিভাষা সমধিক প্রচলিত হলেও বর্তমানে রাগ-সংগীত নাম ব্যাপক ভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। রাগ-রূপের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তির নিমিত্তে বর্ণ ও অলংকারের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। ভারত, মতঙ্গ, পার্শ্বদেব ও শারঙ্গদেব প্রত্যেকেই রাগের সূচ্য বিকাশের জন্য বর্ণালংকার গুলির পরিচয় দিয়েছেন। তাই যখন কোন শিল্পী বা সাধক কোনো রাগকে রূপ ও বর্ণের মাধ্যমে কল্পনা করেন এবং যথাযথ সাংগীতিক নিয়ম-বিধি অনুসরণ পূর্বক সংগীত পরিবেশন করেন, তখন সেই পরিবেশিত সংগীতকেই রাগ-সংগীত নামে আখ্যায়িত করা হয়। মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, সংগীতের প্রধান ও একমাত্র উপজীব্য বিষয় হল রাগের রসপূর্ণ ভাবরূপ^{১৩}।

ভারতীয় সংগীত পর্যালোচনায় ইহা সহজেই অনুমেয় যে, বহু বিবর্তনের পথ অতিক্রম করে গান্ধার গান হতে উদ্ভূত প্রবন্ধ গান এবং পরবর্তী ধ্রুপদ তথা এর পরবর্তী সময়ে বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় খেয়াল গানের আদর্শ মূলত; প্রবন্ধ ও ধ্রুপদ গানেরই প্রতিচ্ছবি। শারঙ্গদেব এর মতে, প্রকৃষ্টরূপে আবদ্ধযুক্ত যে সংগীত তাই প্রবন্ধ গান। বর্তমানকালে ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল ইত্যাদি গীত প্রকারের বিভাগসমূহ যেমন-ছায়ী, অন্তরা, সঞ্চরী, আভোগ নামে চিহ্নিত করা হয়, ঠিক তেমনি প্রবন্ধাদি যুগে প্রবন্ধ গানের বিভাগ সমূহকে ‘ধাতু বলা হত, যাদের নাম ছিল যথাক্রমে উদ্গ্রাহ, মেলাপক ‘ধ্রুব’ অন্তরা, আভোগ, সেই সময়েই প্রবন্ধ, বস্তু, রূপক, রাগালাপ, রূপকালাপ, আলপ্তি গান, স্বস্থান নিয়ম এর আলাপ-বিধি প্রচলিত ছিল, যাদের মধ্যে প্রবন্ধ, বস্তু, রূপক-এই তিন শ্রেণির গান সমূহ নিবন্ধ তথা রাগালাপ, রূপকালাপ, আলপ্তি, স্বস্থান নিয়ম ইত্যাদি অনিবদ্ধ গানের পর্যায়ভুক্ত ছিল।

নিবন্ধ: তালবদ্ধ গানই নিবন্ধ গান। যেমন- বর্তমান সময়ের খেয়াল, ধ্রুপদ, ধামার, ভজন, কীর্তন ইত্যাদি।

অনিবন্ধ: তালবর্জিত গানই অনিবন্ধ গান। খেয়াল, ধ্রুপদ, ধামার ইত্যাদি গানে তালবাদ্যযন্ত্র বাজানোর পূর্বে তথা সেতারে গৎ বাজানোর পূর্বে যে রাগভিত্তিক আলাপচারি করা হয়, তাই অনিবন্ধ গান।

রাগালাপ: অনিবন্ধ গানের মধ্যে আলাপের একটি প্রকার হল রাগালাপ। এই অংশে রাগের শুদ্ধতা বজায় পূর্বক যে দশটি নিয়ম যথা- গ্রহ, অংশ, ন্যাস, অপন্যাস, সন্যাস, বিন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব, মন্দ্র ও তার-এ সকল নিয়ম পালন পূর্বক গায়ন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হত, যাদের শুদ্ধ রাগও বলা হয়।

রূপকলাপ: অনিবন্ধ গানের আলাপের একটি প্রকার হল রূপকলাপ, যা রাগালাপের পর পরিবেশিত হত। রূপকলাপে রাগের নাম বলতে হয় না, রাগালাপে হয়।

ছায়ালাপ: রাগ পরিবেশনকালে যদি মূল রাগে অন্য কোন রাগের ছায়াপাত ঘটে, তখন ঐ রাগকে ছায়ালাপ বা সালঙ্ক রাগ বলা হয়।

আলপ্তি গান: এটি হল প্রচলিত ৪ প্রকার অনিবন্ধ গানের মধ্যে একটি প্রকার। রাগালাপ ও রূপকলাপের পরবর্তী আলাপ হল আলপ্তি গান। এই আলাপে রাগরূপ পরিস্ফুট করে আবির্ভাব-তিরোভাব ঘটিয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হত।

সংকীর্ণ রাগ: যে রাগ পরিবেশনের সময় অন্য দুই বা ততোধিক রাগের ছায়াপাত ঘটে, তাকেই সংকীর্ণ রাগ বলা হয়।

স্বস্থান নিয়ম: প্রবন্ধ গানের যুগে আলোপচারি করার সময় কতগুলি বিধিবদ্ধ নির্দিষ্ট স্থান বা নিয়ম পালন করা হত, যার অনুসরণে শিল্পীর আলাপচারির প্রক্রিয়াকে বলা হত স্বস্থানে নিয়মের আলাপ।

বলাবাহুল্য যে, আধুনিক রাগ বা রাগ সংগীত বলতে রাগ-রূপ সম্বলিত যে চিন্তা বা ভাবনা আমাদের মনে উদয় হয়, তা তৎকালীন সময়ে প্রচলনে ছিল না।

গঠন প্রক্রিয়া

রাগের রঞ্জনশক্তি পরিপূর্ণ ও পুষ্ট হয় ছায়, বর্ণ, অলংকার, কাকু, গমক, মুচ্ছনা প্রভৃতির একত্র সমাবেশে^{৪৪}। সাধারণ অর্থে রাগ বলতে ছায় (রাগাবয়ব), স্বরের স্থিতি ও বিচিত্র বিন্যাসকেই বোঝায়, যার ওপর নির্ভর করে রাগের গঠন-প্রকৃতি, প্রয়োগ ও প্রভাব। অবয়বের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই রাগ তার নিজস্ব স্বকীয়তা ও সৌন্দর্যের বিকাশ সাধন করে। আলাপ, আলপ্তি, নিবন্ধ, প্রবন্ধ ও সকল প্রকার গীতের প্রাণ হল রাগ। রাগ সৃষ্টি হয় ঠাট থেকে, কারণ ঠাট হল রাগের উৎস। ধ্বনির বিশিষ্ট রচনা যা স্বর ও চার বর্ণের সহযোগে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে মনুষ্যহৃদয়কে রঞ্জিত করতে সমর্থ হয়, তার অপর নাম হল রাগ। রাগের কাঠামো বা গঠন-প্রকৃতি বিষয়ক যে বিষয় গুলো মনে রাখা একান্তই আবশ্যিক, তা হল-

- প্রতিটি রাগই কোনো না কোনো ঠাট থেকেই গড়ে উঠেছে বা ঠাটাত্মক আশ্রিত।

- আরোহ-অবরোহ ও বাদী স্বরের উপস্থিতি রাগে অত্যাৱশ্যক মানা হয়^{৪৫}

- রাগ সর্বদা অলংকারযুক্ত ও মনোরঞ্জক হওয়া বাঞ্ছনীয়^{১৬}
- কমপক্ষে পাঁচ স্বরের প্রয়োগ প্রতিটি রাগে থাকতেই হবে^{১৭}
- কোনো রাগেই মধ্যম, পঞ্চম এ দুটি স্বর একত্রে বর্জিত হয় না^{১৮}
- একই স্বরের দুই রূপ (কোমল ও তীব্র) পরপর কোনো রাগেই প্রয়োগ হয় না^{১৯}

রাগ উপযোগী স্বর সংখ্যার ভিত্তিতে রাগের তিন প্রকার ভেদও রয়েছে- ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ রাগ। এই তিন ধরনের জাতির রাগই ঠাট থেকে সৃষ্টি। এই তিন জাতিকে বিশ্লেষণ পূর্বক যে নয় প্রকার জাতির সৃষ্টি হয় তা থেকে আরোহ-অবরোহের বৈশিষ্ট্যের ফলে গাণিতিক ব্যাখ্যানসারে একটি ঠাট হতে মোট ৪৮৪ টি রাগ সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়াও বাদী স্বরের পরিবর্তন ঘটিয়ে এবং দিন রাতের ২৪ ঘন্টার সময়চক্রের ভিত্তিতে আরও ভিন্ন ভিন্ন কিছু রাগের সৃষ্টি হতে পারে, যদিও ২০০টির বেশি রাগ দৃষ্টির বাইরে। কেননা, মনোরঞ্জকতা রাগের জন্য অত্যাবশ্যক উপাত্ত। আর এ কারণেই প্রচলিত রাগের সংখ্যা সীমিত। আজকাল একই রাগের বন্দিশ বিভিন্ন স্বর থেকে শুরু বা শেষও করা যায়। যদিও সংগীত সর্বদা পরিবর্তনশীল, তবুও বাদী স্বরের নিয়মটি এখনও অপরিবর্তনীয় ও অত্যাবশ্যকীয়ভাবে মানা হয়। তবে বিজ্ঞান ও কলার স্বতন্ত্র সমন্বয়ই রাগ সংগীতের ক্ষেত্রে ভাবপক্ষ ও কলাপক্ষ বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পরিবেশনীয় রাগের ভাবরসগত বন্দিশ ও তার সাথে সংগতিপূর্ণ বিস্তার তথা অলংকরণের সম্যক প্রয়োজন অনিবার্য। কারণ, অভিযুক্তির কারণেই রসালভ হয়ে থাকে এবং এও অনস্বীকার্য যে, ভাবহীন কলাত্মক প্রকাশ অসম্পূর্ণ ও অসফল হয়। কারণ, তা শ্রবণযোগ্য চমৎকারিত্ব যুক্ত হলেও হৃদয়গ্রাহী হয় না।

রাগ-সংগীতের গঠন প্রক্রিয়া মূলত দ্বৈত উপায়ে সংঘটিত হয়। এক হল ঠাট থেকে অর্থাৎ ঠাটাত্মীয় রাগসমূহ এবং অপরদিকে লোকমুখে অর্থাৎ লোকধুনোৎপত্তি রাগ।

ঠাট হল সপ্তকের পরবর্তী ধাপ যার ১২ স্বর হতে ঠাটের সৃষ্টি। মেল বা ঠাট হচ্ছে স্বরের এক বিশেষ রূপ, যা থেকে রাগের সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু কিছু গুণীজন এই মতবাদকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অন্তর্গত মনে করেন না। তাদের মধ্যে শাস্ত্রীয় সংগীতকার সংগীতাচার্য ডঃ আলী এফ. এম. রেজোয়ান তাঁর “দশ ঠাট প্রেক্ষাপটে রাগ বর্ণীকরণে বর্তমান বাঁধা” নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন “ঠাট হল শাস্ত্র বা ব্যাকরণ এবং রাগ হল শিল্প। কারণ, শিল্প যখন পরিমার্জিতরূপে শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য গ্রহণীয় হয়, তখনই সে শিল্প শাস্ত্র বা ব্যাকরণের রূপ নেয়।” এরূপ ঠাটাত্মীয় কিছু রাগ হল পুরিয়াধানেশী, দেশ, আহির ভৈরব, মারু বিহাগ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, লোকধুন থেকে নগরায়িত হয়ে পরিণীলিত ও পরিমার্জিত সংগতির স্বরসমূহ দ্বারা আরোহণ-অবরোহণ নির্দিষ্ট হয়ে যে স্বরূপ শাস্ত্রবদ্ধ হয়, তাকে দেশি রাগ বা লোকধুনোৎপত্তি রাগ বলা হয়। যেমন- মূলতানী, জয়জয়ন্তী, ঝিকোটি, খামাজ, ভূপালী, ধানী, স্বরাস্ত্র ভৈরব, গাওতি ইত্যাদি। এভাবেই বিভিন্ন প্রকার গায়নশৈলী যেমন: ধ্রুপদ, খেয়াল ইত্যাদির জন্ম হয়। দ্বিতীয় প্রকার রাগ গঠনের রীতি হল সমস্বর রাগ। অর্থাৎ যে সকল রাগ সমূহের স্বর সমুদয় একই রকম তথা ভিন্ন ভিন্ন নাম ও চলন হওয়া সত্ত্বেও এদের স্বর সমষ্টি একই রকম। যেমন- দেশকার ও ভূপালী স্বর এক, অঙ্গ আলাদা, ভীমপলশী-বাগেশী, আশাবরী-দরবারী, কোমলরিশভ আসাবরী-বিলাসখানী টোড়ী। তৃতীয় প্রকারের পর্যায়ে পড়ে সমাদিক রাগসমূহ অর্থাৎ এদের অঙ্গ ও স্বর-সমূহ দুটোই এক। ভীম-ভীমপলশী, গুজরীতোড়ী-তোড়ী, রেবা-বিভাস, ইমন-ইমনকল্যাণ, পুরিয়া-মারবা। চতুর্থ পর্যায়ভুক্ত হল

জাতিভেদে নির্ণীত রাগসমূহ যেমন-ইমন, শংকরা, দেশ, পূরবী, মারবা ইত্যাদি। যদিও ইতিপূর্বে জাতিজনিত রাগ বর্ণীকরণের কথা এ লেখায় উল্লেখিত রয়েছে। পঞ্চম পর্যায়ভুক্ত হল-অঙ্গভেদে রাগ অর্থাৎ রাগাঙ্গ রাগ। যেমন- খামাজ, কাফী। রাগের স্বর ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও নির্দিষ্ট স্বর-সংগতিতে যে নির্দিষ্ট রাগের রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে রাগাঙ্গ বলে। রাগাঙ্গ রাগ বর্ণীকরণে প্রথম প্রয়াস করেছেন ‘পণ্ডিত নারায়ণ মোরেশ্বর খড়ে’। উদাহরণ স্বরূপ সর্বমোট সংগীত শাস্ত্রে ৩৬ টি রাগাঙ্গের মতান্তরে ৩২টি রাগাঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন- কল্যাণ, ভৈরব, তোড়ী, কাফি, কানাড়া, মলহার, সারংগ, বিহাগ, বিলাবল, নট, শ্রী, ধানেশী, মারবা, পূরবী, গৌরী, জৈত, ললিত ইত্যাদি। ষষ্ঠ সংখ্যায় রয়েছে জোড় রাগ ও মিশ্র রাগ। সমস্বরী একের অধিক রাগ নিয়ে যে নতুন রাগ সৃষ্টি হয়, যার বাদী-সমবাদী এক থাকবে, কিন্তু অঙ্গ পৃথক হবে, তাকে জোড় রাগ বলে। জোড় রাগ গাওয়া মানেই দুটি রাগ অল্প অল্প মিলিয়ে গাওয়া নয়, বরং জোড় রাগ গাওয়ার অর্থ দুটি রাগ মিলিয়ে পৃথক একটি রাগের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলা। যেমন পরজ-বসন্ত, জেতশ্রী-ত্রিবেনী ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন স্বরের একের অধিক রাগকে সংমিশ্রণ করে রাগ গায়ন করাকেই মিশ্র রাগ বলে। দুটি শুদ্ধ রাগের মিশ্রণে যখন একটি রাগ গাওয়া হয় তখনই মিশ্র রাগ হয়। এই রাগ সমস্বরী হতে পারে, আবার অসমস্বরীও হতে পারে। যেমন ভৈরব-বাহার, বসন্ত-বাহার, হিন্দোল-বাহার, কদার-বাহার, রাগেশ্রী-বাহার ইত্যাদি। মিশ্র রাগের গায়ন রীতি সাধারণত নিম্নরূপে পরিবেশিত হয়। যেমন-অনেকে মনে করেন, প্রথমে যে রাগের নাম উল্লেখ থাকে, সে রাগের প্রয়োগ বেশি। দ্বিতীয়ত: আরোহে এক রাগ-অবরোহে অপর রাগ এবং তৃতীয়তঃ একের পর এক রাগের সংগতির ব্যবহার। যদিও বৈদিক ও বৈদিকোত্তর যুগে রাগ শব্দের ব্যবহার ছিলনা, বিভিন্ন বৈদিক স্বরে সামগান প্রচলিত ছিল, যাতে মন্ত্রাদি- তিন স্থান (সপ্তক) ও বিলম্বিতাদি (তিন লয়ের) ব্যবহার ছিল। প্রায় দুই হাজার বছর আগে থেকেই বৈষ্ণবরা মন্দিরে সুরের মাধ্যমে স্তোত্র পাঠ করতেন। বলা হয় যে, সেই স্তোত্রের সুর থেকেই রাগসংগীতের বিকাশ।

রাগসংগীতের গীতরীতি

শুদ্ধ শাস্ত্রীয়সংগীত বলতে যন্ত্রসংগীতকেই বোঝায়, যেখানে শুধুমাত্র সংগীতের মূল দুটি উপাদান (সুর ও তাল) দিয়েই রসনিষ্পত্তি ঘটানোর চেষ্টা করা হয়। অপরদিকে রাগের শাস্ত্রীয় বিধান মেনেই যে গীত প্রকার পরিবেশিত হয়, তাকেই শাস্ত্রীয়সংগীতের গীত ধারায় পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। এ গীতধারায় সুর ও তালের সাথে বাণী যুক্ত করে এ সকল গীত প্রকার পরিবেশিত হয়- ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা।

নানাবিধ অলংকার প্রয়োগ, রাগালাপে স্থায়ী বর্ণের ব্যবহার, মীড়ের প্রয়োগ, মধ্য বা দ্রুত আলাপে গমকের কাজ ধ্রুপদীয় রূপের ভাব-ব্যঞ্জনায় সহায়তা করে। ধ্রুপদ গীত প্রকারে এই গীত-রীতির গঠনগত বৈশিষ্ট্য প্রভাবিত হয় গতি ও ছন্দের দ্বারা। গানের প্রারম্ভে আলাপের সহায়তায় রাগরূপকে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত করে স্থায়ী, অন্তরা আবার কখনও স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চরী, আভোগ এই চারটি বিভাগ বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত লয়ের সাবলীল গতির মধ্যে ধারাবাহিকভাবে যোগসূত্র স্থাপন করে। অপর দিকে, শাস্ত্রীয়সংগীতের অন্যতম গীতিরূপ খেয়াল দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টায় সংগীত জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। রাগ-রূপে সূক্ষ্মতা ও নমনীয়তা আরোপের উদ্দেশ্য নিয়ে এই গীতিরূপটি গড়ে ওঠে। খেয়াল গীতিপদ্ধতি বিশাল সংগীত শিল্পে যে উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিতে পেরেছে, তার অন্যতম কারণ হল এর নিজস্ব রীতিগত স্বকীয়তা ও সৌন্দর্য। সুনিয়ন্ত্রিত বিস্তার ও

তানের সমন্বয়ে খেয়াল গীতিরূপ গঠিত হয়েছে। খেয়াল গানেই শিল্পীর সুর-বিহারের যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে বলে নানা স্বর সমন্বয়ে ও অলংকরণে রাগ সুপরিষ্কৃতিত করার সুযোগ ঘটে। স্বরের দ্রুত চলন ভঙ্গি, আলাপ-বিস্তারকে অলংকার রূপে গ্রহণ করে গমক, মীড়, মুচর্চনা সমন্বয়ে রচিত সুললিত তান এবং বিলম্বিত খেয়ালের শান্ত-সংযত প্রকৃতি রাগ-রূপের উপস্থাপন ভঙ্গিকে আকর্ষণীয় ও সমৃদ্ধ করে তোলে। খেয়াল গানে কয়েক ধরনের গীতি-রীতি প্রচলিত রয়েছে। এদের মধ্যে একটি হল তারানা বা তেলেনা, যাতে দ্রিম, তানা, দেরেনা, নোম-তোম এরূপ বিশেষ শব্দের সহিত রাগ ও তাল যোগে গান করাকেই তারানা বলে।

উত্তরী রাগসংগীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, গায়কের গায়কিতে সাবলীল বিচরণ তথা গায়কই এর একমাত্র রচয়িতা^{১০}। এই স্বাধীনতার জন্যই রাগসংগীতের আকর্ষণ যেমন বেড়েছে, ঠিক তেমনি বিভিন্ন সাংগীতিক ঘরানারও উদ্ভব হয়েছে। যদিও সংগীতের অন্যান্য ধারায় এই স্বাধীনতার ছাপ তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয় না।

শাস্ত্রে রাগসংগীত পরিবেশনের যে সকল কঠোর নিয়মবিধি উল্লেখিত আছে সে সকল নিয়মগুলি প্রাচীন সংগীত জ্ঞানী, সংগীত বোদ্ধা ও শিল্পীদের দ্বারা হাজার বছরের পরিশীলিত ও পরিমার্জনতার সুবাদে লঙ্ঘন হয়েছে। চলচ্চিত্রসংগীত কখনো ছবির সেই সকল বিধি-বিধান অনুসরণ করে না। কারণ, তা বিশুদ্ধ রাগসংগীতের পর্যায়ে পড়ে না। সিনেমাসংগীত সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি ব্যাপার। যদিও সেটা শুধু কণ্ঠসংগীতেই নয়, আবহসংগীত বা সিনেমায় দৃশ্যমান কোনো সাউন্ডও হতে পারে।

চলচ্চিত্রসংগীতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

চলচ্চিত্র এক প্রকার দৃশ্যমান শিল্প বিনোদন মাধ্যম, যার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ। শিল্পকলার প্রভাবশালী ও শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে সংগীতের কোনো বিকল্প নেই, যার ব্যবহার চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সাথে উত্তম যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম। চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত সংগীতকেই সাধারণ অর্থে ‘চলচ্চিত্রসংগীত’ বলা হয়।

যেহেতু আমাদের অজানা নয় যে, স্বাভাবিকভাবেই বোধগম্যতার অপারগতার কারণে শাস্ত্রীয়সংগীত সহজে জনসাধারণকে আকৃষ্ট করতে পারে না, কিন্তু অপর দিকে চিত্রগীতি খুব স্বাভাবিক কারণেই কাহিনীর প্রাসঙ্গিকতার সাথে সংগতি স্থাপন করে রচিত হয় বলেই তা দর্শক শ্রোতার মনোরঞ্জন করে। প্রত্যক্ষভাবে কিছু কিছু চলচ্চিত্রে একক সংগীত হিসেবে শাস্ত্রীয় সংগীতেরই প্রধান স্থান পরিলক্ষিত হয়। যেমন ঢুলি, শাপমোচন, বৈজুবাওরা, তানসেন, অপরভূপালী, অমরগীতি, যদুভট্ট ইত্যাদি। রাগ-রাগিনীর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সংগীত তৈরির নিমিত্তে আধুনিক সংগীত শিক্ষার্থী এবং গায়কদের মধ্যে যথাযথ সাংগীতিক বোধ তৈরি করতে হবে এবং এর পাশাপাশি সাধারণ জনগণকে ফিল্মসংগীত শোনার সময় রাগসমূহ বুঝতে উৎসাহিত করতে হবে। কারণ, চলচ্চিত্র দৃশ্য ও শ্রবণ কলার সমন্বিত শিল্প, যে কারণে দর্শক শ্রোতা দৃশ্যকলা ও শ্রবণ-কলার নিগূঢ় ভাব অতি সহজেই বোধগম্য করতে পারেন। নির্বাক চলচ্চিত্র এবং নিঃশব্দ নাট্য যতটা মনোগ্রাহী হয়, নিশ্চয়ই তার চেয়ে অধিক মনোগ্রাহী, বোধগম্য ও সুগম হয় সবাক চলচ্চিত্র অথবা গীতি-আলেখ্য। যেহেতু সংগীত কেবলই মনোরঞ্জনের বিষয় নয়, এতে জড়িয়ে আছে মনোবৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, আধ্যাত্মিক ও নন্দনতাত্ত্বিক রসনিষ্পত্তির বিষয়।

একজন সুরকার কীভাবে সুর করেন

সাহিত্যে বা শাস্ত্রে সংগীত রচনার লিখিত কোনো নিয়ম উল্লেখিত নেই। সাংগীতিক তত্ত্ব, দর্শন, জীবন-বোধ ও আর্দশের কথাই গানের ভাষায় সাহিত্যে প্রকাশিত হয়। মৌখিক ধারার এ সকল গানই সংগীত হিসেবে পরিচিত। শাস্ত্রীয়সংগীতে রয়েছে দুটি মৌলিক উপাদান যা রাগ এবং তাল হিসেবে পরিচিত। ৭টি সুর ও ২২টি শ্রুতির সমন্বয়ে আরোহ-অবরোহ বিন্যাস, বাদী-সমবাদী স্বরের প্রয়োগ এবং মীড়, গমক ও অন্যান্য সাংগীতিক কৌশলের মাধ্যমেই শাস্ত্রীয়সংগীতে রাগ সমূহ তৈরি ও পরিবেশিত হয়। সংগীত রচনা বা কম্পোজিশন বলতে বোঝায় কোনো ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা জনিত কারণে সুরকারের মস্তিষ্কে তৈরি হওয়া কোনো বাস্তব সুর এবং তার লিখিত রূপ। যারা এই নতুন গীত, কবিতা, গানগুলোর সামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দের দ্বারা পরিপূর্ণ ভাব প্রকাশের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করেন, তাদেরকেই বলা হয় গীতিকার এবং এই লিখিত নতুন রচনাগুলিকে যারা সুর, তাল ও ছন্দোবেষ্টিত করে তৈরি করেন, তাদেরকেই সুরকার বলা হয়। একটি জনপ্রিয় সংগীতের পেছনে এক বা একাধিক সুরকারও থাকতে পারেন। একজন কম্পোজারকে গানের সুর এবং কথা দুই দিকেই সমানভাবে মনোযোগ দিতে হবে। কারণ, এমন অনেক গান আছে যে গুলো প্রথম প্রথম বেশ জনপ্রিয় হলেও কিছু সময়ের ব্যবধানে এগুলো জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে। তাই গানের কথা ও সুর উভয়েই যদি মানসম্মত হয়, তবেই সেসব গান সুদূরপ্রসারী ও কালজয়ী হয়। চাইলেই গান লেখা বা সুর করা যায় না। সত্যিকার অর্থে গান লেখা বা সুর করার জন্য পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন। গান মূলত ছন্দে লিখতে হয়। তাই আগে তাল সম্বন্ধে জ্ঞান থাকতে হবে। গানের বাণীর ওপরই সুর রচনা নির্ভরশীল। কারণ, কবিতা ও গীতি কবিতা লেখার নিয়ম ভিন্ন ভিন্ন। তবে একটি পরিপূর্ণ গীতিকবিতা বলতে আমরা চার তুকের গীতকেই বুঝি। এরূপ গীতি-কবিতাই স্বার্থক, পরিপূর্ণ, সুদূরপ্রসারী বা কালজয়ী শিল্পের সৃজন করতে পারে। যদি বিয়োগাত্মক গানে শৃংগার ভাবাত্মক সুরারোপ করা হয়, তাহলে তা প্রকৃত গান হবে না। আবার আনন্দসূচক বা রোমান্টিক গীতি-কবিতায় যদি বিয়োগাত্মক সুরারোপিত হয়, তবে তাও প্রকৃত গান হবে না। এর সাথে তাল ও ছন্দের বিষয়টিও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। গানের বাণীর ওপর ভিত্তি করেই সুর ও সুরের গঠনগত প্রকৃতি বা ধাঁচের উপর ভিত্তি করেই কোন্ তালে বা ছন্দে গানটি সুরারোপিত হবে, তা নির্ধারণ করতে হবে। সুরকার সাধারণত ধীর লয়ের গানে সুর এবং একটু জমানো গান হলে তাল এবং ছন্দের দিকেই লক্ষ্য রেখে গীত রচনা করে থাকেন। যখন কোনো সুরকার রাগ ইমনে তীব্র ম এরা পাশাপাশি শুদ্ধ ম ব্যবহার করেন, তখন ঐ রাগের মধ্যস্থিত রস ও ভাবের নিষ্পত্তি ঘটানোর জন্য সুরকার সুগমসংগীতের ক্ষেত্রে এ ধরনের স্বর ব্যবহার করে থাকেন। অর্থাৎ, কাব্যের ভাবের রস নিষ্পত্তির প্রয়োজনে সুরকার মূল রাগের বহির্ভূত অন্য স্বর প্রয়োগ করে থাকেন। Composer আর Song Writer এর কাজে অনেকটা সাদৃশ্য রয়েছে। Composer একটি গানের বাণীকে চিত্রপট অনুযায়ী কী ধরনের সুর করবেন, সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। তিনি গানের সুর এবং যন্ত্রাদির প্রায়োগিক আয়োজন করে থাকেন এবং সেই সুরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাদ্যযন্ত্র কীভাবে ব্যবহার করা হবে, তা নির্ধারণ করেন।

নিম্নে উল্লেখিত ক্রমিক নং— (১ - ১৭) পর্যন্ত বাংলাদেশি ছবির গান, (১৮-২২) পর্যন্ত ভারতীয় বাংলা ছবির গান এবং (২৩-৩০) পর্যন্ত ভারতীয় হিন্দি চলচ্চিত্রের গানের তালিকা দেয়া হলো।

ক্র.নং	ছবির নাম	প্রকাশ সাল	গানের প্রথম কলি	সুরকার	রাগের নাম	রাগের আরোহণ-অবরোহণ
০১	জীবন-তৃষ্ণা	১৯৫৭	এ আঁধার কখনো যাবে না মুছে	খন্দকার নুরুল আলম	কাফি	আ: সারে গ ম প ধ নি সাঁ অব: সাঁ নি ধ প ম গ রে সা ^{৭৪}
০২	আর্ষিভাব	১৯৬৮	কাছে এসো যদি বল	সত্য সাহা	ভৈরবী	আ: সা রে গ ম প ধ নি সাঁ অব: সাঁ নি ধ প ম গ রে সা ^{৭৫}
০৩	আর্ষিভাব	১৯৬৮	আমি নিজের মনে নিজেই	সত্যসাহা	দরবারী	আ: নিসা , রেগ , রেসা, মপ, ধনিসাঁ অব: সাঁ, ধ, নিপ, মপ, গমরে, সা ^{৭৬}
০৪	আর্ষিভাব	১৯৬৮	তুমি কখন এসে দাঁড়িয়ে আছ	সত্যসাহা	কল্যাণ	আ: নি রে গ ম ধ নি সাঁ অব: সাঁ নি ধ প ম গ রে সা ^{৭৭}
০৫	মনের মত বউ	১৯৬৯	একি সোনার আলোয়	খান আতাউর রহমান	ছায়াট	আ: সা, রে গ ম প, নি ধ সাঁ অব: সানি ধপ, মপধপ, গমরেসা ^{৭৮}
০৬	নীল আকাশের নীচে	১৯৬৯	নীল আকাশের নীচে আমি রাস্তা চলেছি একা	সত্য সাহা	ভৈরবী	আ: সা রে গ ম প ধ নি সাঁ অব: সাঁ নি ধ প ম গ রে সা ^{৭৯}
০৭	ময়নামতি	১৯৬৯	পিঞ্জর খুলে দিয়েছি	খান আতাউর রহমান	দরবারী	আ: নিসা , রেগ , রেসা, মপ, ধনিসাঁ অব: সাঁ, ধ, নিপ, মপ, গমরে, সা ^{৮০}
০৮	দর্পচূর্ণ	১৯৭০	তুমি যে আমার কবিতা	সুবল দাস	ইমনকল্যাণ	আ: সারেগ, মপমগ, মপধনিসাঁ অব: সানিধপ, মগমগরে, নিরেসা ^{৮১}
০৯	যে আগুনে পুড়ি	১৯৭০	চোখ যে মনের কথা বলে	খন্দকার নুরুল আলম	ইমনকল্যাণ	আ: সারেগ, মপমগ, মপধনিসাঁ অব: সানিধপ, মগমগরে, নিরেসা ^{৮২}
১০	নাচের পুতুল	১৯৭১	আয়নাতে ঐ মুখ দেখবে যখন	রবিন ঘোষ	দরবারী	আ: নিসা , রেগ , রেসা, মপ, ধনিসাঁ অব: সাঁ ধ, নিপ, মপ, গমরে, সা ^{৮৩}
১১	ময়নামতি	১৯৭১	অনেক সাধের ময়না	খান আতাউর রহমান	পটদীপ	আ: নি সা গ ম প নি সাঁ অব: সাঁ নি ধ প ম গ রে সা ^{৮৪}
১২	অবুঝমন	১৯৭২	গুধু গান গেয়ে পরিচয়	শহিদ আলতাফ মাহমুদ	ইমন	আ: নিরে গম ধনি সাঁ অব: সাঁ নি ধপ ম গ রে সা ^{৮৫}
১৩	দুই পুরুষ	১৯৭৮	আমি সুখী কত সুখী কেউ জানেনা	অধীর বাগচী	কাফি	আ: সারে গ ম প ধ নি সাঁ অব: সাঁ নি ধ প ম গ রে সা ^{৮৬}
১৪	ওয়াদা	১৯৭৯	যদি বউ সাজো গো	সুবলদাস	দরবারী	আ: নিসা , রেগ , রেসা, মপ, ধনিসাঁ অব: সাঁ ধ, নিপ, মপ, গমরে, সা ^{৮৭}
১৫	জীবন নৌকা	১৯৮১	তুমিতো এখন আমারই কথা ভাবছো	আলম খান	কাফি	আ: সারে গ ম প ধ নি সাঁ অব: সাঁ নি ধ প ম গ রে সা ^{৮৮}
১৬	নয়নের আলো	১৯৮৪	আমার বুকের মধ্যে খানে	আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল	ভৈরবী	আ: সা রে গ ম, প ধ নি সাঁ অব: সাঁ নি ধপ ম, গ রে সা ^{৮৯}

ক্র.নং	ছবির নাম	প্রকাশ সাল	গানের প্রথম কলি	সুরকার	রাগের নাম	রাগের আরোহণ-অবরোহণ
১৭	শুভদা	১৯৮৬	এত সুখ সহিব কেমন করে	খন্দকার নুরুল আলম	ভীমপলাসী	আ: সা গ ম প নি সা অব: সা নি ধ প ম গ রে সা ২৫
১৮	অগ্নি-পরীক্ষা	১৯৫৫	কে তুমি আমারে ডাকো	অনুপম ঘটক	ইমনকল্যাণ	আ: সারেগ, মপমগ, মপধনিসাঁ অব: সানিধপ, মগমগরে, নিরেসা ^{২৬}
১৯	পথে হল দেবী	১৯৫৭	কিছুক্ষণ আরো না হয় রহিতে কাছে	রবীন চ্যাটার্জি	ইমনকল্যাণ	আ: সারেগ, মপমগ, মপধনিসাঁ অব: সানিধপ, মগমগরে, নিরেসা ^{২৭}
২০	দেয়া নেয়া	১৯৬৩	আমি চেয়ে চেয়ে দেখি সারাদিন	শ্যামল মিত্র	হামীর	আ: সা, রেসা, গম ^{২৮} ধ, নি ধ সা অব: সানিধপ, মপধপ, গমরেসা ^{২৯}
২১	আনন্দ আশ্রম	১৯৭৭	আমার স্বপ্ন তুমি	শ্যামল মিত্র	খামাজ	আ: সা গ ম প ধ নি সা অব: সা নি ধ প ম গ রে সা ^{৩০}
২২	সুজাতা	১৯৮০	কত না মানুষ জন্মলয়	নচিকেতা ঘোষ	ভৈরবী	আ: সা রে গ ম প ধ নি সা অব: সা নি ধ প ম গ রে সা ^{৩১}
২৩	বৈজু বাওরা	১৯৫২	মোহে ভুল গয়ে সাবরিয়া	নওশাদ	ভৈরব	আ: সা রে, গ ম, প ধ, নি সা অব: সা নি ধ প ম গ রে সা ^{৩২}
২৪	বনক বনক পায়েল বাজে	১৯৫৫	বনক বনক পায়েল বাজে	বসন্ত দেসাজি	আড়ানা	আ: সা রে ম প ধ নি সা অব: সা ধ নি প, মপগমরেসা ^{৩৩}
২৫	মুঘলে আজম	১৯৬০	মোহরুত কি বুটি কাহানী পে রোয়া	নওশাদ	দরবারী কানাড়া	আ: নি সা, রেগ, রেসা, মপ, ধ নি সা অব: সা, ধ, নিপ, মপ, গমরে, সা ^{৩৪}
২৬	মুঘলে আজম	১৯৬০	মোহে পনঘট পে নন্দলাল ছেড় গয়া রে	নওশাদ	গারা	আ: সা, ধ নি গ, রেগরে, গমপ, ধনিসাঁ অব: সা নি, ধ নি প, মগ, রেগ রে সা সা, রে নিসা, ধ নিগ, মপগমরেগরেসা ^{৩৫}
২৭	দিল হি তো হ্যায়	১৯৬৩	লাগা চুনি মে দাগ	রোশনলাল নাছাথ	ভৈরবী	আ: সা রে গ ম প ধ নি সা অব: সা নি ধ প ম গ রে সা ^{৩৬}
২৮	সিলসিলা	১৯৮১	দেখা এক খাব তো ইয়ে সিলসিলে ছুয়ে	শিব-হরী	শুদ্ধকল্যাণ	আ: সা 'রে গপ ধ সা অব: সা 'নি ধ প 'গ পরে সা ^{৩৭}
২৯	এক দুজে কে লিয়ে	১৯৮১	সোলা বরস কি বালী উমরো কো সালাম	লক্ষীকান্ত পেয়ারে লাল	আহির ভৈরব	আ: সা রে গ ম, প ধ নি সা অব: সা নি ধ প, ম, গ রে সা ^{৩৮}
৩০	দিওয়ানা	১৯৯২	তেরি উম্মীদ তেরা ইন্তেজার করতে হ্যায়	নাদীম শ্রাবণ	চারুকেশী	আ: সারে গ ম প ধ নি সা অব: সানি ধপ, মগরেসা, ধ নিসা ^{৩৯}

গীতে ব্যবহৃত রাগ বিশ্লেষণ

ভূমিকাঃ বিশ্বের ইতিহাসে চলচ্চিত্রের জন্মকাল থেকেই সংগীতের ব্যবহার হয়ে আসছে যা আজ চলচ্চিত্রের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। চলচ্চিত্রের উন্মূলগ্ন থেকেই আবহসংগীত (Background music), মূলসংগীত যা বারবার গাওয়া হয় (theme song), সুরসংকেত (signature tune) এবং গীতসমূহ মূলত রাগসংগীতের আধারেই রচিত হত। কেননা

চলচ্চিত্রের গানে কখনো প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনো পরোক্ষভাবে রাগসংগীতের ব্যবহার হয়ে থাকে। গীতি কবিতার ভাব, চলচ্চিত্রের বিষয়, শ্লোগান ও মেসেজ এবং গীতসমূহের ভাবানুযায়ী রাগ নির্বাচিত করে সকল সংগীত রচিত। এ সকল সুর ও সংগতি বিশেষ করে Melodic form-এ রচিত হওয়ায় সকল রচনার (Composition) সংগতির ভাবসমূহ বিশেষ করে রাগাশ্রয়ী হলেই ভাব ও রসনিষ্পত্তির পূর্ণতা ঘটে এবং তা কালজয়ী রচনার স্থান পায়। কারণ, কাহিনির পাশাপাশি যথাযথ সংগীতের ব্যবহার চলচ্চিত্রের গুণগত মান ও ব্যবসায়িক সফলতার মূল ভিত্তি। তবে আপেক্ষিক তত্ত্বের ওপরে রাগের ভাব, রূপ ও রস নির্ভর করে। রাগে ব্যবহৃত স্বরসমূহের ছন্দ-সংগতির ওপরেই করুণ রাগও শৃঙ্গার রসাত্মক এবং শৃঙ্গার রসাত্মক রাগও করুণ রসাত্মক রূপে পরিবর্তিত হতে পারে। নিম্নে গীতে ব্যবহৃত কিছু রাগের সংগতি বিশ্লেষণ করা হলো—

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের গান

- আমার বাছাইকৃত প্রথম এই গানটি বাংলাদেশী চলচ্চিত্র “অবুঝ মন” ছবি থেকে নেয়া এবং গানের বাণীর সাথে সুর ও স্বরবিন্যাস হতে স্পষ্টত প্রমাণ হয় যে, এটি একটি রোমান্টিক Sequence এর গান। যেহেতু রাগ ইমন ধীর, শান্ত প্রকৃতির ও এর সুর ভক্তিরস সমৃদ্ধ সেহেতু রাগ ইমনের সুর ও স্বরবিন্যাসে রোমান্টিসিজম্ তথা প্রেমময়তার আবেশ তৈরি হয়, যার কারণে এটি শৃঙ্গার রসের অভিব্যক্তি আনয়নে সহায়তা করে। তাই এই গানটিতে রাগ ইমনের সুরারোপন যথার্থ।

ক) রাগ-ইমন

আরোহণ- নি রে গ ম ধ নি সাঁ

অবরোহণ- সাঁ নি ধ প ম গ রে সা

গান- শুধু গান গেয়ে পরিচয়

এই গানটির স্থায়ী ৬টি অংশে বা সংগতিতে বিভক্ত করা যায়, যার প্রতিটি অংশই কল্যাণ রাগের সম্বাদিক সংগতিতে রচিত। যেমন- অংশগুলো হল—

স্থায়ীর সংগতিসমূহ

১। শুধু গান গেয়ে- ম ম প ম ধ প গ রে সা

২। পরিচয়- রে রে গ

৩। চলার পথে- গ ম প গ ম গ, ম- গ রে

৪। ক্ষণিক দেখা- রে, গ ম রে গ রে সা

৫। একি শুধু- ধ প নি ধ প গ

৬। অভিনয়- সা রে নি।

এ সকল সংগতিসমূহ কল্যাণবাচক, যা ইমন রাগের অন্তর্গত।

অন্তরার সংগতিসমূহ

- ১। এই অবুঝ মনে- নি সাঁ নি প ম ম
- ২। কে যে ক্ষণে ক্ষণে- প ধ ম প ম গ গ
- ৩। চুপি চুপি- গ প ম প
- ৪। দোলা দেয়- ধ সাঁ নি ধ ধ প
- ৫। ওগো জোছনা- ধ নি গিঁ রেঁ রেঁ নি ধ
- ৬। তুমি বলোনা- নি রেঁ নি রেঁ নি ধ প
- ৭। কেন যে- গ ধ ম
- ৮। উতলা- রে প গ
- ৯। এ হৃদয়- রে সাঁ সারে গিঁ

অন্তরার প্রথম পংক্তির চারটি অংশে কল্যাণবাচক সংগতিসমূহ স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। তবে ব্রিজ লাইনে দুটি দ্বিতীয় সম্বাদিক সংগতির পরপরই ইমনের সংগতি দিয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে। কারণ রাগ ইমন একটি সম্পূর্ণ সম্বাদিক রাগ। যেমন- গ ধ ম- কেন যে,

রে প গ- উতলা,

সা রে নি- এ হৃদয়

এর পরবর্তী অন্তরা- “জানি সাঁবের বেলা ... চলার কাহিনি লেখা রয়”।

এই পুরো অংশটুকুই প্রথম অন্তরার সুরেই রচিত।

- পরবর্তী এই গানটি “দর্পচূর্ণ” ছবি থেকে নেয়া। ‘দর্প’ অর্থ অহংকার ও ‘চূর্ণ’ শব্দের অর্থ ভঙ্গ। ছবিটির নামাংকরণ, গানের বাণী ও কাহিনির প্রাসঙ্গিকতায় প্রতীয়মান হয় যে এটি একটি Sad mood এর রোমান্টিক গান। গানটির সুরারোপ করা হয়েছে রাগ ইমনকল্যাণের আধারে। শুদ্ধ মধ্যম ব্যতীত অবশিষ্ট সকল নিয়ম রাগ ইমন এর মতই। তাই গল্প অনুসারে এই রাগের ব্যবহার যথাযথ।

খ) রাগ- ইমনকল্যাণ

আরোহণ : সা রে গ ম প ধ নি সাঁ

অবরোহণ : সাঁ নি ধ প ম গ রে গ ম গ রে সা

গান- তুমি যে আমার কবিতা

এই গানটির স্বর ও সংগতির বিশ্লেষণে রাগ ইমনকল্যাণের পূর্ণরূপ পাওয়া যায়।

এই গানটির স্থায়ী ৬টি অংশের স্বরবিশ্লেষণ নিম্নরূপ-

১। তুমি যে আমার- সা রে গ প প ম^১গ

২। কবিতা- গ ম গ

৩। আমার বাঁশীর - গ ম^১ প নি নি ধ

৪। রাগিনী- প ম^১ প

৫। আমার স্বপন- গ প সা সা ঙ্গ^১নি s নি ধ

৬। আধো জাগরণ- ধ ধপ প পম^১ম

৭। চিরদিন তোমারে চিনি- গ ম^১ প ম^১ গ গরে রে রেসা সা

স্থায়ী এ সকল সংগতিসমূহ পূর্ণরূপে কল্যাণবাচক।

অন্তরার সংগতিসমূহ

১। আমি যে তোমার - প ম^১ ধ প নি s নিধ

২। যদি জানতে-ধ নি সা নি সা

৩। তবে কি আমায় - ধ নি সা রে রে s রে সা

৪। কাছে টানতে- সাগ^১রে সা নি সা s s s

৫। হয়ত সুদূরে-নি নি নি নিধ^১ধনি রেসা^১নি s

৬। যেতে গো সরে- ধ ধপ প পম^১ম

৭। না না নয়নের - ম^১ প নি s নি নিধ

৮। নীলে-ধনি সা নি নিধ

৯। তুমি যে ছিলে - ধ ধপ প পম^১ম

১০। চিরদিন তোমারে চিনি- গ ম^১ প ম^১ গ গরে রে রেসা সা

গানটির পরবর্তী অংশ অন্তরার পূর্ববচ।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র থেকে নেয়া সর্বশেষ এই গানটি “মনের মত বউ” ছবির, যেখানে দৃশ্যত এটি একটি প্রেমের গান। এই গানটি অনেকাংশেই ছবিটির ‘Title song’ এর মত। ‘ছায়ানট’ কল্যাণ অঙ্গের শান্ত প্রকৃতির রাগ বিধায় এই গানটির সুর আরোপ সঠিক রাগেই করা হয়েছে।

গ) রাগ- ছায়ানট

আরোহণ- সা, রে গ ম প, নি ধ সা

অবরোহণ- সা নিধ প, ম প ধ প, গ ম রে সা

গান- একি সোনার আলোয় জীবন ভরিয়ে দিলে।

এই গানটি কল্যাণ অঙ্গের সংগতিতে সুরারোপিত হয়েছে। স্বর-সংগতি সমূহের বিশ্লেষণে দেখা যায়, কিছু প্রাচীন কল্যাণ (শুদ্ধ মধ্যম যুক্ত) এর স্বরূপ পরিলক্ষিত হয়। প্রচলিত কল্যাণে আরোহণ-অবরোহণ উভয় ক্রমেই তীব্র মধ্যম এবং অবরোহক্রমে শুদ্ধ মধ্যম গান্ধারের সাথে ব্যবহৃত হয়। এই গানটিতে শুদ্ধ মধ্যমের আধিক্য রয়েছে, যা ছায়ানটের স্বরূপ এবং তীব্র মধ্যমের ব্যবহারও ছায়ানটের মত। তবে ছায়ানটে শুদ্ধ মধ্যম মুক্ত রূপে ব্যবহৃত হয়। যে কারণে গানটিকে ছায়ানট রাগের আধারে সুরারোপিত মানা উচিত বলে আমি মনে করি।

ছায়ীর সংগতিসমূহ

- ১। একি সোনার আলোয় জীবন ভরিয়ে দিলে- সা রে গ গম^১প ম ম s গ ম s গ^২ম গরে^৩গ s গ s
- ২। ওগো বন্ধু কাছে থেকে, কাছে থেকে- সা নি রে s রে s রে রেগ রেসা রেগ^৪গ রে, পগ^৫পগ রেসা সা s s
- ৩। রিক্ত আমার ক্ষুদ্র প্রাণে-সা s সা নি সা s সা s সা নিসা^৬গরে^৭গরে^৮সানি^৯s s s s s
- ৪। তোমার আঁখিটি রেখো- প, ধনি^{১০}সানিসা^{১১}নি, ধপ প পম^{১২}প গ

ছায়ীর রাগ বিশ্লেষণ

“একি সোনার আলোয় জীবন ভরিয়ে দিলে”-এই পঙ্ক্তিটুকু রাগ ছায়ানটের। “ওগো বন্ধু”-কল্যাণবাচক এবং “কাছে থেকে, কাছে থেকে”-এটিও কল্যাণবাচক। ছায়ানট যেহেতু কল্যাণ অঙ্গের, সেহেতু রাগ নট এর সাথে কল্যাণের আভাস মিশ্রণে রাগ ছায়ানট পরিলক্ষিত হয়। “রিক্ত আমার ক্ষুদ্র প্রাণে...তোমার আঁখিটি রেখো” -এই পর্যন্ত সকল সংগতিসমূহ কল্যাণবাচক যা রাগ ছায়ানটেও ব্যবহৃত হয়।

প্রথম অন্তরার সংগতিসমূহ

- ১। আমি দিয়েছি আমার- সা নি ধপ^১ধ পম^২ম ম s
- ২। হৃদয় লুটিয়ে- গ ম s, গ ম গ রে

- ৩। তোমার প্রেমের জন্য- রে ধ s, ধনি সানিসাঁ নি, ধ প প
- ৪। তুমি দু'হাত বাড়িয়ে- সাঁ নি ধপ ধ প ম ম s
- ৫। বুকেতে জড়িয়ে- গ ম ম গ পম গরে
- ৬। করেছে আমায় ধন্য- রে ধ s ধনি সানিসাঁ নি ধ প প
- ৭। বুকের পাঁজরে- প, নিসাঁ রেঁ রেঁ s s
- ৮। তেমনি লুকিয়ে রেখো- রেঁ s রেঁগঁ রেঁগঁ মঁ গঁরেঁ গঁ রেঁসাঁ সাঁ s s s
- ৯। এমনি আমায়- সাঁ s সাঁ নি সাঁ সাঁ
- ১০। প্রাণের বাঁধনে- সাঁ s সাঁ নিসাঁ গঁরেঁ গঁরেঁ সানিসাঁ s s s s
- ১১। সোনার খাঁচাতে রেখো- প, ধনি সানিসাঁ নি ধ প পম ধপ গ

আমি দিয়েছি আমার...সোনার খাঁচাতে রেখো- এই পুরো অন্তরাটুকুই কল্যাণ ও ছায়ানট-এর সুরেই রচিত। [স্বরলিপি দ্রষ্টব্য]

সম্বন্ধীর সংগতিসমূহ

- ১। জীবন হবে যে- সা সাগ রেগঁ গ গ গ
- ২। এত সুন্দর- গ গ, গরে মগ রেসা নি
- ৩। কখনো ভাবিনি আগে- নি নি নি সা গরে গরেসা সা s সা s
- ৪। এত সুখ আর- সা, সাগ রেগঁ গ s গ
- ৫। এত আনন্দ- গ গ গম গরে মগ রেসানি
- ৬। স্বপ্নের মত লাগে- নি নি নি সা গরে গরেসা সা s সা s

সম্বন্ধীর সবটুকুও কল্যাণবাচক সংগতিতে রচিত।

“ওগো যদি কোনদিন...জ্বালিয়ে রেখো”— দ্বিতীয় অন্তরার এই সব ক’টি পঙ্ক্তি পূর্বের অন্তরার ন্যায় এই সুরে সুরারোপিত।

ভারতীয় বাংলা চলচ্চিত্রের গান

- “আনন্দ আশ্রম” ছবির কাহিনি ও চিত্রনাট্য অনুসারে এই গানটির বাণী তথা সুর সমন্বয় এটাই প্রমাণ করে এটিও Sequence অনুযায়ী রোমান্টিক ও বিরহ ভাবপূর্ণ একটি গান। গানটির অধিকাংশই রাগ খাম্বাজে রচনা করা হয়েছে। কারণ হালকা অঙ্গের আবেদনময়ী কোনো গানে

মিলন ও বিরহের সুরকে রাগ খাম্বাজের বৈশিষ্ট্যে রচনা করাই শ্রেয়। কেননা রাগ খাম্বাজ রোমান্টিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শৃঙ্গার রসাত্মক একটি রাগ।

ঘ) রাগ- খাম্বাজ

আরোহণ- সা গ ম প ধ নি সাঁ

অবরোহণ- সাঁ নি ধ প ম গ রে সা

গান- আমার স্বপ্ন তুমি ওগো চিরদিনের সাথী

এই গানটির কাঠামো খাম্বাজ রাগের হলেও বাণী, ধাপ ও রসনিষ্পত্তি এবং বৈচিত্র্য সৃষ্টির নিমিত্তে সুরকার গীতের কোনো কোনো অংশে মূল রাগ ছেড়ে অন্য রাগের স্বর বা সংগতি প্রয়োগ করেছেন। এই ধরনের সুরারোপ নির্মাণে প্রায়শই সুরকারদের স্বরের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহারের রূপ দেখতে পাওয়া যায়। এই গানটির অন্তরার ব্রিজ লাইনেও এ ধরনের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংগতি দেখা যায়। যেমন— এই গানে রাগ খাম্বাজ এর সাথে ইমন রাগের স্বর-সংগতি প্রয়োগ করা হয়েছে।

স্থায়ী স্বর বিশ্লেষণ

১। আমার স্বপ্ন তুমি- সা গ স গ ম প ম গ স

২। ওগো চিরদিনের- গ, মগ রে, রে রে নি নি নি ধ

৩। সাথী- নিগ রে সা সা

৪। তুমি সূর্য ওঠা ভোর আমার- প নি নি স নি নি নি ধ, নি সাঁ নি সাঁ

৫। আর তারায় ভরা- সাঁরে সাঁ নি নি ধ পধ পম ধ

৬। রাত্তি- ধ প প স স

-এই অংশটুকু পুরোপুরি খাম্বাজ এর চলনে সুরারোপিত।

প্রথম অন্তরার সংগতিসমূহ

- ১। আমি তোমার ছায়া- নি নি ধ পধ পম ধ ধ প প স স স
- ২। তোমার আকাশ নীলে আমি- প প নি^৭ নি নি ধ নি নি সাঁ সানি সাঁ সাঁ
- ৩। শিখ মেঘের ময়া- গ গ ম, প ধসাঁ নিসাঁ নি স নি নিধ ধ প
- ৪। তোমায় কাছে পেয়ে- নি নি ধ পধ পম ধ, ধ প প স স স
- ৫। পৃথিবীতে কে আর সুখী- প প নি^৭ নি নি ধ, নি নি সাঁ সানি সাঁ সাঁ
- ৬। বলো আমার চেয়ে- গ গ ম, প ধসাঁ নিসাঁ নি স নি নিধ ধ প
- ৭। হাতের আড়াল দিয়ে বাঁচাও- সাঁগঁ র়েঁ গঁ গঁর়েঁ সানি সাঁ, নি সাঁ র়েঁ^৭ নি ধ স
- ৮। ঝড়ের মুখে বাতি- মঁ স মঁ, মনি ধ নিধ পমঁ প স গ প সা

অন্তরার ব্রিজ লাইনে সুরকার গানটির স্থায়ীর সাথে বৈচিত্র্যপূর্ণ সংযোগ স্থাপনের জন্য অপ্রচলিত “চম্পাকলি” রাগের অবরোহণের স্বরূপ ব্যবহার করেছেন। যেমন: “বাঁচাও ঝড়ের মুখে বাতি”- এই অংশে চম্পাকলি রাগের অবরোহণের স্বরূপ ব্যবহার করেছেন। রাগ “চম্পাকলি” চম্পাকলি ঠাটের অন্তর্গত। এর আরোহণ-অবরোহণ নিম্নরূপ:

আরোহণ : সা গ ম প নি সাঁ

অবরোহণ : সাঁ নি ধ প মঁ গ রে সা

দ্বিতীয় অন্তরার সংগতিসমূহ

- ১। তুমি ছেড়ো না হাত পথে- গ প সাঁ নি প পধ ম গ প স প স
- ২। যদি আধার আসে নেমে- গ ম ধ ধ ধ ধনি র়েঁ^৭নি স ধ স স স
- ৩। গ্রহণ যত করো আমায়- নি নি সাঁ ধনি প গ প প সাঁ সানি র়েঁসাঁ নি
- ৪। ততই বাধো প্রেমে- নি নি ধ পধ^৭ম ধ ধ প প স স স
- ৫। পাশেই আমার থাকো- নি নি ধ পধ^৭ম ধ ধ প প স স স
- ৬। জীবন টাকে শান্তি দিয়ে- প প নি নি নি ধ নি স সাঁ নি সাঁ সাঁ
- ৭। সবুজ করে রাখো- গ গ ম প ধসাঁ নিসাঁ নি স নি নিধ ধপ
- ৮। তোমার পূজার দুঃখ সুঃখের- সাঁগঁ র়েঁ গঁর়েঁ সানি সাঁ স নি সাঁ র়েঁ^৭নি ধ স স
- ৯। প্রেমের মালা গাঁথি- মঁ মঁ স মনি ধ নিধ পমঁ প স গ প সা

এই অন্তরার ব্রিজ লাইনের এই অংশ অর্থ্যাৎ “তুমি ছেড়ো না...দুঃখ সুখের” পর্যন্ত খাম্বাজ রাগের সংগতি এবং “প্রেমের মালা গাঁথি”-এই অংশে মঁ মঁ মঁ মনি ধ নিধ পমঁ প স গ প সা -এই অংশটুকু কল্যাণবাচক সংগতির প্রয়োগে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

- ভারতীয় চলচ্চিত্র “দেয়া নেয়া” ছবির এই গানটি সরাসরি রাগ হামীরের আধারে রচনা করা হয়নি, শুধু রাগ হামীরের স্বর ব্যবহার হয়েছে মাত্র। এটি একটি বীর রসাত্মক রাগ হওয়া সত্ত্বেও গানটি যেহেতু Sequence অনুযায়ী রোমান্টিক ভাব সম্বলিত, সেহেতু একে শুধুমাত্র রাগ হামীরের স্বর সমন্বয়ে রচনা করা যথোচিত।

ঙ) রাগ হামীর

আরোহণ- সা রে সা, গ ম ^{শি}ধ নি সঁ

অবরোহণ- সঁ নি ধ প, ম^১ প ধ প, গ ম রে সা

গান- আমি চেয়ে চেয়ে দেখি সারাদিন

স্বর ব্যবহারে রাগ-রূপ প্রতিষ্ঠিত হয় না, প্রতিষ্ঠিত হয় সংগতি ও রাগাঙ্গের ব্যবহারে। আধুনিক বা Contemporary রচনাসমূহ সাধারণত: রাগবাচক সংগতিতে রচিত হয়ে ওঠেনা। বাণী ও ভাবের রসনিষ্পত্তিতে রাগবাচক সংগতিতে সুরারোপ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনা। আমরা জানি সুর রচনার দুটি প্রকার রয়েছে- একটি ছন্দোবদ্ধ ও অপরটি গায়কী। সংগীতের সকল ক্ষেত্রেই এই নিয়ম দেখা যায়। এ গানটি ছন্দোবদ্ধ হওয়ার কারণে হামীরের স্বর-সমূহ ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু রাগাঙ্গ রূপ নয়।

স্থায়ী সংগতিসমূহ

১। আমি চেয়ে চেয়ে- সাগ^১ পপ^১ পপ^১

২। দেখি সারাদিন- পধ^১ পম^১ প স প

৩। আজ ঐ চোখে- গম^১ ধ ধধ^১

৪। সাগরের নীল- ধসঁ^১ নিসঁ^১ ধ স ধ

৫। আমি তাই কি- ধধ^১ ধ প স

৬। গান গাই কি- পপ^১ প ম স

৭। বুঝি মনে মনে হয়ে গেল মিল- মম^১ নিনি^১ নিনি^১ নিনি^১ পম^১ গ

অন্তরার সংগতিসমূহ

- ১। কবরীতে ঐ- প ধনি সাঁ ধম্
- ২। ঝরো ঝরো- মম মম
- ৩। কণকচাঁপা- মরেঁ রেঁসাঁ রেঁ s s s
- ৪। না বলা কথায়- নিনি নি নিধ
- ৫। থর থর অধর কাঁপা- ধধ ধধ গম পম প
- ৬। তাই কি আকাশ- সাসাঁ নি নি নিম
- ৭। হল আজ- ধধ প
- ৮। আলোয় আলোয় ঝিলমিল- গপ ম রেম গ নি নি সা

সম্ভারীর সংগতিসমূহ

- ১। এই যেনো নয়গো প্রথম- সাগ গগ রেঁরে সাঁসা ধ
- ২। তোমায় যে কত দেখেছি- রেঁরে রেঁরে রেঁরে রে গ ম
- ৩। স্বপ্নেরও তুলি দিয়ে তাই- ধ ধধ ধধ ধনি ধ s s
- ৪। তোমার সে ছবি ঐঁকেছি- মপ গ মরে গরে প s s

“মৌমাছি আজ গুনগুন...আমার রিনিকিনি” পর্যন্ত এই শেষ অন্তরার চরণগুলি পূর্ববর্তী প্রথম অন্তরার সুরেই রচিত।

সম্পূর্ণ গানটিই রাগ হামীর-এর স্বর ব্যবহারে রচিত। তবে অন্তরা ও সম্ভারীতে যথাক্রমে কোমল রেঁ ও কোমল ধ ব্যবহার করা হয়েছে আধুনিকতার বৈচিত্র্য সৃষ্টির কারণে।

ভারতীয় হিন্দি চলচ্চিত্রের গান

- সর্বশেষ গানটি ভারতীয় বিখ্যাত হিন্দি চলচ্চিত্র “সিলসিলা” থেকে নেয়া। স্বয়ং নাম হতেই পরিষ্কার বোঝা যায় এটি উক্ত ছবির “Title song”, যাকে রাগ শুদ্ধকল্যাণের বৈশিষ্ট্যে রচনা করা হয়েছে। ‘শুদ্ধকল্যাণ’ কল্যাণ অঙ্গের করুণ ও বীর রসাত্মক রাগ। ‘সিলসিলা’ শব্দের অর্থ বারংবার অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহ সাধারণত একই ধরনের জীবনভিত্তিক হয়ে থাকে। সুখ ও দুঃখের অনুভূতি সকলের ক্ষেত্রেই সমান। কিন্তু ঘটনাচক্রে এর উৎস ও সমাধান পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কারণে বদলে যায়।

চ) রাগ শুদ্ধকল্যাণ

আরোহণ- সা, ^৩রে, গপ ধ সা

অবরোহণ- সা ^৩ধ, প ^৩গ, পরে সা

গান- দেখা এক খাব তো ইয়ে সিলসিলে হয়ে

কল্যাণ ঠাঁটের অন্তর্গত রাগ শুদ্ধকল্যাণে এই গান সুরারোপিত হয়েছে। ছন্দোবদ্ধ হলেও গানটিতে রাগবাচক সংগতি ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা জানি, রাগ শুদ্ধকল্যাণ প্রচলিত রাগ ভূপালী'র আরোহণ এবং ইমনের অবরোহণের মিশ্রণ। কৌশলগত ব্যবহারে রাগ শুদ্ধকল্যাণের রূপ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই গানটিতে তাই করা হয়েছে। যেমন- পধনিধপ, পমগ, সাসানিধ- এ সকল সংগতি ব্যবহৃত হয়েছে। তাই ছন্দ ও গায়কীর ভিত্তিতে গানটি শুদ্ধকল্যাণ রাগে সুরারোপিত হয়েছে বলে আমি মনে করি।

স্থায়ীর সংগতিসমূহ

- ১। দেখা এক খাব তো ইয়ে সিলসিলে হয়ে-সারে গরে সাসা ধধ রেরে সাসা ধধ প-
- ২। দূর তক নিগাহো মে হ্যায় গুল খিলে হয়ে-সারে গরে সাসা ধধ রেরে সাসা সা-
- ৩। ইয়ে গিলা হ্যায় আপকী নিগাহো সে-পগ গপ পধ ধপ পধনি ধপ পপ ম গ-
- ৪। ফুল ভি হো দরমিয়া তো ফাসলে হয়ে- গগধ ধপ পম গরে রেগপ গরে রেগ রেসা

প্রথম অন্তরার সংগতিসমূহ

- ১। মেরী সাসো মে বসি খুশবু তেরী-সাঁসা সাঁপ ধ প পপ পগ পপ ধসা ধপ
- ২। ইয়ে তেরে পেয়ার কি হ্যায় জাদুগরী- সাঁসা সাঁপ ধ- পপপ গধ ধ-পপ
- ৩। তেরী আওয়াজ হ্যায় হাওয়াও মে- সাঁসা সাঁপ ধ-প পপ পগ পপ ধসা ধপ
- ৪। পেয়ার কা রংগ হ্যায় ফিজাওমে- সাঁসা সাঁপ ধ-প পপ গধ ধ-পপ
- ৫। ধরকানো মে তেরে গীত হ্যায় মিলে হয়ে- পগ গপ পধ ধধ পপ গসা গরে
- ৬। কেয়া কহ কে শরম সে হ্যায় লব জিলে হয়ে-সারে গরে সাসা ধধ রেরে সাসা সা

দ্বিতীয় অন্তরার সংগতিসমূহ

- ১। মেরা দিল হ্যায় তেরি পনাহো মে-সাঁসা সাঁপ ধ-পপপ পগ পপ ধসাঁ ধপ
- ২। আছুপা লু তুঝে ম্যায় বাহো মে-সাঁসা সাঁপ ধ পপ প গধ ধ-পপ
- ৩। তেরী তসবীর হ্যায় নিগাহো মে-সাঁসা সাঁপ ধ-পপপ পগ পপ ধসাঁ ধপ
- ৪। দূর তক রৌশনী হ্যায় রাহো মে-সাঁসা সাঁপ ধ-পপপ গধ ধপপ
- ৫। কল অগর না রৌশনী কে কাফিলে হয়ে- পগ গপ পধ ধধ পপ গসা গরে
- ৬। পেয়ার কে হাজারো দ্বীপ হ্যায় জলে হয়ে- সারে গরে সাসা নিধধ রেরে সাসা সা

উপসংহার:

চলচ্চিত্র ও রাগসংগীতের ইতিহাস রচনা তথা কতিপয় জনপ্রিয় গান ও রাগের তালিকা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। চলচ্চিত্র যেহেতু সকল শিল্প ও কলার সমন্বয়ের আধার, সেহেতু এর প্রয়োগবিধির গুরুত্ব রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং জাতীয় জীবন চরিতের বাহক। তাই চলচ্চিত্রে শিল্পের প্রতিটি বিষয়ের গুরুত্ব এবং প্রয়োগ কৌশল সুদূর প্রসারী বা দূরদর্শিতা সম্পন্ন হয়ে থাকে, যেখানে দেখা যায় অনেক শিল্পের মাঝে চলচ্চিত্রে সংগীত ও ধ্বনির ব্যবহারের গুরুত্ব অপরিসীম। সংগীত যেমন শুধু মনোরঞ্জনের বিষয় নয়, তেমনি চলচ্চিত্রও শুধুমাত্র মনোরঞ্জনের আধারকৃত কোন শিল্প নয়। নানাধরণ ও বিষয়ের অবক্ষয়মূলক সামাজিক চিত্রের প্রতিফলন ও প্রতিকার চলচ্চিত্রেই প্রকাশ পায়।

চলচ্চিত্র যে প্রকারেরই হোক— বিয়োগাত্মক ও মিলনাত্মক এবং আর্ট ও ডকুমেন্টারি ফিল্ম যা-ই হোক না কেন, সব ধরনের ফিল্মেই সংগীত ও Sound Effect-এর গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা মনে করি না যে, পৃথিবীতে কোন চলচ্চিত্রই সংগীত ও Sound Effect ব্যতীত নির্মিত হয়েছে। যেহেতু চলচ্চিত্র কাহিনি নির্ভর শিল্প সেহেতু চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত Background Music (আবহসংগীত) শুনেই বোঝা যায় যে চলচ্চিত্রটি কোন আঙ্গিকের— রোমান্টিক, ঐতিহাসিক, দেশাত্মবোধক, করুণ, কমেডি নাকি জাগরণমূলক। এক্ষেত্রে সংগীতে ব্যবহৃত Keynote, signature বা Master tune থেকেও ছবিটির কাহিনি কিসের ভিত্তিতে নির্মিত, তা খুব সহজেই বোধগম্য হয় এবং দূর হতে শুনেও মানুষ অনুমেয় করতে পারে যে এই গানটি কোন ছবির। এখানে যেহেতু মূল নিবন্ধের বিষয় ফিল্মি কণ্ঠসংগীত, তাই এ ক্ষেত্রেও দুই ধরনের ফিল্ম প্রচলিত রয়েছে। এক হল Musical film, যার প্রাধান্যতা হল গীতভিত্তিক এবং দুই হল কাহিনিভিত্তিক ঐতিহাসিক ফিল্ম। আর যেহেতু এই নিবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় চলচ্চিত্র নয়, বরং চলচ্চিত্রসংগীতে রাগের ব্যবহার, সেহেতু এই গবেষণায় চলচ্চিত্রের বাছাই করা গানসমূহ সমীক্ষণ করার প্রয়াস করা হয়েছে। প্রতিটি ছবিতেই একটি শ্লোগান বা Message থাকে এবং কোনো কোনো ছবিতে একটি Title Song থাকে, যার মাধ্যমে সম্পূর্ণ ছবির কাহিনি ফুটে ওঠে। আবার ছবিতে যে Sequence বা ক্রম ব্যবহার করা হয়, সে অনুযায়ীও গানের ব্যবহার হয়ে থাকে। তাই এ সকল ক্ষেত্রেই কোন Sequence-এ কোন গান

ব্যবহৃত হবে এবং সেই গানে কোন রাগের ব্যবহার যথার্থ হবে, তাও নির্ধারণ করতে হয় নির্দিষ্ট সেই রাগের প্রকৃতি বা রস অনুযায়ী। আমার আলোচ্য এই গবেষণায় কতিপয় কিছু চলচ্চিত্রের গানে এমন কিছু রাগের ব্যবহার করা হয়েছে, যা নির্ধারিত ঐ চলচ্চিত্রের কাহিনি বিবৃতির লক্ষ্যে সাংগীতিক উৎকর্ষে যথার্থ বলে বিবেচিত হবে। রাগসংগীত নির্ভর নির্বাচিত কোনো ফিল্মের গান আমি আমার এই গবেষণার তালিকায় রাখিনি। শুধুমাত্র প্রচলিত এবং জনপ্রিয় কিছু গান বিশেষ করে বাংলাদেশী চলচ্চিত্রের গান নিয়ে এই গবেষণাটি করা হয়েছে। সেকালের পুরানো বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত গানসমূহে রাগ-সংগীতের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যেত। এপার বাংলার রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমিন, এন্ড্রিকিশোর, মাহমুদুন নবী, সুবীর নন্দী, আব্দুল জব্বার, শাহনাজ রহমতউল্লাহ, নিলুফার ইয়াসমিন এবং ওপার বাংলার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতী মুখোপাধ্যায়, গীতা দত্ত, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, কিশোর কুমার এবং এছাড়াও মহারাষ্ট্রের দুই কিংবদন্তী শিল্পী লতামঙ্গেশকর, আশা ভৌসলে প্রভৃতি বহু গুণী শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত বেশিরভাগ চলচ্চিত্র সংগীতেই রাগের সুস্পষ্ট ব্যবহার পরিলক্ষিত হত।

সাধারণত জনপ্রিয়তার দুটি প্রকার পরিলক্ষিত হয়। এক হল, কাহিনি আধারিত কালজয়ী চলচ্চিত্র এবং দুই হল সংগীত আধারিত কালজয়ী চলচ্চিত্র। সাংগীতিক জনরুচির জরিপে দেখা যায়, যে গানগুলো কালজয়ী হয়ে আছে, সে গানগুলি হয় রাগপ্রধান, নয় রাগাশ্রয়ী অথবা রাগ আধারিত। এই সকল গানগুলি এই নিবন্ধে বিশেষভাবে সমীক্ষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে বিদগ্ধ দর্শক-শ্রোতা এবং শিক্ষার্থী উপলব্ধি করতে পারে যে, যে কোনো সুগমসংগীত তৈরির নিমিত্তেই রাগ সংগীতের প্রয়োগের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কতটুকু। এই গবেষণা পত্রটি বিভিন্ন পর্যায়ে জিজ্ঞাসু মনের অনেক অভাব ও প্রয়োজন মেটাতে বলে আশা করি এবং তখনই এই গবেষণা কার্যটি সফল ও সার্থক বলে প্রতীত হবে।

তথ্যনির্দেশ

১. পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সংগীত ও চলচ্চিত্র', *বাংলা সংগীত মেলা* (কলকাতা: বাংলা সংগীত মেলা পত্রিকা উপসমিতি, ২০০০), পৃ. ২৫৮
২. তদেব, পৃ. ২৫৮
৩. কমলকুমার মজুমদার, 'চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার', *বাংলা সংগীত মেলা* (কলকাতা: বাংলা সংগীত মেলা পত্রিকা উপসমিতি, ১৯৯৮), পৃ. ১২৪।
৪. তদেব, পৃ. ১২৪
৫. পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২
৬. তদেব, পৃ. ২৬২
৭. তদেব, পৃ. ২৬২
৮. তদেব, পৃ. ২৬২
৯. কমলকুমার মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪
১০. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *রাগ ও রূপ প্রথম খণ্ড* (কলকাতা: রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ২০১৬), পৃ. ০১
১১. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *রাগ ও রূপ দ্বিতীয় খণ্ড* (কলকাতা: রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ২০২১), পৃ. ১৫০

১২. তদেব, পৃ. ১৫০
১৩. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, পূর্বোক্ত, পৃ. ০১
১৪. তদেব, পৃ. ০৪
১৫. ড. আলী. এফ. এম. রেজোয়ান, রাগ সন্দর্শন (ঢাকা: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২১), পৃ. ১৩৩
১৬. তদেব, পৃ. ১৩৩
১৭. তদেব, পৃ. ১৩৩
১৮. তদেব, পৃ. ১৩৩
১৯. তদেব, পৃ. ১৩৩
২০. উৎপলা গোস্বামী, ভারতীয় উচ্চাংগ সংগীত দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা: দীপায়ণ, ২০১৫), পৃ. ৩৫।
২১. ড. আলী এফ. এম. রেজোয়ান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪১
২২. তদেব, পৃ. ২৪০
২৩. তদেব, পৃ. ২৪২
২৪. তদেব, পৃ. ২৭৫
২৫. ইন্দুভূষণ রায়, উচ্চাংগ ভারতীয় সংগীত প্রথম খণ্ড (কলকাতা: আদি নাথ ব্রাদার্স, ২০১৬), পৃ. ৯০
২৬. তদেব, পৃ. ৫০
২৭. ড. আলী এফ. এম. রেজোয়ান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫
২৮. ইন্দুভূষণ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯
২৯. ড. আলী এফ. এম. রেজোয়ান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫
৩০. ইন্দুভূষণ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯
৩১. তদেব, পৃ. ২৪৯
৩২. ড. আলী এফ. এম. রেজোয়ান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪০
৩৩. তদেব, পৃ. ২৪১
৩৪. ইন্দুভূষণ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০
৩৫. তদেব, পৃ. ১৫৪
৩৬. ইন্দুভূষণ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯
৩৭. তদেব, পৃ. ৫০
৩৮. ড. আলী এফ. এম. রেজোয়ান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫
৩৯. তদেব, পৃ. ২৪১
৪০. তদেব, পৃ. ২৪১
৪১. ইন্দুভূষণ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯

৪২. তদেব, পৃ. ৪২
৪৩. তদেব, পৃ. ২৫
৪৪. পণ্ডিত রামশ্রয় বা 'রামরংগ', *অভিনব গীতাঞ্জলী* চতুর্থ খণ্ড (এলাহাবাদ: সংগীত সদন প্রকাশন, ২০০০), পৃ. ২৪৯
৪৫. ইন্দুভূষণ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২
৪৬. ইন্দুভূষণ রায়, *উচ্চাংগ ভারতীয় সংগীত* দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা: আদি নাথ ব্রাদার্স, ২০১৬), পৃ. ৩৩৭
৪৭. ড. আলী. এফ. এম. রেজোয়ান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৭
৪৮. তদেব, পৃ. ২৭৫
৪৯. ইন্দুভূষণ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯
৫০. ড. আলী এফ. এম. রেজোয়ান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৯

জমা প্রদানের তারিখ : ২৪.০৮.২০২৩

গ্রহীত হবার তারিখ : ২৬.১১.২০২৩

রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের গানের স্বরূপ সন্ধান

ঝুমুর আহমেদ*

Abstract

Rabindranath Tagore is a sovereign scholar of Bangla music. The uniqueness of his songwriting enriched the stream of Bangla songs. Hindustani classical, Western, and folk music, kirtana (song of praise), and different provincial trends influenced Rabindranath's songs at his younger age. His songs gradually became distinctive by avoiding those influences in the course of the growing maturity of his musical insight. His mature songs fulfilled the listeners' craving for simplicity and depth in place of his earlier songs' complex tunes and insightful lyrics. In this essay, we shall observe the profile of Tagore's songs of his mature age and how his songs have been transformed into an aesthetic form from the emotive state. Ten representative songs have been selected as a sample while doing this research. Through textual analysis and comparative research methodology, this research identified the simultaneous state of his simple and unrheterical creation and the desire for impersonation in the astute Tagore songs.

চাবিশব্দ: রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রসংগীত, পরিণত বয়সের গান, রূপাকুলতা, সারল্য

ভূমিকা

সর্বজনমান্য সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা গানের সার্থক রূপকার, অনন্যসাধারণ আলোকবর্তিকা। তাঁর গীতরচনার প্রাতিদ্বিকতা বাংলা গানের ইতিহাসকে উজ্জ্বল করেছে। শিল্পরসবোদ্ধা হবার কারণে তিনি তাঁর নানান রচনায় শিল্পের নানান বিষয়ের পাশাপাশি নিজের গান প্রসঙ্গেও তথ্য দিয়ে গেছেন। উনিশ শতকের সমসাময়িক সংগীতকারগণের সঙ্গে তাঁর একটা প্রধান ব্যবধান ছিল এই যে, তিনি তাঁর গানকে অবিকল্প রূপ দিয়ে গেছেন, স্বরলিপি দিয়ে চিহ্নিত করে গেছেন। কারণ, নিজের গানের বিকার নিয়ে গভীর সংবেদন এবং উদ্বেগ ছিল তাঁর। রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীমূলক বিবরণ এবং সংগীতচিন্তা-সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ থেকে আমরা জানতে পারি— প্রথম জীবনের গান তিনি ভাব বাংলাবার জন্যে রচনা করেছিলেন, আর পরিণত বয়সের গানে ছিল রূপ দেবার সাধনা। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা দেখব, পরিণত বয়সে রচিত রবীন্দ্রসংগীতের স্বরূপ কী, কেমন করে রবীন্দ্রনাথের সেই রূপ দেবার সাধনা বা রূপাকুলতা সেইসব গানে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তা, গীতবিতান ও স্বরবিতানসমূহ এই গবেষণায় ‘আকর’ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণা-সংশ্লিষ্ট রবীন্দ্রসংগীতের অনন্য স্বরূপ উন্মোচনের ভেতর দিয়ে আমরা দেখব সংগীতকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে স্বকীয় হয়ে উঠেছেন। প্রথম জীবনে সমসাময়িক সাংগীতিক ধারাকে আত্মস্থ করে অর্জিত সুরের জটিলতা, বাণীর গাম্ভীর্যকে কাটিয়ে উঠে পরিণত বয়সে এসে রবীন্দ্রনাথ সহজ ছন্দে বাঁধা সুরের সাবলীলতা, বাণীগত সারল্য ও গভীরতায় তাঁর গানকে ভরিয়ে তুলেছিলেন।

* সহযোগী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

রবীন্দ্রনাথের গানের পরিণতি এক দীর্ঘ শিল্পযাত্রার ফসল। একজন রসাস্বাদনকারী হিসেবে ব্যাপক কাল-পরিসরে সৃষ্ট রবীন্দ্রসংগীতের সৃষ্টির সুমমায় সুস্পষ্ট বিভাজন আমরা লক্ষ্য করি। এই বিভাজনটি মূলত প্রভাবিত ও আত্মীকৃত-স্বকীয় রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এই বিভাজন বাণী ও সুরের নিজস্ব বৈভবে উত্তরণকালের সঙ্গেও সম্পর্কিত। এই গবেষণায় মূলত পরিণত বয়সের গানের বাণীগত বৈশিষ্ট্য, সুরগত অনন্যতা ও ছন্দগত সুমমা যাচাই করা হয়েছে। পরিণত গান বলতে কী বোঝায়, সেই বিবেচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিমতকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, শেষ জীবনের গানের শৈল্পিক ব্যবচ্ছেদই এই গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

গবেষণা-পদ্ধতি

উপরিউক্ত শিরোনামের গবেষণাটি মূলত গুণগত গবেষণা। পাঠবিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং তুলনামূলক পদ্ধতিতে গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সীমার মধ্যে অসীমত্বের ব্যঞ্জনার কথা বলেছেন। তাঁর অসংখ্য পরিণত বয়সের গান থাকলেও এই গবেষণায় রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের গানগুলির মধ্যে দশটি গান বেছে নেয়া হয়েছে। এই সীমিত সংখ্যক গানের মধ্যে ব্যাপকতার ব্যঞ্জনা রয়েছে, এমনসব গান নির্বাচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যে-সকল গান বাণী, সুর ও ছন্দের সম্মিলনে গবেষকের কাছে প্রবল আশ্বাদনযোগ্য, সেই গানসমূহই বিশ্লেষণযোগ্য গান বিবেচিত হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অভিমতকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এই গবেষণায়। বিশেষ করে প্রথম জীবনের গান কী এবং শেষ জীবনের গানই-বা কী তা বিবেচনার যেহেতু সর্বজনমান্য কোনো বিভাজনরেখা টানা সম্ভব নয়, তাই এ ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের অভিমতকেই গ্রাহ্য করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তা থেকে আমরা জানতে পারি, তিনি পরিণত বয়সের রূপাকুল গানের উদাহরণ দিতে গিয়ে ‘কেন বাজাও কাঁকন কনকন ছলভরে’ গানটি নির্দেশ করেছিলেন^১, যা তাঁর ৩৬ বছর^২ বয়সের রচনা। তাঁর ওই বয়সের পূর্ববর্তী কোনো গান বিবেচনায় আনা হয়নি। পরিণত বোধ যদিও কোনো সুনির্দিষ্ট বয়সের ব্যাপার নয়, তবুও পরিণত বয়সের গান নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতার প্রয়োজনে ষাটোর্ধ বয়সের গানকে বেছে নেয়া হয়েছে। বিচার্য গানসমূহের প্রাসঙ্গিক তথ্য ও প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ-পূর্বক সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে এই গবেষণায়।

সাহিত্য পর্যালোচনা ও গবেষণাকর্মের তাৎপর্য

রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন- “প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব-বৎসাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্যে।”^৩ তাঁর প্রথম জীবনের গান ইমোশনাল, পরিণত বয়সের গান ইসথেটিক। নিজের গান রচনা প্রসঙ্গে ভাবতে গিয়ে তাঁর চিন্তার নানান পরিবর্তন হয়েছে এবং তা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পরিণতি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে আলাপচারিতায় জানিয়েছেন, “সারাজীবন ধরে একটা নির্দিষ্ট মতের অনুবর্তন করে চলাটা মনের স্বধর্মের পরিচায়ক নয়। আমার মত যদি বদলেই থাকে তাতে আমি ক্ষোভ করি নে। একটা কথা আমি ভেবে দেখেছি- গানের ক্ষেত্রে, শুধু গানের ক্ষেত্রে কেন, সমস্ত চারুশিল্পের ক্ষেত্রে নতুন সৃষ্টির পথ যদি খোলা নাই রইল

তবে তা কিছুতেই শিল্পের পাণ্ডজ্যে হতে পারে না।”^৪ তাঁর পরিণত বয়সের গান প্রসঙ্গে সংগীতচিন্তায় নানান তথ্য ছড়িয়ে রয়েছে। তবে, তার কোনো বিস্তারিত বিশ্লেষণ নেই। শান্তিদেব ঘোষের ‘রবীন্দ্রসংগীত’ গ্রন্থে গান নিয়ে নানান চিন্তার বিস্তার রয়েছে, কিন্তু পরিণত বয়সের গানকে বিশেষ বিবেচনায় আনা হয়নি। সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত ‘রবীন্দ্রসংগীত চিন্তা’ প্রবন্ধসংকলনে রবীন্দ্রনাথের গান প্রসঙ্গে অনেক তথ্যগত সংবাদ পাওয়া যায়— তাঁর গানের স্বকীয়তা, সাংগীতিক অভিনবত্বের খোঁজ মেলে; পরিণত বয়সের গানকে আলাদা করে গুরুত্ব দিয়ে কোনো রচনা সেখানে অনুপস্থিত। সুভাষ চৌধুরী ও সুচিত্রা মিত্র সম্পাদিত ‘রবীন্দ্রসংগীতায়ন-১’ ও ‘রবীন্দ্রসংগীতায়ন-২’ প্রবন্ধ সংকলনে রবীন্দ্রসংগীতের ভাষা ও রূপ, তাঁর গানে শব্দের ব্যবহার, রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত— এমন নানান প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের গানকে গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ অনুপস্থিত। প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচি’ থেকে পরিণত বয়সের গানের তালিকা রয়েছে, বিশ্লেষণ সেখানে সংগত কারণেই থাকেনি। ড. অপূর্ব বিশ্বাসের ‘ঋতুসংগীতে রবীন্দ্র-কবিমানস’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির গানের বিশ্লেষণ রয়েছে। আলাদা করে পরিণত বয়সের গানকে যাচাই করা হয়নি। শৈলজারঞ্জন মজুমদারের ‘যাত্রাপথের আনন্দগান’ গ্রন্থে স্মৃতিকথার মধ্য রবীন্দ্রনাথের গান প্রসঙ্গে নানান খবর উঠে এসেছে, পরিণত বয়সের গান প্রসঙ্গে কোনো তথ্য সেখানে পাওয়া যায় না। ওয়াহিদুল হকের ‘প্রবন্ধ সংগ্রহ’ গ্রন্থে রবীন্দ্রসংগীতের তাৎপর্য প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংযোজিত হয়েছে, সেখানে রবীন্দ্রগানে পরিণতি প্রসঙ্গে কোনো বিবরণ নেই। সন্জীদা খতুনের ‘রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী, সুর ও ছন্দের বিশ্লেষণ রয়েছে, পরিণত বয়সের গানকে আলাদা করে চিহ্নিত করে বা গুরুত্ব দিয়ে সেখানে আলোচনা করা হয়নি। রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের গানের স্বরূপ ইতঃপূর্বে কোনো গবেষক বা শিল্পরসবোদ্ধা উন্মোচন করে যাননি। ফলে, বিষয় হিসেবে তা অনন্য। অন্তত একটি প্রবন্ধের পরিসরে গবেষণাকর্মটি সম্পাদিত হলে, তার ওপর নির্ভর করে পরবর্তী গবেষকগণ বৃহদাকারে একই বিষয়ে গবেষণা করতে পারবেন। এতে রবীন্দ্রনাথের গানের পরিণত রূপ, রবীন্দ্রসংগীতের বিকাশের ইতিহাসটি আরো সূক্ষ্মভাবে ধরা পড়বে এবং সংগীতগবেষণার ধারায় গুরুত্বপূর্ণ একটি সংযোজন হবে।

২

রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিবেশ তাঁর সংগীতশিক্ষার অনুকূল ছিল। ঠাকুরবাড়িতে হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয়সংগীত শিক্ষার জন্যে গুরু নিযুক্ত থাকতেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলার আত্মকথনের প্রথম বাক্যই এমন ছিল— ‘কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না’।^৫ শিশুকাল থেকে সংগীতগুরু বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে তাঁর গান শেখা শুরু। তাঁর কাছেই তিনি আনমনাভাবে ব্রহ্মসংগীত আউড়িয়েছেন।^৬ এছাড়াও তিনি, যদু ভট্ট, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রমুখ শাস্ত্রীয়সংগীতগুরুদের কাছে শিক্ষা লাভ করেছেন। কিন্তু প্রথাগত সংগীতশিক্ষায় তাঁর মন ছিল না। ‘কুড়িয়ে বাড়িয়ে’^৭, দরোজার ‘আড়ালে আবডালে’^৮ যা শিখেছেন তিনি, তা দিয়েই ঝুলি ভর্তি করেছেন। সেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে নানা সময়ে তিনি গান রচনা ও পিয়ানো চর্চার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন।^৯

শিল্পচর্চার অনুকূল ও সংগীতমুখর পারিবারিক পরিবেশে গান রচনা করতে গিয়ে প্রথম জীবনে শাস্ত্রীয় সংগীতের সুরকে তিনি আশ্রয় করেছিলেন। আর, বাণীর ব্যাপারটি প্রায় নির্ধারিত ছিল— তা

ঈশ্বর উপাসনার অনুকূল বাণী দিয়ে গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রহ্মোপাসনার প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথকে গান লিখতে হতো পরিবারের অন্যান্য সদস্যের মতোই। তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব পেতেন সংগীতকার হিসেবে পিতার কাছে। ‘নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছে নয়নে নয়নে’- গানটি শুনবার পর রবীন্দ্রনাথের পিতা যুবক রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, “দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত, তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই, তখন আমাকেই সে কাজ করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচ-শো টাকার চেক আমার হাতে দিলেন।”^{১০} পারিবারিক পৃষ্ঠপোষকতা তাঁকে বিলেত যাত্রার সুযোগ করে দেয়, যেখান থেকে তিনি পাশ্চাত্য সংগীতের মিশ্র ধারাকে আমাদের বাংলা গানে সংযুক্ত করেছিলেন। পারিবারিক কারণেই জমিদারি দর্শনের সুবাদে তিনি বাংলা লোকজ গানের নানান ধারায় সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেন এবং তাঁর নিজের গানেও তার ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করি। পারিবারিক কারণেই তিনি কীর্তনের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। প্রথম জীবনে এই সকল কিছুর প্রভাবই তাঁর গানে কোনো-না-কোনো ভাবে রয়ে গেছে। বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংগীতকার হিসেবে অভিজ্ঞতার পরিণতির ফলে তাঁর গানে এইসকল ধারার প্রভাব দুর্লক্ষ্য হয়ে পড়ে। পরিণত বয়সের কোনো গানকে আলাদা করে শাস্ত্রীয়, বিদেশি, লোক, কীর্তন, প্রাদেশিক প্রভাবযুক্ত গান হিসেবে আমরা আর পাই না। রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীতে যেমন মিশ্র অনুভূতি সঞ্চারিত থাকে- ঈশ্বরের গানে মানবিক মহিমার সম্পৃক্তি পাওয়া যায়, কিংবা প্রেমের গানে ঐশ্বরিক অনুভূতি উপলব্ধ হয়, তেমনই তাঁর পরিণত বয়সের গানের বাণী ও সুরে নানান ধারায় সূক্ষ্ম সংমিশ্রণ রয়েছে, যার আশ্বাদন স্বকীয় রবীন্দ্রনাথকে চিনিয়ে দেয়, আমাদেরকে অন্যান্য এক বাণী ও সুরের মহিমায় আপ্ত করে।

৩

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানবিশী কালে রচিত ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলির গান, ব্রহ্মসংগীত, শাস্ত্রীয়সংগীত ভাঙা গান, পাশ্চাত্য ভাঙা গানসমূহে কখনো-বা মূল গানের ভাষার ধ্বনিবিন্যাস, ছন্দের ঝাঁক, সুরের মহিমাকে বজায় রেখে চলেছিলেন। তাঁর গীতিনাট্য ‘বাল্মীকিপ্রতিভা’, ‘কালমৃগয়া’ বিদেশি সুরের অনুসরণে সৃষ্ট হলেও এর বিষয় নির্বাচনে পৌরাণিক কাহিনির নির্ভরতা ছিল। সুরের ক্ষেত্রে বিদেশি সংগীতের প্রভাব থাকলেও ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের রাগের ব্যবহার এবং ছন্দের ব্যবহার বিদ্যমান ছিল। পরবর্তী সময়ে যুবক বয়সে রচিত গীতিনাট্য ‘মায়া’র খেয়া’য় ভারতীয় সুরের নানান রকম কারুকার্য ছিল। ছন্দের ক্ষেত্রে ‘মায়া’র খেলা’য় দেখতে পাওয়া যায়- বাণীর ঝাঁক এবং সুরের ঝাঁক একসঙ্গে চলছে না। একধরনের কসরৎ ছিল প্রথম দিকের এমন নিরীক্ষাধর্মী রচনা। নানান আঙ্গিকে গান-রচনার এ নিরীক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। তা আমরা নৃত্যনাট্য ‘শ্যামা’ ও ‘চণ্ডালিকা’র গানের বাণী ও সুরের বিন্যাস লক্ষ্য করলে বুঝতে পারি। শেষ জীবনের এই দুটি রচনা বাণী ও সুরের বিন্যাস অনেক সরল। উল্লেখ্য, ‘চণ্ডালিকা’র পুরোটাই গদ্যে ঢালা। সুরের মহিমায় নিপাট গদ্য কী করে গান হয়ে উঠতে পারে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে ‘চণ্ডালিকা’কে দাঁড় করানো যায়। যেখানে সুরের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ধারার প্রভাব আমরা চিহ্নিত করতে পারি না।

তাঁর প্রথম বয়সের গানে ধ্রুপদের প্রভাব ছিল প্রকট। মূল ধ্রুপদের সুরের আদলে যেমন ভাঙা গান রয়েছে, তেমনই ধ্রুপদকে কেন্দ্র করে ধ্রুপদঙ্গ গানও রয়েছে। শেষ বয়সের গানে বাণীগতভাবে

ধ্রুপদের স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগের চার তুকের বিন্যাস থাকলেও সুরের দিক থেকে ধ্রুপদের গান্ধীর্ষ্য সর্বাংশে বজায় থাকেনি। শেষ বয়সের গানসমূহে পাশ্চাত্য সুরের ব্যবহার নেই বললেই চলে। সুরের ক্ষেত্রে বাউল ও কীর্তনের যুগপৎ ব্যবহার শেষ বয়সের কোনো কোনো গানে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেইসব গানে উচ্ছলতা কম। পরিণত বয়সের অধিকাংশ গানে কোথাও একটা বিষণ্ণতা থেকে যায়।

প্রথম বয়সের গানে দুরূহ ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে— ‘চৌতাল’, ‘আড়াচৌতাল’, ‘ত্রিতাল’, ‘ধামার’, ‘একতাল’, ‘যৎ’, ‘রাঁপতাল’, ‘তেওড়া’ এর মধ্যে অন্যতম। মধ্য বয়স থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত ‘ষষ্ঠী’, ‘অর্ধরাঁপ’, ‘ঝাম্পক’, ‘রূপকড়া’, ‘একাদশী’, ‘নব তাল’, ‘নবপঞ্চ তাল’ ব্যবহার করেছেন সংগীতের মুক্তির প্রয়োজনে। এছাড়া বিভিন্ন ছন্দের মধ্যে দুই-দুই, দুই-চার, চার-দুই, দুই-তিন, তিন-ছয়, নয়মাত্রার টানা ছন্দ, এবং দুই-চার দুই চার ছন্দের ব্যবহার রয়েছে। তাঁর প্রবর্তিত তালের মধ্যে ‘ষষ্ঠী’ তালকে তিনি শেষ বয়স পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন। পরিণত বয়সে তিন-তিন, চার-চার ছন্দের ব্যবহার বেশি। অর্থাৎ, ছন্দগত দিক থেকেও জটিলতাকে এড়িয়ে তিনি সারল্য এনেছিলেন ছন্দ প্রয়োগে— বাণী ও সুরকে নির্ভর করবার প্রয়োজনে।

এবার আমরা পরিণত বয়সের প্রতিনিধিত্বশীল দশটি গান বিশ্লেষণ করব, যার মধ্য উঠে আসবে পরিণত বয়সের গানের বাণী, সুর ও ছন্দের স্বরূপ—

রবীন্দ্রনাথের ৬১ বছর বয়সে রচিত^{১১} গান ‘ভরা থাক স্মৃতি সুধায় বিদায়ের পাত্রখানি’^{১২}। নির্মলকুমারী মহালনবীশ বলেন— আদ্রে কর্পেলস যেদিন শান্তিনিকতন থেকে বিদায় গ্রহণ করেন সেইদিন রচিত হয় এই গানটি।^{১৩} গানটির উপলক্ষ বিদায়ের ব্যাকুলতা— বাণীতে বিরহ, বিষাদ ও সারল্য আমরা দেখতে পাই। এই বিদায়ের সঙ্গে চলে যাওয়া ব্যক্তির পাথেয় হতে পারে রবীন্দ্রনাথের অমোঘ বাক্য— “যে পথে যেতে হবে সে পথে তুমি একা— নয়নে আঁধার রবে, ধ্যানে আলোকরেখা”। বিদায় শুধু বেদনাই নয়, অন্তর্গত ঔজ্জ্বল্যে মহিমাময় হয়ে উঠেছে গানের বাণীতে। এবার গানের স্থায়ী অংশের সুর আমরা লক্ষ্য করি—

I I {-া -া সা। সগা গা -া I -া -া গা। গা গমা -রা I

○ ○ ভ রা○ থা ○ ○ ক্ ভ রা থা○ ○

I (-পা -া -া। -া -া -া I

○ ○ ○ ○ ○ ক্

...

পা। না না -া I

মি ল নে র্

I না ধা -না। না র্সাঁ -না I ধপা -া পা। পর্সা ঙ্গা -া I

উ ○ ৭ স বে○ ○ তা○ য়্ ফি রা○ য়ে ○

I ধা পা -গ পা।^{১৮}মা গা -া II^{১৮}

দি য়ো ০ ০ আ নি ০

উল্লিখিত সুরে আমরা দেখতে পাই ‘ভরা’ শব্দটির সুরে ষড়্জ থেকে ষড়্জ-গান্ধারের সুরের প্রয়োগ রয়েছে, যা শব্দটিকে পূর্ণতা দিয়েছে। ‘থাক’ শব্দটির আট মাত্রা ব্যাপী সুরে বিন্যাস যেন স্মৃতিকে চিরস্থিতি প্রদান করেছে। ‘বিদায়ের পাত্রখানি’র সুরে তীব্র মধ্যমের ব্যবহার এক বেদনাঘন আবহ নিয়ে এসেছে। স্থায়ী অংশের ‘ফিরায়ে’ শব্দটির সুরে কোমল নিষাদ যেন ব্যথাতুর হৃদয়কে বিবৃত করেছে। আমরা জানি, কোনো সুরই রাগবহির্ভূত নয়। সুনির্দিষ্ট কোনো রাগে বাঁধা না হলেও, পরিণত বয়সের গানে বিভিন্ন সুরসংগতি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন। কখনো একটি রাগের সংগতি, কখনো-বা একাধিক রাগের সংগতি রয়েছে তাঁর গানে। ভাবের রসনিষ্পত্তির প্রয়োজনে এমনটি করা হয়েছে বলে মনে করা যায়। আলোচ্য গানটির স্থায়ী অংশে বেহাগের ছায়া; অন্তরা ও আভোগের শেষাংশে ছায়ানট রাগের সংগতি বিদ্যমান।

তিন-তিন ছন্দের সরল বিন্যাসে নিরাভরণ এই গানটি অন্তরা, সঞ্চগরী ও আভোগে তীব্র মধ্যম ও কোমল নিষাদের যৌক্তিক ব্যবহার বিদায়ের লগ্নকে প্রকৃতিগত ভাবে উপস্থাপন করে।

৬২ বছর বয়সে রচিত^{১৭} গান ‘যখন এসেছিলে অন্ধকারে’^{১৮}। এই গানের বাণীতে আমরা লক্ষ করি, পুনরুক্তি দিয়ে গানকে সম্ভাবনার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভিন্নভিন্ন সুরে ‘যখন এসেছিলে’ কথাটি বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। এটি মূলত ভ্রষ্টলগ্নের গান। ‘অজানা’ যাকে বলছেন কবি, তাকেই অনুভবে জেনেছিলেন তিনি, প্রাণে পরশ পেয়েছিলেন সেই অজানার। অথচ, দেখা তার মিলল না, পড়ে রইল পথে কণ্ঠহার। পতিত কোনো মালায়ও প্রত্যাশিত নিবেদন সম্পন্ন হতে পারে, তা রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য এই গানে আমরা জানতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের প্রচলিত বাণীর বিন্যাস থেকে এই গানের বাণী একটু আলাদা হয়ে যায় সুরের বিন্যাসের কারণে। ‘যখন এসেছিলে’ কথাটি যখন দুইমাত্রা ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় মাত্রায় শুরু হয়, তখন আলাদা একটা ঝাঁক তৈরি হয়। ফলে, ‘সিন্ধুপারে’ আসবার খবরটি বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন ‘সিন্ধুপারে’ বুঝি-বা চাঁদ ওঠেনি, এমনটি মনে হয়, যা বাণীর লক্ষ ছিল না। ঝাঁককে বজায় রাখতে গিয়ে, এবং পুনরুক্তির কারণে উদ্ভিষ্টই [যে আসে অন্ধকারে] প্রধান হয়ে ওঠে এই গানে—

II -া -া সা। রা -া। সা -রা I ন্ -া -সা। রা -জ্ঞা। রা -া I

০ ০ য খ ন্ এ ০ সে ০ ০ ছি ০ লে ০

I -রা -পা মা। জ্ঞা -রা। সা -রা I ন্ -সা রা। রা -পা। মজ্ঞা -া I^{১৯}

০ ০ য খ ন্ এ ০ সে ০ ০ ছি ০ লে ০ ০

তিন-দুই-দুই ছন্দের কারণে বাণীর ঝাঁক আর সুরের ছন্দের ঝাঁক যদি একাকার করা যায়, তবেই এই সরল গানটি সার্থকতা পেতে পারে। সচরাচর ঝাঁককে প্রধান্য দেবার প্রবণতা গানের রসকে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে। পরিণত বয়সের এই গানে দারুণ এক প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে যে মানবমহিমা

তা একক নয়, যেন ঈশ্বাভিমুখিতা রয়েছে সেখানে। দেখা পাওয়া যায় না আঁধারের ঘোরে, সেই প্রত্যাশিত জনের, যার ফেলে যাওয়া মালা পরম ধন হয়ে ওঠে মানব-জীবনে। পুরো গান জুড়ে অসংখ্য বার কোমল গান্ধারের ব্যবহার রয়েছে, আর অন্তরায় ও আভোগে একাধিকবার কোমল নিষাদের ব্যবহার রয়েছে— যা বাণীর ব্যাকুলতাকে যথাযথভাবে ধারণ করেছে। পিলু রাগের স্বরসংগতির সঙ্গে এই গানের স্থায়ী ও অন্তরার সুরবিন্যাসের মিল রয়েছে। বাণী ও সুর মিলিয়ে এক অনন্য রূপ লাভ করেছে এই গান। মিড়যুক্ত স্বরের বাইরে সরলভাবে বিন্যস্ত কিছু সুর রয়েছে এই গানে, যেখানে না চাইলেও মিড়ের একটি আবহ চলে এসেছে। যা রবীন্দ্রনাথে শেষ বয়সের অনেক গানেই লক্ষ করা যায়।

৬৩ বছর বয়সে রচিত^{১৮} গান ‘ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার’^{১৯}। রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’ নাটকের বিস্তারিত গাওয়া গান এটি। ঈশ্বরাভিমুখি এক অপার নৈঃসঙ্গ্য ও বেদনা এই গানে জেঁকে বসেছে, যদিও গানটি ‘প্রেম’ পর্যায়ে গান হিসেবে গীতবিতানে চিহ্নিত। এই মিশ্র অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের অধিকাংশ গানেরই বৈশিষ্ট্য। চেনা জগতের এক অচেনা আবহে আমাদেরকে পৌঁছে দেয় ‘রক্তকরবী’র এই গান। এবার গানের সুরটি আমরা লক্ষ করব—

I I সা সা -া -া। -া -া সা রা I গসা -গা সা সা। -গসা -রজ্জা -রা -া I

চো খে ০ ০ ০ র্ জ লের্ লা ০ গ্ ল জো ০০ ০০ যা র্

...

I রা রজ্জা -মজ্জা -রজ্জা। সরা গসা -গা -া I সা গা মা পা। -পধপা -মগা -রগা -মপা I

আ কু ০ ০০ ০ল্ আ ০ লো ০ য়্ দি শা হা রা ০০০ ০০ ০০ ০০

I গা মা -া -া। -া -া -া -া I^{২০}

রা তে ০ ০ ০ ০ ০ ০

এই গানের গ্রহস্বর ষড়্জ হওয়ায় প্রথমেই একটা স্থিরতার বোধ নিয়ে আসে, তারপর ক্রমে টপ্পার দানায় ভর করে গানটি ডানা মেলতে থাকে। স্থায়ী অংশের কোমল নিষাদ, কোমল গান্ধার বাণীর ব্যথার আবহকে নিশ্চিত করে। পুরো গানজুড়ে ঘুরে ফিরে এসেছে এই কোমল নিষাদ আর কোমল গান্ধার। কাফি রাগের স্বরসংগতি রয়েছে এই গানে। গানটি বক্তব্য-নির্ভর, যেন একটি নির্মম ঘটনার বিবরণ দেওয়াই এর লক্ষ্য। অন্তরার দ্বিতীয় চরণ ‘তারে হাওয়ায় হাওয়ার নিয়ে গেল কোন অচেনার ধারে’, আভোগের দ্বিতীয় চরণ ‘দিক ভোলাবার পাগল আমার হাসে

অন্ধকারে' সুরের বিন্যাসে দুমড়ে মুচড়ে দেয় আত্মদানকারীর হৃদয়; বিষাদমখিত করেই তা শিল্পিত হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের ৬৪ বছর বয়সে রচিত^{২১} গান 'গহন রাতে শ্রাবণধারা পড়িছে ঝরে'^{২২}। প্রকৃতির এই গানে এক ধরনের objective correlation তৈরি করা হয়েছে। প্রকৃতিকে মানবিক করে তোলা হয়েছে মানুষের স্বভাব প্রকৃতির মধ্যে আরোপ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের গানের এটাও এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। এবার, গানের সুর আমরা লক্ষ করি—

II সা সণা গা ।^১ধা -পা -।I ^২ক্ষা -পা ক্ষধা । ^৩পা -মা -জ্ঞাI

গ হ০ ন রা তে ০ শ্রা ব ৭০ ধা রা ০

I^১রা ^২পা মা । গা -রা -গাI সা -^৩রা । রা -। -গা I

প ড়ি ছে ঝ রে ০ কে ০ ০ ন ০ ০

I^১রা -। গমা । মা -মা -গাI ^২রা -। -গা । ^৩রা -। -পাII

গো ০ ০০ মি ছে ০ জা ০ ০ গা ০ ০

I মগা -পমা -গা । রগা -^১সা -।II^{২৩}

বে০ ০০ ০ ও০ রে ০

স্থায়ী প্রথম চরণে কোমল নিষাদ ও তীব্র মধ্যমের ব্যবহার এবং দ্বিতীয় চরণে 'কেন' ও 'জাগাবে' শব্দটিতে মিড়ের ব্যবহার প্রশ্নাকুলতায় ভরা। স্থায়ী অংশের সুরটিই প্রধান হয়ে উঠেছে এই গানে। গৌড়মল্লার রাগের স্বরসংগতি এই গানে প্রচ্ছন্নভাবে দেখতে পাওয়া যায়। অন্তরা, সঞ্চরী ও আভোগ গাইবার পর স্থায়ী অংশে ফিরবার একটা তাগিদ রয়েছে গানটিতে। শেষ জীবনের গানের এই অভিনব বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথকে অনন্য করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৬৫ বছর বয়সে রচিত^{২৪} গান 'আলোর অমল কমলখানি কে ফুটালে'^{২৫}। শরৎ প্রকৃতির এই গানটিও পূর্ববর্তী গানের মতোই প্রকৃতি যেন মানবের মতোই সক্ষমতা নিয়ে বিরাজ করেছে। শুভ্র এক সকালের নিখাদ সৌন্দর্যই কেবল বিবৃত হয়েছে গানটিতে। প্রাকৃতিক পরিস্থিতির বাইরে কোনো মানবের সম্পৃক্ততা এই গানে নেই। কেবল সৌন্দর্যের অভিঘাতের বিবরণটুকুই সারল্য আর গভীরতায় চিহ্নিত হয়েছে গানটিতে। এবার আমরা গানের সুরটি লক্ষ করব—

মা -া পাII -গা -মা -দা । -দপা -গা -দাI পা -া -া । পা -দা পাI

আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ লো ০ র্ অ ম ল

I মা পা পা । পদা -গদা-পাI মগা -া -া । গপা -া -াI

ক ম ল খা ০ ০ ০ নি ০ ০ ০ কে ০ ০ ০

I সা -খা -গা । -মা -পা -দাI -মা -পা -দা । -না -সা -খাI

কে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -সা -া -জা । -রা -সা -াI গা -া -দা । দা -পা -মাI

০ ০ ০ ফু টা ০ লে ০ ০ আ ০ ০

I -গা -মা -দা । -দপা -গা -দাI পা -া -া । -া -া -াI^{২৬}

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ লো ০ ০ ০ ০ ০ র্

স্থায়ী অংশে ‘আলোর’ কথাটি তালের দুইটি পূর্ণ আবর্তন জুড়ে রয়েছে। যেন বিস্তৃত রূপে দেখা আলোয় চিত্ত ঝলমল করে উঠেছে। কোমল ধৈবত, কোমল নিষাদ, কোমল ঋষভ, কোমল গান্ধারের ব্যবহার শরতের সকালের শুভ্রতাকে প্রকাশের বাহন হয়ে উঠেছে। সুনির্দিষ্ট কোনো ভৈরবের স্বরসংগতি এখানে নেই, তবে ভৈরব অপের রাগের স্বরের সঙ্গে এই গানের স্বরসমূহের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই গানের কোথাও একটি মিড়ও নেই, অথচ এই গানে অলক্ষ মিড় সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। পরিণত বয়সের গানে রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের সুরের বিন্যাস এবং তিন-তিন ছন্দের সহজ বিন্যাস তাঁকে স্বকীয় করেছে, যা প্রথম বয়সের গানসমূহে অনুপস্থিত ছিল।

রবীন্দ্রনাথের ৬৬ বছর বয়সে রচিত^{২৭} গান ‘গোধূলীগগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা’^{২৮}। প্রেমের এই গানে বর্ষাপ্রকৃতির আবহ ও বিষণ্ণতা বিদ্যমান। বর্ষাপ্রকৃতিকে ব্যবহার করে বিরহ-বেদনার উন্মোচন রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের গানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। অন্তরার ‘হয়ত সে তুমি শোনো নাই’, আভোগের ‘আর কি কখনো কবে’ বাণীর মতো একই সুরে বিন্যস্ত হলেও ভাবনা আলাদা- একটিতে সংশয় অপরটিতে প্রশ্নাকুলতা রয়েছে। গানের সুর এবার লক্ষ করব-

II { সা সগা ধগা । ধা ধা^{২৯} গধাI পা -ক্ষা -ধা । পা -া -রাI

গো ধু ০ লি ০ গ গ নে ০ মে ০ ০ ঘে ০ ০

...

দি যে ছি ল তা ০ কি ০ ০ ০ ০ ০

এই গানে কোনো কোনো স্বরে শব্দের শেষ ধ্বনির স্থিতিকাল ছয় মাত্রা জুড়ে, কখনো-বা দশ মাত্রা জুড়ে রয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। এমন সুরবিন্যাস রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের গানে বিরল। কোমল নিষাদ, কোমল গান্ধার, তীব্র মধ্যমের ব্যবহার বেদনাবাহী বাণীকে অধিকতর বিষণ্ণতায় ভরিয়ে তোলে। গানটির সুরে কাফি রাগের সংগতি পাওয়া যায়। এটিচার-চার ছন্দের আট মাত্রার আবর্ততের গান হলেও, বাণী ও সুরের অভিনব সম্মিলনে একে দীর্ঘ ষোলো মাত্রার

আবর্তন বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের গান এভাবেই সারল্যকে ধারণ করে বাণী, সুর ও ছন্দে অভিনবত্ব লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথের ৭৩ বছর বয়সে রচিত গান^{৩৩} ‘কাছে থেকে দূর রচিল’^{৩৪}। এই গানটিও বাণীর সারল্যে উত্তীর্ণ এক প্রেমের গান। মানব-মানবীর প্রেমকে সহজভাবে উপস্থাপিত হয়েছে গানটিতে। পাওয়া এবং না-পাওয়া যুগপৎ মিলেমিশে আছে যেন। প্রেমময় মিলন তাই কবির হৃদয়কে বিরহের কারাগারে বেঁধে রেখেছে। প্রিয় মানুষকে জানা কখনো-বা না-জানার সমার্থক হয়ে যায়— এই আশ্চর্য কথাই গানটির মর্মে রয়েছে। কাক্ষিতকে পেয়ে হারানো বোধ জীবনকে সম্পূর্ণ হতে দেয়নি, ‘আধা’ করে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের গানগুলি এভাবেই গভীরতাকে সরলপথে তুলে এনেছে আশ্বাদনকারীর কাছে। এবার গানের সুর আমরা লক্ষ করব—

[রা রসা সন্না]

II { সা সা সা । সন্না সা -পা I মা জ্ঞরা সা । -া -া -I

কা ছে থে কে০ দূ র র চি০ ল ০ ০ ০

I (গা গা গা । মা পা -ধা I মা -পা -মা । জ্ঞা -মা -গা) I

কে ন গো আঁ ধা ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

...

I (সা পা পা । পা পা ধা I ধর্সা সা -গা । ধা পা -ধা I

জা নি তা রে আ মি ত০ বু ০ তা রে ০

I^{৩৫} পা গা -া । মা -া পা I^{৩৬} মা -জ্ঞা -া । -া -া -রসা) I^{৩৭}

না হি ০ জা ০ নি যে ০ ০ ০ ০ ০০

স্থায়ী অংশে উহ্য মীড় আমরা দেখতে পাই প্রথম চরনের ‘দূর’ শব্দটির সুরবিন্যাসে। ‘আঁধারে’ অংশের সুরে ভিন্নভিন্ন স্বর ঘুরে ঘুরে সুরের চলন যেন অন্ধকারকেই প্রকটিত করেছে। আভোগের ‘বাহিরে হারাই’ কথাটির শেষাংশের সুর তালের দুই আবর্তন জুড়ে আছে যার বিন্যাস হাহাকার তৈরি করে। কোমল গান্ধার ও কোমল নিষাদের ব্যবহার পুরো গানটির মধ্যেই বেদনা বিছিয়ে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের গানে ব্যকুল বেদনা প্রকাশ করতে কোমল স্বরের ব্যবহার আমরা এর আগেও লক্ষ করেছি। এই গানে তা আরো প্রবলভাবে বিদ্যমান। মালগুঞ্জি রাগের স্বরসংগতি এই গানে প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে। তিন-তিন সরল ছন্দে বিন্যস্ত গানটি চটুল নয়, বাণীর

প্রয়োজনেই এই গানের ছন্দের মধ্যে বিশেষ ধরনের স্থিরতা আমরা লক্ষ করি, যা পরিণত গানের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথের ৭৭ বছর বয়সে রচিত^{৩৬} গান ‘প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে’^{৩৭}। অথও গীতবিতানের ভূমিকা হিসেবে গানটি ব্যবহৃত হয়েছে এই গান। ফলে, বাণীগতভাবে এই গানের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। প্রথমাংশের বাণীতে প্রকারান্তরে নিজেকেই যেন ‘নবসৃষ্টির কবি’ এবং ‘নবজাগরণযুগপ্রভাতের রবি’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। দ্বিতীয়াংশে তিনি তাঁর জীবনদেবতার কথা বলেছেন, যিনি ‘অবাক আলোর লিপি’ তাঁর কাছে বয়ে এনেছেন। সেই ‘অপূর্ব একা’র সঙ্গে শেষ বয়সেও ‘নবপরিচয়’ ঘটেছে যেন। এবার গানটির সুর আমরা লক্ষ করব—

II ন্সা সা সা । রা রা রা I রা রা রা । রা রা -সা I
 প্র০ থ ম যু গে র উ দ য় দি গ ঙ্
 I রা মন্তা -। -। -। -মা I
 গ নে০ ০ ০ ০ ০

...

I মা পা পা । পা পা -গা I গা গা গধা । পা -ধগা গা I
 ব হু জ ন তা র্ মা ঝে অ০ পূ ০র্ ব
 I^গধা পা -। -। -। -ধপা I মা মগা গা । -। গা সা I
 এ কা ০ ০ ০ ০০ যে জা০ গা য় চো খে
 Iসা গা গা । মা পা ধপা I মগা মা -। -। -। -। I^{৩৮}
 নূ ত ন দে খা র০ দে০ খা ০ ০ ০ ০

স্থায়ী অংশে প্রথম চরণের ‘প্রথম’ শব্দটিতে শুদ্ধ নিষাদ ও ষড়্জ হয়ে শুদ্ধ ঋষভে আট মাত্রার স্থায়িত্ব এবং কোমল গান্ধার হয়ে মধ্যম দিয়ে শেষ হওয়ায় গানটি প্রথম থেকেই এক ধরনের ধ্রুপদীয় দাপট অর্জন করেছে, যদিও তা ধ্রুপদ নয়। অন্তরা ও আভোগে কোমল নিষাদের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কাফি-কানাড়ার স্বরসংগতি গানটিতে বিদ্যমান। এ গানে তাঁর শিল্প-সৃষ্টির সর্বপ্রান্তস্পর্শী রহস্য, সরল ভাষার অসামান্য তাৎপর্যসহজ সুরের বিন্যাসে নিয়ে বিরাজ করেছে। উপরিউক্ত অপরাপার গানে কোমল গান্ধার, কোমল নিষাদের ব্যবহার যেমন করে বেদনাবাহী হয়েছিল, এই গানে তেমনটি আমরা দেখতে পাই না। মধ্য লয়ে গেয় এই গানটিতে তিন-তিন ছন্দের ব্যবহার রয়েছে। দীর্ঘ এই গানের স্বরলিপিতে মিড়ের ব্যবহার খুব কম, তবু গাইবার সময় অদেখা মিড় এসে প্রায় প্রতিটি চরণেই লক্ষ করা যায়। এ ব্যাপারটি পরিণত বয়সের গানের প্রধান লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের ৭৭ বছর বয়সে রচিত^{৯৯} গান ‘সমুখে শান্তিপারাবার’^{১০০}। এই গানটি রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় গাইতে বারণ ছিল। কবির অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে সাধারণের সামনে গানটি পরিবেশিত হয়। বাণীগত তাৎপর্য বিবেচনা করতে গেলে আমরা দেখব, রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্তিমে লিখিত এই গানে কবি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে মৃত্যু সম্পর্কিত কিছু দার্শনিক প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। প্রথাগতভাবে ভয় কিংবা বৈরাগ্য মানুষের মৃত্যুচিন্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যেন তা ব্যতিক্রম— ‘শান্তিপারাবার’। তাঁর কাছে মহা ‘অজানা’ যেন ক্রমান্বয়ে জেনে ওঠা— এক ধরনের সদর্শক অনুভূতি নিয়ে সম্পূর্ণ গানে বিরাজ করছে। এবার গানের সুর লক্ষ্য করব—

I I সা রা গা -। গা -পা পা -I পা -ক্ষা “পা -ক্ষা। গা -মা -গা -। I

স মু খে ০ শা ন্ তি ০ পা ০ রা ০ বা ০ ০ র্

I গা -ক্ষা পা -। ক্ষপা গক্ষা গা -ক্ষা I গা -পা গা -ক্ষা। গা -ক্ষা সা -। I

ভা ০ সা ও ত০ র০ নী ০ হে ০ ক র্ ণ ০ ধা র্

...

I I সা -রা গা -পা। গা -“রা সা -I সা রা গা ক্ষা। পা -। -। -। I

মু ক্ তি ০ দা ০ তা ০ তো মা র ক্ষ মা ০ ০ ০

I ক্ষা পা ধা ধা। “না -। -ধা -পা I পা ধা না সা। সা গা রা সনা I

তো মা র দ যা ০ ০ ০ হ বে চি র পা ০ থে য০

I ধা পক্ষা “পা -“ক্ষা। গা -। -। -। I^{১০১}

চি র০ যা ৭ ত্রা ০ ০ র্

স্থায়ী অংশের সুরে তীব্র মধ্যমের ব্যবহার এবং পর্যায়ক্রমে কোমল ঋষভের পুনঃপুন ব্যবহার সরল সুরের মধ্যে গাভীর্য পুরে দেয়। স্থায়ী অংশে যুগপৎ ইমনকল্যাণ ও পূর্ববী রাগের স্বরসংগতি লক্ষ্য করা যায়। গানের মধ্যে মিড়ের প্রাধান্য নেই, অথচ স্বরের প্রয়োগের কারণে এই গানে অনায়াসে মিড় চলে আসে। কিন্তু সঞ্চরীতে ‘তোমার ক্ষমা’ বলবার সময় পঞ্চমে চারমাত্রাব্যাপী ন্যাশ যেন প্রার্থনাকে প্রকট করে তোলে। আভোগের ‘বিরাত বিশ্ব বাহু মেলি লয়’ অংশের সুরে প্রসারিত বাহু স্বরের মধ্য দিয়ে জেগে ওঠে যেন। গানের শেষাংশে ‘অজানা’ শব্দের সুরে অপার্থিব প্রতিতি জেগে ওঠে, সেই সুর নিজের সঙ্গে নিজেকে সংলগ্ন করে। চার-চার ছন্দের গানের প্রতিটি মাত্রাই আলাদা

করে প্রাধান্য পায় এই গান গাইবার কালে। এই গানে নিজেকে নিঙড়ে দিয়েছেন বাণী, সুর ও ছন্দের সুসমায়। আমরা সম্পূর্ণ এবং সম্পন্ন এক সফল রসস্রষ্টাকে পেয়ে যাই অন্তিমে রচিত গানে।

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা গানের এক সার্বভৌম প্রতিভা। তাঁর গীতরচনার স্বাতন্ত্র্য বাংলা গানের ধারাকে সমৃদ্ধ করেছে। পরিণত বয়সের গানে আমরা লক্ষ করেছি, প্রথম জীবনের গানের সকল প্রভাবকে তিনি অতিক্রম করে গেছেন। প্রথম বয়সের গানে হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয়সংগীত, পাশ্চাত্যসংগীত, লোকসংগীত, কীর্তন, প্রাদেশিক এমন নানান ধারার প্রভাব ছিল। সাংগীতিক বোধের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই প্রভাব অতিক্রম করে অনন্য হয়ে ওঠেন। উপরিউক্ত বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাই, গীতরচনার প্রথম দিকের জটিল সুর ও বাণীর আবহ কাটিয়ে পরিণত বয়সের গান সারল্য আর গভীরতায় আত্মদানকারীর মন ভরিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষ্যমতে প্রথম জীবনের গানের ‘ইমোটিভ’ দশা থেকে শেষ জীবনের গানে ‘ইস্‌থেটিক’ দশায় উত্তরণ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ যে ‘রূপ’ দেবার কথা পরিণত বয়সের গান সম্পর্কে বলেছেন, তা যথার্থ। গান বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাই, সেখানে ভাবের কোনো ভারিক্কি নেই, নিরাভরণ রূপের প্রকাশ রয়েছে সেইসব গানে। পরিণত বয়সে এসে রবীন্দ্রনাথ নিজের গান সম্পর্কে বলেছেন, “...আমি গান রচনা করতে করতে, সে গান বার বার নিজের কানে শুনতে শুনতেই বুঝেছি যে, দরকার নেই ‘প্রভূত’ কারু-কৌশলের। যথার্থ আনন্দ দেয় রূপের সম্পূর্ণতায়— অতি সূক্ষ্ম, অতি সরল ভঙ্গিমার দ্বারাই সেই সম্পূর্ণতা জেগে ওঠে”^{৪২}। তাঁর পরিণত বয়সের গানগুলি এই বোধেরই অনুপুঞ্জ রূপায়ণ। ফলে, অনিবার্যভাবেই সারল্য, রূপময়তা আর গভীরতায় অনন্য ও ভাস্বর হয়ে ওঠে পরিণত বয়সের রবীন্দ্রসংগীত।

তথ্যনির্দেশ

- ১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা* (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৯৯), পৃ. ১৭২
- ২ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচি* (কলকাতা: টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ২০০৩), পৃ. ২০১
- ৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭২
- ৪ তদেব, ১১৭
- ৫ তদেব, ১৭৫
- ৬ তদেব, ১৭৭
- ৭ তদেব, ১৭৭
- ৮ তদেব, ১১৮
- ৯ তদেব, ১৭৮-১৭৯
- ১০ তদেব, ১৮৬
- ১১ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *তদেব*, পৃ. ২০১
- ১২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, সং. ১৩৮০), পৃ. ৩৬৬

- ১৩ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১
- ১৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতমালিকা দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, সং. ১৩৭৮), পৃ. ২০
- ১৫ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫
- ১৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮১
- ১৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতমালিকা প্রথম খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, সং. ১৩৭৬), পৃ. ১৫১
- ১৮ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮
- ১৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৮
- ২০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বরবিতান প্রথম খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, সং. ১৩৭৭), পৃ. ৩৬-৩৭
- ২১ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩
- ২২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৬
- ২৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতমালিকা দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০
- ২৪ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৫
- ২৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯২
- ২৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বরবিতান দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, সং. ১৩৭৭), পৃ. ৯৮
- ২৭ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৮
- ২৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৪
- ২৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বরবিতান অষ্টপঞ্চাশত্তম খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, সং. ১৩৭৮), পৃ. ৩৮-৩৯
- ৩০ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৭
- ৩১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪২
- ৩২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বরবিতান ষট্‌পঞ্চাশত্তম খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, সং. ১৩৭৭), পৃ. ৪০
- ৩৩ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২
- ৩৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৯
- ৩৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২-১৪৩
- ৩৬ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৮
- ৩৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১ [ভূমিকা]
- ৩৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বরবিতান ঊনষষ্টিত্তম খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৩৭১), পৃ. ৫-৮
- ৩৯ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০২
- ৪০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬৬
- ৪১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বরবিতান পঞ্চপঞ্চাশত্তম খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, সং. ১৩৭৮), পৃ. ৪৪-৪৫
- ৪২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংগীতচিন্তা, তদেব, পৃ. ১১২

পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র ও গণমাধ্যমের আন্তঃসম্পর্ক: অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক- সাংস্কৃতিক চক্রের মিথস্ক্রিয়া

তারিক হোসেন খান*

Abstract

Capitalism and democracy are philosophically different. The first produces and expands societal inequality, while democracy promotes the idea of political equality by following the principle of 'one person, one vote'. Despite the differences, history shows that capitalists have established democracy worldwide and that democracy promotes capitalism by ensuring private property rights, financial incentives, market autonomy, privatization, and banking services. The question is, why do democracy and capitalism support each other even if they hold opposite ideals? What role does mass media play in the relationship between democracy and capitalism, and in what ways do they ensure their own development through reciprocity? By critically reviewing the classic literature on democracy and capitalism and recent texts on the subject matter and following an explanatory research method, this essay attempts to answer the questions posed. The article argues that democracy and capitalism support each other as part of survival mechanisms. Mass media expands capitalism by increasing consumer demand and establishing democracy as the best political ideal in the public mind. It concludes that capitalism, mass media, and democracy are not only interrelated but are three inseparable components of the same socio-political-economic cycle that enrich and protect each other through interaction; they collaborate because opposite political-economic approaches must overthrow them.

চাবিশব্দ: পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র, গণমাধ্যম, ক্ষমতা-পারস্পরিকতা, সমাজতন্ত্র

ভূমিকা

গত কয়েক শতাব্দীর রাজনীতি এবং রাজনৈতিক তত্ত্বের একটি অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিলো পুঁজিবাদ এবং গণতন্ত্রের সম্পর্ক। এসময় গণতন্ত্র আবির্ভূত হয়েছে আধুনিক সভ্যতার 'সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার' হিসাবে। অন্যদিকে পুঁজিবাদকে আখ্যায়িত করা হয়েছে আধুনিক সভ্যতার নির্মাতা হিসাবে। জোসেফ সুম্পটার যেমনটা বলেছেন— আধুনিক বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, বিমান, জীবন রক্ষাকারী ওষুধ, রেডিও-টেলিভিশন-ফ্রিজ সব কিছুর পিছনে রয়েছে পুঁজিবাদীর বিনিয়োগ, মুনাফার চিন্তা এবং অবশ্যই পুঁজিপতির উদ্ভাবনী উদ্যোগ।^১ রেনেসা-উত্তর ইউরোপে নব্য পুঁজিপতি ও মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করে আধুনিক গণতন্ত্রের। তথাপি গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে দর্শনগত ও চেতনগত ব্যাপক ফাঁরাক রয়েছে। গণতন্ত্র সামাজিক-রাজনৈতিক সাম্যের কথা প্রচার করে, যেমন : আইনের চোখে সবাই সমান, এক ব্যক্তি এক ভোট, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আম-জনতার অংশীদারিত্ব ইত্যাদি। কিন্তু পুঁজিবাদ মুনাফা স্ফীতিকরণ, বৈষম্য তথা পুঁজিপতি আর শ্রমিকের প্রভু-ভূত্য

* সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ এবং পিএইচডি ফেলো, এডুকেশন ইউনিভার্সিটি অব হংকং

সম্পর্ককেই জানান দেয়। দর্শনগত বা ধারণাগত এসব পার্থক্য অবশ্য পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের বাস্তবিক নিবিড় সম্পর্ক বিলুপ্ত করতে পারেনা। ঐতিহাসিক ভাবেই, গণতন্ত্র আর পুঁজিবাদ সম্পর্কিত। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্রের কেবল প্রথম নয়, একমাত্র পছন্দ পুঁজিবাদ। অন্যদিকে গণতন্ত্র ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি একটি বিমুখ প্রবণতা বজায় রাখে পুঁজিবাদ। এজন্য অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদকে পরস্পরের সমর্থক বলে অভিহিত করেছেন। যেমন গ্রাবিয়েল অ্যালমন্ডের মতে, পুঁজিবাদ গণতন্ত্রের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। পুঁজিবাদ নিজের মূল্যবোধ, বণিক-সংস্কৃতির আদান-প্রদান করে গণতন্ত্রের সঙ্গে।^২ এ প্রক্রিয়ায় নিজের উন্নয়নও করে পুঁজিবাদ। যুক্তি, ইতিহাস কিংবা সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রমাণ সব কিছুই এ সম্পর্কের সাক্ষী। অবশ্য এটিও সত্য, গণতন্ত্রকে পুঁজিবাদ থেকে পৃথক, এমনকি পুঁজিবাদের অবাধ সম্প্রসারণে গণতন্ত্রকে বাধা হিসাবে বর্ণনা করেছেন অনেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী।^৩ অবশ্য এ মতবাদ জ্ঞানের জগতে ঢেউ তুলতে পারেনি।

পুঁজিবাদ সম্প্রসারণশীল চরিত্রের কারণেই উত্তর-দক্ষিণ গোলার্ধ চম্বে বেড়াচ্ছে। অর্থনৈতিক এ মতবাদকে সামাজিক পাটাতনে যতই নিরপেক্ষ ভাবা হোক, বিশ্ব ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় স্থানিক কিংবা বৈশ্বিক পরিমন্ডলে পুঁজিবাদ ভয়াবহ রক্তপাত আর সহিংসতার মাধ্যমে চলার পথ তৈরী করে নিয়েছে। তবে দীর্ঘ সংঘাত অর্থের চেয়ে ‘অর্থ’ সৃষ্টি করে। সেজন্য পুঁজির চায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক নিরাপত্তা; দরকার পুঁজির জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দু’টি অব্যর্থ হাতিয়ার। নিজের অস্তিত্বের স্বার্থে যারা পুঁজিকে নিঃশর্ত সমর্থন দেবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র পুঁজির চলার পথ মসৃণ করে দেয়। আর সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে অব্যাহত প্রচার-প্রচারণা দ্বারা গণমাধ্যম প্রসার ঘটায় ভোগবাদের। পুঁজির ক্ষীতিকরণের শর্ত হিসাবে পণ্য চাহিদা সৃষ্টি খুবই প্রাসঙ্গিক। ভোগবাদী সংস্কৃতির পুনরুৎপাদন কেবল পুঁজির নিরাপত্তার জন্য জরুরি নয়, তা একই সঙ্গে গণতন্ত্র ও গণমাধ্যমের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির জন্যও জরুরি। সত্যিকার অর্থে, পুঁজিবাদ, গণমাধ্যম আর গণতন্ত্র কেবল আন্তঃসম্পর্কিত নয়, তা একই আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক চক্রের অবিচ্ছিন্ন তিন উপাদান যারা মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে পরস্পরকে পুষ্ট করছে। দর্শনগতভাবে পৃথক হওয়া সত্ত্বেও কেন গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ একে অপরকে সাহায্য করে? গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের সম্পর্ক পরিগঠনে গণমাধ্যম কোন ভূমিকা রাখে কি? ঠিক কোন প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম আন্তঃসম্পর্কের জালে জড়িয়ে নিজেদের বিকাশ নিশ্চিত করে? বর্তমান প্রবন্ধটি তিনটি প্রশ্নকে সামনে রেখে আবর্তিত হয়েছে। অন্যভাবে, এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস

এই গবেষণায় ব্যাখ্যামূলক বিশ্লেষণ (explanatory analysis) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। ব্যাখ্যামূলক গবেষণা হল কেন কিছু ঘটে বা ঘটে না বা কোন একটি বিষয় কেন একটি নির্দিষ্ট উপায়ে সংঘটিত হয় তা খুঁজে বের করার একটি পদ্ধতিগত উপায়।^৪ ব্যাখ্যামূলক গবেষণা সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণায় একটি কাঠামো প্রদান করে এবং তা একইসঙ্গে একধরনের অনুশীলন যা সামাজিক বাস্তবতা বোঝার দার্শনিক এবং পদ্ধতিগত উপায়। ব্যাখ্যামূলক কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দু হল একটি তাত্ত্বিক বা সামাজিক সমস্যা উপলব্ধি করা।^৫ একটি বিশেষ সামাজিক সমস্যা বা ঘটনা পরীক্ষা করার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য বা তত্ত্বের অনুপস্থিতি থাকলে কিংবা জ্ঞান-জগতে সেসবের কার্য-কারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যায় একাধিক হাইপোথিসিস বিদ্যমান থাকলে গবেষকরা ব্যাখ্যামূলক বিশ্লেষণ

পদ্ধতি অনুসরণ করে নতুন অনুসিদ্ধান্ত উপস্থাপন করতে পারে। এই পদ্ধতিটি গভীরভাবে বিশ্লেষণের জন্য একটি সূচনা বিন্দু হিসাবে কাজ করতে পারে। একইসঙ্গে এটি একটি ঘটনার মূল কারণ বা ব্যাখ্যামূলক চলক সনাক্ত করার জন্য দিকনির্দেশ প্রদান করতে পারে।^৬ প্রবন্ধটিতে মূলত সেকেন্ডারি তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রের উপর ক্লাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ বই এবং প্রবন্ধগুলি হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যেমন এই প্রবন্ধে জোসেফ সুম্পিটার, মিল্টন ফ্রিডম্যান, সাইমুর লিপসেট, চার্লস লিডব্রুম, রবার্ট ডাল, ল্যারি ডায়মন্ড, স্যামুয়েল হান্টিংটন, ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা, ফরিদ জাকারিয়াসহ বিখ্যাত উদারবাদী গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের তাত্ত্বিকদের লিটারেচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

কিছু ক্ষেত্রে ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতিটি একমাত্র বৈজ্ঞানিক উপায় হতে পারে জটিল রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রপঞ্চ ক্রিটিকালি উপস্থাপনের জন্য।^৭ বিশেষ করে ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করার জন্য বা জটিল রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাব বা বিনির্মাণের কারণ অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতিটি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য গবেষণা হাতিয়ার কেননা তা অনেকটা নিরপেক্ষ এবং নৈব্যক্তিকভাবে নির্ভরশীল, অনির্ভরশীল এবং মধ্যবর্তী চলকসমূহ বিশ্লেষণ করে। কিছু তাত্ত্বিক দাবি করেছেন ব্যাখ্যামূলক আখ্যান কার্যকারণ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ পরিমাণগত পদ্ধতির (কোয়ান্টিটেটিভ মেথড) চেয়ে ভাল।^৮ এটি একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামো হিসাবে সামাজিক এবং মানববিজ্ঞান জুড়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, বিশেষ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক অধ্যয়নে।

গুরুত্বপূর্ণ মেথডলজিক্যাল প্রশ্ন হলো কেন এই প্রবন্ধ ব্যাখ্যামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করেছে বা এই গবেষণায় ব্যাখ্যামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতির উপযোগিতা কী? প্রথমত, এই গবেষণা সংখ্যাতাত্ত্বিক এপ্রোচ অনুসরণ করেনি উত্থাপিত প্রশ্নে উত্তর দানে; বরং এটি গুণগত (কোয়ালিটেটিভ) এপ্রোচ ব্যবহার করেছে। ব্যাখ্যামূলক গবেষণা পদ্ধতি গুণগত গবেষণার একটি অন্যতম প্রধান হাতিয়ার যা একদিকে ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমের কেবল বর্ণনামূলক আখ্যান উপস্থাপন করেনা; অন্যদিকে তা কার্যকারণ সম্পর্ক ক্রিটিকালি অনুসন্ধান করে। এটি একইসঙ্গে গবেষণা বিষয়বস্তুর যুক্তিযুক্ত সংশ্লেষণ দ্বারা গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত/উপসংহারে পৌঁছাতে সাহায্য করে। ম্যাক্সওয়েল এবং মিন্তাপালির মতে: "The term explanatory research implies that the research in question is intended to explain, rather than simply to describe, the phenomena studied."^৯ অর্থাৎ ব্যাখ্যামূলক গবেষণা অধ্যয়নকৃত প্রশ্ন বা ঘটনার বর্ণনা করার পরিবর্তে ব্যাখ্যা করতে অগ্রহী। এটি আমার গবেষণা লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, এই প্রবন্ধটি দুটি ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে তাদের সহাবস্থানের কারণগুলি বোঝার চেষ্টা করেছে (যেমন: কেন পুঁজিবাদ, গণমাধ্যম এবং গণতন্ত্র এক অপরকে সমর্থন করে বা কেন তারা একটি আন্তঃসম্পর্কের জালে আবদ্ধ)। এই লক্ষ্যটি ব্যাখ্যামূলক বিশ্লেষণের ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কারণ সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ভেবার বলেছেন যে ব্যাখ্যামূলক অনুসন্ধান হল জটিল সামাজিক সমস্যা বা বাস্তবতা বোঝার অন্যতম হাতিয়ার।^{১০} আমি এই প্রবন্ধে দাবি করেছি, গণতন্ত্র এবং পুঁজিবাদের মধ্যে কোন আদর্শিক সংযোগ নেই এবং তারা ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতকে সহিংসতার মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছিল। তর্কাতীতভাবে, এই দাবির জন্য গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ উৎপন্নকারী ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, যা ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি পর্যাগতভাবে করতে পারে। একইসঙ্গে পুঁজিবাদ, গণমাধ্যম এবং গণতন্ত্র কেন এবং কিভাবে আন্তঃসম্পর্কের জালে আবদ্ধ এবং একটি মিথস্ক্রিয়া নীতি প্রতিষ্ঠা করে তা একটি জটিল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-

সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া, যা উপলব্ধির জন্য ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি একটি সম্প্রসারিত এবং অনির্ধারিত কাঠামো প্রদান করে। আমি এই পদ্ধতিটিকে ব্যবহার করেছি কার্যকারণ সম্পর্কের একটি মডেল তৈরি করার জন্য নয়; বরং আমার উত্থাপিত যুক্তির গভীর বিশ্লেষণ উপস্থাপনা হিসাবে। আমি সেজন্য একদিকে, গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, মার্কেট ব্যবস্থাপনা, গণমাধ্যমের বিকাশ এবং প্রভাব-এর উপর বিদ্যমান মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ লিটারেচার ব্যাখ্যা করেছি। অন্যদিকে, পর্যবেক্ষণ দ্বারা পুঁজিবাদ, গণমাধ্যম ও উদার গণতন্ত্রের উপর আমার নিজস্ব যুক্তি প্রসারিত করেছি। তাত্ত্বিকদের দাবি এবং ব্যাখ্যা গ্রহণ, বর্জন এবং প্রশ্নবিদ্ধ করেছি।

এই নিবন্ধের পরবর্তী আলোচনাসমূহ ছয়টি অংশে বিভক্ত। সেকশন ৩ গণতন্ত্র এবং পুঁজিবাদের তত্ত্ব আলোচনাপূর্বক তাদের সংজ্ঞা এবং প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উপস্থাপন করেছে। পরবর্তী সেকশনে আলোচনা করা হয়েছে, তাত্ত্বিকেরা কিভাবে গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছে। এখানে আমি জ্ঞান-জগতে গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের সম্পর্ক ঘিরে গড়ে ওঠা তিন ধরনের অনুকল্প বর্ণনা করেছি। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সেকশনে যথাক্রমে আলোচনা করা হয়েছে পুঁজিবাদ কেন গণতন্ত্রকে সমর্থন করে এবং গণতন্ত্র কেন পুঁজিবাদের পক্ষ অবলম্বন করে। এই দুই সেকশনের আলোচনা প্রবন্ধে উত্থাপিত প্রথম প্রশ্নকে ফোকাস করে- কেন পুঁজিবাদ এবং গণতন্ত্র পরস্পরকে সমর্থন করে যেখানে তাদের মধ্যে কোন আদর্শিক সম্পর্ক নেই। গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের সম্পর্ক পরিগঠনে গণমাধ্যম কেমন ভূমিকা পালন করে তা সপ্তম সেকশনে আলোচনা করা হয়েছে। অষ্টম সেকশন মূলত গবেষণা ফলাফলকে উপস্থাপন করেছে যেখানে প্রধানত ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিভাবে এবং কেন পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম আন্তঃসম্পর্কের জালে আবদ্ধ, যা গবেষণার মূল প্রশ্নের যুক্তিযুক্ত উত্তরদানে চেষ্টা করেছে।

গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও গণমাধ্যম: তত্ত্ব পুনঃপাঠ

গণতন্ত্র

বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র সবচেয়ে জনপ্রিয় শাসন ব্যবস্থা হলেও এর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। গণতন্ত্রের সংজ্ঞায়নে কখনো আইন, কখনো ভোট আবার কখনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দেয়া হয়। অসংখ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, বেসামরিক-সামরিক শাসক এমনকি ধর্মীয় নেতারা গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন নিজের সুবিধা মতো। মোটা দাগে গণতন্ত্রের সংজ্ঞায়নে আইনের শাসন, জনকর্তৃত্ব, ভোট আর অংশগ্রহণের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হয়। ডায়মন্ড, লিনজ ও লিপসেট সু-গণতন্ত্র অর্থে কিছু শর্ত আরোপ করেছেন, যেসব তাদের মতে ‘গণতন্ত্রের স্তম্ভ’। আর সেগুলো হলো-আইনের শাসন অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জবাবদিহিতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক সাম্য ও সাড়া প্রদান।^{১১} সম্প্রতি গণতন্ত্রের সংজ্ঞায়নে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, রাজনীতি বিজ্ঞানে যাকে বলা হয় ‘ডেলিবারেট ডেমোক্রেসি’। রবার্ট ডাল শুধু ভোটগ্রহণকে গুরুত্ব না দিয়ে সামগ্রিক অংশগ্রহণের অধিকারের আলোকে গণতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করেন। পলিয়ার্কির ধারণা দিয়ে ডাল গণতন্ত্রের জন্য অত্যাৱশ্যকীয় বেশ কিছু শর্ত জুড়ে দেন- সংগঠনের অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, চিন্তার স্বাধীনতা, ভোটাধিকার, সরকারী পদের জন্য উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা, নেতৃত্বের অধিকার, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ইত্যাদি।^{১২} ও’ডানিয়েলের মতে, গণতন্ত্র এমন এক শাসন ব্যবস্থা যা তিনটি চলকের ওপর নির্ভর করে: নির্বাচন, মানবাধিকার এবং সরকারের জবাবদিহিতা।^{১৩} বর্তমান সময়ে গণতন্ত্রের অন্যতম তাত্ত্বিক ল্যারি ডায়মন্ড লিখেছেন,

গণতন্ত্র হলো এমন এক সরকার ব্যবস্থা যেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা অবাধ, নিরপেক্ষ, নিয়মিত ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ (বহুদলীয়) নির্বাচনের মাধ্যমে অর্পিত হয়।^{১৪} অনুরূপ মতামত লিপসেট উপস্থাপন করে দাবি করেছেন:

Democracy (in a complex society) is defined as a political system, which supplies regular constitutional opportunities for changing the governing officials. It is a social mechanism for the resolution of the problem of societal decision-making among conflicting interest groups, which permits the largest possible part of the population to influence these decisions through their ability to choose among alternative contenders for political office.¹⁵

এই প্রবন্ধে গণতন্ত্র বলতে এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নির্দেশ করা হয়েছে যেখানে সাংবিধানিক উপায়ে নিয়মিত ক্ষমতা পরিবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি হয় প্রতিযোগিতামূলক ভোটের মাধ্যমে এবং যেখানে বিবাদমান স্বার্থবাদী গোষ্ঠীগুলো সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তারের সুযোগ লাভ করে।

পুঁজিবাদ

গণতন্ত্রের মতো পুঁজিবাদের সংজ্ঞায়ন তত জটিল নয়। কেননা বাজার ব্যবস্থা আর ব্যক্তি মালিকানার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পুঁজিবাদের সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে নব ধারা সৃষ্টি বেশ জটিল; সেই সূত্রে বিচ্যুতির সম্ভবনাও কম। পুঁজিবাদ বলতে বুঝায় এমন এক ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবাধ কেন্দ্রীকরণের অধিকার থাকে এবং অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় উদ্যোক্তা শ্রেণি কর্তৃক।^{১৬} বেইলীর মতে, “Capitalism’ is essentially derived from ‘capital’, an accretion of wealth”^{১৭} উদ্যোক্তা এবং ভোক্তার স্বাধীনতার জন্য পরিচিত বা অন্যান্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদে পণ্য ও সেবার উৎপাদন অনেক বেশি কার্যকর ভাবে সম্পন্ন হয় কেননা সেখানে সবকিছু নিয়ন্ত্রিত অদৃশ্য স্বাধীন ব্যবস্থা (হাত) দ্বারা।^{১৮} সুম্পিটারের মতে মুনাফার অভিশাস হলো পুঁজিবাদের কেন্দ্রীয় বিষয় যা আবার দুটো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল: উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও অবাধ বাণিজ্য। তবে রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে পুঁজিবাদ কেবল অর্থনৈতিক গন্ডিতে আবদ্ধ নয়। বাজার, শিল্প সংগঠন আর পুঁজিবাদী উদ্যোক্তার কল্যাণে সমাজ দ্রুততার সাথে বিবর্তিত হতে থাকে। নতুন পণ্য সংস্কৃতি, নতুন উৎপাদন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, নতুন বাজার এবং নতুন শিল্প সংগঠন-কাঠামো নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে সমাজ ও রাজনীতির ওপর। যেমনটা বলেছেন সুম্পিটার লিখেছেন: “The fundamental impulse that sets and keeps the capitalist engine in motion comes from the new consumers’ goods, the new methods of production or transportation, the new markets, the new forms of industrial organization that capitalist enterprise creates.”^{১৯}

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়, পুঁজিবাদ হলো এমন এক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে পণ্য ও সেবার আদান-প্রদানে ব্যক্তি পূর্ণ স্বাধীন এবং যেখানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়া; তবে সেখানে কাজ করে অদৃশ্য হাত যা সমন্বয় করে চাহিদা ও যোগানের জটিল হিসাব।

গণমাধ্যম

গণমাধ্যম হলো বিস্তৃত পরিসরে একই সময়ে তথ্য প্রকাশের হাতিয়ার। তা কেবল তথ্য প্রকাশ করে না; গড়ে দেয় ব্যক্তির মনঃস্তত্বও। গণমাধ্যম স্বভাবগত বৈচিত্র্য, গতিশীলতা ও কেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে বিনির্মাণ করে ‘গণসংস্কৃতি’ যেখানে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও বিশ্বাস ‘সমজাতীয়’ হয়ে ওঠে।^{২০} কারেন্স এবং পার্লফ বলেছেন, গণমাধ্যম জনগণের আচরণ, অংশগ্রহণ ও মনঃস্তত্বকে নির্ধারন করে।^{২১} উপরন্তু গণমাধ্যম ব্যবহার করে রাজনৈতিক নেতারা ‘জনমত’ বা ‘ইমেজ’ তৈরি করে। গণমাধ্যম একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের এজেন্ট। গণমাধ্যম কোনো সংস্থার ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে, তাকে দৃঢ় করতে পারে। আবার তার বিরুদ্ধে গণমতও গড়ে তুলতে পারে। যেখানে জনগণের কোনো অভিজ্ঞতা নেই, সেখানে গণমাধ্যম নতুন ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষম। মনোজগতে সচলতা তৈরি করে গণমাধ্যম ব্যক্তিকে সমৃদ্ধ জীবনের ছবি দেখায়, গতানুগতিক জীবনের বন্ধ পরিধি থেকে তাকে মুক্ত করে আধুনিক জীবনের দিকে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করে।^{২২} গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ-উদাহরণ প্রয়োগ করে মানুষের মূল্যবোধ ও বিশ্বাস কাঠামো গঠন করে; আরোপ করে ভাল-মন্দের ‘ইমেজ’। এমনকি আধিপত্য কায়েম করে কল্পনা-জগতেও। প্রযুক্তিগত ক্ষমতায় গণমাধ্যম মানুষের ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষণ, কর্তৃত্ব, আত্মপরিচয় এবং তাৎপর্যের ধারণা পরিবর্তন করে দেয়। এ প্রেক্ষাপটেই ‘সেই সত্য যা রচিব আমি’- আর সত্য থাকে না বরং সত্য হয়ে ওঠে সেই সব বিষয়াবলি যা বর্ণমালার হরফে প্রকাশ পায় কিংবা দেখা যায় রঙিন পর্দায়।

গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও গণমাধ্যম

আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বিষয়াদি পরস্পর ঘনিষ্ঠ। যে কোন ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন অন্যান্য বিষয়াদিতে ‘চেইন রি-এ্যাকশন’ এর আদলে আঘাত করে; পরিবর্তন আনে অন্যসব ক্ষেত্রেও। ইংল্যান্ডের গৌরবময় রক্তপাতহীন বিপ্লব (১৬৮৮), ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯) আর যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৭৭৬-১৭৮০) আমূল বদলে দেয় পশ্চিমা সমাজের ক্ষমতা কাঠামো। পুঁজিবাদ সমর্থিত এসব আন্দোলনের মাধ্যমে সামন্ততন্ত্র, রাজতন্ত্র আর অভিজাততন্ত্রের পুরানো ক্ষমতা কাঠামো ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে। সামন্তপ্রভু আর যাজকদের হাঠিয়ে নব্য পুঁজিপতি আর মধ্যবিত্ত (যাদের একটি বড় অংশ আইনজীবী) ক্ষমতার জ্যোতিকেন্দ্রে চলে আসে। রূপান্তর ও পরিবর্তনের ধারাবাহিক ঘটনাসমূহ বদলে দেয় মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্থিরকৃত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমন্ডল। বিশ্বসভ্যতা সেই অভূতপূর্ব ঘটনার জন্ম দেয় যা চলতি ইতিহাসে ‘শিল্প বিপ্লব’ বলে অভিহিত। আবার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক এইসব পট পরিবর্তনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে ত্রয়োদশ শতকে শুরু হওয়া আলোকায়ন বা রেনেসা। চক্রাকারে প্রভাবিত এইসব ঘটনাবলীর যে কোনটিকে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতায় কেন্দ্রে নিয়ে আসা যায়। সে বিতর্ক প্রসারিত না করে চলমান প্রবন্ধ এই প্রস্তাবনায় পক্ষপাতী যে, রেনেসা থেকে শিল্প বিপ্লব এবং তৎপরবর্তী উপনিবেশীকরণের মধ্যদিয়ে ইউরোপে একইসঙ্গে বিকাশ ঘটে পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র আর গণমাধ্যমের। পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া আর অভিযোজন ক্ষমতা তিনটি প্রতিষ্ঠানকেই শক্তিশালী করেছে। জাতীয়তাবাদের বিকাশ এই ত্রয়ী-সম্পর্ককে আরো পুষ্ট করে। মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের (১৪৯৮) পর নব্য পুঁজিপতি শ্রেণি মতাদর্শিক জগতে আধিপত্য বিস্তারের এক অব্যর্থ অস্ত্র পেয়ে যায়। জাতীয়তাবাদ চিন্তার স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার শ্লোগান নিয়ে মহাসমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রিন্ট-মিডিয়াকে সঞ্চল করে কেন্দ্র থেকে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।^{২৩} সামন্ততন্ত্র-

রাজতন্ত্র-পোপতন্ত্রের স্থিরকৃত কাঠামোর কোন প্রস্তুতি, কৌশল আরো বাড়িয়ে বললে সক্ষমতা ছিলোনা ‘ভয়েজ অব পিপল, ভয়েজ অব গড’ এর মতো সম্মোহনী মতবাদকে রুখে দেওয়ার। বলপ্রয়োগের সনাতনীপন্থা শুরুতে কিছুটা সফলতা আনলেও নতুন মতবাদ যখন আরো বেশি সহিংস হয়ে ইংল্যান্ড (১৬৪৯), ফ্রান্স (১৭৮৯), রাশিয়ায় (১৯১৭) রাজাদের শিরোচ্ছেদে সক্ষম হয় তখন পুরাতন রাজতন্ত্র-সামন্ততন্ত্র-পোপতন্ত্রের গাঁট ছাড়া সম্পর্কের স্থিরকৃত বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্তন বা রূপান্তর ছাড়া আর কোন বিকল্প অবশিষ্ট ছিলো না।^{২৪} অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এসময় সামন্ত প্রভুরা দ্রুত নিজেদের পুঁজিপতি শ্রেণিতে রূপান্তরিত করে নতুন ধারার মধ্যে একীভূত হয়ে যায়। এই প্রেক্ষাপটেই জন্ম হয় রাজনৈতিক দলের যার নিয়ন্ত্রণে থাকে আইনজীবী, মধ্যবিত্ত ও উঠতি পুঁজিপতিরা। শিল্পোবিপ্লব পরবর্তী অষ্টদশ শতকে ইউরোপে পার্লামেন্ট গণসমাজের প্রতিনিধি হিসাবে ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসে। তবে ক্ষমতার কেন্দ্রাতিক প্রবণতা আর নির্বাচন ব্যবস্থার কারণে পার্লামেন্টের নামে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের কাছে। স্টুয়ার্ট মিলের *রিপ্রেজেন্টেটিভ গভর্নমেন্ট* গ্রন্থে তার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তবে অচিরেই রাজনৈতিক দলের বদলে ক্ষমতা চলে যায় ছোট্ট একটি ক্যাবিনেটের হাতে এবং সেই সূত্র ধরে সরকার প্রধানের হাতে।^{২৫}

গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের সম্পর্ক: মিথস্ক্রিয়া বনাম পৃথকতার অনুকল্প বিশ্লেষণ

প্রতিটি সমাজেই রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কিত। কার্ল মার্ক্স অর্থনীতিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন- অর্থনীতি হলো ভিত্তি কাঠামো (বেসিক স্ট্রাকচার) যা নির্ধারণ করে দেয় উপরি কাঠামো (সুপার স্ট্রাকচার) অর্থাৎ রাজনৈতিক কাঠামোসহ ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক। অ্যালান্ট অর্থনীতি ও রাজনীতিকে মানব সমাজের সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার হিসাবে বর্ণনা করে রাজনীতি-অর্থনীতির সম্পর্ক টেনে বলেছেন: “The economy and the polity are the main problem solving mechanisms of human society. They each have their distinctive means, and they each have their *Ögoods* or ends. They necessarily interact with each other, and transform each other in the process.”^{২৬}

আর এ কারণেই আমরা দেখি দাস কেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা জন্ম দেয় অভিজাততন্ত্রের বলয় যেখানে প্লেটো-এরিস্টটল দাসপ্রথাকে কেবল অপরিহার্য নয়, ‘নৈতিক’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সামন্ততন্ত্র ধারক হয়ে ওঠে রাজতন্ত্র ও পোপতন্ত্রের। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা পণ্যের প্রসার আর বিশাল ভোজ্য শ্রেণী তৈরীর মুনাফা কেন্দ্রিক চাহিদার কারণে পক্ষ নেয় গণতন্ত্রের। গণতন্ত্র ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীভূত করে সমাজের স্তরে স্তরে বিদ্যুতছটার মতো ছড়িয়ে দেয়। আধুনিকীকরণের দুটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ। ঐতিহাসিকভাবে দুটি উপাদান কেবল সম্পর্কযুক্ত নয়, সম্পর্কের মাত্রা এতটাই তীব্র এবং স্বতঃস্ফূর্ত যে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলে থাকেন গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের সম্পর্ক প্রকৃতিজাত।^{২৭} পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হলেও গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ দুটি ভিন্ন প্রপঞ্চ। দুটি ভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান। কেননা গণতন্ত্র হলো রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, সেই সূত্রে যা ‘মূল্যবোধের কর্তৃত্বপূর্ণ বরাদ্দের’ সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ গণতন্ত্র নিখাদ রাজনৈতিক। অন্যদিকে পুঁজিবাদ হলো অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা, যা অবাধ বাণিজ্যের কথা বলে ব্যক্তিগত মালিকানা ও মুনাফা স্বীকৃতির অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। ফরিদ জাকারিয়া লিখেছেন গণতন্ত্রের সঙ্গে পুঁজিবাদের সম্পর্ক খুবই প্রাসঙ্গিক। লিপসেট গণতন্ত্রের সঙ্গে পুঁজিবাদের অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্কের

কথা বলেছিলেন, অনেক তর্ক-বিতর্কের শেষে সেই অনুকল্প চার দশক পরেও জ্ঞান জগতে শক্তিশালী অবস্থান নিয়েই টিকে আছে বলে মনে করেন ফরিদ জাকারিয়া।^{২৮}

জ্ঞান-জগতে গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের সম্পর্ক আলোচনায় তিন ধরনের অনুকল্প রয়েছে। প্রথমত, পুঁজিবাদ এবং গণতন্ত্র আন্তঃ সম্পর্কিত। এই মতবাদের প্রচারকরা^{২৯} বিশ্বাস করেন, দুটো মতবাদই উদারতাবাদের ধারক। উভয় মতবাদই ব্যক্তির উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ পরিগঠনে পুঁজিবাদ মুখ্য ভূমিকা রাখে। অপরদিকে, গণতন্ত্র ব্যক্তির সম্পত্তি অর্জনের অধিকার কেবল নয়, বিপুল সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণের স্বীকৃতি দিয়ে পুঁজিবাদের সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে গণতন্ত্র। গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ উভয় ব্যক্তিগত দক্ষতা, অংশগ্রহণ এবং পছন্দ-অপছন্দকে গুরুত্ব দেয়।

দ্বিতীয় ধারায় বিশ্বাস করা হয়, গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের সম্পর্ক বর্তমান বিশ্বে ঘনিষ্ঠ হলেও এ দুটো বিষয় পরস্পর বিরোধী।^{৩০} পুঁজিবাদ সম্পদের ক্ষেত্রে বিশাল বৈষম্য তৈরী করে সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছোরিত অবস্থার জন্ম দেয়। কিন্তু গণতন্ত্র রাজনৈতিক সমতার কথা বলে; ভোট, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্ম পালন, সামাজিক গতিশীলতার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সবাই সমান অধিকার ভোগ করে। কাজেই পুঁজিবাদ-গণতন্ত্র পরস্পর বিরোধী। পুঁজিবাদ অসাম্যের ধারক; গণতন্ত্র রাজনৈতিক সমতায় বিশ্বাসী। এজন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আর গণতন্ত্রকে দুটি পৃথক ও সাংঘর্ষিক বিষয় বলে মনে করেন এডুনারি ডনস।^{৩১} তাঁর মতে, দীর্ঘকাল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুঁজিবাদের বিকাশের জন্য সহায়ক নয়। যুক্তরাজ্যের উদাহরণ টেনে তিনি বলেছেন, বিভিন্ন চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বিরোধিতায় ও গণতন্ত্রের আপষকামী ভূমিকায় পুঁজিবাদ যুক্তরাজ্যে বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

তৃতীয় ধারাটি দ্বিতীয় ধারার সম্প্রসারিত বা সংশোধিত রূপ। এই ধারার তাত্ত্বিকরা বিশ্বাস করেন পার্থক্য স্বত্ত্বেও গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, বিশেষত একে অপরের সংশোধনে 'কারেকটিভ মেজারস' হিসেবে কাজ করে।^{৩২} পুঁজিবাদের 'পুঞ্জীভূত অসমতা' তথা ধনী-দরিদ্র বৈষম্য গণতন্ত্র দূর করে বা প্রশমিত করে। গণতন্ত্র পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবের সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দেয়। এই ধারায় বিশ্বাস করা হয়, গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে বিরোধ থাকলেও তা বিচ্ছিন্ন হওয়ার মতো কোন বিষয় নয়, কেননা উদ্ভবগত উপাদান ও স্বার্থগত চাহিদার কারণে কেউ পৃথক হতে চায় না। রবার্ট ডালের ভাষায় 'two persons bound in a tempestuous marriage that is ripen by conflict and yet endures because neither partner wishes to separate from other'।^{৩৩} অর্থাৎ বিশ্বের আধুনিক ইতিহাস এই দুই শক্তির গাঁটবদ্ধতার সাক্ষী। বর্তমান সভ্যতা এই দুই শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল।

গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ উভয়ই ব্যক্তির দক্ষতা, পছন্দ ও অংশগ্রহণের পক্ষে। গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের কেন্দ্রীয় শক্তি ব্যক্তিস্বতন্ত্রবাদ ও উদারতাবাদ।^{৩৪} হার্জেরিয়ান দার্শনিক জি. এম. টমাস বলেছেন, গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ একত্রিত হয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু সাংস্কৃতিক বিষয়াদির জন্ম দেয় যা উভয়কেই শক্তিশালী করে।^{৩৫} টমাস স্পষ্টভাবে বলেছেন, হার্জেরি বা পূর্ব ইউরোপে পশ্চিমের মূল ভূ-খন্ডের মতো গণতন্ত্র বিকশিত হবে না, কেননা সেখানে 'সাংস্কৃতিক শর্তগুলো' অনুপস্থিত রয়েছে।^{৩৬} তাঁর মতে পূর্ব ইউরোপের মানুষ এখনও প্রাচ্যের মতো পুঁজিবাদ ঘৃণা করে, তারা প্রতি-ব্যক্তিস্বতন্ত্রবাদী। টমাসের অনুসিদ্ধান্ত হতে দুটি বিষয় স্পষ্ট; প্রথমত, গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ সমন্বিতভাবে উভয়ের জন্য

প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক ভিত্তি দান করে। অর্থাৎ তা নিবিড়ভাবে জন্ম-মৃত্যুর প্রশ্নসহ ঘনিষ্ঠ। দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদকে পশ্চিম-ইউরোপের মতো পুরোপুরিভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গ্রহণ না করলে উদার গণতন্ত্র ধরা দিবে না। যার অন্য অর্থ, গণতন্ত্র কেবল তখনই দৃশ্যমান হবে যখন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিপতির স্বপোষী ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ উচ্ছেদ করবে। এর প্রমাণ রয়েছে ডালের জবানে: “এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য যে আধুনিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান প্রধানত ব্যক্তি মালিকানাধীন, বাজারমুখী অর্থনীতি বা পুঁজিবাদের দেশগুলিতেই বিদ্যমান। এটিও সত্য যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন, কেন্দ্রীয়ভাবে নির্দেশিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসহ সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশ সমূহ বা কমান্ড অর্থনীতি, গণতান্ত্রিক সরকারগুলি উপভোগ করেনি; বরং কর্তৃত্ববাদী একনায়কতন্ত্র দ্বারা শাসিত হয়েছে”।^{৭৭} সঙ্গত কারণে এটা মনে করা যুক্তিযুক্ত যে, বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয়, এটি একটি ঐতিহাসিক প্রমাণ যেখানে কোন সন্দেহ নেই।

উল্লিখিত বক্তব্যের সহজ পাঠ হলো- গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রধানতম শর্ত, যেমন সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনে দরকার কর্তৃত্ববাদী সরকার ব্যবস্থা। গত শতাব্দীর অভিজ্ঞতা এ উপসংহার টানতে সাহায্য করে। গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ আর সংস্কৃতি পরিগঠন করে গণমাধ্যম। স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিংবা জনসমাজে জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য নয়, গণমাধ্যম অত্যন্ত সুপরিচালিতভাবে ও ব্যবসায়িক স্বার্থেই টমাস কথিত ‘সাংস্কৃতিক শর্তাবলির’ জন্ম দেয়। আর এক্ষেত্রে গণমাধ্যম ব্যবহার করে জাদুগুণিতিক ক্ষমতা (magic multiplier) যা ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তনের তাগিদ সৃষ্টি করে।^{৭৮} ব্যক্তির কল্লোজগতে হানা দেয় দুর্দমনীয় ‘পণ্য চাহিদা’। এই পণ্য চাহিদা এতটাই তীব্র, সম্মোহিত এবং নেশা উৎপাদনকারী যে ভোক্তা সুনির্দিষ্ট সেই পণ্য না পেয়ে আত্মহত্যাও করে। কেবল পণ্য চাহিদা তৈরি নয়; গণসমাজে গণতন্ত্রের প্রতি জন-আকাঙ্ক্ষাও তৈরী করে গণমাধ্যম। প্রযুক্তি উৎকর্ষতার ডয়েচে ভেলী থেকে বাংলাদেশের প্রান্তিক বিদ্যুৎহীন গ্রাম- উভয় জনপদেই গণমাধ্যমের এ ভূমিকা রয়েছে।^{৭৯} এক্ষেত্রে লিন্ডব্লুমের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য- “বাজার ব্যবস্থা বা পুঁজিবাদ কেবল অসাম্য উদ্রেককারী নয়, তা একই সঙ্গে একটি শক্তি ব্যবস্থা (power system)। এটি এমন এক ব্যবস্থা যা নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তির আচরণ, আরোপ করে সামাজিক স্তর বিন্যাস (পদ ও শৃঙ্খলার নামে) এবং বিভিন্ন ধরনের আন্তঃসম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণ”।^{৮০}

দু’টি চলকের সম্পর্ক বিপরীতমুখী হলেও গত তিন শতাব্দী জুড়ে গণতন্ত্র কিংবা পুঁজিবাদ নিজের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে বরাবরই অপর হাতিয়ারটি ব্যবহার করেছে। চলতি বিশ্বে কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র নেই যা গণতান্ত্রিক নয়; আবার কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দেখা পাওয়া যাবে না যা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত নয়। এটি সম্ভব হয়েছে গণতন্ত্রের পক্ষে পুঁজিপতি তথা ক্ষমতাবান ব্যক্তির (এলিট) অব্যাহত প্রচারে। ক্ষমতাবান ব্যক্তির আরোপিত চিন্তা ধারার আলোকেই গণ-মানুষ গড়ে নেয় নিজেদের জগত, জগতের মতাদর্শ, পছন্দ-অপছন্দ। পাশ্চাত্যের এক গবেষকের জবানে পশ্চিমা গণতন্ত্র হল একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে লোকেরা তাদের অভিজাতদের দ্বারা যা শেখানো হয়েছে তা তাদের সরকারের কাছে দাবি করে। এইভাবে জনপ্রিয় নিয়ন্ত্রণ হলো অনেকটা শর্ট সার্কিটের মতো যেখানে গণতন্ত্র সার্কিটের বা নিয়ন্ত্রকের মতো ভূমিকা পালন করে।^{৮১}

পুঁজিবাদী বা বাজার ব্যবস্থা উপড়ে ফেলে স্বপোষী (subsistence) অর্থনীতি-উদ্ধৃত চক্রাকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন। জন্ম দেয় মধ্যবিত্তের যারা প্রকৃতিগতভাবে গণতন্ত্রের মিত্র। পলিটির ধারণা দিয়ে অ্যারিস্টটল প্রথম এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সিদ্ধান্ত গ্রহণে চায় স্বাধীনতা, কামনা করে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণহীনতা। কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং চাহিদা ও যোগানের সমন্বয়ের জন্য সরকার চায় অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে। গণতন্ত্র তত্ত্বগতভাবে অন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে অনেক বেশি বিকেন্দ্রীভূত এবং অর্থনীতিতে কম হস্তক্ষেপে বিশ্বাসী। আর এ কারণেই পুঁজিবাদের পছন্দ গণতন্ত্র যা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমতা হ্রাসের পক্ষে। কমিউনিজম একইসঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ যা কেন্দ্রীয়ভাবে রাজনীতি এবং অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের ধারণা দেয়। কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক-প্রশাসনিক আমলাতন্ত্র এ ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা। অন্যদিকে সামন্ততন্ত্র আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একই ব্যক্তির অধিপত্য কায়ম করে। রাজা-পোপ-লর্ড-ডিউক-নাইটদের কেন্দ্রীভূত ও বংশীয় ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়ম করে।

পুঁজিবাদ কেন গণতন্ত্রকে সমর্থন করে?

সাম্যের মহান ব্রতই গণতন্ত্রের শক্তি। তবে সে সাম্য কেবলই রাজনৈতিক আলঙ্কারিক বিষয় যা এক ব্যক্তি এক ভোটের দর্শন প্রচার করে সামাজিক সাম্যের কথা প্রচার করে। আর এ কারণেই গণতান্ত্রিক সরকার হয়ে ওঠে পুঁজিবাদের বন্ধু; কমিউনিস্ট ইশতাহার-এ মার্ক্স-এঙ্গেলস যাকে অত্যন্ত তিব্র ভাষায় বলেছেন ‘পুঁজিপতি অনুমোদিত সমিতি’। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণ পৃথক রাজনৈতিক দলে বিভক্ত হয়ে ক্ষমতা প্রাপ্তির সহিংস/অনুমোদিত পথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। ফলশ্রুতিতে সম্পদের বণ্টন ও বৈষম্যের মৌলিক প্রশ্ন অন্তরালে চলে যায়; গণমাধ্যম রাজনৈতিক প্রশাসনিক এলিটদের খবর প্রচার করে একটি উপরি কাঠামোর দ্বন্দ্ব জনগণের মনোযোগ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আবদ্ধ রাখে। ট্রেড ইউনিয়নের পুঁজিবাদীকরণ, দলীয়করণ, বিভক্তকরণ, খন্ডিতকরণ কোথাও আবার নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখে। রাজনৈতিক দলের উদ্ভব, বিকাশ, ক্ষমতারোহণ এবং তর্জমূল পর্যন্ত বিস্তৃত সাংগঠনিক কাঠামোর জন্য পুঁজিবাদী রাজনৈতিক দল যে কোন অসন্তোষ বা বিদ্রোহে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নেয়। আর এ কারণে বিদ্রোহ রূপ নেয় না সমাজ পরিবর্তনের বিপ্লবে। দুজন তাত্ত্বিক এই প্রসঙ্গে বলেছেন- “Democracy is essentially a means, a utilitarian device for safeguarding internal peace and individual freedom, with a commitment to the progressive extension of people’s capacity to govern their personal lives and social histories”^{৪২}

গণতন্ত্র আসলে ব্যক্তিক দক্ষতা, আর শান্তি রক্ষার নামে পুঁজিপতিকেই রক্ষা করে। সমস্ত রাষ্ট্রীয় বল প্রয়োগকারী শক্তি দিয়ে বিদ্যমান উৎপাদন সম্পর্ক রক্ষা করে গণতন্ত্র। পার্লামেন্ট নিয়ন্ত্রণে থাকায় দ্রুত কিছু বরাদ্দ দিয়ে, আইন করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখে রাজনৈতিক দলগুলো; পার্লামেন্ট এবং রাজনৈতিক দলগুলোতে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ থাকে পুঁজিপতিদের। এসব কোন কৌশল কাজ না করলে আপাত শান্ত গণতন্ত্র ভয়ংকর নখ-দন্ত নিয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নামে ধ্বংস করে, উপড়ে ফেলে বিরোধী মত। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি, মরণাত্তর সমৃদ্ধি আর পরাশক্তির সঙ্গে সেই স্থানিক শক্তির মিত্রতা বিচার করতে হবে এ প্রেক্ষিতেই। সপ্তদশ শতকে গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ পৃথক দুটি বিষয় ছিলো, অনেক ক্ষেত্রে তা সাংঘর্ষিকও ছিলো। তবে জাতীয় রাষ্ট্র বিশেষত কল্যাণকামী রাষ্ট্রের ধারণা প্রসারিত হলে গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ একই পাটাতনে সামিল

হয়। জনকল্যাণ প্রচারিত আদর্শ হলেও এর সত্যিকার লক্ষ ছিলো ‘সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী’ তৈরী করে পুঁজিবাদের উপজাত পরিষ্কারের আলোকে বিপ্লব তিরোহিত করা আর গণতান্ত্রিক সরকারকে জনপ্রিয় করা। এ প্রেক্ষাপটে মুলার বলেছেন, ‘It was the creation of the modern welfare state that finally enabled capitalism and democracy to coexist in relative harmony.’^{৪৩}

গণতন্ত্র চারটি প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রসার ও স্থায়ীকরণে ভূমিকা পালন করছে—

প্রথমত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রণোদনা, সরাসরি আর্থিক সাহায্য, ব্যাংক ঋণ দিয়ে পুঁজিপতির সম্পদ কেন্দ্রীকরণে সাহায্য করছে। পুঁজিপতিদের লুণ্ঠনে রাষ্ট্রের সমাহীন পৃষ্ঠপোষকতা এক্ষেত্রে বেশ ভালো উদাহরণ। বাংলাদেশে ২০২২ সালে খেলাপী ঋণের পরিমাণ ছিলো ১৩৪৩ বিলিয়ন টাকা।^{৪৪} আর এই খেলাপীদের সবাই ধনিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। গণতন্ত্রের কল্যাণে ট্রিলিয়ন ডলার প্যাকেজ প্রণোদনা পেয়ে গণতন্ত্র অন্তত দু’বার প্রাণ পেয়েছে। ১৯৩০’র দশকের মহামন্দা ও ২০০৮ সালের বিশ্বমন্দা মোকাবেলায় পুঁজিবাদ পেয়েছিলো ‘প্রণোদনা’ হিসাবে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অফুরন্ত সাহায্য। কসমোপলিটন-স্যাটেলাইট উভয় রাষ্ট্রই এ ভূমিকা নিয়েছে।^{৪৫} গতিশীল পুঁজিবাদ টিকে থাকে পুঁজিপতির ঝুঁকি আর উদ্যমের কল্যাণে। গণতন্ত্র এক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের প্রণোদনার ঝুড়ি বরাদ্দ করে। সম্পদ আর অর্থের ছাড় ছাড়াও গণতন্ত্র মহান পুঁজিপতিদের প্রদান করে শ্রম নিষ্পেষণের খোলা চেক।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় নীতিসমূহ পুঁজিপতিদের অনুকূলে বরাদ্দ করে গণতন্ত্র পুঁজির নিরাপত্তা, পুঞ্জীভূতকরণ ও কেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করে। কেবল স্থানিক বা জাতীয় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ নয়; আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ক্ষমতাধর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, উত্তর-আধুনিক বিশ্বে যাদের অ-রাষ্ট্রীয় সংস্থা (যেমন বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, ডাব্লিউটিও) বলা হয়, এক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের স্বার্থে উমেদারি কেবল নয়, সক্রিয় চাপ প্রয়োগকারীর ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টো আইএমএফের চাপে ৩শ’ কল-কারখানা বেসরকারিকরণ করেছিলেন ১৯৭৩ সালে। ১৩০০ আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য নিজ দেশে ঢুকতে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। বাংলাদেশে জেনারেল জিয়া-এরশাদ কসমোপলিটন কর্তাদের সমর্থন পেতে ১৯৭০ ও ৮০’র দশকে দেদার বিরুদ্ধীকরণ করেছিলেন। উপরন্তু, পুঁজিবাদের চলার পথ মসৃণ করতে গণতন্ত্র অনেক ক্ষেত্রে গণহত্যাকে অনুমোদন দিয়েছে। ঔপনিবেশিক ব্রাজিলে আখ ক্ষেতে কয়েক হাজার চাষীকে হত্যা করে ইনডেমনিটি পেয়েছিলেন প্রথম রকফেলার। দক্ষিণ আফ্রিকায় অসংখ্য গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে কৃষিভূমি দখল করেছিল ব্রিটিশরা। নৃ-বিজ্ঞানী এলিজাবেথ চোমাক দেখিয়েছেন, উপনিবেশিক রাষ্ট্রে দমন-পীড়নমূলক আইনের মাধ্যমে প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজের বীজ বপন করা হয়, যা পরে পুঁজিবাদের বিকাশকে নিশ্চিত করে।^{৪৬} তালাল আসাদের (১৯৯২) অনুসিদ্ধান্ত, উপনিবেশিক সমাজে পাশ্চাত্যের আলোক-প্রাণ্ড রাষ্ট্রসমূহ ধ্বংস আর নির্মাণের যে সমান্তরাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করে তাই অ-পশ্চাত্য সমাজে পুঁজিবাদের জন্ম দেয়।^{৪৭}

তৃতীয়ত, পুঁজিবাদী শোষণ সমাজে যাতে মধ্যযুগীয়/সামন্ততান্ত্রিক বৈষম্য সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য গণতন্ত্র পুঁজিপতি ও গণমানুষের মধ্যে বিরোধ মিমাংসার ভূমিকা নেয়। বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী এ প্রকল্পেরই অংশ। পুঁজিবাদী সব রাষ্ট্রেই কম-বেশি সামাজিক নিরাপত্তা বেটনী কর্মসূচি আছে। যুক্তরাষ্ট্রে মোট বাজেটের প্রায় ১৪ শতাংশ এ খাতের জন্য বরাদ্দ। বাংলাদেশে

শতাধিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আছে, যা ২০২২ সালের মোট বাজেটের ১৪.০৭ শতাংশ। বস্তুত এ-সকল কর্মসূচির মাধ্যমে রাষ্ট্র বৈষম্য উদ্ভূত ব্যাপক গণ-অসন্তোষ বা বিপ্লব নস্যাত্ন করে দেয়। ‘সামাজিক নিরাপত্তা’ কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। শিল্পের উপজাত হিসাবে যে বৈষম্যের উদগীরণ হয় রাষ্ট্র ‘গণতান্ত্রিক ও কল্যাণময়ী’র ভূমিকা নিয়ে নিজে তা পরিষ্কার করে, যদিও প্রায়শই তা ব্যর্থ হয়। কেননা এসব সাহায্য রাজনৈতিক সমর্থক তৈরী করলেও বৈষম্য দূর করে না।

চতুর্থত, পুঁজিবাদ ছাড়া ধর্মীয় কিংবা স্বপোষী (subsistence) অথবা সমাজতন্ত্রী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েমের যে কোন চেষ্টা গণতন্ত্র রক্তপাত আর চরম সহিংস প্রক্রিয়ায় উৎখাত করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সামরিক-বেসামরিক আমলা আর পুঁজিপতির ত্রয়ী শক্তি জোটবদ্ধভাবে আঘাত করে ভিন্নমতকে। আপাত নিরীহ, নিরপেক্ষ গণতন্ত্র বিরোধী মত নির্মূলে মৌলবাদ (fundamentalism) থেকে কোন অংশে কম সহিংস নয়। সমাজতন্ত্রকে গণতন্ত্র মৌলবাদের মতোই দমন করে। চিলিতে আলেন্দে, বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর ইন্দোনেশিয়ায় সুকর্ণকে হত্যার উদাহরণ কেবল নয়, আফ্রো-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় বিশ্বের ক্যারিশমাটিক নেতাদের হত্যা করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ রুদ্ধ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।^{৪৮}

গণতন্ত্র কেন পুঁজিবাদকে সমর্থন করে?

বিষয়বস্তু, পরিধি ও ধারণাগত পার্থক্য সত্ত্বেও রাজনৈতিক মতবাদ হিসাবে গণতন্ত্র সুপ্রাচীন একটি মতাদর্শ। মানব সভ্যতার লিখিত ইতিহাসের প্রারম্ভিক পর্যায়ে থেকেই ‘গণতন্ত্র’ অন্তত শাব্দিক বিচারে রাজনৈতিক/শাসন প্রক্রিয়ার অনুসঙ্গ। উন্নত গ্রীসে হেরাডোটাস-প্লেটো-এরিস্টটলের লেখনীতে তো বটেই ইউরোপ কথিত ‘বর্বর’ এশিয়ায় গণতন্ত্রের বাস্তবিক প্রমাণ রয়েছে প্রাচীন যুগেও। মতাদর্শিক জগতে কেবল নয়; পূর্ব বাংলায় অষ্টম শতকে পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠান ছিলো নিখাদ গণতান্ত্রিক। গণতন্ত্র হচ্ছে বিশ্বে টিকে থাকা সবচেয়ে প্রাচীন রাজনৈতিক মতাদর্শ। তবে আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গণতন্ত্রের সঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগের গণতন্ত্রের কার্যকর পার্থক্য রয়েছে। গ্রীকের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ ছিলো ক্রীতদাস। পুরো মধ্যযুগতো বটেই শিল্প বিপ্লবেরও দু’শতাব্দী পর নারী ভোটাধিকার লাভ করে। অর্থাৎ পূর্বের গণতন্ত্র ছিলো কেবল অভিজাতদের, আরো সংক্ষিপ্ত পরিসরে ধনিক পুরুষের। সমসাময়িক বিশ্বে আমরা গণ-মানুষের ভোটাধিকার কেন্দ্রিক গণতন্ত্র বলতে যা বুঝি তা পুঁজিবাদেরই সৃষ্টি। পুঁজিবাদের বিকাশই সারা বিশ্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এক্ষেত্রে দুটো বিষয় বিবেচনা জরুরি। প্রথমত, পুঁজিবাদ শুরুতে ছিল জাতীয়তাবাদী কারণ পুঁজির ক্ষীতকরণ ও কেন্দ্রীকরণের জন্য তা জরুরি ছিল। নিজ রাষ্ট্রে অন্য দেশের পুঁজিপতির পণ্য প্রবেশে বাধা দান কিংবা নিষিদ্ধ করেই স্থানিক পুঁজিপতি গড়ে তোলে কল-কারখানা। মুনাফা বৃদ্ধিতে শ্রম শোষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলেও বণিক শ্রেণির প্রধান লক্ষ্য ছিল উৎপাদিত পণ্যের বাজার নিশ্চিত করা। তখন গণতন্ত্রও ছিলো জাতীয় রাষ্ট্রের বিষয়। দ্বিতীয়ত, স্থানিক পুঁজি সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন আর কেন্দ্রীভবনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পুঁজিতে রূপান্তরিত হলে গণতন্ত্রও আন্তর্জাতিক প্রকল্পের অংশ হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমা বিশ্ব পুঁজিবাদের চলার পথ মসৃণ করতে বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্র রপ্তানি করে। বিভিন্ন সহায়তা প্রাপ্তির শর্ত হয়ে দাঁড়ায় গণতন্ত্র।^{৪৯} অনেক ক্ষেত্রে বল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশ্বে

সমাজতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করে। ল্যারি ডায়ামন্ড জানিয়েছেন, ১৯৭৪ সালে যখন গণতন্ত্রের তৃতীয় ঢেউ শুরু হয় তখন মাত্র ৪০ টি রাষ্ট্র ছিলো গণতান্ত্রিক, যার প্রায় সবকটি ছিলো পশ্চিমা বিশ্বের। পরবর্তী দুদশকের মধ্যে নির্বাচন কেন্দ্রিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৭টিতে।^{৫০}

সমসাময়িক বিশ্বে গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান আলোচক রবার্ট ডাল বলেছেন, ‘পুঁজিবাদ ঐতিহাসিক ভাবে গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত।’ *Democracy and Its Critiques* গ্রন্থে ডাল মন্তব্য করেছেন, গ্রীক নগর রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে শিল্পবিপ্লবোত্তর সাম্যমূলক পরোক্ষ গণতন্ত্র - সব ক্ষেত্রেই গণতন্ত্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ধনিকতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। জোসেপ সুম্পিটার গণতন্ত্রের উত্থানের সঙ্গে পতনের বিষয়েও পুঁজিবাদের প্রাসঙ্গিকতার কথা বলেছেন। রাজনৈতিক-অর্থনীতির অন্যতম তাত্ত্বিক সুম্পিটার গণতন্ত্রের উদ্ভব আর বিকাশকে আলোচনা করেছেন পুঁজিবাদের উত্থান আর পুঁজিপতির ক্ষমতা গ্রহণের ভিত্তি ভূমিতেই।^{৫১} অসংখ্য নজির তুলে নির্বিকার ভাবে বলেছেন: “history clearly confirms modern democracy rose along with capitalism, and is causal connection with it... modern democracy is a product of the capitalist process”।^{৫২} কোন দ্বিধা না রেখেই সুম্পিটার বলেছেন, পুঁজিবাদের সভ্যতা (civilization of capitalism)’র রাজনৈতিক অংশ হলো গণতন্ত্র। কেননা চলতি বিশ্বব্যবস্থা, ক্ষমতা-কাঠামো, বিজ্ঞানের মায়াময় আবিষ্কার, সমুদ্র গতিপথ থেকে শুরু করে প্রাত্যাহিক জীবনের অনুষ্ণ সব কিছুই সৃষ্টি করেছে পুঁজিপতির প্রণোদনা- উদ্যোগ। সুম্পিটারের ভাষায়:

“Not only the modern mechanized plant and the volume of the output that pours forth from it, not only modern technology and economic organization, but all the features and achievements of modern civilization are, directly or indirectly, the products of the capitalist process. Airplanes, refrigerators, television and that sort of thing are immediately recognizable as results of the profit economy...modern medicine and hygiene would still be by-products of the capitalist process just as is modern education”.^{৫৩}

কাজেই আধুনিক যন্ত্রময় বিশ্ব, সম-সাময়িক শিক্ষা ব্যবস্থা এমনকি জীবনরক্ষাকারী ওষুধের ক্যারিশমা সব কিছুরই নির্মাতা পুঁজিপতি। পুঁজিপতিদের বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন সরাসরি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। পুঁজিবাদ রাষ্ট্রে শিক্ষা এবং গণমাধ্যমের যে বিকাশ ঘটায় তা গণতন্ত্রকে পুষ্ট করে। সঙ্গত কারণেই উদারনৈতিক জীবনধারা, বহুত্ববাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতি সৃষ্টি এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে মুক্ত প্রতিযোগিতার চর্চার সুযোগের সঙ্গে পুঁজিবাদ সম্পর্কিত। এসব আবার গণতন্ত্রকে বাস্তবিক এবং শক্তিশালী করে দেয়।

গণতন্ত্র কেবল বাজার অর্থনীতি আর ব্যক্তিগত সম্পত্তির পুঞ্জীভূতকরণের সুযোগ সৃষ্টির মধ্যেই কার্যকর হতে পারে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা জরুরি রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য। সামন্ততান্ত্রিক, মোল্লাতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক কিংবা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বিধিব্যবস্থা/ ফ্যাসিজমে গণতন্ত্র নির্বাসিত হতে বাধ্য। বিশ্বের সমস্ত পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রই গণতান্ত্রিক; সমস্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই নিখাদ পুঁজিবাদী। বিপরীতক্রমে ইউরোপের মতো যেখানে বিকশিত পুঁজিবাদ নেই, সেখানে গণতন্ত্রও নেই। সামন্ততান্ত্রিক বা ধর্মতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদী কাঠামো যেখানে পুঁজিবাদ বিনাশ করতে পারেনি সেখানে বিভিন্ন নামে ওইসব ক্ষমতা-কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গই রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনা

করছে। মধ্যপ্রাচ্যে রাজতন্ত্র, আফ্রিকায় গোত্রতন্ত্র আর এশিয়ার দেশে দেশে বিভিন্ন ছদ্মনামে 'প্রাগ-ঐতিহাসিক স্বৈরতন্ত্র' রাষ্ট্র পরিচালনার প্রধান শক্তি।

পুঁজিবাদের বিকাশের তিনটি প্রধান ধারায় গণতন্ত্রের অথযাত্রাকে বিশ্লেষণ করেছেন বেরিংটন মুর। তাঁর মতে, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পুঁজিবাদের ভিন্ন বিকাশপথ এবং সেই পথে রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিবর্তনের সূত্র ধরে পুঁজিবাদের সঙ্গে বিকশিত হয়েছে গণতন্ত্র।^{৫৪} প্রথমত, সামন্ততন্ত্রের উপযোগিতায় ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, হল্যান্ডে ভূমি কেন্দ্রিক উদ্ধৃত আয়ের মধ্যে দিয়ে একটি ছোট কিন্তু ক্ষমতামালা বণিক সম্প্রদায় (commercial bourgeoisie)র উদ্ভব ঘটে। ইউরোপ-আমেরিকায় তারা ই নেতৃত্ব দেয় শিল্প বিপ্লবের। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে এই বণিক সম্প্রদায় আইন সভার কর্তৃত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। দ্বিতীয়ত, জার্মানি ও জাপানে পুঁজিবাদের বিকাশ প্রাপ্ত পথের পরিপন্থে পথে হয়নি। ভূমিকেন্দ্রিক অভিজাত শ্রেণি বণিক সম্প্রদায়ের উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। বস্তুত ক্ষমতা কাঠামোর এই দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী নিজেদের আপোষ-রফা ও রূপান্তরের মধ্যদিয়ে শিল্প বিপ্লবের জন্ম দেয়। কিন্তু সামরিক-রাজতান্ত্রিক কর্তৃত্ব কাঠামোকে তারা উপরে ফেলতে কিংবা চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি। বরং প্রবল পরাক্রমশীল রাজতন্ত্র এসব অঞ্চলে সরাসরি শিল্প স্থাপন ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে পুঁজিবাদের নামে চরম কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ফ্যাসিজমের জন্ম দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিকশিত ওই ফ্যাসিজমই রূপান্তরিত হয় গণতন্ত্রে। তৃতীয়ত, পুঁজিবাদের বিকাশের তৃতীয় পথটি বৈপ্লবিক ও সহিংস, যা সাধিত হয়েছে সোভিয়েত রাশিয়া বলকান অঞ্চল ও গণচীনে। মুরের মতে, রাশিয়ায় বণিক সম্প্রদায় এতটাই দুর্বল ছিল যে, তারা শিল্পের আধুনিকীকরণে নেতৃত্ব দিতে পারেনি। অক্ষমতার এ প্রেক্ষাপটে ক্রীতদাস তুল্য প্রান্তিক কৃষকদের (সার্ফ) হতাশাকে পুঁজি করে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বণিক সম্প্রদায়ের বিপ্লবী অংশ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে। জন্ম দেয় রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি তথা সমাজতান্ত্রিক কর্তৃত্ব কাঠামোর। রাশিয়াসহ বলকান অঞ্চলে সমাজতন্ত্র শিল্প স্থাপন ও আধুনিকীকরণে সফল হলেও রাজনৈতিক অস্থিরতা ও হতাশার জন্ম দেয়। শিল্পের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে কমিউনিজম এ অঞ্চলে গত শতকের শেষ দশকে রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থা হিসাবে কার্যত বিদায় নেয়; প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যক্তি মালিকানার গণতন্ত্র।

উপরের আলোচনা হতে স্পষ্ট, অগ্রসর ইউরোপ এবং আমেরিকায় পুঁজিবাদের সঙ্গে গণতন্ত্র কাঠামোগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিপরীতক্রমে, যেখানে পুঁজিবাদ তার পূর্ণরূপ এবং স্বকীয়তা নিয়ে আবির্ভূত হতে পারেনি সেখানে গণতন্ত্র অনুপস্থিত ছিলো। এর সহজ অর্থ হলো, আধুনিক গণতন্ত্র পুঁজিবাদেরই সৃষ্টি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতি ছাড়া এর বিকাশের পথ অনিশ্চিত। তিন শতাব্দী আগে পুঁজিবাদী শ্রেণী ছিলো সমাজ ও রাষ্ট্রের বিপ্লবী শক্তি। তারা (স্বাধীন কৃষক, বণিক, ক্র্যাফটম্যান) সামন্ততন্ত্র-চার্চ-রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলো প্রতিনিধিত্বশীল সরকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতাসহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের দাবিতে। ক্ষুদ্র তবে শক্তিশালী মধ্যবিত্তিক সেই পুঁজিপতি শ্রেণি একইসঙ্গে নেতৃত্ব দেয় রাজনৈতিক দল গঠনে, নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনের মাধ্যমে শিল্প-বিপ্লবের, ধর্মীয় সংস্কার-উদারতাবাদের প্রসারসহ রাজতন্ত্রের রক্তাক্ত উচ্ছেদ প্রক্রিয়ায়। তবে উপনিবেশের ঐতিহ্যবাহী তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বে গণতন্ত্রের বিকাশ প্রাপ্ত পথে হয়নি। সরাসরি সামরিক দখল-দারিত্ব, বণিকদের পুঁজি লুণ্ঠন আর উপনিবেশিক শক্তির দেশীয় লাঠিয়াল (যারা অভিজাত বলে কথিত) এর সমর্থনে স্থানিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-পারিবারিক কাঠামো ভাঙনের মধ্য দিয়ে ভারত-আফ্রিকা-ব্রাজিলে পুঁজিবাদের স্ফূরণ ও স্ফীতকরণ।

গণতন্ত্র ও আইন এক্ষেত্রে ছিলো দুই অ-ব্যাখ্য হাতিয়ার। বস্তুত এসব অঞ্চলের কৃষিভিত্তিক ও স্ব-পোষী (subsistence) অর্থনীতির শক্ত খোলশ স্থানিক চাহিদা, জনদাবি বা বিবর্তনের দ্বন্দ্বিক প্রক্রিয়ায় ভাঙেনি। ভেঙেছে জন ডায়ারের কামানের গোলায়, কর্ণওয়ালিসের পীড়নমূলক ভূমি ব্যবস্থায় এবং আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকায় শত শত হত্যা-জিঘাংসার ইনডেমনিটির কল্যাণে। তৃতীয় বিশ্বে পুঁজি গঠিতই হয়েছে রক্তাক্ত প্রক্রিয়ায়; সে কারণে গণতন্ত্রও এখানে রক্তাক্ত।

গণতন্ত্র বাজার কেন্দ্রিক অর্থনীতি ছাড়া সুসংগঠিত ও সফল হতে পারে না। যদিও গণতন্ত্রের জন্য বাজার অর্থনীতি একমাত্র শর্ত নয়, তবে প্রথম শর্ত। গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, ব্যক্তি অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, এক ব্যক্তি এক ভোট, নারীর ক্ষমতায়ন, গণমাধ্যমের বিকাশ- সবকিছুই পুঁজিবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। এক্ষেত্রে পিটার বার্জারের দুটি অনুকল্প খুবই কার্যকর আন্তঃসম্পর্ক নির্দেশ করে। প্রথমত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যদি অর্থনীতিতে কড়া হস্তক্ষেপ করে তবে গণতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে যায়; প্রতিষ্ঠিত হয় কর্তৃত্ববাদ। দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যদি অর্থনীতিতে উদারীকরণ শুরু করে তবে সমাজতন্ত্র বাতিল হয়ে এক পর্যায়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।^{৫৫} ১৯৯১ সালে পেরেস্তাইকা ও গ্লাসনস্তর কল্যাণে পরাক্রমশালী সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে ১৫ টি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় এই অনুকল্প নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে। কাজেই গণতন্ত্র এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত যা বাজার ও মুনাফা কেন্দ্রিক। আর এ কারণেই গণতন্ত্র নিজের প্রাতিষ্ঠানিকতার জন্য পুঁজিবাদকে সমর্থন করে। ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার ভাষায়-

“The relationship between capitalism and democracy is an indirect one. That is, capitalism in itself does not generate direct pressures for democracy. It is perfectly compatible with many forms of authoritarianism (though obviously not with communist totalitarianism), and may even flourish better in nondemocracies. But capitalism is a more efficient engine of economic growth than socialism, and thus is more likely to generate the rapid socioeconomic change that favors the emergence of stable democracy”.^{৫৬}

সামাজিক গতিশীলতার ধারণা দিয়ে ১৯৫০ ও '৬০-এর দশকে ডানিয়েল লার্নার (১৯৫৮), লিপসেট (১৯৫৯) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেন, গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সঙ্গে মাথাপিছু জিএনপি জোরালো সম্পর্ক রয়েছে। কেবল তাদের মত আর পরিসংখ্যানিক প্রমাণ নয়; সাধারণ যৌক্তিকতা এ দুটি চলকের সম্পর্ক নির্দেশ করতে যথেষ্ট। কেননা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত জাতিগোষ্ঠীর স্বাক্ষরতার হার, পুষ্টিমান, গণমাধ্যম ব্যবহারের মাত্রা, মনস্তাত্ত্বিক গতিশীলতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়নসহ জনগণের সার্বিক জীবন-মান উন্নয়ন। লিপসেটের মতে, গণতন্ত্র রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত। সুনির্দিষ্টভাবে, এর অর্থ হল যে একটি জাতি যত বেশি ভাল করবে, তার গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার সম্ভাবনা তত বেশি। অ্যারিস্টটলের প্রাচীন গ্রীস থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, শুধু একটি ধনী সমাজে যেখানে অপেক্ষাকৃত কম নাগরিকই প্রকৃত দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করতে পারে এমন একটি পরিস্থিতি থাকতে পারে যেখানে জনসংখ্যার জনগণ বুদ্ধিমত্তার সাথে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং প্রয়োজনীয় আত্মসংযম গড়ে তুলতে পারে। দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজনৈতিক নেতাদের আবেদনের কাছে নতি স্বীকার করা এড়িয়ে চলতে পারে। “একটি বৃহৎ

দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং একটি ছোট অভিজাত শ্রেণীতে বিভক্ত একটি সমাজের পরিণতি হলো অলিগার্কি বা কতিপয়ের স্বৈচ্ছাচারী শাসন”।^{৫৭} এরিস্টটলের মতো আধুনিককালে লিপসেট গণতন্ত্রের উদ্ভব এবং বিকাশের জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্ফীতকরণে জোর দিয়েছেন। ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ টেনে লিপসেট লিখেছেন: “these were the land in which the bourgeoisie were strongest, education most widespread, the central state weakest”।^{৫৮} বেরিংটন মুর-এর অনুসরণে লিপসেট লিখেছেন, গণতন্ত্র ছাড়া পুঁজিপতি টিকতে পারে না, আবার পুঁজিপতি ছাড়া গণতন্ত্রের উদ্ভব হয় না। শ্লোগানের আদলে তিনি লিখেছেন ‘*No Bourgeoisie, No Democracy*’। গণতন্ত্রে মধ্যবিত্তের অপরিহার্যতার যৌক্তিকতা তুলে লিপসেট লিখেছেন-“a society with a large middle class, particularly a self employed middle class, is more likely to foster democracy, to seek to inhibit state power and to accept political competition as legitimate, than one with extreme hierarchical differences.”^{৫৯}

পুঁজিবাদের সম্প্রসারণ কেবল জোরপূর্বক পন্থায় গণতন্ত্রের প্রসার আর স্থায়ীকরণ করে না। পুঁজিপতির সৃজনশীল উদ্যোগ আর আবিষ্কার ব্যক্তিকে বিমোহিত করে। ভোগবাদী আদর্শের চমৎকার বিজ্ঞাপন আর জ্ঞান জগতে জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ, বিশ্বায়ন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রভৃতি দর্শনের প্রচার করে পুঁজিবাদ ব্যক্তির মনঃস্বত্ত্ব গণতন্ত্রের পক্ষে গড়ে দেয়। এ প্রেক্ষাপটেই খোদ কার্ল মার্কসের বিপ্লবের ‘ভ্যানগার্ড’ প্রলেতারিয়েত শ্রমিক নিজেদের নিস্পৃহ হিসাবে আবিষ্কার করেন। জীবনক্ষয়ী বিপ্লবকে তারা বর্ণনা করেন ‘অহেতুক উৎপাত’ হিসাবে। এলেক্স ইনকেলেস এবং ডেভিড স্মিথ ছয়টি পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কয়েক হাজার শ্রমিকের সাক্ষাৎকার নিয়ে জানিয়েছেন, সংস্কৃতিগত ভিন্নতা থাকলেও এসব রাষ্ট্রের শ্রমিকরা বুর্জোয়া মতাদর্শ (নিস্পৃহতা, অংশগ্রহণমূলক রাজনীতি, অবাধ প্রতিযোগিতা) ধারণ করে।^{৬০} তারা বিপ্লবের মাধ্যমে ‘সর্বহারার একনায়কত্ব’ প্রতিষ্ঠার মতাদর্শে বিশ্বাসী নয়। তাদের গবেষণার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হলো- পুঁজিবাদ খোদ শোষিত শ্রমিকের মধ্যেও বিপ্লবের তাগিদ নস্যাৎ করে দিয়ে প্রলেতারিয়েতের মনঃস্বত্ত্ব গণতন্ত্রের প্রতি আত্মহীন করে তোলে। মনে রাখা জরুরি, কমিউনিস্ট বিপ্লব যেসব রাষ্ট্রে সম্পন্ন হয়েছে তার কোনটি পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিলো না। রাশিয়া-চীন-ভিয়েতনাম প্রাক-পুঁজিবাদী অথবা আধা-সামন্তান্ত্রিক স্তর থেকে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। কাজেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শ্রম শোষণের প্রেক্ষাপটে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নিজেকে রূপান্তরের নজির চলতি বিশ্বে নেই। রশিয়ায় ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লব সাধিত হয় কৃষক-শ্রমিক-জনতার সম্মিলিত প্রয়াসে। কার্ল মার্কস কথিত বিপ্লবে শ্রমিকদের অগ্রণী ভূমিকা সম্পর্কে পুরোপুরি আস্থা ছিলনা ভ্লাদিমির লেনিনের। তিনি ‘কমিউনিস্ট পার্টি’র ধারণা দিয়ে বলেন, বিপ্লবের ভানগার্ড হবে কমিউনিস্ট পার্টি। চীনে মাও জে-দং এর সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের প্রধান শক্তি ছিল ক্ষুদ্র-কৃষক। সমসাময়িক বিশ্বে চীন শিল্পোন্নত রাষ্ট্রের মর্যাদা পেয়ে জি-সেভেন ভুক্ত রাষ্ট্রের কাতারে দাঁড়াতে পারেনি। আর ভিয়েতনাম এখনো প্রধানত কৃষিনির্ভর সমাজ/রাষ্ট্র।

লিপসেট মধ্যবিত্তের বিকাশে পুঁজিবাদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেনি। তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, মধ্যবিত্তের বিকাশে মূল ভূমিকা পালন করে পুঁজিবাদই। বস্তুত শিল্প বিপ্লবের আগে কার্যকর ও স্ফীত মধ্যবিত্তের দেখা পায়নি কোন রাষ্ট্রই। শিল্প-কারখানা কেন্দ্রিক অর্থনীতিকে ঘিরে গড়ে ওঠে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান। প্রশাসনিক বিধি ব্যবস্থা। প্রসার ঘটে শিক্ষার। পুঁজির নিরাপত্তায় নতুনভাবে সাজানো হয় পুলিশ আর সেনাবাহিনী। নতুন চিন্তা ব্যাপকভাবে প্রসার ঘটায় সাহিত্য-

সংস্কৃতির। নতুন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশের উদ্ভবের ফল হিসাবে বিকাশ ঘটে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির। তাই পুঁজিবাদ কেবল বুর্জোয়া নয়, মধ্যবিত্তেরও ধাত্রী। মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটিয়ে পুঁজিবাদ অনিবার্য করেছে গণতন্ত্রের বিকাশও। গণতন্ত্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশেষত মাথাপিছু আয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। লিপসেটের মতোই, অ্যাডাম প্রজেওরস্কির বলেছেন, দরিদ্র রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা কম, মধ্যম আয়ের রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা অনেক বেশী।^{৬১} মানব সমাজের লিখিত ইতিহাস জানান দিচ্ছে, এক হাজার ডলারের নিচে আয়কারী রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। অন্যদিকে তিন হাজার থেকে ৬ হাজার ডলারের মধ্যে আয়কারী রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা মাঝারি। আর ৬ হাজার ৫৫ ডলারের উপর মাথাপিছু আয়ের রাষ্ট্রে গণতন্ত্র অনেকটাই নিরাপদ।^{৬২} কেবল প্রতিষ্ঠা নয়, গণতন্ত্র স্থায়ীকরণের সঙ্গেও পুঁজিবাদ তথা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয় সরাসরি সম্পর্কিত। প্রজেওরস্কি বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন নিম্নোক্তভাবে:

“We know that democracies are frequent among the economically developed countries and rare among the very poor ones. The paths to democracy are varied. Indeed, they seem to follow no predictable pattern. But once democracy is established, for whatever reasons, its survival depends on a few, easily identifiable, factors. Foremost among them is the level of economic development, as captured by per capita income.”^{৬৩}

গণমাধ্যম, গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ: ভোগবাদের বিকাশ

পুঁজিবাদী সংস্কৃতির বিকাশের কেন্দ্রে রয়েছে ভোগবাদের স্ফূরণ। উৎপাদক পুঁজিপতির পক্ষে ভোগবাদের বিকাশ ঘটায় গণমাধ্যম। গণমাধ্যম সম্মোহনী ক্ষমতা আর বহুমুখী সূক্ষ্ম প্রচার-প্রচারণা দ্বারা অনবরত সৃষ্টি করছে ‘অপ্রয়োজনের প্রয়োজন’। পুঁজিপতির মুনাফা বৃদ্ধির জন্য তা জরুরি, কেননা ভোগবাদের প্রসার ভোক্তার সংখ্যা বাড়ায়, ভোক্তা হয়ে পড়ে আধুনিক তথা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আবশ্যিক গ্রাহক।^{৬৪} ভোক্তারূপী আধুনিকতার আবশ্যিক গ্রাহকরা পুঁজিবাদ আর গণমাধ্যমের সমার্থক কেবল নয়, সেবাদাসে পরিণত হয়। গণতন্ত্র যেহেতু গণমাধ্যমের অবাধ স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয় সেহেতু ভোক্তা গণতন্ত্রেরও গ্রাহক।

গণমাধ্যম বিজ্ঞাপন, নাটক, সিনেমার মাধ্যমে সমাজে ভোগবাদী সংস্কৃতি গড়ে তোলে। রাষ্ট্র-সমাজ তো বটেই, নিজ চেতনা থেকেও ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিচ্ছিন্নতার সামাজিক-সাংস্কৃতিক পাটাতন রাজনৈতিক অসাম্যকে দৃঢ় ভিত্তি দান করে। বিপ্লবের জন্মগত অধিকারচ্যুত হয়ে ব্যক্তি পুঁজিবাদী গণতন্ত্র (capitalist democracy)’র বিমুখ দর্শক আর গ্রহীতায় রূপান্তরিত হয়। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে ব্যক্তির অবস্থান/অংশগ্রহণ কেবল ভোটদান আর পণ্য ক্রয়ে। তবে এক্ষেত্রেও সে স্বাধীন নয়; ভোট দানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি কেবল স্থিরকৃত বিকল্প (সম্পদশালী প্রার্থী) পছন্দ করে। অন্যদিকে পণ্যক্রয়ে ব্যক্তির চাহিদা, পছন্দ-অপছন্দ গণমাধ্যম সৃষ্টি করে নির্দিষ্ট পণ্যের ‘ব্রান্ডিং’-এর মাধ্যমে। দেশ-কাল-সংস্কৃতি ভেদে ভোক্তার মনোভূমিতে গণমাধ্যম খোদাই করে দেয় চলতি ব্র্যান্ডের নাম, হাল ফ্যাশন কিংবা পুরানো পণ্য বাতিল করতে লাগিয়ে দেয় ‘আধুনিক’ কিংবা ‘সেকেন্ডে’ তকমা। ভোগ চাহিদার সঙ্গে গণমাধ্যম বিনির্মাণ করে রাজনৈতিক মতাদর্শ। ‘কালচারাল ইন্ডাস্ট্রি’ হিসাবে গণমাধ্যম সংস্কৃতির উৎপাদন, পুনরুৎপাদন ও বিতরণ করে। ব্যাপক প্রবেশগম্যতার ক্ষমতায় টেলিভিশনের ক্ষমতা এখানে সব থেকে বেশি। কেননা নেপলিয়ান বলেছেন, “চারটি শত্রু ভবাপন্ন

সংবাদপত্র হাজার বেয়নেটের চেয়ে বেশি ভয়ংকর"।^{৬৫} গণমাধ্যম নির্মিত মতাদর্শ সঙ্গতকারণেই গণমাধ্যমের মালিক তথা পুঁজিবাদের বিরোধী নয়। বস্তুত গণমাধ্যম নিজের জীবন-মরণ-প্রসার-জনপ্রিয়তার জন্য পুঁজিবাদ আর গণতন্ত্রের পক্ষে অবস্থান নেয়। এডওয়ার্ড হারম্যান ও নোয়াম চমস্কি এ প্রেক্ষাপটেই *ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট* গ্রন্থে বলেছেন, শক্তিমানেরা নিজেদের প্রয়োজনে 'সম্মতি' আদায় করতে পারে, এমনকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ব্যক্তির চিন্তা আর কল্প-জগতও।^{৬৬} গণমাধ্যমের সর্বব্যাপী বিন্যস্ত এ ক্ষমতা অবশ্যই পুঁজিবাদের বিরোধী শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয় না; কেননা গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমানে পুঁজিরই (পুঁজিপতির) শিল্প। স্ব-পুঁজির নিরাপত্তার স্বার্থেই গণমাধ্যম সরাসরি অবস্থান নেয় গণতন্ত্রের পক্ষে। গণতন্ত্র বাদে আর সব মতবাদ পুঁজিপতি নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমে স্বৈরচারী, জঙ্গীবাদী, নিপীড়নমূলক কিংবা মানবতা-বিরোধী। এই প্রেক্ষাপটে আরেকটি প্রশ্ন সযত্নে ক্ষমতা নিয়ে দৃশ্যমান হয়-গণমাধ্যম প্রচার করে বলেই মানুষ তা বিশ্বাস করে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে, প্রথমে মুদ্রণ যন্ত্রের প্রসার এবং আরো পরে তরঙ্গায়িত (ইলেকট্রনিক্স) গণমাধ্যমের বৈপ্লবিক ও মনোজাগতিক ক্ষমতার ভিত্তি মূলে।

মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার আর ছাপার হরফ সমাজাতীয় সমাজ গঠনে মূল ভূমিকা রেখেছে। বেনডিক্ট এন্ডারসনের মতে, মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের কল্যাণে তৈরি হয় কল্পিত জনসমষ্টি (imagined community)। ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, জীবনচরণ, আর্থ-সামাজিক হতাশা/প্রত্যাশা সবকিছুকে কেন্দ্র করে ছাপার হরফই মানুষের মগজে বপণ করে জাতীয়তাবাদের বীজ। একইসঙ্গে চিন্তার বলয়ে নিয়ে আসে 'অন্যজাতি', 'বর্বর গোষ্ঠী'র ধারণা। জাতি 'কল্পিত', কেননা ক্ষুদ্রতম জাতির সদস্যরাও কখনো তাদের অধিকাংশ সদস্যদের চেনেনা অথচ প্রত্যেকের মনোজগতে তাদের প্রতিচ্ছবি ও যোগাযোগের ধারণা বিরাজমান।^{৬৭} কল্পিত এ বোধ (জাতীয়তাবাদ) ভাষা আর ছাপার হরফের ক্ষমতায় চার্চের ক্ষমতা সীমিত করে। সনাতনী শাসকদের হঠিয়ে বণিকগোষ্ঠীর শাসন প্রতিস্থাপিত করে। মুদ্রণযন্ত্রের কল্যাণে প্রতিস্থাপিত নতুন শক্তি নিজের ক্ষমতাকে বৈধতা দেয়। অ্যান্ডারসন এই প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছেন 'মুদ্রণ পুঁজিবাদ'-যা একাধারে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করে এবং শাসককে বৈধতা দেয় নিজ জনগোষ্ঠীকে শাসনের, দখলের।^{৬৮} গ্রামসি এক্ষেত্রে হেজিমিনিক ক্ষমতা ধারণার বিকাশ ঘটিয়ে আমাদের জানিয়ে দেন, গণমাধ্যমের কল্যাণে আধুনিক রাষ্ট্র দখল করে ব্যক্তির মনোজগত। আর সেই সূত্র ধরে সম্মতি আদায়ের মাধ্যমে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র প্রবল পরাক্রমশালী মুঘল বা জার শাসকের চেয়েও বেশি ক্ষমতা নিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তি ও সমাজ জীবন।

জাতীয়তাবাদের বোধ ছাড়া পুঁজির গঠন ও স্ফীতকরণ প্রায় অসম্ভব ছিল। কেননা প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজে জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়েই অন্য রাষ্ট্রের পণ্য নিষিদ্ধ করা হয়। জাতীয়তাবাদের নামেই যুদ্ধের ময়দানে লাখ লাখ তরুণ জীবন উৎসর্গ ও হরণ করে। সম্মোহিত এ বোধে কবিতা, গান, শোকস্তব, বীরত্বের প্রচার, নাটকসহ সৃষ্টিশীল কর্ম মহাপ্লাবনের মতো ছড়িয়ে পড়ে। আলোকয়ান যুগের পর এসব সৃষ্টিশীল কর্ম আর ব্যক্তি উদ্যোগ নেতৃত্ব দেয় শিল্প বিপ্লবের। পুঁজিপতির পক্ষে গণমাধ্যমের ক্যারিশমা (জাতীয়তাবাদ গঠন) এখানেই থেমে থাকেনি; উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কিংবা উত্তর-আধুনিক যুগে পণ্য চাহিদা তৈরি করে গণমাধ্যমই পুঁজির স্ফীতকরণে সনাতনী বারুদের ভূমিকা আত্মগোপন করেছে। পণ্যের উৎপাদন বাজারজাতকরণের (বা ক্রতাকে কিনতে বাধ্য করা) চেয়ে ঢের ঢের সহজ। বস্তুত গণমাধ্যমের বিজ্ঞাপন ধাপে ধাপে পণ্যের পক্ষে মানুষের মনঃস্তম্ভ পরিগঠন করে। প্রথমে তা কল্পজগতে দৃশ্যমান হয়, তারপর নানা ইমেজে

আচ্ছন্ন করে ব্যক্তির মধ্যে দুর্দমনীয় চাহিদার জন্ম দেয়, ব্যক্তিকে বাধ্য করে পণ্যটির অনিবার্য ক্রেতা হতে। যেমনটা ভোক্তারা সাধারণত বর্ণনা করে: “আমি একটি প্রয়োজনীয় পণ্যও কল্পনা করতে পারি, তাই আমি এটি চাই। আমি সেটা চাই, তাই আমার ওটা থাকা উচিত। আমার পণ্যটি থাকা উচিত, কারণ আমার ওটা দরকার। যেহেতু আমার পণ্যটি দরকার, তা আমার প্রাপ্য। পণ্যটি যেহেতু আমার প্রাপ্য, তা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু আমি করব”।

বস্তুত আধুনিক যুগে মানুষ আর চোখের দেখাকে বিশ্বাস করে না, যতক্ষণ না তা ছাপার অক্ষরে জানান দেয়; যেভাবে টেলিভিশনে ঘোষণা আসে। মানুষের চিন্তাজগৎ কল্পিত ছবি তৈরির কারখানা এবং সেখানে ব্যক্তি নিজের জগৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে। কিছু শ্রুতি, কিছু চলমান দৃশ্য, কিছু স্পর্শ ইন্দ্রিয়জাত বোধ এবং তার সঙ্গে অভিজ্ঞতার মিশ্রণে সে পরিবেশ সম্পর্কে মনোভাব, ভাল-মন্দ কিংবা পছন্দ-অপছন্দের তালিকা করে নেয়। অর্থাৎ আমাদের চেনা-জানা পৃথিবী, দেখার ধরন, কল্পজগত, এমনকি বাস্তব জগতেরও মালিক কিংবা নির্মাতা গণমাধ্যম।

পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র এবং গণমাধ্যমের মিথস্ক্রিয়া: আলোচনা এবং গবেষণা ফলাফল

ফিরে আসি প্রবন্ধের মূল প্রশ্নে, ‘পুঁজিবাদ কেন রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র কায়ম করে এবং গণতন্ত্র কেন পুঁজিবাদকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে পছন্দ করে?’ পুঁজিবাদ এবং গণতন্ত্রের মিথস্ক্রিয়ায় গণমাধ্যমের ভূমিকা কী? এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে দুটি আদর্শের জন্ম, বিকাশ, স্থায়িত্ব এবং নিরাপত্তা হুমকির মধ্যে। এই সেকশনের প্রথম ভাগে আমি পুঁজিবাদ কেন গণতন্ত্রের অনুগামী তা ব্যাখ্যা করবো এবং দ্বিতীয়ত অংশে ব্যাখ্যা করবো কিসব বিষয় গণতন্ত্রকে বাধ্য করে পুঁজিবাদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হতে। সবশেষে, গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ এবং গণমাধ্যমের মিথস্ক্রিয়া ব্যাখ্যা করবো।

রাজতন্ত্র, ধর্মতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র কিংবা সমাজতন্ত্র পুঁজির নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। কেননা এগুলো নিজেরাই এক ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আরোপ করে পুঁজিপতিদের বিনাশ সাধনে তৎপর হয়। অপরদিকে গণতন্ত্র প্রধানত রাজনৈতিক মতবাদ, যদিও তা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। ব্যক্তি মালিকানা, সম্পদ স্ফীতকরণ-পুঞ্জীভূতকরণ, অবাধ প্রতিযোগিতা আর উৎপাদনে রাষ্ট্রের অংশীদারীত্বহীনতার (বিরাস্ত্রীয়করণ) কথা প্রচার করে গণতন্ত্র পুঁজিবাদের পক্ষেই অবস্থান নেয়। সহজ কথায় গণতন্ত্র মার্কেট ব্যবস্থা বা উৎপাদন-বন্টনে সরাসরি হস্তক্ষেপ করেনা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে পুঁজিপতিদের অটোনমি স্বীকার করে। একদিকে গণতন্ত্র দেয় পুঁজির সুরক্ষা ও পুঁজিপতিদের স্বায়ত্ত্বশাসন আর অন্যদিকে তা ভোগবাদী আদর্শ-বিভ্রাণন প্রচার করে বিকাশ ঘটায় জাতীয় পুঁজির যা পরে রূপান্তরিত হয় আন্তর্জাতিক পুঁজিতে। দ্বিতীয়ত, ভোক্তা-উৎপাদক সম্পর্কের বহুমুখীকরণ ও বিস্তৃতকরণের ওপর নির্ভর করে গতিশীল পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদের বিকাশে মধ্যবিত্ত আর ক্ষিত ভোক্তা শ্রেণি জরুরি। রাজতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক কাঠামো (সামাজিক স্তর বিন্যাস) ভোক্তা শ্রেণির বিকাশে বাধা দেয়। গণতন্ত্র মধ্যবিত্ত তথা ভোক্তা শ্রেণির বিকাশে সক্ষম হাতিয়ার। কেননা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণমাধ্যম পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে জনগণের মনোজগতে ভোগের চাহিদা উৎপাদন ও পুনরোৎপাদন করে।

তৃতীয়ত, পুঁজিবাদের বিকাশে জবরদস্তির কার্যকর ভূমিকা রয়েছে, তবে তা মুখ্য নয়; মুখ্য ভূমিকা রাখে ব্যক্তির উদ্ভাবনী শক্তি আর অবাধ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে সম্পদ ও মুনাফা বৃদ্ধির দুর্বিনীত

লোভ। গণতন্ত্র ছাড়া অন্যান্য শাসন ব্যবস্থা কৃত্রিম ও জন্মগত অন্যান্য সামাজিক স্তর বিন্যাস চাপিয়ে দিয়ে ব্যক্তির উদ্ভাবনী শক্তি নষ্ট করে দেয়। আর এ কারণে পুঁজিবাদ বর্ণবাদ কেন্দ্রিক ধর্মতন্ত্র, নারীকে অন্তরীণ রাখার গোড়ামিপূর্ণ সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা, ভূমি কেন্দ্রিক সামন্ততন্ত্র বা মুনাফার স্বীকৃতিহীন সমাজতন্ত্রের ঘোর বিরোধী। চতুর্থত, গণতন্ত্র দ্রুতই পুঁজিবাদের মতো অভিযোজনে সক্ষম, এটি ধর্মতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের মতো কট্টর মতাদর্শ নয়। গণতন্ত্রের প্রচারিত মতাদর্শে আছে স্ব-বিরোধিতা। স্ব-বিরোধিতার মুখোশ গণতন্ত্রকে আপাত নিরপেক্ষ রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে জনমনে প্রতিষ্ঠিত করে। গণতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ ভাবমূর্তি ভিন্নমতাদর্শ দমন-পীড়নে খুবই সহায়ক। পঞ্চমত, পুঁজিপতি শ্রেণি ‘অবাধ প্রতিযোগিতা’ আর ‘ভোটের স্বীকৃতি’ নিয়ে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ, আইন বিভাগসহ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ সব প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ দখলদারিত্ব ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। মোল্লাতন্ত্রে সেটা সম্ভব নয়; রাজতন্ত্রে তা আরো অসম্ভব। সমাজতন্ত্রে তা অকল্পনীয়।

আধুনিক গণতন্ত্র পুঁজিবাদের সৃষ্টি; পুঁজিবাদের বিকাশ এবং চরিত্রের উপর নির্ভর করে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় পুঁজিবাদ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা রেখেছে। সমাজ ও রাজনীতির বৈপ্লবিক রূপান্তরের নিয়ামক ছিলো পুঁজিবাদ। এটি পরিবর্তন আনতে সাহায্য করেছে সমাজের সর্বত্র; ভূস্বামী ও কৃষক থেকে চাকরিদাতা ও চাকরিজীবী তৈরি, অশিক্ষিত জনসমাজ থেকে শিক্ষিত পৌর সমাজ নির্মাণ, গ্রামভিত্তিক সমাজ থেকে আধুনিক শহুরে জনগণ এবং সম্পদ ও ক্ষমতা পরিকাঠামোকে কতিপয়ের একচ্ছত্র দখল থেকে মুক্ত করে জনগণের মধ্যে বিস্তৃত বন্টন (wider dispersion of resources)- সবকিছু পুঁজিবাদের পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ অবদান। আর এসবের সম্মিলিত প্রভাবে পুঁজিবাদ সৃষ্টি করে মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার তুলনামূলক ভারসাম্যপূর্ণ বন্টনের চাহিদা, যা অনিবার্যভাবে গণতন্ত্রকে দৃশ্যমান করে তোলে।

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা আশ্চর্য উৎকর্ষতার ‘পিরামিড’ নির্মাণ করলেও মধ্যবিত্তের বিনির্মাণ করতে পারেনি। হামুরাবির ব্যাবিলন তো বটেই, মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপেও রাজনৈতিক প্রভাবশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণির উপস্থিতি নেই। মধ্যবিত্তের বিকাশ ম্যাক্স ভেবার কথিত পুঁজিবাদের গহবর থেকেই। বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষার বিকাশ আর পুঁজিপতিদের অবাধ প্রতিযোগিতা জন্ম দিয়েছে মধ্যবিত্তের। সামন্ততান্ত্রিক যুগে গণ-সমাজে শিক্ষার বিকাশ ঘটেনি। কৃষি ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা ও সামাজিক গতিশীলতার অভাবে নগরায়ণের হার ছিলো খুবই সীমিত। সত্যিকার অর্থে শিল্প বিপ্লবের আগে বিশ্বের কোথাও গণ-মানুষের জীবন-জীবিকা বা জীবন মানের খুব বেশী কোন উন্নয়ন হয়নি। প্রতিনিয়ত তাদের মোকাবেলা করতে হয়েছে দুর্ভিক্ষ, প্লেগ, মহামারী। সন্দেহ নেই গত তিনশ’ বছরে সারা বিশ্বে আমূল পাল্টে দিয়েছে পুঁজিবাদ। এ সময়ে যে উন্নয়ন হয়েছে তিরিশ হাজার বছরেও তা হয়নি। সুম্পিটার যথার্থ বলেছেন, ব্যক্তির উদ্ভাবনী শক্তিকে জাঘত করে পুঁজিবাদ বিজ্ঞানের প্রসারে নেতৃত্ব দিয়েছে। মুনাফার লোভ ব্যক্তির শ্রমঘণ্টা বাড়িয়েছে। জন্ম দিয়েছে নতুন সমাজ ব্যবস্থার, যার এক অবিচ্ছেদ্য উপ-ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ক্ষমতা চর্চার ধরন গণতন্ত্র। নিজের জন্ম, বিকাশের চাহিদা এবং বিনাশের আশঙ্কা দূর করতে গণতন্ত্র পুঁজিবাদকে সমর্থন করে। কেননা সমাজতন্ত্র বা একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থা কেবল উৎপাদন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় কমান্ডের অধীনে আনতে চায় না, তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনগণের পছন্দ ও রাজনৈতিক পদ দখলে অবাধ প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ করে। ফলত গণতন্ত্রের অপমৃত্যু হতে বাধ্য পুঁজিবাদ ভিন্ন অন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়।

অন্যদিকে, রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্র নির্মাণে গণমাধ্যম ভূমিকা রাখে এবং তা কোন নিরপেক্ষ বিষয় নয়। বিশ্বায়নের যুগে গণমাধ্যম মতাদর্শ বিনির্মাণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। কেননা গণমাধ্যম সংস্কৃতির বিনির্মাণে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। গণমাধ্যম আমাদের কাছে যা পেশ করে তা বাস্তব ও কল্পনার মেল বন্ধন। এই দুয়ের সমন্বয়ে গণমাধ্যম জনসমাজে পায় অপ্রতিরোধ্য প্রবেশ গম্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা। ফলত সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, রাজনৈতিক আদর্শ, রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিনির্মাণ, সংরক্ষণ বা রূপান্তরে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আধুনিক যুগে শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের সম্মতি আদায় হয় সংবাদপত্র আর টিভি নিউজের শিরোনামে। গণমাধ্যমের প্রচার রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে স্থিতিশীলতা দান করে, শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের সম্মতি আদায় হয়। গণমাধ্যম কোন সংস্থার ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে, তাকে দৃঢ় করতে পারে, আবার তার বিরুদ্ধে গণমতও গড়ে তুলতে পারে। অন্যান্য উপরি কাঠামোর মত গণমাধ্যমও উৎপাদন ব্যবস্থার উপর (বেসিক স্ট্রাকচার) নির্ভরশীল, যা পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণা-আদর্শ সৃষ্টির মাধ্যম। আন্তনিও গ্রামসীর অনুকরণে ফ্রেড ইনগ্লিস বলেন, স্কুল, চার্চ, রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন সংঘ, মিডিয়া ক্ষমতা কাঠামোর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। এগুলো মনস্তাত্ত্বিক আধিপত্য ও আদর্শ তৈরীতে কাজ করে।^{৬৯} অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণমাধ্যম পুরোপুরি পুঁজিবাদের উপর নির্ভরশীল কেননা তা কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে পুরোপুরি ব্যক্তিমালিকানাধীন; পুঁজিবাদের বিকাশের উপর নির্ভর করে টেলিভিশন, রেডিও এবং সংবাদপত্রের জন্ম, বিকাশ এবং গণমাধ্যম কর্মীদের জীবন-জীবিকা। গণতন্ত্রের প্রতিও তাদের পক্ষপাতিত্ব টিকে থাকার জন্য কেননা অন্যান্য রাজনৈতিক মতাদর্শ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বা মুক্ত মত প্রকাশের বিরোধী। ফলত নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে গণমাধ্যম জনসমাজে তেমন গ্রহণযোগ্যতা পায়না এবং তার বিকাশ থাকে খুব সীমিত। সঙ্গত কারণেই গণমাধ্যম অ-পুঁজিবাদী এবং অ-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধী। তাদের এই বিরোধিতা গণতন্ত্র-পুঁজিবাদের জোটবদ্ধতা এবং প্রসারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার

আধুনিক সমাজে পুঁজিবাদ টিকে আছে উদ্ভাবনী ক্ষমতা, মেধার স্বীকৃতি আর সামাজিক-সাংস্কৃতিক গতিশীলতার কল্যাণে। বলপ্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ একটি হাতিয়ার হলেও পুঁজিবাদের মূল ভরসা উৎপাদন সম্পর্কের জালে সমস্ত সমাজকে আটকে ফেলা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ব্যক্তির সম্মুখে অসংখ্য পদ, ব্যবসা, সম্পদ, সেবা উন্মুক্ত করে দিয়ে ‘মায়ার জগত’ তৈরি করে। ভোগবাদের সম্প্রসারণ ব্যক্তির চেতনা আচ্ছন্ন করে পুঁজিবাদের পক্ষেই তাঁর মনঃস্তব্ধ গড়ে দেয়। আর এ কারণেই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির পছন্দ গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ। অর্থনৈতিক কাঠামো ছাড়া স্বয়ং ক্ষমতা নিয়ে গণতন্ত্র কার্যকর হতে পারে না। বিকশিত পুঁজিবাদই গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ। কেননা গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ হিসাবে পরিগণিত বিষয়াবলি যেমন; গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক সচেতনতা, ব্যাপক জন-অংশগ্রহণ, নাগরিক দায়বদ্ধতা, পৌর-সংস্কৃতি, দায়িত্বশীল আমলাতন্ত্র সবই পুঁজিবাদের অনুষঙ্গ। এ কারণেই গণতন্ত্রের প্রাণ-ভ্রমর হলো পুঁজিবাদ।

আবার পুঁজিবাদ স্বভাবগত ও উদ্ভবগত কারণেই গণতন্ত্রের পক্ষে। অন্য কোনো রাজনৈতিক মতবাদ গণতন্ত্রের মতো পুঁজিবাদকে সহায়তা করে না। গণতন্ত্র একদিকে বাজার ব্যবস্থাকে পুঁজিপতিদের হাতে ছেড়ে দেয় অন্যদিকে তাদের অবাধ সুযোগ/বৈধতা দেয় সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণের, যা অন্য শাসন ব্যবস্থায় পদ্ধতিগতভাবে অসম্ভব। অনেকক্ষেত্রে সেসব মতবাদ (সমাজতন্ত্র, মৌলবাদ,

একনায়কতন্ত্র) পুঁজিবাদের স্বায়ত্ত্বশাসন উচ্ছেদ করে অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব আরোপের চেষ্টা চালায়; এমনকি পুঁজিপতিদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে বা তাতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায় (যেমন সোভিয়েত সমাজতন্ত্র বা জিম্বাবুয়েতে মুগাবের একনায়কতান্ত্রিক শাসন)। রাষ্ট্রে গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ অন্যান্য রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে ঘটনাচক্রে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সর্বদা একটি টেনশন এবং অবিশ্বাস কাজ করে। পল কিগামীর মতে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং চীনে পুঁজিবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্র বা অ-উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমন্বয় রাষ্ট্র প্রশাসনে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও অনিশ্চয়তার জন্ম দিয়েছে। বিপরীতে, গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ একে অপরের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং রাষ্ট্রে একটি স্থিতিশীল আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা দান করে। তারা এক-অপরের জীবন রক্ষাকারী বাতি বা ঢাল-বর্মের মতো কাজ করে। অবশ্যই তাদের মধ্যে আদর্শিক কোন সম্পর্ক নেই: বাস্তবিক ক্ষেত্রে তারা বিপরীতমুখী দর্শন ধারণ করে। গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের সমন্বয়কে দৃঢ় করে তাদের বাঁচার তাগিদ (সারভাইভাল ডিমান্ড) এবং গণমাধ্যম; বস্তুত এই দুই ব্যবস্থার মঝে গণমাধ্যম একটি সেতু হিসেবে কাজ করে। গণমাধ্যম একদিকে অব্যাহত প্রচারের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং উদার রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে জনমানসে প্রতিষ্ঠা করে অন্যদিকে এটি সমাজে ভোগের চাহিদার স্ফূরণ ঘটিয়ে পুঁজিবাদের বিকাশকে শক্তিশালী করে এবং অর্থনীতিতে পুঁজিপতিদের অটোনমি প্রতিষ্ঠা এবং তা বজায় রাখায় প্রহরীর ভূমিকা পালন করে।

তথ্যসূত্র

- ১ Joseph Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy* (New York: Harper and Row, 1946/1976), pp.82-83.
- ২ অ্যালমন্ড লিখেছেন: “capitalism is positively linked with democracy, shares its values and culture, and facilitates its development.” See, Gabriel Almond, “Capitalism and Democracy”, *PS: Political Science*, No.24, September 1991, p. 467.
- ৩ Robert A. Dahl, *On Democracy* (New Haven and London: Yale University Press, 1998), p. 4; Samuel Bowles, and Herbert Gintis, *Democracy and Capitalism: Property, Community, and the Contradictions of Modern Social Thought* (London: Routledge & Keagan Paul. 1986), p. 12.
- ৪ Joseph A. Maxwell, “Using qualitative methods for causal explanation”, *Field Methods*, Issue 16, 2004, p.244.
- ৫ Himika Bhattacharya, “Interpretive research.” In *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*, ed. L. M. Given (Thousand Oaks: Sage, 2008), p. 464.
- ৬ Joseph A. Maxwell, and Kavita Mittapalli, “Explanatory Research”. In *The Sage encyclopedia of qualitative research methods*, ed. L. M. Given (Thousand Oaks: Sage, 2008), p. 323.
- ৭ John W. Creswell, and Vicki Plano-Clark, (2006). *Designing and conducting mixed methods research*. Sage.
- ৮ Maxwell, 2004, *op.cit.*, p. 244; John Creswell, and Vicki Plano-Clark,, *op.cit.*, p. 126.
- ৯ Joseph A. Maxwell and Kavita Mittapalli, 2008, *op.cit.*, , p. 323.

- ১০ ম্যাক্স ভেবারের উদ্ধৃতি, Himika Bhattacharya, 2008, *op.cit.*, p.464.
- ১১ Larry Diamond, J. Linz and Martin Lipset, (eds.), *Democracy in Developing Countries: Africa* (Boulder: Lynne Reiner Pub, 1988).
- ১২ Robert A. Dhal, *Polyarchy: Participation and Opposition* (New Haven: Yale University Press, 1971), p. 34.
- ১৩ Guillermo O'Donnell, "Horizontal Accountability in New Democracies", *Journal of Democracy*, Vol. 9, no. 3 (July 1998), p.110.
- ১৪ Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), p. 3.
- ১৫ Seymour M. Lipset, "Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy", *The American Political Science Review*, Vol. 53, No. 1, 1959, p. 71.
- ১৬ Friedrich A. Hayek, *The Road to Serfdom* (London: George Routledge and Son, 1974), p.73.
- ১৭ F. Bealey, "Capitalism and Democracy", *European Journal of Political Research*, Vol. 23, 1993, p. 205.
- ১৮ Robert A. Dhal, *On Democracy* (New Haven and London: Yale University Press, 1998), p. 167.
- ১৯ Joseph Schumpeter, 1976, *op.cit.*, pp.82-83.
- 20 Colin Seymour-Ure, *The Political Impact of Mass Media* (New-Delhi: Sage Publication, 1974), p.15.
- ২১ Sidney Kraus and Richard M. Perloff, *Mass Media and Political Thought: An Information Processing Approach* (New Delhi: Sage Publication, 1985), p. 198.
- ২২ Daniel Learner, *The Passing of Traditional Society: Modernizing of the Middle East*, (New York: Free-Press, 1958), p.54.
- ২৩ Benedict Anderson, *Imagined Communities* (London: Verso, 1991), pp. 6-7.
- ২৪ বিপ্লবীদের তলোয়ার, গিলোটিন বা ফাঁসির দড়িতে প্রাণ হারান ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম চার্লস (১৬৪৯), ফ্রান্সে ষোড়শ লুই (১৭৯৩), রাশিয়ায় জার শাসক নিকোলাস (১৯১৭)। কেবল রাজাদের প্রাণ হরণ নয়; লাখে লাখে স্বপ্নবাদী তরুণ প্রাণ দিয়েছে বিপ্লবের ডামাডোলে। বারম্যান ফরাসী বিপ্লবের প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন, "vowing to eradicate democracy's enemies within as well as without, the new regime soon found itself at war both at home and abroad. In 1793 and 1794 came the Reign of Terror; historians estimate that 20,000 to 40,000 people were executed for "counterrevolutionary" activities (Berman, 2007: 32). Ó ð'Lyb, Sheri Berman, "How Democracies Emerge: Lessons from Europe", *Journal of Democracy*, Vol. 18, No. 1, 2007, pp. 31-34.
- ২৫ সাধারণত দলের প্রভাবশালী কয়েকজন নেতা নিয়ে গঠিত হয় ক্যাবিনেট। তবে বর্তমানে সংসদীয় গণতন্ত্রে ক্যাবিনেটের বদলে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর হাতে। এ বিষয়ে দেখুন, M. Gallagher, M. Laver, and P. Mair *Representative Government in Modern Europe* (New York: McGraw-Hill, 2004).

- ২৬ Almond, 1991, *op.cit.*, p. 467.
- ২৭ Bealey, 1993, *op.cit.*, p. 222.
- ২৮ Fareed Zakaria, *The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad* (New York: W.W. Norton, 2003), p.69.
- ২৯ Shumpeter, 1946, *op.cit.*, p.125. ; Lipset, 1959, *op.cit.*, p.71; Milton Friedman, *Capitalism and Freedom* (Chicago: University of Chicago Press, 1981), p.5.
- ৩০ A. Downs, “An Economic Theory of Political Action in a Democracy”, *The Journal of Political Economy*, Vol. 65, No.2, 1957, p. 139; Samuel Bowles and Herbert Gintis, *Democracy and Capitalism: Property, Community, and the Contradictions of Modern Social Thought* (London: Routledge & Keagan Paul. 1986), p.121.
- ৩১ A. Downs, 1957, *op.cit.*, p. 140.
- ৩২ Dhal, 1998, *op.cit.*, p. 165 ; Almond, 1991, *op.cit.*, p. 468.
- ৩৩ Dhal, 1998, *op.cit.*, p. 166.
- ৩৪ Seymour M. Lipset, “Reflections on Capitalism, Socialism and Democracy”, *Journal of Democracy*, Vol. 4, No. 2, April 1993, p.50.
- ৩৫ G. M. Tamas, “Capitalism, Socialism, and Modernity”, *Journal of Democracy*, Vol. 3, No.3, 1992, p.873.
- ৩৬ *Ibid*, pp.873-74.
- ৩৭ Robert A. Dhal, *Democracy and its Critics* (New haven: Yale University Press, 1989), p.5.
- ৩৮ Daniel Learner, *The Passing of Traditional Society: Modernizing of the Middle East*, (New York: Free-Press, 1958), p.32.
- ৩৯ ম্যাকলুহানের বিশ্লেষণে দেখা যায়, যোগাযোগের ইতিহাসে তিনটি মৌল উদ্ভাবনা মানুষের সমাজকে বদলে দিয়েছে। বর্ণমালা তৈরি করেছিল দৃষ্টিগোচর সংস্কৃতি। মুদ্রণ এর পরিসরকে বাড়িয়ে সূচনা করেছিল শিল্প বিপ্লবের। টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের ভিতর দিয়ে শুরু হয়েছিল তৃতীয় বিপ্লব এবং টেলিভিশন এর বর্ধিত রূপ। আধুনিক গণমাধ্যম বিশেষত টেলিভিশনই পৃথিবীকে পরিণত করেছে ‘ভুবনব্যাপী গ্রামে’। এক্ষেত্রে ম্যাকলুহানের বহুল প্রচারিত বিবৃতিটি হলো: ‘medium is the message’। we¹WiZ, Marshall H. McLuhan, *Understanding Media: The Extension of Man* (New York: McGraw-Hill Book Company, 1964), pp.7-14.
- ৪০ Charles Lindblom, *Democracy and Market System* (Oslo: Norwegian University Press, 1988), p.17.
- ৪১ *Ibid*, p. 135.
- ৪২ Bowles and Gintis, 1986, *op.cit.*, p. 17.
- ৪৩ Jerry Z. Muller, “Capitalism and Inequality: What the Right and the Left Get Wrong”, *Foreign Affairs*, Vol. 92, 2013, p 32.
- ৪৪ “খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১০ বছরে ৩ গুণ বেড়েছে: সিপিডি”, দ্যা ডেইলি স্টার (বাংলা), ঢাকা, শনিবার, ডিসেম্বর ১৭, ২০২২। (<https://bangla.thedailystar.net/economy/news-430366>)

- ৪৫ মহামন্দা মোকাবেলায় পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রগুলো প্রায় ৬ ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। ২০০৮ সালে মন্দা মোকাবেলায় কেবল যুক্তরাষ্ট্র ব্যয় করে ৭০০ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ সরকার এসময় পোশাক খাতসহ অন্যান্য রপ্তানী খাতে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা প্রণোদনা সাহায্য দেয়। (http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Recession_in_the_United_States)
- ৪৬ Elizabeth Comack (ed.), *Locating Law: Race/Class/Gender Connections* (Halifax: Fernwood Publishing, 1999), chapter 3.
- ৪৭ Talal Asad, “Conscripts of Western Civilization.” In *Civilization in Crisis: Anthropological Perspectives. Essays in Honor of Stanley Diamond*, ed. Christine Ward Gailey (Gainesville: University Press of Florida, 1992). Chapter 17.
- ৪৮ বিভিন্ন রাষ্ট্রে গণহত্যা এবং ক্যারিসমেটিক নেতাদের হত্যায় যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততার অভিযোগ বিষয়ক আলোচনার জন্য দেখুন, Christopher Hitchens, *The Trial of Henry Kissinger* (Washington, D.C.: Harper, 2001).
- ৪৯ Samuel P. Huntington, “Democracy’s third wave”, *Journal of Democracy*, Vol. 2, No. 2, 1991, p. 15.
- ৫০ Larry Diamond, “Why are There No Arab Democracies? *Journal of Democracy*, Vol. 21, No. 1, 2010, p. 93.
- ৫১ Joseph Schumpeter, 1946, *op.cit.*, p.124.
- ৫২ *Ibid*, p.124.
- ৫৩ *Ibid*, p.125.
- ৫৪ Barrington Moore, *The Social Origins of Dictatorship and Democracy* (New York: Beacon Press, 1966), pp.159-162.
- ৫৫ Peter Berger, *The Capitalist Revolution* (New York: Basic Book, 1986), p.17.
- ৫৬ Francis Fukuyama, “Capitalism & Democracy: The Missing Link,” *Journal of Democracy*, Vol. 3 (July 1992), p. 108.
- ৫৭ Lipset, 1959, *op.cit.*, p. 75.
- ৫৮ Lipset, 1993, *op.cit.*, p.44.
- ৫৯ Lipset, 1959, *op.cit.*, p. 79.
- ৬০ Alex Inkels, and David Smith, *Becoming Modern: Individual Change in Six Developing Countries* (Cambridge: Harvard University Press, 1974), p. 278.
- ৬১ Adam Przeworski, “Democracy and Economic Development”. In *Political Science and the Public Interest*, eds., Edward D. Mansfield and Richard Sisson (Columbus: Ohio State University Press, 1991), p.5.
- ৬২ *Ibid*, p.9.
- ৬৩ *Ibid*, p.12
- ৬৪ Talal Asad, 1992, *op.cit.*, ch. 17.

- ৬৫ নেপলিয়নের মতে, “Four hostile newspapers are more to be feared than a thousand bayonets”। D×,,wZi Rb” †`Lyb, Susan Ratcliffe, Oxford Essential Quotations (Oxford: Oxford University Press, 2018), p. 87.
- ৬৬ Edward S. Herman and Noam Chomsky, Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media (Pantheon Books, NewYork, 1988), p. 306.
- ২৪ Almond and Powel, op cit., 1980, p.39
- ৬৭ Anderson, 1991, op.cit., p.15.
- ৬৮ এন্ডারসন জাতির পরিগঠন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে “a nation is imagined because the members of even the smallest nation will never know most of their fellow-members, meet them, or even hear of them, yet in the minds of each lives the image of their communion [...] creation of imagined communities became possible because of print capitalism. Capitalist entrepreneurs printed their books and media in the vernacular in order to maximize circulation. As a result, readers speaking various local dialects became able to understand each other, and a common discourse emerged”. See Anderson, 1991, op.cit., pp. 6-7.
- ৬৯ Fred Inglis, Media Theory: An Introduction (Oxford: Oxford University Press, 1990), p.146.

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে চট্টগ্রাম শহর: নাগরিক সমাজের ভূমিকা

তাসলিমা ইসলাম*

Abstract

During World War II the famine of 1943 is struck in the Bengal province of British India. About three million people died due to malnutrition and disease. In this famine, Chittagong is the most effected city of east Bengal. The government failure to allocate sufficient rice or relief in this city. There is also rampant corruption and nepotism the distribution of government aid. On the other hand, half of the goods disappeared into the black market or into the hands of friend or relatives. As a result, In May and June famine became terrible in Chittagong. Deaths from starvation throughout this city and number of living skeleton increasing. In this situation communists, socialists, wealthy merchants, women's group and also at the individual level played an important role. This civil society served relief efforts, donations of money, food, treatment etc.

চাবিশব্দ: দুর্ভিক্ষ, চট্টগ্রাম শহর, সিভিল সোসাইটি, কম্যুনিষ্ট পার্টি

বাংলায় দুর্ভিক্ষ আঘাত হেনেছে বারবার। ১৭৭০ সাল থেকে অদ্যাবধি যেসকল দুর্ভিক্ষ বাংলায় আঘাত হানে তন্মধ্যে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ছিল ভয়াবহতম। বাংলা ১৩৫০ সালে এই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল বলে এটি ‘পঞ্চাশের মন্বন্তর’ নামেও পরিচিত। ১৯৪১ সালের গণনা অনুযায়ী, ২১ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৬৩ শতাংশ মানুষ অর্ধাহারে এই মহামারীর সাথে লড়াই করেছে। সরকারি সূত্র অনুসারে, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু হয় আর বেসরকারি তথ্য মতে, এই সংখ্যা প্রায় ৩৫-৩৮ লক্ষ।^১ বাংলায় আঘাত হানা ভয়াবহতম এই দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হয় চট্টগ্রাম শহরও। এই দুর্ভিক্ষে চট্টগ্রাম ছিল পূর্ববাংলার সবচেয়ে পীড়িত এলাকা। ভয়ংকর এই দুর্ভিক্ষ চট্টগ্রামবাসীর কাছে ‘তেতাল্লিশের রাড’ নামে পরিচিত। উল্লেখ্য, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ব্যতীত অন্য কোনো দুর্ভিক্ষ চট্টগ্রামকে তেমন আক্রান্ত করতে পারেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে জাপানের নিকট বার্মার পতন হলে সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ শরণার্থী চট্টগ্রাম শহরে এসে ভিড় জমায়। এছাড়া দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামাঞ্চলের মানুষও দলে দলে শহরটিতে আসে খাদ্যের সন্ধানে। ফলে শহরটির জনসংখ্যা হঠাৎ করেই বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে ১৯৪২ সালের শুরু থেকেই খাদ্যশস্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরই সাথে মুনাফা শিকারী, কালোবাজারী ও মজুতদারদের সীমাহীন লোভ, খাদ্যশস্যের চরম দুস্তাপ্যতা প্রভৃতি শহরটিকে দুর্ভিক্ষের চরম অবস্থায় পতিত করে। ১৯৪৩ সালের মে মাস থেকেই চট্টগ্রাম শহরের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। এ মহামারীর জটিলাবস্থা মোকাবেলায় শহরটির নাগরিক সমাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে চট্টগ্রাম শহরের অবস্থা এবং দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় শহরটির নাগরিক সমাজের ভূমিকা আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

গবেষণার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

১৯৪৩ সালের বাংলার এই দুর্ভিক্ষ নিয়ে সামগ্রিকভাবে অনেক গবেষণা হয়েছে। এছাড়া এই দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত বেশকিছু শহর নিয়েও বিভিন্ন গবেষণা পাওয়া যায়। তবে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে পূর্ববাংলার সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত চট্টগ্রাম শহরটি নিয়ে একক কোনো গবেষণা হয়েছে বলে জানা নেই। তাই প্রবন্ধটিতে দুর্ভিক্ষকালীন চট্টগ্রাম শহরের অবস্থা নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে উদ্ভূত দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি মোকাবেলায় শহরটির নাগরিক সমাজের ভূমিকা তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে যা আঞ্চলিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। প্রবন্ধটি রচনায় ইতিহাস গবেষণার বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে প্রাথমিক সূত্র হিসেবে Sir John Woohead এর 'Famine Inquiry Commission: Report on Bengal',^২ The Statesman, Peoples War, বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকা ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম শহরের দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষদর্শী প্রথিতযশা লেখক, সাহিত্যিক ও ব্যক্তিদের স্মৃতিকথা, আত্মজীবনী, লোকসাহিত্য প্রভৃতি প্রবাহমান সমাজ ও ইতিহাসের অন্যতম দলিলগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া দ্বিতীয়ক উৎস হিসেবে দুর্ভিক্ষের উপর লিখিত বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহও প্রবন্ধটিতে প্রয়োজনানুসারে ব্যবহৃত হয়েছে।

দুর্ভিক্ষপূর্ব চট্টগ্রাম শহর

প্রাচীনকালের বিখ্যাত চট্টগ্রাম বন্দর উনিশ শতকের শেষার্ধ্বে তার জৌলুস হারায়। কলকাতা বন্দরের উত্থানে চট্টগ্রাম বন্দর এ সময় থেকেই অনেকটা ম্লান হতে থাকে। যার প্রভাব পড়ে শহর বিকাশে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপূর্ব চট্টগ্রাম ছিল পূর্ববাংলার একটি ছোট বন্দর শহর। তবে এই বন্দর শহরটির অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা টিকিয়ে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চা, বস্ত্র, জাহাজ নির্মাণ-শিল্প প্রভৃতি। ১৯৪১ সালের গুমারি অনুযায়ী চট্টগ্রাম শহরের আয়তন ছিল ৪.৫৬ বর্গ কিলোমিটার আর লোকসংখ্যা ৯২,৩০১।^৩ এ সময় শহরটিতে সরকারি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্কুল-কলেজের শিক্ষক, ব্যবসায়ী, রেল শ্রমিক, মিস্ত্রি, কারিগর প্রভৃতি পেশার মানুষের বাস ছিল। তৎকালীন চট্টগ্রাম শহরটিতে ধন্যাঢ্য ব্যক্তির সংখ্যা খুব কম ছিল।^৪ সে সময় শহরটির জীবনযাত্রার মান ছিল কম। অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক মুহাম্মদ নূরুল করিম এর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, শহরটিতে এ সময় দ্রব্যমূল্য অনেক সস্তা ছিল। বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব সময়ে শহরটিতে অনায়েসেই এক টাকায় সাত সের খাঁটি দুধ, পাঁচ টাকায় এক মণ ভাল মানের চাল পাওয়া যেতো। এছাড়া একটি ভাল দোতলা বাড়ি মাত্র ২৫ টাকাতেই ভাড়া পাওয়া যেতো।^৫

দুর্ভিক্ষে চট্টগ্রাম শহর

১৯৪৩ সালের বাংলার তথা চট্টগ্রামের দুর্ভিক্ষের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন। এই বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার বাংলার সীমান্ত জেলা চট্টগ্রামকে সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করে। চলমান যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার চট্টগ্রামের পতেঙ্গা, হাটহাজারী, ডুলাহাজরা, চিড়িগায় সামরিক বিমান বন্দর স্থাপন ও সড়ক যোগাযোগ উন্নয়ন পরিকল্পনা হাতে নেয়। পরিকল্পনানুযায়ী কৃষকের ফসলি জমি নিয়ে নতুন নতুন রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়। এর ফলে এখানকার কৃষি জমি কমতে থাকে। বেকার হয়ে পড়ে এসকল এলাকার কৃষক শ্রেণি। অন্যদিকে ১৯৪২ সালের ১০ মার্চ জাপান বার্মা দখল করলে দেশটির সাথে চট্টগ্রামের সকল নৌ যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়। আরাকান-

চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ-চট্টগ্রাম প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ রুটে পরিবহন ও মালামাল বহনকারী সকল নৌ চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া কর্নফুলি, শঙ্খ ও হালদা নদীর বিভিন্ন উপনদীগুলোতে চলমান হাজার হাজার নৌ চলাচলও বন্ধ হয়ে যায়। এরূপ পরিস্থিতিতে একদিকে নৌ পেশার সাথে জড়িত অসংখ্য কর্মজীবী বেকার হয়ে পড়ে। অন্যদিকে নৌ চলাচল বন্ধের ফলে বার্মা থেকে চাল আমদানি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। চট্টগ্রাম শহরে চালের সরবরাহ কমে যায়। চাকতাই, খাতুনগঞ্জ এর মতো বড় পাইকারী চালের আড়তগুলো খালি হয়ে যায়। চরম অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে চালের বাজার। লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে চালের মূল্য। এ সময় চাল ছাড়াও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী, বস্ত্র ও নিত্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যাদি ছিল অপ্রতুল। ফলে প্রায় সকল পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় অস্বাভাবিক হারে। অথচ দ্রব্যমূল্যের এই উর্ধ্বগতির সময় শহরটিতে বাসরত সরকারি চাকরিজীবী বা শ্রমিক শ্রেণি কারোরই বেতন বৃদ্ধি পায়নি। পণ্যদ্রব্যের অপ্রতুলতায় বিপাকে পড়ে ব্যবসায়ী শ্রেণিও। ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শহরবাসী এক গভীর সংকটে নিপতিত হয়।

অন্যদিকে, জাপানের কাছে বার্মার পতনের পর সেখানে বাসরত চট্টগ্রামবাসী ফিরে আসে নিজ শহরে। এহেন যুদ্ধাবস্থায় বার্মার অনেক অধিবাসীও শরণার্থী হিসেবে চট্টগ্রাম শহরে আশ্রয় নেয়।^৬ খাদ্যের অপ্রতুলতায় গ্রামের নিরন্ন মানুষ দলে দলে শহরে ভিড় জমায়। চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক কর্মী, কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরীর বর্ণনায় এর যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায়।^৭ যুদ্ধ পরিস্থিতিতে শহরটির নাসিরাবাদে সামরিক ক্যাম্প স্থাপন করে ‘পাইওনিয়ার কোর’ এর বিপুল সৈন্যের সমাবেশ ঘটানো হয়। ফলে হঠাৎ করেই শহরটিতে জনসংখ্যা অত্যধিক বেড়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই হঠাৎ করে বৃদ্ধি পাওয়া বিপুল এই জনসংখ্যা শহরের খাদ্যের উপর ব্যাপক চাপ বাড়ায়।

চালের অপ্রতুলতা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্ব গতি, শহরে নিত্য বৃদ্ধি পাওয়া মানুষ প্রভৃতি জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সরকার ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে ১৫ হাজার থেকে ২০ হাজার মণ চাল রিলিফের জন্য বরাদ্দ দেয়।^৮ কিন্তু বরাদ্দকৃত এই রিলিফ বিপুল পরিমাণ মানুষের জন্য খুবই কম ছিল। চালের অপ্রতুলতায় ১৯৪২ সালের শুরু থেকেই চট্টগ্রামে চালের মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে ১৯৪৩ সালের শুরু থেকে মূল্যের এই উর্ধ্বগতি বাংলার অন্যান্য শহরকে ছাড়িয়ে যায়। নিচের সারণীতে তা স্পষ্টঃ

১৯৪৩ সাল	খুলনা	বর্ধমান	ফরিদপুর	চট্টগ্রাম
জানুয়ারি	১০ টাকা ৬ আনা	১১ টাকা ১২ আনা	১৩ টাকা ৪ আনা	১২ টাকা ৪ আনা
ফেব্রুয়ারি	১২ টাকা ৮ আনা	১৩ টাকা ৮ আনা	১৩ টাকা ৮ আনা	১৩ টাকা ২ আনা
মার্চ	১৮ টাকা ১২ আনা	২০ টাকা ৫ আনা	১৮ টাকা	২৫ টাকা
এপ্রিল	২২ টাকা ৮ আনা	২৩ টাকা ৮ আনা	২০ টাকা	২৪ টাকা
মে	৩০ টাকা	২৯ টাকা ১২ আনা	২৬ টাকা ৫ আনা	৩১ টাকা

১৯৪৩ সালের অক্টোবরে চট্টগ্রামে চালের দাম বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮০ টাকায়। অথচ এ সময় বাংলার অধিকাংশ জেলায় চালের দাম ছিল ৪০ থেকে ৫০ টাকা মণ।^৯ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শহরটির খাদ্য সংকট মোকাবেলার জন্য পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে চালের পরিবর্তে গম, বজরা আমদানি করা হয়। ফলে দুর্ভিক্ষকালীন চট্টগ্রাম শহরবাসীদের চালের পরিবর্তে বজরা খেতে হয়েছে। এ সম্পর্কে দুর্ভিক্ষকালীন চট্টগ্রাম শহরে অবস্থানরত বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবুল ফজল লিখেন,

চাউল শুধু দুর্মূল্য নয়, দুস্তাপ্যও। ছেলে বুড়ো সবাইকে ভাগাভাগি করে খেতে হচ্ছে কিছু ভাত, কিছু ছোলা সিদ্ধ, কিছু বজরা। বজরা কি চিজ তা চোখে দেখা দূরে থাক আগে কোনোদিন নামও শুনিনি। দেখতে কালো ঘাসের বিচির মতো। এখন তাই আমাদের খাদ্য।^{১১}

চরম এই খাদ্য সংকটের সময় শহরের অধিকাংশ মানুষ এই বজরাও খেতে পায়নি। অনেককেই শুধু এক বেলা খেয়ে দিনাতিপাত করতে হয়েছে।^{১২} শুধু চট্টগ্রাম নয় বাংলা জুড়েই দুর্ভিক্ষের একরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সরকার কলকাতাসহ অন্যান্য শহরে লঙ্গরখানা ও রেশন ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৪৩ সালের ২৯ মে চট্টগ্রাম শহরে বাংলার প্রথম লঙ্গরখানা খোলা হয়।^{১৩} কলকাতা বাদ দিয়ে চট্টগ্রাম শহরে প্রথম লঙ্গরখানা খোলা শহটির ভয়ানক দুরাবস্থার কথাই প্রমাণ করে। দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ১১ জুনের মধ্যে ইউনিয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে শহটির বিভিন্ন স্থানে ১৫টি লঙ্গরখানা খোলা হয়। লঙ্গরখানাগুলোতে প্রতিদিন ১,৫০০ দরিদ্র ও নিরন্ন মানুষদের খাবার দেয়ার ব্যবস্থা ছিল।^{১৪} তবে অনেকের ভাগ্যে এই খাবারও জুটতো না। কারণ বিপুলসংখ্যক নিরন্ন, বুভুক্ষু মানুষের জন্য লঙ্গরখানার এই খাবার ছিল অপ্রতুল যা চট্টগ্রামের কবিয়াল রমেশ শীল এর লেখায় স্পষ্ট ফুটে উঠেছে,

জাউ, খেচুরি পাইয়ম বুলি লঙ্গর খানাত যাই
হক্কে পাইল রে খানা আঁর ভাগ্যত নাই।^{১৫}

অন্যদিকে শহরটির দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সরকারের গৃহীত রেশন ব্যবস্থাও ব্যর্থ হয়। এই ব্যবস্থাটি ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল পণ্যদ্রব্যের স্বল্পতা ও বন্টন ব্যবস্থায় নৈরাজ্য। রেশন ব্যবস্থা চালু হলে সুযোগ সন্ধানীরা ভুয়া রেশন কার্ড বানিয়ে চাল, চিনি, কেরোসিন মজুদ শুরু করে। মজুদকৃত পণ্যসমূহ বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রি করে তারা লাখ টাকার মালিক হয়ে যায়।^{১৬} এছাড়া রিলিফ, রেশন ও লঙ্গরখানা ব্যবস্থায় চরম অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি প্রভৃতি নৈরাজ্য ব্যাপকভাবে কালোবাজারিকে উসকে দেয়।^{১৭} এই কালোবাজারি শহরবাসীর সংকটকে আরও ঘনীভূত করে। সাধারণ দরিদ্র শ্রেণিকে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দেয়। ফলে মে মাস থেকেই চট্টগ্রামের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে। রাস্তায় রাস্তায় কঙ্কালসার মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। খাবারের অভাব এতটাই প্রকট আকার ধারণ করে যে, শহরের রাস্তাগুলোতে মৃতদেহ পাওয়া যেতে থাকে।^{১৮} সরকারি তথ্যানুসারে, ১৯৪৩ সালের ২৮ জুন শহরের রাস্তায় দুর্ভিক্ষপীড়িত ১১ জনের মৃতদেহ পাওয়া যায়।^{১৯} ছোট্ট একটি শহরের রাস্তায় একদিনে এতগুলো মানুষের মৃতদেহ পাওয়া শহরটির দ্রুত অবনতিশীল দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির প্রমাণ। একরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে সরকার লঙ্গরখানায় আর খাদ্য সরবরাহ না করার সিদ্ধান্ত নেয়।^{২০} এই সিদ্ধান্তে চট্টগ্রাম শহরের দুর্ভিক্ষাবস্থা জটিল আকার ধারণ করে। শহরটির দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষদর্শী বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ আবদুল করিম লিখেন,

... ডাস্টবিন থেকে ক্ষুধার্ত ছেলেবুড়ো মেয়ে মানুষকে খাবার তাল্লাশ করে খেতে দেখেছি, ডাস্টবিন বা রাস্তার ধারে ক্ষুধায় মানুষের কাতরানি দেখেছি এবং মরা মানুষ দেখেছি।^{২১}

আরেক প্রত্যক্ষদর্শী আবুল ফজলের বর্ণনায়,

“... পথে পথে দেখা যাচ্ছে হাড়িসার মানুষের সারি। ঘরের দরজা খোলার উপায় নেই, অভুক্ত মানুষের প্রেতমূর্তি দেখে আঁতকে উঠতে হয়”।^{২২}

শহরটির দুর্ভিক্ষের করুণ চিত্র এঁকেছেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী,

ডাস্টবিনের চারিদিকে ক্ষুধাতুর মানুষ আর কুকুর খুঁজছে খাদ্য। বুড়ো ছেলে, নারী-পুরুষ সকলেই শাশানের প্রেতের মতো খাদ্য খুঁজছে। দলে দলে ছুটছে পথের ওপর দিয়ে লঙ্গরখানার উদ্দেশ্যে, অসংখ্য তারা। হাতে ভাঙা থালা, মাটির পাত্র, টিনের কৌটা। ঘুরছে দলে দলে নারী। তার গুঁকিয়ে যাওয়া স্তনে শিশুর জন্য দুধ নেই। ফুটপাতে আর জায়গা নেই। লঙ্গরখানা এদের জন্য স্বর্গ, ফ্যান (ভাতের মাড়) এদের কাছে অমৃত। এরা বাঁচতে চায়। নারীরা এতটুকু ফ্যানের জন্য উন্মুক্ত ফুটপাতে সতীত্ব বিসর্জন দিচ্ছে। স্ত্রী নয়, পুত্র নয়, পিতা নয়- কেউ আর আপনার নয়।^{২০}

এরূপ পরিস্থিতিতে অনাহারী মানুষ এমন অবস্থায় পৌঁছে যে, খাবার দোকানের সামনে অথবা খাবার গ্রহণকারীর পাশেই মৃত্যুবরণ করে। তারপরও কেউ কাউকে খাবার দিয়ে সাহায্য করে না। এমনকি ভাতের ফ্যান দিয়েও না। কারণ ফেলনা ফ্যানটিও এ সময় খুব দামি ছিল। মানবতার খাতিরেও কেউ কারো দিকে ফিরে তাকানোর সুযোগ ছিল না। তাইতো কবি রমেশ শীল লিখেন,

দুই বেলা কেহ খায়না, কেহ কারো পানে চায় না।
ভিক্ষা পায় না অন্ধ আতুর গনে।^{২১}

দুর্ভিক্ষের সময় আলোচ্য শহরটিতে অবস্থান করছিলেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী সোমনাথ হোর। দুর্ভিক্ষে লাখ লাখ মানুষের নিদারুণ কষ্টের ছবি দেখে সোমনাথ হোর বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি পার্টির (কমিউনিস্ট পার্টি) কাছে তাঁকে চট্টগ্রাম থেকে সরিয়ে নেয়ার আবেদন করেন। আবেদনে তিনি লিখেন,

“আমি না খেয়ে মারা যেতে রাজি আছি। এই দুর্ভিক্ষপীড়িত কল্লালসার মানুষের সামনে বসে আমি কি করে ভাত খাবো।”^{২২}

শহরটির দিনমজুর শ্রেণির নিদারুণ দূরাবস্থার কথা জানা যায় আবদুল করিমের প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে। খুব কাছ থেকে তিনি এই শ্রেণির ধুকে ধুকে নিঃশেষিত হওয়া দেখেছেন। তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেন,

... দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে করাচীদের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। ফলে ... পরিবারের পরিণতি হল ভয়াবহ। এবং করুণ। ... ৮ থেকে ১০ জনের একটা গোটা পরিবারের সকলেই এক এক করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।^{২৩}

শুধু দরিদ্র শ্রেণি নয় দুর্ভিক্ষ শহরটির মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভিতও নাড়িয়ে দেয়। চট্টগ্রাম কলেজের বাংলার শিক্ষক, বিশিষ্ট কবি আশুতোষ চৌধুরীর দুর্ভিক্ষকালীন সংকটে টিকে থাকার লড়াইয়ের কথা জানা যায় আবুল ফজলের লেখায়। আশুতোষ চৌধুরী চলমান মহামারীর সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবেলায় নিজের একমাত্র সম্বল বসত বাড়িটি বন্ধক রাখতে বাধ্য হন। তারপরও পরিবার নিয়ে দিনাতিপাত করা তাঁর জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে তিনি একটি রেশনের দোকান দেন।^{২৪} একজন কলেজ শিক্ষকের বই, খাতা, কলম রেখে হাতে দাঁড়িপাল্লা তুলে নেয়া, রেশনের দোকান দিয়ে সংসার চালানো দুর্ভিক্ষকালীন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির চরম দূরাবস্থার প্রমাণ। এ সময় শহরটির অনেক ছাত্রও বেঁচে থাকার জন্য লেখাপড়া ছেড়ে দিনমজুরি শুরু করে।

যেকোনো মহামারীতে নারীর অসহায়ত্ব অবর্ণনীয়। তাদের দুর্ভোগ-দুর্দশা বৃদ্ধি পায় সবচেয়ে বেশি। দুর্ভিক্ষকালীন চট্টগ্রাম শহরে অনাহারী নারীদের অসহায়ত্ব চরম আকার ধারণ করে। এহেন সংকটময় পরিস্থিতিতে নারীরা আর্থিক নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা, নিরাপদ আশ্রয় সবই হারিয়ে নিদারুণ অসহায় অবস্থায় পড়ে। এই অসহায়ত্ব মনুষ্যত্বের এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটায়। মনুষ্যত্বহীন

সমাজের প্রধান শিকারে পরিণত হয় অনাহারী নারীরা। শহরের সৈনিক শিবিরে চাহিদানুসারে দালালেরা অসহায় নারীদের সরবরাহ করতো। এছাড়া রাস্তা, সামরিক বিমান বন্দর তৈরির কাজ পাওয়ার জন্য কন্সট্রাক্টররা টাকা ঘুষ দেওয়ার পাশাপাশি নারী সাপ্লাই দিত। আর অনাহারী নারীরাও ছেলেমেয়েদের জীবন রক্ষার্থে, নিজের উদরপূর্তির জন্য অবলীলায় সতীত্ব বিক্রিয়ে দিতে বাধ্য হতো। কবিয়াল রমেশ শীলের কণ্ঠেও একই কথা ধ্বনিত হয়।^{১৮}

দুর্ভিক্ষের আরেক আঘাত বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাস থেকেই চট্টগ্রাম, বর্ধমান, মেদিনীপুরে ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, আমাশয় প্রভৃতি রোগ ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ে।^{১৯} চট্টগ্রামে কলেরা রোগের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা যায় কলকাতার সাপ্তাহিক পত্রিকা বসুমতী থেকে। পত্রিকাটির তথ্যমতে, ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে চট্টগ্রামের শহরে মৃতের সংখ্যা ছিল ৪ জন আর পূর্বের সপ্তাহে এই সংখ্যা ছিল ১৮ জন। গ্রামাঞ্চলে মৃতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৮৭ ও ২২৩ জন।^{২০} অর্থাৎ চট্টগ্রামে গ্রামাঞ্চলের তুলনায় কলেরা রোগের পরিস্থিতি শহরে ভালো ছিল। এছাড়া আলোচ্য কালপর্বে ‘গোদ রোগ’ নামে এক নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব হয় চট্টগ্রাম শহরে। কবিয়াল রমেশ শীলের লেখায়ও শহরটিতে বিভিন্ন রোগে মানুষের মৃত্যুর তথ্য পাওয়া যায়।^{২১}

উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যায়, ১৯৪৩ সালের প্রথম থেকেই চট্টগ্রাম শহরের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে। ক্ষুধা আর বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাবে মে-জুন মাস থেকে তা ভয়ংকর রূপ পরিগ্রহ করে। অবশ্য মে এবং জুন মাসে দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার অন্যান্য শহরগুলোর অবস্থাও প্রায় একই ছিল। এ দুই মাসে চট্টগ্রামসহ নোয়াখালী, রংপুর, ময়মনসিংহ, বাকেরগঞ্জ এবং ত্রিপুরায় মৃত্যু হার বেশি ছিল।^{২২} তবে চট্টগ্রাম শহরটির সর্বোচ্চ মৃত্যুহার ছিল জুলাই এবং আগস্ট মাসে। মৃত্যু হারের এই উর্ধ্বগতি অব্যাহত ছিল ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।^{২৩} মুসলিম লীগের সাহায্য সমিতির সম্পাদক চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেনের বরাত দিয়ে বসুমতী তথ্য দেয়, “গত ৫ মাসে (আগস্ট-ডিসেম্বর, ১৯৪৩) চট্টগ্রাম শহরের ৩০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ৩ হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে।”^{২৪} ১৯৪৪ সালের জুন মাস থেকে এই পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতে থাকে।^{২৫} সরকারি ও বেসরকারি তথ্য মতে, বাংলার অন্যান্য জেলার তুলনায় চট্টগ্রামে মৃতের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। Sir John Woodhead এর রিপোর্ট মোতাবেক, ১৯৪৩ সালে মৃত্যুর হার ছিল চট্টগ্রামে ১২১.০ শতাংশ, নোয়াখালী ৯৫.৬, ত্রিপুরা ১১৮.৬, ঢাকা ৮৬.৭ এবং ফরিদপুর ৫১.১।^{২৬} কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড যোশি এ সময় চট্টগ্রাম সফর করেন। তাঁর হিসেব মতে, ১৯৪৩ সালের অক্টোবরের আগেই চট্টগ্রামে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ।^{২৭} সুতরাং চট্টগ্রামের মৃত্যুহারের সরকারি ও বেসরকারি উভয় তথ্যই শহরটির দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করে।

নাগরিক সমাজ

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি মোকাবেলায় চট্টগ্রামের নাগরিক সমাজের ভূমিকা আলোচনার পূর্বে নাগরিক সমাজ সম্পর্কে একটু ধারণা দেয়া প্রয়োজন। ইংরেজি Civil Society শব্দের বাংলা পারিভাষিক শব্দ সুশীল সমাজ বা নাগরিক সমাজ। সমাজের যে অংশ রাষ্ট্রের নানা অনিয়ম ও অসংগতি নিয়ে কথা বলে তাদেরকেই নাগরিক সমাজ বলা হয়। নাগরিক সমাজের সম্পর্কে Larry

Diamond বলেন, Civil society is the realm of organized social life that is open, voluntary, bound by a legal order or set of shared rules.^{৩৮}

Suchit Bunbongkarn এর মতে, Civil society may encompass a wide range of organizations concerned with public matters.^{৩৯}

প্রকৃত পক্ষে নাগরিক সমাজ হলো বুদ্ধিবৃত্তিক রাজনৈতিক দল, নিরপেক্ষ স্বাধীন বেসরকারি গ্রুপ, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, শিক্ষিত ব্যক্তি প্রমুখ যারা স্ব উদ্যোগে রাষ্ট্র, সমাজ ও জনগণের মঙ্গলার্থে ও কল্যাণের জন্য কাজ করে থাকে। এটি একটি সংগঠিত গোষ্ঠী। এর সদস্যরা নাগরিক অধিকার অর্জনের জন্য নানাবিধ উপায়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করে। নাগরিক সমাজ জনগণের অধিকার সুরক্ষা ও এই বিষয়ে জনগণকে সচেতন করাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে সমাজের এই অংশ অপেক্ষাকৃত অগ্রসর। এরা সরকার ও অর্থনৈতিক ব্যবসায়ী গ্রুপগুলো থেকে পৃথক একটি তৃতীয় শ্রোতধারা।

উপনিবেশ পরবর্তী সময়ে নাগরিক সমাজের বিকাশ ঘটলেও প্রাচীনকাল থেকেই সমাজে এদের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। তবে সতেরো শতক থেকে আধুনিক পাশ্চাত্য সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে নাগরিক সমাজ শব্দ দুটি গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ নাগরিক সমাজের উপস্থিতি ও ভূমিকা সর্বকালেই ছিল এবং বর্তমানেও আছে। রাষ্ট্র ও সমাজভেদে এদের ধারণা ও ভূমিকা ভিন্ন। তবে নাগরিক সমাজ ধারণাটি অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রতিনিয়ত নব ব্যাখ্যার দ্বারা নবভাবে গঠিত হচ্ছে।^{৪০}

চট্টগ্রাম শহরের দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় নাগরিক সমাজের ভূমিকা

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে চট্টগ্রাম শহরের ভয়াবহ সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবেলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে শহরটির নাগরিক সমাজ। এই দুর্ভিক্ষের শুরুতেই বাংলার চরম খাদ্য সংকট মোকাবেলার জন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কলকাতা ও ঢাকায় খাদ্য আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে চট্টগ্রাম কমিউনিস্ট পার্টি^{৪১} শহরে একই কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শহরটির জেলা প্রশাসকসহ সকল রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম কংগ্রেস লীগ, মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, হিন্দু মহাসভা, সমাজতন্ত্রী দল, ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের কর্মীদের উপস্থিতিতে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। শহরের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি মোকাবেলার লক্ষ্যে উক্ত সভায় চট্টগ্রাম কংগ্রেস লীগের নেতা ব্যারিস্টার এস, এল খান্জুগীর ও মুসলিম লীগের নেতা খান বাহাদুর আবদুস সাত্তার (যুগ্ম সভাপতি) ও সমাজতন্ত্রী দলের নেতা শ্রী মজুমদার ও মুসলিম লীগের সাহায্য সমিতির সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেনের দ্বারা একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি শহরের পাঁচটি পৌর এলাকার প্রত্যেকটিতে একটি করে 'ত্রাণ ভান্ডার' খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই ত্রাণ ভান্ডার থেকে চাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। মাসিক ৩৫ টাকা (অনূর্ধ্ব) আয় বিশিষ্ট শহরের প্রত্যেক পরিবারকে রেশন কার্ডের মাধ্যমে চাল বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।^{৪২}

দুর্ভিক্ষকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলায় চট্টগ্রামের কমিউনিস্ট পার্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কমিউনিস্ট পার্টি শহরের দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় পূর্ণেন্দু দস্তিদারের (১৯০৯-১৯৭১) নেতৃত্বে 'ডিফেন্স কমিটি' গঠন করে।^{৪৩} এই কমিটির মাধ্যমেই কমিউনিস্ট পার্টি শহরে তাদের দুর্ভিক্ষকালীন বিভিন্ন

কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই পার্টি দুর্ভিক্ষপীড়িত শিশুদের জন্য শহরের রহমতগঞ্জে একটি ‘বেবি হোম’ খোলে। হোমটির তত্ত্বাবধানে ছিলেন ডা. এম এ হাশেম ও পূর্ণেন্দু দস্তিদার।^{৪৪} বুভক্ষ মানুষের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বাবধানে শহরের তিনটি এলাকায় তিনটি লঙ্গর খানা খোলা হয়।^{৪৫} অসহায় দুস্থদের চিকিৎসা সেবার জন্য এই পার্টির তত্ত্বাবধানে ‘দ্রাণ হাসপাতাল’ ও কালাজ্বর প্রতিরোধে ২৫০টি ‘কালাজ্বর কেন্দ্র’ খোলা হয়।^{৪৬} হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অসহায় ও দুস্থদের আশ্রয় দেয়ার জন্য পৃথক ‘অনাথ আশ্রম’ খোলা হয়।^{৪৭} এছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বাবধানে ‘ওয়ার্ক হাউস’, ‘মহিলাদের হস্ত শিল্প প্রকল্প’ প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং কালোবাজারী ও মজুতদারী রোধে ‘স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী’ গঠন করা হয়।^{৪৮} এ সময় চট্টগ্রাম জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি কল্পতরু সেনগুপ্তসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যেমন পূর্ণেন্দু দস্তিদার, কল্পনা দত্ত, ননী সেনগুপ্ত, রনধীর সেনগুপ্ত, বঙ্কিম সেন^{৪৯} (১৯১১-১৯৭৩), অনঙ্গ সেন (১৯১৩-১৯৯৮) প্রমুখ দিনরাত দ্রাণ বিতরণ ও মানুষের সেবায় নিয়োজিত ছিল। শহরটির দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি মোকাবেলায় কমিউনিস্ট পার্টির সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে ‘চট্টগ্রাম জেলা নারী সমিতি’ ও ‘জনরক্ষা ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি’। ‘চট্টগ্রাম জেলা নারী সমিতি’র নেত্রী নেলী সেনগুপ্তা^{৫০} ‘বেবি হোম’ এর অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি শহরটিতে দুর্যোগকালীন বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি প্রায় প্রতিদিন বিকেলে লালদিঘীর পশ্চিম পাশে সমাবেশ করতো। সমাবেশে দুর্ভিক্ষের কারণ বিশ্লেষণ করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বক্তব্য দেয়া হতো। সেই সাথে চোরাকারবারি ও মজুতদারদের বিরুদ্ধেও বক্তব্য দেয়া হতো। এছাড়া সমাবেশে বঙ্কিম সেন, হরিপদ কুশারী, রমেশ শীলের গান গাওয়া হতো।^{৫১} তেজেন সেনের গাওয়া গণসংগীতগুলো যেন শহরবাসীদের ধ্বংসস্তম্ভ থেকে নতুনভাবে বেঁচে উঠার প্রেরণা যোগাতো। তবে তাদের এই কাজ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলতে পারেনি। ছাত্র নেতা কমরেড বিশ্বনাথ ও কমরেড পি. যোশীর চট্টগ্রামে অবস্থান ও তাদের গতিবিধি এবং কমিউনিস্ট পার্টির অন্যান্য কর্মীদের উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারী কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।^{৫২}

চট্টগ্রামের দুর্ভিক্ষ স্থানীয় শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের মনকে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি তাদের সদস্য ও শিল্পী কমরেড সোমনাথ হোর (১৯২১-২০০৬) ও চিত্ত প্রসাদকে (১৯১৫-৭৮) দুর্ভিক্ষকালীন ছবি আঁকতে শহরে ও গ্রামে-গঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় পাঠায়। দুর্ভিক্ষের সময় চট্টগ্রাম শহরে পাঁচ দিনব্যাপী ‘ডিফেন্ড চিটাগাং’ শিরোনামে চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে চিত্তপ্রসাদ ও সোমনাথ হোরের দুর্ভিক্ষের ছবি ছাড়াও ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য স্টিভেনসন এবং ক্লাইভ ব্রেনসনের আঁকা ছবি ছিল।^{৫৩} এছাড়া চিত্তপ্রসাদ এর দুর্ভিক্ষের উপর ৩টি কার্টুন কম্যুনিষ্ট পার্টির পত্রিকা ‘জনযুদ্ধে’ প্রকাশিত হয়। যা সচেতন মহলকে ভাবিত করে, তাদের চিন্তকে নাড়া দেয়। তিনটি কার্টুনের দুটি দুর্ভিক্ষের চরম সময়ে প্রকাশিত হয়। ‘রেশন মালিকদের ফাঁকি ও চোরাকারবারি’ বিষয়ক কার্টুনটি ১৯৪৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি আর এ বছরের ২৪ নভেম্বর প্রকাশিত হয় ‘কৃষ্ণ কৃষক ও আড়তদার’ বিষয়ক একটি কার্টুন। কার্টুন দুটির মাধ্যমে চিত্তপ্রসাদ রেশন মালিকদের দুর্নীতি-নৈরাজ্য, আমন ধানের চোরাকারবারি, আড়তদারদের দখলদারিত্ব প্রভৃতি বিষয়টি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলেন। ১৯৪৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত তাঁর তৃতীয় কার্টুনটিতে কাপড়ের অভাবে পত্রিকা দিয়ে ঢেকে দেয়া একটি মৃতদেহকে দেখানো হয়। কার্টুনটি দুর্ভিক্ষের সময়ের বস্ত্রের অভাবকে নির্দেশ করে। চিত্তপ্রসাদের এ সকল কার্টুন ভারতের শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী মহলকে সচকিত করেছিল। ছবিগুলো

সম্পর্কে চিত্তপ্রসাদের সহযাত্রী শিল্পী সোমনাথ হোর এর মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য, “... তাঁর ছবিগুলো শিল্পীদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সতর্কবাণী হিসেবে কাজ করেছিল।”^{৫৪} চট্টগ্রামের দুর্ভিক্ষ নিয়ে গান বেঁধেছেন চট্টগ্রামের বিশিষ্ট কবিয়াল রমেশ শীল (১৮৭৭- ১৯৬৭) এবং তাঁর শিষ্য ফণী বড়ুয়া (১৯১৫-২০০১) ও রাইগোপাল দাশ (১৯১৮-১৯৮৭)।^{৫৫} তাদের গানে ফুটে উঠেছিল মন্বন্তরের মুখে উজাড় হওয়া চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চল ও শহরের বিধ্বস্ত জীবনযাত্রার ছবি।

দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সহায়তায় চট্টগ্রাম শহরের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বগণের ভূমিকাও ছিল প্রশংসনীয়। মাহবুব উল আলম চৌধুরী, সুচরিত চৌধুরী, বদিউল আলম, প্রভাত সেন, জামাল, জালাল, সত্য সাহা ও তাঁর বড় ভাই বিনয় সাহা, মহিউদ্দিন, ফনী ভূষন, রবি দত্ত প্রমুখ শহরের উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মুসলিম হলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উক্ত অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে শিল্পী সুচরিত চৌধুরী বাঁশ বাজায়, নৃত্য শিল্পী প্রতিমা চৌধুরী ও বন্ধু নৃত্য পরিবেশন করে এবং সংগীত শিল্পী উষা নন্দী ও প্রভাত কুমার সেন গান পরিবেশন করে। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে সাহিত্যিক মাহবুব উল আলম চৌধুরীর^{৫৬} (১৯২৭-২০০৭) রচিত ‘ভাঙন’ নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। অনুষ্ঠানের টিকেট বিক্রিতে সহায়তা করতে এগিয়ে আসেন ত্রিপুরা মডার্ন ব্যাংকের ম্যানেজার প্রবোধ বর্মণ, কুমিল্লা ব্যাংকিং কর্পোরেশনের ম্যানেজার হরলাল চৌধুরী, অশোকা দাশ এবং ব্যবসায়ী আহমদ কবীর চৌধুরী। তারা অনুষ্ঠানের অধিকাংশ টিকেট ক্রয় করে নেয়। বিক্রিত টিকিটের সকল টাকা ‘বেবি হোম’সহ বেশ কয়েকটি সাহায্য সংস্থাকে দেয়া হয়।^{৫৭}

চলমান মহামারী মোকাবেলায় দলগত প্রচেষ্টার সাথে সাথে ব্যক্তিগতভাবেও অনেকে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। কবি ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মাহবুব উল আলম চৌধুরীর ব্যবসায়ী মামা আহমদ কবীর চৌধুরী কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ‘বেবি হোমে’ নিয়মিত অর্থ সাহায্য প্রদান করেন। এছাড়া তাঁর অর্থায়নে বেশ কয়েকটি লঙ্গরখানও খোলা হয়।^{৫৮} শহরটির একজন কর্নেল (কর্নেল দাশ) এর স্ত্রী অশোকা দাশ শহরের ত্রাণকার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।^{৫৯} দুর্ভিক্ষের সময় চট্টগ্রামের খাদ্য সংকট মোকাবেলার জন্য চট্টগ্রাম কলেজের শিক্ষক আসহাব উদ্দিন আহমদ^{৬০} (১৯১৪-২০০৬) কম খাওয়ার আন্দোলন শুরু করেন। তিনি মানুষকে ভাত কম খেয়ে পানি বেশি খাওয়ার কথা বলেন। এছাড়া তিনি প্রত্যেককে একটু একটু করে কম খেয়ে খাবার বাচানোর পরামর্শ দেন। উদ্ভূত সংকটময় পরিস্থিতিতে অল্প পরিমাণে খাবার গ্রহণের উপর তিনি একটি প্রবন্ধও লিখেন। আসহাব উদ্দিন তাঁর বক্তব্য প্রচারের জন্য ছাত্রদের নিয়ে ‘দেশ-প্রাণ’ নামে একটি স্বেচ্ছসেবক বাহিনী গঠনের উদ্যোগ নেন।^{৬১} যদিও তাঁর এই উদ্যোগটি বেশি দিন চলে নি। তবে চরম খাদ্য সংকটের সময় সাময়িক সময়ের জন্য হলেও আসহাব উদ্দিনের উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে একটি ভালো উদ্যোগ ছিল। এভাবে চট্টগ্রাম শহরের দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কমিউনিস্ট পার্টিসহ শহরটির বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। এছাড়া শহরটির সংকটময় পরিস্থিতিতে ব্যক্তি পর্যায়েও সাধ্যমতো বিভিন্ন সাহায্য-সহযোগিতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, একদিকে চালসহ অন্যান্য খাদ্যশস্যের স্বল্পতা অন্যদিকে শহরে অনাহারী মানুষের দলে দলে নিত্য আগমন, পাইওনিয়ার কোরের সৈন্যশিবির স্থাপন প্রভৃতি শহরটির খাদ্য ভাণ্ডারে অধিক চাপ সৃষ্টি করে। উদ্ভূত সংকটময় পরিস্থিতিতে অপ্রতুল রিলিফ, রেশন, লঙ্গরখানা

এবং এগুলোর অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি শহরটির দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিতে আরও জটিল করে তোলে। ফলে দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত বাংলার অন্যান্য শহরের তুলনায় চট্টগ্রামের মৃত্যু হার অনেক বেড়ে যায়। দুর্ভিক্ষকালীন পরিবেশে শহরে কালোবাজারি, মজুতদারদের দৌরাড্রা, ডাস্টবিন থেকে কাক ও কুকুরের সাথে মানুষের খাবার ভাগাভাগির দৃশ্য, অনাহারে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু প্রভৃতি ছিল স্বাভাবিক এক নৈমন্তিক চিত্র। শহরটিতে এ ধরনের ভয়ানক অবস্থা বিরাজমান ছিল ১৯৪৩ সালের প্রথম থেকে ১৯৪৪ সালের মে মাস পর্যন্ত। চরম এই সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা ছিল খুবই অপ্রতুল। তার উপর সরকার কর্তৃক পরিচালিত লঙ্গরখানাগুলো মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যেই বন্ধ করে দিলে শহরটির দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। তবে চট্টগ্রাম শহরের সংকটময় দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ‘কমিউনিস্ট পার্টি’, ‘জনরক্ষা ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি’, ‘চট্টগ্রাম জেলা নারী সমিতি’সহ বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন। এছাড়া ব্যক্তি পর্যায়েও শহরটির সচেতন মহলের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। দুর্ভিক্ষের সময় শহরটির নাগরিক সমাজ ‘দ্রাণ ভাণ্ডার’, ‘দ্রাণ হাসপাতাল’, শিশুদের সুরক্ষায় ‘বেবি হোম’, হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক ‘অনাথ আশ্রম’, ‘ওয়ার্ক হাউস’, ‘মহিলাদের হস্ত শিল্প প্রকল্প’, কালোবাজারি ও মজুতদারি রোধে ‘স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী’ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে নাগরিক সমাজ শহরজুড়ে বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। আর এ সকল কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, স্বেচ্ছাসেবা ও শ্রম দিয়ে সার্বক্ষণিক শহরের দুর্দশগ্রস্ত মানুষের পাশে থাকে নাগরিক সমাজ। এছাড়া দুর্ভিক্ষের চিত্র প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিক্ষোভ সমাবেশ, সমাবেশে গণসংগীত পরিবেশন প্রভৃতির মাধ্যমে দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে শহরবাসীর মনোবল বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চট্টগ্রাম শহরের সচেতন নাগরিক সমাজের অক্লান্ত ও নিবেদিত শ্রম নিঃসন্দেহে শহরটিকে আরও ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করেছে। শহরটির সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবেলায় নাগরিক সমাজের এই ভূমিকা সত্যিই প্রশংসনীয়। দুর্ভিক্ষকালীন চট্টগ্রাম শহরজুড়ে নাগরিক সমাজের কর্মকাণ্ড সমাজের প্রতি এই গোষ্ঠীর প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্যের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. Sir John Woodhead, *Famine Inquiry Commission: Report on Bengal* (Delhi: Government of India press, 1945), pp. 109-110
২. বাংলা সরকার গঠিত প্রথম দুর্ভিক্ষ কমিশন। এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন স্যার জন উডহেড। সদস্য এস. ডি রামমূর্তি, মতিলাল নানাবতী, এম আফজাল হুসাইন ও ডব্লিউ. আর. ব্রুয়েড
৩. *Census of India 1941*, Vol. IV, Bengal Tables (Delhi: Manager of Publications, 1942), p. 26
৪. আবদুল করিম, *সমাজ ও জীবন* ১ম খণ্ড (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮), পৃ. ১০৯
৫. মুহাম্মদ নূরুল করিম, *স্মৃতিকথা* (ঢাকা: প্রকাশক আসমা খানম চৌধুরী, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯০), পৃ. ৫৪
৬. আবদুল করিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৭
৭. “গ্রাম থেকে ধীরে ধীরে অনাহাররক্কীষ্ট লোকজন শহরের দিকে আসতে শুরু করে। নিরস্ত্রের জোয়ার গ্রাম ছাপিয়ে এসে পড়ল শহরের চারিদিকে।” মাহবুব উল আলম চৌধুরী, *স্মৃতির সন্ধানে* (ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, এপ্রিল, ২০০৮), পৃ. ৮৮
৮. Sir John Woohead, *Op. cit.*, p. 72

৯. *Ibid*, p. 40
১০. P.C Joshi, 'Chittagong: The Front Line District', *Peoples War*, 21 November 1943; *The Statesman*, 7 October, 1943; Sir Azizul Haq, *Evidence before Famine Enquiry Commission*, 1945, Vol. II, pp. 426-38
১১. আবুল ফজল, *রেখাচিত্র* (ঢাকা: গতিধারা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৬), পৃ. ১৯৯
১২. Sir John Woodhead, *Op. cit*, p. 40
১৩. *Ibid*, pp. 41, 72
১৪. *Ibid*, p. 41
১৫. এস, এম, নূর-উল-আলম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *চট্টগ্রামের কবিয়াল ও কবিগান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি: জুন, ২০০৩), পৃ. ৩৪
১৬. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭
১৭. J. Mukharjee, *Hungry Bengal: War, Famine and The End of Empire* (New York: Oxford University Press, 2015), p. 175.
১৮. মুহাম্মদ নূরুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪
১৯. Sir John Woodhead, *Op. cit*, p. 41
২০. *Ibid*, p. 73
২১. আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০
২২. আবুল ফজল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯
২৩. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮
২৪. এস, এম, নূর-উল-আলম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫
২৫. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮
২৬. আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০
২৭. আবুল ফজল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১
২৮. অল্পে-বল্পে পেয়ে কষ্ট, কত সতীদের সতীত্ব নষ্ট, দারুণ এই উদরের কারণে।। এস, এম, নূর-উল-আলম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫
২৯. Arup Maharatna, *The Demography of Indian Famines: A Historical Perspective*, (London: London School of Economics and Political Science, 1992), p. 268.
৩০. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বসুমতী', ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৩, ৪৮ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, পৃ. ৪
৩১. "মরে গিয়েও যারা আছে, তারাও মরতে বসেছে অনাহারে আর রোগের পীড়নে।" এস, এম, নূর-উল-আলম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫
৩২. Sir John Woodhead, *Op. cit*, p. 112
৩৩. *Ibid*, p. 227
৩৪. বসুমতী, ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৩, ৪৮ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, পৃ. ৩
৩৫. Sir John Woodhead, *Op. cit*, p. 73
৩৬. *Ibid*, p. 114
৩৭. P. C. Joshi, Chittagong: The Front Line District, *Peoples Power*, 21 November, 1943; *The Statesman*, 23 November, 1943
৩৮. Larry Diamond, *Development of Democracy: Toward Consolidation*, (Baltimore: The John Hopkins University Press, 1999), p. 218

৩৯. Suchit Bunbongkarn, *The Role of Civil Society in Democratic Consolidation in Asia*, <http://dkiaspcss.edu>, p. 138
৪০. Michael Edwards, *The Oxford Handbook of Civil Society*, (New York: Oxford University Press, 2011), p. 13
৪১. ১৯৩৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির চট্টগ্রাম শাখাটি গঠিত হয়। এর প্রথম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ননী সেনগুপ্ত। দুর্ভিক্ষকালীন চট্টগ্রাম কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন কল্পতরু সেনগুপ্ত
৪২. শ্রেমাংশু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, '৪৩ এর বাংলায় দুর্ভিক্ষ ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি', *নন্দন পত্রিকা*, শারদ সংখ্যা (পশ্চিমবঙ্গ: উত্তর দিনাজপুর, ১৯৯৬), পৃ. ৫০২, <http://dspce.wbpublibnet.gov.india>; *Peoples Power*, 21 November, 1943
৪৩. কমলেশ দাশগুপ্ত, *প্রাচীন হিন্দু সমাজ ও সেকালের হিন্দু সমাজ* (চট্টগ্রাম: খড়িমাটি, অক্টোবর, ২০১৮), পৃ. ৫২৬
৪৪. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯
৪৫. তদেব, পৃ. ৯০, ৯২
৪৬. কমলেশ দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৬
৪৭. *The Statesman*, 23 November, 1943
৪৮. কমলেশ দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৬
৪৯. চট্টগ্রাম কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য বঙ্কিম সেন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্গ সংগঠন 'কৃষক সমিতি' ও 'সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের' অন্যতম উদ্যোক্তা
৫০. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেত্রী নেলী সেনগুপ্ত (১৮৮৬-১৯৭৩) চট্টগ্রামের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের স্ত্রী। ১৯১০ সালে স্বামীর সাথে নেলীও কলকাতায় কংগ্রেস রাজনীতিতে যোগ দেন। তিনি ১৯৪০ ও ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য ছিলেন
৫১. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯
৫২. শ্রেমাংশু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০২
৫৩. কমলেশ দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২২
৫৪. শুভেন্দু দাশগুপ্ত, *জনযুদ্ধে সোমনাথ হোর* (মুর্শিদাবাদ: উদ্ভাস, সেপ্টেম্বর, ২০২১), পৃ. ৮
৫৫. 'হাজার বছরের চট্টগ্রাম', *দৈনিক আজাদী*, ৩৫ বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা (চট্টগ্রাম: নভেম্বর, ১৯৯৫) পৃ. ৩৬
৫৬. মাহবুব উল আলম চৌধুরী একাধারে কবি, সাংবাদিক, সাহিত্যিক এবং ভাষা সৈনিক। ১৯২৭ সালে চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি চট্টগ্রাম জেলা ছাত্র কংগ্রেসে যোগ দেন। একুশের প্রথম কবিতাটি তিনি রচনা করেন। ২০০৯ সালে মাহবুব উল আলম মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত হন।
৫৭. মাহবুব উল আলম চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪
৫৮. তদেব, পৃ. ৯০
৫৯. তদেব, পৃ. ৯২
৬০. অধ্যাপক আসহাব উদ্দিন আহমদ ১৯১৪ সালে চট্টগ্রামের বাঁশখালীর সাধনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আজীবন সংগ্রামী এই শিক্ষাবিদ ২০০৫ সালে মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত হন
৬১. আবদুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২- ১১৩

বাংলাদেশের মুদ্রিত বিজ্ঞাপন শিল্প: অতীত, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভবনা

মারুফ আদনান*

Abstract

As information technology advances, advertising is having the greatest influence on people's lives. Advertisements may be seen online or offline, in newspapers or on TV. Advertising dominates newspapers, radio, television, internet, YouTube, Facebook and other social media platform. Before digital technology became prevalent, most advertising was done via various forms of print media. In the past, popular forms of advertising included direct poems, songs, canvassing, short plays, or circuses; yet, these strategies continued to evolve as a result of the development of various printing processes. Employing qualitative research techniques, this study provides a concise overview of the evolution of print and newspaper advertisements, as well as data pertinent to Bangladeshi newspapers published at various periods. This research uncovers both the history of printed advertisements in Bangladesh after the partition as well as the culture of advertising in the country.

চাবিশব্দ: বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্র, মুদ্রণ, দেশভাগ-উত্তর, বাংলাদেশ

ভূমিকা

উৎপাদনকারী পণ্য, সেবা বা নতুন ধারণা বিক্রয়ের জন্য ব্যবহারকারী বা ভোক্তার কাছে যে ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ায় যোগাযোগ স্থাপন করে তাকে বিজ্ঞাপন বলা হয়। তবে বিজ্ঞাপন সরাসরি ব্যবসার উদ্দেশ্য ছাড়াও হতে পারে। প্রচারিত বিজ্ঞাপনের বিষয়, নান্দনিকতা ও টেক্সটের ব্যবহার থেকে একটা জনগোষ্ঠীর রুচি-অভিরুচির ধারণা পাওয়া যায়। ঘরে কিংবা বাইরে বিজ্ঞাপনের সাথেই মানুষের বসবাস। বাড়ির ছাদে বা মোড়ে দেখা মেলে বিলবোর্ডের, দেয়ালে পোস্টার বা বিজ্ঞাপন না লেখার জন্য বিজ্ঞাপন, চাকরির বিজ্ঞাপন, বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপন, পড়াতে চাই, পাত্রী চাই, চিকামারা বা দেয়াল লিখন, গাড়ি বাজমি বিক্রির বিজ্ঞাপন, রঙবেরঙের সাইনবোর্ড, ব্যানার, পোস্টার, লিফলেট, ফ্লয়ার, ক্রশিয়ার, নিয়ন সাইন, এলইডি ডিসপ্লে, মাইকিং, ফুটপাতে শত রকম পণ্য আর শত বিক্রেতার হাঁকডাক ইত্যাদি। ঘরের মধ্যেও নিত্য পৌঁছে যাচ্ছে বিজ্ঞাপন। সংবাদপত্র,



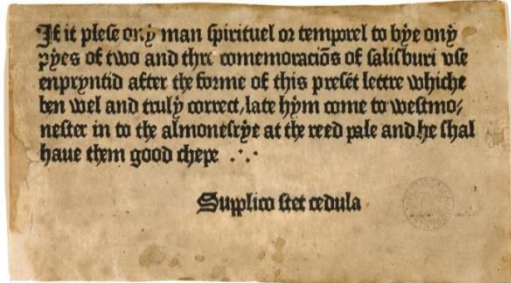
চিত্র ১: Jinan Liu's Kung-Fu Needles Shop-এর বিজ্ঞাপনের জন্য তৈরিকৃত লগো সম্বলিত তামার প্লেট। ছবির উৎস: Wikimedia Commons

* সহকারী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, ইউটিউব, ফেসবুক, টুইটার, মোবাইল মেসেজে, অনলাইনে, অফলাইনে নানান উপায়ে বিজ্ঞাপন প্রতিটা মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। মানুষের আবেগ, রুচি ও সাজসজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ, চলাফেরা, জীবনধারা সবকিছুর উপরে বিজ্ঞাপনসংস্কৃতির বড় প্রভাব রয়েছে। এমনকি মানুষের মুখের ভাষাকেও প্রভাবিত করেছে বিজ্ঞাপন। আজকের বিশ্বে বিজ্ঞাপন সংস্কৃতি এতো বেশি প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে উঠেছে যে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের চল দিন দিন কমে আসছে। বিজ্ঞাপনের ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে একটি অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিল্পসাহিত্য, যোগাযোগ সবকিছুই। পূর্ববাংলায় ব্রিটিশ শাসন অবসানের পর সামাজিক ও অর্থনৈতিক কিছুটা উন্নয়নের হাওয়া বইতে শুরু করে। স্থানীয় কাঁচামালের উৎপাদনের উপর ভর করে আস্তে আস্তে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে শুরু করে। স্থানীয় পণ্যের বাজার তৈরি হতে থাকে। ফলে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে আগের তুলনায় বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। খ্রিষ্টপূর্ব সাতশ বছর আগে প্রথম পূর্বচীনের শহর ইনানে (Tsinan) বিজ্ঞাপনের ধারণার জন্ম হলেও ১৪ শতকে মুদ্রণ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পরই এর প্রসার ঘটে।^১ তবে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে ১৭ শতকের প্রথমার্ধে। ইউরোপে তখন পত্রিকার জনপ্রিয়তা বাড়তে শুরু করেছিলো।^২ মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের তথ্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের ইতিহাস খুব গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত প্রথম বাংলা দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকর'-এ (১৮৪০ খ্রি:) প্রথম পৃষ্ঠায় দুইটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিলো। পূর্ব বাংলা প্রথম সাময়িকপত্র 'রঙ্গপুর দিক প্রকাশ'-এ (১৮৬০) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রায় পুরো পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপন রাখা হয়েছিলো।^৩

মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

বিজ্ঞাপনের ইতিহাস বেশ পুরানো। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে গণমানুষের কাছে পণ্য বা সেবার প্রচারের ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের পুরানো বলে ধারণা করা হয়। প্রাচীন মিশরীয়রা প্যাপিরাসের পাতায় বিক্রয়ের জন্য পণ্যের বিজ্ঞাপন করতো বলে জানা যায়। Zhou Gong এর Classic of Poetry: Shijing এ উল্লেখ পাওয়া যায় একাদশ থেকে সপ্তম খ্রিষ্টপূর্বের চীনে চকলেট জাতীয় খাবার বিক্রি করার জন্য বাঁশি বাজিয়ে

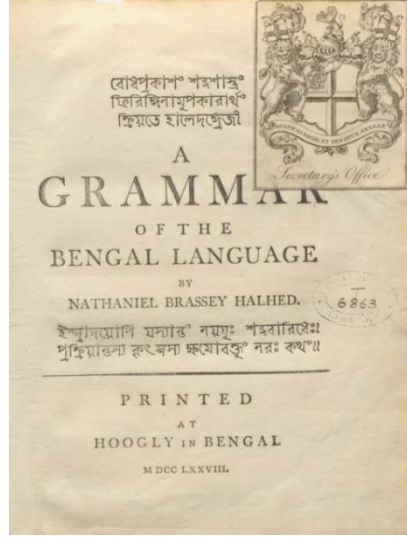


চিত্র ২: উইলিয়াম ক্যার্লটন কর্তৃক লেখা বইয়ের প্রচারের লক্ষ্যে হ্যান্ডবিল আকারে ছাপানো বিজ্ঞাপন। ছবির উৎস: infoacrs.com

ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হতো। 'পূর্ব চীনের জিনান শহর থেকে সং রাজবংশের সময়কার তৈরি তামার পাতে লেখা একটি বিজ্ঞাপন উদ্ধার করা হয়। বিজ্ঞাপনটির উপরের অংশে খরগোশের লোগোসহ “Jinan Liu's Fine Needle Shop” এবং নিচের অংশে “We buy high-quality steel rods and make fine-quality needles, to be ready for use at

home in no time''লেখা রয়েছে। একেই এখন পর্যন্ত সংরক্ষিত প্রাচীনতম বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের একমাত্র উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়(চিত্র ১)।^৪

মুদ্রণ প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথেসাথে মানুষের তথ্য আদান প্রদানের সুযোগ বেড়ে গেলো। বিজ্ঞাপনের জন্য আগে সরাসরি কবিতা, গান, ক্যানভাসিং (Canvassing), ছোট নাটিকা, সার্কাস ইত্যাদির প্রচলন থাকলেও মুদ্রণ পদ্ধতির উন্নয়নের ফলে এই কৌশলগুলোর ধরণ পাল্টে যেতে থাকে। জার্মানিতে ১৪৪০ সালের দিকে Johannes Gutenberg কর্তৃক 'লেটারপ্রেস মুদ্রণ' (Letterpress Printing) পদ্ধতির আবিষ্কারের পর মুদ্রণ পদ্ধতির ইতিহাসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। একসময় ক্যানভাসাররা পণ্য হাতে নিয়ে পণ্যের গুণগান করতো বা কবিতা-গান করতো, কাঠের ফলক বা দেয়ালে লিখে সাইনবোর্ড, কাপড় বা কাগজে লিখে পোস্টারের মতো স্থানে স্থানে স্টেটে দিতো। মুদ্রণ পদ্ধতির আবিষ্কারের পর কাগজে বা কাপড়ে পণ্যের ছবি ছাপিয়ে তার পাশে পণ্য সম্পর্কে ছন্দ মিলিয়ে কয়েক লাইন কবিতা ও পণ্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া সম্ভব হলো। ছাপা হওয়াতে বিজ্ঞাপনটি গ্রাহকের সামনে বেশিক্ষণ রাখাও গেলো। ধারণা করা হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে ইংল্যান্ডে প্রথম মুদ্রিত বিজ্ঞাপন দেখা যায়। ইংরেজ লেখক ও মুদ্রক William Caxton ১৪৭৭ সনে তার লেখা বইয়ের প্রচারের লক্ষ্যে বইটি সম্পর্কে নানান তথ্য দিয়ে কাগজের হ্যান্ডবিল বিলি করেন। প্রচারিত হ্যান্ডবিলটিতে কোনো ছবি ছিলো না। অনেক গবেষক হ্যান্ডবিলটিকে প্রথম মুদ্রিত বিজ্ঞাপন মনে করেন(চিত্র ২)।^৫



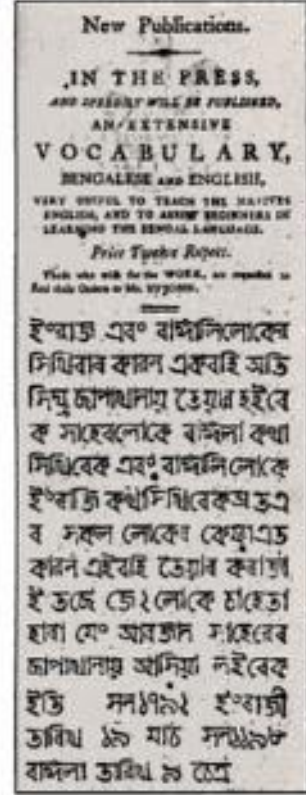
চিত্র ৩: 'A Grammar of the Bengali Language' বইয়ের একটি পৃষ্ঠা। ছবির উৎস: British Library (Online).

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজ প্রকাশের চল শুরু হলে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের ধারণা জনপ্রিয়তা পায়। ১৬০৪ জার্মানিতে প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কাগজের উৎপাদন, মুদ্রণ প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং গণমানুষের তথ্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে পত্রিকা দৈনিক ভিত্তিতে প্রকাশ হতে শুরু করে। ইতিহাসের প্রথম মুদ্রিত ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা 'The Daily Courant' ইংল্যান্ডে প্রকাশিত হয় ১৭০২ সালে। এক পাতার এই পত্রিকায় সামনের পাতায় দুইটি কলাম ও পেছনে বিজ্ঞাপন থাকতো।^৬ এই পত্রিকাটি ১৭৩৫ সাল পর্যন্ত টিকে ছিলো। তবে ১৭০৪ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশ তৎকালীন উত্তর-আমেরিকার দৈনিক পত্রিকা 'The Boston News Letter'-এ প্রথম বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। যা ছিলো একটি জমি বিক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন। ১৭২৯ সালে প্রকাশিত Benjamin Franklin এর 'Pennsylvania Gazette' পত্রিকায় সম্পূর্ণ একটি পাতা বিজ্ঞাপনের জন্য

রাখা হতো।^৭ ফলে স্বল্পমূল্যে গ্রাহকের কাছে পত্রিকা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হলো। পক্ষান্তরে পত্রিকা ও অন্যান্য প্রকাশনায় বিজ্ঞাপনের জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়।

বাংলাদেশের মুদ্রিত বিজ্ঞাপন:

ষাট-সত্তর বছর আগেও বিজ্ঞাপন মাধ্যমটি বাংলাদেশ অঞ্চলে এতো শক্তিশালী ছিলো না। বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনের ইতিহাস তুলনামূলক নবীনই বলা যায়। ১৯৪৭-এর দেশ ভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কয়েকটি বিজ্ঞাপনী সংস্থা গড়ে উঠেছিলো। এরমধ্যে এভারগ্রীন পাবলিসিটি, কামার্ট, ইস্টল্যান্ড এ্যাডভার্টাইজিং, গ্রীন ওয়েজ পাবলিসিটি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তান আমলে কয়েকজন চারু শিল্পী পত্রিকার বিজ্ঞাপনের নকশা বা পরিকল্পনায় যুক্ত ছিলেন, যেমন- কামরুল হাসান (১৯২১-১৯৮৮), কাইয়ুম চৌধুরী (১৯৩৪-২০১৪), খাজা শফিক আহমেদ (১৯২৫-১৯৭২), আবদুস সবুর খান, এ.জেড পাশা, সুভাষ দত্ত (১৯৩০-২০১২) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। দেশভাগের পর বার-তেরো বছর পর্যন্ত কলকাতা থেকে ব্রুক নিয়ে এসে বিজ্ঞাপন ছাপানোর কাজ চালানো হলেও পরবর্তীতে পুরান ঢাকায় ইস্টার্ন প্রসেস নামে একটি কোম্পানী ব্রুক তৈরির কাজ শুরু করে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের বিজ্ঞাপন জগৎ বেশ বড় হয়ে উঠে। ১৯৭৫ সালে ঢাকায় ৩৯টি বিজ্ঞাপনী সংস্থা গড়ে উঠেছিলো বলে জানা যায়, বর্তমানে যা শতকের ঘর ছাড়িয়েছে।^৮



চিত্র ৪: বাংলা ভাষাছাপা অক্ষরে প্রকাশিত প্রথম বিজ্ঞাপন।

বাংলা ভাষার বর্ণ প্রথম মুদ্রিত হয় “A Grammar of the Bengali Language” বইয়ে (চিত্র ৩)। প্রকাশিত হয়েছিলো ১৭৭৮ সালে। Nathaniel Brassey Halhead এর বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ক এই বইয়ের জন্য Charles Wilkins এবং তার সহকারী পঞ্চানন কর্মকার প্রথম লেটারপ্রেস (Letterpress) প্রিন্টের উপযোগী বাংলা বর্ণমালার ‘Bengali Typeface’ নির্মাণ করেন এবং বইটি মুদ্রণ করেন। এই বইটি বাংলা ভাষার লেটারপ্রেস মুদ্রণ পদ্ধতির প্রথম সফল পুনঃমুদ্রণযোগ্য বই।^৯ ১৭৯২ সালে ‘Culcatta Chronicle’ নামক ইংরেজি পত্রিকায় ‘A Grammar of the Bengali Language’ বইটির একটি বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। বিজ্ঞাপনটি বাংলা ভাষাছাপা অক্ষরে প্রকাশিত প্রথম বিজ্ঞাপন (চিত্র ৪)।^{১০} তবে বাংলা ভাষায় এই বিজ্ঞাপনটির সমসাময়িক বা তারও আগে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়ে থাকলেও তার কোনো সংরক্ষিত কপি বা তথ্য জানা যায়নি। বিজ্ঞাপনটির ভাষা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিস্তৃত বাংলা অঞ্চলে বাংলাভাষার নানা বৈচিত্র্য বিদ্যমান। এই বিজ্ঞাপনের ভাষা, বাক্য, বর্ণ, বানানরীতি আজকের বাংলা ভাষার চেয়ে বেশ কিছু ভিন্নতা আছে। বিজ্ঞাপনের লেখাটা কিছুটা এমন- ‘ইংরাজ এবং বাঙ্গালিলোকের সিখিবার কারণ একবহি অতি সিম্ব ছাপাখানায় তৈয়ার হইবেক সাহেবলোকে

বাঙ্গলা কথা সিখিবেক এবং বাঙ্গালিলোকে ইংরেজি কথা সিখিবেক অতএব সকল লোকের...’’^{১১} টেক্সটের শেষের দিকে তারিখ ছাপা হয়েছে এভাবে- ‘ইতি সন ১৭৯২ ইংরাজী তারিখ ১৯ মার্চ সন ১১৯৮ বাঙ্গলা তারিখ ৯ চৈত্র’। বিজ্ঞাপনটির মূল বক্তব্য ছিলো, ‘ইংরেজ এবং বাঙালিদের শিক্ষার জন্য একটি বই শীঘ্রই ছাপাখানায় তৈরি হবে। ইংরেজরা বাংলায় কথা বলা শিখবে এবং বাঙালিরা ইংরেজিতে কথা বলা শিখবে অতএব সকলের জন্য এই বইটি তৈরি করা হচ্ছে। যারা বইটি সংগ্রহ করতে চান তারা আবজদ সাহেবের ছাপাখানা থেকে চেয়ে নিবেন।’ ‘ইতি’র পর সম্ভবত নিবেদক বা যিনি বক্তব্য দিয়েছেন তার নাম হতো আর তারিখ হতো নামের নিচে। বিরাম চিহ্নের ব্যবহার না করা, নির্দিষ্ট স্পেস রাখার সমস্যা ও তখনকার প্রযুক্তিতে বর্ণের সঠিক আকার বজায় রাখার সমস্যার কারণে লেখাটা পড়া অসুবিধাজনক হলেও মূল বক্তব্যটি বোধগম্য ছিলো। উল্লেখ্য তারিখ লেখার ধরণটাও লক্ষণীয়। প্রথমে সাল, মাঝখানে ‘ইংরাজী তারিখ’ ও ‘বাঙ্গলা তারিখ’ লিখে তারপর তারিখ এবং মাসের নাম লেখা হয়েছে।

পত্র পত্রিকায় ছাপানো বিজ্ঞাপন এবং তার প্রেক্ষিতে তৎকালীন সমাজ চিত্রকে অনুধাবনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পত্রিকার ইতিহাস অনুসন্ধানের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। রংপুরের কুটী পরগনার জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরীর উদ্যোগে এবং গুরুচরণ রায়ের সম্পাদনায় ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দের আগস্টে (বাংলা ভাদ্র, ১২৫৪) প্রকাশিত হয়েছিল বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র ‘রঙ্গপুর বার্তাবহ’।^{১২} পত্রিকাটি ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বিরতি ছাড়াই প্রকাশিত হয়েছিলো। জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরীর আর্থিক আনুকূল্যে সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো ফলে বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভরশীল হতে হয়নি।^{১৩}

সংবাদ পত্রের ইতিহাসের সাথে ঢাকার মুদ্রণ ইতিহাস জড়িত। ১৮৪৭ সালে ঢাকায় প্রথম মুদ্রণযন্ত্র এনেছিলেন ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা, তাদের প্রচারপত্র ও রিপোর্ট ছাপার জন্য। ১৮৫৬ সালে ঢাকায় দ্বিতীয় মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়, যার নাম ‘ঢাকা প্রেস’। এই প্রেস থেকেই মুদ্রিত হতো সাপ্তাহিক ইংরেজী সংবাদ পত্রিকা ‘দি ঢাকা নিউজ’। আলেকজান্ডার ফর্বেসের সম্পাদনায় ‘দি ঢাকা নিউজ’-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ সালের ২৬ এপ্রিল।^{১৪} মধুসূদন ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রটির নাম ছিল ‘রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ’। বৃহত্তর রংপুরের জমিদার শম্ভুচন্দ্র রায়চৌধুরী নিজ উদ্যোগ ও খরচে পত্রিকাটি বের করেছিলেন।^{১৫} ‘রঙ্গপুর বার্তাবহ’, ‘দি ঢাকা নিউজ’ ও ‘রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ’ এই তিনটি পত্রিকার সম্পাদক আর্থিকভাবে সামর্থবান ব্যক্তিরা ছিলেন। পত্রিকাগুলোর মুনাফা করা বা নিয়মিত মুদ্রণের খরচ জোগার কোনো সমস্যা ছিলো না। ফলে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে পত্রিকাগুলোর বাড়তি আয়ের দরকার হতো না। এই পত্রিকাগুলোর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিলো ঢাকা শহর ও এর বাইরের ইংরেজ, আর্মেনি, জমিদার এবং নীলকরদের নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ। তাছাড়া বাংলাদেশে তখন শিল্পায়নের তেমন অগ্রগতি না হওয়ায় পত্রিকাগুলোর বিজ্ঞাপন না ছাপানোর অন্যতম কারণ হতে পারে। তবে ‘ঢাকা নিউজ’ কখনো কখনো কম্পানি প্রশাসন ও মিশনারিদের কঠোর সমালোচনাও করতো।

এরপর বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে বহুল জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র ‘ঢাকা প্রকাশ’। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মার্চ ‘ঢাকা প্রকাশ’ প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি ছিলো ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র। ‘ঢাকা প্রকাশ’ বিজ্ঞাপন ছাপানোর উপর

বেশ জোর দিত। সেসময় প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার উৎস হিসেবেও পত্রিকাটি পরিচিতি পেয়েছিল। পত্রিকাটিতে ওষুধ এবং বই-পুস্তকের বিজ্ঞাপনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো। ‘ঢাকা প্রকাশ’-এর ১৯০৩ সালের ১৭ মে সংখ্যার প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছিল বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী। একই তারিখে আয়ুবদী ওষুধ ‘যোগাঙ্গ প্রসাদের সিদ্ধ চূর্ণ’ সেবনে উপকারপ্রাপ্ত বিক্রমপুরের লৌহজঙ্গের পাল বংশীয় জমিদারের পত্র বিজ্ঞাপনকারে প্রথম পাতার প্রথম দুটো কলামে মুদ্রিত হয়েছিল। তৃতীয় কলামে শ্রীমঙ্গবন্দীতাসহ ধর্মীয় গ্রন্থাবলির বিজ্ঞাপন, চতুর্থ কলামে কেশরঞ্জন তৈলের বিজ্ঞাপন ও পঞ্চম কলামে শিশুরঞ্জন পাটি গণিতের বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল। পত্রিকার ভাষা যেহেতু ‘সাধু’ ছিলো বিজ্ঞাপনও ছাপা হতো ঐ ভাষাতে। কাঠের ব্লকে সাদা কালো রঙে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয় ছবি ছাপা হতো। সেইসময় রঙিন ছবি ছাপানোর ব্যবস্থা ছিল না। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বকাল পর্যন্ত ‘ঢাকা প্রকাশ’ টিকে ছিলো। বাংলাদেশের শতাব্দী বয়সীপত্রিকাটি বিজ্ঞাপন শিল্পের ইতিহাসে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।^{১৬}



চিত্র ৫: মাসিক মোহাম্মদীতে ছাপা
সানলাইটসাবানের বিজ্ঞাপন।

প্রাপ্ত ইতিহাস থেকে ধারণা করা যায়, বাংলা অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন বলবৎ থাকা পর্যন্ত গণমানুষের কথা ভেবে দেশীয় বণিকদের পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কোনো শিল্প-কারখানার বিস্তার ঘটেনি। ১৮৮৮ সালে ইস্পাহানি কোম্পানি প্রাথমিকভাবে পূর্ববঙ্গে পাট ও চায়ের ব্যবসা শুরু করলেও দেশ ভাগের পরই কোম্পানিটি এই অঞ্চলে বড় পরিসরে বিনিয়োগ করে। পূর্ববঙ্গে স্থানীয় জমিদার ও ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে ছোটখাটো ব্যবসার প্রসার হলেও বৃহত্তর অঞ্চল জুড়ে বড় পরিসরে সেবা বা পণ্য পৌঁছে দেয়ার নিমিত্তে বিজ্ঞাপন বা প্রচারনার ইতিহাস খুব একটা পাওয়া যায় না। পূর্ববঙ্গের বিজ্ঞাপনের ইতিহাসে দেখা যায় উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য বা সেবা শহর কিংবা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারীদের কথা ভেবেই বিজ্ঞাপন ছাপানো হতো। পূর্ববঙ্গের সমাজ ছিলো পুরোপুরি কৃষি নির্ভর। উৎপাদিত কৃষিপণ্য ও কাপড়ের বাণিজ্যের প্রসার অনেক আগে থেকে হলেও হাতে লেখা সাইনবোর্ড বা হাঁকডাক ছাড়া ঐ সমস্ত পণ্যের বিশেষ বিজ্ঞাপনের চল ছিলো না। পূর্ববঙ্গে মুদ্রণ পদ্ধতির আগমনের আরো প্রায় একশত বছর পর সর্বস্বত্বের মানুষের কথা ভেবে বিজ্ঞাপন প্রচারের চল শুরু হয়। এখানে পুরানো যে সব বিজ্ঞাপনের অস্তিত্ব পাওয়া তার মধ্যে কৃষিজাত পণ্য হিসেবে চা'র বিজ্ঞাপন বেশি দেখা যায়।

১৯২১ সালের ৫ আগস্ট পূর্ববাংলার প্রথম দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল চট্টগ্রাম থেকে ‘জ্যোতি’ নামে। এরপর ১৯২৯-এ চালু হয় ‘দৈনিক’, ১৯৩০-এ ‘দৈনিক রাষ্ট্রবার্তা’, ১৯৩৬-এ দৈনিক ‘আযান’ এবং ১৯৪৬-এ ‘দৈনিক পূর্ব পাকিস্তান’। ভারত বিভক্তির সময় আব্দুস সামাদ সম্পাদিত দৈনিক পূর্ব পাকিস্তান-ই কেবল চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হতো। দেশ ভাগের পর পূর্ববাংলায় ফয়েজ আহমেদ চৌধুরীর সম্পাদনায় ১৯৪৭ সালের ১৮ আগস্ট চট্টগ্রাম থেকে প্রথম

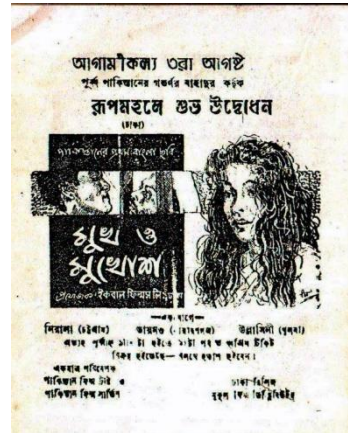
দৈনিক প্রকাশিত হয়, নাম ছিল ‘পয়গাম’। ১৯৪৯ সালে ঢাকায় প্রকাশিত হয় ‘দ্য পাকিস্তান অবজারভার’ এবং দৈনিক ‘ইত্তেফাক’। আর দৈনিক ‘সংবাদ’ প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে। এর মধ্যে দৈনিক ইত্তেফাক এবং সংবাদ এখনো প্রকাশিত হয়।^{১৭}

বাংলাদেশের মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি পত্রিকা হলো ‘মোহাম্মদী’। ১৯০৩ সালের আগস্ট মাসে মোহাম্মদ আকরম খাঁর সম্পাদনায় কলকাতা থেকে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পরে দুই বছর বন্ধ থাকার পর ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ‘মোহাম্মদী’ ঢাকা থেকে পুনঃপ্রকাশিত হয় এবং ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এর প্রকাশ অব্যাহত থাকে।^{১৮} ১৯৫৮ সালে অক্টোবরে মাসিক মোহাম্মদীতে এই বিজ্ঞাপনটি ছাপা হয় (চিত্র ৫)। এখানে লেখা আছে ‘আমি আমার কাপড় ঘরে ধোই, সানলাইট ইহাকে অতি সহজ করে তোলে’, ভাষার ব্যবহারে বিশেষ মার্জিত ভাব দেখা যায়। পাঠক বা দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ‘অতি সহজ’ শব্দ দুটির নিচে আন্ডারলাইন করা হয়েছে। আজকের দিনে বিশেষ শব্দের ভিন্ন রং বা টাইফোগ্রাফিক্যাল ভিন্নতার মাধ্যমে যেভাবে শব্দের উপর আলাদা জোর দেয়া হয় এটিও সেরকম। তখনকার দিনের মুদ্রণ প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে বিজ্ঞাপনকে যতটুকু আকর্ষণীয় করা যায় তার প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। দৃষ্টিনন্দন ও আকর্ষণীয় করার জন্য এই বিজ্ঞাপনে লাস্যময়ী রমণীর উপস্থাপন দেখা যায়।

১৯৪৭’র ভারত পাকিস্তান বিভক্তির পর পূর্ববাংলা অঞ্চলে ব্যবসার পুরোপুরি অনুকূল পরিবেশ তৈরি না হলেও ব্রিটিশ আমলের তুলনায় সহজ হয়ে আসে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের বাজার তৈরি হয়। যার ফলে সমকালীন পত্রিকাগুলোই সিনেমার প্রচুর বিজ্ঞাপন ছাপানো হতো। চট্টগ্রাম শহরে ১৯৩৩ সাল থেকে প্রকাশিত ‘উদয়ন’ মাসিক পত্রিকার ১৯৫২ সালের মার্চ-এপ্রিল সংখ্যায় দেখা যায় সিনেমার পাশাপাশি শিল্প-সংস্কৃতিবিষয়ক নানান বিষয় স্থান পেয়েছে। মাসিক এই পত্রিকাটিতে তৎকালীন বাংলাদেশে প্রদর্শিত সিনেমার বিজ্ঞাপন ছাপা হতো বলে জানা যায়। সিনেমার বিজ্ঞাপন ছাড়াও নিত্য প্রয়োজনীয় নানা পণ্যের নিয়মিত বিজ্ঞাপন ছাপা হতো ‘উদয়ন’-এ। মীজানুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সাময়িকী প্রকাশিত হতো ‘রূপছায়া’ (১৯৫০-১৯৬০) নামে। ঐ পত্রিকার ডিসেম্বর ১৯৫৭, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বিজ্ঞাপনের উপর গুরুত্বারোপ করে একটি লেখা ছাপানো হয়।



চিত্র ৬: পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় প্রকাশিত মুখ ও মুখোশ চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন।



পঞ্চাশের দশকের শিশু-কিশোর পত্রিকা 'খেলাঘর'-এ ভারতীয় চলচ্চিত্র 'কারুলিওয়ালা' এবং বাংলাদেশের প্রথম সবাক বাংলা চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ'-এর বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল (চিত্র ৭)।^{১৯} 'পাকিস্তান অবজার্ভার' পত্রিকাতেও ২রা আগস্ট ১৯৫৬ তারিখে মুখ ও মুখোশের বিজ্ঞাপন ছাপা হয় (চিত্র ৬)। পরের দিন অর্থাৎ ৩রা আগস্ট ১৯৫৬ সালে সিনেমাটি ঢাকার রূপমহল, চট্টগ্রামের নিরালা, নারায়ণগঞ্জের ডায়মন্ড ও খুলনার উল্লাসিনী সিনেমাহলে একযোগে মুক্তি পায়। সাতচল্লিশ-উত্তর পূর্ববাংলায় ভিনদেশি সিনেমার প্রভাবের ফলে সমাজে স্থানীয় বাঙালি সংস্কৃতির উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করেছিলো। তাই নাট্যকর্মী ও অভিনেতা আব্দুল জব্বার খাঁ দেশজ সংস্কৃতি নির্ভর সিনেমা বানানোর কথা ভাবেন। ৯৯ মিনিট দৈর্ঘ্যের এই সিনেমায় তিনি অসামাজিক কর্মকাণ্ড, পারিবারিক কলহ ও দুর্নীতির মতো বিষয় তুলে ধরেন। মুখ ও মুখোশের জন্য পার্শ্ব অভিনেতা খোঁজার উদ্দেশ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছিলো।^{২০} এই সিনেমার পোস্টার ডিজাইন করেন সুভাষ দত্ত। বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ' দেশের মানুষের মাঝে বেশ সাদা জাগায়। মুক্তিপ্রাপ্তির আগের দিন ততকালীন বেশ কিছু বাংলা পত্রিকাতে পাশের বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়। পোস্টারের সাথে প্রচারিত বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত ইমেজের ভিন্নতা লক্ষ্যণীয়। তখন পত্রিকায় ক্যামরায় তোলা ছবির ব্যবহার দেখা গেলেও মুখ ও মুখোশের বিজ্ঞাপনের জন্য সরাসরি পোস্টার থেকে নেয়া ইমেজ না নিয়ে আলাদা করে হাতে আঁকা ছবির ব্যবহার করা হয়েছিলো।



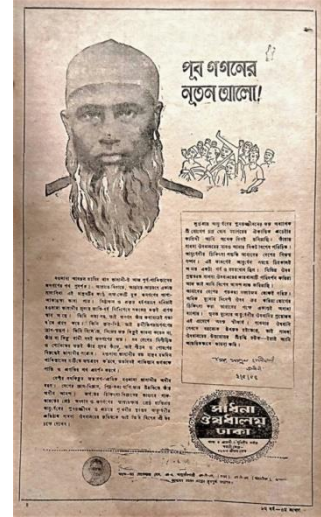
চিত্র ৮: আজাদ পত্রিকায়
ছাপাকোস্ট ক্রিম এবং
ভ্যানিটিং ক্রিমের বিজ্ঞাপন।

১৯৫২ সালে সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজ কর্তক প্রকাশিত বাংলাদেশে অন্যতম জনপ্রিয় পত্রিকা ছিলো 'চিত্রাঙ্গী'। পত্রিকাটি ষাটের দশকের শেষ ও সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয় ছিল। চলচ্চিত্র তারকাদের খবর, তাদের নিয়ে গুজব-গুঞ্জন, দেশের ও বিদেশের চলচ্চিত্র সংবাদ, নিবন্ধ, সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্র বিষয়ে কলাম, বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের খবর ইত্যাদি 'চিত্রাঙ্গী' পত্রিকায় স্থান পেতো। 'চিত্রাঙ্গী'তে সব ধরনের পণ্যের বিজ্ঞাপন ছাপা তো হতোই, চলচ্চিত্রের রঙিন বিজ্ঞাপনও ছাপা হতো বলে জানা যায়।^{২১}

বাংলাদেশের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা 'দৈনিক আজাদ'। মুদ্রিত বিজ্ঞাপন ও ততকালীন সমাজ বাস্তবতার চিত্র জানার ক্ষেত্রে পত্রিকাটি অন্যতম সহায়ক উৎস। ১৯৩৬ সালের ৩১ অক্টোবর কলকাতা থেকে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। ৪৭-এর দেশ ভাগের পর ১৯৪৮ সনের ১৯ অক্টোবর পত্রিকাটির অফিস ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। তখন পূর্ববঙ্গের প্রধান দৈনিক ছিল আজাদ পত্রিকা। ১৯৪৯ সালে 'সাধু সাবধান' শিরোনামে সম্পাদকীয় লেখা হলে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভায় বিতর্কের তৈরি হয় এবং সরকার পত্রিকাটির বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেয়। ৫২'র ভাষা আন্দোলন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে আজাদ পত্রিকা সাহসী ভূমিকা রাখে। ১৯৫২'র ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় আন্দোলনকারীদের উপর আইয়ুব খান

সরকার গুলি চালিয়ে হত্যার প্রতিবাদে সারা দেশ বিক্ষোভে উদ্ভাল হয়ে ওঠে। পরের দিন ২২ ফেব্রুয়ারি আজাদ পত্রিকা ছাত্র-জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদ স্বরূপ নিন্দা জানিয়ে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দৈনিক আজাদ পত্রিকা বাংলার জনগণের পক্ষ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।^{২২} দেশ ভাগের পর পাকিস্তান আমলের নানা আন্দোলন সংগ্রাম, ৭১'র স্বাধীনতা, পরবর্তী রাজনৈতিক উত্তান-পতন ও বাঙালির নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়ের অন্যতম উৎস এই পত্রিকাটি টিকে ছিলো ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। এই দীর্ঘ পথ চলায় বিজ্ঞাপন শিল্পের ও সমকালীন সংস্কৃতির নানা তথ্যের বড় একটি আর্কাইভ হয়ে উঠে দৈনিক আজাদ। এই বিজ্ঞাপনটি ১৯৫২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে আজাদ পত্রিকায় ছাপা হয় (চিত্র ৮)। 'Evening in Paris' নামের কোল্ড ক্রিম এবং ভ্যানিশিং ক্রিমের বিজ্ঞাপন। ছবিতে The City Gates of Paris-এর ছবি লক্ষণীয়। ১৮৬৩ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত 'Bourjois' প্রসাধনী কোম্পানিটি ফ্রান্সের মালিকানাধীন ছিলো, আমেরিকান কোম্পানি Coty Inc. এর মালিকানা কিনে নেয়। ১৯৫২ সালে Bourjois কোম্পানির কিছু কিছু প্রসাধনী বাংলাদেশে পাওয়া যেতো।

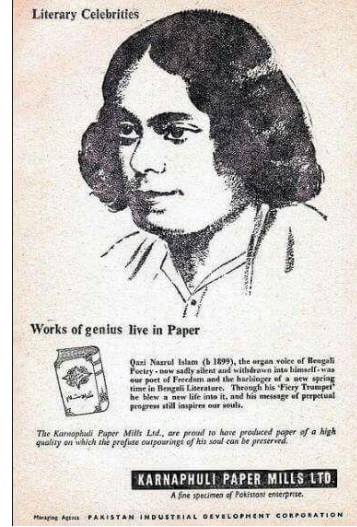
'সাধনা ঔষধালয়'-এর এই বিজ্ঞাপনটি ১৮ ডিসেম্বর ১৯৫৫ সালে 'সৈনিক' পত্রিকায় ছাপা হয়। ভারতসহ পৃথিবীর আয়ুর্বেদশাস্ত্রে এক যুগান্তকারী নাম পূর্ববাংলার 'সাধনা ঔষধালয়'। আয়ুর্বেদশাস্ত্রী যোগেশ চন্দ্র ঘোষ ১৯১৪ সালে তৎকালীন জগন্নাথ কলেজে রসায়নে অধ্যাপনার পাশাপাশি সাধনা ঔষধালয়ের কার্যক্রম শুরু করেন।^{২৩} দেশজ সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে নিজের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে স্বদেশের মঙ্গল সাধনে শিক্ষক প্রফুল্ল চন্দ্র রায়তাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের মূলমন্ত্র তখন থেকে তাঁর মনে স্থায়ী দাগ কাটে। ১৯১২ সালে জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগদানের পর স্থানীয় ঔষধি গাছপালা থেকে ঔষধ ও বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার্য দ্রব্য তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যান তিনি। উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দেশের মানুষের কথা ভেবে ১৯১৪ সালে ঢাকার সূত্রাপুর থানার গেভারিয়ায় নিজ বাসভবনে 'সাধনা ঔষধালয়' নামে আয়ুর্বেদীয় ঔষধ তৈরির কারখানার কার্যক্রম শুরু করেন। পূর্ববঙ্গে আয়ুর্বেদীয় ঔষধ তৈরির এটিই প্রথম কারখানা। অধ্যাপক যোগেশ চন্দ্র ঘোষ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি ও ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন।^{২৪} উল্লেখিত বিজ্ঞাপনে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর ছবি (ফটোগ্রাফ) ও পাশে কৃষক-মজুরের ছবি (রেখাচিত্র) দেখা যায়। বড় অক্ষরে ভাসানীকে 'পূব গগনের নূতন আলো!' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সাথে রয়েছে সাধনা ঔষধালয়ের পক্ষ থেকে দেয়া বক্তব্য ও এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ভাসানীর মতামত সম্বলিত দস্তখত ও তারিখসহ চিঠি। মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম তৃণমূল রাজনীতিবিদ। সাধারণ মানুষের অধিকার নিয়ে আন্দোলন করে গেছেন সারা জীবন।



চিত্র ৯: সৈনিক পত্রিকায় 'সাধনা ঔষধালয়'-এর বিজ্ঞাপন।
ছবির উৎস: 'Bangladesh on Record', A non-profit organization.

বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৫২ সালের ৩০শে জানুয়ারি তাঁর সভাপতিত্বে ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিসদ’ গঠিত হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসেবে মওলানা ভাসানীকে ২১শে ফেব্রুয়ারির আগেই গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১৬ মাস জেলে বন্দী রাখা হয়। পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৫৩ সালে শের-এ-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে নিয়ে মওলানা ভাসানী ‘যুক্তফ্রন্ট’ নামক নির্বাচনী মোর্চা গঠন করেন। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুলভোটে বিজয় অর্জন করে। ফজলুল হকের নেতৃত্বে সরকার গঠন করার পর ১৯৫৪ সালের ২৫শে মে বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ভাসানী সুইডেন গমন করেন। ৩০শে মে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভা ভেঙে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নরের শাসন জারি করে এবং মওলানা ভাসানীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। প্রায় ১১ মাস বিভিন্ন দেশে অবস্থানের পর ১৯৫৫ সালের ২৫ এপ্রিল তিনি দেশে ফিরতে পারেন।^{২৫} দেশের সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন ও ত্যাগের এক অনন্য নজির রাখেন মওলানা ভাসানী। ভালোবেসে দেশের মানুষ ভাসানীকে ‘মজলুম জননেতা’ বলে ডাকতো। তাঁর এই জনপ্রিয়তার কারণে ‘সাধনা ঔষধালয়’ ১৯৫৫ সালে অর্থাৎ যে বছর পাকিস্তান সরকারের নিষেধাজ্ঞা শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন সে বছর তাদের বিজ্ঞাপনে মওলানা ভাসানীর ছবি ও চিঠি ছাপায়। বিজ্ঞাপনে ভাসানীর প্রত্যাবর্তনকেই হয়তো ‘পূর্ব গগনে নূতন আলো’ বলে উল্লেখ করা হয়েছিলো।

বিজ্ঞাপনের ইতিহাসে জনপ্রিয় ও প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিদের ছবি, উক্তি, মন্তব্য, স্বাক্ষর ইত্যাদি ব্যবহারের রেওয়াজ বেশ পুরানো। বাংলায় বিজ্ঞাপনে জনপ্রিয় ব্যক্তির ছবি ও উক্তি বা পণ্য সম্পর্কিত মন্তব্যের ব্যবহার সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে শুরু। তৎকালীন মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের জগতে রবীন্দ্রনাথ খুবই জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। পণ্যের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে প্রথমদিকে গবেষণা করেছেন কলকাতার মাসিক পত্রিকা ‘পূরশ্রী’র সম্পাদক অরুণ কুমার রায়। তার তথ্য অনুযায়ী ১৮৮৯ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রায় নব্বইটির বেশি



চিত্র ১০: কাজী নজরুল ইসলামকে বিষয়বস্তু করে কর্ণফুলী পেপার মিলস-এর বিজ্ঞাপন।



চিত্র ১১: ১৯৫৬ সালের ফিলিপস কোম্পানির রেডিওর বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপনে নিজের মন্তব্য, উক্তি, উদ্ধৃতি এবং ছবি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন।^{২৬} বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি আজকের মডেল বা জনপ্রিয় ব্যক্তিদের মতো ছিলো না। ছবির ক্ষেত্রে গান্ধীরূপ পোট্রেটের ব্যবহার আর লেখা বা উক্তির ক্ষেত্রে শ্রুতিমধুরতা, ছন্দময়তা, রসবোধ, বুদ্ধিমত্তা ও দেশাত্ববোধের পরিচয় মেলে।^{২৭}

কাজী নজরুল ইসলাম কর্ণফুলী পেপার মিলস কোম্পানির কাগজে লিখেছেন বলে গর্ব করে বিজ্ঞাপনে লিখেছে- ‘The Karnophuli Paper Mills Ltd. are proud to have produced paper of a high quality on which the profuse outpourings of his soul can be preserved.’ তার উপর বড় অক্ষরে লেখা হয়েছে- ‘Works for genius live in Paper’ বিজ্ঞাপনটি (চিত্র ১০) পাকিস্তান আমলে, পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে বাংলাদেশের কোনো একটি পত্রিকায় ছাপানো হয়েছিলো। বিজ্ঞাপনের টেক্সট থেকে জানা যাচ্ছে নজরুল তখন নির্বাক জীবন কাটাচ্ছিলেন। এই বিজ্ঞাপনে টেক্সটের ভাষা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কাব্যময় শব্দ চয়ন ও বিনয়ানত হয়ে কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে কর্ণফুলী পেপার কোম্পানি তাদের বিজ্ঞাপন দিয়েছে যাতে ঐ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।



চিত্র ১২: দৈনিক আজাদে ছাপানো তিব্বত স্নোর বিজ্ঞাপন।

পাশের বিজ্ঞাপনটি (চিত্র ১১) ফিলিপস কোম্পানির রেডিও'র। ১৯৫৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর 'আজাদ' পত্রিকায় ছাপা হয়। বাংলাদেশের ঐ সময়ের বিজ্ঞাপনে ইমেজের পাশাপাশি ভাষা ও টেক্সটের ব্যবহারে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হতো। বিজ্ঞাপনের টেক্সটে আছে - ‘THE EVOLUTION OF SOUND’ ‘শব্দের ক্রমবিক্রম’, ‘বহু শতাব্দী ধরে পল্লীবাসীরা নিজেদের আমোদ প্রমোদের জন্য গান বাজনা করে আসছে। আজকালকার রেডিও দূরের সুস্বাদু সঙ্গীত শুনিয়ে তাদের আনন্দ বৃদ্ধি করছে’। ছবিতে বিশেষ পোষাক পরিহিত এক লোক বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে আর দূরে এক রমণী কলসিতে পানি নিয়ে যাচ্ছে। দুইজনের পোষাকের বিশেষত্ব হলো ইসলামিক অনুশাসন মেনে পরা পোষাক। মোটাদাগে বললে যা আরব থেকে পারস্য-আফগানিস্তান পাকিস্তান হয়ে বাংলাতে এসেছে মুঘলদের হাত ধরে। বাংলার মুসলমানরা যদিও পাজামা-পাঞ্জাবি বা লুঙ্গি-পাঞ্জাবিই বেশি পরিধান করে এসেছে। এই বিজ্ঞাপনে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের কথা মাথায় রেখে পোষাকের ব্যবহার চিহ্নিত করা যায়। ইসলাম ধর্ম মতে গুটিকয়েক বাদ্যযন্ত্র বাদে বেশির ভাগই হারাম বা নিষিদ্ধ



চিত্র ১৩: দৈনিক আজাদে ছাপানো আলাদীন ব্যাটারির বিজ্ঞাপন।

হলেও সুফি ঘরানার মতাদর্শে মিউজিকের দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। বাণিজ্যিক প্রচারণাকৌশল হিসেবে বিষয়টিকে চতুরতার সাথে এই বিজ্ঞাপনটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। সনাতন ধর্মে গান, শ্লোক, বাদ্যযন্ত্র উপসনার সাথে সম্পৃক্ত। এই বিজ্ঞাপনে রাঁধা-কুশের প্রেমের যে উপাখ্যান তারই ইসলাম সহনীয় রূপের উপস্থাপন মনে হয়। উপমহাদেশে ইসলাম ছড়িয়েছে সুফি মতাদর্শের উপর ভর করে। সরাসরি আরবের ইসলাম এখানে চর্চিত হয়নি। অন্যান্য মতাদর্শের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখার খাতিরে এই অঞ্চলের ইসলামকে অনেক বেশি নমনীয় হতে হয়েছে। ফলে ইসলামের প্রসার ঘটলেও বাঙ্গালির জাতিগত পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ নানান পদের গান ও বাদ্যযন্ত্র বাঙ্গালি ত্যাগ করেনি।



চিত্র ১৪: দৈনিক পূর্বদেশে ছাপানো কসকো সাবানের বিজ্ঞাপন।

কহিনূর কেমিক্যালস কোম্পানি লি: ১৯৫৬ সালে প্রথম ‘তিব্বত স্নো’ বাজারে নিয়ে আসে। সারা বছর ব্যবহারযোগ্য স্নোটি এখনো এই কোম্পানির অন্যতম জনপ্রিয় প্রোডাক্ট। এই বিজ্ঞাপনটি (চিত্র ১২) ১৯৬৫ সালে ২৩ সেপ্টেম্বর দৈনিক আজাদে ছাপানো হয়। বিজ্ঞাপনটির মডেল হয়েছিলেন তৎকালীন পাকিস্তানের তুমুল জনপ্রিয় চলচ্চিত্র অভিনেতা সন্তোষ কুমার। তাঁর প্রকৃত নাম সৈয়দ মুসা রাজা। পাকিস্তান ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে বেশ প্রভাবশালী অভিনেতা হয়ে ওঠেন তিনি। পঞ্চাশের দশকে সন্তোষ কুমার পূর্ববঙ্গেও ভীষণ জনপ্রিয় রোমান্টিক হিরো হিসেবে পরিচিতি পান। বিকাশমান পূর্ববঙ্গের শিল্প-কারখানার উৎপাদিত পণ্যের বিজ্ঞাপনের জন্য এমন পরিচিত ও জনপ্রিয় মুখ দরকার ছিলো। কোনো অভিনেতার জনপ্রিয়তাকে পণ্য প্রচারের হতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা বিজ্ঞাপন ইতিহাসে পুরানো কৌশল। সম্ভবত দেশ ভাগের পর পূর্ববঙ্গে বিজ্ঞাপনে মডেল হিসেবে জনপ্রিয় অভিনেতার উপস্থিতি প্রথম এই বিজ্ঞাপনে দেখা যায়। এই বিজ্ঞাপনের টেক্সটে নতুনত্ব হলো, জনপ্রিয় মডেলের মুখের কথা সরাসরি উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন ‘চিত্রতারকা সন্তোষ কুমার বলেন, ক্ষীরকার্যের পর তিব্বত স্নো ব্যবহার আরামদায়ক’।

আলাদীন ব্যাটারির এই বিজ্ঞাপনটি (চিত্র ১৩) ১৯৫৬ সালে ২ সেপ্টেম্বর দৈনিক আজাদ পত্রিকায় ছাপা হয়। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে করাচী থেকে আসা এ্যাটকো (ATCO) কোম্পানির আলাদীন সেল ব্যাটারি পূর্ববঙ্গে পাওয়া যেতো। প্রতিটি আট-নয় আনায় বিক্রি হতো। বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে চোর রাতের অন্ধকারে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে। হঠাৎ বাড়ির মালিক টর্চলাইট জ্বালালে চোর ধরা পড়ে যায়। আলাদীন ব্যাটারির বিজ্ঞাপনের টেক্সট এমন- ‘সতর্ক হউন। চারিদিকে নজর রাখুন। অস্ত্র-শস্ত্র বা শক্তির প্রয়োজন নাই...। আলাদীন সেল ব্যাটারির বিজ্ঞাপনে রাতের বেলা চোরের উৎপাতকে বিষয় করা হয়েছে।

কসকো সাবানের এই বিজ্ঞাপনটি (চিত্র ১৪) ১৯৬৬ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারি দৈনিক পূর্বদেশে ছাপানো হয়। তৎকালীন পাকিস্তানের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ‘রাণী’ এই বিজ্ঞাপনের মডেল হয়েছিলেন। পাশাপাশি ছাপা হয় কসকো সাবান সম্পর্কে তার অনুকূল মতামত, যেমন— ‘রূপসম্রাজ্ঞী “রাণী” বলেন— লাভণ্যময় ও মসৃণ ত্বকের জন্য “কসকো কোল্ড ক্রিম” সাবানই একমাত্র উপযুক্ত সাবান যা পূর্বে আমি কখনই ব্যবহার করিনি।’ সাথে ছাপা হয় অভিনেত্রী রাণীর স্বাক্ষর। ষাটের দশকের শেষের দিকে পাকিস্তানের টিভি ও বড় পর্দায় রাণী ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। পাকিস্তানের পাশাপাশি তৎকালীন বাংলাদেশেও তিনি বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু ভাষার সিনেমা বাংলাদেশেও মুক্তি পেতো। কসকো সাবান ‘কমন্ডার সোপ কোং’র একটি পণ্য। বাংলাদেশের পুরানো কোম্পানিগুলোর মধ্যে এটি একটি। ১৯৪৮ সালে ঢাকার তেজগাঁও শিল্প এলাকায় তাদের কার্যক্রম শুরু করে।^{২৮} কসকো সাবানের ক্ষয় কম হয় বলে হয়তো মিতব্যয়ী বাঙালি সমাজে একটা সময় কসকো সাবানের ভালো চাহিদা ছিলো। শুধু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য নয় প্রসাধন হিসেবেও সাবানের ব্যবহারকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে কসকো সাবানের ভূমিকা ছিলো।

লাক্স সাবানের এই বিজ্ঞাপনটি (চিত্র ১৫:) ৮ জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় ছাপানো হয়। বিজ্ঞাপনে মডেল হয়েছিলেন তৎকালীন পাকিস্তানের খ্যাতিমান নায়িকা হুসনা। তিনি ‘আজব খান’ (১৯৬১) সিনেমার মধ্য দিয়ে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। পঞ্চাশ-ষাটের দশক বাংলাদেশে শিল্প-সাহিত্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সময়। তখন এখানে বিজ্ঞাপনে নারীদের উপস্থাপনার কৌশল মাত্রই শুরু হয়েছিলো। ইসলামি অনুশাসন নির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয় করে দেখানোর ব্যাপারে বিধি-নিষেধ আছে। হুসনা বাংলাদেশে জনপ্রিয় ছিলো যার কারণে লাক্সের বিজ্ঞাপনে তার ছবি ও উক্তির ব্যবহার করা হয়েছিলো। “বিশুদ্ধ, স্নিগ্ধ লাক্স আমার ত্বক-সৌন্দর্যের সঙ্গের যত্ন নেয়”, নায়িকা হুসনার এই উক্তি বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হয়। ১৯২৯ সালে ভারতে প্রথম লাক্স বাজারে আসে এবং প্রথম লাক্সের বিজ্ঞাপনের মডেল হয়েছিলেন বলিউডের জনপ্রিয় নায়িকা লীলা চিতনিস। লিভার ব্রাদার্স কোম্পানি জনপ্রিয় নায়িকাদের লাক্সের ব্র্যান্ড এম্বাসেডর (Brand Ambassador) হিসেবে চুক্তিবদ্ধ করে যা পণ্যের প্রচারে ব্যাপক প্রভাব রাখে। বিজ্ঞাপন জগতে লাক্সের এই কৌশলটি অভিনব ও বেশ কার্যকর হয়েছে। ভারতে লাক্সের প্রথম বিজ্ঞাপনে সাবানের ব্যবহারবিধিও দেওয়া হয়েছিলো। সাথে ‘লাক্স, সিনেমার নায়িকাদের সৌন্দর্য সাবান’ এই স্লোগানটি প্রচারিত হয়েছিলো।^{২৯}

বাংলাদেশে ২০০৫ সাল থেকে ‘লাক্স-চ্যানেল আই সুপারস্টার’ নামক একটা রিয়েলিটি শো’র আয়োজন করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে বাছাই করা তরুণীদের মিডিয়াতে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের পুরস্কৃত করা হয়। মূল উদ্দেশ্য লাক্সের প্রচার ও বিজ্ঞাপন। পরবর্তীতে নির্বাচিত তরুণীদের লাক্সের মডেল ও কখনো কখনো ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে চুক্তিবদ্ধ করা



চিত্র ১৫: ১৯৬৯ সালে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় লাক্স সাবানের বিজ্ঞাপন।

হয়। লাক্স নারীদের সৌন্দর্যের আঞ্চলিক মান নির্ধারণ করে, প্রচার করে এবং তা কাজে লাগিয়ে নিজেদের বাজার ধরে রাখতে চায়। সৌন্দর্যের যে মান লাক্স তুলে ধরে সমাজে এর বিশেষ প্রভাব আছে। প্রচার ও পরিচিতি বাড়ানোর কৌশল হিসেবে পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারীদের আকর্ষণীয় করে দেখানো ও সাধারণ মানুষকে পণ্য কিনতে প্রলুব্ধ করার জন্য নারীদের ব্যবহার উপমহাদেশে লাক্সই প্রথম করেছে। লাক্সের বিজ্ঞাপনে জনপ্রিয় ব্যক্তির ছবি ও পণ্য সম্পর্কিত অনুকূল মন্তব্য ব্যবহারের চল বাইরের দেশে আগে থেকে চালু থাকলেও বাংলাদেশে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের দিকে এর চল দেখা যায়। যুগে যুগে উপনিবেশিক শাসনের ভেতর থেকে এই অঞ্চলের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। ইংরেজ শাসন আমলে ইউরোপীয় ভাবধারার নন্দনতত্ত্বই নির্ধারণ করে দিয়েছে সৌন্দর্যের মাপকাঠি। তারা আধুনিকতার নামে মানসিক দাসত্বের বীজ রোপণ এবং প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থানের মাঝে বৈরিতার সম্পর্ক নির্মাণ করে দিয়েছে। বাংলার মানুষ নিজেদের অস্তিত্বের শিকড় ভুলে ইংরেজদের দেখানো পথে সমাজ পরিবর্তন করতে গিয়ে মূলত ওদের দাসে পরিণত হয়েছে।

যার প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায় বাংলার মানুষের সৌন্দর্য-তত্ত্বে ও রুচিবোধে। বাংলাদেশে মানুষের শারীরিক সৌন্দর্যের যে বৈশিষ্ট্য আজো সমাজে প্রচলিত তা মূলত ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা।



চিত্র ১৬: লাক্স সাবানের বিজ্ঞাপনে বিভিন্ন সময়ে মডেল হওয়া নায়িকারা।

লাক্সের বিজ্ঞাপনে জনপ্রিয় যে

নারী মডেলদের নেয়া হয় তাদের রূপ বা সৌন্দর্যকে পুঁজি করে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনই কোম্পানির লক্ষ্য। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নারীর সৌন্দর্য ও যৌনতাকে পণ্যের প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণে। ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে নারী শরীরের যৌনাত্মক উপস্থাপনা এখন খুব সাধারণ বিষয়। বিজ্ঞাপনে নারীদের উপস্থিতি বাঙালি সমাজে গভীর প্রভাব ফেলেছে। সাধারণত বিজ্ঞাপন সংস্কৃতিতে নারীদের অবস্থানকে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা হয়ে থাকে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় নারীর পণ্য হয়ে উঠার পেছনে লাক্সের বিশেষ ভূমিকা আছে।

বর্তমান সময়ে মুদ্রণ প্রযুক্তির উন্নয়ন, মানুষের রুচির পরিবর্তন ও চাহিদাবৃদ্ধি, বৈশ্বিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক সামর্থ্য ইত্যাদি কারণে পত্রিকা ও সাময়িকী সমূহের বিজ্ঞাপনে নতুনত্বের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। অনেক পণ্য বা সেবার সোশ্যাল মিডিয়া বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুকে সারসংক্ষেপ করে ছবি আকারে পত্রিকা বা সাময়িকীগুলোতে ছাপানো হয়। ষাট-সত্তরের দশকে পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপনচিত্রে সাধারণত মডেলের সাথে পণ্যের ছবি ও প্রাসঙ্গিক কিছু লেখা চোখে পড়ে তবে এই সময়ে বেশ কিছু মুদ্রিত বিজ্ঞাপনচিত্রের সঙ্গে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত বিজ্ঞাপনের সংযোগ থাকায় ছোট নাটিকা বা গল্পের আকারে প্রচারিত বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত ডায়ালগ বা জিঙ্গেল (Jingle), চরিত্র, নির্দিষ্ট রঙ ও পণ্যের ছবি প্রিন্টেড ভার্সনে ব্যবহার করে দর্শক বা ভোক্তাকে সংযুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। মানুষের আবেগকে স্পর্শ করে এমন গল্প, যেমন-পিতা-পুত্রের বা কন্যার সম্পর্ক, ভাইবোনের সম্পর্ক, ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক, বন্ধুত্বের সম্পর্ক

ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পণ্যের ভূমিকাকে মূখ্য করে দেখানোর প্রয়াস দেখা যায়। মানুষ যেহেতু স্মৃতিচারণে আবেগী হয়ে পড়ে সেহেতু বিজ্ঞাপনের গল্পে স্মৃতিকাতরতাকে উপজীব্য করতে প্রায় দেখা যায়। পণ্যের নাম বা পরিচয় অবচেতন মনে মানুষের মস্তিষ্কে গেঁথে দিতে নির্দিষ্ট রঙকে চিহ্নিত করে বিজ্ঞাপনে সেই রঙকে প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্নভাবে ব্যাভিৎ করা হয়। সাধারণ মানুষের মনস্তত্ত্ব অবচেতনে পণ্যের পরিচয়ের ছাপ ফেলতে চায় ব্যবসায়ীগণ। কোম্পানিগুলো মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পছন্দ, প্রয়োজন, চাহিদা ইত্যাদি বিষয়কে প্রভাবিত করে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে চায়। দৈনন্দিন জীবন-যাপনে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে সহজ করার উদ্দেশ্যে পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করে ভোগবাদী সমাজ তৈরি করে নিজেদের পুঁজি বৃদ্ধি ও অবস্থান শক্ত করতে চায়।

তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে কাগজে মুদ্রিত পত্র-পত্রিকার ব্যবহার হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ডিজিটাল মাধ্যমের সহজলভ্যতায় সাধারণ মানুষের হাতে থাকা বিভিন্ন ডিভাইসে সরাসরি বিজ্ঞাপন পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে। বিকল্প অনেক মাধ্যম জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তবে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন যেমন দীর্ঘ সময় দর্শকের সামনে থাকে তা অন্য মাধ্যমে সম্ভব নয়। বিলবোর্ড ও লিফলেটের (Leaflet) মতো মুদ্রণ নির্ভর প্রচার মাধ্যমগুলো আরো দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে। তবে মুদ্রিত পত্রিকার প্রয়োজন ধীরে ধীরে কমে আসছে এবং তাতে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের বড় একটি ক্ষেত্র হারিয়ে যেতে পারে। উন্নতবিশ্বের দেশগুলোয় যেখানে নাগরিকদের ব্যক্তিগত ডাকবক্স রাখা হয় সেখানে কয়েকদিন পর পর বিভিন্ন পণ্যের মূল্যতালিকা সহকারে মুদ্রিত লিফলেট বা প্রচারপত্র রেখে যেতে দেখা যায়, তবে কেউ না চাইলে এই সেবাটি বন্ধ করে দিতে পারেন, যেমনটি কম্পিউটার বা ফোনের স্ক্রিনে বিজ্ঞাপন না চাইলে হাইড (Hide) বা ক্রস প্রেস করে বন্ধ করে দিতে পারেন। এক্ষেত্রে কোনো কোনো ওয়েবসাইটে (Website) একটা নির্দিষ্ট সময় (কয়েক সেকেন্ড) পর্যন্ত দেখার পর বিজ্ঞাপন হাইড করা সম্ভব হয়।

উপসংহার:

মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের ইতিহাস পুরানো হলেও পূর্ববঙ্গে এর আগমন বিংশ শতকের প্রথমার্ধে। ব্রিটিশ দুর্ভাগ্যের পর দেশভাগের সাথে এই দেশ অন্য এক সংকটের সম্মুখীন হয়। পাকিস্তানের শোষণের কারণে কিছু কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হলেও এর বেশির ভাগ সুফল ভোগ করতো পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ। এই অঞ্চল ব্যবসা-বাণিজ্যে পিছিয়ে পড়ার কারণে বিজ্ঞাপনের জনপ্রিয়তাও তেমন তৈরি হয়নি। মুদ্রণ প্রযুক্তির আগমন ঘটলেও পত্র-পত্রিকা তেমন সার্বজনীন হয়ে উঠেনি। পাকিস্তান আমলে হাতেগোনা কয়েকটি পণ্যের বিজ্ঞাপন বেশি চোখে পড়ে, তারমধ্যে- চা, প্রসাধনী, বিভিন্ন বৈদ্যুতিক পণ্য, চলচ্চিত্র, কাগজ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের মধ্যে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ও প্রচারিত কিছু মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের উদাহরণ এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত লেখা, ছবি ইত্যাদির মাধ্যমে একটি ধারণা বা চিন্তাকে প্রচার করা হয়েছে যার প্রভাবে সাধারণ মানুষ যেনো পণ্যটি কিনতে উৎসাহিত হয়। পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের দীর্ঘ ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত একটি উপস্থাপন এই প্রবন্ধ এবং এখানে পণ্যের বিজ্ঞাপন কীভাবে উপস্থাপন হচ্ছে তার ভিত্তিতে ঐ সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি পরিস্থিতির সাধারণ ও প্রাসঙ্গিক চিত্র বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। রাষ্ট্র ও সমাজের উপর বিজ্ঞাপন সংস্কৃতির যেমন প্রভাব থাকে তেমনি বিজ্ঞাপনের উপরেও রাষ্ট্র ও সমাজের প্রভাব রয়েছে। বর্তমান সময়ে বিজ্ঞাপন প্রচারের প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন মাধ্যম থাকলেও পত্র-পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন প্রচার অব্যাহত রয়েছে। মুদ্রণ

প্রযুক্তির উন্নয়ন ও কম্পিউটার-নির্ভর বিভিন্ন সফটওয়্যারের সাহায্যে অনেক বেশি সূক্ষ্ম কাজ করা সম্ভব হচ্ছে।

তথ্যসূত্র

- ১ পার্বণ মাজহার, *বিজ্ঞাপনের ইতিহাস, কিভাবে, কবে থেকে শুরু হলো বিজ্ঞাপন?*, ইতিবৃত্ত (অনলাইন) [সর্বশেষ পরিবর্তন সেপ্টেম্বর ১৬, ২০২২] <http://surl.li/pxgok> প্রেক্ষিত: ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২২
- ২ তদেব
- ৩ মো: যোবায়ের আলী জুয়েল, *বিজ্ঞাপনের ইতিহাস II উপমহাদেশের পত্রপত্রিকায়, দৈনিক জনকণ্ঠ*, প্রকাশ: ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ (অনলাইন)। <http://surl.li/pxgoy> প্রেক্ষিত: ২০ আগস্ট ২০২২
- ৪ পার্বণ মাজহার, পূর্বোক্ত
- ৫ *Caxton Prints the First Book Advertisement in the English Language*, Jeremy Norman's History of Information.com <http://surl.li/pxgpi> প্রেক্ষিত: ২১ আগস্ট ২০২০
- ৬ Ben Judge, *11 March 1702 - the world's daily newspaper published*, MoneyWeek [Last update march 11, 2020] <http://surl.li/pxgpt> প্রেক্ষিত: ২১ আগস্ট ২০২২
- ৭ The History of Newspaper Ads, Newspaper Advertising Encyclopedia, Releasemyad.com <http://surl.li/pxgqd> প্রেক্ষিত: ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২
- ৮ শাওন আকন্দ, গ্রাফিক ডিজাইন, চারু ও কারুকলা (লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ২০০৭, পৃ: ১৮০
- ৯ Arun Chaudhuri, *INDIAN ADVERTISING 1780 to 1950 A.D.*, Published by the Tata McGraw Hill Publishing Company Limited, 7 West Patel Nagar, New Delhi 110 008. <http://surl.li/pxghb> প্রেক্ষিত: ২৩ আগস্ট ২০২০
- ১০ তদেব
- ১১ তদেব
- ১২ খন্দকার মাহমুদুল হাসান, 'বিজ্ঞাপন যেভাবে শুরু' প্রকাশ: 'সমকাল' ২৫ নভেম্বর ২০১৭, ১০ ভাদ্র ১৪২৭। <http://surl.li/pxghs> প্রেক্ষিত: ৫ সেপ্টেম্বর ২০২০
- ১৩ রতন লাল চক্রবর্তী 'বাংলা পিডিয়া' বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, [শেষ পরিবর্তন হয়েছিল ০৪:৫০টার সময়, ৫ মে ২০১৪ তারিখে]
- ১৪ মুনতাসীর মামুন, 'ঢাকার প্রথম সংবাদপত্র', প্রকাশ: 'কালেরকণ্ঠ' ১০ জানুয়ারি, ২০১৭
<http://surl.li/pxgij>
- ১৫ খন্দকার মাহমুদুল হাসান, পূর্বোক্ত
- ১৬ তদেব
- ১৭ 'সংবাদপত্র ও সাময়িকী'- হেলাল উদ্দিন আহমেদ এবং গোলাম রহমান, 'বাংলা পিডিয়া' বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ। [শেষ পরিবর্তন হয়েছিল ০৫:০৫টার সময়, ৫ মে ২০১৪ তারিখে] <http://surl.li/pxgjt> প্রেক্ষিত: ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২০]

- ১৮ 'মোহাম্মদী' এ.এইচ.এম শফিকুল মাওলা 'বাংলা পিডিয়া' বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ। [শেষ পরিবর্তন হয়েছিল ১৩:১৯টার সময়, ৫ মার্চ ২০১৫ তারিখে] <http://surl.li/pxgkgj>
- ১৯ খন্দকার মাহমুদুল হাসান, পূর্বোক্ত।
- ২০ সজিব তৌহিদ, 'ঢাকার প্রথম ছবি 'মুখ ও মুখোশ'' প্রকাশ: 'সমকাল' ০৯ নভেম্বর ২০১৭
<http://surl.li/pxglc> প্রেক্ষিত: ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০
- ২১ খন্দকার মাহমুদুল হাসান, পূর্বোক্ত
- ২২ মনু ইসলাম, 'দৈনিকআজাদ', 'বাংলা পিডিয়া' বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, [শেষ পরিবর্তন হয়েছিল ২৩:৫৮টার সময়, ৪ মে ২০১৪ তারিখে]। <http://surl.li/pxglg> প্রেক্ষিত: ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০
- ২৩ 'শরীয়তপুর পোর্টাল', শরীয়তপুর জেলা বিষয়ক অনলাইন তথ্য পোর্টাল। <http://surl.li/pxglo> প্রেক্ষিত: ১০ জানুয়ারি, ২০২১
- ২৪ চন্দন সাহা রায়, 'সাধনা ঔষধালয় ঢাকা- যোগেশ চন্দ্র ঘোষ একটি নাম! একটি ইতিহাস!' <http://surl.li/pxglx> প্রেক্ষিত: ১০ জানুয়ারি, ২০২১
- ২৫ Engr. M Inamul Haque, Remerbering Moulana Bhasani, The Daily Star, Published: November 17, 2007. <http://surl.li/pxgmf> প্রেক্ষিত: ২৩ জানুয়ারি, ২০২১; উইকিপিডিয়া, <http://surl.li/pxgml> প্রেক্ষিত: ১৫ জানুয়ারি, ২০২১
- ২৬ শমিত দাশ, 'কবি যখন বিজ্ঞাপনে', আনন্দবাজার পত্রিকা, প্রকাশ: ২৮ জুন ২০২০, অনলাইন সংস্করণ। <http://surl.li/pxgmw> প্রেক্ষিত: ১৬ জানুয়ারি, ২০২১
- ২৭ আহমেদ জুয়েল, বিজ্ঞাপন-তারকা রবীন্দ্রনাথ, বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, প্রকাশ: ৬ আগস্ট ২০১০, অনলাইন সংস্করণ। <http://surl.li/pxgnf> প্রেক্ষিত: ২৮ জানুয়ারি, ২০২১
- ২৮ <http://surl.li/pxgno> প্রেক্ষিত: ৮ জানুয়ারি, ২০২১
- ২৯ আতিফ আতাউর, 'লাক্সের বিজ্ঞাপনে বলিউড তারকারা', কালের কণ্ঠ, ৬ জানুয়ারি ২০১৭, অনলাইন সংস্করণ। <http://surl.li/pxgnv> প্রেক্ষিত: ৮ জানুয়ারি, ২০২১

দেরিদার বিনির্মাণ : একটি বিশ্লেষণ

মুহাম্মাদ আবদুস সালাম*

Abstract

Jacques Derrida was One of the most influential and leading philosopher on 20th century. His influence touched many field of academic such as linguistics, literature, anthropology, music, law, architecture and so on. His influence also continues into the 21st century. He is most familiar for his 'Deconstruction' which that once on interpretive approach and a critique of western metaphysics. Although Derrida used the word deconstruction in his three books which are *Of Grammatology*, *Writing and Difference* and *Speech and Phenomena* (and all this three books published in 1967), but he first introduce this concept in *Of Grammatology*. Where he analyzed the interplay between language and the construction of meaning. Derrida's deconstruction is basically critique of western thoughts and he presented his own views as counter discourse. This paper presents early Derrida's deconstruction and analysis some related term what are exposed by him to focusing deconstruction. And in this connection also this paper explain Derrida's contrary views against some philosophers, linguist and anthropologist.

চাবিশব্দ: কেন্দ্র, কাঠামো, পাঠ্য, ভিন্নতা, অর্থ, মুক্ত-খেলা

ভূমিকা

দর্শনের সুদীর্ঘ ইতিহাস আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব কোনও দার্শনিকের মত বা তত্ত্বই চিরসত্য হিসেবে টিকে নেই। মত প্রতিমত ও ভিন্নমতের মধ্য দিয়ে দর্শনের ইতিহাস অগ্রসরমান। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক থেলিস জগতের মূল সত্তা সম্পর্কিত যে বিশ্বতাত্ত্বিক সমস্যার অবতারণা করেছিলেন এবং এর ব্যাখ্যায় তিনি 'পানি'কে জগতের মূলসত্তা হিসেবে গ্রহণ করে যে একটি জড়বাদী ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন তা পরবর্তী দার্শনিকদের দ্বারা সমালোচিত ও বর্জিত হয়েছে এবং প্রত্যেকেই এ সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন মত প্রদানের চেষ্টা করেছেন। যেমন অ্যানাক্সিমেন্ডার জগতের মূল সত্তা হিসেবে সীমাহীন বস্তু (Boundless Matter) অ্যানাক্সিমেনিস বায়ু, পিথাগোরীয়রা সংখ্যা, এলিয়াটিকরা সত্তা (Being), হিরাক্লিটাস আগুন, এম্পিডক্লিস চারটি উপাদান (আগুন, পানি, মাটি, বায়ু), ডেমোক্রিটাস পরমানুর কথা বলেছেন।^১ কিন্তু কারোর মতই সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। একজনের মত বা তত্ত্বকে অপরজন সমালোচনা করে বর্জন করেছেন অতঃপর নিজেই আবার ভিন্ন কোনো মত বা তত্ত্ব প্রদানের চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ প্রত্যেক দার্শনিক বা দার্শনিকগোষ্ঠী তাদের মত বা তত্ত্বকে চূড়ান্ত সত্য বলে মনে করে। কিন্তু দর্শনে চূড়ান্ত সত্য বলে আসলে কিছু নেই। বস্তুত জগত-জীবন সম্পর্কিত যেকোনো চিন্তার মধ্যেই একটা অনিবার্য ফাঁক থেকে যায়। আর এ জন্যই দার্শনিকরা পুরাতনকে বর্জন করে নতুন তত্ত্ব প্রদান করেন। আর এই নতুন তত্ত্ব প্রদানের মাধ্যমে কেবল পুরাতন তত্ত্ব বর্জিতই হয় না; এর সাথে সাথে নতুন তত্ত্ব গৃহীতও হয় বটে। পুরাতনের ধ্বংসের মধ্য দিয়েই নতুনের সৃষ্টি হয়। একই সঙ্গে destruction

* সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

এবং construction, আর এই দুটো মিলিয়ে হয় de-construction। আর এটাই হল জ্যাক দেরিদার deconstruction। বাংলায় অনেকে deconstruction শব্দটিকে বিনির্মাণ বলে অভিহিত করেছেন।^১ সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দেরিদা যে বিনির্মাণের কথা বলেছেন তার সূত্রপাত দর্শনের ইতিহাসের প্রারম্ভিক সময় থেকেই। তবে দর্শনে যা জগৎ ভাবনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে, দেরিদার বিনির্মাণে তা প্রয়োগ করা হয়েছে দর্শনের উপর। তিনি প্রশ্ন তোলেন দর্শনের প্রচলিত রীতি, প্রচলিত প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে। আর এজন্যই দেরিদার লেখালেখিতে মূলত: রয়েছে অন্যান্য দার্শনিকের ভাষ্য কিংবা প্রতিষ্ঠিত দর্শনের সমালোচনা। দর্শন সাহিত্যে তাঁর তিনটি বিখ্যাত বই হল- (i) *Of Grammatology* (ii) *Writing and Difference* এবং (ii) *Speech and Phenomena*। ১৯৬৭ সালে এই বই তিনটি প্রকাশের মধ্য দিয়েই মূলত বিনির্মাণ শব্দটির সূত্রপাত হয় এবং এরপর থেকেই দার্শনিক আন্দোলনে একটি নতুন মুখ হিসেবে দেরিদার পরিচিতি দ্রুত বাড়তে থাকে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : উত্তর আধুনিক দর্শনে দেরিদার প্রভাব অপরিসীম। দেরিদার বিচরণ চিন্তার নানা ক্ষেত্রে। তাঁর চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বিনির্মাণ (Deconstruction)। তবে বিনির্মাণ উপস্থাপনার ক্ষেত্রে দার্শনিক ভাষা ও সাহিত্যিক ভাষার মধ্যে যে একটা বিভাজন রয়েছে তা তিনি তুলে দিয়েছেন। ফলে তিনি একজন সাহিত্যিক না দার্শনিক তা বোঝা অনেক সময় মুশকিল হয়ে পড়ে। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেরিদা একটা নিজস্ব শৈলী ব্যবহার করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে চমকতা এবং নানা ধরনের কারুকাজ। তাঁর এই ভাষা মূলত রূপক এবং প্যারাডক্স এর সমন্বয়ে উপস্থাপিত। ভাষা খেলায় তাঁর এই শৈল্পিক উপস্থাপনার জন্য প্রচলিত দার্শনিক প্রত্যয়গুলো তাঁর দর্শনে স্থান পায়নি। ফলে সাধারণ পাঠকের কাছে তাঁর দর্শন অত্যন্ত দূর্বোধ্য এবং জটিল বলে মনে হয়। সুতরাং দেরিদার বিনির্মাণ দর্শনকে সহজ সরল এবং সাবলীল ভাষায় পাঠকের কাছে উপস্থাপন করাই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি: একটি গবেষণাকর্ম সম্পাদন এবং তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে গবেষণা পদ্ধতি বিশেষভাবে সহায়তা করে। আলোচ্য ‘দেরিদার বিনির্মাণ : একটি বিশ্লেষণ’ শীর্ষক গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে গিয়ে দেরিদার বিনির্মাণ দর্শনের ধারণা প্রদান করা হয়েছে। আবার দেরিদা তাঁর বিনির্মাণ দর্শনে বিভিন্ন ধরনের প্রত্যয় ব্যবহার করেছেন, গবেষণা প্রবন্ধে সেসব প্রত্যয়গুলো বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুতরাং প্রবন্ধ রচনায় একদিকে যেমন বর্ণনামূলক পদ্ধতি (Descriptive Method) ব্যবহার করা হয়েছে, অন্যদিকে আবার বিশ্লেষণমূলক (Analytical) ও ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি (Explanatory Method) ব্যবহার করা হয়েছে।

দেরিদার দর্শন বেশিরভাগ সময় ঘুরপাক খেয়েছে ভাষা কেন্দ্রিক অধিবিদ্যার সমালোচনার মধ্যে। তিনি মনে করেন, ভাষা কেন্দ্রিক অধিবিদ্যার বিষয় থেকে মানুষ কখনও সত্যের সন্ধান পায়না। হেগেল সমস্ত জগতকে যুক্তির প্রকাশ বলে মনে করতেন। মানুষের জীবনকেও তিনি যুক্তির কাঠামোতে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যুক্তি ছাড়াও মানুষের জীবনে আরও অনেক উপাদান আছে। কিন্তু হেগেল সেগুলোকে অগ্রাহ্য করেছেন। অস্তিত্ববাদী দার্শনিক কিয়োর্কগার্ডের মতে, মানুষের জীবনে উদ্বেগ আছে, আবেগ আছে এবং তার অস্তিত্বের ও স্বাতন্ত্র্যের উপলব্ধি আছে। আর এর সবগুলো মিলিয়ে রচিত হয় তার জীবনের সত্য। মূলত পাশ্চাত্য দর্শনের অধিবিদ্যা যুক্তিনির্ভর এবং বাক্কেন্দ্রিক। দার্শনিক যে সত্য উপলব্ধি করেছেন তাকে তাঁর বাক্ বা উক্তির মধ্য দিয়ে

প্রকাশ করেছেন। কিন্তু যুক্তি যে মানুষের সকল দিকের প্রতি আলোকপাত করতে পারে না, তা আমরা অন্তিত্ববাদী দর্শনে দেখেছি। কাজেই দেরিদা যুক্তি নির্ভর বাক্য কেন্দ্রিক দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে এমন দর্শনের কথা বলতে চান, যা জীবনের সমস্ত দিকের প্রতি আলোকপাত করে। জীবনে বাক্য বা উক্তি ও লেখার পারস্পরিক নির্ভরতার বন্ধনে গড়ে উঠতে পারে প্রকৃত দর্শন। তাই কেবলমাত্র বাক্য বা উক্তির প্রাধান্যকে বর্জন করে বাক্য ও লেখার সৌহাদ্যপূর্ণ অবস্থানকে আমরা জীবন রচনায় আমন্ত্রণ জানাতে পারি। আর এই প্রাধান্য বর্জন করাটাই হলো দেরিদার বিনির্মাণের গল্প। দেরিদার মতে, দর্শনে একটি যুক্তি পরম্পরা কাজ করে এবং এই যুক্তিকে নানারকমভাবে ব্যাখ্যা (Interpretation) করা যেতে পারে।^{১০} সাধারণভাবে ব্যাখ্যার (Interpretation) উদ্দেশ্য হলো টেক্সটের অন্তর্নিহিত অর্থ সুস্পষ্ট করা এবং একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। কিন্তু দেরিদার বিনির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যার অর্থ সম্পূর্ণরূপে আলাদা এবং কোনো ব্যাখ্যার মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় অর্থ বা সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। বরং ব্যাখ্যা এখানে গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। সুতরাং একটা ব্যাখ্যাকে বর্জন করে আরেকটি ব্যাখ্যা প্রদান করা আবার সেটাকে বর্জন করে নতুন ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়। এই গ্রহণ-বর্জন রীতিটাই হলো দেরিদার বিনির্মাণের অনুষঙ্গ।

দেরিদা Deconstruction বা বিনির্মাণ পদটি প্রথম ব্যবহার করেন তাঁর *Of Grammatology* গ্রন্থে ১৯৬৭ সালে, যখন তিনি বোধগম্য ভাষা হিসেবে কথ্য ভাষার চেয়ে লেখ্য ভাষার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তিনি বলেন, “Writing thus enlarged and radicalized, no longer issues from a logos. Further, it inaugurates the destruction, not the demolition but the de-sedimentation, the de-construction, of all the significations that have their source in that of the logos.”^{১১} এখানে দেরিদা বিনির্মাণকে বোঝাতে চেয়েছেন ভাষার মাধ্যমে। মূলত কেউ যখন বোধগম্য ভাষায় কোনো কিছু লিখে তখন তার অর্থের মধ্যে কি ঘটে? দেরিদার মতে, ভাষাকে যখন লেখায় রূপদান করা হয়, তখন ভাষা ব্যবহারকারীর চিন্তা থেকে তাঁর অর্থের উৎপত্তি ঘটেনা। কারণ সেই চিন্তা ততক্ষণে ভাষার মধ্যে একটা স্থান দখল করে নেয়। প্রত্যেক ভাষা ব্যবহারকারী একটা পদ্ধতির মধ্যে বাইরে থেকে অর্থ দেওয়ার চেষ্টা করে। সুতরাং অর্থ সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ভাষা ব্যবহারকারীর নিয়ন্ত্রণে থাকে না। টেক্সট বা পাঠ্যের অর্থ প্রকৃতপক্ষে লেখকের অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে না। বরং টেক্সটের অর্থ আবশ্যিকভাবে নির্ভর করে ব্যাখ্যা, আলোচনা এবং অনুবাদের কিছু মাত্রার উপর। সুতরাং লিখিত ভাষার অর্থ আবশ্যিকভাবে পাঠকের সক্রিয় ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে। আর এজন্যই লিখিত ভাষা বা টেক্সটের অর্থের ক্ষেত্রে বিনির্মাণ তার স্থান দখল করে। বিষয়টিকে আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য দেরিদার মৌখিক ও লিখিত ভাষার মধ্যে পার্থক্য করনের বিষয়টিকে বিবেচনা করা যাক। দেরিদা যুক্তি দেখান যে, মানুষ ঐতিহাসিকভাবেই মৌখিক ভাষাকে ভাষার প্রাথমিক ধরণ বা মুখ্য ভাষা হিসেবে মনে করে^{১২} এবং লিখিত ভাষাকে মৌখিক ভাষার অধীন বা গৌণ ভাষা হিসেবে মনে করে (“a particular, derivative, auxiliary form of language in general.”)^{১৩} দেরিদার মতে, মৌখিক ভাষাকে ঐতিহাসিকভাবে চিন্তা হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এখানে বক্তার সামনে শোতা উপস্থিত থাকে। বক্তার চিন্তা যদি জোরে উচ্চারিত হয় এবং শোতা তা শ্রবণ করে এবং শোতার মধ্যে বক্তার চিন্তা বোঝার ব্যাপারে কোনো অসুবিধা দেখা দেয়, তখন বক্তা সেখানে উপস্থিত থাকে বলে তার পূর্ববর্তী উক্তির অর্থ বুঝিয়ে দিতে পারে।

দেরিদা যুক্তি দেখান যে, চিন্তা হিসেবে মৌখিক ভাষা নিজেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।^৭ মৌখিক ভাষার ক্ষেত্রে নির্দেশিত (signified) অর্থ এত তাৎক্ষণিকভাবে বোঝানো হয় যে, সেখানে যে ভাষাতাত্ত্বিক নির্দেশক (signifier) জড়িত ছিলেন এবং যিনি মৌখিক শব্দ করেছিলেন তাঁকে ভুলে যাওয়াটা খুবই সহজ ব্যাপার। আর তাই লিখিত চিহ্নই প্রকৃতপক্ষে ভাষার অন্তর্ভুক্ত বলে দেরিদা মনে করেন। সুতরাং দেরিদা মৌখিক ভাষার সাথে সরাসরি, অর্থের সমস্যাহীন তত্ত্ব এবং নির্দেশককে (signifier) ভুলে যাওয়া বিষয়গুলোকে সহযোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।^৮

অন্যদিকে লিখিত ভাষার ক্ষেত্রে লেখক সাধারণত অনুপস্থিত থাকেন। এক্ষেত্রে পাঠক কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে টেক্সটের (পাঠ্যের) অর্থ স্পষ্টকরণের জন্য লেখকের উপর নির্ভর করতে পারেনা। আর অনেকটা সেকারণেই লিখিত ভাষাকে চিহ্ন পদ্ধতির ভাষা হিসেবে পরিজ্ঞান করা হয়। চিহ্নপদ্ধতি হিসেবে নির্দেশকগণ (signifier) উপস্থিত থাকতে পারেন, কিন্তু নির্দেশিত বিষয়ের অর্থ (meaning) কেবলমাত্র অনুমিত। কার্যত এখানে ভাষার নির্দেশকের দ্বারা যা নির্দেশিত হচ্ছে তার অর্থ পাঠকের অনুবাদের উপর নির্ভর করে। সুতরাং মৌখিক ভাষার চেয়ে লিখিত ভাষার বিশেষত্ব হলো এখানে ভাষার মধ্যে নির্দেশকগণ উপস্থিত থাকে, কিন্তু নির্দেশিত বিষয়ের অর্থ অনুপস্থিত থাকে। সুতরাং শব্দের অর্থ এখানে পাঠকের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে। আর যেহেতু শব্দের অর্থ বা টেক্সটের অর্থ পাঠকের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে, সেহেতু প্রত্যেক পাঠকই টেক্সটের অর্থ ভিন্নভাবে বিনির্মাণ করতে পারে।^৯

দেরিদা তাঁর বিনির্মাণ এর আলোচনায় ভাষার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। কেননা ভাষা মানুষের জীবন পরিসরে এমন এক প্রাকটিস, যার মধ্যে আমাদের অনেক কিছু উন্মোচিত। দেরিদার মতে, ভাষা হলো দ্যোতক পুঞ্জের অনন্ত উল্লাসের মঞ্চ। তিনি মনে করেন, ভাষা ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং ভাষার বাইরে কিছু নেই; আর ভাষার অর্থ অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং অর্থের বাইরে কিছু নেই। অর্থের কোনো শেষ নেই এবং শেষ খুঁজতে যাওয়াও উচিত নয়। কেননা কন্টেক্সট (Context) পরিবর্তনে অর্থ বদলে যায়। যিনি টেক্সট রচনা করেন তিনি টেক্সটের অর্থ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখেন না। টেক্সট এর অর্থ অবশ্যই আছে কিন্তু অর্থ নিয়ন্ত্রণের একমাত্র কোনো সূত্র নেই। প্রতিমুহূর্তেই নতুন অর্থ তৈরীর সম্ভাবনা থাকে এবং প্রতিটি নব উদ্ভাবিত অর্থের সঙ্গে পুরনো অর্থের যোগ অত্যন্ত ক্ষীণ। অর্থের এই অস্থিরতা যে কোনো টেক্সটের ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। দেরিদার এই টেক্সট সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি মূলত সুইস ভাষাবিদ ফার্ডিনান্ড ডি সস্যুর এর নিকট থেকে এসেছে। সস্যুরকে কাঠামোবাদের অন্যতম প্রবক্তা হিসেবে মনে করা হয়। সস্যুরের মতে, ভাষা কোনো টেক্সটের অর্থ তৈরি করে না; বরং টেক্সটের অর্থ উদঘাটন করাই হলো ভাষার কাজ। সুতরাং বলা যায় ভাষা ব্যবহারের পূর্বেই টেক্সটের অর্থ অবস্থান করে। তাঁর মতে, মানুষের ব্যবহৃত ভাষাচিহ্ন বা শব্দ, ভাষা-কৌশলের আওতাধীন অন্যান্য ভাষা-চিহ্নের সাথে তুলনা করার পরই অর্থবোধক হয়।^{১০} যেমন আমরা যখন ‘বাঘ’ শব্দটি উচ্চারণ করি তখন তার অর্থ প্রকাশ করার জন্য একটি তুলনামূলক গ্রহণ-বর্জন কৌশল গ্রহণ করি। যেমন- বাঘ যেহেতু গরু নয়, মানুষ নয়, ঘোড়া নয় সেহেতু ‘বাঘ’ অর্থ বাঘ। দেরিদা সস্যুরের এই মত গ্রহণ করলেও তত্ত্বটির বিস্তার ঘটান। তিনি মনে করেন, কোনো একটি ভাষা ব্যবস্থার আওতাধীন ভাষাচিহ্নের তুলনামূলক অবস্থান বিশ্লেষণ মানুষকে জীবন জগত সম্পর্কিত বিভিন্ন শব্দের অর্থ প্রদান করে। সস্যুরের মতে, অর্থ উদ্ধারের এই প্রক্রিয়ায় মানবিক চেতনার ক্রিয়াই থাকে মুখ্য যার ফলে জগৎ জীবন সম্পর্কিত বিষয়ের অর্থ

প্রাপ্তির সাথে সাথে একজন মানুষ তার উপস্থিতি বা অস্তিত্বকে অনুভব করে, তৈরি করে এক অতীন্দ্রিয় অধিতাত্ত্বিক জগৎ। এই অতীন্দ্রিয় অধিতাত্ত্বিক জগতের স্রষ্টা মানুষ- ‘আমি আছি তাই সবকিছুর অস্তিত্ব আছে, সবকিছুর অর্থ আছে’ এমন একটা উপলব্ধিকে কেন্দ্র করে তার সমস্ত চিন্তার জাল বিস্তার করে। দেকার্তের বিখ্যাত উক্তি “Cogito ergo sum” (আমি চিন্তা করি তাই আমি আছি) এর মাধ্যমে অহং-সত্তাকে স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও সত্যের প্রকৃত উপস্থাপক হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু দেরিদার মতে, অহং-সত্তা কেন্দ্রিক এই চিন্তা প্রকৃত সত্য কিংবা অর্থকে উদ্ধার করে না। কারণ প্রকৃত সত্য ও অর্থ এক সময়হীন ভাষার শৃংখলে আবদ্ধ।^{১১} অহং কেন্দ্রিক উচ্চারিত (মানুষের) মুখের ভাষা তাত্ত্বিকভাবে একটি নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করলেও লিখিত ভাষা কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করতে পারে না। কারণ লিখিত ভাষা একটা সময় কেন্দ্রিক এবং বিভিন্ন সময় তা বিভিন্ন দেশ কালের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষিত হয় বলে তা’ বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা বা অর্থ তৈরি করে।^{১২} লিখিত ভাষার এই দেশ কাল কেন্দ্রিক অর্থের ভিন্নতার বিষয়টিকে বুঝানোর জন্য দেরিদা ডিফারেন্স (diffe’rance) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ডিফারেন্স (diffe’rance) শব্দটির মূলে আছে differ যার অর্থ ভিন্নতা বা পার্থক্য। দেরিদার মতে, সমস্ত ভিন্নতা এবং সমস্ত অস্তিত্বের উৎপত্তি ঘটে ডিফারেন্সের ক্রিয়াকলাপ হতে। (All difference and all presence arise from the operation of diffe’rance).^{১৩} তিনি যুক্তি দেখান যে, ডিফারেন্স (diffe’rance) সমস্ত দর্শনেই পরিব্যাপ্ত। কারণ সকল দর্শনই ভাষার মাধ্যমে একটি পদ্ধতি হিসেবে নির্মিত হয়। ভাষার জন্যও ডিফারেন্স আবশ্যিক, কারণ “অধিবিদ্যায় যাকে চিহ্ন (sign) বলা হয় (নির্দেশিত এবং নির্দেশক signified and signifier)” তাও ডিফারেন্সের তৈরি।^{১৪} ভাষার মধ্যে যে অস্থির ক্রীড়া চলে এটা তারই সৃষ্টি এবং এর ফলে কোনো শব্দের সুনির্দিষ্ট কোনো অর্থ নির্ধারণ করা যায় না। কোনো ধারণার সঠিক সংজ্ঞা প্রণয়ন করাও সম্ভব হয় না। সুতরাং বিনির্মাণের তাত্ত্বিক ভিত্তির চাবিকাঠি হল এই ডিফারেন্স।

দেরিদার লেখার মধ্যে উত্তর কাঠামোবাদ অত্যন্ত গভীরভাবে চিহ্নিত আছে, আর এর ব্যাখ্যামূলক কৌশল হলো তাঁর বিনির্মাণ তত্ত্ব, যা সমালোচনামূলকও নয় আবার বিরোধিতাপূর্ণও নয়। তাঁর লক্ষ্য ছিল অর্থপূর্ণ আলোচনার আদি প্রতিষ্ঠাতাকে হ্রাসকরণের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করা। তাঁর এই কাজের প্রথম কারণ ছিল নিজস্ব অর্থ এবং সম্ভাব্য অর্থকে চূড়ান্তভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন করা। দেরিদার মতে, অর্থ (Meaning) এবং ভাষা একে অপরের ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করে এবং ভাষা অর্থের বাহক নয় বরং অর্থের বিনাশকারী। বিনির্মাণ তত্ত্ব আবশ্যিকভাবে পাঠ্যের ব্যাখ্যাকারী (Textual Interpretation), যা অবসানের অসম্ভাব্যতার ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করে।^{১৫} অর্থাৎ কোনো টেক্সটের অর্থের শেষ বা চূড়ান্ত অর্থ বলে কিছু একটা যে আছে তা এখানে অস্বীকার করা হয়। কোনো একটি বাক্যের বা শব্দের অর্থ কি তা নিয়ে প্রচলিত মতের সাথে দেরিদার মতের যে ভিন্নতা তাই ডিফারেন্স নামে অভিহিত। প্রচলিত অর্থ মনে করা হয় যে, কোনো একটি বাক্যের নিজস্ব একটি অর্থ আছে। বাক্য যেন জানে সে কে, বলতে পারে কি তার পরিচয়, বলতে পারে তার নিজের অর্থ। বাক্যের নিজের যে অভিন্নতা (identite) যে আত্মপরিচয় তা’ নিজের অর্থই চেনানো সম্ভব। কিন্তু দেরিদা এখানেই ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন, কোনো কিছুই তার আত্মপরিচয়ে পরিচিত হতে পারে না, বা নিজের কাছে নিজেই উপস্থিত থাকতে পারেনা। বরং নিজে নিজের কাছে না থেকে নিজ থেকে একটু দূরে অবস্থান করে। উদাহরণ হিসেবে বলা

যায়, ‘এটা হয় একটি চেয়ার’- এই বাক্যের অর্থ কী? এই প্রশ্নের উত্তর সহজ বাংলায় দেয়া সম্ভব নয়। বরং এর উত্তর দিতে হলে ভিন্ন একটি ভাষায় দিতে হবে। যেমন ইংরেজি ভাষায় বললে “দিস ইজ এ চেয়ার (This is a chair) এবং এই বাক্যের মাধ্যমে মূল বাক্যের পরিচয় বা অর্থ পাওয়া গেল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে একটি বাক্যের অর্থ বা পরিচয় তার নিজের মধ্যে (অভিন্ন) থাকে না; বরং অন্য ভাষার বাক্যের মধ্যে তার অর্থ বা পরিচয় নিহিত থাকে। আর এজন্যই দেরিদার ভাষাকে বলা হয় অভিন্নতার (identite’) দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ভিন্নতার(diffe’rance) দিকে ঝুঁকে যাওয়া ভাষা।^{১৬} কেউ-ই তার নিজের ধ্রুব পরিচয় দিতে পারে না। কারণ অন্তরের আত্মতত্ত্ব খুঁজে তার পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং খুঁজে দেখতে হয় কোথায় সে আপন হতে বের হয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। পূর্বে উল্লিখিত চেয়ারের উদাহরণে প্রথমত্যা থেকে সরে এসেছে(diffe’rance) বলেই “দিস ইজ এ চেয়ার” মাধ্যমে (ভিন্ন ভাষা) তার পরিচয় দিতে পেরেছে। ফরাসি আত্মপরিচয় বাচক বা অভিন্নতা বাচক শব্দidentite’র বিপরীত শব্দ হলো diffe’rence। Diffe’ranceএর প্রচলিত বানান ence এর স্থলে দেরিদা ance লিখেছেন। এর ফলে শব্দটির ফরাসি উচ্চারণ (দিফেরাঁস) না পাল্টালেও অর্থ পরিবর্তনের আভাস কিন্তু রয়েছে। দেরিদা এখানে বলতে চেয়েছেন, লিপি নিছক কথ্য ভাষার গোলাম নয়; বরং নিজস্ব কিছু খেলাও সে খেলতে জানে। কথ্য ও লেখ্য ভাষার মধ্যে এই যে মুক্ত খেলা (Free Play)তারই দৃষ্টান্ত হলো দেরিদার অবানান ওয়ালা diffe’rance শব্দটি।^{১৭} বস্তুত দেরিদা তাঁর বিনির্মাণ তত্ত্বে কথ্য ভাষার (মুখের ভাষা) চেয়ে লেখ্য ভাষার (লিখিত ভাষা) উপর বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন। কথা বলার সময় বক্তা এবং শ্রোতা দুজনেই উপস্থিত থাকেন বলে বক্তা, শ্রোতা এবং কথার মধ্যে স্থান কালের কোনো দূরত্ব থাকে না। এখানে বক্তা জানে, সে যা বলছে, শ্রোতা তা শুনছে। ফলে বক্তা যা বলতে চায়, যা প্রকাশ করতে চায় তার অর্থ শ্রোতা বোঝার চেষ্টা করে। তবে অর্থ শ্রোতার বুঝতে অসুবিধা হলে বক্তা সেখানে উপস্থিত থাকেন বলে সে নিজেই সে অসুবিধা দূর করতে পারে। কিন্তু কোন লেখা যখন পাঠক পড়েন, তখন লেখক সেখানে উপস্থিত থাকেন না। ফলে অনেক সময় যখন পাঠক লেখকের অভিপ্রায় বুঝতে পারেন না, তখন সেটি ধরিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে (লেখককে) পাওয়া যায় না। এজন্য পাশ্চাত্যে লেখার চেয়ে কথাকে অধিক মূল্য দেয়া হয়েছে।^{১৮} কিন্তু দেরিদার মধ্যে বিপরীত প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কথা ও লেখার মধ্যে লেখার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়ার দেরিদার এই যে বিনির্মাণ তার পিছনে এক গভীরতর যুক্তি রয়েছে। আর তা হল কোনো একটি শব্দের যে অর্থ তা সব ক্ষেত্রেই এক হবে।^{১৯} ফলে কোনো বক্তা সেই কথাটি বলার জন্য যদি উপস্থিত নাও থাকেন, তাঁর অভিপ্রায় যদি আমরা জানতে না পারি, তবুও সেই কথাটির অর্থের পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ শব্দের অর্থ বোঝার জন্য বক্তার উপস্থিতির প্রয়োজন নেই। ভাষাকে আয়ত্ত করতে পারলেই শব্দের অর্থ আয়ত্তে আসবে। লিখিত ভাষা এই সত্যটি তুলে ধরে বলেই দেরিদা লেখ্য ভাষাকে কথ্য ভাষার চেয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন।^{২০}

দেরিদার বিনির্মাণ সকল রকমের কাঠামোর বিরুদ্ধে। তিনি ১৯৬৬ সালে তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধ (Structure Sign and Play in the Discourse of Human Sciences) নামক প্রবন্ধে কাঠামোবাদের (Structuralism) বিরুদ্ধে তাঁর মত তুলে ধরেছেন। কাঠামোবাদ শব্দটির মধ্যে কাঠামো বা একটি ছকের ধারণা রয়েছে। কাঠামোবাদীদের মধ্যে অন্যতম হলেন সস্যুর, ফ্রয়েড, লেভি-স্ট্রাস, অ্যালথুসার প্রমুখ। দার্শনিকদের দর্শন বিষয়ক আলোচনাগুলো একটা

স্ট্রাকচার বা কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের একটা কাঠামো রয়েছে, আবার মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের আরেকটি কাঠামো রয়েছে। অ্যালথুসার, মার্কসীয় দ্বন্দ্বিক মতবাদকে হেগেলীয় মতবাদ থেকে আলাদা করে মার্কসীয় কাঠামোবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। দেরিদার মতে, হেগেলের দর্শনের একটা কাঠামো বা ছক রয়েছে, আবার কাঠামোবাদীদের দর্শনের আর এক ধরনের কাঠামো বা ছক। তবুও ছক। দেরিদা এই কাঠামোর বিরুদ্ধাচারন করে বলেন, দর্শনকে বা কোনো আলোচনাকে একটা নির্দিষ্ট কাঠামো বা ছকে ধরে রাখা যায় না।^{২১} হেগেলীয় দর্শন একটি সামগ্রিক ধারণার কথা বলে, যার অংশে থাকে মানুষ। যেমন রাষ্ট্র একটি সামগ্রিক রূপ, যার অংশ হলো নাগরিক। আবার বাজার যদি হয় একটি সামগ্রিক রূপ, তবে তার অংশ হল মালিক ও শ্রমিক। উভয় ক্ষেত্রেই সামগ্রিক ধারণার কেন্দ্রে থাকে মানুষ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, হেগেলীয় দর্শন একটি ধারণার মধ্য দিয়ে সমগ্রকে প্রকাশ করে, যার নাম হলো ইউনিভার্সাল বা সার্বিক। এই সার্বিক বা ইউনিভার্সাল হলো উৎস, আর এই সার্বিক উৎস থেকে পার্টিকুলার বা বিশেষরা প্রবাহিত হয়। মার্কসবাদে অর্থ (money) হলো উৎস, আর এই অর্থনৈতিক উৎস থেকে উপরিকাঠামো হিসেবে রাজনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি বের হয়ে আসে। সুতরাং সার্বিক বা ইউনিভার্সাল হলো একটি সেন্টার বা কেন্দ্র যা পার্টিকুলার বা বিশেষগুলোকে ধরে রাখে।^{২২} দেরিদার কাঠামোবাদ বিরোধী বিনির্মাণ দর্শন মূলত প্লেটোনিক দর্শনের এক ধরনের সমালোচনা। কেননা প্লেটোনিক দর্শন অনুসারে কেবলমাত্র সার্বিকের অস্তিত্ব আছে; বিশেষগুলো সার্বিকের ছায়ামাত্র। আবার মানবিক চিন্তা-ক্রিয়ায় অহং উপস্থিত থাকে বলে মানুষ সবসময় তার পছন্দমত একটি সেন্টার বা কেন্দ্র নির্ধারণ করে অগ্রসর হতে চায়। কিন্তু দেরিদার বিনির্মাণে মানবিক চেতনা সবসময় অহং কেন্দ্রিক যুগ্ম-বৈপরীত্য (Binary-opposition) কে কেন্দ্র করে অগ্রসর হতে চায়।^{২৩} এই যুগ্ম-বৈপরীত্যগুলো হলো অস্তিত্ব/অনস্তিত্ব, সার্বিক/বিশেষ, ভালো/মন্দ, চিরন্তন/পরিবর্তন, কথা/লেখা, যুক্তি/আবেগ, সংস্কৃত/প্রাকৃত, নর/নারী ইত্যাদি। এই যুগ্ম-বৈপরীত্যগুলো পরস্পর বিপরিত এবং প্রথমটি দ্বিতীয়টির চেয়ে উঁচু স্তরের। ফলে প্রথমটির উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। তবে দেরিদার মতে, মানবিক চিন্তা কাঠামোয় যুগ্ম-বৈপরীত্যের ধারণায় পরিবর্তন আসতে পারে। ফলে একটা পর্যায়ে এসে নিচু স্তরের ধারণা উঁচু স্তরের ধারণায় পর্যবসিত হতে পারে। সুতরাং প্লেটোনিক দর্শনে যে বিশেষগুলোকে সার্বিকের ছায়ামাত্র বা গুরুত্বহীন মনে করা হয়েছে, তা আসলে গুরুত্বহীন নয়। বরং সার্বিক এবং বিশেষ উভয়ই সত্য, উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ। যাই হোক, কাঠামোবাদ অনুসারে, উৎস বা সেন্টার বলে কিছু নেই। প্রতিটি কাঠামোই অন্য কাঠামোগুলির দ্বন্দ্বের দ্বারা নির্ধারিত। সুতরাং সার্বিক বা উৎস বা সেন্টার নেই। কিন্তু দেরিদার মতে, সেন্টার আছে, কেননা কাঠামোগুলো মিলেমিশে এক সমাজ হয়ে আছে। বস্তুত মানবিক চিন্তায় উৎস বা সেন্টার বিহীন কোনো কিছুর ধারণা করা একবারেই অসম্ভব। অ্যালথুসারের (Althusser) কাঠামোবাদ সমাজকে অনেকগুলি কাঠামোর কাঠামোরূপে দেখে। অর্থাৎ এমন কিছু একটা আছে যা কাঠামোগুলোকে ধরে রাখে, অথচ কাঠামোবাদ তাকে ব্যাখ্যা করেনা।^{২৪} আর যা কাঠামোগুলোকে ধরে রাখে সেটাই হলো সেন্টার বা উৎস। সুতরাং কাঠামোবাদেও একটি সেন্টার আছে; অথচ তা আলোচনার বাইরে থাকে। হেগেলের কাঠামোবাদ সেন্টারটিকে ধারণ করে কিন্তু কাঠামোবাদ তাকে অস্বীকার করে। দেরিদা সেন্টারটিকে অস্বীকার না করে স্বীকার করে নেওয়ার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, আলোচনায় সবকিছু মিলবে এমনটা নয়; কিছু জিনিস বাইরে থেকে যেতেই পারে, অথচ তার চিহ্ন রেখে যায় আলোচনার অভ্যন্তরেই। আবার এই গ্রহণ এবং বর্জনের কাজটি সাবজেক্ট করে বলে পুরো ব্যাপারটিই সাবজেক্টিভ।^{২৫} আরেক কাঠামোবাদী ফরাসি নৃবিজ্ঞানী ক্লদ লেভি-স্ট্রাস

(Claude Levi-Strauss) আদিম মানুষের (savage) সমাজ কাঠামোকে খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন তাদের মনন এবং সংস্কৃতি দিয়ে। তাঁর মতে, সার্বিক (Universal) নিয়মাবলি দিয়ে আদিম মানুষের সমাজ কাঠামো বোঝা যায় না, বরং মনন এবং সংস্কৃতি দিয়ে তা বোঝা যায়। আর এই আদিম মানুষের মননের একটা কাঠামো বা স্ট্রাকচার আছে, কিন্তু বিশেষ নিয়ম দিয়ে তাকে নির্দিষ্ট করা যায় না। তবে কেবলমাত্র একটি ক্ষেত্রে নিয়ম রয়েছে; আর তা হল জ্ঞাতির মধ্যে যৌনাচারের (Incest) ক্ষেত্রে। ইনসেস্টের (Incest) এই বিধি নিষেধ প্রাকৃতিক। দেরিদা এখানেই লেভি-স্ট্রাসকে সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে (দেরিদা), কোনো কিছুই প্রাকৃতিক নয়; সুতরাং ইনসেস্টের বিধি-নিষেধ ও প্রাকৃতিক নয়। বরং এই বিধি নিষেধ একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যার একটি ইতিহাস আছে। লেভি-স্ট্রাসের আলোচনা জ্ঞাতির মধ্যে যৌনাচারের (ইনসেস্ট) বিধি-নিষেধ নামক সেন্টারটিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। দেরিদা স্ট্রাসের আলোচনার এই সেন্টারটিকে চিহ্নিত করে দেখালেন যে, লেভি-স্ট্রাসের কাঠামোবাদেও একটি সেন্টার আছে; কিন্তু তা ব্যাখ্যা করা হয়নি বরং বাদ পড়ে গেছে।^{২৬} দেরিদার মতে, নিয়মাবলির কাঠামো অসংখ্য হতে বাধ্য, কেননা একটি কাঠামোতে সবসময়ই কিছু-না-কিছু বাদ পড়ে যায়। আর এই বাদ পড়ে যাওয়া বা গ্রহণ বর্জনের বিষয়টি অনন্তহীনভাবে চলতে থাকে। প্রতিটি কাঠামোই তা সমাজের হোক বা অন্য যেকোনো বিষয়েরই হোক না কেন তা অবশ্যই গ্রহণ বর্জন সাপেক্ষ। আর এই গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়াটি সম্পাদিত হয় সাবজেক্টের দ্বারা। সুতরাং প্রক্রিয়াটি সাবজেক্টিভ এবং সাবজেক্টের স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী খেলামাত্র।^{২৭}

উপসংহার: দেরিদার বিনির্মাণ পশ্চিমা দর্শনে বিদ্যমান প্রথা বা ঐতিহ্যের (Tradition) প্রতি একধরনের বিরোধিতা করার প্রবণতা। যে প্রবণতায় তিনি দর্শনের প্রচলিত রীতিকে ভাঙতে চেয়েছেন। কেননা প্রচলিত রীতি অনুসারে, দার্শনিক অনুসন্ধানের (philosophical investigation) মূল উদ্দেশ্য হলো সত্যে পৌঁছানো। কিন্তু দেরিদার বিনির্মাণ সত্য অনুসন্ধান (আবিষ্কার)ে অগ্রহীণ নয় বা সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর প্রতিও এর কোনো অগ্রহ নেই। তাঁর বিনির্মাণের বৈশিষ্ট্যই হলো অনিশ্চিত এবং অনির্দিষ্ট। আর এজন্যই দেরিদা মনে করেন, তাঁর বিনির্মাণ কোনো পদ্ধতি (Method) নয়; বরং এটা পড়া (reading), লেখা (writing) এবং চিন্তা (thinking) করার পন্থামাত্র। কেউ বিনির্মাণকে কোনো প্রকল্পের (Hypothesis) পরীক্ষায় বা যুক্তির পক্ষে ব্যবহার করতে পারেনা। বরং বিনির্মাণ হলো কোনো কিছুর অর্থ জিজ্ঞাসার একটা চলমান প্রক্রিয়া। এই বিনির্মাণের বিশেষ কোনো লক্ষ্য নেই। এটা অসম্ভব এবং সিদ্ধান্তহীনতার বিষয়ের একটি আলাপ-আলোচনা মাত্র। দেরিদার বিনির্মাণের ধারণাটি বিকশিত হয়েছে মূলত ভাষাকে কেন্দ্র করে। ভাষাকে দুইভাবে প্রকাশ করা হয়। যথা: বাক্ (মৌখিক) এবং লিখিত মাধ্যমে। পশ্চিমা অধিবিদ্যক দর্শনে মৌখিক ভাষাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু দেরিদা বিপরীত (ভিন্ন) মত প্রদান করে লিখিত ভাষার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তবে তিনি দেখিয়েছেন, লিখিত ভাষার যে টেক্সট, তার অর্থ ব্যাখ্যাভেদে ভিন্ন হতে পারে। আর ভিন্নমত প্রদান করা হলো দেরিদার বিনির্মাণের একটি রীতি। আর এই রীতি বোঝাতে গিয়ে দেরিদা যুগ্ম-বৈপরীত্যের (Binary-opposites) কথা বলেছেন। যুগ্ম-বৈপরীত্য অনুসারে, সবকিছুতেই পরস্পর বিরোধী দুটো বিষয় অবস্থান করে। যেমন: অস্তিত্ব/অনস্তিত্ব, ভালো/মন্দ, চিরন্তন/পরিবর্তন, কথা/লেখা, যুক্তি/আবেগ, সংস্কৃত/প্রাকৃত, নর/নারী ইত্যাদি। এই যুগ্ম-বৈপরীত্যেগুলো পরস্পর বিপরীত অর্থ ধারণ করে এবং এদের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই প্রথমটি উঁচু স্তরের এবং দ্বিতীয়টি নিচু স্তরের। ফলে দ্বিতীয়টির চেয়ে প্রথমটির উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা

হয়। কিন্তু দেরিদার বিনির্মাণ অনুসারে, দ্বৈত-বৈপরীত্যের যে ধারণা, তার কাঠামোতে পরিবর্তন হতে পারে। ফলে একটা পর্যায়ে এসে যে ধারণাকে নিচু স্তরের মনে করা হয়, তা উঁচু স্তরের বা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। আবার দেরিদা যে লিখিত ভাষার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন, ভাষার সেই লিখিত রূপ হিসেবে যে চিহ্ন (sign) বা শব্দ ব্যবহার করা হয়, তার অর্থ (meaning) লেখকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা প্রত্যেক পাঠকের ব্যাখ্যা বা অনুবাদের উপর নির্ভর করে। সুতরাং সেই লিখিত শব্দ যেটাকে দেরিদা টেক্সট (text) বলেছেন, সেই টেক্সটের অর্থ কনটেক্সট পরিবর্তনে বা পাঠকভেদে ভিন্ন হতে পারে। আর এই বিষয়টা হলো দেরিদার ডিফারেন্স (Différance) সংক্রান্ত বিনির্মাণ। আবার দেরিদার বিনির্মাণ কাঠামোবাদের (Structuralism) বিরুদ্ধাচারণ করতে গিয়ে মূলত প্লেটোনিক (Platonic) দর্শনের সমালোচনা করেছেন। কেননা দেরিদার মতে, প্রতিটি কাঠামোর-ই একটা উৎস বা কেন্দ্র (Centre) থাকে। প্লেটোনিক দর্শনে এই কেন্দ্র হলো সার্বিক ধারণা (Universal idea)। আর এই সার্বিক ধারণা থেকে বিশেষগুলো (Particulars) বের হয়ে আসে। কিন্তু সার্বিক ছাড়া বিশেষের নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব নেই। সুতরাং কেবলমাত্র সার্বিক ধারণা বা কেন্দ্রের অস্তিত্ব আছে এবং কেন্দ্রই সত্য। কেন্দ্রের এই বিষয়টাকে আমরা যদি অর্থের (meaning) ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি, তাহলে দেখা যায় কেন্দ্র অন্যান্য সকল সম্ভাব্য অর্থকেই (all possible meaning) অস্বীকার করে। যুগ্ম-বৈপরীত্য (Binary-opposites) অনুসারে কেন্দ্রের বিপরীত শব্দ হলো প্রান্ত (marginal)। সুতরাং প্লেটোনিক দৃষ্টিকোণ থেকে কেবলমাত্র কেন্দ্রই সত্য আর প্রান্ত অসত্য এবং অর্থহীন। কিন্তু দেরিদার বিনির্মাণ অনুসারে, অর্থের গতি অস্থির (unstable)। সুতরাং যুগ্ম-বৈপরীত্যের বিনির্মাণ অনুসারে বলা যায় কেন্দ্রের মতো প্রান্তও সত্য এবং প্রান্তেরও অর্থ আছে। অর্থাৎ কেন্দ্র এবং প্রান্ত উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং প্লেটোনিক দর্শনের সার্বিক এবং বিশেষ উভয়ই সত্য এবং উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য নির্দেশ:

১. W.T. Stace, *A Critical History of Greek Philosophy*, (ST Martin's Press, New York, 1967), p.22.
২. মৃণালকান্তি ভদ্র, “জ্যাক-দেরিদার বিনির্মাণ প্রসঙ্গ ও হাইডেগার”, *জ্যাক দেরিদা, পাঠ ও বিবেচনা* (ঢাকা: সংবেদ প্রকাশনী, ২০০৬), পৃ. ১৩৩।
৩. ভদ্র, পৃ. ১৩৬।
৪. Jacques Derrida, *Of Grammatology*(1967), Trans. by Gayatri Chakravorty Spivak, (The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, Corrected ed. 1997), pp. 10-11.
৫. “These disguises are not historical contingencies that one might admire or regret. Their movement was absolutely necessary” and that “within this logos [i.e. the western tradition of philosophical thought], the original and essential link to the phone’ has never been broken.” *ibid*, p. 7.
৬. *ibid*, p. 7.
৭. *ibid*, p. 8.

৮. www.en.wikipedia.org/wiki/Jacques-Derrida-on-deconstruction.
Access date.07 June, 2013, 10:39am.
৯. www.en.wikipedia.org/wiki/Jacques-Derrida-on-deconstruction.
Access date.07 June, 2013, 10:39am.
১০. Ferdinand de Saussure, *Course in General Linguistics* (1916), Trans. by Wade Baskin, (New York: New York Philosophical Library, 1959), pp. 121-122.
১১. মঈন চৌধুরী, “দেরিদার ডিকনস্ট্রাকশন: তাত্ত্বিক বিচার ও সাহিত্য সমালোচনায় প্রয়োগ”, *একবিংশ* (সেপ্টেম্বর, ১৯৯১, বাংলাদেশ), পৃ. ১৬।
১২. তদেব, পৃ. ২০।
১৩. Jacques Derrida, *Positions*, Translated and Annotated by Alan Bass, (2nd ed., 2002, introduction by C. Norris, London and New York : Continuum.), pp. 5-6.
১৪. *ibid*, p. 6.
১৫. Gerard Delanty, *Modernity and Postmodernity Knowledge, Power and the Self*, (SAGE Publications, London, 2000), p.140.
১৬. প্রবাল দাস গুপ্ত, “দেরিদা আর বিবরণ”, *আলোচনা চক্র*, মনন বিশ্ব সংখ্যা: ১ (অষ্টম সংকলন, জুলাই ১৯৯৬ কলকাতা) পৃ. ১১৪।
১৭. তদেব, পৃ. ১১৫।
১৮. কল্যাণ সেনগুপ্ত, “দেরিদা-দর্শনের একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা”, *যোগসূত্র*, ৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, (জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৯৪, কলকাতা) পৃ. ৭।
১৯. তদেব, পৃ. ৭।
২০. Jacques Derrida, *Positions*, Translated and Annotated by Alan Bass, “Interview with Julia Kristeva”, (The University of Chicago Press, 1982), pp.28-30.
২১. অজিত চৌধুরী, “একটি আধা অ্যাকাডেমিক (হাফ হাটেড) প্রবন্ধ”, *যোগসূত্র*, ৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, (জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৪, কলকাতা), পৃ. ১৫।
২২. তদেব, পৃ. ১৫।
২৩. মঈন চৌধুরী, তদেব, পৃ. ১৭।
২৪. অজিত চৌধুরী, তদেব, পৃ. ১৫।
২৫. তদেব, পৃ. ১৬।
২৬. তদেব, পৃ. ১৬।
২৭. তদেব, পৃ. ১৭।

বাঙালি সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

মুহাম্মদ খাইরুল ইসলাম*

মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম**

Abstract

Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, moral, law, custom and any other capabilities and habits acquired by a man as a member of society. Every nation has its own culture and traditions. Culture is reflected through its architecture, literature, music, painting, clothing and behavior. Bangladesh is an independent country with a population of around 169 million people. The country has a Bengali Muslim majority. The history of Islam in Bengal is very ancient and prosperous. It is divided into two phases. The First phase is the period of maritime trade with Arabia and Persia between the 8th and 12th centuries. The second phase covers centuries of Muslim dynastic rule after the Muslim conquest in Bengal in 1204. Bengali has a rich and diverse culture. Islam has a great influence on Bengali Culture. There are a lot of things in Bengali and Bangladeshi culture that are justified in and approved by Islam. This article is an attempt to focus on Islamic elements in Bengali culture.

চাবিশব্দ: বাঙালি, সংস্কৃতি, ইসলাম, কুরআন, হাদিস

ভূমিকা

সংস্কৃতি শব্দটি সংস্কার থেকে গঠিত। অভিধানে তার অর্থ- কোনো জিনিসের দোষ ত্রুটি বা ময়লা-আবর্জনা দূর করে তাকে ঠিক ঠাক করে দেয়া। সংস্কৃতির মূল কথা নিজেকে সুন্দর করা, সভ্য করা। প্রেম ও সৌন্দর্য সংস্কৃতির মূল আশ্রয়। এ আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হলে সংস্কৃতি ধ্বংস হয়। জীবনের সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। জীবনযাপন পদ্ধতির মধ্যেই সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ। জীবনচর্চার পরিশীলিত, পরিমার্জিত দিকটাকেই সংস্কৃতি বলা যায়। সব মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি এক রকম নয়। স্থান-কাল-পরিবেশের কারণে সংস্কৃতির মধ্যে নানা বৈচিত্র্য ঘটে। সংস্কৃতির বৈচিত্র্য সাধনে ক্ষেত্রবিশেষে যেসব প্রাকৃতিক উপাদান ক্রিয়াশীল, সেগুলোকে স্থান, কাল, আবহাওয়া, ভাষা, বর্ণ, খাদ্য ইত্যাদি রূপে চিহ্নিত করা যায়। অঞ্চলভেদে বিশাল পৃথিবীতে গ্রীষ্মমন্ডল, শীতপ্রধান অঞ্চল, নাতিশীতোষ্ণ মন্ডল সৃষ্টি হয়েছে, কোথাও সবুজ অরণ্যানী, কোথাও ধূ ধূ মরুভূমি, কোথাও শস্যশ্যামল উর্বরা ফসলের মাঠ, কোথাও সাগর-জলাশয়, কোথাও সুউচ্চ পাহাড়। শীত-গ্রীষ্ম-নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে আবহাওয়ার উল্লেখযোগ্য তারতম্য ঘটে। আবহাওয়ার কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশে যেমন বৈচিত্র্য ঘটে, জীবজন্তু-প্রাণীর জীবনযাত্রা প্রণালীতেও তেমনি বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। এক এক অঞ্চলের খাদ্য, বেশ-ভূষা প্রভৃতি সবকিছুতেই দৃশ্যমান পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এ পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে। আলোচ্য প্রবন্ধে বাঙালির দেশীয় সংস্কৃতির মধ্যে ইসলামের যে প্রভাব পড়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

** সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

গবেষণা পদ্ধতি

প্রবন্ধটি (Qualitative) গুণগত রীতির (Analytical) বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণে রচিত হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য-উপাত্তের জন্য কুরআন, হাদিস ও বিভিন্ন মুসলিম মনীষীর মৌলিক রচনার উপর নির্ভর করা হয়েছে। দৈনিক উৎস হিসেবে বিভিন্ন প্রবন্ধ, সাময়িকী ও ইন্টারনেটের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। উদ্ধৃতি ও তথ্যসূত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিকাগো স্টাইল পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো, সংস্কৃতি একটি সমাজের দর্পন। বাঙালি সংস্কৃতি অত্যন্ত প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। বাঙালির বিভিন্ন সংস্কৃতিতে মিশে আছে ইসলামের অনেক উপাদান যা আমাদের অনেকেরই অজানা। মূলত এ সম্পর্কে সকলকে অবহিত করার জন্যই এই প্রয়াশ; যাতে করে সকল মুসলিম এটি জেনে ইবাদত হিসেবে পালন করতে পারে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন বাঙালি সংস্কৃতির উপর কুরআন-হাদিস ভিত্তিক কোনো যুগোপযোগী গবেষণা হয়নি বললেই চলে। তবে কতিপয় ইসলামি গবেষক শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে কলম ধরেছেন যা অতি সামান্য। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ ও গবেষণাকর্ম হলো এ কে এম শওকত আলী খান রচিত স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস, গ্রন্থটি ২০১৪ সালে গ্রন্থ কুঠির থেকে প্রকাশিত হয়েছে। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, রসূলুল্লাহ সা. এর দৃষ্টিতে সংস্কৃতির রূপরেখা (প্রবন্ধ), অগ্রপথিক (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.), আগস্ট, ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, পৃ. ১৭। মুহাম্মদ আবদুর রহীম কর্তৃক বিরচিত শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, গ্রন্থটি খায়রুন প্রকাশনী থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত। এছাড়াও কিছু জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় সংস্কৃতি ও ইসলামি সংস্কৃতি বিষয়ে কিছু কলাম প্রকাশিত হয়েছে। তবে সেসব গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহে সংস্কৃতি, বাঙালি সংস্কৃতি এবং ইসলামি সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকলেও বাঙালি সংস্কৃতিতে ইসলামি উপাদান সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পায়নি।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা

সংস্কৃতি শব্দের আভিধানিক অর্থ কৃষ্টি, চিত্তপ্রকর্ষ।^১ সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Culture^২-এর আভিধানিক অর্থ হালচাষ, কর্ষণ ও কৃষিকার্য।^৩

সংস্কৃতি শব্দটির আভিধানিক অর্থ চিত্তপ্রকর্ষ বা মানবীয় বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষ সাধন। ইংরেজি Culture-এর প্রতিশব্দ হিসেবে সংস্কৃতি শব্দটি ১৯২২ সালে বাংলায় প্রথম ব্যবহার করা শুরু হয়।^৪

কোনো স্থানের মানুষের আচার-ব্যবহার, জীবিকার উপায়, সংগীত, নৃত্য, সাহিত্য, নাট্যশালা, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মীয় রীতি-নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয়, তাই সংস্কৃতি।^৫

কোনো জাতির বৈশিষ্ট্যসূচক শিল্প-সাহিত্য, বিশ্বাস, সমাজনীতি ও মানসিক বিকাশের অবস্থাকে সংস্কৃতি বলে।^৬

সংস্কৃতি হল টিকে থাকার কৌশল এবং পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র সংস্কৃতিমান প্রাণী। মানুষের এই কৌশলগুলো ভৌগোলিক, সামাজিক, জৈবিকসহ নানা বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে।^৭

স্যামুয়েল পুফেনডারফের সংজ্ঞা অনুযায়ী, সংস্কৃতি বলতে সেই সকল পছন্দকে বোঝায় যার মধ্য দিয়ে মানব জাতি তাদের প্রকৃত বর্বরতাকে কাটিয়ে ওঠে এবং ভ্রান্তিমূলক কৌশলের মাধ্যমে পূর্ণরূপে মানুষে পরিণত হয়।^৮

এ সব সংজ্ঞা হতে যে কথাটি সহজে বেরিয়ে আসে তা হল জীবনের মূল্যবোধ ও তার বহিঃপ্রকাশই হল ‘কালচার’ বা সংস্কৃতি।

আসলে ‘সংস্কৃতি’ শব্দটি অসংস্কৃত বা অপরিচ্ছন্ন শব্দেরই পরিচ্ছন্ন বা বিশুদ্ধরূপ। ১১শ শতাব্দীতে সেন রাজাগণ বঙ্গদেশ অধিকার করার পরে এদেশে উঁচু মহলে প্রবর্তিত ভাষার বিকৃতি সহ্য করতে না পেরে সে ভাষাকে সংস্কৃত করেছিলেন। এ জন্যই এ অঞ্চলে তা সংস্কৃত ভাষা বলে প্রচলিত।^৯

এর সাধারণ বোধগম্য অর্থ হলো, মার্জিত রুচি ও উত্তম স্বভাব। ভদ্রজনিত আচার আচরণের অর্থেও শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যেমন অশিক্ষিত ও অমার্জিত স্বভাবের লোকদেরকে Uncultured এবং সুশিক্ষিত, সুরুচি সম্পন্ন ও ভদ্র আচরণ বিশিষ্ট মানুষকে Cultured Man বলা হয়। আসলে এ তিনটি (সংস্কৃতি, কালচার ও সাকাফাহ) শব্দেই ঠিকঠাক করা, সংশোধন করা ও পরিশুদ্ধ করার অর্থ নিহিত রয়েছে। এর পারিভাষিক সংজ্ঞাতেও এ অর্থটি পুরোপুরি রক্ষিত হয়েছে।^{১০}

বাঙালি সংস্কৃতি বলতে সাধারণত বোঝানো হয় বিশেষ সমাজের সাহিত্য, সংগীত, ললিত কলা, ক্রীড়া, মানবিকতা, জ্ঞানের উৎকর্ষ ও আরো অনেক শান্তি ও সৌন্দর্যের সমাহার। এর পরও, ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখলে সংস্কৃতি হলো মানুষের জ্ঞান, আচার-আচরণ, বিশ্বাস, রীতিনীতি, নীতিবোধ, চিরাচরিত প্রথা, সমষ্টিগত মনোভাব, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং অর্জিত কীর্তিসমূহ। নৃতাত্ত্বিক দিক দিয়ে সংস্কৃতি আবার ভিন্ন ধরনের একটি জটিল ধারণা। যেহেতু সব সংস্কৃতিই উৎস, বিকাশ, মূল্যবোধ এবং সংগঠনের দিক দিয়ে বিশিষ্ট, তাই বাহ্যিক রূপরেখা, তার বিবিধ প্রকাশ এবং নির্যাসে এক সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতি থেকে যথেষ্ট পৃথক। হাজার হাজার বছর ধরে নানা নৃতাত্ত্বিক এবং ধর্মীয় গোষ্ঠী ও শাখা-গোষ্ঠী, নানা শ্রেণির মিলন, পারস্পরিক প্রভাব এবং সমন্বয়ের ফলে গড়ে উঠেছে বঙ্গীয় সংস্কৃতি। বহু শতাব্দী ধরে সংস্কৃতির বিভিন্ন, এমনকি, পরস্পর-বিরোধী উপাদানের সহাবস্থান এবং সমন্বয়ের ফলে বঙ্গীয় অঞ্চলে বাঙালিত্বের এমন এক বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে যাকে বলা যায় বঙ্গীয় সংস্কৃতি এবং এক কথায় বলা যায় বঙ্গদেশ ও বাংলাভাষীদের সংস্কৃতি।^{১১}

বাঙালি সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব

ক. **অনাড়ম্বর জীবন-যাপন :** ক্রমবর্ধমান বিলাসবহুল জীবনযাত্রার মধ্যেও বাঙালিরা জৌলুসমুক্ত অনাড়ম্বর জীবনধারা পছন্দ করে থাকে। এ সম্পর্কে একটি অতি পরিচিত ও প্রাচীন প্রবাদ হলো “মাছে ভাতে বাঙালি” তথা মাছে ভাতে বাঙালি বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধারণ করে। সাধারণত বাংলাদেশের বেশীরভাগ মানুষ ভাত, মাছ, ডাল, শাক

সবজি, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি খেয়ে থাকে। বেশির ভাগ মানুষ তিন বেলাতেই ভাত খায়; তবে অনেকে ভাতের বদলে রুটিও খেয়ে থাকে। অতি অল্পতেই তারা তুষ্ট থাকে। আমরা যদি ইসলামি জীবন-যাপনের দিকে দৃষ্টি দেই তাহলে দেখবো যে, এটি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর কঠোর ঘোষণা রয়েছে এভাবে,

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ.

“দুনিয়ার জীবনের যে জাকজমক ও সৌন্দর্য তাদের কিছু দলকে পরীক্ষা করার জন্য আমি ভোগ করতে দিয়েছি, আপনি কিছুতেই সেদিকে আপনার চোখদ্বয়কে প্রসারিত করবেন না।”^{১২}

এ সম্পর্কে হাদিসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَنْكِبِي فَقَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ غَابِرُ سَبِيلٍ.

আব্দুল্লাহ ইবন উমার রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : (একদা) রাসূলুল্লাহ সা. আমার কাধ ধরে বললেন : দুনিয়াতে এমনভাবে থাকো যেনো তুমি একজন বিদেশী অথবা পথিক।^{১৩}

এ সম্পর্কে মুজাহিদ রহ. বলেন; আব্দুল্লাহ ইবন উমার রা. আমাকে বলেছেন :

إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ وَإِذَا أُمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ وَخُذْ مِنْ صَحَائِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ غَدًا "

“তুমি সকালে উপনীত হয়ে বিকালের জন্য নিজেকে অস্তিত্ববান মনে করো না এবং বিকালে উপনীত হয়ে সকালের জন্য নিজেকে অস্তিত্ববান মনে করো না। অসুস্থ হওয়ার পূর্বে তোমার সুস্থতার এবং মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনের সুযোগকে কাজে লাগাও। কেননা, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি তো জান না যে, আগামীকাল তুমি কী নামে অভিহিত হবে?”^{১৪}

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক নবী-রাসূল ও তাঁর সাহাবীগণের জীবন ছিলো অত্যন্ত সহজ সরল এবং অনাড়ম্বর। তাঁদের চিন্তা ও চেতনার মধ্যে ঘোর-প্যাঁচ কিংবা জটিলতার লেশমাত্র ছিলো না। উদার প্রকৃতির মতই তাঁদের মন ছিল উন্মুক্ত, কিন্তু মেজাজ ছিল তীক্ষ্ণ। তাই বলা যায় যে, বাঙালি সংস্কৃতিতে ইসলামের এ মহান শিক্ষার প্রভাব রয়েছে।

- খ. **সামাজিক ঐক্য :** মানবতার ঐক্য ও সংহতি জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি বৃদ্ধি করে, চেতনা ও মনোবল সুদৃঢ় করে। বাঙালি জাতির একটি বহুল প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ সংস্কৃতি হলো সামাজিক ঐক্য। তারা হুজুগে ও দীর্ঘমেয়াদী ফলাফলের কথা না ভেবে সবাই মিলে যে কোনো কাজে লাফিয়ে পড়তে পছন্দ করে। যেমন : কারো বিপদ হলে, কেউ অসুস্থ হলে, কারো দুর্ঘটনা ঘটলে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে থাকে। আর ইসলাম মূলত এই সামাজিক ঐক্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যা আমাদের দেশের বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে প্রবল। মানুষের মধ্যে এই সামাজিক ঐক্য সম্পর্কে মহান আল্লাহর ঘোষণা :

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ . وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاغِبُونَ.

“নিশ্চিত জেনো, এই তোমাদের উম্মাহ, এক উম্মাহ (তাওহীদের উম্মাহ) এবং আমি তোমাদের রব। সুতরাং আমার ইবাদত কর। কিন্তু তারা নিজেদের দ্বীনকে নিজেদের মাঝে টুকরা টুকরা করে ফেলেছে। (তবে) সকলেই আমার কাছে ফিরে আসবে।”^{১৫}

এ ছাড়া হাদিসেও প্রত্যেক আল্লাহর বান্দাহকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল, ঐক্যবদ্ধভাবে ভাই ভাইয়ের সম্পর্কের মতো থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদিসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا .

আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা প্রত্যেক আল্লাহর বান্দাহ পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও।^{১৬}

- গ. **অভিভাবকদের মাধ্যমে বিবাহ :** ছেলে-মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক হলে তাদের বিবাহ দেয়া আবশ্যিক; আর এ দায়িত্বটি বর্তায় পিতা-মাতা, বড় ভাই, চাচা ও বয়স্ক তথা অভিভাবকদের ওপর। আর এটি বাঙালি জাতির একটি আবহমানকালের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। মাত্র দু-একটি ব্যতিক্রম ব্যতীত বাঙালি জাতির মধ্যে অভিভাবকদের মাধ্যমেই বিবাহ-শাদীর আয়োজন করা হয়ে থাকে। যদিও পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সামাজিকতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিবাহ-শাদীতে পিতামাতা বা অভিভাবকদের কোনো স্থান থাকে না; যে যাকে ইচ্ছা তাকেই বিবাহ করছে, আর যে যাকে ইচ্ছা ত্যাগ করছে। অথচ বাঙালি জাতির ক্ষেত্রে তা পরিলক্ষিত হয় না। তাই বলা যায় যে, এটি নিঃসন্দেহে বাঙালিদের একটি সম্মানের বিষয়ও বটে। যা জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই অনুসরণ করে থাকে। এটি বাঙালি সংস্কৃতিতে ইসলামের একটি অন্যতম প্রভাব। কারণ ইসলামে অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ করাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অভিভাবক ব্যতীত বিবাহকে বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে হাদিসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْطَّلَاقُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

“আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কোনো নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করলে তার সে বিয়ে বাতিল। তিনি একথাটি তিনবার বলেছেন। আর সে যদি তার সাথে সহবাস করে, তাহলে এজন্য তাকে মোহর দিবে। যদি উভয় পক্ষের (অভিভাবকদের) মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে শাসক হবেন তার অভিভাবক। কারণ যাদের অভিভাবক নাই তার অভিভাবক শাসক।”^{১৭}

হাদিসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ .

আবু মুসা আল-আশআরী রা. হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন অভিভাবক ছাড়া কোনো বিয়েই হতে পারে না।^{১৮}

এ ছাড়া হাদিসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ.

“ওয়ালী (অভিভাবক) এবং দুইজন উত্তম চরিত্রের সাক্ষী ব্যতীত কোনো বিবাহ (বৈধ) হবে না”।^{১৯}

বিয়ের জন্য ছেলেদের শুধু নিজের সম্মতি প্রয়োজন। কিন্তু মেয়ের নিজের সম্মতির সাথে অভিভাবকের সম্মতিও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে একটা স্পষ্ট কথা মেয়েদের জেনে রাখা উচিত যে, যত যাই হোক না কেন, তাঁর অভিভাবকের সম্মতি ব্যতীত কোনো বিয়ে নিন্দনীয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস এ ব্যাপারটিই নির্দেশ করে।

ঘ. বিবাহপূর্ব প্রেম অপছন্দনীয় : বাঙালি সমাজে বিবাহপূর্ব প্রেম-ভালোবাসা, দুজন নারী-পুরুষের মধ্যকার এই সম্পর্কটিকে অত্যন্ত বাঁকা চোখে দেখা হয়ে থাকে। প্রেমিকযুগলকে তাঁদের সম্পর্কের পরিণতি দিতে সম্মুখীন হতে হয় অনেক বাধাবিপত্তির; শুনতে হয় কতশত কটু কথা; পড়তে হয় বিব্রতকর অবস্থায়। এ তো গেল সাধারণ পরিস্থিতির কথা! কিন্তু যখন এ সম্পর্কে এসে পড়ে কিছু ভিন্ন ধরনের প্রসঙ্গ, তখন তা জন্ম দেয় আরো বিতর্কের। তাই বিবাহপূর্ব ও বিবাহবহির্ভূত প্রেম-ভালোবাসা বাঙালি জাতির মধ্যে একেবারেই অপছন্দনীয়; এ জন্য এ বিষয়টি বাঙালি জাতির মধ্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে খুব সামান্যই দেখা যায়। এটি বাঙালি জাতির অন্যতম একটি সংস্কৃতি। বিশেষ করে অভিজাত পরিবার কখনই এ বিষয়টি মেনে নেয় না; যে কারণে ক্ষেত্রবিশেষ যদি এমন ঘটনা ঘটেও যায় তারপর তারা কখনও তা মানতে পারেন না ফলে উভয়ের মধ্যে বিবাদ-বিরোধ এমনকি মৃত্যুর ঘটনা পর্যন্তও ঘটে।^{২০} যদিও এ জঘন্যতম কাজ পৃথিবীর কোনো কোনো রাষ্ট্রে অপরাধ বলে বিবেচিত নয়।

‘প্রেমিকের কোলে যুবতীর লাশ’ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায় যে, শাহীন নামের এক প্রতারক বিলকিস নামের এক তরুণীর সাথে প্রেম করে। সে বিবাহিত হয়েও বিলকিসের সাথে অবিবাহিত পরিচয়ে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে। বিলকিস (১৭) সে বিষয়টি নিয়ে শাহীনের সাথে আলোচনা করে ঢাকা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আসে এবং বিয়ে করতে বলে। শাহীন এতে অস্বীকৃতি জানালে বিলকিস তার ব্যাগ থেকে বিষের শিশি বের করে তা পান করে। মুমূর্ষ অবস্থায় শাহীন নিজেই তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসার পথে সে মারা যায়।^{২১} এছাড়া ‘বিয়েতে প্রেমিকের আপত্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর আত্মহত্যা’^{২২}, ‘ধর্মণের পর দুই প্রেমিক বালিশ চাপা দিয়ে খুন করে সোনিয়াকে’^{২৩}, ‘ধরা পড়ার ভয়ে রুমিকে ২৮ টুকরো করে বাচু’^{২৪} ইত্যাদি খবর প্রতিনিয়ত আমরা জাতীয় দৈনিকে দেখতে পাই।

প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়টি একটি অসভ্যতা ও জঘন্য কাজ বলে আমাদের সমাজে পরিচিত। আর এ বিষয়টি সম্পর্কে ইসলামের বিধান অত্যন্ত কঠোর ও স্পষ্ট। ইসলামে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ছাড়া আর কোনো নারী পুরুষের প্রেম বৈধ নয়। সেটা বিয়ের আগে হোক আর পরে হোক। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর ঘোষণা:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْنَاهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفَحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ.

“এবং মু’মিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, যদি তোমরা তাদের মাহর প্রদান করো বিবাহের জন্য-প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা গোপন প্রণয়িনী গ্রহণের জন্য নয়। অর্থাৎ স্বাধীনভাবে লালসা পূরণ কিংবা গোপনে লুকিয়ে প্রেমলীলা করবে না।”^{২৫}

ইসলামে গাইরে-মোহরেম নারী-পুরুষের মাঝে প্রেম-ভালবাসা নিষিদ্ধ, এটি চরম গুনাহের কাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَأَنكِحُوا هُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَوتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا
مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ.

“সুতরাং তাদেরকে বিবাহ করবে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে এবং তাদেরকে তাদের মাহর ন্যায়সংগতভাবে দিবে। তারা হবে সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নয় ও উপপতি গ্রহণকারিণীও নয়।”^{২৬}

আর এ কারণেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা ও পরস্পর দৃষ্টি বিনিময়কে হারাম ঘোষণা করেছেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
يَصْنَعُونَ.

“মু’মিনদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফায়ত করে; ইহাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।”^{২৭}

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেমিক-প্রেমিকাদের মাঝে যেসব দেখা সাক্ষাত, ঘুরাফিরা সংঘটিত হয়ে থাকে সেগুলোকেও যিনা-ব্যভিচার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে হাদিসের এক বর্ণনায় এসেছে,

فَرْنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ، وَرْنَا الْيَدَيْنِ الْبَطْشُ، وَرْنَا الرَّجُلَيْنِ الْمَشْيُ، وَرْنَا الْفَمَ الْقُبْلُ، وَالْقُلْبُ
يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ الْقَرْجُ.

“দুই চক্ষুর যিনা হচ্ছে- দেখা, দুই হাতের যিনা হলো হাত দিয়ে স্পর্শ করা, দুই পায়ের যিনা হচ্ছে- হাঁটা, জিহ্বার যিনা হচ্ছে- কথা বলা, অন্তর কামনা-বাসনা করে; আর যৌনাঙ্গ সেটাকে বাস্তবায়ন করে অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।”^{২৮}

- ঙ. বিবাহপূর্ব ও বিবাহবহির্ভূত শারীরিক সম্পর্ক অপরাধ: পৃথিবীর সকল ধর্মেই বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন সভ্যতা ও ধর্মে বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্কে আখ্যা দেয়া হয়েছে পাপ হিসেবে এবং এর জন্য রয়েছে বিশেষ শাস্তি। অনেক ক্ষেত্রেই প্রেমের সময়ে শারীরিক সম্পর্ক দাম্পত্য পরবর্তী জীবনে নানাবিধ সমস্যা ডেকে আনে। এছাড়া বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ,

অকাল গর্ভপাতের মতো বড় বড় সমস্যা। মোটকথা, সমাজ বা ধর্ম কোনোভাবেই প্রেমের সময়ে ও বিবাহ পূর্ববর্তী পরনারী-পুরুষের সাথে শারীরিক সম্পর্কে স্বীকৃতি দেয় না। কিন্তু প্রেমের আবেগের স্রোতে ভেসে গিয়ে প্রেমিকযুগল সবকিছু ভুলে গিয়ে লিগু হন শারীরিক সম্পর্কে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে এটি কোনো ব্যাপার না হলেও বাঙালি সংস্কৃতিতে এটি একটি বিতর্কিত বিষয় ও জঘন্য অপরাধ হিসেবে গণ্য। অস্বীকার করার উপায় নেই আমাদের সমাজে লিভ টুগেদার করার প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সামাজিকভাবে স্বীকৃত না হলেও গোপনে গোপনে অনেক প্রেমিকযুগলই লিভ টুগেদার করে থাকে। একই ছাদের নিচে তারা স্বামী-স্ত্রীর মতো বসবাস করে বিয়ে না করেই। অনেকেই স্বামী-স্ত্রীর মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বাসা ভাড়া করে থাকে। যারা একা থাকে বা পরিবার থেকে দূরে থাকে, তাদের মধ্যেই এই প্রবণতা বেশি দেখা যায়।^{৯৬} এ বিষয়গুলো আবার কোনো কোনো রাষ্ট্রের আইনে অপরাধ বলেও মনে করা হয় না; আর যা অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত হয় তাও আবার অতি সামান্য। তবে বিবাহ বহির্ভূত শারীরিক সম্পর্কে বাঙালী সংস্কৃতিতে যেমন ঘণার চোখে দেখা হয় আবার এটি আইনের চোখে অপরাধ বলেও সাব্যস্ত।^{৯৭} আর বিবাহপূর্ব ও বহির্ভূত এ সব পরকীয়া ও শারীরিক সম্পর্কে মুকুলেই ভেঙ্গে যায় অনেক সংসার; ঝরে যায় অনেক সোনার ফুল।^{৯৮}

‘প্রবাসীর স্ত্রী উধাও’ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানা যায়, নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার পবনপুর গ্রামের মোঃ আব্দুর রহিম একজন প্রবাসী। দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকতে তার স্ত্রী শিরিন বেগমের ঢাকার রামপুরার বারেক নামের এক যুবকের সাথে পরকীয়া সম্পর্ক গড়ে উঠে। সুযোগ বুঝে শিরিন গত ২৮/৩/১১ তারিখে স্বামী রহিমের দেওয়া গচ্ছিত কয়েক লাখ টাকা ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে ঐ যুবক বারেকের সাথে পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে থানায় মামলা না করার জন্য শিরিন তার স্বামী রহিম ও শাশুড়িকে হুমকি প্রদান করে। রহিমের মা থানায় জিডি করলেও তখন পর্যন্ত কোনোব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।^{৯৯} এছাড়া “পরকীয়ার জের ধরে রূপগঞ্জে গৃহবধূর আত্মহত্যা স্বামী গ্রেফতার”^{১০০}, ‘লাশ তিন টুকরো করে বস্তায় ভরে নদীতে ফেলে দেই’^{১০১}, ‘পরকীয়া: রাজবাড়িতে গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ’^{১০২}, ‘পরকীয়া সফল করতে স্বামী খুন স্ত্রী গ্রেফতার’^{১০৩}, ‘সাভারে গৃহবধূকে গলা কেটে হত্যা’^{১০৪} ইত্যাদি খবর প্রতিনিয়ত আমরা জাতীয় দৈনিকে দেখতে পাই।

ইসলামে এটি জঘন্য অপরাধ বলে সাব্যস্ত এবং এর শাস্তিও খুব ভয়াবহ। অবিবাহিত নারী-পুরুষ যদি এমন কোনো ঘটনা কর্মে লিপ্ত হয় তাদেরকে একশত বেত্রাঘাত করার বিধান ইসলামে রয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী :

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنَّكُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَتَهُمَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ .

“ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী-তাদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহে এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু’মিনদের একটি দল যেন এদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।”^{১০৫}

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর আরো কঠোর ভাষ্য হলো :

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .

“ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীকে অথবা মুশরিক নারীকে ব্যতীত বিবাহ করে না এবং ব্যভিচারিণীকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ব্যতীত কেউ বিবাহ করে না, মু'মিনদের জন্য তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।”^{৩৯}

চ. পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা : যে পরিবারে পুরুষের মাধ্যমে বংশ পরিচয় নির্ধারণ করা হয় এবং পুরুষকেই পরিবারের কর্তা বলে স্বীকার করা হয় তাকে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বলা হয়। এক্ষেত্রে পরিবারের সকল দায়িত্ব পুরুষের হাতেই ন্যস্ত থাকে এবং পিতাই সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক, মালিক ও প্রশাসক হিসেবে কাজ করে থাকে। সন্তান-সন্ততি স্ত্রী ও ভাই-বোনেরা তার অধীনস্ত পরিবারের সদস্য। পিতার অবর্তমানে বড় ছেলের ওপর পরিবারের ভরণ-পোষণ ও নিরাপত্তার দায়িত্ব অর্পিত হয়। বর্তমান বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই এ ধরনের পরিবারের অস্তিত্ব বিদ্যমান। সামাজিক দিক থেকে বাঙালি সমাজ আগাগোড়াই পিতৃতান্ত্রিক। এ সমাজব্যবস্থাকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাও বলা হয়ে থাকে। এটি ইসলামি সমাজ ও পরিবারের বিধানও বটে। তবে ইসলামের এ বিধানের মানে নারীকে হয়ে করা নয়, বরং নারী-পুরুষ প্রত্যেকের যার যার অবস্থান অনুযায়ী সম্মান ও মর্যাদা নিশ্চিত করা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাসুলু আলামীন বলেন :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ .

“পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে।”^{৪০}

হাফেজ ইবনে কাসির অত্র আয়াতের তাফসীরে বলেন : “পুরুষ নারীর তত্ত্বাবধায়ক। অর্থাৎ সে তার অভিভাবক, তার ওপর কর্তৃত্বকারী ও তাকে সংশোধনকারী, যদি সে বিপদগামী বা লাইনচ্যুত হয়।”^{৪১}

মহান আল্লাহ বর্ণনা করেছেন নেককার নারীগণ অনুগত অর্থাৎ তারা তাদের স্বামীদের বৈধ আদেশের আনুগত্য করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ .

“নেককার স্ত্রীগণ অনুগত এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহ যা সংরক্ষিত করেছেন তা হিফাজতকারিণী।”^{৪২}

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইমাম আল-কুরতুবী রহ. বলেন :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ هَذَا خَبْرٌ ، وَمَقْصُودُ الْأَمْرِ بِطَاعَةِ الرَّؤُوسِ وَالْإِيَامِ بِحَقِّهِ فِي مَالِهِ وَفِي نَفْسِهَا فِي حَالِ غَيْبَةِ الرَّؤُوسِ .

“আল্লাহর বাণী-নেককার নারীগণ অনুগত, লোকচক্ষুর অন্তরালে হিফায়তকারিণী” এ এমন

এক খবর যা দ্বারা স্বামীর আনুগত্য ও স্বামীর অবর্তমানে তার সম্পদ ও নিজ সতীত্বের অধিকার সংরক্ষণ করার নির্দেশ প্রদানই উদ্দেশ্য।”^{৪০}

এ প্রসঙ্গে হাদিসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ النِّسَاءِ أَمْرًا إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ ، وَإِذَا أَمَرَتْهَا أَطَاعَتْكَ ، وَإِذَا غَبَتْ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ ، قَالَ : ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ . الْآيَةُ .

আবু হুরায়রা র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন : “সর্বোত্তম স্ত্রী সেই মহিলা যখন তুমি তার দিকে তাকাবে তোমাকে আনন্দ দিবে, যখন তাকে কোনো নির্দেশ দিবে সে তা পালন করবে এবং যখন তুমি তার থেকে অনুপস্থিত থাকবে সে তার জীবন (সতীত্ব) ও তোমার সম্পদ সংরক্ষণ করবে।” বর্ণনাকারী বলেন : অতঃপর রসূলুল্লাহ সা. তিলাওয়াত করলেন: الرجال قوامون على النساء “পুরুষগণ নারীগণের দায়িত্বশীল।”^{৪১}

ছ. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি: সমাজবদ্ধ মানুষ নানা ধর্ম সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সকল ধর্মের মূল কথা প্রেম, মৈত্রী, শান্তি ও সম্প্রীতি। তাই যে দুর্লভ গুণ মানুষের কণ্ঠে পরিয়েছে বিজয়ীর বরণমালা, দিয়েছে বক্ষ-বিস্মৃত সাহস, শুনিয়েছে অমরত্বের মন্ত্র তা হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। এই গুণই মানব-সভ্যতাকে মহিমাময় করেছে। সাম্প্রতিক বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া বিভিন্ন বিরোধী সংস্কৃতিকেও কাছাকাছি নিয়ে আসছে এবং ধর্মসমূহ ও আঞ্চলিক সম্প্রদায়গুলো ঐক্যের ডাক দিচ্ছে। বাঙালি সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সাথে সমাজে বসবাস করা। যা আবহমানকাল থেকে বাঙালির একটি ঐতিহ্য হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

ইসলাম বিশ্বভ্রাতৃত্ব বিশ্বাস করে। ইসলামের মতে, বিশ্বের সকল মানুষ পরস্পর ভাই-ভাই, একই আদি পিতা-মাতা আদম-হাওয়ার সন্তান। এতে দেশ, জাতি, ভাষা ও বর্ণের কোনো পার্থক্য নেই। ইসলাম ভিন্ন ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দিয়েছে। তাদের ধর্মগ্রন্থ, উপাসনালয়, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা যাবে না। তাদের ধর্ম পালনে বাধা দেয়া যাবে না। আর ইসলামও একই কথা বলছে। ইসলাম শান্তি-সম্প্রীতি ও মানবতার ধর্ম। কোনরূপ সহিংসতা, বিবাদ-বিসংবাদের স্থান ইসলামে নেই। ন্যূনতম শান্তি-শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বিনষ্ট হয় এমন আচরণকেও ইসলাম প্রশ্রয় দেয় না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন :

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ.

“ফিৎনা-ফাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ।”^{৪২}

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

“তারা আল্লাহ তায়ালায় বদলে যাদের ডাকে, তাদের তোমরা কখনও গালি দিও না, তাহলে তারাও শত্রুতার কারণে না জেনে আল্লাহ তায়ালাকে গালি দেবে। আমি প্রত্যেক জাতির কাছেই তাদের কার্যকলাপ সুশোভনীয় করে রেখেছি, অতঃপর সবাইকে একদিন তার রবের কাছে ফিরে যেতে হবে, তারপর তিনি তাদের বলে দেবেন, তারা দুনিয়ার জীবনে কে কী কাজ করে এসেছে।”^{৪৬}

হাদিসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : كُتِبُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا لَا تَعَادُوا وَلَا تَبَاغَضُوا سَدُّوا وَقَارِبُوا وَأَبْشَرُوا.

আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : তোমরা প্রত্যেক আল্লাহর বান্দাহ পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও এবং পরস্পর শত্রুতা পোষণ করো না, রাগারাগি করো না বরং একে অপরের কাছাকাছি হও ও সুসংবাদ দাও।^{৪৭}

আমরা ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে, অমুসলিমদের প্রতিও কোনো অন্যায় আচরণ ইসলাম অনুমোদন করে না। শান্তি-সৌহার্দ্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষায় ইসলামের রয়েছে শ্বাশত আদর্শ ও সুমহান ঐতিহ্য। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতিটি আচরণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিরল ও প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মদীনা সনদ, হুদায়াবিয়ার সন্ধি, মক্কাবিজয়ান্তর সাধারণ ক্ষমা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সা. কর্তৃক বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গকে ক্ষমা ইত্যাদি বিষয়গুলো এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাই বলা যায় যে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, শান্তি, সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান ও সদ্যবহার ইসলামের অনুপম শিক্ষা। আর এটি বাঙালি সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়।^{৪৮}

জ. একই ভাষার বিভিন্ন বৈচিত্র্য বা উপভাষা : সংস্কৃতির অন্যতম বাহন ভাষা। ভৌত এবং ভার্চুয়াল যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি বিশ্বজুড়ে ভাষা-সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটছে প্রতিনিয়ত। ভাষার কথা চিন্তা করলে বলতে হয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির ফলে প্রামাণ্য ভাষা আঞ্চলিক ভাষাগুলো দিয়ে এবং আঞ্চলিক ভাষাগুলো প্রামাণ্য ভাষা দিয়ে প্রভাবিত হচ্ছে। বাঙালি সংস্কৃতিতে উপভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন গ্রামে একই ভাষা অন্যগ্রামে একই ভাষা অন্যভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন : টাকা কে টিহা, ‘র’ শব্দকে ‘ল’। যেমন: পূর্ববঙ্গের একটি উপভাষায় বলা হয়, ‘আমি অহন ভাত খামু না’ যা আদর্শ বাংলায় বলা হয়, ‘আমি এখন ভাত খাব না।’ একইভাবে ভাষার ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের নিজস্ব টান আছে। শুধু টানই নয়, কিছু উচ্চারণ ভ্রংশও আছে। তবে এ কথা সত্য যে, একই ভাষার বিভিন্ন উপভাষা বা বৈচিত্র্য বাংলাভাষাকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। ভাষার বৈচিত্র্য স্রষ্টার বিস্ময়কর নিদর্শন ও বিশেষ নিয়ামত। কেবল ভাষাই নয়; একই ভাষাভাষীর মধ্যে পৃথক ধর্নি ও স্বর লক্ষ করা যায়। একইভাবে ভাষার ক্ষেত্রেও রয়েছে অনেক পার্থক্য। একই বাংলাভাষায় প্রধানত প্রায় ৫ ধরনের উপভাষা পরিলক্ষিত হয়।^{৪৯}

বস্তুত ভাষা, বর্ণ ইত্যাদির পার্থক্য আল্লাহ তায়ালায় সৃষ্টিকুশলতারই নিদর্শন। ভাষার বৈচিত্র্য মহান আল্লাহর বিস্ময়কর নিদর্শন ও বিশেষ নিয়ামত। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন :

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ السِّنِّكُمْ وَالْوُكُوفُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ.

“আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।”^{৫০}

আমরা যদি মহাগ্রন্থ আল-কুরআন গবেষণা করি তাহলে দেখতে পাবো যে, একই আরবী ভাষা বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়। আর তার প্রমাণ হলো রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদিস :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْرَأَيْتَ جِبْرِيلَ عَلَى حَرْفٍ فَرَجَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ

ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সা. বলেছেন, জিব্রীল আ. আমাকে একভাবে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর আমি তাঁকে অন্যভাবে পাঠ করার জন্য অনুরোধ করতে লাগলাম এবং বার বার অন্যভাবে পাঠ করার জন্য ক্রমাগত অনুরোধ করতে থাকলে তিনি আমার জন্য তিলাওয়াতের পদ্ধতি বাড়িয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে তিনি সাত আঞ্চলিক ভাষায় তিলাওয়াত করে সমাপ্ত করলেন।^{৫১}

এ প্রসঙ্গে হাদিসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ فَأَمَرَ عُثْمَانُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْخَارِثِ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يَنْسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ لَهُمْ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي عَرَبِيَّةٍ مِنْ عَرَبِيَّةِ الْقُرْآنِ فَارْتَبِعُوا قُرَيْشَ فَإِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا!

আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘উসমান রা. যায়দ ইবনু সাবিত রা., সা’ঈদ ইবনুল ‘আস রা., ‘আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়র রা. এবং ‘আবদুর রহমান ইবনু হারিস ইবনু হিশাম রা. কে পবিত্র কুরআন গ্রন্থাগারে লিপিবদ্ধ করার জন্য আদেশ দিলেন এবং তাদেরকে বললেন, আল কুরআনের কোনো শব্দের আরবী হওয়ার ব্যাপারে যায়দ ইবনু সাবিতের সঙ্গে তোমাদের মতভেদ দেখা দিলে তোমরা তা কুরাইশদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে। কারণ, কুরআন তাদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তাঁরা তা-ই করলেন।^{৫২}

উল্লিখিত হাদিসসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল কুরআনের এই ৭ হারফ আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সা. কর্তৃক অনুমোদিত। আর এগুলো ছিলো আরবী ভাষার একটি বৈচিত্র্য ও উপভাষা।^{৫৩}

ঝ. বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ : পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, ইসলামি পোশাক-পরিচ্ছদ বর্তমানে বাঙালি সংস্কৃতির ওপর বেশি প্রভাব ফেলেছে। পোশাকের পরিবর্তন অবশ্য মহিলাদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মহিলারা শাড়ী বর্জন করে সালওয়ার-কমিজ পরতে আরম্ভ করেছেন। আর বিশেষ অনুষ্ঠানে পুরুষরা পাঞ্জাবি-পায়জামা পরিধান করে থাকেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পাঞ্জাবি বাংলাদেশী পুরুষদের অন্যতম অনুষঙ্গ। পূর্ব-দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে সেলাই করা বস্ত্র পরিধানের রীতি আদিমকালে ছিলো না; সেলাইবিহীন একবস্ত্র পরাটাই ছিলো পুরারীতি। ধুতি ও শাড়িই ছিলো প্রাচীন বাঙালির সাধারণ পরিধেয়, তবে অভিজাত পরিবারের লোকদের ছিলো উত্তরবাসরূপে আর একখন্ড

সেলাইবিহীন বস্ত্রের ব্যবহার, যা ছিলো পুরুষদের ক্ষেত্রে উত্তরীয়, নারীদের ক্ষেত্রে ওড়না। ওড়নাই প্রয়োজনমতো অবগুণ্ঠনের কাজ করতো। মহিলারা জাকজমকপূর্ণ পোশাক পরিচ্ছদ পড়তেন। তারা কামিজ ও সালোয়ার বা স্কার্ট পরিধান করতেন। উল্লেখ্য যে, যে সকল পোশাক নারীরা পরলে সাধারণত তাদের সৌন্দর্য বাইরে প্রকাশ পায় না; সে সকল পোশাক ইসলামি পোশাক হিসেবে বিবেচিত। আর এটি মূলত মহান আল্লাহর নির্দেশ; এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর ঘোষণা:

وَلَا يُدِينُ زِينَتُهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ .

“(আর মু’মিন নারীদেরকে বল,) তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে।”^{৫৪}

মহান আল্লাহ আরো বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

“হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বল, ‘তারা যেন তাদের জিলবাবের কিছু অংশ নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে। ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’”^{৫৫}

এ৪. টাখনুর উপরে কাপড় পরিধান : বাঙালী জাতির একটি অতি প্রাচীনকালের সংস্কৃতি হলো তারা পায়ের গোড়ালী নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরতো না। এটি পুরুষদের ক্ষেত্রে একটি ইসলামের অতীত জরুরী বিধান। ইসলামে টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা এবং অহংকার করাকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং এর শাস্তি খুব কঠিন। এ প্রসঙ্গে হাদিসের এক বর্ণনায় এসেছে,

ثَلَاثَةٌ لَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الْمَنَانُ بِمَا أُعْطِيَ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتُهُ بِالْخَلْفِ الْكَاذِبِ.

“কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা’আলা তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সেই তিন ব্যক্তি হল :) পায়ের টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারী, দান করে খোঁটাদানকারী এবং মিথ্যা শপথ করে পন্য বিক্রয়কারী।”^{৫৬}

হাদিসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন :

إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَىٰ نَصْفِ السَّاقِ وَلَا حَرَجَ أَوْ لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا لَمْ يَنْظُرَ اللَّهُ إِلَيْهِ.

“মুমিন ব্যক্তির কাপড় নিসফে সাক তথা অর্ধ হাঁটু পর্যন্ত, এতে কোনো অসুবিধা নেই” (হাঁটু থেকে পায়ের তলার মধ্যভাগকে নিসফে সাক বলা হয়) অন্য বর্ণনায় রাসুলুল্লাহ সা. বলেন :

“পায়ের টাখনু এবং হাটুর মধ্যবর্তী স্থানে কাপড় পরিধান করাতে কোনো অসুবিধা নেই। যে টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করা হবে তা জাহান্নামে যাবে, এবং যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ কাপড় ঝুলিয়ে পরবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।”^{৫৭}

ট. গায়ে হলুদ : গায়ে হলুদ বাঙালি জাতির বহু প্রচলিত সংস্কৃতির একটি। এটি মূলতঃ বিয়ে সম্পর্কিত একটি আচার যা বর ও কনে উভয় পক্ষ দ্বারা পালিত হয়। বরপক্ষ বা কনেপক্ষের পক্ষ হতে অপরপক্ষের আয়োজিত অনুষ্ঠানে নানান উপহারসামগ্রী পাঠানো হয়ে থাকে এই অনুষ্ঠানে। বাঙালি জাতির এ সংস্কৃতির সাথে ইসলামি সংস্কৃতির মিল কিছুটা পরিলক্ষিত হয়। তবে বিয়ের সময় বর ও কনের গায়ে হলুদ মাখানো ইসলামি শরিয়াতে তখনই সম্পূর্ণ জায়েজ ও পছন্দনীয় হবে; যখন তা শরীয়াহ পন্থায় হয়। হাদিসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَنْزُرٌ صُفْرَةٌ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ سَفَتْ إِلَيْهَا فَقَالَ زَنَةُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

আনাস ইবন মালিক রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে আবদুর রহমান ইবন আউফ রা. উপস্থিত হইলেন। তাঁর (দেহে ও বস্ত্রে) হলুদ বর্ণের সুগন্ধি দ্রব্যের চিহ্ন ছিল। রাসূলুল্লাহ সা. তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আবদুর রহমান ইবন আউফ তাঁকে জানালেন তিনি বিবাহ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সা. জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তাকে কত মহর প্রদান করেছো? তিনি বললেন : এক (নাওয়া) খেজুরের বিচি পরিমাণ স্বর্ণ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা. বললেন : একটি বকরী দিয়ে হলেও (বিয়ের) অলীমা করো।^{৫৮}

যেহেতু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সেহেতু ‘গায়ে হলুদ’ বা ‘হলুদ বরণ’ জায়েজ। তবে এক্ষেত্রে খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যে, গায়ের মুহাররামগণ যেন বর ও কনেকে স্পর্শ করতে না পারে।^{৫৯}

উপসংহার

বাঙালি সংস্কৃতি আজ বাঙালির প্রাণ। সংস্কৃতি যেকোনো সমাজের জীবনধারার চলমান অনুকৃতি। মানবজাতির প্রথম বিকাশের সময় থেকেই সংস্কৃতি মানবসমাজ ও প্রাণীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীর নানামুখী সৃষ্টির মধ্যে মানুষই একমাত্র সংস্কৃতিমান প্রাণী। বাঙালিত্ব বিশেষ করে আধুনিক কালে বাঙালিদের সংস্কৃতি বিচিত্র রূপ লাভ করলেও, তার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়ে গেছে, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাঙালি সমাজে স্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হিসেবে এদেশের বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে ইসলামি সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত হয়েছে সেই আদিকাল থেকেই। আলোচ্য প্রবন্ধে এ বিষয়গুলোই তুলে ধরা হয়েছে; যা আমাদের বাস্তবজীবন গঠনে সোচ্চার ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

তথ্যসূত্র

১. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ১১০৩

২. Zillur Rahman Siddiqui, *Bangla Academy English-Bangla Dictionary* (Dhaka : Bangla Academy, 2012), P. 182.
৩. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, পৃ. ২৮৩
৪. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *একশ্রে ফেব্রুয়ারি সকল ভাষার কথা কয়*, (ঢাকা : সময় প্রকাশন, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ২৬
৫. বদরুদ্দীন উমর, *সংস্কৃতির সংকট* (ঢাকা : মুক্তধারা প্রকাশনী, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ২৭
৬. Zillur Rahman Siddiqui, *Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, P. 182
৭. পূর্বপুরুষদের যেমন এই কৌশলগুলো ছিল তা থেকে উত্তরপুরুষেরা এই কৌশলগুলো পেয়ে থাকে। অধিকন্তু সময় ও যুগের প্রেক্ষিতেও তারা কিছু কৌশল সৃষ্টি করে থাকে। তাই বলা যায় সংস্কৃতি একদিকে যেমন আরোপিত অর্থাৎ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তেমনি তা অর্জিতও বটে।
-এ কে এম শওকত আলী খান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস* (ঢাকা : গ্রন্থ কুটির, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৪৭
৮. Velkley, Richard, *The Tension in the Beautiful: On Culture and Civilization in Rousseau and German Philosophy* (Chicago : The University of Chicago Press, W.D), P. 11-30.
৯. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *রসুলুল্লাহ সা. এর দৃষ্টিতে সংস্কৃতির রূপরেখা* (প্রবন্ধ), *অগ্রপথিক* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.), আগস্ট, ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, পৃ. ১৭
১০. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ২৫০-২৫২
১১. বাংলাপিডিয়া, *বাঙালি সংস্কৃতি*
১২. আল-কুর'আন, ২০ : ১৩১
১৩. বুখারী, আবু আদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল ইবন ইবরাহীম ইবন মুগীরা, *আস-সহীহ* (বৈরুত : দারু ইবন কাছীর, ১৯৮৭ খ্রি.), হাদিস নং-৬০৫৩; আহমাদ, *আল-মুসনাদ* (কায়রো : মুআসসায়াতু কদাভা, তা.বি.), হাদিস নং-৪৭৬৪
১৪. তিরমিযী, আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা, *আস-সুনান* (বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাখিল আরাবী, তা.বি.), হাদিস নং-২৩৩৩
১৫. আল-কুর'আন, ২১ : ৯২-৯৩
অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন :
وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. فَتَقَطُّوا أُمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ.
- “নিশ্চিত জেনো, এই তোমাদের উম্মাহ, এক উম্মাহ (তাওহীদের উম্মাহ) এবং আমি তোমাদের রব। সুতরাং আমাকে ভয় কর। এরপর তারা নিজেদের দ্বীনের মাঝে বিভেদ করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেল। প্রত্যেক দল (নিজেদের খেলালখুশি মতো) যে পথ গ্রহণ করল তাতেই মত্ত রইল। সুতরাং (হে পয়গাম্বর!) তাদেরকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত মূর্খতায় ডুবিয়ে থাকতে দাও।”-আল-কুর'আন, ২৩ : ৫২-৫৩
১৬. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৯৭৬২
১৭. আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনুল আশআশ আস-সিজিস্তানী, *আস-সুনান* (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবী, তা.বি.), হাদিস নং-২০৮৫
১৮. তিরমিযী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১১০১।

১৯. আল বায়হাকী, সহীহ আল-জামি', প্রাণ্ডক্ত, হাদিস নং- ৭৫৫৭

২০. এমন অসংখ্য ঘটনা আমাদের সমাজে প্রতিনিয়ত ঘটে চলছে; তন্মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো :

কেসস্টাডি-১ : প্রেমে বাঁধা দেয়ায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে ময়না নামে (১৬) বছরের এক কিশোরী। নারায়নগঞ্জের বন্দর থানার কুমারপাড়া এলাকায়।- বন্দরে প্রেমে বাঁধা দেয়ায় কিশোরীর আত্মহত্যা, যুগান্তর, ০৪ জুলাই ২০১৮

কেসস্টাডি-২ : রাজশাহীর বাঘা উপজেলার সরেরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী পুথিরানী পদ্মার চরাঞ্চল এলাকার যুবক আব্দুর রাজ্জাকের সঙ্গে মোবাইলের মাধ্যমে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ ঘটনাটি জেনে যায় তার পরিবার। পরিবারের লোকজন তার মোবাইলটি কেড়ে নিলে সে অভিমানে বিষপান করে। পরে পরিবারের লোকজন পুথিকে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত সাড়ে ৮টায় তার মৃত্যু হয়।-প্রেমে বাঁধা দেয়ায় স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা, দৈনিক ইনকিলাব, ৩১ মে, ২০১৭

কেসস্টাডি-৩ : ফরিদপুরে পাট মিলে শ্রমিকদের আবাসন কোয়ার্টার থেকে এক কিশোরীর বুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃত ওই কিশোরীর নাম তামান্না আক্তার (১৪)। ওই কিশোরীর সাথে এক শ্রমিকের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ নিয়ে গত মঙ্গলবার কিশোরীর বাবা ও মা তাকে ভৎসনা করে কাজে চলে আসেন। রাত ৯টার দিকে ওই তরুণীর মা ঘরে ফিরে ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখতে পান। অনেক ডাকাডাকি করে ঘরের ভিতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে তিনি কৌশলে জানালা খুলে মেয়েকে ঘরের সিলিং ফ্যানের সাথে গলা ওড়না পোচানো বুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান।-প্রেমে বাঁধা দেয়ায় মা-বাবার সাথে অভিমান করে কিশোরীর আত্মহত্যা, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২৫ ডিসেম্বর ২০১৯

কেসস্টাডি-৪ : যশোরের মণিরামপুর উপজেলার হরিহরনগর ইউপির তেঁতুলিয়া গ্রামের সালামতপুর গ্রামে বোন কুলসুম বেগমের বাড়িতে বেড়াতে যান রুমা। এরপর বিকেলে গলায় ফাঁস দেন তিনি। রাজগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির এসআই শাহাবুর বলেন, দুই মাস আগে ঢাকায় কাজে যান রুমা এবং ছোট চাচি শাহানারা বেগমের বাসায় থাকতেন। সেখানে এক যুবকের সঙ্গে রুমার প্রেম হয়। বিষয়টি টের পেয়ে মঙ্গলবার দুপুরে রুমাকে নিয়ে কুলসুমের বাড়িতে আসেন শাহানারা। সেখানে তার সিমকার্ড ভেঙে ফেলেন কুলসুম ও শাহানারা। পরে অভিমানে আত্মহত্যা করেন তিনি।-প্রেমে বাধা, দুলাভাইয়ের বাড়িতে জীবন দিলেন নারী, ডেইলি-বাংলাদেশ, ৯ অক্টোবর ২০১৯

২১. বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৫ জুলাই ২০১১ খ্রি.

২২. বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৫ এপ্রিল ২০১২ খ্রি.

২৩. বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৩ আগস্ট ২০১১ খ্রি.

২৪. দৈনিক সমকাল পত্রিকা, ৪ জুন ২০১২ খ্রি.

২৫. আল-কুর'আন, ৫ : ৫

২৬. আল-কুর'আন, ৪ : ২৫

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা সূয়ুতী বলেন:

{ غير مسافحات } زانيات جھرا { ولا متخذات أخدان } أخلاء يزنون بهن سرا.

“مسافحات মানে প্রকাশ্যে ব্যভিচারকারিনী। আর متخذات أخدان অর্থ গোপনে যাদের সাথে ব্যভিচার করা হয়।”-মহল্লী, জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ও আস-সুয়ুতী, জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবন আবী বকর, তাফসীরে জালালাইন (কায়রো : দারুল হাদিস, তা.বি.), পৃ. ১৭৯

২৭. আল-কুর'আন, ২৪ : ৩০

২৮. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাপ্তভ, হাদিস নং-১০৯৩৩

২৯. গবেষণায় দেখা যায়, যে নারীর কোনো পুরুষের সাথে বিবাহপূর্ব শারীরিক সম্পর্ক থাকে তার দাম্পত্য জীবন কলহপূর্ণ ও খুবই নড়াবড়ে। তার সংসার ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। বিয়ের পূর্বে অবৈধ সম্পর্কে সতীত্ব হারানো নারীর সংসার ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি পক্ষান্তরে কুমারী নারীর সংসার সুখের ও টেকসই হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। কুমারী নারীর বিয়ে বিচ্ছেদের ঘটনা প্রায় শূন্যের কোটায়।

ব্রিটেনের সংবাদ মাধ্যমের বরাতে কুদরত উটকম জানায়, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও বিয়ে পরবর্তীকালে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদের কারণ নিয়ে গবেষণা করা এক জরিপে দেখা যায় ১৬ থেকে ৪৪ বছর বয়সী প্রত্যেক ব্রিটিশ নারী গড়ে ৭.৭ জন পুরুষের সাথে শারীরিক সম্পর্কে জড়িত আর আর প্রত্যেক ব্রিটিশ পুরুষ ১১.৭ জন নারীর সাথে শারীরিক সম্পর্কে জড়িত।

৩০. বাংলাদেশে প্রচলিত দণ্ডবিধির ৪৯৩ ধারা থেকে ৪৯৮ ধারা পর্যন্ত বিয়ে-সংক্রান্ত বিভিন্ন অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান করা হয়েছে:

৪৯৩ ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো নারীকে প্রতারণামূলক আইনসম্মত বিবাহিত বলে বিশ্বাস সৃষ্টি করায়, কিন্তু আদৌ ওই বিয়ে যদি আইনসম্মতভাবে না হয়ে থাকে এবং ওই নারীর সঙ্গে যৌন-সম্পর্ক স্থাপন করে, তাহলে অপরাধী ১০ বছর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

৪৯৪ ধারায় উল্লেখ আছে, যদি কোনো ব্যক্তি এক স্বামী বা এক স্ত্রী জীবিত থাকা সত্ত্বেও পুনরায় বিয়ে করে, তাহলে দায়ী ব্যক্তি সাত বছর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং অর্ধদণ্ডে দণ্ডিত হবে। তবে যে সাবেক স্বামী বা স্ত্রীর জীবদ্দশায় বিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, বিয়ের সময় পর্যন্ত সে স্বামী বা স্ত্রী যদি সাত বছর পর্যন্ত নিখোঁজ থাকেন এবং সেই ব্যক্তি বেঁচে আছেন বলে কোনো সংবাদ না পান, তাহলে এ ধারার আওতায় তিনি শাস্তিযোগ্য অপরাধী বলে গণ্য হবেন না।

৪৯৫ ধারা অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি দ্বিতীয় বা পরবর্তী বিয়ে করার সময় প্রথম বা পূর্ববর্তী বিয়ের তথ্য গোপন রাখে, তা যদি দ্বিতীয় বাংলাদেশের আইনে বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক ও শাস্তির বিধানবিবাহিত ব্যক্তি জানতে পারে, তাহলে অপরাধী ১০ বছর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং অর্ধদণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

৪৯৬ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি আইনসম্মত বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা ব্যতীত প্রতারণামূলকভাবে বিয়ে সম্পন্ন করে, তাহলে অপরাধী সাত বছর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্ধদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

৪৯৭ ধারায় ব্যভিচারের শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোনো নারীর সঙ্গে তার স্বামীর সম্মতি ব্যতীত যৌনসঙ্গম করে এবং অনুরূপ যৌনসঙ্গম যদি ধর্ষণের অপরাধ না হয়, তাহলে সে ব্যক্তি ব্যভিচারের দায়ে দায়ী হবে, যার শাস্তি সাত বছর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডসহ উভয় দণ্ড। এ ক্ষেত্রে নির্ধারিতভাবে অন্য লোকের স্ত্রী হতে হবে। তবে ব্যভিচারের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের কোনো শাস্তির বিধান আইনে নেই।

৪৯৮ ধারায় বলা হয়েছে, কোনো বিবাহিত নারীকে ফুসলিয়ে বা প্ররোচনার মাধ্যমে কোথাও নিয়ে যাওয়া এবং তাকে অপরাধজনক উদ্দেশ্যে আটক রাখা অপরাধ। এ ধারা অনুযায়ী অপরাধী ব্যক্তি দুই বছর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্ধদণ্ডসহ উভয় ধরনের শাস্তি পাবে।

ভারতীয় আইনে, ৪৯৭ ধারাতেই বলা আছে, “কোনও পুরুষ যদি জেনেশুনে কোনও বিবাহিত মহিলার সঙ্গে তাঁর স্বামীর সম্মতি না নিয়ে বা তাঁর অজান্তে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হন, এমন শারীরিক সম্পর্ক ধর্ষণ হিসেবে গণ্য করা না গেলেও তা ব্যভিচারের সমান অপরাধ হিসেবেই গণ্য হবে এবং শাস্তিস্বরূপ সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড অথবা জরিমানা কিংবা উভয়ই প্রযোজ্য হতে পারে। যদিও, এক্ষেত্রে এমন সম্পর্ক যুক্ত বিবাহিত মহিলাকে অপরাধে যুক্ত থাকার জন্য কোনও শাস্তি দেওয়া যাবে না।”

৩১. এ ধরনের অনেক ঘটনা প্রতিনিয়ত আমাদের সমাজে ঘটে চলছে। যেমন :

কেসস্টাডি-১ : গাজীপুরের কাপাসিয়ায় স্বামীর পরকিয়ায় বাধা দেয়ায় শারমীন আক্তার (২৫) নামে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে স্বামীর পরিবার হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। - **পরকিয়ায় বাধা দেয়ায় হত্যা, দৈনিক ইনকিলাব, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯**

কেসস্টাডি-২ : পরকিয়ায় মত্ত ছিলেন স্বামী মনজু নামের এক পুরুষ। ঘরে সুন্দরী স্ত্রী। আছে সন্তানও। এসব ফেলে পরনারীতে আসক্ত হয়ে পড়েছিল সে। আর সে দৃশ্য দেখে ফেলাই কাল হলো রোজিনার। হারপিক খাইয়ে হত্যা করা হলো তাকে। প্রায় দুই মাস মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে মারা গেলেন রোজিনা। এ ঘটনায় তোলপাড় চলছে সিলেটের দক্ষিণ সুরমায়। পারিবারিক সূত্র জানায়, রোজিনার বাবা আব্দুল খালিক হলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। ২০১৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর জালালপুর ইউনিয়নের শেখপাড়া গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল খালিকের মেয়ে রোজিনা বেগম ও পার্শ্ববর্তী কুচাই ইউনিয়নের শ্রীরামপুর গ্রামের মৃত মখলিছুর রহমানের ছেলে মো. ইমানুর রহমান মনজুর সঙ্গে বিয়ে হয়। বিয়ের পর রোজিনার সসারের একটি ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ভালোই চলছিলো তাদের সংসার। এর মধ্যে আরেক মহিলা এসে জুটে স্বামী মনজুরের কাছে। ওই মহিলার সঙ্গে পরকিয়া সম্পর্ক গড়ে উঠে মনজুরের।-**স্বামীর পরকিয়ার প্রতিবাদ করায় স্ত্রীকে হারপিক খাইয়ে হত্যা, সিলেটের দিনকাল, আগস্ট ২৯, ২০১৯**

কেসস্টাডি-৩ : পরকিয়া করে অন্য পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার সময় মাকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে মেয়ের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় মেয়ে তামান্না ও তারা বাবা বিজ্ঞান ওরফে রাসেলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানায়, মেরিনা বেগমের স্বামী রাসেল ব্যবসার প্রয়োজনে দূরে থাকতেন। সেই সুযোগে স্ত্রী মেরিনা পরকিয়ায় লিপ্ত হয়ে পড়েন। পরকিয়ায় আসক্ত হয়ে ওই পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালালে স্বামী ও মেয়ে এতে বাধা হয়ে দাঁড়ান। রবিবার রাতে মেরিনা বাসা থেকে বের হয়ে যেতে চাইলে মেয়ে তামান্না ওড়না দিয়ে মায়ের গলায় প্যাচ দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করেন। এতে শ্বাসরোধ হয়ে মারা যান মেরিনা। খবর পেয়ে পুলিশ সোমবার সকালে মেরিনার লাশ উদ্ধার করে। ঘটনার পরেই পুলিশ স্বামী রাসেল এবং মেয়ে তামান্নাকে গ্রেফতার করে। -**পরকিয়ার অভিযোগে মাকে হত্যা করলেন মেয়ে, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯**

কেসস্টাডি-৪ : পরকিয়া সন্দেহে পলাশে শাহানাজ আক্তার (২৪) নামে এক গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনা ওই গৃহবধূর স্বামী এরশাদুল ইসলামসহ দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ সোমবার দুপুরে পলাশ উপজেলার ডাঙ্গা ইউনিয়নের ইসলামপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। - **পলাশে পরকিয়ার জেরে গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যা, যুগান্তর, ০৮ জানুয়ারি ২০১৯**

৩২. বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২ জুন ২০১১ খ্রি.

৩৩. বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৯ জুন ২০১১ খ্রি.

৩৪. বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৬ জানুয়ারী ২০১২ খ্রি.

৩৫. বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২১ আগস্ট ২০১১ খ্রি.

৩৬. বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৫ আগস্ট ২০১৭ খ্রি.

৩৭. দৈনিক প্রথম আলো, ১০ জুন ২০২০ খ্রি.

৩৮. আল-কুর'আন, ২৪ : ২

৩৯. আল-কুর'আন, ২৪ : ৩

৪০. আল-কুর'আন, ৪ : ৩৪

৪১. ইবন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, প্রাণ্ডক্ত, ১খ., পৃ. ৭২১

৪২. আল-কুর'আন, ৪ : ৩৪

৪৩. কুরতুবী, আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, প্রাপ্ত, খ. ৫, পৃ. ১৭০
৪৪. তাবারী, জামিউল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন, প্রাপ্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৯০
৪৫. আল-কুর'আন, ২ : ২১৭
৪৬. আল-কুর'আন, ৬ : ১০৮
৪৭. আহমাদ, আল-মুসনাদ, প্রাপ্ত, হাদিস নং-৯৭৬২
৪৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ কেন্দ্র (সিআইআইডি) এবং বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে প্রতি বছর জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিবসকে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। -ভোরের কাগজ, শুক্রবার, ২৭ মে ২০১৬
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনপ্রিয় উক্তি 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' উদ্ধৃত করে দেশে সব ধর্মের মানুষ কীভাবে শান্তি ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করছে তা তুলে ধরেছেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। জাতিসংঘ সদর দফতরে 'বৈষম্য, বৈরিতা ও সহিংসতা বন্ধে ঘৃণাত্মক বক্তব্য মোকাবিলা ও উসকানি প্রতিরোধ : জাতিসংঘ ব্যবস্থাপনার মধ্যে সমন্বয়' শীর্ষক এক সাইড ইভেন্টে বক্তব্যে বাংলাদেশে বিদ্যমান আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির কথা তুলে ধরেন তিনি। -প্রতিদিনের সংবাদ, ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০
৪৯. বাংলা ভাষায় অঞ্চলভেদে ভিন্ন উচ্চারণ হয়ে থাকে। ভাষাবিদ সুকুমার সেন বাংলা উপভাষার শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বাংলা ভাষা উচ্চারণ ভিত্তিতে আলাদা। তাই, বাংলা উপভাষা পাঁচ প্রকার:
১. **রাঢ়ী উপভাষা** : পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বাঁকুড়া (পূর্ব), হুগলী, হাওড়া, কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় এই উপভাষার প্রচলন লক্ষ করা যায়। এই উপভাষাকে ভিত্তি করে প্রমিত বাংলা গঠন করা হয়েছে। এখানকার উপভাষার উদাহরণ হলো : 'ন' 'ল' রূপে এবং 'ল' 'ন' রূপে উচ্চারণ লক্ষ করা যায়। যেমন : নৌকা >লৌকা, নয় >লয় ;লুচি >মুচি, লেবু >নেবু ইত্যাদি।
 ২. **বঙ্গালী উপভাষা** : এটি অধুনা বাংলাদেশের প্রধান উপভাষা। ঢাকা বিভাগ, ময়মনসিংহ বিভাগ, খুলনা বিভাগ, বরিশাল বিভাগ, বৃহত্তর কুমিল্লা-নোয়াখালী এবং ত্রিপুরার বিষ্ণুপুর অঞ্চল জুড়ে আছে এই উপভাষা। ভাষাভাষী সংখ্যা বিবেচনায় এই উপভাষাই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত। এখানকার উপভাষার উদাহরণ হলো : এ >আ (কেন > ক্যান), উ >ও (মুলা > মোলা), ও >উ (দোষ >দুষ), র >ড় (ঘর >ঘড়) ধ্বনিত্যে পরিবর্তন ঘটে। গুল, গুলাইন দিয়ে বহুবচন পদ গঠিত হয়। যেমন- বাত গুলাইন খাও। গৌণকর্মে 'রে' বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যেমন : 'আমারে মারে ক্যান।'
 ৩. **বরেন্দ্রী উপভাষা** : উত্তরবঙ্গের মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের লোকমুখের ভাষা হল এটি। এ উপভাষার উদাহরণ : অপ্রত্যাশিত স্থানে 'র' আগম বা লোপ। আবার গৌণকর্মে 'কে', 'ক' বিভক্তি দেখা যায়। যেমন : 'হামাক দাও।'
 ৪. **ঝাড়খড়ী উপভাষা** : পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান জেলা ও ঝাড়খন্ডের বোকারণো, ধানবাদ, সড়াইকেলা, পূর্ব ও পশ্চিম সিংভূম জেলা এবং ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলায় এই উপভাষা প্রচলিত। এ উপভাষার উদাহরণ : প্রায় সর্বত্র 'ও'-কার লুপ্ত হয়ে 'অ'-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন : লোক >লক, মোটা >মটা, ভালো >ভাল, অঘোর >অঘর। আর ক্রিয়াপদে স্বার্থিক 'ক' প্রত্যয়ের প্রচুর প্রয়োগ। যেমন- যাবেক, খাবেক, করবেক।
 ৫. **রাজবংশী উপভাষা** : পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার; আসামের বঙাইগাঁও, কোকড়াঝাড়, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী জেলা ও বাংলাদেশের রংপুর বিভাগ এর সব জেলায় এটি প্রচলিত। বরেন্দ্রী ও বঙ্গালী উপভাষার মিশ্রণে এই ভাষা গড়ে উঠেছে। এ উপভাষায় 'র' এবং 'ড়' ও 'ন'

এবং 'ল'-এর বিপর্যয় লক্ষ করা যায়। যেমন : বাড়ী >বারি, জননী >জনলী। আবার শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাতের জন্য 'অ', 'আ' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন- অসুখ >আসুখ, কথা >কাথা।

-সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভাষা-প্রকাশ বাদলা ব্যাকরণ* (কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯); সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*, ২০০০ খ্রি.); SK Chatterji, *The Origin and Development of the Bengali Language* (Calcutta : Calcutta University, 1926), p. 324; CP Masica, *The Indo-Aryan Languages* (Cambridge : Cambridge University Press, 1991), p. 623.

৫০. আল-কুর'আন, ৩০ : ২২

৫১. বুখারী, *আস-সহীহ*, প্রাপ্ত, হাদিস নং-৪৭০৫

৫২. বুখারী, *আস-সহীহ*, প্রাপ্ত, হাদিস নং-৪৬৯৯

হাদিসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ غَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ بْنِ جَزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأُهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَقْرَأَ نَبِيَّهَا فَكَذَّبَتْ أَنْ أُغْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَمْهَلَتْهُ حَتَّى انْتَصَرَفَتْ ثُمَّ لَبَّيْتُهِ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتُ نَبِيَّهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِمَ سَلِمَهُ أَقْرَأَ «. فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هَكَذَا أَنْزَلْتُ «. ثُمَّ قَالَ لِي لِقْرَأَ «. فَقَرَأْتُ فَقَالَ هَكَذَا أَنْزَلْتُ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْزَابٍ فَأَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ «.

উমর বিন খাতাব বলেন: আমি হিশাম বিন হাকিম বিন হিয়ামকে সূরা আল-ফুরকান আমি যেভাবে পড়তাম, যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে শিখিয়েছিলেন, তা অপেক্ষা ভিন্ন এক পদ্ধতিতে পড়তে শুনলাম। আমি তার সাথে তর্ক করতে উদ্যত হলাম, কিন্তু তিনি তা শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। অতঃপর আমি তার চাদর ধরে তাকে রাসূলুল্লাহ (সা.)এঁর কাছে নিয়ে গেলাম এবং বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এই ব্যক্তিকে এমন পদ্ধতিতে সূরা আল-ফুরকান পড়তে শুনেছি যা আপনি আমাকে যেভাবে শিখিয়েছেন তা অপেক্ষা ভিন্ন। এই প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে ছেড়ে দিতে বললেন এবং তাকে তিলাওয়াত করতে বললেন। তিনি তখন সেই পদ্ধতিতে পড়লেন যেই পদ্ধতিতে আমি তাকে পড়তে শুনেছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন বললেন: এভাবেই এটা নাযিল হয়েছে। তিনি তখন আমাকে তিলাওয়াত করতে বললেন এবং আমি তিলাওয়াত করলাম। তিনি বললেন: এভাবেই এটা নাযিল হয়েছে। কুরআন সাতটি হরফে নাযিল হয়েছে। কাজেই সেগুলোর ভেতর হতে যেটা সহজ মনে হয় সেভাবেই তিলাওয়াত করো। -মুসলিম, *আস-সহীহ*, প্রাপ্ত, হাদিস নং-১৯৩৬

৫৩. উলামারা অনেক আগে থেকেই এই সাত হরফ দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা নির্ণয় করতে গিয়ে মতভেদ করেছেন।

তবে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মত সম্পর্কে শায়খ সালিহ আল মুনায্জিদ বলেন,

أحسن الأقوال مما قيل في معناها أنها سبعة أوجه من القراءة تختلف باللفظ وقد تتفق بالمعنى وإن اختلفت بالمعنى: فاختلافها من باب التنوع والتغاير لا من باب التضاد والتعارض

এই বিষয়ে উলামাদের থেকে বর্ণিত সর্বাধিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো যে এই সাবআতুল আহরুফ কিরাতের সাতটি বিশেষ পদ্ধতি যা শব্দের দিক থেকে আলাদা হলেও অর্থের দিক থেকে এক। আর যদি ও অর্থের দিক থেকে একে অপরের থেকে ভিন্নও হয়, তবে তা বৈচিত্র্যের দিক থেকে সামগ্রিকভাবে একে অপরের বিরোধী নয়” -<https://islamqa.info/ar/5142>.

৫৪. আল-কুর'আন, ২৪ : ৩১

৫৫. আল-কুর'আন, ৩৩ : ৫৯

৫৬. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাপ্ত, হাদিস নং-২২০৯৮

হাদিসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করবে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না” এ বিধান ঐ ব্যক্তির জন্য যে অহংকার বশতঃ কাপড় ঝুলিয়ে পরে।” -বুখারী, আস-সহীহ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৩৪৬৫

৫৭. আহমাদ, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১২২৪৮

৫৮. মালিক ইবন আনাস, আল-মুআত্তা (মুআস্সাসাতু বায়িদ ইবন সুলতান, ২০০৪ খ্রি.), হাদিস নং-২০০৬

৫৯. এ সম্পর্কে আলিমগণের মন্তব্য হলো : গায়ে হলুদ শুধু আমাদের বাঙালি কালচারের একটি অন্যতম বিষয়। এটি যদি ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে ভুল হবে। এটি হচ্ছে এলাকার প্রচলন (ইসলামী আইনের একটি মূলনীতি যাকে উরফ বলে)। সৌন্দর্যের জন্য এটি করা যেতে পারে। তবে বর্তমানে যে ছেলেরা মেয়েদের আবার মেয়েরা ছেলেরদের আনুষ্ঠানিকভাবে গায়ে হলুদ দেয় তা শরীয়াত গর্হিত ও গুনাহের কাজ। তাই মুহরিমদের দ্বারা তা সম্পন্ন হলে গুনাহের মধ্যে পড়বে না।

www.youtube.com/watch?time_continue=186&v=S3iaOh9eXhM&feature=emb_logo;
www.youtube.com/watch?v=xptpOP8wGKs;
www.youtube.com/watch?v=K99ER45jJLM. Accessed on 11 July 2023

জমা প্রদানের তারিখ : ২৪.০৮.২০২৩

গৃহীত হবার তারিখ : ১৮.১০.২০২৩

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা: পরিপ্রেক্ষিত ইসলামি নির্দেশনা

মুহাম্মদ ছালেহ উদ্দিন*

Abstract

Climate change and natural disasters are the biggest obstacles to the development of the current world. In this era of industrialization, nature is suffering from pollution in various ways and the climate is changing, as a result of which various kinds of natural disasters are hitting. Islam has given guidance on protecting the environment and dealing with the effects of climate change. The Sustainable Development Goals have set 3 specific targets and 2 target implementation methods to deal with the effects of climate change. As a United Nations country, Bangladesh is determined to implement these goals. Bangladesh has made positive progress in various areas in implementing these goals. Qualitative method was used in the present study. As part of the qualitative research, document analysis was carried out. Descriptive method and analytical method were followed in the comparative review of Islamic guidelines on sustainable climate change impact management goals. Considering the country's majority Muslim population, these goals will play a positive role in implementing the goals presented in the light of Islamic guidance.

চাবিশব্দ: জলবায়ু, দুর্যোগ, সহনশীলতা, অভিযোজন, প্রশমন

ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার উন্নয়নের সবচেয়ে বড় বাঁধা। শিল্পায়নের এ যুগে প্রকৃতি নানাভাবে দূষণের শিকার হয়ে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে, যার ফলশ্রুতিতে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানছে। সাধারণভাবে জলবায়ু পরিবর্তন বলতে জলবায়ুর উপাদানসমূহের পরিবর্তনকে বুঝায়, যা একটি দীর্ঘ সময় পর পরিলক্ষিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়। মহান আল্লাহ মানুষের বসবাসের উপযোগী করে এ পৃথিবী, এর পরিবেশ ও জলবায়ু সৃষ্টি করেছেন। জলবায়ু মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি এক অসীম রহমত। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী, **هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ**। “তিনিই তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া জীবনোপকরণ হতে আহাৰ্য গ্রহণ কর।” (আল কুরআন, ৬৭ : ১৫) মনুষ্যসৃষ্ট দূষণের কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সৃষ্টি হয়। ইসলাম পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় নির্দেশনা দিয়েছে। জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট ৩টি লক্ষ্যমাত্রা ও ২টি লক্ষ্য বাস্তবায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে। জাতিসংঘভুক্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশও এ লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নের বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশ এ

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি সাধন করেছে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী বিবেচনায় এ লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ইসলামি নির্দেশনার আলোকে উপস্থাপন লক্ষ্য বাস্তবায়নের ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

২. গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

গুণগত পদ্ধতি (Quantitative Method) ব্যবহার করে বর্তমান গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। গুণগত গবেষণার অংশ হিসেবে ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ (document analysis) করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে ইসলামি নির্দেশনার তুলনামূলক পর্যালোচনায় বর্ণনামূলক পদ্ধতি (Descriptive Method) ও ব্যাখ্যামূলক গবেষণা (Explanatory Research) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা শীর্ষক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ইসলামি দৃষ্টিকোণে পর্যালোচনা করে জনসচেতনতা তৈরি ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর করণীয় নির্ধারণ এ গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত।

৩. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা : ইসলামি নির্দেশনা

টেকসই উন্নয়নের সাথে পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রতিরোধ সম্পর্কিত, যা জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির *গভর্নিং কাউন্সিল* প্রদত্ত টেকসই উন্নয়নের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা থেকে সহজেই অনুমেয়। Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs.^১ “টেকসই উন্নয়ন হলো এমন উন্নয়ন যা ভবিষ্যত প্রজন্মের নিজস্ব চাহিদা মেটাতে সক্ষমতার সাথে আপস না করে বর্তমানের চাহিদা পূরণ করে।” জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব বিভিন্নভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা মেটানোর পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে প্রতীয়মান। তাই টেকসই উন্নয়নের ১৭টি প্রধানতম লক্ষ্যমাত্রার ১৩শ লক্ষ্যমাত্রা হলো- “জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ”। নিম্নে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৩শ লক্ষ্যমাত্রা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় কর্মব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত ৩টি বিশেষ লক্ষ্য ও ২টি লক্ষ্য বাস্তবায়ন পদ্ধতি ইসলামি নির্দেশনার আলোকে পর্যালোচনা করা হলো।

৪. বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-১ (অভিঘাতসহনশীলতা ও অভিযোজন-সক্ষমতা বৃদ্ধি)

“সকল দেশে জলবায়ু সম্পৃক্ত ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় অভিঘাতসহনশীলতা ও অভিযোজন-সক্ষমতা বৃদ্ধি করা”^২ এ লক্ষ্যমাত্রায় জলবায়ু সম্পৃক্ত ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার সক্ষমতা বৃদ্ধি তথা অভিঘাতসহনশীলতা ও অভিযোজন-সক্ষমতা বৃদ্ধির নির্দেশনা রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তাই টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। ইসলামি দৃষ্টিকোণে এ লক্ষ্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪.১ দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়ন : জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্ভাব্য দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায় মজবুত শক্ত বাসস্থান নির্মাণ, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, বেড়িবাঁধ নির্মাণ, নদী খনন, বনায়ন, কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় লোক স্থানান্তর ইত্যাদি করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালে সর্বপ্রথম গুচ্ছগ্রাম (Climate Victims Rehabilitation) প্রকল্প গ্রহণ করে। এ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (Climate Victims Rehabilitation) প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০২৩) বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৯১৭.৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে পরিচালিত হয়েছে। এ প্রকল্পের সর্বশেষ জরিপ অনুসারে এখন পর্যন্ত (জুন ২০২২) ১২৬২টি গুচ্ছগ্রামে ৪৩,৮৯৫টি ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গা পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। প্রতিটি পরিবারকে পরিবেশ বান্ধব উন্নত চুলা প্রদান; ফলজ, বনজ ও কাঠ উৎপাদনোপযোগী গাছের চারা প্রদান; আয় বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের প্রশিক্ষণ প্রদান; পুকুর খনন করে দেয়া ইত্যাদি কর্মকৌশল বাস্তবায়ন করা হয়েছে।^{১৩}

দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় দুর্যোগ প্রতিরোধে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ একটি কার্যকর প্রতিরোধ কৌশল। বাংলাদেশের ১৯টি উপকূলীয় জেলার উপকূলজুড়ে মোট কতগুলো ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র আছে, তার সঠিক হিসাব পাওয়া না গেলেও ধারণা করা হয় এ সংখ্যা প্রায় ৪ হাজার ৩০০।^{১৪} ইতোমধ্যে সরকার Cyclone Shelter Database এর মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলে নির্মিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।^{১৫} সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে সমগ্র উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর নিরাপদ আশ্রয়স্থল নিশ্চিতকরার লক্ষ্যে সর্বমোট ৭০০০ আশ্রয়কেন্দ্রের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।^{১৬} দুর্যোগকালীন সময়ে মানুষ ও গবাদি পশুর আশ্রয় প্রদান ও মানুষের মূল্যবান সম্পদ সুরক্ষার জন্য মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের হাত থেকে মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর অংশ হিসাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু মাটির কিল্লা নির্মাণ করা হয়, যা মুজিব কিল্লা নামে পরিচিত।^{১৭}

২০১৮ সালে সরকার দেশের বিদ্যমান ১৭২টি মুজিব কিল্লা সংস্কার উন্নয়ন এবং নতুন ৩৭৮টি মুজিব কিল্লা নির্মাণের লক্ষ্যে ‘মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করে, যাতে মোট কিল্লা হবে ৫৫০টি। ‘মুজিব কিল্লা’ বানানোর কাজটি বাস্তবায়ন করছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর। অধিদপ্তরের ২০২২ সালের ডিসেম্বরের তথ্যমতে, কাজ শুরুর পর গত সাড়ে চার বছরে মাত্র ৬৪টি কিল্লার নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। ৯৫টির কাজ চলমান, প্রকল্পের বাস্তবায়ন দীরগতি ও বিভিন্ন কারণে প্রায় সাড়ে চার বছর পর ১০০টি কিল্লার নির্মাণ বাতিল করেছে পরিকল্পনা কমিশন এবং ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ৪৫০টি কিল্লা নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করার জন্য সময় নির্ধারণ করেছে।^{১৮} এছাড়াও সরকার বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ৪ হাজার ৩২৩ কোটি ৪৭ লাখ টাকা ব্যয়ে ‘Resilient Infrastructure for Adaptation and Vulnerability Reduction Project (River)’ প্রকল্প (জুলাই-২০২৩ থেকে জুন ২০২৮) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৫০০টি বহুমুখী বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, সংযোগ সড়ক এবং জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে।^{১৯}

ইসলামও আমাদেরকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় এ ধরনের অবকাঠামো উন্নয়নের নির্দেশনা দেয়। এছাড়া বিভিন্ন দুর্যোগে আগত শরণার্থীদেরকে অনুকূল অবস্থানে বসবাসের সুযোগ দেয়ার নির্দেশনা দিয়েছে। ওমর রা.-এর শাসনামলে দুর্ভিক্ষের বছর যখন চারদিক থেকে আরবরা মদীনায়ে এসে জড়ো হতে লাগল। ওমর রা. তখন তাদের থাকার সুবিধার্থে আশ্রয়ক্যাম্প তৈরি করেন।^{১০} প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন বিশেষত, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছাসের ক্ষেত্রে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত খাল-বিল খনন করা প্রয়োজন। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার প্রয়োজনে খাল-বিল ও নদ-নদী খনন করতে হবে। আর এ সকল ব্যয় ইসলামি রাষ্ট্রের বায়তুল মাল তথা সরকারী কোষাগার বহন করবে। বায়তুল মাল সম্পূর্ণ বহন করতে না পারলে সরকার এ ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য বিভবানদের বাধ্য করবে।^{১১} ওমর রা. সমগ্র বিজিত এলাকায় নদী-নালা প্রবাহিত করেন- বাঁধ তৈরি করেন, পুকুর খনন করান, পানি সরবরাহের জন্য জলাধার সৃষ্টি করান, নদী-নালায় শাখা-প্রশাখা বের করেন এবং এ জাতীয় কাজ সম্পাদনের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগের পত্তন করেন।^{১২}

৪.২ প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপযোগী কৃষি পণ্য আবিষ্কার: প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের ক্ষয়-ক্ষতির পাশাপাশি ফসলেরও ক্ষতি হয়। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে এমন শস্য জাত আবিষ্কার করা উচিত, যা দুর্যোগ উপেক্ষা করে টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। যেমন- বর্ষা মৌসুমের উপযোগী ধান, একই সাথে শুষ্ক মৌসুমে কম পানি ব্যবহারে উৎপন্ন ধানের জাত আবিষ্কার, বর্ষায় ভাসমান সবজি চাষ ইত্যাদি। দেশের বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে বিভিন্ন ফসলের লবণাক্ততা সহিষ্ণু, বিভিন্ন ফলের জলমগ্নতা সহিষ্ণু এবং বিভিন্ন ফসলের ক্ষরা সহিষ্ণু জাত আবিষ্কার করেছে। বিশেষত, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিনা) ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। সবশেষ ২০১২ সালে দেশে প্রথমবারের মতো লবণাক্ততা ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু ধানের পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্স উন্মোচন করেছে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিনা) ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। বিনা ও বাকুবির যৌথ এ গবেষণায় বিভিন্ন মাত্রার গামা রেডিয়েশন প্রয়োগ করে প্রায় অর্ধ লাখের বেশি মিউট্যান্ট সৃষ্টি করে তা থেকে নানামুখী পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে M 6 জেনারেশনে তিনটি উন্নত মিউট্যান্ট শনাক্ত করা হয়েছে, যা ৪ dS/m মাত্রার লবণাক্ততা ও ১৫ দিন জলমগ্নতা সহিষ্ণু।^{১৩} সর্বোপরি বিনা এ যাবৎ ১৮টি ফসলের ১১৭টি উচ্চফলনশীল ও প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাতসহ অর্ধশতাধিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। তন্মধ্যে বিনা উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল বন্যাসহিষ্ণু বিনাধান-১১ ও বিনাধান-১২; লবণাক্ততাসহিষ্ণু ধানের জাত বিনাধান-৮, দ্বৈত লবণাক্ততা ও বন্যাসহিষ্ণু বিনাধান-২৩; লবণাক্ততাসহিষ্ণু চীনাবাদামের জাত বিনা চীনাবাদাম-৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০; লবণাক্ততাসহিষ্ণু সয়াবিনের জাত বিনাসয়াবিন-২, ৩, ৫ ও বিনাতিল-২; খরাসহিষ্ণু ধানের জাত বিনাধান-৭, ১৯, ২১; খরাসহিষ্ণু মুগ এবং মসুরের জাত বিনামুগ-৮ ও বিনামসুর-৯; পানি ও সার সাশ্রয়ী বিনাধান-১৭; জিংকসমৃদ্ধ বিনাধান-২০, সাময়িক জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু বিনাসরিষা-৯ এবং পরিবেশবান্ধব জীবাণুসার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।^{১৪}

ইসলাম গবেষণার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে উপায় নির্ধারণের নির্দেশনা দেয়। কুরআনের বাণী,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ -

“নিশ্চয় আল্লাহ কোনো কণ্ঠের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।”^{১৫}

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাজী সানাউল্লাহ পানিপথি (রহ.) বলেন, “কোনো জাতিই সুদিনের মুখ দেখতে পায় না, যতক্ষণ না তারা সুদিন ফিরে পাওয়ার জন্য দুর্দিনে চেষ্টা সাধন না করে। আর কোনো জাতির প্রতি যদি আল্লাহ অশুভ কিছু আপতিত করতে চান, তবে তা প্রতিরোধ করার সাধ্যও কারো নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবকও নেই। হওয়া সম্ভবও নয়।”^{১৬} বান্দার চেষ্টার মাধ্যমে মহান আল্লাহই বান্দার সমস্যা সমাধানের পথ তৈরি করেন। সুতরাং মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে, তবে সফলতা লাভ করা যাবে। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا -

“যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পথ করে দিবেন।”^{১৭}

৪.৩ দুর্যোগকালীন খাদ্য নিরাপত্তা : প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে দুর্যোগকালীন জনসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা বিধান করতে হবে। ২০৩০ সালের পর বাংলাদেশের নদীর প্রবাহ নাটকীয়ভাবে কমে যাবে। ফলে এশিয়ায় পানির স্বল্পতা দেখা দেবে এবং ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ১০০ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। উচ্চ তাপমাত্রার প্রভাবে ঘন ঘন বন্যা, ঝড়, অনাবৃষ্টি এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশ তার ভূমির ১৭ শতাংশ এবং খাদ্য উৎপাদনের ৩০ শতাংশ হারাবে।^{১৮} যা ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে অনুভূত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। এ সমস্যা মোকাবিলায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনে সামাজিক নিরাপত্তা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দরিদ্র বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে ‘গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর- খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ) কর্মসূচি’ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাজেটে ৭৩৩.৩৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত “অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম বৃহৎ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি। কর্মসূচিটি বছরের কর্মহীন মৌসুমে স্বল্পমেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দরিদ্রতা নিরসন ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত/সংস্কারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এই কর্মসূচির আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাজেটে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ২,১৮৬.৫৪ কোটি টাকা। এছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ‘ভিজিএফ’ কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। সাধারণত দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দরিদ্র মানুষের জীবিকা পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে এ প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তা হিসেবে প্রতি পরিবারকে মাসিক ২০-৪০ কেজি খাদ্য সহায়তা ২ থেকে ৫ মাস পর্যন্ত দেয়া হয়।^{১৯}

ইসলামি দৃষ্টিকোণে দুর্ভিক্ষের ক্ষেত্রে সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য ইসলামি রাষ্ট্রের যিনি কর্ণদার হবেন তাঁর। কেননা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এলাকার জনসাধারণের সকল দুঃখ-কষ্ট নিবারণের সম্ভাব্য সব রকমের প্রচেষ্টা চালানো তার জন্য ফরজ। ওমর রা. দুর্ভিক্ষের সময় দুর্ভিক্ষপীড়িত মদীনার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে সমস্ত গর্ভনর ও প্রশাসকদের নিকট পত্র পাঠান। বিভিন্ন

গভর্নরদের পাঠানো খাদ্য প্রবীণতম সাহাবীদের নিয়ে স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করে তালিকা করে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদের নামে রাষ্ট্রীয় সিল দিয়ে পাঠানো হয়। এছাড়াও দুর্যোগকালীন খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে গুদাম নির্মাণ করেন।^{২০} ইসলাম আমাদেরকে দুর্যোগকালীন মুহূর্তে দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে একে অন্যের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে নির্দেশনা দেয়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

“যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের পার্থিব কষ্টসমূহের মধ্যে একটা কষ্ট দূর করে দেয়, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার একটা কষ্ট দূর করে দেবেন।”^{২১}

৪.৪ বাস্তুচ্যুতি প্রতিরোধ : ভৌগোলিক দিক থেকে পৃথিবীর নিম্নভূমির ব-দ্বীপ অঞ্চল হওয়ায় বাংলাদেশ একটি অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ।^{২২} খরা, বন্যা, নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের বাস্তুচ্যুতি সমস্যার কারণ হিসেবে প্রতিয়মান। সমগ্র বিশ্বের বন্যা পর্যালোচনায় বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়। একইসাথে ঘূর্ণিঝড় ক্ষতি বিবেচনায় এদেশ ৬ষ্ঠ স্থানে রয়েছে।^{২৩} বঙ্গোপসাগর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের প্রজ্বলন স্থল হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশে অধিকাংশ ঘূর্ণিঝড় হয় বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের কারণে। সমুদ্রে সৃষ্ট নিম্নচাপ ও ঝড়ের ফলে সমুদ্রের লোনা জল বিশাল উচ্চতা নিয়ে ও তীব্রবেগে উপকূলের স্থলভাগকে প্লাবিত করে। এই ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে এপ্রিল ও মে মাসের মৌসুমি বায়ুর পূর্বে এবং অক্টোবর ও নভেম্বরের অর্থাৎ মৌসুমি বায়ুর পরে আঘাত হানে।^{২৪} বিশ্বব্যাংকের Economics of Adaptation to Climate Change প্রতিবেদনে উল্লিখিত হয়েছে, প্রতি ৩ থেকে ৫ বছরে বাংলাদেশের দুই তৃতীয়াংশ অঞ্চল বন্যা কবলিত হয়। একইসাথে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে গড়ে প্রতি তিন বছরে একবার বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে।^{২৫} বাংলাদেশ একটি নদীবিধৌত দেশ, এদেশের বৃকের উপর দিয়ে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, সুরমা ও কর্ণফুলীসহ ৩১০টি ছোট-বড় নদী বয়ে গেছে।^{২৬} সমগ্র বিশ্বের বন্যা পর্যালোচনায় বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়।^{২৭} বাংলাদেশের ৬৮% ভূমি বন্যাপ্লাবিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। প্রতি ৪-৫ বছরে এখানে বড় ধরনের বন্যা দেখা দেয়, যাতে দেশের ৬০% ভূমি প্লাবিত হয় এবং জীবন, সম্পদ ও অবকাঠামো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।^{২৮}

প্রতিবছর বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে নদীভাঙন দেখা দেয়। বাংলাদেশের নদীগুলোর গতিপথ আঁকাবাঁকা। নদীর বাকগুলো ঘনঘন। ফলে পানির প্রবল তোড় সোজা পথে প্রবাহিত হতে না পেরে নদীর পাড়ে এসে আঘাত হানে। ফলে নদীর পাড় ভেঙে বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১ মিলিয়ন লোকের ১০০০০ হেক্টর জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।^{২৯} ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার পাশাপাশি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিও বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের একটি অন্যতম কারণ। জাতিসংঘ তার সতর্কীকরণে বলেছে পরবর্তী ৫০ বছরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৩ ফুট বাড়লে তাতে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী একটি অংশ প্লাবিত হবে এবং প্রায় ১৭ শতাংশ ভূমি পানির নিচে চলে যাবে। আনুমানিক ৩ কোটি মানুষ তাদের ঘরবাড়ি, ফসলি জমি হারিয়ে জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে। জার্মানওয়াচ এর গবেষণা প্রতিবেদন Global Climate Risk Index 2020 অনুযায়ী ১৯৯৯-২০১৮ এ বিশ বছরের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার

দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম।^{১০} নানাদরনের দুর্যোগের ফলশ্রুতিতে এদেশে বাস্তুচ্যুতি একটি ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে প্রতিয়মান। আদমশুমারির (২০১৩) ভিত্তিতে চালানো রামরু (RMMRU Refugee And Migratory Movements Research Unit) ও এসসিএমআর (SCMR-Sussex Centre for Migration Research)-এর ২০১৩ সালের যৌথ গবেষণার প্রাভাস অনুযায়ী, ২০১১ থেকে ২০৫০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ১৬ থেকে ২৬ মিলিয়নের বেশি মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের কারণে নিজ বসতিভিটা ছেড়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হবে।^{১১}

বাস্তুচ্যুতি সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ ‘অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র’ গ্রহণ করেছে। এ কর্মকৌশলের লক্ষ্য অর্জনে তিনটি বাস্তুবায়ন ধাপ/স্তর [বাস্তুচ্যুতি প্রতিরোধ, সুরক্ষা এবং স্থায়ী সমাধান] এর অধীনে সর্বমোট ৯৯টি কর্মসূচি বাস্তুবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিরোধ এবং প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমসমূহকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে; ১. ঝুঁকি নিরূপণ মূল্যায়ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত কার্যক্রম, ২. জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত সুশাসন বিষয়সমূহকে শক্তিশালীকরণ, ৩. দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমন (ডিডিআর) এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন (সিসিএ) তে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ বা অর্থ বরাদ্দ করা, ৪. আরবান গ্রোথ সেন্টার সম্প্রসারণ এবং বিকেন্দ্রীকরণে উৎসাহীকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং ৫. অধিক সঙ্কটাপন্ন এলাকাগুলো চিহ্নিত করে জলবায়ু-দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পন্ন জমিগুলো পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা। বাস্তুচ্যুতিকালীন সুরক্ষা কৌশলসমূহকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে; ১. মানবিক এবং দুর্যোগ ত্রাণ সহযোগিতা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং ২. বাস্তুচ্যুতদের মৌলিক/মানবিক অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করা। বাস্তুচ্যুতি সমস্যার স্থায়ী সমাধানে আটটি বিষয় চিহ্নিত করেছেন। সেগুলো হলো- অ) সুরক্ষা ও নিরাপত্তা; আ) জীবনযাত্রার নির্দিষ্ট মান; ই) জীবিকার সুযোগ; ঈ) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত আবাসন, ভূমি ও সম্পত্তি পুনরুদ্ধার; উ) প্রয়োজনীয় নথিপত্র পুনঃপ্রাপ্তির সুযোগ; উ) পরিবারের সদস্যদের পুনরেকত্রিত হওয়ার সুযোগ; ঋ) সরকারি সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণের সুযোগ; এ) কার্যকর প্রতিকার ও ন্যায় বিচার পাওয়ার সুযোগ। এছাড়াও ১২ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও অর্থায়ন কৌশল এবং ৫টি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে।^{১২}

ইসলাম বাস্তুচ্যুতি সমস্যা সমাধানে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর জীবনমানোন্নয়নে ইসলামি সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের প্রধান কৌশল যাকাত ব্যবস্থার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ ...

“নিশ্চয় সদাকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য...”^{১৩}

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় এসকল বাস্তুচ্যুত লোকদের ভরণ-পোষণ, পুনর্বাসন, আবাসন, কর্মসংস্থান ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়। বিশেষত যাকাত, ফিতরা, সাদাকাত ইত্যাদি ফান্ডের অর্থ দিয়ে বাস্তুচ্যুতি সমাধানে যথাযথ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যায়। একসইসাথে ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো, এমন উপায়-উপকরণ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা যার মাধ্যমে দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান করা যায়, দরিদ্রের (বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী দরিদ্রের অন্তর্ভুক্ত) জন্য মানানসই জীবন-যাপন নিশ্চিত করা যায় এবং সমাজে সহমর্মিতার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়।^{১৪} যাকাত ভিন্ন

ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের অন্যান্য খাত থেকে প্রাপ্ত আয় থেকে দারিদ্র্য বিমোচনের নির্দেশনা রয়েছে। তাই গণীমতের এক পঞ্চমাংশ এবং ফাই ও খারাজসহ ইসলামি রাষ্ট্রের কোষাগারে থাকা সকল রাজস্বের দরিদ্রদের অধিকার রয়েছে। গণীমতের এক পঞ্চমাংশ দরিদ্রদের জন্য নির্ধারিত করে মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ

“আর তোমরা জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু গণীমতরূপে পেয়েছ, নিশ্চয় আল্লাহ ও রাসুলের জন্য তার এক পঞ্চমাংশ, নিকট আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য।”^{৩৫}

৫. বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-২ (জাতীয় কর্মকৌশলের সাথে জলবায়ু পরিবর্তন কার্যক্রমের সময়সীমা সাধন)

“জাতীয় নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কর্মব্যবস্থার সময়সীমা।”^{৩৬}

এ লক্ষ্যমাত্রার অধীন নির্দেশিত বিষয় হলো- জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনার সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহের সময়সীমা সাধন। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ক নীতিমালা ও কৌশল গ্রহণ এবং সূচ্য পরিকল্পনার বিকল্প নেই। এতদসম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন ও কৌশল নির্ধারণে অভিজ্ঞ পরিবেশবিদগণের সাথে পরামর্শ করা প্রয়োজন। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সময়সীমা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ব্যাখ্যা ও স্বার্থ সংরক্ষণ, এ সংক্রান্ত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রকল্প অনুমোদন ও পরিবীক্ষণ এবং বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে।^{৩৭} বাংলাদেশ ইতোমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

৫.১ জলবায়ু পরিবর্তন কল্যাণ তহবিল: জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ মোকাবিলায় সরকার ২০০৯ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (BCCSAP) প্রণয়ন করে। একই সঙ্গে বিসিসিএসএপি বাস্তবায়নে সরকার নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন কল্যাণ তহবিল (CCTF) গঠন করে। স্বল্পোন্নত দেশের (LDC) তালিকাভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে কোনো দেশের স্ব-উদ্যোগে জলবায়ু প্রভাব মোকাবিলায় গৃহীত এটিই প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ। জলবায়ু তহবিলে অর্থের জোগান নিশ্চিত করতে সরকার এ পর্যন্ত তিন হাজার ৬৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় জলবায়ু পরিবর্তন কল্যাণ তহবিল ৭৮টি প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে।^{৩৮}

৫.২ জলবায়ু খাতে রাজস্ব সংস্কার : সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (PFM) মূল ধারার সঙ্গে জলবায়ুর বিষয়টির সংগতি বিধান, কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন এবং সংসদীয় পর্যবেক্ষণ লক্ষ্যে ২০১৪ সালে সরকার জলবায়ু-সংক্রান্ত রাজস্ব কাঠামো

গ্রহণ করে। এরই মধ্যে অর্থবিভাগ তাদের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোতে (MTBF) জলবায়ুর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো বাজেটকে জলবায়ু অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলতে বাজেট কল সার্কুলারের (BCC) মাধ্যমে কৌশলগত নির্দেশিকা জারি করেছে। এমটিবিএফ প্রক্রিয়ায় জলবায়ুর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে একটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোও প্রতিষ্ঠা করেছে। অধিকন্তু গত পাঁচ বছর ধরে আইবাস প্লাস নামক একটি শক্তিশালী আইটি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অর্থবিভাগ বার্ষিক জলবায়ু বাজেট প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে।^{৭৯}

৫.৩ Bangladesh Country Investment Plan For Environment, Forestry and Climate Change (2016 – 2021): জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্প্রতি Bangladesh Country Investment Plan প্রস্তুত করেছে যা পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে বাংলাদেশে বিনিয়োগের একটি সমন্বিত পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত দেশের বিভিন্ন নীতি ও নির্দেশনার আলোকে একটি সমন্বিত কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে।^{৮০}

৫.৪ বাংলাদেশ জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা National Adaptation Plan (NAP): জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের অর্থায়নে বিভিন্ন কর্মশালা ও গবেষণার পরিচালনার মাধ্যমে National Adaptation Plan (NAP) প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনায় (NAP) দেশে মোট ১৪ টি জলবায়ু পরিবর্তন জনিত দুর্যোগ ও ১১ টি জলবায়ু সঙ্কটাপূর্ণ এলাকা (Climate Stress Area) চিহ্নিত করা হয়।^{৮১}

৫.৫ Nationally Determined Contribution (NDC): বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ বিগত সেপ্টেম্বর ২০১৫-তে জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে Nationally Determined Contribution (NDC) প্রণয়ন এবং হালনাগাদ (Update) করে আগস্ট ২০২১ মাসে UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)-তে দাখিল করেছে। ৮টি বৈষয়িক খাতের ওপর দুর্যোগের ঝুঁকি এবং সামগ্রিকভাবে সম্পদ, অবকাঠামো, জীবিকা এবং বাস্তুতন্ত্রের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিরূপণ করা হয়েছে। এ সকল ঝুঁকি নিরসনে সর্বমোট ১১৩ টি মধ্যমেয়াদী (২০৪১) ও দীর্ঘমেয়াদী (২০৫০) অভিযোজনের পদক্ষেপ প্রস্তাব করা হয়েছে যা আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ (২৭ বছরে) বাস্তবায়ন করা হবে। NDC-তে শর্তহীনভাবে অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়ন ও সক্ষমতায় ২০৩০ সাল নাগাদ ৬.৮৩% অর্থাৎ ২৭.৫৬ মিলিয়ন টন CO₂ এবং শর্তযুক্তভাবে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রাপ্তি সাপেক্ষে আরো ১৫.১২% অর্থাৎ ৬১.৭ মিলিয়ন টন CO₂ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।^{৮২}

৫.৬ জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮: টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এবং পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষা ও উন্নয়নের বিষয়গুলো প্রতিফলিত করে পরিবেশকে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতে আনার লক্ষ্যে সরকার ‘পরিবেশ নীতিমালা, ১৯৯২’ পরিমার্জন করে ‘জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮’ ঘোষণা করেছে। এই নীতিটি পরিবেশ সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বিত নীতি

হিসেবে বিবেচিত হবে এবং অন্যান্য নীতিতে বর্ণিত সমস্ত পরিবেশগত ক্রিয়াকলাপের দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে।^{৪০}

৫.৭ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা ও সংরক্ষণ: বাস্তবত্বের গুরুত্ব বিবেচনায় এর যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সাধনে বাংলাদেশ সরকার ‘পরিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধি, ২০১৬’ ঘোষণা করেছে। এ বিধির আওতায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক কিছু জলাভূমি, নদী, উপকূলীয় এলাকা এবং সামুদ্রিক দ্বীপ এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area-ECA/ইসিএ) ঘোষণা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশের ১৩টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ২০০৯-২০১০ হতে অদ্যাবধি ০৯ টি জাতীয় উদ্যান, ১৮ টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ০৩ টি ইকোপার্ক, ০১ টি উদ্ভিদ উদ্যান, ০২ টি মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া এবং ০২ টি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকাসহ মোট ৩৫ টি রক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে রক্ষিত এলাকার সংখ্যা মোট ৫১ টি।^{৪৪}

৫.৮ Mujib Climate Prosperity Plan (MCCP): এটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে জলবায়ু অর্থায়নের জন্য একটি কৌশলগত বিনিয়োগ কাঠামো। মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধির পরিকল্পনায় স্থিতিস্থাপকতা অর্জনের জন্য ২০৩০ সাল নাগাদ ৮০ বিলিয়ন ইউএস ডলার বিনিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। এ পরিকল্পনার ৬টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো- ১. অভিযোজন ত্বরান্বিতকরণ; ২. প্রযুক্তি স্থানান্তর, শ্রম দক্ষতা এবং শিল্পের Future-Proofing-এর মাধ্যমে জাস্ট ট্রানজিশন নিশ্চিতকরণ; ৩. সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য রাজস্ব বৃদ্ধি করা; ৪. সমন্বিত জলবায়ু এবং দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও অর্থায়ন; ৫. ২১-শতকের প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা নিয়ে মানব কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং ৬. নবায়নযোগ্য জ্বালানি, শক্তি দক্ষতা এবং বিদ্যুৎ ও পরিবহন খাতের স্থিতিস্থাপকতা সর্বাধিক করা।^{৪৫}

৫.৯ অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা : অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও বন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ও কৌশলসমূহ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। এ পরিকল্পনার ‘টেকসই উন্নয়ন: পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন’ শীর্ষক ৮ম অধ্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, এক্ষেত্রে ৭ম পঞ্চমবার্ষিকীর সফলতা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে চ্যালেঞ্জ ও উত্তোরণের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে।^{৪৬}

ইসলাম প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট থেকে মতামত গ্রহণ ও পরামর্শের মাধ্যমে সমন্বয় করে কাজ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করে। মহান আল্লাহ বলেন,

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

“জ্ঞানীদের নিকট জিজ্ঞাসা করো যদি তোমরা না জানো।”^{৪৭}

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ .

“এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর, অতঃপর তুমি কোনো সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর করবে, যারা নির্ভর করে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।”^{৪৮}

একইসাথে ইসলাম যেকোনো কাজের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়। পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে কুরআন ইউসুফ (আ.) কর্তৃক গৃহীত সাতবছর মেয়াদী পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابَّاءَ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَكْتُمُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ.

“ইউসুফ বললো, তোমরা সাতবছর একাধিক্রমে চাষ করবে, অতঃপর তোমরা যে শস্য কর্তন করবে এর মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করবে, তা ব্যতীত সমস্ত শীষ সমেত রেখে দিবে; এরপর সাতটি কঠিন বছর, এর সাত বছর, যা পূর্বে সঞ্চয় করে রাখবে, লোকে তা খাবে; কেবল সামান্য কিছু তোমরা যা সংরক্ষণ করবে, তা ব্যতীত। অতঃপর আসবে একবছর সে বছর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সে বছর মানুষ প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে।”^{৪৯}

৬. বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-৩ (প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং মানব ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার উন্নতি)

“জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন, অভিযোজন, প্রভাব নিরসন ও আগাম সতর্কতা বিষয়ে শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানব ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার উন্নতি সাধন।”^{৫০} এ লক্ষ্যমাত্রার অধীন নির্দেশনাবলি হলো-

৬.১ শিক্ষা (প্রশিক্ষণ) ও সচেতনতা বৃদ্ধি : জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন, অভিযোজন, প্রভাব নিরসন ও আগাম সতর্কতা বিষয়ে শিক্ষা (প্রশিক্ষণ) ও সচেতনতা বৃদ্ধি জলবায়ু ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস ও দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার কার্যক্রমসহ সকল ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করা যায়। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় শিক্ষা (প্রশিক্ষণ) ও সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ৩য় শ্রেণী হতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য পুস্তকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অধ্যায় সংযুক্ত করা হয়েছে; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মোকাবিলায় দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে মোট ৪১টি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরই মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিভ্রাণ ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস এ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ের উপর অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্যোগ বিষয়ক মাস্টার্স/ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়েছে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের আওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৪,০২৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ প্রদান চলমান রয়েছে।^{৫১}

ইসলামও জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন, প্রভাব নিরসন ও আগাম সতর্কতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্বারোপ করে। ইসলামের অন্যতম একটি মূলনীতি হচ্ছে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে সত্য বিষয়কে মেনে নেয়ার ব্যাপারে দিকনির্দেশ করা। তাই জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন, প্রভাব নিরসন ও আগাম সতর্কতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি ইসলাম সমর্থন করে। মহান আল্লাহ বলেন,

إِن يَنْبَغُونَ إِلَّا الظَّنُّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا .

“তারা কেবলই বদ্ধমূল ধারণার অনুসরণ করছে। আর ধারণা কখনো জ্ঞানের প্রয়োজন পূরণে কোন কাজে আসতে পারে না।”^{৫২}

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ .

“হে নবি! আপনি বলে দিন, যারা জানে, আর যারা জানে না তারা উভয়েই কি কখনো সমান হতে পারে? বুদ্ধিমান লোকেরাইতো উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।”^{৫৩}

উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে ধারণাপ্রসূত তথা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে সঠিক জ্ঞানার্জন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় পদক্ষেপ গ্রহণ বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা প্রতিফলিত হয়েছে।

৬.২ মানব ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার উন্নতি সাধন : জলবায়ু ঝুঁকি ও দুর্যোগ মোকাবেলায় মানব ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন। দুর্যোগ পূর্ববর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ ও দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার কার্যক্রমে অংশ নিতে দক্ষতা অর্জন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন, উদ্ধারকারী বাহিনী গঠন, ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থাপনা, জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রস্তুত রাখা ইত্যাদি মানব ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়নের অর্ন্তভূক্ত। বাংলাদেশ সরকারি ও বেসরকারি (NGO) প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সমতা ও সমন্বয় আনয়নের লক্ষ্যে Harmonized Training Module এবং প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা প্রস্তুত করেছে। ECRRP-DI প্রকল্পের আওতায় Damage and Need Assessment (DNA) Cell এবং Multi-Hazard Risk and Vulnerability Assessment (MRVA) Cell স্থাপন করা হয়েছে। দেশব্যাপী ৮টি বড় ধরনের দুর্যোগের বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, সুনামি, ভূমিধস, খরা প্রযুক্তিগত ও স্বাস্থ্যগত বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং website এ আপলোড করা হয়েছে।

ইসলামি দৃষ্টিকোণে এসকল কাজে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠুভাবে কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কেননা রাষ্ট্রের নাগরিকের জান, মালের নিরাপত্তা দেয়া রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব। ইসলাম সম্ভাব্য বিপদ মোকাবিলায় যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণে উৎসাহ দিয়েছে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُزَيِّنُونَ بِهِ وَعَدُّوا لِلَّهِ وَعَدُّوكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ۚ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ .

“আর তোমরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বাধিক পরিমাণ শক্তি ও সদাপ্রস্তুত ঘোড়া তাদের মোকাবিলার জন্য জোগাড় করে রাখো। এর মাধ্যমে তোমরা ভীতসন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে, নিজের শত্রুকে এবং অন্য এমন সব শত্রুকে যাদেরকে তোমরা চিনো না। কিন্তু আল্লাহ চেনেন।”^{৫৪}

৭. লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন পদ্ধতি

উপরিউক্ত ৩টি লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ২টি বাস্তবায়ন পদ্ধতি সুপারিশ করা হয়েছে, নিম্নে এ বাস্তবায়ন পদ্ধতিগুলো ইসলামি নির্দেশনার আলোকে পর্যালোচনা করা হলো।

৭.১ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন পদ্ধতি-১ (সবুজ জলবায়ু তহবিলে বৈশ্বিক অর্থ সহযোগিতা)

“অর্থবহ প্রশমন তৎপরতা ও বাস্তবায়ন-স্বচ্ছতার প্রেক্ষাপটে উন্নয়নশীল দেশসমূহের চাহিদা মেটাতে ‘জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (ইউএনএফসিসিসি)’-এর অধীনে উন্নত দেশসমূহ কর্তৃক প্রতিশ্রুত ২০২০ সাল নাগাদ যৌথভাবে বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহের লক্ষ্য বাস্তবায়ন এবং সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে মূলধনী অর্থায়নের (capitalization) মাধ্যমে ‘সবুজ জলবায়ু তহবিল (Green Climate Fund)’ সক্রিয় করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ।”^{৫৫}

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা সম্পর্কিত টেকসই উন্নয়নের নির্ধারিত ৩টি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে উন্নত দেশসমূহ কর্তৃক ২০২০ সাল নাগাদ বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলার সহায়তার মাধ্যমে ‘সবুজ জলবায়ু তহবিল’ সক্রিয় করার নির্দেশনা থাকলেও এশিয়ার অন্যান্য দেশ এ খাতে অর্থ সহায়তা পেলেও বাংলাদেশ সঠিকভাবে প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করতে না পারায় আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলো যেন এসব প্রক্রিয়া যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে এবার সে উদ্যোগ নিয়েছে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)।^{৫৬} জলবায়ু তহবিলে প্রাথমিকভাবে ১০.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ জমা হওয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল। এর মধ্যে নিশ্চিত হয়েছে ৮.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।^{৫৭} সবুজ জলবায়ু তহবিল (GCF) সমৃদ্ধ করার জন্য বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) বর্তমানে জলবায়ু তহবিলের জন্য চার বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি পাইপলাইন সৃষ্টি করেছে এবং এরই মধ্যে চারটি প্রকল্পে জিসিএফ থেকে ৯৪.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন করা হয়েছে।^{৫৮}

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব একটি বৈশ্বিক সমস্যা, তাই এ সমস্যা মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক বিশ্বের, বিশেষত উন্নত দেশসমূহ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগে ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহকে সহায়তায় বার্ষিক অনুদান দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। এ ধরনের সহায়তা প্রদান ও সহায়তা গ্রহণে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক। উন্নত বিশ্বের দেশসমূহ এ খাতে সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইসলাম যেকোনো প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নির্দেশনা দিয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী,

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“তোমরা পারস্পরিক ওয়াদা- প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ কর। কেননা এই ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কিয়ামতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।”^{৫৯}

তবে সবুজ জলবায়ু তহবিল খাতের প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দুর্নীতির সবচেয়ে বড় এবং লোভনীয় উপায় হচ্ছে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প। সুতরাং জলবায়ু তহবিলের যথাযথ ব্যবহার করার বিকল্প নেই। ইসলাম কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে দুর্নীতিমুক্তভাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দেয়, যেমন হাদিসে বর্ণিত আছে,

عَنْ عَدِيِّ بْنِ غَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ اسْتَغْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكْتَمْنَا مَخِيطًا، فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“আদী ইবনে আমীরা আল কিনদী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি- আমি তোমাদের কাউকে কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করি। আর যদি সে আমাদের থেকে একটি সূঁচ বা তার চেয়ে অধিক কিছু লুকিয়ে রাখে তবে তা হবে খেয়ানত বা আত্মসাৎ। কিয়ামতের দিন সে তা বহন করে নিয়ে আসবে।”^{৬০}

৭.২ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন পদ্ধতি-২ (কার্যকর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি)

“নারী, যুবসমাজ, স্থানীয় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে প্রাধিকার প্রদান সাপেক্ষে স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কার্যকর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে কর্মপদ্ধতির প্রসার।”^{৬১}

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় নারী, যুবসমাজ, স্থানীয় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে প্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো-জাতীয় পরিবেশ নীতি (২০১৮), জাতীয় বন নীতি (২০১৬), বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট : বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২০, বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ : একুশ শতকের বাংলাদেশ, National Sustainable Development Strategy (2010–2021), National Aquaculture Development Strategy and Action Plan 2013–2020. ইসলামও আমাদেরকে দুর্যোগকালীন বিশেষ প্রস্তুতি হিসেবে যেকোনো পদক্ষেপ, দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষকে সহায়তা তথা তাদের কষ্ট দূর করে দেয়াকে ইসলাম বিশেষ ফজিলতের কাজ হিসেবে বিবেচনা করেছে। তাই আমাদেরকে দুর্যোগকালীন মুহূর্তে দুর্যোগ প্রশমন ও সম্পদ ব্যবহারে সক্ষমতা অর্জনে একে অন্যের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

“যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের পার্শ্বিক কষ্টসমূহের মধ্যে একটা কষ্ট দূর করে দেয়, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার একটা কষ্ট দূর করে দিবেন।”^{৬২}

৮. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রতিরোধ শীর্ষক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সূচক

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রতিরোধ শীর্ষক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাফল্য মূল্যায়নের জন্য ৮টি সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এ সূচকগুলো অর্জনে অনেকাংশে ইতিবাচক অগ্রগতি সাধন করেছে। তবে বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ এখনো তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করায় এ ব্যাপারে সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব

হয়নি। বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি নিয়ে ‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট : বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২০’ শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে, এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অলনাইন তথ্য বাতায়ন হিসেবে ‘এসডিজি ট্রাকার’ চালু করেছে। এসকল তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে বাংলাদেশের অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো:

লক্ষ্যমাত্রা	সূচক	লক্ষ্য (২০৩০)	বর্তমান অবস্থা
১৩.১.১	প্রতি ১০০,০০০ জনে দুর্যোগের কারণে মৃত, নিখোঁজ ও সরাসরি দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা	১৫০০	৪৩১৮ (২০১৯)
১৩.১.২	সেনদাই ফ্রেমওয়ার্ক এর সঙ্গে মিল রেখে জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নকারী দেশের সংখ্যা	বাংলাদেশ জাতীয় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকরণ কৌশল (২০১৬-২০২০) গ্রহণ করেছে।	
১৩.১.৩	জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন কৌশলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ স্থানীয় ঝুঁকি নিরসন কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নকারী স্থানীয় সরকারের সংখ্যা	দেশের ১২ টি সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে ১টি এবং ৩৩০ টি পৌরসভার মধ্যে ১২টিতে স্থানীয় দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসকরণ কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে।	
১৩.২.১	একটি সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে এমন দেশের সংখ্যা, যা ঐ সকল দেশের জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবে সাথে অভিযোজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং জলবায়ু-সহিষ্ণুতা বৃদ্ধিসহ গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন এমনভাবে কমিয়ে আনে যাতে খাদ্য উৎপাদন কোনো প্রকার হুমকির সম্মুখীন না হয়।	কার্বন নিঃসরণ কমাতে জাতীয় প্রতিশ্রুতি (এনডিসি) বা ন্যাশনাল ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশনে সিওটু নিঃসরণ কমানোর অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নিজ উদ্যোগে স্বাভাবিক প্রেক্ষাপটে ৫ শতাংশ কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আর উন্নয়ন অংশীদারদের সহায়তায় আরও ১৫ শতাংশ কমানোর বিষয়ে সম্মত হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) হালনাগাদ করেছে। এনডিসি’তে বাংলাদেশ অগ্রাধিকার দিয়েছে বিদ্যুৎ, পরিবহন, জ্বালানি ও শিল্পের হালনাগাদকরণে বিনিয়োগ করার বিষয়ে। যাতে এসব উদ্যোগ সিওটু নিঃসরণ কমাতে সহায়ক হয়। সবুজ প্রবৃদ্ধি থেকে কম নিঃসরণ কৌশলের বিষয়েও বাংলাদেশ কাজ করছে।	
১৩.৩.১	প্রশমন, অভিযোজন, প্রভাব নিরসন ও আগাম সতর্কতা বিষয়সমূহ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এমন দেশের সংখ্যা	বাংলাদেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।	
১৩.৩.২	অভিযোজন, প্রশমন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং উন্নয়ন কর্মব্যবস্থা বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক, পদ্ধতিগত ও ব্যক্তি পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রচার করেছে এমন দেশের সংখ্যা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন কর্মসূচি চলমান	

১৩.ক.১	অঙ্গীকারকৃত ১০০ বিলিয়ন ডলার তহবিলে জমার জন্য ২০২০ সাল থেকে প্রতি বছর সংগৃহীত মার্কিন ডলারের পরিমাণ	১০.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ জমা হওয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে নিশ্চিত হয়েছে ৮.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
১৩.খ.১	নারী, যুবসমাজ, স্থানীয় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর অগ্রাধিকারসহ জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কার্যকর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত কর্মপদ্ধতি এবং অর্থায়ন, প্রযুক্তি ও সক্ষমতা বিনির্মাণসহ সহায়তার পরিমাণ ও বিশেষ সহায়তাপ্রাপ্ত স্বল্পোন্নত দেশ এবং উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রের সংখ্যা	ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সবুজ জলবায়ু ফান্ড গঠন করেছে। জলবায়ু তহবিলের জন্য চার বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি পাইপলাইন সৃষ্টি হয়েছে এবং এরই মধ্যে চারটি প্রকল্পে জিসিএফ থেকে ৯৪.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন করা হয়েছে।

৯. সুপারিশমালা

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশের বিভিন্ন পদক্ষেপ ইসলামি দৃষ্টিকোণে মূল্যায়ন সমাপনান্তে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় করণীয় বিষয়ে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হলো-

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রতিকূলতা সহিষ্ণুতা ও অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।
- দুর্যোগ উপযোগী কৃষিপণ্য উদ্ভাবনের মধ্যে সক্ষমতা অর্জন করা।
- দুর্যোগকালীন জনসাধারণের খাদ্যসংকট মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ ও পারস্পরিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া।
- জলবায়ু পরিবর্তন ও কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা।
- দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে আগাম সতর্কতা বিষয়ক শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা।
- জলবায়ু অর্থায়ন ফান্ডের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- দুর্যোগ পরবর্তী করণীয় ঠিক করে প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও উদ্ধারকারী বাহিনী গঠন করা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ সম্পর্কে সচেতনতামূলক সভা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে এতৎসম্পর্কিত ইসলামি নির্দেশনা তুলে ধরা।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গণমাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় ইসলামি নির্দেশনার প্রচার ও প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ।

১০. উপসংহার

জলবায়ু পরিবর্তন অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জনজীবনের দরিদ্রতার প্রতিকূলতার ব্যাপারে প্রভাব ফেলেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে পুরোপুরি রেহাই পাওয়া সম্ভব না হলেও পরিবেশ ও বন

মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার ‘বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা ২০০৯’ এর মাধ্যমে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে দুর্যোগ ঝুঁকি এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিপর্যয় মোকাবিলা করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রতিরোধ শীর্ষক ৮টি সূচক বিশ্লেষণে প্রতিয়মান হয় যে, বাংলাদেশ জলবায়ু মোকাবিলায় যথাযথ আইনি কাঠামো ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কিন্তু যথাযথ বাস্তবায়নের অভাবে বাংলাদেশ এর সুফল যথাযথ ভোগ করতে পারছে না। তাই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন এবং আন্তর্জাতিক অর্থায়নের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণে মনোযোগী হতে হবে। এক্ষেত্রে ইসলামি নির্দেশনার অনুশীলন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রতিরোধে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

তথ্যসূত্র:

- ১ United Nations General Assembly, *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*, Transmitted to the General Assembly as an Annex to document A/42/427 (USA : United Nations, 1987), p. 43
- ২ Editorial Board, *Transforming Our World : The 2030 Agenda For Sustainable Development*, The General Assembly, 4th plenary meeting 25 September 2015 (New York : United Nations, 2015) Seventieth session Agenda items 15 and 116, p. 27
- ৩ ভূমি মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২১-২০২২) (ঢাকা: ভূমি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২২), পৃ. ৯৭-৯৮
- ৪ রাজু নূরুল, “ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র: ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে উপকূলের সহায়”, *বণিকবর্তা*, ঢাকা, অক্টোবর ২৮, ২০২০, অনলাইন ভার্সন, তারিখ: ২০/০৮/২০২৩
- ৫ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩ (ঢাকা: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ২০২৩), পৃ. ২৪৮
- ৬ The world bank, “Cyclone shelter center in Bangladesh”, <https://www.worldbank.org/en/results/2022/08/29/shelter-from-the-storm-protecting-bangladesh-scoastal-communities-from-natural-disasters>. (Accessed 20 october 2023).
- ৭ হামিদ-উজ-জামান, “৫৫০-এর মধ্যে ৪ বছরে কাজ হয়েছে ৫টি”, *যুগান্তর*, ঢাকা: ০৩ জুলাই ২০২২, অনলাইন ভার্সন, সংগ্রহের তারিখ: ০৮-২১-২০২৩
- ৮ আরিফুর রহমান, “প্রকল্পের সাড়ে চার বছরের মাথায় বাতিল হলো ১০০ মুজিব কিল্লা”, *প্রথম আলো*, ঢাকা: ১৬ মার্চ ২০২৩, অনলাইন ভার্সন, সংগ্রহের তারিখ: ০৮-২১-২০২৩
- ৯ *Resilient Infrastructure for Adaptation and Vulnerability Reduction (RIVER) Project* (Dhaka : Local Government Engineering Department, Government of the People’s Republic of Bangladesh, 2023)
- ১০ ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, *ফাসুলুল খিতাব ফি সিরাতি আমিরিল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব*, অনু: কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক (সিলেট : কালান্তর প্রকাশনী, ২০১৮), খ. ১. পৃ. ৪৬৭-৪৬৮
- ১১ সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯), পৃ. ৪৭৭
- ১২ মওলানা মুশাহিদ আলী, *ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০), পৃ. ১৪১

- ১৩ www.bina.gov.bd/site/news/42512053-ac9b-4569-9627-ff08c2de56ecদেশে লবণাক্ততা ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু ধানের পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্স উন্মোচন। সংগ্রহের তারিখ: ২১/০৮/২০২৩
- ১৪ ড. মিজা মোফাজ্জল ইসলাম, “খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় প্রতিকূলতা সহিষ্ণু উন্নত জাত উদ্ভাবন”, কৃষি কথা (ঢাকা: কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২২), সংখ্যা- ভদ্র-১৪৩০, পৃ. ৩
- ১৫ আল কুরআন, ১৩ : ১১
- ১৬ কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, তাফসীরে মায়হারী, মাওলানা তালেব আলী অনুদিত (ঢাকা : হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেরিয়া, ১৯৯৯), খ. ৬, পৃ. ৩০১
- ১৭ আল কুরআন, ৬৫ : ২
- ১৮ টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন বাজেট প্রতিবেদন ২০২০-২০২১ (ঢাকা : অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন-২০২০), পৃ. ১৪
- ১৯ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫০
- ২০ ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার, পূর্বোক্ত
- ২১ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন নিশাপুরি আল কুশাইরী, আস সহিহ (বৈরুত : দারু এহয়া তুরাসিল আরবি, তা.বি.), হাদিস নং : ২৫৮০/৫৮
- ২২ টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন বাজেট প্রতিবেদন ২০২০-২০২১, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪
- ২৩ *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction: Risk and Poverty in a Changing Climate -Invest Today for a Safer Tomorrow* (Geneva : United Nations International Strategy for Disaster Reduction-UNISDR, 2009), p. 207
- ২৪ *ibid*, p. 37
- ২৫ *Economics of Adaptation to Climate Change Synthesis Report* (Washington DC : The World Bank, 2010), p. 54
- ২৬ *ibid*, p. 2
- ২৭ *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction: Risk and Poverty in a Changing Climate -Invest Today for a Safer Tomorrow*, op.cit, p. 207
- ২৮ *ibid*
- ২৯ *National Sustainable Development Strategy* (Dhaka : General Economics Division, Planning Commission, 2013), p. 38
- ৩০ David Eckstein and others, GLOBAL CLIMATE RISK INDEX 2020 Who Suffers Most from Extreme Weather Events? Weather-Related Loss Events in 2018 and 1999 to 2018 (Germany : Germanwatch, December-2019), p.9
- ৩১ অভ্যন্তরীণ বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র (ঢাকা : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২১), পৃ. ১
- ৩২ পূর্বোক্ত, পৃ. ১-৩৬
- ৩৩ আল কুরআন, ৯ : ৬০
- ৩৪ ইউসুফ আল-কারদাভী, ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন, মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ও মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ অনুদিত (ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০১৮), পৃ. ১৬২
- ৩৫ আল কুরআন, ৮ : ৪১
- ৩৬ Editorial Board, *ibid*, p. 27
- ৩৭ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ (ঢাকা: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২২), পৃ. ৫

- ৩৮ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) (ঢাকা: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২১), পৃ. ৪২৬
- ৩৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৫
- ৪০ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬
- ৪১ পূর্বোক্ত
- ৪২ পূর্বোক্ত
- ৪৩ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২০
- ৪৪ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬
- ৪৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭
- ৪৬ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৭-৪৫৪
- ৪৭ আল কুরআন, ১৬ : ৪৩
- ৪৮ আল কুরআন, ৩ : ১৫৯
- ৪৯ আল কুরআন, ১২ : ৪৭-৪৯
- ৫০ Editorial Board, *ibid*, p. 27
- ৫১ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮
- ৫২ আল কুরআন, ৫৩ : ২৮
- ৫৩ আল কুরআন, ৩৯ : ৯
- ৫৪ আল কুরআন, ৮ : ৬০
- ৫৫ Editorial Board, *ibid*, p. 27
- ৫৬ বিশেষ প্রতিনিধি, “জলবায়ু তহবিল থেকে অর্থ পেতে নতুন উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার”, প্রথম আলো, ঢাকা: ২৮ মে ২০২২, অনলাইন ভার্সন, সংগ্রহের তারিখ: ২২/৮/২০২৩
- ৫৭ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৩
- ৫৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৭
- ৫৯ আল কুরআন, ১৭ : ৩৪
- ৬০ ইমাম মুসলিম, পূর্বোক্ত, হাদিস নং : ১৮৩৩/৩০
- ৬১ Editorial Board, *ibid*, p. 28
- ৬২ ইমাম মুসলিম, পূর্বোক্ত, হাদিস নং : ২৫৮০/৫৮

পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা নিরসনে ইসলামি নির্দেশনা: পরিপ্রেক্ষিত পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০

মোহাম্মদ ইসমাইল*

Abstract

The primary organization of human society is the family. Basically family is the origin of society. Family is developed to organize the social life of human being. Because of which the family is the center of society. The presence of the family in social life, the need is immense. Because of this, sociologists have tried to analyze the explanation, history, effectiveness of the family. Family conflicts are notable as archetypes of family systems. However, the transformation from conflict to violence is an obstacle to maintaining peace and order in the social system. Therefore, various steps have been taken to resolve family conflicts over the ages. Various laws have been made in this regard in Bangladesh. Islam has also given clear instructions about this. The Government of Bangladesh has enacted a special law for this purpose, the 'Family Violence (Prevention and Protection) Act, 2010'. In the current study, the review of this law has been highlighted in the light of Islamic guidance. The implementation of the recommendations visible in the review of this law will play a positive role in resolving the conflicts at the family level of the majority Muslim population of this country.

চাবিশব্দ: দ্বন্দ্ব, সহিংসতা, নির্যাতন, সামাজিকতা, পরিবার, সম্প্রীতি

উপস্থাপনা

মানব সমাজের প্রাথমিক সংগঠন হলো পরিবার। মূলত পরিবারেই সমাজের উৎপত্তি। মানুষের সামাজিক জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য পরিবার গড়ে উঠেছে। যার কারণে পরিবার সমাজের কেন্দ্রস্থল। সমাজ জীবনে পরিবারের উপস্থিতির, প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যার কারণে সমাজবিজ্ঞানীগণ পরিবারের ব্যাখ্যা, ইতিহাস, কার্যকারিতা প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। পরিবার ব্যবস্থার চিরায়তরূপ হিসেবে পারিবারিক দ্বন্দ্ব লক্ষ্যণীয়। তবে দ্বন্দ্ব থেকে সহিংসতায় রূপায়ন সমাজব্যবস্থার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার অন্তরায়। তাই যুগে যুগে পারিবারিক দ্বন্দ্ব নিরসনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশেও এ সম্পর্কে বিভিন্ন আইন প্রণীত হয়েছে। ইসলামও এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এ লক্ষ্যে ‘পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০’ একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করেছে। বর্তমান গবেষণায় ইসলামি নির্দেশনার আলোকে এ আইনের পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে। এ আইনের পর্যালোচনায় দৃশ্যমান সুপারিশমালা বাস্তবায়ন এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর পারিবারিক পরিমণ্ডলে দ্বন্দ্ব নিরসনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

* পিএইচ.ডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা

দ্বন্দ্ব শব্দটির ইংরেজি পরিভাষা হলো Conflict। বাংলায় কলহ, সংঘাত, ঝগড়া, বিবাদ, যুদ্ধ বা শত্রুতা, দ্বিধা বা সংশয় ইত্যাদি শব্দ দ্বন্দ্ব শব্দের সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।^১ পরিভাষায়, দ্বন্দ্ব হলো একাধিক ব্যক্তি, দল বা সম্প্রদায়ের মধ্যে মতের, চিন্তার বা স্বার্থের ভিন্নতা।^২ সমাজবিজ্ঞানী Lewis A. Coser বলেন, “Conflict is a struggle over values and claims to scarce status, power, and resources in which the aims of the opponents are to neutralize, injure or eliminate the rival.”^৩ অর্থাৎ, “দ্বন্দ্ব হল মূল্যবোধের বিরুদ্ধে লড়াই এবং দুর্বল অবস্থা, ক্ষমতা ও সম্পদের বিরুদ্ধে অবস্থান যেখানে বিরোধীদের লক্ষ্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে বশে আনা, আহত করা বা নির্মূল করা।” যখন দ্বন্দ্ব পারিবারিক পরিমণ্ডলে বিস্তৃত থাকে তখন তাকে পারিবারিক দ্বন্দ্ব বলে। বিভিন্ন গবেষক বিভিন্নভাবে পারিবারিক দ্বন্দ্বকে বর্ণনা করেছেন, Elena Marta & Sara Alfieri-এর মতে, “Family conflict refers to active opposition between family members. Because of the nature of family relationships, it can take a wide variety of forms, including verbal, physical, sexual, financial, or psychological. Conflicts may involve different combinations of family members: it can be conflict within the couple or between parents and children or, again, between siblings.”^৪ অর্থাৎ, “পারিবারিক দ্বন্দ্ব বলতে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সক্রিয় বিরোধিতা বোঝায়। পারিবারিক সম্পর্কের প্রকৃতির কারণে, এটি মৌখিক, শারীরিক, যৌন, আর্থিক বা মানসিকসহ বিভিন্ন ধরনের রূপ নিতে পারে। দ্বন্দ্ব পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন সংমিশ্রণ জড়িত থাকতে পারে: এটি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বা পিতামাতা এবং সন্তানদের মধ্যে বা ভাইবোনের মধ্যে বিরোধ হতে পারে।” উপরিউক্ত সংজ্ঞা থেকে পারিবারিক দ্বন্দ্বের বিভিন্ন প্রকরণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়, তবে কোনো সমাজবিজ্ঞানী পারিবারিক দ্বন্দ্বের ৭টি কারণ উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো- ১. সম্পদের দ্বন্দ্ব, ২. স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব, ৩. ভাই-বোনের দ্বন্দ্ব, ৪. বাবা-মা ও ছেলে-মেয়েদের দ্বন্দ্ব, ৫. পরিবার সদস্যদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, ৬. দারিদ্র্যের দ্বন্দ্ব, ৭. উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্ব।^৫ প্রায়োগিক অর্থে একটি দলের এক বা একাধিক সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্য, বিরোধ, সংঘর্ষ প্রভৃতি বিশ্বাস বা কাজের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায়। মানুষের সৃষ্টি থেকেই দ্বন্দ্বের শুরু। কখনো সে নিজের সাথে। কখনো বা অন্যের সাথে। আমাদের চারপাশের প্রতিদিনকার ঘটনাগুলো লক্ষ্য করলে আমরা দ্বন্দ্বের নানারূপ দেখতে পাই। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী দ্বন্দ্বকে সমাজের একটি স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। যেমন, প্লেটো ((খ্রিস্টপূর্ব ৪২৭-খ্রিস্টপূর্ব ৩৪৮), রুশো (২৮ জুন ১৭১২ - ২ জুলাই ১৭৭৮), অগাস্ট কোঁৎ (১৭৯৮খ্রিস্টাব্দ -১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ) এবং এমিল দুর্খেইম (১৫ এপ্রিল ১৮৫৮ - ১৫ নভেম্বর ১৯১৭) দ্বন্দ্বকে একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার উপায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাদের মতানুসারে সমাজ ব্যবস্থার অর্ন্তনিহিত এক শক্তি থাকে, যার ফলে দ্বন্দ্ব আপনা হতেই মিটে যায় এবং সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। তাই দ্বন্দ্ব নির্মূল করা সম্ভব হবে না, তবে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দ্বন্দ্বের স্বাভাবিক মাত্রা বজায় রেখে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব এবং দ্বন্দ্বকে সহিংসতায় রূপায়ন থেকে রক্ষা করা যাবে।

দ্বন্দ্ব থেকে এক পর্যায়ে বিবাদমান ব্যক্তিগণের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। দ্বন্দ্ব একটি স্বাভাবিক ঘটনা। চিন্তার বা মতের ভিন্নতার জন্য দ্বন্দ্ব তৈরি হতে পারে। ভিন্ন চিন্তা বা মত

থাকতেই পারে, কিন্তু দ্বন্দ্বের কারণে যখন একজন মানুষের বা একদল মানুষের অধিকার কেড়ে নেয়া হয়, তখন তা সহিংসতায় রূপ নেয়।^৬ সমাজে বিভিন্ন রকমের দ্বন্দ্ব থাকে। তন্মধ্যে পারিবারিক দ্বন্দ্ব সবচেয়ে বেশি স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে বর্তমান। পারিবারিক দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে যে সহিংসতা লক্ষ্য করা যায়, তাই পারিবারিক সহিংসতা। পারিবারিক সহিংসতা সংজ্ঞায়নে বৃটিশ আইনবিদ Tony Wragg () বলেন, “Domestic violence occurs when one person tries to coerce or control another person in a family-like or domestic relationship. Domestic violence involves an abuse of power and can take the form of physical abuse, sexual abuse, emotional or psychological abuse, verbal abuse, stalking and intimidation, social and geographic isolation, financial abuse, cruelty to pets, or damage to property or threats to be violent in these ways.”^৭ অর্থাৎ, পারিবারিক সহিংসতা ঘটে যখন একজন ব্যক্তি পরিবারের মতো বা ঘরোয়া সম্পর্কের মধ্যে থাকা অন্য ব্যক্তিকে বাধ্য করে বা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। পারিবারিক সহিংসতা ক্ষমতার অপব্যবহার, শারীরিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, আবেগতাড়িত নির্যাতন, মনস্বাত্তিক নির্যাতন, মৌখিক অপব্যবহার, আড়িপাঁতা, ভয় দেখানো, সামাজিক ও ভৌগলিকভাবে বয়কট, আর্থিক নির্যাতন, পোষা প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা, সম্পত্তির ক্ষতি বা হুমকিতে রূপ নিতে পারে।^৮ পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ এর ভাষ্যানুসারে, “পারিবারিক সহিংসতা বলতে পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিবারের অপর কোন নারী বা শিশু সদস্যের উপর শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন অথবা আর্থিক ক্ষতিকে বুঝাবে।”^৯

পারিবারিক দ্বন্দ্বের ধরণ ও প্রকৃতি : ইসলামি নির্দেশনা

পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে পারিবারিক দ্বন্দ্বের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার উল্লেখযোগ্য ধরণগুলো হলো- মারধোর করা, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ, হত্যা, ক্ষুধার্ত রাখা, চিকিৎসা সেবা না দেয়া, সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, অশালীন উক্তি করা, অশালীনভাবে অঙ্গভঙ্গি করা, শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, বিশ্রামের সুযোগ না দেয়া, সাধের অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে দেয়া, বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ পরবর্তী বৈষম্য, পোষাক পরিচ্ছদ না দেয়া, গালিগালাজ করা, অন্যায়ভাবে তালাক দেয়া, যৌতুক নেয়া, সন্তানদের দেখাশোনা না করা ইত্যাদি। পরিবার দ্বন্দ্বের বিভিন্ন ধরণ থাকলেও ৫টি দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নিম্নে ইসলামি নির্দেশনা আলোকে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো-

১. সম্পদের দ্বন্দ্ব : পারিবারিক দ্বন্দ্বের প্রধান কারণ হলো সম্পদের দ্বন্দ্ব। সম্পদের কারণে পিতামাতা ভাই বোনসহ আত্মীয় স্বজনদের সাথে দ্বন্দ্ব জড়িয়ে পড়ে। পরিবারের মধ্যে পিতার সম্পদ যদি তার ছেলে মেয়েদের মধ্যে কেউ একজন বেশি ভোগ করে অথবা তার সম্পদ থেকে পরিবারের কাউকে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে চায় তখন পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সেখানে দ্বন্দ্ব জড়িয়ে পড়ে। অথবা পিতা তার কোন এক ছেলেমেয়েকে যদি আলাদাভাবে সম্পদ বেশি দিতে চায় তখন পরিবারের অন্য সদস্যরা পিতার সাথে দ্বন্দ্ব জড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ পিতার সম্পদ যদি পরিবারের কোন একজন বেশি ভোগ করতে চায় তখন সেই পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্য। অথবা পিতা যদি তার গরীব কন্যা সন্তানকে সম্পদ বেশি দান করতে চায় তখন পরিবারের ছেলে সন্তানরা তার সাথে দ্বন্দ্ব জড়িয়ে পড়ে। তাই বলা যায় পারিবারিক দ্বন্দ্বের প্রধান কারণ হলো সম্পদের দ্বন্দ্ব।

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থার পারিবারিক পরিমণ্ডলে সম্পদের দ্বন্দ্ব বিভিন্ন পারিবারিক ও সামাজিক অবক্ষয় লক্ষ্য করা যায়; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- সম্পদের জন্য ভাই-ভাইকে নির্যাতন, হত্যা^{১৭}; চাচাতো ভাইকে হত্যা^{১৮}; জামাই কর্তৃক শ্বশুর হত্যা^{১৯}; সম্পত্তি দ্বন্দ্ব পিতার লাশ দাফনে বাধা^{২০}; ভতিজা কর্তৃক চাচা অথবা চাচা কর্তৃক ভতিজা হত্যা^{২১}; এমনকি সম্পত্তির জন্য নিজ সন্তানের হাতে পিতা-মাতা নির্যাতন ও খুনের ঘটনাও ঘটছে^{২২}। পিতামাতার মৃত্যু বরণের পর অথবা তারা জীবিত থাকা কালীন উত্তরাধিকার সম্পদের বন্টন নিয়ে ভাইবোন, ফুফু, চাচা ইত্যাদি আত্মীয়দের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। অথবা পিতার সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে ভাই কর্তৃক তার বোনকে তার প্রাপ্য সম্পদ না দেওয়ার কারণে পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরাজ করে। অথবা পিতার মৃত্যুর পর পরিবারের প্রধান কর্তা কে হবে এবং সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ কে করবে এই নিয়েও পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে যায়। মোট কথা পরিবারের উত্তরাধিকারের সম্পদ বন্টন নিয়েই সম্পদ কম বেশি, সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি নিয়ে পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

ইসলাম পারিবারিক পরিমণ্ডলে সম্পদের দ্বন্দ্ব নিরসনে বিভিন্ন উপায় নির্দেশ করেছেন। প্রথমত, উত্তরাধিকারী সম্পত্তির বন্টননীতি নির্ধারণ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, “পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের প্রাপ্যাংশ রয়েছে। অনুরূপভাবে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও প্রাপ্যাংশ রয়েছে। তা কম হোক অথবা বেশি, এক নির্ধারিত অংশ।”^{২৩}

মহাশু আল কুরআন ও হাদিসে উত্তরাধিকারী সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে কে কত অংশ পাবে তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যাদের অংশ কুরআন ও এবং হাদীস দ্বারা নির্ধারিত এবং যাদের অংশ দেওয়া ব্যতীত অন্য কারো অংশ দেয়া যায় না, এমন শ্রেণীর ওয়ারিশদেরকে যাবিল ফুরুয বলা হয়। এদের সংখ্যা ১২ জন; এরা বিবাহ সিদ্ধ জাত এবং রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়। তার মধ্যে ৪ জন পুরুষ এবং ৮ জন মহিলা। পুরুষ চার জন হলো: ১. পিতা, ২. দাদা, ৩. স্বামী, ৪. বৈপিত্র্যেয় ভাই। মহিলা আটজন হলো: ১. স্ত্রী, ২. মাতা, ৩. কন্যা, ৪. সহোদরা বোন, ৫. বৈমাত্রের বোন, ৬. বৈপিত্র্যের বোন, ৭. কন্যা ও ৮. দাদী। তাদের মধ্যে পিতা, স্বামী, মাতা, কন্যা ও স্ত্রী এই পাঁচজন কখনো উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয় না। উত্তরাধিকারী সম্পত্তি যথাযথভাবে বন্টন করার নির্দেশনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, “পিতা-মাতা এবং নিকটাত্মীয়গণ যা ত্যাগ করে যান সেসবের জন্যই আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি। আর যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও। আল্লাহ তা’আলা নিঃসন্দেহে সব কিছুই প্রত্যক্ষ করেন।”^{২৪}

দ্বিতীয়ত, সম্পদসহ যেকোনো ক্ষেত্রে পুত্র-কন্যাদের মাঝে কারো উপর কাউকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না; বরং সকলকে সমান হিসেবে সমান সম্পদের অধিকার দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে হাদিসের বাণী, “আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যার কোন কন্যাসন্তান থাকবে, সে যদি তাকে জীবিত দাফন না করে এবং তার তুলনায় পুত্রসন্তানকে অগ্রাধিকার না দেয় তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।”^{২৫}

তৃতীয়ত, অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ভোগ করা যাবে না। এটি ইসলামের অর্থনীতির একটি সাধারণ নীতি। পারিবারিক পরিমণ্ডলেও এ নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে পারিবারিক দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ করা সম্ভব। মহান আল্লাহ বলেন, “তোমরা অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ভক্ষণ করো না।”^{২৬}

২. স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনেকগুলো কারণ নিয়ে দ্বন্দ্ব হতে পারে প্রথমটি হলো স্বামীর কারণে দ্বন্দ্ব দ্বিতীয় হলো স্ত্রীর কারণে দ্বন্দ্ব। স্বামীর যেসকল কারণে দ্বন্দ্ব হয় সেগুলো হলো- স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অমনযোগ, স্বামীর হাতে স্ত্রী নির্যাতন, পরকীয়ায় আসক্তি, স্বামীর মাদকাসক্তি, স্বামী দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকা এবং স্ত্রীর ভরনপোষণের অনীহা ইত্যাদি। আবার স্ত্রীর যেসব সমস্যার কারণে স্বামীর সাথে দ্বন্দ্ব দেখা যায় তাহলো, স্বামীর প্রতি অনীহা, স্ত্রীর পরকীয়া, স্বামীর পরিবারের সাথে ভালো ব্যবহার না করা, স্বামীর আদেশ-নিষেধ অমান্য করাসহ বিভিন্ন কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়ে থাকে। সামাজিক অস্থিরতা, মাদকাসক্তি প্রভাব এবং পরস্পরকে ছাড় না দেওয়ার মনোভাবও স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্বের অন্যতম কারণ। বাংলাদেশে স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব পারিবারিক দ্বন্দ্বের সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয়। দেশে বিবাহিত নারীদের শতকরা ৮০ জনই কোনো না কোনোভাবে নির্যাতনের শিকার হন। আর সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হন স্বামীর দ্বারা। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের জুলাই, ২০২৩ মাসের নারী ও কন্যা নির্যাতন তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, একমাসে (জুলাই-২০২৩) ২৯৮টি নির্যাতনের ঘটনায় ১৪টি স্বামী-স্ত্রী দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত। তন্মধ্যে যৌতুকের কারণে নির্যাতন ৮জন, যৌতুকের কারণে হত্যা ৬ জন এছাড়াও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন আরো ১৪ জন।^{১৯} এছাড়াও এসিড নিক্ষেপ, মানসিক অত্যাচার, অগ্নিদগ্ধকরণ ইত্যাদি ধরনেরও নির্যাতনের শিকার হয় নারীরা। দ্বিতীয় বিবাহ পরবর্তী প্রথম স্ত্রীর প্রতি অবহেলা জনিত অত্যাচারও পারিবারিক দ্বন্দ্বের একটি ভয়াবহ দৃষ্টান্ত।

ইসলাম নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবনে সৃষ্ট সকল দ্বন্দ্ব প্রতিরোধে নির্দেশনা দিয়েছে। প্রথমত, যথাযথ ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। ইসলামি পরিভাষায় একে (نفقة) নাফাকা বলা হয়।^{২০} স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ওয়াজিব। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, “সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুযায়ী যেন ব্যয় করে।”^{২১}

দ্বিতীয়ত, যৌতুক নিষিদ্ধ। নারী নির্যাতনের অন্যতম দিক হলো যৌতুক। যৌতুকের মাধ্যমে আমাদের সমাজে অধিকাংশ নারী নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। ইসলাম যৌতুককে হারাম ঘোষণা করেছে। বিবাহের সময় স্ত্রীর সম্পদের লোভে বিয়ে করলে সে ব্যক্তি প্রকারান্তরে দরিদ্রই হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি সম্পদ লাভের আশায় বিবাহ করে আল্লাহ তার দরিদ্রতাই বৃদ্ধি করে দেন।”^{২২} ইসলাম যৌতুক নিরোধ করার লক্ষ্যে বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্রী নির্বাচনের সময় নারীর অর্থ-সম্পদের প্রতি খেয়াল না রেখে বরং তার ধর্মভীরু ও নৈতিক মানের দিকে লক্ষ্য রাখতে বলেছে। এ প্রসঙ্গে হাদিসের বাণী, “আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, “তোমরা রূপ-সৌন্দর্য দেখেই নারীদের বিয়ে করো না। কারণ রূপ-সৌন্দর্য তাদের বিপদগামীও করে দিতে পারে। আর তাদের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দেখেও বিয়ে করো না কারণ, ধন-সম্পদ তাদের বিদ্রোহী ও অব্যাহত করে দিতে পারে। তোমরা বরং নারীদের ধার্মিকতা দেখে বিয়ে করো। মনে রেখো, যদি সে দীনদার না হয়, তা হলে একটি কালো দাসী অন্যদের তুলনায় উত্তম।”^{২৩} যৌতুক নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি ইসলাম নারীকে স্বামীর কাছ থেকে আর্থিক নিরাপত্তা হিসেবে (المهر) মোহরানা বা মাহর পাওয়ার অধিকার দিয়েছে। স্বামীর জন্য স্ত্রীকে দেনমোহর প্রদান বাধ্যতামূলক। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, “আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশিমনে।”^{২৪}

তৃতীয়ত, একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশনা। মহান আল্লাহ বলেন, “যদি তোমরা আশংকা করো যে, তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে পারবে না তবে একটি বিবাহ কর।”^{২৫} এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “যার দু’জন স্ত্রী রয়েছে এবং একজনকে অন্যজনের চেয়ে বেশি পছন্দ করে সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, তার অর্ধাংশ একদিকে ঝুঁকানো থাকবে।”^{২৬}

চতুর্থত, ইসলামি আইনে নারীর শারীরিক, মানসিকসহ সব নির্যাতন নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন, “তাদেরকে সঙ্কটে ফেলার জন্য কষ্ট দিয়ো না।”^{২৭}

পঞ্চমত, পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহমর্মিতার সম্পর্ক রক্ষার নির্দেশনা। মহান আল্লাহ বলেন, “আর তার নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।”^{২৮}

ষষ্ঠত, ইসলামি আইন অনুসারে স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ বা স্বামী-স্ত্রীর কারো যে কোনো শারীরিক, মানসিক কোনো অসুস্থতার কারণে দাম্পত্য জীবনে অসুবিধা দেখা দিলে সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে স্বামী ও স্ত্রীর প্রথমে নিজেদের মধ্যে সমাধানের চেষ্টা করবে। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী, “যদি কোন নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে কোন দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তাহলে তারা উভয়ে কোন মীমাংসা করলে তাদের কোন অপরাধ নেই। আর মীমাংসা কল্যাণকর।”^{২৯} স্বামী স্ত্রী নিজেদের মধ্যে সমাধান করতে ব্যর্থ হলে, আত্মীয়দের পক্ষ থেকে একজন করে বিচারক নিয়োগের মাধ্যমে দাম্পত্য সম্পর্ক স্বাভাবিক করা বা সুষ্ঠুভাবে বিচ্ছেদের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। মহান আল্লাহর বাণী, “আর যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন বিচারক পাঠাও। যদি তারা মীমাংসা চায় তাহলে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে মিল করে দেবেন।”^{৩০}

৩. **ভাই-বোন দ্বন্দ্ব** : একটা পরিবারের মধ্যে রক্ত সম্পর্কীয় আপনজনের মধ্যে ভাই-বোন হলো সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। বিভিন্ন কারণে সেই ভাই বোনের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে যায়। পরিবারের মধ্যে বাবার অবর্তমানে বোনের লালন পালন এবং উপযুক্ত পাত্র দেখে বিয়ে দেওয়া ভাইয়ের দায়িত্ব। ভাই যদি এই দায়িত্ব পালনে অনীহা দেখায় তাহলে ভাই বোনের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগতে পারে। ভাই-বোনের মাঝে দ্বন্দ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী কারণ হলো পিতা-মাতার উত্তরাধিকারী সম্পত্তির ন্যায্য অংশ প্রাপ্তিতে বৈষম্য। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পিতা-মাতার সম্পত্তি থেকে সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত হয় বোনেরা। বিভিন্ন গবেষণা ও পত্র-পত্রিকায় ভাইয়ের হাতের সম্পত্তির জন্য বোনের নির্যাতন, কারাবরণ ইত্যাদি ঘটনা লক্ষ্য করা যায়।^{৩১} ভাই-বোনের দ্বন্দ্বের মূল কারণসমূহের মধ্যে উত্তরাধিকারী সম্পত্তি বন্টন সম্পর্কে বোনদের অজ্ঞতা, ভাইদের কূটকৌশল, সামাজিক কুসংস্কার, আইন-আদালতের মাধ্যমে হয়রানী ইত্যাদি অন্যতম।^{৩২} বোনদের উত্তরাধিকারী সম্পত্তি সঠিকভাবে না দেওয়া বর্তমানে ভাই বোনদের মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রধান কারণ। ইসলাম বোনদের উত্তরাধিকারী সম্পত্তি যথাযথভাবে দেয়ার নির্দেশনা দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, “আত্মীয়স্বজনকে তার অধিকার দিয়ে দাও।”^{৩৩}

ইসলামি নির্দেশনা অনুসারে, ভাই-বোনের সাথে আদব রক্ষা করে চলার বিষয়টি পিতামাতা ও সন্তানসম্বন্ধিতর সাথে আদব রক্ষা করে চলার মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ; সুতরাং ছোট ভাইবোনের উপর আবশ্যিক হলো তার বড় ভাইবোনদের সাথে এমনভাবে আদব রক্ষা করে চলা, যেমনিভাবে তাদের উপর ওয়াজিব হলো তাদের পিতামাতার সাথে অধিকার আদায়, দায়িত্ব পালন ও আদব রক্ষা করে চলা। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “আবু রিমসাহ (রা.) হতে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে পৌছলাম অতঃপর আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তুমি তোমার মাতা ও পিতার সাথে উত্তম ব্যবহার কর; অতঃপর উত্তম ব্যবহার কর তোমার বোন ও ভাইয়ের সাথে; অতঃপর উত্তম ব্যবহার কর একে একে তোমার নিকটাত্মীয়ের সাথে।”^{৩৪}

রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়দের মাঝে ভাই-বোনের সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি। বোনদের প্রতি যত্নশীল হওয়ার বিশেষ ফজিলত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, “আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘যার তিনটি মেয়ে অথবা তিনটি বোন আছে অথবা দুটি মেয়ে অথবা দুটি বোন আছে, সে তাদের প্রতি ভালো ব্যবহার করলে এবং তাদের (অধিকার) সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করলে তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত।’”^{৩৫}

পিতার অবর্তমানে অথবা পিতার অপারগতায় ভাইদের কর্তব্য বোনদের সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় পাশে থাকা এবং প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত পাত্র দেখে বিয়ে দেওয়াও ভাইয়ের দায়িত্ব।^{৩৬} নিজে বিবাহ করার ক্ষেত্রে অবিবাহিত ছোট বোন কোনোভাবেই যেন তারা কষ্ট না পায়, সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে; বরং নিজের স্বার্থকে ত্যাগ করে হলেও বোনদের ভালো রাখার চেষ্টা করা। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে জাবির! তুমি বিয়ে করেছ কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কেমন, কুমারী না অকুমারী? আমি বললাম, না, বরং অকুমারী। তিনি বললেন, কোন কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে না কেন? সে তো তোমার সঙ্গে আমোদ-ফুঁর্তি করত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার আববা উহূদের যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেছেন। রেখে গেছেন নয়টি মেয়ে। এখন আমার নয় বোন। এ কারণে আমি তাদের সঙ্গে তাদেরই মতো একজন আনাড়ি মেয়েকে এনে একত্রিত করা পছন্দ করিনি। বরং এমন একটি মহিলাকে (পছন্দ করলাম) যে তাদের চুল আঁচড়ে দিতে পারবে এবং তাদের দেখাশোনা করতে পারবে। তিনি বললেন, ঠিক করেছে।”^{৩৭}

সর্বাবস্থায় ভাই-বোনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করবে, এমনকি বোনের অথবা ভাইয়ের পক্ষ থেকে দুর্ব্যবহার স্বত্ত্বেও সুসম্পর্ক রক্ষার চেষ্টা করতে হবে। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, “এক ব্যক্তি বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কিছু আত্মীয় আছে আমি তাদের সাথে সম্পর্ক রেখে চলি; কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি; তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। আমি তাদের সাথে সহিষ্ণু আচরণ করি; তারা আমার সাথে মূর্খের মত আচরণ করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: তুমি যেমনটি উল্লেখ করেছ যদি তুমি তেমন হও তাহলে তুমি যেন তাদের মুখে গরম ছাই ছুড়ে দিচ্ছ। তুমি যতক্ষণ এর উপর অটল থাকবে ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে তোমার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী থাকবে।”^{৩৮}

৪. বাবা-মা ও ছেলে-মেয়েদের দ্বন্দ্ব : পারিবারিক দ্বন্দ্বের মধ্যে মা-বাবা ও ছেলে মেয়ের দ্বন্দ্ব, অন্যতম একটি দ্বন্দ্ব। পিতা-মাতা যদি সন্তানের এই দায়িত্ব যথাযথ পালন না করে থাকেন অর্থাৎ সন্তানের হক আদায় করে না থাকেন তাহলে পিতামাতার সাথে সন্তানের দ্বন্দ্ব লাগার সম্ভাবনা বেশি থাকে। অথবা পিতামাতা বার্ষিক উপনীত হওয়ার পর ছেলে মেয়েরা যদি তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন অর্থাৎ তাদের হক আদায় না করে তাহলে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে যায়। অথবা পুত্রবধু কর্তৃক শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবা করতে অনীহা এবং শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সাথে খারাপ ব্যবহার করতে অথবা পিতামাতা কর্তৃক পক্ষপাতমূলক আচরণের কারণে কোন ছেলে বা মেয়েকে অতিরিক্ত সম্পদ লিখে দিলে মা-বাবা ও ছেলে-মেয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে যায়। এমনকি পিতামাতা ও সন্তানের দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে অত্যন্ত অমানবিকভাবে পিতামাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো হয়। মূলকথা হলো পিতামাতা এবং ছেলেমেয়ে উভয় যদি তাদের হকগুলো যথাযথভাবে আদায় না করে তাহলে পিতামাতা ও ছেলেমেয়ে উভয়ের সাথে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

ইসলাম পিতামাতার সাথে ছেলে-মেয়ের দ্বন্দ্ব নিরসনে নির্দেশনা দিয়েছে। প্রথমত, সর্বাবস্থায় পিতামাতার সাথে সদ্যবহার করার আদেশ। পিতা-মাতা ডাকা মাত্র সাড়া দিতে হবে। সকলের আগে তাদের কথা পালন করতে হবে। পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার করা নফল নামায, সদকা, সাওম, হজ, উমরা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার চেয়েও উত্তম। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, “আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না এবং পিতামাতার সাথে অবশ্যই ভালো ব্যবহার করবে।”^{৭৬} কেননা পিতা-মাতার সম্বন্ধিত্ব উপরই সন্তানের জন্মাত নির্ভর করে। এ সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, “আবু ওমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) সন্তানের উপর পিতামাতার অধিকার কী? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তারা তোমার জন্মাত ও জাহান্নাম।”^{৭৭}

দ্বিতীয়ত, সুস্থ অবস্থায় যেভাবে পিতা-মাতার সেবা যত্ন করবে সেভাবে অসুস্থ হলেও যত্নসহকারে সেবা-শুশ্রূষা করবে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যদি কোনো ব্যক্তি নিজের হায়াত বাড়াতে এবং জীবিকার প্রশস্ততা চায় তাহলে সে যেন নিজের পিতামাতার সাথে ভাল আচরণ করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে।”^{৭৮} এমনকি বৃদ্ধ বয়সেও পিতামাতার সেবা করতে ইসলাম সন্তানকে আদেশ করেছে। বার্ষিক মানুষকে নানাভাবে অসহায় করে তোলে। ইসলাম বার্ষিক্যের নিরাপত্তায় পিতামাতার সেবা করার নির্দেশ দিয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, “তোমার সামনে তাঁদের একজন বা উভয়ই যদি বার্ষিক্য উপনীত হন, তবে তাঁদের প্রতি উহ! কথাটিও উচ্চারণ করবে না। তাঁদের সাথে কর্কশ ভাষায় কথা বলবে না। তাঁদের সাথে নম্রভাবে কথা বলবে। তাঁদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে বিনয়ের সাথে বাহু প্রসারিত করে দাও। তাঁদের সেবায় আত্মনিয়োগ কর।”^{৭৯}

তৃতীয়ত, পিতা-মাতা দরিদ্র বা অসহায় হলে সন্তান তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, “বলুন, তোমরা যে সম্পদ ব্যয় কর, তা তোমাদের পিতা মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ব্যয় করবে।”^{৮০}

চতুর্থত, পিতামাতার উপর ইসলাম সন্তানের কিছু অধিকার নির্ধারণ করেছে। তাই পিতামাতার উচিত সন্তানের অধিকারসমূহ প্রদানে সদাসচেষ্ট থাকা। সন্তানের অধিকারসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম হলো যথাযথভাবে লালন-পালন করা। পিতামাতার উচিত সন্তানদের প্রতিটি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি

রাখা, তাদের যথাযথ পরিচর্যা করা, তাদের জন্য উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করা এবং তাদের সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ করা। কুরআনে এসেছে, “সন্তান ও জননীর ভরণ-পোষণের ভার পিতার ওপরই ন্যস্ত।”^{৪৪}

সন্তানকে নৈতিকতা ও ধর্মীয় জ্ঞানের সমন্বয়ে উত্তমরূপে শিক্ষা দেয়া এবং সম্পদে যথাযথ অংশ দেয়া পিতামাতার কর্তব্য। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “আবু রাফি (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, সন্তানদের প্রতি তাদের কোনো দায়িত্ব-কর্তব্য আছে কিনা, যেমনিভাবে আমাদের ওপর তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন- হ্যাঁ, আর তাহলো কিতাব শিক্ষা দেওয়া, সাতার শিখানো, ধনুক প্রশিক্ষণ ও যথাযথভাবে সম্পদের অংশীদার বানানো।”^{৪৫}

৫. পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব : পারিবারিক দ্বন্দের আরেকটি অন্যতম কারণ হলো পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব। পরিবারের সদস্যগণ যখন বিভিন্ন প্রয়োজনে অর্থাৎ চাকরির সুবাদে পরিবার ছেড়ে বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করে, ভাই-বোনদের বিয়ের কারণে অথবা পারিবারিক বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে ঠিকমত যোগাযোগ করতে পারে না। দীর্ঘদিন যোগাযোগ না থাকার কারণে তাদের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যায় যা পরবর্তীতে দ্বন্দের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ পরিবার থেকে দূরে যাওয়ার পর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে যোগাযোগের যে ঘাটতি হয় তার কারণে পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগতে পারে। পারিবারিক সদস্যদের মধ্যে তথা বাবা, মা, পুত্র-কন্যা, ভাই-ভাবী, বোন-বোন জামাই, চাচা-চাচী, ভতিজা, ভতিজি, ফুফু-ফুফা, চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, ফুফাতো ভাই, সৎ মা, সৎ ভাই-বোন, দাদা-দাদী, নাতি-নাতনি, শ্বশুর-শ্বশুরী, শ্যালক-শ্যালিকা, গৃহকর্মী, দেবর-ননদ ইত্যাদি রক্ত ও বৈবাহিক সম্পর্কিত আত্মীয়দের সাথে পারস্পরিক যেকোনো দ্বন্দ্বকে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বলে।

সমাজিক ও পারিবারিকভাবে বয়কট করার মাধ্যমে পরিবারের সদস্যরা সহিংসতার শিকার হয়। ইসলাম কখনো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে সমর্থন করে না। ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো মুসলমান ভাইয়ের প্রতি নির্মম হয়ে, তার প্রতি বিমুখ হয়ে তাকে বয়কট করা হারাম। কারো প্রতি যদি কোনো কারণে হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েই যায় তবে তা দমনের জন্য, রাগ প্রশমিত হওয়ার জন্য মাত্র তিনটি দিনের জন্য সময় দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “কোনো মুসলমানের জন্য তার মুসলমান ভাইকে তিন দিনের বেশি সময় বিচ্ছিন্ন রাখা বৈধ নয়।”^{৪৬}

কোন মুসলমান যদি তার কাউকে পরিত্যাগ করে তার সাথে দ্বন্দ্ব লিপ্ত হয় তাহলে তার আল্লাহর ক্ষমাদৃষ্টি ও রহমত হতে বঞ্চিত থাকার ভয় রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, “রাসূল (সা.) বলেছেন, প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার জান্নাতসমূহের দরজাসমূহ খোলা হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরিক করে না এরূপ প্রত্যেককে আল্লাহ তায়াল্লা ক্ষমা করে দেন। তবে যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে শত্রুতা আছে তাকে ক্ষমা করেন না। তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, এ দুজনের ব্যাপারটি স্থগিত রেখে দাও। যতক্ষণ না তারা পারস্পরিক সম্পর্ক পুনর্গঠিত করে নেয়।”^{৪৭}

পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য পালনে ইসলামি নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমেও পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নিরসন করা সম্ভব। ইসলামি দৃষ্টিকোণে প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, “প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল, সুতরাং প্রত্যেকে অবশ্যই তাঁর অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক জনগণের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জবাবদিহি করবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, অতএব সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীগৃহের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। গোলাম তার মনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল, সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। আমার সন্দেহ হয়, তিনি এও বলেছেন, ছেলে সন্তান তার পিতার সম্পদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। অতএব প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থের দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।”^{৪৮} এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, স্বামী তার স্ত্রীসহ পরিবারের সকল সদস্য অন্যান্যদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, বাবা তার স্ত্রী তথা সন্তানের মা এবং সন্তানের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। অতএব সকলেই সকলের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, কেননা পরকালে তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। এ পারস্পরিক দায়িত্বশীলতার আধুনিক নাম হলো পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য। এক জনে কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই অন্যের অধিকার অর্জিত হয়।

পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ ইসলামি নির্দেশনার আলোকে পর্যালোচনা

বাংলাদেশে পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে আজ অবধি এ দেশে পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন আইন, অধ্যাদেশ ও নীতি রচিত হয়েছে, সেগুলো হলো-

১. বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৮৬৯
২. বিশেষ বিবাহ আইন, ১৮৭২
৩. চুক্তি আইন, ১৮৭২
৪. সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২
৫. বিবাহিত নারীর সম্পত্তি আইন, ১৮৭৪
৬. সাবালকত্ব আইন, ১৮৭৫
৭. অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০
৮. ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮
৯. বিদেশি বিবাহ আইন, ১৯০৩
১০. দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮
১১. নৈতিকতাবিরোধী বৃত্তি দমন আইন, ১৯৩৩
১২. মুসলিম ব্যক্তিগত (শরিয়ত) প্রয়োগ আইন-১৯৩৭
১৩. মুসলিম পারিবারিক আইন (অধ্যাদেশ), ১৯৬১ (সংশোধন ১৯৮২, ১০৮৫, ১৯৮৬)
১৪. গৃহকর্মী নিবন্ধন আইন, ১৯৬১

১৫. মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (সংশোধন ২০০৫)
১৬. মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ১৯৭৫ (সংশোধন ২০০৯)
১৭. যৌতুক নিরোধ (সংশোধন) আইন, ১৯৮৪ (সংশোধন ১৯৮৬)
১৮. পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫
১৯. দণ্ডবিধি, ১৯৮৬
২০. আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০
২১. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩
২২. মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯
২৩. এসিড নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০১০
২৪. পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০
২৫. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১
২৬. ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১
২৭. জাতীয় শিশুনীতি, ২০১১
২৮. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২
২৯. শিশু আইন, ২০১৩
৩০. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩
৩১. পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩
৩২. নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩
৩৩. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭

বিভিন্ন আইন ও বিধি দ্বারা পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা প্রতিরোধে বিধান থাকলেও ‘পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০’ একটি পূর্ণাঙ্গ আইন হিসেবে প্রণীত। উল্লেখ্য যে, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০-এ ৭টি অধ্যায় ও ৩৭টি ধারা^{৩৩} রয়েছে। পারিবারিক সহিংসতা থেকে নারী ও শিশুদের রক্ষার জন্য ইতোপূর্বে সুনির্দিষ্ট তেমন কোন আইন ছিল না। ফলে প্রতিকার পাবার জন্য সহিংসতার শিকার নারীরা আইনের দারস্থ হতে পারতো না। বাংলাদেশ জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, ১৯৭৯ ও শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯ এর স্বাক্ষরকারী একটি রাষ্ট্র এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও শিশুর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে ‘পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০’ আইনটি ২০১০ সনের ৫৮ নং আইন হিসেবে জাতীয় সংসদে অনুমোদনের পর ১১ই অক্টোবর, ২০১০ (২৬শে আশ্বিন, ১৪১৭) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করায় ১২ই অক্টোবর, ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যার ৯৩৭৫ থেকে ৯৩৯০ পৃষ্ঠায় সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হয়। পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ, পারিবারিক সহিংসতা হইতে নারী ও শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।”

একই বছরের ৩০ ডিসেম্বর থেকে এই আইনটি কার্যকর হয়েছে। পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা প্রতিরোধে প্রণীত এ আইনের বিশেষ দিকগুলো ইসলামি বিধি-বিধানের আলোকে পর্যালোচনা করা হলো।

১. পারিবারিক সহিংসতার পরিচয় (ধারা-৩) : এ আইনের মাধ্যমে পারিবারিক সহিংসতাকে আইনের ধারায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। পারিবারিক নির্যাতন বলতে পারিবারিক পরিমণ্ডলে শারীরিক, মানসিক, মৌখিক, যৌন নির্যাতন ও আর্থিক ক্ষতিকে বুঝানো হয়েছে। ইসলামি আইন পারিবারিক পরিমণ্ডলে স্ত্রীর শারীরিক, মানসিক, মৌখিক, যৌন নির্যাতন, আর্থিকসহ সব নির্যাতনকে নিষিদ্ধ করেছে। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, “তাদেরকে সঙ্কটে ফেলার জন্য কষ্ট দিয়ো না।”^{৫০}

২. আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও চিকিৎসা সেবা প্রদানকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য (ধারা-৪-৯) : এ আইনে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতি কতিপয় দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। একই সাথে সহিংসতার শিকার নারীর চিকিৎসা সেবা প্রদানে হাসপাতাল, ক্লিনিক বা চিকিৎসা কেন্দ্র দায়িত্ব পালন করবে। তবে এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় স্ত্রীর চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। স্ত্রী কেন, যেকোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবা করা ইসলামে শিক্ষা। তদুপরি স্বামী হলো স্ত্রীর দায়িত্বশীল তাই স্বামীর জন্য স্ত্রীর অসুস্থতায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যিক। ইসলাম নির্দেশিত ওয়াজিব খোরপোষের অধীনে স্বামীর জন্য স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ওয়াজিব।^{৫১} ওয়াজিব না হলেও ইসলাম কখনো স্ত্রীকে অসুস্থ অবস্থায় কষ্ট দেয়াকে ইসলাম সমর্থন করে না।

৩. সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির অংশীদারী বাসগৃহে বসবাসের অধিকার (ধারা-১০) : স্ত্রীদের জন্য নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করাও ভরণ-পোষণের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই ইসলাম নির্দেশিত স্ত্রীর ভরণ-পোষণের অধিকারের মধ্যেই স্ত্রীর বাসস্থানের অধিকার রয়েছে। সুতরাং সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির অংশীদারী বাসগৃহে বসবাসের অধিকার থাকবে। এ সম্পর্কে ইসলামি বিধান হলো, “যদি কোনো ব্যক্তি পরিবারের কারো এরূপ কোনো আচরণের কারণে সংক্ষুব্ধ হয়, তা হলে অংশীদারী বাসগৃহে তার অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার স্বার্থে প্রতিপক্ষকে প্রয়োজনে বাসগৃহ থেকে সাময়িকভাবে উচ্ছেদ করা যেতে পারে কিংবা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সম্মতিতে তার জন্য অন্যত্র নিরাপদ আবাসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সত্যনিষ্ঠ খলিফাগণ ঘরে অসংযত আচরণকারীদেরকে শাস্তিস্বরূপ সাময়িকভাবে ঘর থেকে বের করে দিতেন।”^{৫২} একইভাবে কেউ যদি কারো স্ত্রী থেকে বসবাসের অধিকার হরণ করে, তাকে অপহরণের শাস্তি হিসেবে শাস্তি দেয়া হবে, “অধিকাংশ ইমামের দৃষ্টিতে ঘরে বসবাসের অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার জন্যও অপহরণের বিধান প্রযোজ্য হবে। কেননা তাঁদের দৃষ্টিতে যেহেতু স্থাবর সম্পদের বেলায়ও অপহরণ হতে পারে, তাই তার ভোগাধিকারও অপহরণ হতে পারে। অতএব কোন ব্যক্তি যদি অপরকে তার ঘরে বসবাস করতে বাধা দেয়, সে ঘরের বাসাধিকার অপহরণকারী রূপে পরিগণিত হবে। এ জন্য ঘরটি যতদিন অপহরণকারীর দখলে থাকবে, ততদিনের জন্য তাকে ঐ ঘরের ভাড়ার সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। চাই সে ঘরে নিজে বসবাস করুক কিংবা অন্যকে বসবাস করতে দিক বা খালি পড়ে থাকুক। অনুরূপভাবে যে কোন সম্পদের ভোগাধিকার থেকে কেউ কাউকে বঞ্চিত করলে সে জন্যও এ অপহরণের বিধান কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) প্রমুখের দৃষ্টিতে ঘরের বসবাসের অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার জন্য অপহরণের বিধান কার্যকর হবে না। কারণ বসবাসের অধিকার এটা সম্পদ নয়; বরং সম্পদের উপকারভোগ। অনুরূপভাবে যে কোন সম্পদের ভোগাধিকার কেউ ছিনিয়ে নিলে তার জন্য অপহরণের বিধান প্রযোজ্য হবে না। তাঁদের দৃষ্টিতে, অপহরণের বিধান কেবল সম্পদ ছিনতাইয়ের জন্য কার্যকর হবে। অতএব, কেউ কারো ঘর জোর

করে ছিনিয়ে নিলে বা কাউকে তার সম্পদের ভোগাধিকার থেকে বঞ্চিত করলে তাকে ঐ ঘর বা সম্পদ দ্বারা যে লাভ বা উপকারিতা অর্জন করা যেত তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তবে পরবর্তীকালের হানার ইমামগণ নিম্নোক্ত তিনটি ক্ষেত্রে সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ দান ওয়াজিব হবার কথা বলেছেন।”^{৫৩}

৪. পারিবারিক সহিংসতার ক্ষেত্রে আদালতে প্রতিকার পাওয়ার অধিকার (ধারা-১১) : ইসলামি দৃষ্টিকোণে প্রতিটি মানুষের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। কেউ তার এ অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। সুতরাং পারিবারিক সহিংসতার ক্ষেত্রেও আদালতের মাধ্যমে বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং রাষ্ট্রপ্রধান নাগরিকদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করবে। মহান আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা আমানত পৌঁছে দাও তার প্রাপকদের কাছে। আর যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক বিচার করবে। আল্লাহ্ যে উপদেশ তোমাদের দেন তা কত উত্তম! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব শোনে, সব দেখেন।”^{৫৪}

৫. সংক্ষুব্ধ^{৫৫} ব্যক্তির পক্ষে আদালত কর্তৃক সুরক্ষা আদেশ প্রদান (ধারা-১৪) : ইসলাম স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের অধিকার দিয়েছে। সুতরাং স্ত্রীর আবাসনসহ যেকোনো পারিবারিক নির্যাতন থেকে সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয়া স্ত্রীর ভরণ-পোষণের অধিকারের আওতাভুক্ত। এ সম্পর্কে ড. আহমদ আলী^{৫৬} বলেন, “প্রত্যেক স্বামীর কর্তব্য হলো, তার স্ত্রীর জন্য প্রচলিত নিয়মে এমন আবাসের ব্যবস্থা করা, যাতে সে নিরাপদে ও স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারে। অনুরূপভাবে অংশীদারী গৃহে ভাইবোন, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন প্রত্যেককেই অন্যের প্রতি দায়িত্বশীল ও ন্যায্যনুগ্ আচরণ করতে হবে। তাদের কারো এরূপ কোনো আচরণ করা সমাচীন নয়, যাতে ঘরের অপর কারো কোনো ধরনের অধিকার হরণ হয় কিংবা কারো নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।”^{৫৭}

৬. শারীরিক, মানসিক, আর্থিক ক্ষতির প্রেক্ষিতে ক্ষতিপূরণ আদেশ (ধারা-১৬) : ইসলামি আইনে কারো শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতিসাধন করা দণ্ডযোগ্য অপরাধ। ইসলাম শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতির বিপরীতে হুদুদ ও কিসাসের শাস্তির বিধান রেখেছে। ইসলামি আইনে অর্থদণ্ডের শাস্তি দেয়া বৈধ নয়। অধিকাংশ ইমামের মতে, তা’যীর হিসেবে কোন অপরাধের জন্য কাউকে আর্থিক দণ্ডে দণ্ডিত করা সঙ্গত নয়, এটাই হল ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর অভিমত। ইমাম শাফিঈ (রহ.) প্রথমে জায়যের মত পোষণ করলেও পরবর্তীতে সে মত থেকে ফিরে আসেন। তাঁর নতুন মত অনুযায়ী অর্থ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা জায়য নয়। হাম্বলী ইমামগণের মতে, অর্থ জরিমানা করা হারাম। অনুরূপভাবে শাস্তি হিসেবে সম্পদ বিনষ্ট করাও হারাম। তাঁদের কথা হল, এ বিষয়ে শরিয়তের নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে হানার ইমামগণের মধ্যে ইমাম আবু ইউসূফ (রহ.) ও অধিকাংশ মালিকী মতাবলম্বী ইমামের মতে, অর্থ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা জায়য, যদি তাতে কোন কল্যাণ নিহিত থাকে।^{৫৮} ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) ও ইবনুল কাইয়িম (রহ.) প্রমুখের মতে, অর্থ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা জায়য। তাঁদের কথা হলো, অরক্ষিত সম্পদ কেউ যদি চুরি করে কিংবা এ ধরনের চুরি যাতে হৃদ প্রয়োগ করা যায় না, তাতে দ্বিগুণ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা যায়।^{৫৯} এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে গাছে ঝুলন্ত ফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, “অভাবগ্রস্ত

ব্যক্তি যদি তা মুখের কাছে পেয়ে যায়, কোন উপায়ে তা ছিঁড়ে নেয়নি, তা খেলে তাতে কোন অপরাধ হবে না। আর যে তা কোন জিনিসের সাহায্যে ছিঁড়ে নিয়ে খাবে, তাকে তার দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হবে এবং তাকে শাস্তিও ভোগ করতে হবে।”^{৬০}

তাছাড়া খুলাফা রাশিদুন যাকাত অনাদায়কারীদের থেকে তাদের সম্পদের একটি অংশও জরিমানা হিসেবে নিয়ে নিতেন।^{৬১} এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, অর্থ জরিমানা করা নিষিদ্ধ নয়। সর্বোপরি সাধারণ অবস্থায় অর্থ জরিমানার শাস্তি না দেয়াই হল মূল বিধান। কারণ কারো সম্পদ তার সম্মতি কিংবা আইনসম্মত পথ ছাড়া অন্য কোনভাবে ভোগ করা কারো জন্য বৈধ নয়। তবে বিচারক প্রয়োজন মনে করলে বিশেষ কোন অপরাধের ক্ষেত্রে (যেমন চুরি, যাকাত দান থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি) অর্থ জরিমানা প্রদান করতে পারে। তবে সরকার সে অর্থ রাজকোষে জমা করতে পারবে না এবং কোন সম্পদশালীকেও দিতে পারবে না; বরং তা অভাবীদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া যেতে পারে কিংবা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭. পারিবারিক সহিংসতার আবেদন, বিচার, আপিল, নিষ্পত্তি ইত্যাদির বিধান (ধারা-২০-২৮) : উক্ত আইনের ধারার মাধ্যমে বিচার প্রাপ্তিতে অযথা কালক্ষেপণ না করার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। ইসলামও সকল ক্ষেত্রে বিচার প্রাপ্তিতে কালক্ষেপণ করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এমনকি ইসলাম সহিংসতার আবেদন, বিচার, আপিল, নিষ্পত্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্ব ও সুপারিশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যার সুপারিশের কারণে আল্লাহর কোন হদ কায়িম বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, সে অবশ্যই আল্লাহর সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছে।”^{৬২}

৮. নিভৃত কক্ষে বিচার প্রাপ্তির অধিকার (ধারা- ২৩) : ইসলাম অন্যের দোষ প্রচার করার চাইতে গোপন রাখতেই উৎসাহিত করে; যদি তা সমাজ বিশৃংখলামূলক কোনো ঘটনা না হয়। পারিবারিক সহিংসতার ক্ষেত্রে স্বামী, স্ত্রী এবং পরিবারের অন্যান্যদের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার অবতারণা হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীরা এ বিষয়ে প্রকাশ্যে বিচার লাভে ইতস্তত বোধ করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা লজ্জায় সঠিক তথ্য উপস্থাপন থেকে বিরত থাকে। সুতরাং পারস্পরিক দোষ-ত্রুটি যথাসম্ভব গোপন রেখে বিচার মীমাংসার সুবিধার্থে নিভৃত কক্ষে বিচারের ব্যবস্থাকে ইসলামি আইন সমর্থন করে। কেননা নিভৃত কক্ষে বিচারের ফলে বাদি-বিবাদি ও কাজী ব্যতীত অন্য কেউ এ সম্পর্কে জানার সুযোগ থাকবে না, ফলে পারস্পরিক দোষত্রুটি যথাসম্ভব গোপন থাকবে। এ সম্পর্কে ইসলামি বিধান হলো, “যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন।”^{৬৩}

৯. সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সুরক্ষার আদেশ লঙ্ঘনের শাস্তি (ধারা-৩০) : এ আইনের অধীনে কোনো ব্যক্তির সুরক্ষার আদেশ দিলে, সে আদেশ মান্য করতে হবে; নতুবা তাকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। ইসলামি আইনেও সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সুরক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। ইসলামি আইনানুসারে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনে নিরাপত্তা-সঙ্গিনীরও ব্যবস্থা করা স্বামীর জন্য কর্তব্য। এ সম্পর্কে যাইনুদ্দীন ইবনু নুজাইম^{৬৪} বলেন, “যদি স্ত্রী নিজের জান-মালের ব্যাপারে আশঙ্কা বোধ করে, তা হলে তার জন্য নিরাপত্তা-সঙ্গিনীর ব্যবস্থা করা ওয়াজিব হবে।”^{৬৫}

১০. মিথ্যা আবেদনের প্রেক্ষিতে কারাদণ্ডের বিধান (ধারা-৩২) : ইসলামি আইন অনুসারে, মিথ্যা মামলার শাস্তির বিধান বিবাদির অবস্থা, মামলার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনায় বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যথা-

১. যদি অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি কুখ্যাত অপরাধী বা সন্ত্রাসী হয়, তাহলে যেসব অপরাধ সচরাচর প্রমাণ করা কষ্টসাধ্য (যেমন চুরি, ডাকাতি, হত্যা, ছিনতাই, অপহরণ প্রভৃতি) সে সবেমাত্র তাকে নিছক অভিযোগের ভিত্তিতে স্বীকারোক্তি লাভের উদ্দেশ্যে প্রহার করাও যেতে পারে,^{৬৬} বন্দী করেও রাখা যেতে পারে।^{৬৭}

২. যদি অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে জনসমাজে সুখ্যাত হয়, তা হলে তাকে কোনভাবে নিছক অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোন রূপ শাস্তি দেয়া যাবে না; বরং অভিযোগকারী যদি অভিযোগ প্রমাণিত করতে না পারে, তাকেই শাস্তি দেয়া হবে। যাতে কোন অসৎ ব্যক্তি পবিত্র চরিত্রের লোকদের মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে ছিনমিনি খেলতে না পারে।^{৬৮}

৩. যদি অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি সৎ কি অসৎ জানা না যায়, তা হলে তাকে বন্দী করে রাখা যাবে, যতক্ষণ না তার অবস্থা স্পষ্ট হবে।^{৬৯}

৪. যদি অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি সৎ কি না জানা নাই, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় করানোর জন্য দুজন সাধারণ লোক কিংবা একজন ন্যায়বান লোকের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তবে কুখ্যাত অপরাধী ও সন্ত্রাসীর ক্ষেত্রে বিচারক কিংবা শাসকের অবগতিই যথেষ্ট।^{৭০}

৫. যে ব্যক্তি উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাউকে হয়রানি কিংবা অপমানিত করার জন্য কোন মামলা দায়ের করে এবং বিচারকের কাছে যদি প্রমাণিত হয় যে, বাদি অসৎ উদ্দেশ্যে মামলা দায়ের করেছে, তাহলে বিচারক তাকে নীতি শিক্ষাদানমূলক যে কোন শাস্তি দান করবেন। আর এ ধরনের শাস্তিসমূহের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ের শাস্তি হল কারাদণ্ড। এ ধরনের শাস্তির কারণ হল, যাতে সমাজে অসৎ ও মতলববাজ লোকদের এ ধরনের মামলা দায়েরের প্রবণতা বেড়ে না যায়।^{৭১}

সুপারিশমালা

পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় যুগ যুগ ধরে চলমান। বিভিন্ন যুগে, ধর্ম ও সভ্যতায় পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা প্রতিরোধে সামাজিক সংস্কৃতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং আইনি বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা কমানো সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশে প্রচলিত ‘পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০’ ইসলামি দৃষ্টিকোণে মূল্যায়ন প্রেক্ষাপটে পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা প্রতিরোধে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হলো-

১. ইসলাম নির্দেশিত পারিবারিক বিধি-বিধান মেনে চলা।
২. ইসলাম প্রদর্শিত পারস্পরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় কর্তব্য পালনে যত্নশীল হওয়া।
৩. পরিবারের কেউ সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত থাকলে তাকে এর ক্ষতিকর প্রভাব ও শাস্তি সম্পর্কে বুঝিয়ে সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ।
৪. পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার শাস্তি সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করা

৫. পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার প্রতিরোধে ইসলামি বিধি-বিধানের আলোকে প্রচলিত আইনের সংস্কার।
৬. পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার প্রতিরোধে প্রচলিত আইনের কঠোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
৭. পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার প্রতিরোধে সহজলভ্য আইনি সহায়তা ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান।
৮. পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার প্রতিরোধ সম্পর্কিত বিষয়াদি সরকারী ও বেসরকারী প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৯. সরকারি ইসলামি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার প্রতিরোধে ইসলামি নির্দেশনা তুলে ধরে পর্যাপ্ত বই-পুস্তক, বুকলেট, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা করা।

উপসংহার

পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ এ উল্লিখিত বিষয়াদি কুরআন ও হাদিসের আলোকে পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীতি হতে পেরেছি যে, পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার প্রতিরোধ ও সুরক্ষা সংক্রান্ত এ আইনের অধিকাংশ ধারায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়াদির আলোচনা রয়েছে, কারণ পারিবারিক সহিংসতার সবচেয়ে বেশি শিকার হলো নারী ও শিশু। উল্লিখিত আইনের সাথে ইসলামি নির্দেশনার পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, এ আইনের সবগুলো ধারার সাথে ইসলামের সমর্থন রয়েছে। তদুপরি, ইসলাম পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে স্বতন্ত্র কৌশল নির্দেশ করেছে। পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ সম্পর্কিত ইসলাম নির্দেশিত বিষয়াদির বাস্তবায়ন পারিবারিক পরিমণ্ডলে সৃষ্ট সকল ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধ করতে পারবে। ইসলাম পারিবারিক পরিমণ্ডলে নারী অধিকার রক্ষা ও বৈষম্য নিরসনে পুরুষের উপরই প্রধান দায়িত্ব অর্পন করেছে, এজন্য এ গবেষণার সুপারিশ হবে- ইসলাম নির্দেশিত ক্ষমতাবলে একজন পুরুষ পরিবারের কর্তা হিসেবে নারী অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট থাকবে। এছাড়াও পরিবারের অন্যান্য সদস্য তথা ভাই-ভাই দ্বন্দ্ব, ভাই-বোন দ্বন্দ্ব, পিতা-মাতা ও সন্তানের সাথে দ্বন্দ্ব, শ্বশুর-শ্বশুরির সাথে দ্বন্দ্ব থেকে সৃষ্ট সহিংসতা প্রতিরোধে উল্লিখিত আইনে কোনো নির্দেশনা নেই; তাই উল্লিখিত আইনের সংশোধন, আইনের কঠোর বাস্তবায়নের পাশাপাশি সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম জনগোষ্ঠীর জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ইসলামি নির্দেশনার আলোকে পারিবারিক ব্যবস্থা পরিচালনার মাধ্যমে পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা সম্ভব।

তথ্যসূত্র

- ১ সম্পাদনা পরিষদ, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১২), পৃ. ৬৩১
- ২ সম্পাদনা পরিষদ, *স্থানীয় পর্যায়ে দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মশালা* (ঢাকা: এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন, ২০২১), পৃ. ১
- ৩ Lewis A. Coser, *The functions of social conflict* (Illinois: The Free Press, 1956), Vol. 9, p. 8

- ৪ Elena Marta & Sara Alfieri, 'Family Conflicts' in Alex C. Michalos (eds) "Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research" (Springer Dordrecht, 2014), p. 2164, https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_997, Search on date : 20-08-2023
- ৫ ড. আসান হাবীব, পরিবার ও বিবাহের সমাজ বিজ্ঞান (ঢাকা : গ্রন্থকুটির, ২০২০), পৃ. ৮৫
- ৬ সম্পাদনা পরিষদ, স্থানীয় পর্যায়ে দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মশালা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১
- ৭ Tony Wragg, *Nutshells: Family Law* (London : Sweet & Maxwell, 2010), p. 62
- ৮ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ (ঢাকা : আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, (২০১০ সনের ৫৮ নং আইন), ৩০ ডিসেম্বর, ২০১০), ধারা নং : ৩
- ৯ 'বাবার সম্পত্তি নিয়ে দ্বন্দ্ব ভাইয়ের হাতে ভাই খুন', "ঢাকা পোস্ট", ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, <https://www.dhakapost.com/country/171366>, সংগ্রহের তারিখ, ২০-০৮-২০২৩
- ১০ 'পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে দ্বন্দ্ব: চাচাতো ভাইকে কুপিয়ে খুন', "জাগো নিউজ", <https://www.jagonews24.com/national/news/844760>, সংগ্রহের তারিখ, ২০-০৮-২০২৩
- ১১ 'সম্পত্তি নিয়ে দ্বন্দ্ব, জামাইয়ের বিরুদ্ধে শ্বশুরকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগে মামলা', "প্রথম আলো", ১ মে ২০২২, অনলাইন ভার্সন, সংগ্রহের তারিখ, ২০-০৮-২০২৩
- ১২ 'উঠানে বাবার লাশ রেখেই সম্পত্তি নিয়ে দ্বন্দ্ব ৫ সন্তানের', "যুগান্তর", ৭ জুলাই ২০২১, অনলাইন ভার্সন, সংগ্রহের তারিখ, ২০-০৮-২০২৩
- ১৩ বুলবুল চৌধুরী, 'জমি নিয়ে দ্বন্দ্ব, চাচার অস্ত্রের আঘাতে নিহত ভতিজা', "নিউজ বাংলা ২৪" ঢাকা ২ অক্টোবর, ২০২২, <https://www.newsbangla24.com/news/208400/Nephew-killed-by-uncles-weapon-in-conflict-over-land>, সংগ্রহের তারিখ, ২০-০৮-২০২৩
- ১৪ 'সম্পত্তি নিয়ে দ্বন্দ্ব নিজের গুলি দিয়ে মাকে খুন করে পালাল পাশও ছেলে', "মহানগর নিউজ" ১৬ আগস্ট, ২০২২, <https://www.mohanagar.news/greater-chattogram/news/16714>, সংগ্রহের তারিখ, ২০-০৮-২০২৩
- ১৫ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (আল কুরআন, ৪ : ৭)
- ১৬ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ قَاتُوهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ شَيْءٍ شَهِيدًا (আল কুরআন, ৪ : ৩৩)
- ১৭ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْتَى فَلَمْ يَنْدُهَا، وَلَمْ يَهْنُهَا، وَلَمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْتَى فَلَمْ يَنْدُهَا، وَلَمْ يَهْنُهَا، وَلَمْ يَغْنِي الذُّكُورَ - أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ . (আবু দাউদ সূলায়মান বিন আশআস বিন ইসহাক আসসিজিস্তানী, *আস সুনান* (বৈরুত : মাকতাবা আসরীয়াহ, তা.বি.), খ. ৪, পৃ. ৩৩৭, হাদিস নং : ৫১৪৬)
- ১৮ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (আল কুরআন, ২ : ১৮৮)
- ১৯ নারী ও কন্যা নির্যাতন বিষয়ক তথ্য (জুলাই, ২০২৩) (ঢাকা : লিগ্যাল এইড উপ-পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, আগস্ট ২০২৩), পৃ. ১
- ২০ আরবি 'নাফকা' শব্দের বহুবচন হলো نفقات। এর আভিধানিক অর্থ- الزاد তথা পাথেয়। অর্থাৎ দিরহাম বা অন্য যা কিছু খরচ করা হয়। পরিবারভুক্ত ব্যক্তিবর্গের জন্য যা ব্যয় করা হয়। ইবন 'আবিদীন, মুহাম্মদ আমীন, *হাশিয়াতু আলাদ দুররিল মুখতার শারহি তানবীকুল আবছার* (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৩২৮ হি.), খ. ১, পৃ. ৬২৮। নাফাকার পারিভাষিক সংজ্ঞায়নে শরহে বেকায়া ব্যাখ্যাকার বলেন, ما يفرض للمرأة على زوجها من طعام وكسوة وسكني "নাফকা বলা হয় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান প্রদান করা, যা স্ত্রীর জন্য স্বামীর উপর আবশ্যিক।" বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আলিমুজ্জামান বলেন, ভরণ-পোষণ বলতে খাদ্য, বস্ত্র ও বসবাসের

সংস্থানকে বুঝায়। [আলিমুজ্জামান চৌধুরী, ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স ও মুসলিম আইন (ঢাকা : কুমিল্লা ল' বুক হাউজ, ২০০৫), পৃ. ৩৯৪]

২১. لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ. (আল কুরআন, ৬৫ : ৭)
২২. وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا فَقْرًا [সুলায়মান বিন আহমদ বিন আইয়্যাব বিন মুত্তির আবুল কাশেম আত তাবারানী, আল-মুজামুল আওসাত (কায়রো : দারুল হারামাইন, ১৪১৫ হি), খ. ৩, পৃ. ২১, হাদিস নং : ২৩৪২]
২৩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُزِدِيَهُنَّ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُظْغِيَهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، [আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান (মিসর : দারুল ইহয়াউ কুতুবুল আরাবীয়া, তা.বি), খ. ১, পৃ. ৫৯৭, হাদিস নং : ১৮৫৯]
২৪. وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. (আল কুরআন, ৪ : ৪)
২৫. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. (আল কুরআন, ৪ : ৩)
২৬. مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِأَحَدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدٌ شَقِيهٌ مَائِلٌ. [আবু আব্দুর রাহমান আহমদ বিন শুআইব আন নাসায়ী, আস সুনান (হালব : মাকতাবাতু মাতবাতু আল ইসলামিয়াহ, ১৪০৬ হি.), খ. ৭, পৃ. ৬৩, হাদিস নং : ৩৯৪২]
২৭. وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ. (আল কুরআন, ৬৫ : ৬)
২৮. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (আল কুরআন, ৩০ : ২১)
২৯. وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا يُتْرَكُ أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. (আল কুরআন, ৪ : ১২৮)
৩০. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. (আল কুরআন, ৪ : ৩৫)
৩১. 'সম্পত্তি নিয়ে দ্বন্দ্ব, ৫ নারীকে বিনা ওয়ারেন্টে ধরে নিয়ে গেল পুলিশ', “আলোকিত প্রতিদিন”, ১২ জানুয়ারি ২০২৩, অনলাইন ভার্সন, সংগ্রহের তারিখ, ২০-০৮-২০২৩
৩২. তানজিম আল ইসলাম, 'সম্পত্তি নিয়ে ভাই-বোনের বিরোধ', “প্রথম আলো”, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭, অনলাইন ভার্সন, সংগ্রহের তারিখ, ২০-০৮-২০২৩
৩৩. وَاتِذَا الْقَرْبَىٰ حَقَّهُ (আল কুরআন, ১৭ : ২৬)
৩৪. عَنْ أَبِي رَمْثَةَ، قَالَ: انْتَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «بَرِّ أَمْلَكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَمِنْهَا آلَاكَ» [আবু আব্দুল্লাহ হাকেম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ, আল মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন (বেরুত : দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, ১৪১১ হি.), খ. ৪, পৃ. ১৬৭, হাদিস নং : ৭২৪৫]
৩৫. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللَّهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ [আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা আত তিরমিযি, আস সুনান (মিশর : শিরকাতু মাকতাবাতু মাতবাতু মুসতফা আল বালী আল হালী, ১৩৯৫৪ হি.), খ. ৪, পৃ. ৩২০, হাদিস নং : ১৯১৬]
৩৬. আবু আব্দুল-হ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী, আস সহীহ (মিশর : দারুল তাওকুন নাজাত, ১৪২২ হি.), খ. ৭, পৃ. ১৬, হাদিস : ৫১৩০
৩৭. عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ فَلْتُ نَعَمْ قَالَ مَاذَا أَبْكُرَا أَمْ تَبْكِبَا فَلْتُ لَا بَلْ تَبْكِبَا قَالَ فَهَلَا جَارِيَةً تُلَاعِبُكَ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي قَتَلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ كُنَّ لِي تِسْعَ أَخَوَاتٍ

- ইমাম (ইমাম) .فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةَ خَزَقَاءَ مِثْلَهُنَّ وَلَكِنْ امْرَأَةً تَمْسُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَصَبْتُ
 ৩৮ عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصْلَهُمْ وَيَقْطَعُونِي وَأَحْسِنَ إِلَيْهِمْ وَيُسَيِّئُونَ إِلَيَّ
 وَأَخْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ . فَقَالَ " لَيْسَ كُنْتُ كَمَا قُلْتَ فَكَانَمَا تُسْفَهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ
 (ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন নিশাপুরী আল কুসাইরী, আস সহীহ
 (বৈরুত : দারু এহয়া তুরাসুল আরবী, তা.বি.), খ. ৪, পৃ. ১৯৮২, হাদিস নং : ২২/২৫৫৮)
- ৩৯ (আল কুরআন, ২ : ৮৩) لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا .
- ৪০ (ইমাম) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَيَّ وَلَدَيْهِمَا؟ قَالَ: هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ .
 ইবনে মাজাহ, পূর্বোক্ত, খ. ২, পৃ. ১২০৮, হাদিস নং : ৩৬৬২)
- ৪১ [আবু আব্দুল্লাহ আহমদ আবু আব্দুল্লাহ আহমদ] مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمُدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ، وَأَنْ يَزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، فَلْيَبْتَزْ وَلَدَيْهِ، وَلْيَصِلْ رَحْمَهُ .
 বিন হাঞ্চল বিন হেলাল বিন আসাদ শায়বানী, আল মুসনাদ (বৈরুত : মুআসাসাতুর রিসালা, ১২৪১ হি), খ. ২১,
 পৃ. ৯৩, হাদিস নং : ১৩৪০১]
- ৪২ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا .
 (আল কুরআন, ১৭ : ২৩-২৪) وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ .
- ৪৩ (আল কুরআন, ২ : ২১৫) مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ .
- ৪৪ (আল কুরআন, ২ : ২৩৩) وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
- ৪৫ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِلْوَلَدُ عَلَيْنَا حَقٌّ كَحَقِّنَا عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ .
 [আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী বিন মূসা
 বায়হাকী, সুনাযুল কুবরা (বৈরুত : দারু কুতুবুল ইলমিয়াহ, ১৪২৪ হি), খ. ১০, পৃ. ২৬, হাদিস নং ১৯৭৪২]
- ৪৬ (ইমাম বুখারী, পূর্বোক্ত, খ. ৮, পৃ. ২০, হাদিস নং :
 ৬০৭৩) لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ .
- ৪৭ تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ
 وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحَاءَةٌ، فَيَقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَضْطَلِّخَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَضْطَلِّخَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى
 يَضْطَلِّخَا (ইমাম মুসলিম, পূর্বোক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৯৮৭, হাদিস নং : ২৫৬৫/৩৫)
- ৪৮ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،
 وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ رَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
 . قَالَ: - وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ - . وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .
 (ইমাম বুখারী, পূর্বোক্ত, খ. ২, পৃ. ৫, হাদিস নং : ৮৯৩)
- ৪৯ ধারা অর্থ আইনের বিধি (Section)। [ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক
 বাংলা অভিধান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১২), পৃ. ১৬৪৫] প্রায়োগিক অর্থে ধারা বলতে কোনো আইনের
 নির্ধারিত বিধান বর্ণিত হয়েছে এবং প্রধান অংশসমূহ, অনেক সময় ধারার অধীনে ব্যাখ্যামূলক উপধারাও
 (Subsection) থাকে।
- ৫০ (আল কুরআন, ৬৫ : ৬) وَلَا تُضَارُّوهُمْ لِنَصْرِيفٍ عَلَيْهِمْ .
- ৫১ সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী ফিকহ বিশ্লেষণ-২ (ইসলামের পারিবারিক আইন, দ্বিতীয় খণ্ড) (ঢাকা : বাংলাদেশ
 ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৬), পৃ. ১২৬
- ৫২ ড. আহমদ আলী, ইসলামের আলোকে বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ
 এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৫), পৃ. ৪৫
- ৫৩ ইবনু আবিদীন, পূর্বোক্ত, খ. ৬, পৃ. ২০৬-৭

- ৫৪ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ
- (আল কুরআন, ৪ : ৫৮) بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
- ৫৫ সংস্কৃদ্ধ অর্থ অতিশয় স্কৃদ্ধ হয়েছে এমন। [ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯৯] এখানে
সংস্কৃদ্ধ দ্বারা বুঝানো হয়েছে নির্ধারিত শিকার ব্যক্তি।
- ৫৬ ড. আহমদ আলী ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগে
অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত আছেন। ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে তাঁর ত্রিশটি গ্রন্থ প্রকাশিত
হয়েছে। বিশেষত তার ‘ইসলামের শান্তি আইন’ ও ‘ইসলামের আলোকে বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা’ বাংলা
ভাষায় ফিকহ চর্চায় এক অনন্য উদাহরণ।
- ৫৭ ড. আহমদ আলী, ইসলামের আলোকে বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা, পূর্বোক্ত, ৪৫
- ৫৮ মুহাম্মদ আমীন ইবনু আবদীদীন, রাদ্দুল মুহতার (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ তাবি), খ. ৪, পৃ. ৬১
- ৫৯ ইবনে তাইমিয়াহ, আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ তাবি), খ. ৪, পৃ. ২১১-
২১২
- ৬০ مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ حُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلُهُ
- (ইমাম আবু দাউদ, পূর্বোক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩৭, হাদিস নং : ৪৩৯০)
- ৬১ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবু বকর বিন আইয়ুব বিন সাদ শামসুদ্দীন ইবনুল কাইয়িম জাওযিয়া, আত-
তুলাকুল হকমিয়াহ (দামেশক : মাকতাবাতু দারিল বয়ান, তাবি), পৃ. ২২৭
- ৬২ مَنْ خَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ (ইমাম আবু দাউদ, পূর্বোক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩০৫,
হাদিস নং : ৩৫৯৭)
- ৬৩ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (ইমাম বুখারী, পূর্বোক্ত, খ. ৩, পৃ. ১২৮, হাদিস নং : ২৪৪২)
- ৬৪ ইমাম যাইনুদ্দীন ইবনু ইবরাহীম ইবনু নুজাইম (মৃত্যু ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে) হানাফি ফিকহের একজন প্রখ্যাত
ফকিহ। তিনি হানাফী ফিকহের বিশ্বে বখ্যাত গ্রন্থ ‘আল-বাহরুর রায়িক’ রচনা করেন।
- ৬৫ যাইনুদ্দীন ইবনু নুজাইম, আল-বাহরুর রায়িক (বৈরুত : দারুল ফিকর, তা.বি), খ. ৪, পৃ. ২১১
- ৬৬ সম্পাদনা পরিষদ, আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়া (কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়া আল-শুয়ুন আল
ইসলামিয়াহ, ১৯৯৫), খ. ১৬, পৃ. ৯২
- ৬৭ কামাল উদ্দীন ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কদীর শারহুল হিদায়া (বৈরুত : দারুল ফিকর, তাবি), খ. ৫, পৃ. ৩৫২
- ৬৮ ড. আহমদ আলী, ইসলামের শান্তি আইন (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯), পৃ. ৩২৭-৩২৮
- ৬৯ ড. আহমদ আলী, ইসলামের শান্তি আইন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৮
- ৭০ সম্পাদনা পরিষদ, আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়া (কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়া আল-শুয়ুন আল
ইসলামিয়াহ, ১৯৯৫), খ. ১৪, পৃ. ৯৫
- ৭১ ইব্রাহীম ইবনু ফারহন, তাবহিরাতুল হকাম (বৈরুত : দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ তাবি), খ. ২, পৃ. ৩০০

সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে মুসলমানি নাগরী লিপির প্রভাব : পরিপ্রেক্ষিত বৃহত্তর সিলেট জেলা

মোহাম্মদ ওমর ফারুক*
ফাতেহা বেগম**

Abstract

Sylheti Nagri script is a language and script with completely unique characteristics. Although it was lost in the course of time, its influence in the social system of that time was not reduced in any way. The Nagri script was a unique symbol of the individual and cultural independence of Muslim community of Sylhet. This script was not only a script but it was a consciousness or a culture. Infact Sylheti Nagri script is the name of simple bangali script based on Muslim tradition. The Muslim community of Sylhet is mainly the inventor, nurturer and patron of this urban script.

চাবিশব্দ: সিলেট, মুসলমান, নাগরী, লিপি, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি

ভূমিকা

১৩০৩ সালে হযরত শাহজালাল ইয়ামনী (র.) এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী সিলেট জয় করেন। ফলে সিলেটে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা অর্জিত হয়। তখন স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষা ছিল দেবনাগরীজাত সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার মিশ্রণ। আবার বিজয়ী মুসলিমগণের ভাষা ছিল আরবি ও ফার্সি মিশ্রিত। ফলে স্থানীয় সংস্কৃতির প্রভাব বলয় থেকে বেরিয়ে একটি নতুন সাংস্কৃতিক ধারার সূচনা তখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। যার তাৎক্ষণিক ফল ছিল সিলেটি মুসলমানি নাগরী লিপির উৎপত্তি। হযরত শাহজালাল (র.) ও ৩৬০ আউলিয়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে এই লিপি সিলেটের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক অভূতপূর্ব নবজাগরণ বা রেনেসাঁর সূত্রপাত ঘটায়। এই লিপি উদ্ভবের ফলে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে গঠনমূলক ও ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। ধর্মপ্রচার, সাহিত্যচর্চা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সিলেটি কথ্যবুলি এবং নাগরী লিপি ছিল মুসলমানদের প্রধান বাহন। এমনকি ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে মুদ্রায় নাগরী লিপির অস্তিত্বের পাশাপাশি রাজনৈতিক অঙ্গনেও এর প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাই নাগরী লিপি ছিল সিলেটের মুসলিম সমাজের স্বতন্ত্র ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার অনন্য নিদর্শন। এই লিপি কেবল একটি লিপিই ছিলনা বরং তা ছিল একটি চেতনা বা কালচার। আলোচ্য প্রবন্ধে সিলেটে মুসলমানি নাগরী লিপির উৎপত্তি এবং সমকালীন সমাজ ও সংস্কৃতিতে এর প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব।

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

** লেখক ও গবেষক

নাগরী লিপির পরিচয়

চতুর্দশ শতকে সিলেটে মুসলমানগণ কর্তৃক ‘নাগরী ভাষা’ নামে একটি উপভাষা জন্ম নেয়। এ ভাষা লিখন পদ্ধতি, বর্ণমালা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ ছিল। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম ঐতিহ্য নির্ভর সহজ বাংলা লিপির নামই সিলেটি লিপি। হযরত শাহজালাল (র.) ও ৩৬০ আউলিয়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের ফলে এই লিপির উদ্ভব ও প্রচলন হওয়ায় কেউ কেউ এটাকে ‘জালালাবাদী লিপি’ হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন। এটি মূলত কথ্য ভাষা ছিল। স্থানীয় লোকজনের কথ্য বুলির সাথে বিজয়ী জনগোষ্ঠীর ভাষা আরবি- ফার্সির সমন্বয় ঘটিয়েই এই ভাষার উৎপত্তি। তবে মুসলিম ঐতিহ্য নির্ভর এই লিপি স্থানীয় দেবনাগরী লিপির প্যারালাল হিসেবে ‘মুসলমানি নাগরী’ তথা ‘সিলেটি নাগরী’ নামে সমধিক পরিচিত।^১ সিলেটের মুসলিম সমাজ প্রধানত এই নাগরী লিপির উদ্ভাবক, লালনকারী ও পৃষ্ঠপোষক।

বর্ণপরিচয় ও অন্যান্য ভাষার প্রভাব: আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ভাষা যুক্তক্ষর বর্জিত। সিলেটি নাগরীতে ও যুক্তক্ষর নাই। অক্ষর সংখ্যা ৩২, স্বর চিহ্ন ৫টি।^২ উদাহরণস্বরূপ-

সিলেটি নাগরীবর্ণ	বাংলা বর্ণ
↗	আ
ছ	ই
ত	উ
ঢ	এ
×	অ

মুসলমানগণ কর্তৃক সিলেট বিজয়ের সাথে সিলেটের আঞ্চলিক ভাষার উপর আরবি ও ফার্সি ভাষার প্রভাব পড়তে শুরু করে। হিন্দুয়ানী অনেক শব্দের মুসলিম রূপান্তর হয়। যেমন ‘জল’ মুসলমানদের কাছে ‘পানি’ এবং ‘লান’ গোসল হয়ে গেল। অযু, নামায, রোযা, সালাত, হালাল, হারাম, যিয়ারত, প্রভৃতি অসংখ্য আরবি/ফার্সি শব্দ বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে থাকে। নাগরী ভাষা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড.এস. এম. গোলাম কাদির লিখেছেন-“সিলেটি নাগরীর বর্ণ বাছাই ও বিন্যাসে আরবি বর্ণমালার বিন্যাসিক অবস্থান ও উচ্চারণগত প্রভাব পড়েছে প্রচুর। সিলেটি উপভাষার উচ্চারণ স্বাতন্ত্র্য নির্মাণ করেছে মূলত ফার্সি (উর্দু) প্রভাব। সিলেটি উপভাষার উচ্চারণ তথা সিলেটি নাগরী লিপি ও উচ্চারণ বিশ্লেষণে ফার্সি (উর্দু) উচ্চারণ প্রভাবকেও তাই আরবি বর্ণমালা দ্বারা প্রকাশ ভিন্ন বিকল্প নাই”।^৩ নাগরী পুঁথির শ্রেষ্ঠ সংগ্রাহক ও গবেষক কবি মোহাম্মদ সাদিকের ভাষ্য মতে “সিলেটি লিপিতে রচিত পাণ্ডুলিপির অবয়বে সেমেটিক প্রভাবের দিকটি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। অর্থাৎ সিলেটি লিপির কিছু কিছু নমুনায় লিপিকারগণ আরবি ও ফার্সি ক্যালিগ্রাফির নিকটবর্তী থাকার প্রয়াস পেয়েছেন। উৎস বিচারের ক্ষেত্রে এ লিপির স্টাইল ও স্ট্রোক বিচারের বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য”^৪।

সিলেটি নাগরী হরফ ‘ط’ আরবি ‘ط’ এর মত। কেবল মাত্রা যোগ করতে হয়। এ ছাড়া নাগরী, X, Y, O আরবি و, ا ও আরবি যতিচিহ্ন ‘ ة ’ এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অনুরূপ সিলেটি নাগরীর নিজস্ব

হরফ ‘ ʼ (আ), ‘ ʼ (র), ‘ ʼ (ল) প্রভৃতি আরবি যযম এর সাথে মাত্রা যোগ করে লিখতে হয়। এসব কারণেও সিলেটি নাগরী লিপি মুসলমানি নাগরী বলে চিহ্নিত।

সিলেটি নাগরী লিপি প্রবর্তনে আরবি ও ফার্সি ভাষা মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করলেও ভারত উপমহাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষা, যেমন— কাইথি, দেবনাগরী, আফগান ও পূর্ব ভারতীয় বাংলা লিপির প্রভাব নেহায়েত কম ছিল না। উল্লেখ্য যে, সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে মূল “নাগরী” লিপির জন্ম। এই নাগরী থেকে জন্ম লাভ করে দেবনাগরী, কাইথী ও গুজরাটি লিপি। ব্রাহ্মণ রাজপুতেরাই এর স্রষ্টা। এসব ভাষা ছিল হিন্দু ধর্ম ঐতিহ্য নির্ভর।^৭ ভারতে মুসলমানদের আগমনের ফলে ব্যাপক সংখ্যক স্থানীয় জনগোষ্ঠী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু এসব ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মাতৃভাষা পরিবর্তন হয়নি। আবার নবাগত মুসলমানদের ভাষার সাথেও তাদের একটি সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ফলে তাদের প্রচেষ্টায় স্থানীয় এবং প্রচলিত ভাষার কিছু বর্ণও সিলেটি নাগরী লিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে আরবি, ফার্সি, বাংলা, কাইথি, দেবনাগরী, আফগানী প্রভৃতি ভাষার লিপি থেকে কিছু কিছু হরফের নমুনা সংগ্রহ করে সিলেটি নাগরী স্বকীয় বৈশিষ্ট্য মন্ডিত নিজস্ব একটি লিপিমাল্য সৃষ্টি করে, যা এই ভাষাকে গতিশীল ও প্রাণান্ত করে তোলে। সিলেটি কথ্য নির্ভর এই লিপি গণশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই ভাষা সহজে আয়ত্ত্ব করা যেত, কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন হতো না। ফলে ধীরে ধীরে তা এতদঞ্চলের সব শ্রেণির জনগোষ্ঠীর কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

নাগরী লিপির উদ্ভব

হযরত শাহজালাল ইয়ামনী (র.) ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে সিলেট বিজয় করার পর সেখানেই আমৃত্যু বসবাস করেন। কসবে সিলেটেই গড়ে ওঠে তাঁর খানকা ও লঙ্গরখানা। এই খানকাই ছিল তৎকালীন এ অঞ্চলের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র। এখানে দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করা হত। খানকার আশ-পাশের লঙ্গরখানায় খাবারের সময় ঢাক ডোল পিটিয়ে সংশ্লিষ্টদের জানান দেয়া হলে অনেক লোক খাবার গ্রহণ করত। পাশাপাশি তাদেরকে গণশিক্ষার আওতায় আনারও ব্যবস্থা করা হয়।^৮ কিন্তু তৎকালীন সিলেটে প্রচলিত হিন্দু ঐতিহ্য নির্ভর জটিল দেবনাগরী ও জটিল বাংলা লিপি দ্বারা বহুভাষিক এ সকল মানুষের চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল না। এ কারণে ঐ জনগোষ্ঠীর ও স্থানীয় এবং আশ-পাশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর (এদের সকলকে নিয়ে গড়ে উঠে মুসলিম কমিউনিটি) দ্বারা বহু ভাষার লিপির নমুনা সমন্বয়ে সহজবোধ্য ও সহজে লিখিত-পঠিত একটি বিকল্প ভাষা ও লিপির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ ছাড়া দেবনাগরীজাত হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতি থেকে মুক্তি লাভ করতে স্বকীয় সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা হাসিলের লক্ষ্যে সহজতর মুসলমানি নাগরী লিপির সৃষ্টি করা হয়। হিন্দুয়ানী কথ্যবুলিকে মুসলমানি বাংলার আদলে প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধ করা হয়। সিলেটি জনগণ নাগরীর বাংলা ভাষাকেই স্বকীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। সুতরাং বাংলা ভাষার ইতিহাসে সিলেটি নাগরীর উদ্ভাবন এক যুগান্তকারী ঘটনা। নাগরী লিপির উদ্ভব, প্রচলন ও গ্রহণযোগ্যতার পেছনে হযরত শাহজালাল (র.) ও ৩৬০ আউলিয়ার যে আশীর্বাদ ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নাই। এমনকি ৩৬০ আউলিয়ার কেউ কেউ যে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন এর প্রমাণ সিলেটি নাগরী লিপিতেই বিদ্যমান আছে।

ভারতের আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুল মুসাক্কির ভূঁইয়ার মতে, “The history of the Advent of Islam and Sufism in also connected with the history of

the script”^{৭৭}। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি বিভাগের অধ্যাপক জগমল সিং ড. মুসাব্বির ভূইয়ার সূত্র ধরে বলেন, “Dr. A S. M Bhuiya’s is of opinion that this language and script came in to existence during the time of Shahjalal.”^{৭৮}।

প্রকৃতপক্ষে হযরত শাহজালাল (র.) ও ৩৬০ আউলিয়ার নেতৃত্বাধীন মুসলিম সমাজ নাগরী তথা মুসলমানি নাগরী সৃষ্টি পূর্বক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইসলামিকরণ করে মুসলমানি বাংলায়ই (ভাষা ও সাহিত্যেরই) কেবল গোড়াপত্তন করেননি; বরং হিন্দু ঐতিহ্যনির্ভর দেবনাগরীর প্যারালাল মুসলমানি নাগরীরও গোড়াপত্তন করেন। তাঁরা বাংলা ভাষার অবিচ্ছেদ্য অংশ সিলেটি কথ্যবুলিকেও মুসলমানি বাংলায় ঢেলে সাজান। সিলেটি নাগরীর মাধ্যমে হযরত শাহজালাল (র.) ও ৩৬০ আউলিয়া বহুজাতিক (রাষ্ট্রীয়) বহু ভাষিক জাতি সমূহকে তাদের কর্মস্থলে এক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন এতদঞ্চলের সমাজ বদলের রূপকার। কারণ, সিলেটি নাগরী এবং কথ্যবুলি ছিল তৎকালীন সমাজ বদলের ও নতুন সমাজ গঠনের অন্যতম হাতিয়ার^{৭৯}।

নাগরী লিপির ক্রমবিকাশ

১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে সিলেটে সংগঠিত ইসলামি বিপ্লবের ফলে উদ্ধৃত ভাষা সংকট মুকাবিলার লক্ষেই সিলেটি নাগরী তথা মুসলমানি নাগরীর উদ্ভব ঘটে। পরবর্তী কালেও এর লালন ও বিকাশ সাধিত হতে হতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে তা স্বর্ণযুগে প্রবেশ করে। নাগরী সমগ্র সিলেট ও আসামের কাছাড়ের মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। সিলেটি নাগরী ভাষার মুখ্য অংশই ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান কাহিনি বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়েছে। মাঝে মাঝে আধ্যাত্মিক বিষয়, মরমী প্রেম ও রোমান্টিক কাহিনির সন্ধানও মিলে এ ভাষায়। দলিল দস্তাবেজে অস্তিত্ব পাওয়া গেলেও সরকারী কার্যকলাপে তা তেমন একটি ব্যবহৃত হয়নি। মূলত সুফি-সাধক ও ফকির-দরবেশগণ নাগরী লিপিতে সাহিত্য চর্চা করতেন। তাঁদের হাতেই এই লিপির তথা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ সাধিত হয়। এ জন্য নাগরী সাহিত্যকে ফকিরি ধারার সাহিত্যও বলা হয়। এ সম্পর্কে নাগরী গবেষক কবি মোহাম্মদ সাদিক বলেন, “সিলেটি নাগরী লিপির চর্চা ও বিকাশ সাধিত হয় মূলধারার মুসলমান অর্থাৎ ফকির দরবেশদের দ্বারা। এ সকল ফকির-দরবেশ সমাজে সম্মানিত আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারা কোনোভাবেই সমাজের নিম্ন শ্রেণির মানুষ ছিলেন না।^{৮০} একথা বলাই বাহুল্য যে, পীর ফকির দরবেশদের মর্যাদা ছিল সমাজে সবার উপরে এবং সমাজের সকল শ্রেণি পেশার মানুষের উপর তাঁদের প্রভাব ছিল ব্যাপক। ফলে তাঁদের হাতে বিকশিত নাগরী লিপি যে সিলেটের তৎকালীন মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রধান ভাষা ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নাগরী লিপির প্রভাব

চতুর্দশ শতকের প্রথম দিকে উদ্ভূত হয়ে প্রায় দু’শ বছরের গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে নাগরী লিপি ভাষা ও সাহিত্যে একটি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে এই লিপি সিলেটের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ে। আরাকান রাজ সলিম শাহ (১৫৯৩-১৬১২ খ্রি.) পনের শতকেই আরবি, ফার্সি ও নাগরী লিপিতে মুদ্রা চালু করেন।^{৮১} দিনারপুরের বড় খান,^{৮২} কুরেশী মাগন ঠাকুর (পীর বখশ খান)^{৮৩} ও তরফের সৈয়দ মুসা^{৮৪} প্রমুখের প্রভাবেই চট্টগ্রাম ও আরাকান অঞ্চলে নাগরী লিপি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এছাড়া আফগান শাসকগণও তাঁদের মুদ্রায় সিলেটি লিপি উৎকীর্ণ করে এ লিপির প্রতি সম্মান জানিয়েছিলেন।^{৮৫}

সাহিত্য চর্চায় নাগরী লিপির প্রভাব

চতুর্দশ শতকে শুরু হয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রাথমিক কাল পর্যন্ত কয়েকশ বছর সিলেটি নাগরী সাহিত্য সিলেটের গ্রামীণ সাহিত্য রসিক জনগোষ্ঠীর পিপাসা নিবৃত্ত করেছে। আরবি, ফার্সি ও বাংলা সাহিত্য রচনার পাশাপাশি মুসলমানি নাগরী সাহিত্য চর্চা সিলেটি সাহিত্য চর্চাও ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ষোড়শ শতাব্দীতে জনৈক হলায়দ মিশ্র নাগরী লিপিতে ‘সেক শুভোদয়া’ গ্রন্থ রচনা করেন।^{১৬} মৌলভী বাজারের লংলার অধিবাসী কবি গোলাম হুসন (জন্ম ১৪৬৮ খ্রি.) ‘তালিব হুসন’ নামে নাগরী লিপিতে কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন।^{১৭} প্রথম দিকের নাগরী সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কবি সৈয়দ শাহ হুসন আলম (১৫০০-১৬৫০ খ্রি.) তিনি সিলেটি নাগরী লিপিতে ‘ভেদশার’ ও ‘রিছলাত’ নামে দু’খানি কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। মহাকবি সৈয়দ সুলতান তাঁর শিষ্য ছিলেন। তাঁর রচনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়-

“আল্লার নাম আগে মনে করি শার
পরথমে আগাজ পুথি নামে ভেদশার”^{১৮}

প্রখ্যাত মরমী কবি শাহনূর (১৭৩০-১৮৫৮ খ্রি.) নাগরী লিপিতে ‘নূর নসিহত’ ‘রাগনূর’ ‘নূরের বাগান’, ‘সাত কন্যার বাখান’ ও মনিহার নামে পাঁচ খানা গ্রন্থ রচনা করেন। এ সময়ে সিলেটি নাগরী খুব জনপ্রিয় ছিল। তাই কবি লিখেছিলেন

“আরবি ফারসী কেহ বুঝিতে না পারে
নাগরী করে লিখে দিলু সবে বুঝিবারে”^{১৯}

মধ্য যুগের অন্যান্য নাগরী সাহিত্যিকদের মধ্যে- কবি শেখচান্দ, দীন ভবানন্দ, ভেলা শাহ, শাহ আছদ আলী, শেখ বানু অন্যতম।

নাগরী লিপির স্বর্ণযুগ

সূফি বা ফকিরি ধারার নাগরী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ শুরু হয় আঠারশ শতকে। এ সময়ের নাগরী লেখকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মুন্সি সাদেক আলী (১৮০১-১৮৬২ খ্রি.)। নাগরী লিপিতে রচিত তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো ‘হালতুল্লবী’, ‘রদ্দেকুফর’, ‘হাসর মিসিল’, ‘মহব্বতনামা’, প্রভৃতি। ‘হালতুল্লবী’ নাগরী সাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও ‘হালতুল্লবী’ ঘরে ঘরে পঠিত হতো।^{২০} আধুনিক যুগেও বহু লেখক নাগরী লিপিতে সূফি বা ফকিরি ধারার সাহিত্য রচনা করেন। তাদের মধ্যে আশরাফ হোসেন সাহিত্য রত্ন, চৌধুরী গোলাম আকবর, সৈয়দ মুর্তজা আলী, দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুর আলী, সৈয়দ মোস্তফা কামাল, আব্দুল হামিদ মানিক, ফাতেমা চৌধুরী, মতিয়ার রহমান চৌধুরী ও কবি মোহাম্মদ সাদিক উল্লেখযোগ্য।^{২১}

নাগরী লিপি ও সাহিত্যের প্রকাশনা শিল্প

উনবিংশ শতকের পূর্বে নাগরী শুধু হাতে লিখা হতো। টাইপ না থাকার দরুণ সিলেটি নাগরীতে বই ছাপানো সম্ভব ছিলনা। সিলেটের কৃতি সন্তান মরহুম মুন্সি আব্দুল করিম সর্বপ্রথম নাগরী অক্ষরের টাইপ চালু করেন ও পুস্তক ছাপানোর কাজে হাত দেন। সিলেটে ‘ইসলামিয়া প্রেস’ (১৮৬০-৭০) ‘সরদা প্রিন্টিং ওয়ার্কস’ এবং কলকাতায় আপার চিৎপুর রোডের রত্ন সরকার লেনে

‘জেনারেল প্রিন্টিং প্রেসে’ অনেক নাগরী পুস্তক ছাপা হয়।^{২২} বর্তমানে ড. সোলেয়েড উইলিয়ামস ও জেমস লয়েড উইলিয়ামস নামক দু’জন বিদেশি কম্পিউটারে নাগরী ফন্ট (সুরমা) প্রবর্তন করেছেন।^{২৩} এছাড়া Mr. Roger Gwymn (ইংল্যান্ডের নাগরিক), সিলেটের ফুলবাড়ির মি. আব্দুল জলিল চৌধুরী এবং বার্মিংহাম প্রবাসী ছাতক থানার এম এ হামিদের প্রচেষ্টায় নাগরী হরফের কম্পিউটার ফন্ট প্রস্তুত করা হয়।^{২৪}

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রভাব

সিলেটি নাগরী লিপি উদ্ভবের পর তৎকালীন মুসলিম জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ক্ষেত্রে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ধর্মান্তরিত মুসলমান ও বহিরাগত মুসলমান জনগোষ্ঠীর শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে নাগরী লিপি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এমনকি নারীগণও খুব সহজেই এই লিপির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হন। যা তৎকালীন সমাজে নারী শিক্ষা প্রসারে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। তাছাড়া নাগরী লিপিতে লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে লোক জীবন গাঁথা, ফকিরি ও মরমী ভাবধারা, ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন আখ্যান রচিত হয়েছে। যার মাধ্যমে ইসলামি সাংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধিত হয়। শুধু তাই নয়, দেবনাগরীজাত সাংস্কৃতিক আত্মসনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে মুসলমানি নাগরী স্বকীয় ঐতিহ্যনির্ভর সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার ঐতিহাসিক নিদর্শন।

নাগরী লিপির বর্তমান অবস্থা

হযরত শাহজালাল (র.) কর্তৃক সিলেট বিজয়ের পর সিলেটে উদ্ভূত নাগরী লিপি তথা নাগরী ভাষা কয়েকশত বছর সিলেটের মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধরে রাখলেও বর্তমানে এই লিপি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। রাষ্ট্রীয় ভাষা ও দাফতরিক ভাষা হিসেবে ফার্সি ও বাংলার ব্যবহার নাগরী লিপি বিলুপ্তির অন্যতম কারণ। তাছাড়া হিন্দু জনগোষ্ঠী ফার্সিকে মেনে নিলেও মুসলমানি নাগরীকে মেনে নেয়নি, কারণ তা ছিল হিন্দুয়ানি দেব নাগরী লিপির প্যারালল চ্যালেঞ্জিং মুসলমানি লিপি। পরবর্তীতে উর্দু ভাষার প্রচলন দেশব্যাপি সিলেটি নাগরী লিপি চালু না হওয়ার অন্যতম কারণ। বর্তমানে মুসলমানদের স্বকীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নির্ভর এ লিপির পুনর্জাগরণে সকল ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নাগরীর উৎকর্ষে কৃতি মনীষীগণের অবদান

নাগরীতে সূফি ফকিরি ধারার সাহিত্যই রচিত হয়েছে বেশি। যাতে ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির পাশাপাশি আরবি ও ফার্সি ভাষার অনেক শব্দাবলি ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং প্রকারান্তরে নাগরী লিপির মাধ্যমে মুসলিম সংস্কৃতিরই উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। সিলেটি নাগরী লিপি সাহিত্যের সব চেয়ে আলোচিত লেখকদের মধ্যে রয়েছেন সুনামগঞ্জের সৈয়দ শাহনুর, শাহ সৈয়দ হুসন আলম, পীর মজির উদ্দিন, আফজল শাহ, শাহ আছদ আলী, প্রমুখ। এরা সকলেই গীতি কবি। সকলেই মরমি গান রচনা করেছেন এই নাগরী লিপিতে। গবেষক ফাতেমা চৌধুরীর মতে, “সিলেটের মরমী সাধক ও কবিরা সিলেটি আঞ্চলিক বাংলা ভাষাকে পুঁজি করে জন্ম দেন সিলেটি নাগরী লিপি আর এই লিপিতে চতুর্দশ শতক থেকে উনিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত প্রায় পাঁচশত বৎসর নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে অজস্র গান রচনা করে যান। সিলেটি বাংলা কবিতা, গানের বিপুল রসভান্ডার সিলেটি নাগরী লিপির ফসল। যুগ সভ্যতার এ সংকট লগ্নে আমাদেরই আত্মিক ও পার্থিব স্বার্থে সিলেটি নাগরী লিপি সাহিত্য পূর্ণাঙ্গরূপে পুনরুদ্ধারের আশু প্রয়োজন আজ অনস্বীকার্য”।^{২৫}

নাগরী লিপির সর্বাধিক গ্রন্থ হচ্ছে ধর্ম বিষয়ক সংগীত, মারিফতি, মুর্শিদী ও বাউল এবং সুফিতত্ত্ব বিষয়ক পুঁথি। ষোড়শ শতকে রচিত সুনামগঞ্জের সৈয়দ হুসন আলমের ‘ভেদসার’ একখানা বিশিষ্ট মারেফতি সংগীত ও তত্ত্বগ্রন্থ। এ ছাড়া মুন্সি ইরফান আলীর রচিত ‘মফিদুল মুমিনিন’, ‘আখবা রুল ইমান’, শাহ আব্দুল ওয়াহাব চৌধুরীর ‘ভেদকায়া’, ‘হাশর তরাণ’, ওয়াহেদ আলী রচিত ‘জঙ্গনামা’ প্রভৃতি গ্রন্থ ও সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশ ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে নাগরী লিপি মাইলফলক হিসেবে গণ্য।^{২৬} আলোচ্য প্রবন্ধে কৃতি মনীষীদের মধ্যে যারা নাগরী চর্চার মাধ্যমে সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তাদের সম্পর্কে এবং তাঁদের নাগরী বিষয়ক সৃষ্টি কর্ম নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

মরমী কবি আফজল শাহ

সুফি সাধক মরমী কবি আফজল শাহ ওরফে আরমান আলী সিলেটের অসংখ্য সুফি সাধকদের অন্যতম যোগ্য উত্তরসূরি। সিলেট ছাতক রেল লাইনে অবস্থিত ‘আফজলাবাদ’ রেল স্টেশনটি তাঁরই নামের পূন্য স্মৃতির সাথে সম্পৃক্ত। ১২১৬ বাংলার ১৫ই ফাল্গুন তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৩৩৪ বাংলার ২রা আষাঢ় ১২০ বছর বয়সে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।^{২৭} শুধু সুফি সাধক এবং মরমী কবিই নন, একজন কামেল পীর হিসেবেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তিনি নাগরী হরফে ‘নূর পরিচয়’ নামে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। অমুদ্রিত থাকার পরও কেবল লোকমুখে প্রচারিত হয়ে ‘নূর পরিচয়’ ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে অথবা চতুর্দশ শতকের শুরুতে এর রচনাকাল বলে গবেষকদের ধারণা। উনিশ শতকের প্রারম্ভে আফজল শাহ এর মাজারের খাদেম শাহ মোশাহিদ আলী নূর পরিচয় গ্রন্থের একখানা বাংলা লিপান্তরের ব্যবস্থা করেন। পয়ার’ ত্রিপদী, গান ও গজল ইত্যাদি মিলে গ্রন্থের পঙ্ক্তিসংখ্যা তিন হাজারেরও বেশি।^{২৮} পুঁথির প্রায় অর্ধেকই পয়ার ছন্দে রচিত, বৃহদাংশ রাগ গীত সমষ্টি। পুঁথির অবয়ব জুড়ে রয়েছে নূরের সঙ্গে পরিচয় দেওয়ার অভিপ্রায়। শ্রুষ্ঠার মাহাত্ম্য, তাঁর নৈকট্যলাভের উচ্চারণ। এটি ফকিরি সাধনার এক অমূল্য তত্ত্বগ্রন্থ। দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের এক চমৎকার আখ্যান।

সুরের জগতে হারিয়ে যাওয়া, চোখের জলে আপুত এক মহান মরমী সাধক ছিলেন আফজল শাহ। সারারাত এবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। বালিশের পরিবর্তে মাথার নীচে এক টুকরো কাঠ ব্যবহার করতেন। গান করা, গান শুনা এবং গান রচনা করা এই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। তিনি আরো ছয়টি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যথাক্রমে ঘটনামা, বাটুরা নামা, আমুয়া নামা, কলানদর নামা, দস্তুর নামা, ফিকিরি সিজরা ও রিসালায়ে মারিফাত।^{২৯} তাঁর রচিত এসব মূল্যবান গ্রন্থাদি আমাদের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির এক মূল্যবান উপাদান।

পীর মজির উদ্দিন

সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর থানার বিখ্যাত সৈয়দপুর গ্রামে ১২৮৩ হিজরীর ২১ জমাদিউস সানী শুক্রবার সকালে জন্ম গ্রহণ করেন কাদেরীয়া ও চিশতীয়া তরীকার অন্যতম সুফি সাধক ও নাগরী সংস্কৃতির অন্যতম রূপকার পীর মজির উদ্দিন। প্রায় ৭০ বছর বয়সে ১৩৫৩ হিজরীর ১৫ জমাদিউস সানী মোতাবেক ১৩৪০ বাংলার ৭ই আশ্বিন সোমবার দিবাগত রাত ১ টার সময় তিনি ইন্তেকাল করেন।^{৩০} আধ্যাত্ম সাধনার পাশাপাশি তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করেছেন। নাগরী হরফে লেখা ‘প্রেমালাপ’ প্রথম খণ্ড, ‘প্রেমালাপ’ দ্বিতীয় খণ্ড, ‘শাহাদাতে বুজুর্গান’, ‘জারী

‘জঙ্গনামা’ এবং ‘ভেদ জহুর’, তাঁর অমূল্য গ্রন্থ। বাংলালিপিতেও ‘প্রেমরতন’ এবং ‘গুরুত্ব’ নামে তিনি দু’টি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।^{৩১}

পীর মজির উদ্দিনের ‘প্রেমমালা’ প্রথম খণ্ড বাংলায় লিপ্যন্তর করে ১৩৬৪ সালে প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন তাঁর পুত্র এস. জেড মনফর উদ্দিন। প্রথম খণ্ডে গানের সংখ্যা ছিল ৪৪টি, দ্বিতীয় খণ্ডে ৫৯টি, কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনার উপর লেখা ‘শাহাদাতে বুজুর্গান’ ৮০০ পৃষ্ঠার মহাকাব্য হিসেবে গণ্য। ‘ভেদ জহুর’ তাঁর রচিত উচ্চ মার্গের একটি সুফি বিষয়ক গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থে তাঁর রচিত গানগুলোর মধ্যে রয়েছে:

“মজির কহে পাগল মনরে আর কত বুজাই, শকলের ভেদাভেদ মুরশিদের ঠাই/মুরশিদ বিনে তরিবার আর উপাএ নাই”। অনুরূপ উক্ত গ্রন্থে শতাধিক গান সংকলিত হয়েছে বলে গবেষক আসাদুর আলী উল্লেখ করেছেন।^{৩২} মজির উদ্দিনের বাংলা লিপিতে রচিত সুফি বিষয়ক গ্রন্থ ‘প্রেমরতন’ ১৩৬৪ সালে মুদ্রিত হয়েছে। গ্রন্থটি মুসলিম সংস্কৃতির উৎকর্ষে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য গান হলো:

“এক নিরঞ্জন বিনে দুই নাহি আর
আচার বিচার রহু আঠার হাজার
হিন্দু বলে রাধা-কিরিশনঅ দেবতা তারার
আমি ভাবি এই সবার নাহি দরকার
তন রাধা মন কানু ভাবিয়া দেখ মনে
রাধা কানু বিচারিআ চাও আপন তনে”।^{৩৩}

হাজী শাহ পীর সুকুর আলী চিশতী

ছাতক থানার শান্তিগঞ্জ বাজার এলাকার কামারগাঁও পীর বাড়িতে ১৩২১ বাংলায় হাজী শাহ পীর সুকুর আলী জন্মগ্রহণ করেন।^{৩৪} তিনি মাদরাসায় লেখাপড়া করে মারেফাতী তত্ত্ব জ্ঞানের অধিকারী হন। তাঁর পিতার নাম শাহ ছাবাল আলী। তার অন্ধ পিতা ছিলেন একজন বিখ্যাত মরমী কবি এবং শরীয়তের একজন উচ্চমাপের সুফি সাধক। তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে মারেফাতের দীক্ষা লাভ করেন। শাহ ছাবাল পীরই ছিলেন তার মুর্শিদ। তাঁর ইন্তেকালের সঠিক সন জানা যায়নি। তাঁর রচিত সুফি শাস্ত্র গ্রন্থের নাম: ‘এসকুল আছরার’। ১৩৯২ বাংলায় গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৬৬টি কালাম এবং কতিপয় পদ্য নিয়ে তাঁর লেখা গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৯৪ বাংলা বা ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়।^{৩৫} দ্বিতীয় সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট (১০+৯৬)=১০৬। মোট ২৬ পঙ্ক্তির যে মোনাজাত দিয়ে গ্রন্থখানা শুরু হয়েছে, সে মোনাজাতের কিয়দংশ হলো:

“সর্বমজ্জিমান খোদা কুদরত অসীম
দয়া করে ওহে দয়াল আমিত এতিম।
জোড় হাত মিল্লতী করি দরবারে তোমার
পাপীরে কর মুক্তি প্রার্থনা আমার।
আউয়াল্লে আখেরে তুমি জাহির বাতিন
তোমার কুদরতে পয়দা আছমান ও জমিন”।^{৩৬} (সংক্ষিপ্ত)

চার তরিকার বিবরণ, আসমান জমিন সৃষ্টি সংক্রান্ত বিবরণ, আল্লাহ ও নবি প্রেম, যিকির-আযকার ও মুর্শিদ বন্দনাসহ অসংখ্য কালাম ও পংক্তি গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। গ্রন্থটির শেষাংশে পীর সুকুর আলী পরম করুণাময়ের দয়া কামনা করেছেন এভাবে:

হাজী সুকুর আলীর জীবনভরা, নামাজ আদায় হৈল না সারা
হায়মাবুদ উপায় কি করা, বলি আমি কাতরে
যদি দয়া করে নিজ গুনে, আমি কাঙ্গালেরে রাখো মনে
আপনার মেহের গুনে সব যাবে দূরে”।^{৩৭}

ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম একটি গ্রন্থ হিসেবে ‘এসকুল আছর’ সর্বজন স্বীকৃত।

ফকির ওয়াহেদ আলী

ফকির ওয়াহেদ আলী সিলেটী নাগরী লিপিতে রচিত সুবৃহৎ ‘গ্রন্থ জঙ্গনামা’ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ থেকে তাঁর যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হল :

“শাকিন বসত বাড়ি শকলের জানা
চন্দবুজের বসতি এক আছে ফকির খানা
আমি অধম মুরখমতি ওয়াহেদ আলি নাম
ছাবডিভিশন গুনামগঞ্জ নামজাদি বড়া
অধিনের নিরাশ জান মহলে ফকির পাড়া”।^{৩৮}

সুনামগঞ্জের লক্ষণেশ্বরী পরগণার ষোল ঘরের অধিবাসী ছিলেন ওয়াহেদ আলী। কারবালার হৃদয় বিদারক কাহিনির কাব্যরূপ হচ্ছে তাঁর রচিত ‘জঙ্গনামা’। পাঁচ শত পৃষ্ঠার বৃহৎ গ্রন্থ ‘জঙ্গনামা’ পাঠক সমাজের কাছে ছিল খুবই জনপ্রিয় ও সমাদৃত। তাঁর কাব্যভাষার একটি নমুনা :

“তীর তরকশ ছুলফা খনজর কামান
নেজাগুর্জ ছংগ পাশী আরবি নিশান
সাজান করিলা ঘোড়া দুলদুল সংকার
অতিশয় উচা ঘোড়া পর্বত আকার”।^{৩৯}

‘জঙ্গনামা’র রচয়িতা ফকির ওয়াহেদ আলী দু’টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সিলেটি নাগরী লিপিতে। একটি হলো ‘শহীদে কারবালা’ এবং অন্যটি হলো ‘হুশন শহীদ’। গ্রন্থ দু’টি মুদ্রিত হয়নি। তবে জনপ্রিয়তার দিক থেকে ‘জঙ্গনামা’ ছিল কালজয়ী পুঁথি। পুঁথির কাহিনি মানুষের হৃদয়কে প্রবলভাবে নাড়া দিত। এ পুঁথি গুনে অনেকেই অঝোরে কাঁদতেন। ট্রাজেডির করুণ উপাখ্যান এই পুঁথিকাব্যে দারুণ দক্ষতার সাথে তিনি চিত্রিত করেছেন। অসমান্য সৃজনশীলতায় তিনি নিপুণভাবে এঁকেছেন কারবালার মর্মান্তিক দৃশ্যপট। তাঁর রচিত গ্রন্থাদি ইসলামি সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক উল্লেখযোগ্য উপাদান।

নাগরী লিপির লিপিকর মহরম আলী

সুনামগঞ্জের সদর উপজেলার মনোহরপুরের মহরম আলী সৈয়দ শাহনুর রচিত ‘নুর নছিহত’ এর লিপিকর ও পাঠক। মহরম আলীর পিতাও সিলেটি নাগরী লিপির পেশাদার লিপিকর ও পাঠক

ছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা এখনও বজায় রেখে চলেছেন মহরম আলী। তাঁর দৃষ্টিশক্তি আগের মত নেই কিন্তু তাঁর অসাধারণ কণ্ঠ এখনও বহাল আছে। সুনামগঞ্জের পূর্বাঞ্চলে সৈয়দ শাহনুরের পুঁথি পাঠক ও গায়ক হিসেবে তাঁর একক খ্যাতি রয়েছে। উল্লেখ্য যে, মহরম আলীর নিবাস সৈয়দ শাহনুরের অন্যতম শিষ্য কুরবান শাহ এর মাজারের অদূরে।^{৪০} এই এলাকায় আজো ফকির, ফকিরি ঘরনার মানুষেরা এ সব পুঁথি ও সংগীতের আসরের নিয়মিত শ্রোতা। হাওর, নদী-বিল বিধৌত উদার প্রাকৃতিক পরিবেশে সুনামগঞ্জের খালেরআগাম গ্রামে কুরবান শাহের মাজার। তাঁকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষেরা এই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে যুগ যুগ ধরে লালন করে আসছে। এই জনপদেরই কীর্তিমান পুরুষ মহরম আলীর সুরেলা কণ্ঠে ‘নূর নছিহত’ এর পয়ার ও সুর আপ্ত করে যেকোনো ভাবুক হৃদয়।

সুনামগঞ্জের আরো যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য কীর্তিমান পুরুষ নাগরী চর্চা করেছেন এবং নাগরী লিপিতে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করে ইসলামি সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে অসামান্য অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ও তাঁদের রচিত গ্রন্থাদির নাম নিম্নে প্রদান করা হলো।^{৪১}

রচয়িতার নাম	গ্রন্থের নাম
শাহ সৈয়দ হুসন আলম	ভেদসার
সৈয়দ আকবর আলী ওরফে ছাবাল শাহ	এশকে দেওয়ানা
	যৌবন বাহার
	ফানায়ে জান
মুনশি মুশাহেদ আলী	কবিতা বাউলা দুখখিত
	স্ত্রী পুরুষের আখবার
ভেলা শাহ	খবর নিশান
কুদরত উল্লা	কুদরত উল্লাহর পুঁথি
মুনশি ফজল উদ্দীন	ওলিগণের কবিতা
শাহ রহমত আলী পীর	ইলমে তাসাউফ
কারি ছমির উদ্দিন	ইবরতুল ইনছান
মোঃ হাতেম	মুহব্বত নামা কেতাব
সৈয়দ রাগীব আলী	মা'আরিফুল আহদত

বৃহত্তর সিলেটের প্রাচীন ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্যবোধের স্মারক নাগরী লিপির প্রাচীন গৌরবগাথাঁকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্রত নিয়ে অনেকেই নাগরী লিপির উপর বিভিন্নধর্মী গবেষণা ও গ্রন্থ রচনা করে যাচ্ছেন। তাদের মধ্যে সুনামগঞ্জ জেলার দুজন কৃতি পুরুষের নাম সর্বাত্মে উল্লেখযোগ্য। তারা দুজন ইতোমধ্যে নাগরী লিপির উপর গবেষণা করে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। প্রথমজন এস.এম গোলাম কাদির, যিনি সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা থানার চামরধানী গ্রামের

সন্তান। তিনি ১৯৮৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে “সিলেটি নাগরী লিপি ভাষা ও সাহিত্য” বিষয়ে গবেষণা করে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন।^{৪২} সিলেটি নাগরীকে জাতীয় পর্যায়ে উপস্থাপনের এ কৃতিত্ব ড. গোলাম কাদিরের। দ্বিতীয়জন ড. মোহাম্মদ সাদিক। যিনি ১৯৫৫ সালে সুনামগঞ্জ থানার বারারগায়ে জন্ম গ্রহণ করেন। “সিলেটি নাগরী: ফকিরী ধারার ফসল” বিষয়ে গবেষণা কর্মের জন্য আসাম বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ২০০৬ সালে পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রদান করেছে।^{৪৩} এছাড়া সুনামগঞ্জের কৃতি সন্তান বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুর আলী নাগরীর উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে বহু গ্রন্থে এ বিষয়ে অনেক গবেষণা প্রবন্ধ লিখেছেন। যেমন (১) জালালাবাদ: ভাষা আন্দোলনের পথিকৃৎ, সিলেট ১৯৯৯ পৃ. ২৭-৩৮, (২) সূফি শাস্ত্র গ্রন্থ রচনায় জালালাবাদ, সিলেট ১৯৯৮ পৃ. ৩(৩) সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় জালালাবাদ ১ম খণ্ড, সিলেট, ১৯৯৬, পৃ. ৩৭-৫৩ (৪) সিলেট জেলা পরিক্রমা ১৯৯৪ পৃ. ৪৩ প্রভৃতি।^{৪৪} তাছাড়া সুনামগঞ্জের তরুণ প্রজন্মের অনেকেই তাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে জগ্নত করার প্রয়াসে নিয়োজিত রয়েছেন। নাগরী লিপি ও তার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা, চর্চা ও সংরক্ষণ তাই জাতিসত্তার গৌরব সন্ধানেরই নামান্তর। এ বোধ বিশ্বাসে এবং চেতনায় অধুনালুপ্ত এ বর্ণের সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিচর্যায় প্রত্যেককে এগিয়ে আসা উচিত।

উপসংহার

সিলেটি নাগরী সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রিক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি ভাষা ও লিপি। কালের আবর্তে তা হারিয়ে গেলেও তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় তার প্রভাব কোনো অংশেই কম ছিল না। হযরত শাহজালাল (র.) ও ৩৬০ আউলিয়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের ফলে এই লিপির উদ্ভব। এই নাগরী লিপি ছিল সিলেটের মুসলিম সমাজের স্বতন্ত্র ও সাংস্কৃতিক স্বধীনতার অনন্য নিদর্শন। এই লিপি কেবল একটি লিপিই ছিল না বরং তা ছিল একটি চেতনা বা কালচার। সিলেটি নাগরী ভাষা ও লিপি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ গবেষণার ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা সংযোজনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্র

- ১ দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা: উত্তরাধিকার ও মুসলমানী নাগরী, (সেন্টার ফর বাংলাদেশ রিচার্স : লন্ডন, ১৬ই অক্টোবর, ২০০১), পৃ. ২২-২৩
- ২ ফজলুর রহমান, সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ (ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯১), পৃ. ১৪৬-১৪৭
- ৩ দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬
- ৪ মোহাম্মদ সাদিক, 'সিলেটি লিপি ফকির ধারার সোনালী ফসল', সিলেট, আল-ইসলাহ, এপ্রিল-ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ১৭৮
- ৫ দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১
- ৬ দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮
- ৭ Dr. Md. Abdul Musabbir Bhuiya, JALAL VADI NAGARI (Sylhet, August 2000), P. 22
- ৮ Dr. Md. Abdul Musabbir Bhuiya, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১
- ৯ Dr. Md. Abdul Musabbir Bhuiya, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪
- ১০ মোহাম্মদ সাদিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৯-১৮০

- ১১ দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, শিকড়ের সন্ধানে শিলালিপি ও সনদে আমাদের সমাজ চিত্র (ঢাকা, ১০ ফেব্রুয়ারী ২০০১, পৃ- ২৭)
- ১২ আরাকান রাজসভার সমরমন্ত্রী ছিলেন বৃহত্তর সিলেটের দিনার পুরের অধিবাসী হযরত শাহজালাল রে.) এর অন্যতম সঙ্গী দেওয়ান শাহ তাজ উদ্দিন কুরায়শীর বংশধর। [আসমা চৌধুরী, স্বাধীনতা সংগ্রামে সিলেট (এল্যাট প্রিন্টার্স: ঢাকা, ১৯৯৬), পৃ. ৬৯]
- ১৩ মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালী মুসলিম কবি। রোসাজ রাজসভার প্রধান আমাত্য, 'চন্দ্রবতী' কাব্যের রচয়িতা ও মহাকবি আলাওলের 'পদ্মাবতি' কাব্যের পৃষ্ঠপোষক এবং সমরমন্ত্রী বড়খানের পুত্র। [দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিন্মৃত ইতিহাস, (ই.ফা.বা.) ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১২৮
- ১৪ তরফের অধিবাসী হযরত শাহজালাল (র.) এর সফরসঙ্গী সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিপাহসলার বংশধর। আরাকান রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। মহাকবি আলাওল তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহে ' সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামান' রচনা সমাপ্ত করেন। [ড.শরীফ উদ্দিন, হযরত শাহজালালের সিলেট বিজয়, সিলেট, দৈনিক জালালাবাদী, ১০ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃ. ৩]
- ১৫ দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, হযরত শাহজালাল (র.) ও ৩৬০ আউলিয়ার সিলেট, জালালাবাদ: ঐতিহাসিক রূপরেখা, ঢাকা, ৩রা মে ২০০৪ ইং, পৃ.২৬
- ১৬ অধ্যাপক ড.আব্দুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য (বাংলা একাডেমী: ঢাকা, ১৯৯৪), পৃ. ১৫০
- ১৭ ফজলুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮
১৮ফজলুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯
- ১৯ দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩
- ২০ ফজলুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮
- ২১ দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪
- ২২ ফজলুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭
- ২৩ ফজলুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫
- ২৪ ফজলুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭
- ২৫ ফাতেমা চৌধুরী, সিলেট নাগরী লিপি সমীক্ষা, ঢাকা: উৎস প্রকাশন, ২০১২, পৃ. ১৭২
- ২৬ মোস্তফা সেলিম, সিলেট নাগরীলিপি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (ঢাকা: আত্মপুর্নান, অক্টোবর ২০১৮), পৃ. ৪৬-৪৭
- ২৭ মুহাম্মদ আসাদুর আলী, সূফী শাস্ত্র গ্রন্থ রচনায় জালালাবাদ (সিলেট: তাইয়ীবা প্রকাশনী, জানুয়ারী ১৯৯৮), পৃ. ৫
- ২৮ মুহাম্মদ আসাদুর আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬
- ২৯ মোস্তফা সেলিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬
- ৩০ মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান, সিলেট বিভাগের পাঁচশ মরমী কবি (নিউ এমদাদিয়া পাবলিকেশন্স: ঢাকা, ১৯৯৬), পৃ. ৪৯
- ৩১ মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০
- ৩২ আসাদুর রচনা সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড (দ্য এথনিক মাইনরিটিজ অরজিন্যাল হিস্ট্রি এন্ড রিসার্চ সেন্টার, লন্ডন, ইউকে, ফেব্রুয়ারী ২০০৩), পৃ. ৩২
- ৩৩ মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান, সিলেট বিভাগের পাঁচশ মরমী কবি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬
- ৩৪ মুহাম্মদ আসাদুর আলী, সূফী শাস্ত্র গ্রন্থ রচনায় জালালাবাদ (সিলেট, ১৯৯৮), পৃ. ১৪৪
- ৩৫ মুহাম্মদ আসাদুর আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫

- ৩৬ মুহাম্মদ আসদুর আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪
- ৩৭ মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান, *সিলেট বিভাগের পাঁচশত মরমী কবি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩
- ৩৮ মোহাম্মদ সাদিক, *সিলেটি নাগরী: ফকিরি ধারার ফসল* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ২০০৮), পৃ. ১৩২
- ৩৯ সৈয়দ মোর্তাজা আলী, *প্রবন্ধ বিচিত্রা* (ঢাকা, ১৯৬৭), পৃ. ১৬৬
- ৪০ মোহাম্মদ সাদিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯
- ৪১ *সিলেটি নাগরী লিপি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* গ্রন্থের 'নাগরী লিপিতে রচিত পুঁথি ও বই এবং লেখকের তালিকা' শীর্ষক অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ১৮৪-১৮৯
- ৪২ গোলাম কাদির, *সিলেটি নাগরী লিপি ভাষা ও সাহিত্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, জানুয়ারী ১৯৯৯), পৃ. লেখক পরিচিতি
- ৪৩ মোহাম্মদ সাদিক, পূর্বোক্ত, পৃ. লেখক পরিচিতি
- ৪৪ দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ঢাকা নগরীর আধুনিকায়ন ও জন-জীবনে এর প্রভাব

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন*

Abstract

Under British rule the people of Dhaka city experienced socio-cultural changes brought through colonial ‘modernity’, and the impact of ‘Bengal's Renaissance’ and scientific advancement of the contemporary period on their everyday life. The major concern here is whether the new concepts of rationality, morality and technical advancement were able to influence the corner of the city or did a majority of the common people remained in darkness. Western education, including scientific, medical and literary, received impetus from a small section of the Bengali society and their diverse effects became visible in Calcutta. Many educational centres, Western in nature, took birth under different circumstances, and social evils were questioned by many Western-educated indigenous people. It is true that after Calcutta, compared to the other cities in Bengal, Dhaka went through a visible change during the British colonial period. However, throughout the century, a small number of significant steps were taken to develop and reform the socio-cultural milieu of Dhaka city. There is no hesitation in saying that not only the peripheral people remained out of the ‘modernizing agenda’, but also the urban poor and uneducated faced the same condition. Keeping in mind the various overwhelming processes of action in a cityscape, in this article, I will try to explore how the city people connected the space and its changing milieu in their everyday life in colonial settings. And how they perceived and responded to the process of modernity. It also focuses on the process of how the city's local inhabitants explained modernity and transformed it in their own ways. This research has been done through qualitative methods using primary and secondary sources including vernacular literature collected from different libraries, archives and museums.

চাবিশব্দ: উপনিবেশবাদ, আধুনিকতা, ঢাকা শহর, স্থানিক রূপান্তর, জনজীবন

ভূমিকা

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে নগরায়ণ ও নগরের স্থানিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল নগর ও নগরে বসবাসকারী জনগণের জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ছিল অবশ্যসম্ভাবী। তবে এই প্রভাবের মাত্রা জন-জীবনের সকল ক্ষেত্রে একই রকম ছিল না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর প্রভাব ছিল ব্যাপক, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। মুঘল সুবা বাংলার রাজধানীর মর্যাদা লাভের অতীত ও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে নিজামতের পরিচয় হারিয়ে বিভাগীয় শহর হিসেবে ঢাকা লাভ করে এক নতুন পরিচয়। ১৮৫৮ সালে ভারতে ব্রিটিশ রাজ এর সরাসরি শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ঢাকা নগরীর স্থানিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়। এর আয়তন, প্রশাসনিক দপ্তরের কাঠামোগত পরিবর্তন, নতুন ও আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন, প্রযুক্তিগত ও

* অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ ও মানষিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাাদি ঢাকা নগরীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে দৃশ্যমান পরিবর্তন এনেছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাংলার আধুনিক নগর হিসেবে কলকাতার পরই ছিল ঢাকার স্থান। আঠারো-উনিশ শতকের ব্রিটিশ রাজধানী কলকাতার নিকটবর্তী শহর হিসেবে ঢাকার নাগরিক জীবনে আসা পরিবর্তন এবং এই নগরীর গুরুত্ব ও আধুনিকায়নের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ব্রিটিশ অধিকারীগণের লিখিত পত্রাদি এবং উনিশ ও বিশ শতকে ঢাকায় পদার্পণকারী ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের উক্তিগুহ থেকেও ধারণা পাওয়া যায়। ফলে এ অঞ্চলের নগর ইতিহাস রচনায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব আজ বহুল আলোচিত বিষয় হিসেবে ইতিহাসে অধীত। কিন্তু এই আধুনিকায়নের প্রভাব জন-জীবনে কতটুকু বিস্তৃতি লাভ করেছে, তা নিয়ে এখনো গবেষণা চলমান। বর্তমান প্রবন্ধে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতের অন্যতম নগর ঢাকায় তৎকালীন শাসকদের আমদানিকৃত আধুনিকতা, নগরীর স্থানিক ও অবকাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে জন-জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা চিহ্নিত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

ঢাকার নগরায়ণের ইতিহাস রচনা একটি নতুন প্রয়াস। ইতঃপূর্বে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের সম্পাদিত রচনাবলী ও গবেষণাকর্মে ব্রিটিশ-ঔপনিবেশিক আমলে ঢাকাকে একটি আধুনিক নগর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যে স্থানিক, অবকাঠামোগত ও প্রতিবেশিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়েছিল এবং তার ফলে ঢাকার জন-জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পরেছিল তার প্রকৃতি নির্ণয় ও এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের প্রয়াস সীমিত। ফলে বর্তমান গবেষণাকর্মটি নিঃসন্দেহে ইতিহাসের এই শূন্যতা পূরণ করবে। নগরের স্থানিক ইতিহাস একটি জাতির সামগ্রিক ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে। ফলে উক্ত ইতিহাস নির্ণয়ে পরিচালিত বর্তমান গবেষণাকর্মটি ঢাকার নগরায়ণের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করবে এবং একটি ইতিহাস সচেতন জাতি গঠনে সহায়তা করবে।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান প্রবন্ধটি লেখার ক্ষেত্রে মূলত গুণগত পদ্ধতি (Qualitative method) ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক ও দ্বিতীয়িক উৎস ব্যবহার করে এই গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎসসমূহ বাংলাদেশ জাতীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত আলোচ্য সময়কালের (উনিশ ও বিশ শতকের প্রথম ভাগ) সিটি কর্পোরেশন রেকর্ড, মিউনিসিপাল রেকর্ড, পাবলিক হেলথ অ্যান্ড সেনিটেশন ফাইলসমূহ, এডুকেশন ডেসপাসসমূহ, সরকারি প্রসেডিংস, সার্কুলারসমূহ, গ্যাজেটসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে। আহসান মঞ্জিল যাদুঘরে ঢাকার নবাবদের রক্ষিত দলিলপত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত সরকারি প্রসেডিংস, গ্যাজেট ও সমকালীন পত্রিকাসমূহ প্রাথমিক উৎসের জোগান দিয়েছে। এছাড়া সমকালীন পত্রিকাসমূহ, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ঢাকা প্রকাশ পত্রিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া, গ্রাম বাংলা প্রবেশিকা, বঙ্গবাণী, ঢাকা মুসলিম সুহদ সম্মিলনী সভা ও ব্রাহ্ম সমাজের সভার বার্ষিক বিবরণী ও আঞ্জুমান (ঢাকা) এর বার্ষিক বিবরণীসমূহ ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ঢাকার জনজীবনের বিবিধ সমস্যা নিয়ে প্রকাশিত বিবৃতিসমূহ আলোচ্য প্রবন্ধকে তথ্য সমৃদ্ধ করেছে। আলোচ্য সময়ে লেখা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ভ্রমণকাহিনি এবং আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থাদি অন্যতম মূল্যবান উৎস হিসেবে সংযুক্ত হয়েছে। তবে গবেষণার ক্ষেত্র অনুসন্ধান ও এর যৌক্তিকতা নির্ণয়

তথা কাঠামো বিন্যাসের জন্য দ্বিতীয়ক উৎসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান গবেষণায় এটি মূল্যবান উৎসের যোগান দিয়েছে। বর্তমান গবেষণাটি একটি মৌলিক গবেষণা যা এই দুই ধরনের উৎসের সমন্বয়ে সম্পন্ন হয়েছে।

নগর ইতিহাস চর্চার ধারা ও ঔপনিবেশিক ঢাকার নগরায়ণ

নগরায়ণের ইতিহাস মানব সভ্যতার উন্মেষের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত। সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে বদলে যায় এর প্রকৃতি ও পরিধি। ফলে একটি শহর বা নগরের পতনও সভ্যতার বিবর্তন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। ঐতিহাসিকগণ সাধারণত মেসোপটেমিয় সভ্যতাকে নগর সভ্যতার সূচনাকাল হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে।^১ কেননা খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ৩৫০০ অব্দে এ অঞ্চলে নগরায়ণের বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিলক্ষিত হয়। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ গর্ডন চাইল্ড 'নগরায়ণ বিপ্লব' (Urban Revolution)^২ এর দশটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন, তার মধ্যে জনসংখ্যা ও সম্পদ বৃদ্ধি অন্যতম। এ সকল বৈশিষ্ট্যের অনুসঙ্গ হিসেবে লিখন পদ্ধতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও পৌর কর্মের বিস্তৃতি ঘটে।^৩ মেসোপটেমিয় অঞ্চলে এ সকল বৈশিষ্ট্যের বিকাশ প্রথম ঘটেছিল, এমনটি ধরে নিলে এ সময়কালকে নগর সভ্যতার সূচনাকাল ধরা যায়। এর ধারাবাহিকতায় মিশর, গ্রিস, রোম, পারস্য ও ভারতসহ পৃথিবীর বহু অঞ্চলে প্রাচীন সভ্যতার হাত ধরে নগরায়ণের বিস্তৃতি ঘটে। বাংলায় নগরায়ণের সূচনাকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্তের অভাব রয়েছে। বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গবেষণা, ভ্রমণবৃত্তান্ত, প্রাচীন লিপিমাল্য ও সমকালীন সাহিত্যের উৎস থেকে গঙ্গা বিধৌত বাংলায়^৪ নগরায়ণের ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়। প্রাচীন ভারতের হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর সমসাময়িক না হলেও এর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে এ সকল উৎস থেকে ধারণা পাওয়া যায়।^৫ প্রাচীন বাংলার নগরায়ণের কারণ হিসেবে ইতিহাসবিদ গোলাম মর্তুজা সম্পদের প্রাচুর্য, যাতায়াত ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিহার নির্মাণকে প্রধান উপাদান হিসেবে উল্লেখ করেন।^৬ এছাড়া তার মতে পলিবিধৌত এ অঞ্চলে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণের প্রক্রিয়ায় নদীতীরসমূহে যে ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে ওঠে, কালের আবর্তে তা নগরে রূপান্তরিত হয়।^৭ সময়ের আবর্তে নদীর গতি পরিবর্তনের সঙ্গে পুরাতন নগরের অবক্ষয় ও নতুন নগরের সূচনা হয়েছে। বলা যায়, বাংলায় নগরীর ভাঙা-গড়ার এই চলমান প্রক্রিয়ার ইতিহাস অতি পুরাতন হলেও তা অনুসন্ধানের প্রয়াস এখনও অনেকটাই নতুন।

এ প্রসঙ্গে ভারতের ঔপনিবেশিক নগর ইতিহাসবিদ কেনিথ এল গিলিয়ন এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বিশ শতকের মাঝামাঝিতে আহমেদাবাদ নগরের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে অনেকটা আক্ষেপের সুরে বলেন—

Modern Indian historiography no longer confines its study to the activities of rulers. The Indian nationalist movement is receiving close attention from scholars in several countries, as are the effects of British law and land revenue settlements on the social structure of rural India. But those who wish to read about Indian cities are still more likely to look to the works of geographers and sociologists than to urban history.^৮

কালের আবর্তে নগর ইতিহাস রচনায় গতি সঞ্চারিত হতে দেখা যায়। নগর ইতিহাস রচনার অংশ হিসেবে গবেষকগণ নানাবিধ প্রশ্নের অবতারণা করেন; যেমন-শহরের কেন্দ্র ও এর বিন্যাস প্রক্রিয়ায় শহরের সাথে তার পশ্চাদভূমির মধ্যকার সম্পর্ক এবং একইসাথে নগর অধিবাসীর যাপিত জীবনে

এ ধরনের সম্পর্কের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবও এর গতি-প্রকৃতির রূপ অনুসন্ধান প্রভৃতি। এ ধরনের অনুসন্ধান মূলত একটি শহরের উত্থান-পতনের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত।^{১৯} এ সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে নগরায়ণ নিয়ে গবেষণা বর্তমানে ভূগোলবিদ ও সমাজতাত্ত্বিকদের গবেষণায় সীমাবদ্ধ না থেকে অধিবিদ্যার বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্থাপত্যিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণা। এ প্রসঙ্গে নগর ইতিহাসবিদ নারায়ণী গুপ্ত বলেন, “নাগরিক ইতিহাস আন্তর্বিষয়গত (inter-disciplinary) দৃষ্টিভঙ্গি দাবি করে। ভূগোলবিদ, পরিসংখ্যানবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজতাত্ত্বিক, স্থপতি, পুরাতত্ত্ববিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী- সবার কাছ থেকেই ইতিহাসবিদদের কিছু শেখার আছে।”^{২০}

নগরের সংজ্ঞা ও এর প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়ে ঐতিহাসিক, ভূগোলবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, প্রত্নতত্ত্ববিদ বিবিধ সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন। বাংলা একাডেমির অভিধায় নগর এর শব্দটির অর্থ নানা পেশার বহুসংখ্যক লোকের আবাস ও শিল্প-বাণিজ্যাদির স্থান।^{২১} আবার এর সমার্থক শব্দ ‘শহর’ বলতে বোঝায় বড় নগর, মহানগর বা রাজধানী।^{২২} নগরের বহুবিধ সমার্থক শব্দ পাওয়া যায় পালি সাহিত্যে। করুণানন্দ ভিক্ষু তার *পালি সাহিত্যে নগরবিন্যাস ও নগরজীবন* গ্রন্থে নিগম, নগর, নগরক, রাজধানী, পুর, প্রভৃতিকে নগর হিসেবে চিহ্নিত করেন। নগরের সংজ্ঞা দিতে তিনি উল্লেখ করেন “নগর- এর প্রধান ও মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি হলো- গ্রামাঞ্চলের তুলনায় স্বল্পমাত্রা স্থান আশ্রয় করে অধিকতর সংখ্যক লোকের বসবাস, সীমাবদ্ধ আবাসস্থল, প্রধানত খাদ্যোত্তর সামগ্রীর উৎপাদন ও অন্যদিকে খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের জন্য গ্রাম নির্ভরতা, বণিকশ্রেণির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক এমন কি, ব্যবসা-বাণিজ্যগত এবং কখনো ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্ববহ ছিল।”^{২৩} এক কথায় বলা যায়, ইংরেজি *Urbanization* বা বাংলা নগরায়ণ মানব সভ্যতা গঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যেখানে নগর হলো মানুষের ‘সভ্য’ কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র বিন্দু।^{২৪} নগরায়ণের হ্রাস বা বৃদ্ধির জন্য যে সকল উপাদান মূল্য ভূমিকা পালন করে তাকে নগর ইতিহাসবিদ সুবিকাশ মুখোপাধ্যায় চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। এগুলো হলো: ১. ভৌগোলিক ও জনসংখ্যাগত শ্রেণি, ২. অর্থনৈতিক শ্রেণি, ৩. সমাজ ও সংস্কৃতিগত শ্রেণি এবং ৪. পরিকাঠামোগত শ্রেণি।^{২৫} তাছাড়া কোনো স্থানে নগরায়ণের উপাদানগুলো কতটা কার্যকর তার নির্ভর করে ঐ স্থানের অধিবাসীর মোট আয় বা পেশার উপর। এর সাথে স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতিগত শ্রেণিটিও নগরায়ণের প্রকৃতি গঠনে ভূমিকা রাখে। ফলে কোন স্থানের নগরায়ণের স্বরূপ নির্ভর করে স্থানীয় জনগনের যাপিত জীবনের গতি-প্রকৃতির উপর। এই দিকগুলো বিচার করে ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকগণ মনে করেন, প্রাক-ব্রিটিশ বাংলার সমাজ ও রাষ্ট্রের বাস্তবতায় এই উপাদানের অভাব ছিল।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলোতে নগরায়ণের খাঁচ সর্বদা একই ধারায় গড়ে উঠেছিল তা নয়, বরং প্রত্যেক নগরই কতগুলো আলাদা কারণ ও বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল। দেখা যায়, পুঁজিবাদী কৃষি অর্থনীতি, রেলপথ এবং রেল স্টেশন, প্রশাসনিক প্রয়োজন, ইয়োরোপীয় গ্রীষ্মাবাস স্থাপনের যৌক্তিকতা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে নতুন নতুন নগর গড়ে ওঠে; আবার পুরোনো নগরীর রূপ পরিবর্তিত হয়। তবে জনপদকে নগর হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য ঔপনিবেশিক শাসকশ্রেণির জন জরিপ শুরু হলে ১৮৭২ এর সেন্সাস অধিকর্তা জে সি জেক মন্তব্য করেন, এ অঞ্চলের সিংহভাগ শহর “actually half towns and half village”^{২৬} বলা যায়, বর্তমানকালেও দক্ষিণ এশিয়ার অনেক শহরে পর্যাপ্ত নাগরিক সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে, অথচ

জনসংখ্যার ভিত্তিতে এগুলো বৃহৎ শহরের শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ঢাকার ক্ষেত্রেও এই সত্যটি প্রযোজ্য। উনিশ ও বিশ শতকের ঢাকায় নগরায়ণের উপাদানগুলো কীভাবে স্থানীয় অধিবাসীর যাপিত জীবনের উপর কতটুকু কার্যকরী প্রভাব ফেলেছে- তা আলোচ্য প্রবন্ধে অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

ঢাকা নগর ও এর নাগরিক চরিত্র অন্বেষণের ইতিহাস আলোচনা ব্যাপক বিস্তৃত নয়। ঔপনিবেশিক ঢাকার নগরকেন্দ্রিক ইতিহাস নিয়ে গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে যেখানে ক্ষুদ্র পরিসরে ঢাকার জন-জীবন সম্পর্কে আলোচনাও পাওয়া যায়। আলোচ্য সময়কালের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সৈয়দ আওলাদ হাসান এর *Antiquities of Dacca* (1905) সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর রচিত *Glimpses of Old Dhaka: A short Historical Narration of East Bengal and Assam with special Treatment of Dhaka* (1956) এবং আহমেদ হাসান দানী রচিত *Dacca: A Record of Its Changing Fortunes* (1956) গ্রন্থসমূহের নাম উল্লেখযোগ্য। কোম্পানি ও ব্রিটিশ শাসনাধীনে লিখিত চার্লস ড'য়েলির রচিত *Antiquities of Dacca*, (1814), জেমস ওয়াইজ রচিত *Notes on the Races, castes and trades in Eastern Bengal* (1883) ও বার্ডলি বাট রচিত *The Romance of an Eastern Capital* (1906) গ্রন্থসমূহ ঢাকার ঔপনিবেশিক ধারার নগরায়ণ ও নাগরিক জীবন সম্পর্কিত প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিবেচিত। এ সকল গ্রন্থের বেশিরভাগই ঢাকার ইতিহাস বর্ণনায় মূলত এ অঞ্চলে ব্রিটিশপূর্ব ও তৎপরবর্তী কালের টিকে-থাকা ও ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতাদির বর্ণনা ও পরিচয় প্রাধান্য পেয়েছে। পাশাপাশি ঢাকার নগরায়ণের প্রকৃতি, সমাজ, সংস্কৃতি, স্থাপত্য ও প্রচলিত রীতি-নীতি সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ফলে ঢাকার ইতিহাস রচনায় এ সকল গ্রন্থের অবদান অনস্বীকার্য।

আঠারো ও উনিশ শতকে ঢাকার জন-জীবন ও শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে উর্দু ও ফার্সিতে লেখা কিছু গ্রন্থের অনুবাদ পাওয়া যায়। এ সকল গ্রন্থের মধ্যে মুনসী রহমান আলী তায়েশ রচিত *তাওয়ারিখে ঢাকা*, হাকিম হাবিবুর রহমানের *ঢাকা পাঁচশ বরস পেহলে*, আসুদগানে *ঢাকা* গ্রন্থসমূহ উল্লেখযোগ্য। এ সকল গ্রন্থে তৎকালীন ঢাকাবাসীর সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। তায়েশ মুঘল ঢাকার নাজিম ও নায়েব নাজিমদের শাসনকাল, তাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা ঘটনা নিয়ে প্রচলিত ইতিহাস, তাদের অধীনে ঢাকার নাগরিক উন্নয়ন, ধর্মীয় ও পার্শ্বস্থ স্থাপত্য ও অবকাঠামো নির্মাণসহ ১৯০৫ সালে পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানীর সিভিল স্টেশন হিসেবে রমনার নবরূপে প্রতিষ্ঠালাভ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। হাকিম হাবিবুর রহমানের *ঢাকা পাঁচশ বরস পেহলে* গ্রন্থটির আলোচনার সীমা উনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত। তবে এই গ্রন্থটিকে বাংলা বিভাগপূর্ব ঢাকার সমকালীন সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি চর্চা তথা এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে লেখা একটি প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ সকল আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে ঢাকার স্থানিক বিবর্তনের পাশাপাশি জন-জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ সকল প্রসঙ্গ বর্তমান গবেষণায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখে। তবে ব্রিটিশ শাসকগণ ঢাকাকে একটি আধুনিক নগর হিসেবে গড়ে তোলার যে প্রয়াস নিয়েছিল এবং তা ঢাকার অধিবাসীগণ কীভাবে গ্রহণ ও আত্মস্থ করেছে কিংবা বাতিল করেছে-তা আলোচনার কোনো প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না।

ঔপনিবেশিক ঢাকার নগরায়ণ সম্পর্কিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে শরীফ উদ্দিন আহমেদ রচিত, *Dhaka: A Study In Urban History & Development 1840-1921* গ্রন্থে লেখক ব্রিটিশ কোম্পানি ও রাজ আমলে ঢাকার নগরায়ণের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। ঢাকায় আধুনিক নাগরিক সুবিধাগুলো প্রণয়নের জন্য ইংরেজ শাসক ও সিভিলিয়ানদের প্রচেষ্টা, স্থানীয় বিশিষ্ট বাজিবর্গের সম্পৃক্ততা ও বিরোধিতা সংক্রান্ত বিষয়গুলোর বিশদ বিবরণ এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। তবে ঢাকার স্থানিক পরিবর্তনে বিষয়গুলো কীভাবে কাজ করেছে, সে সম্পর্কে বিশ্লেষণের পরিসরটি সীমিত। শরীফ উদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত *Dhaka Past Presesnt Future* (1889) গ্রন্থে আব্দুল মুমিন চৌধুরী ও শবনব ফারুকীর যৌথভাবে লেখা ‘Origin and Development of Mughal Dhaka’ এবং সম্পাদকের লেখা ‘Municipal Politics and Urban Developments in Dhaka (1885-1915)’ প্রবন্ধে ঢাকার নাগরিক জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকার ৪০০ বছর উপলক্ষে ২০১২ সালে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত *Urbanization and Urban Development* শিরোনামের ৩ নম্বর ভলুমে এ কে এম গোলাম রব্বানী ‘Parks and Open Spaces in British Times’^{১৭} শিরোনামের প্রবন্ধে ঢাকার পার্ক, খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থানগুলোর বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে। উত্তর-ঔপনিবেশিক ঢাকায় উন্মুক্ত বিনোদনের স্থানগুলোর বিকাশ ও ঢাকার নগরায়ণের এ সকল স্থানের গুরুত্ব নির্ণয়ে এই প্রবন্ধটি উল্লেখের দাবি রাখে।

ঢাকা সম্পর্কে বহুবিধ তথ্যের সমাহার ঘটিয়েছেন ঢাকা নিয়ে বহু গ্রন্থের লেখক ঐতিহাসিক মুনতাসীর মামুন। এ সকল গ্রন্থের মধ্যে তার লেখা *ঢাকা সমগ্র* অন্যতম। হয় খণ্ডে লেখা এই গ্রন্থের অধ্যায়সমূহ ঢাকার পরিচয়, প্রাক-ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক ঢাকার বিবর্তন ও ঢাকার আধুনিকায়নে স্থানীয়দের ভূমিকা- সব কিছুই সাবলীল ভাষায় ফুটে উঠেছে। এই সকল লেখনীর উৎস সরকারি দলিলপত্র, সমসাময়িক সংবাদপত্র ও আত্মজীবনী- তবে সাধারণ পাঠকদের জন্য লেখা এ সকল গ্রন্থে আধুনিক ঢাকা নির্মাণকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বিত্তবান শ্রেণি, ঔপনিবেশিক অধিকারীগণ তথা ঢাকা মিউনিসিপালিটির মধ্যকার দীর্ঘ বিরোধ এবং এর ফলস্বরূপ ঢাকার এ সকল শ্রেণির মধ্যকার ত্রিপক্ষীয় সম্পর্কের সমীকরণ সম্পর্কে আলোচনা বা বিশ্লেষণ অনুপস্থিত। অথচ নগরের স্থানিক পরিবর্তন নাগরিকের মধ্যকার সম্পর্কই নির্ধারণ করে। বর্তমান গবেষণায় এ সম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষণে এসকল অনুল্লিখিত বিষয়ের ওপর দৃষ্টি নিবন্ধনের মাধ্যমে ইতিহাসের শূন্যতা পূরণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

ঔপনিবেশিক আধুনিকায়ন ও ঢাকার নগরজীবনে এর প্রভাব

বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে ঔপনিবেশিকতা একটি পুরাতন ও বহুল ব্যবহৃত পন্থা হলেও যুগের আবর্তে তার প্রক্রিয়াগত পরিবর্তন ঘটেছে। মার্কসবাদীগণ ঔপনিবেশিকতার রূপ নির্ণয় করতে গিয়ে ইউরোপীয় ধরণ থেকে আদি ঔপনিবেশিকতার পাথক্যকে পুঁজির নিগরে বিচার করেছেন। এ অনুযায়ী আদি উপনিবেশকে প্রাক-পুঁজিবাদী ও আধুনিক উপনিবেশ ইউরোপীয় পুঁজিবাদের নিয়ন্ত্রণে প্রতিষ্ঠিত।^{১৮} ফলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত উপনিবেশ আধুনিক ঔপনিবেশিক চরিত্র নিয়ে গড়ে উঠেছিল যার মূল লক্ষ্য ছিল এ অঞ্চলের রাজস্ব, রসদ, সম্পদ হস্তগত করে বিজয়ী রাষ্ট্রের অর্থনীতির পুনর্গঠন এবং এ লক্ষ্যে ঔপনিবেশিত ও উপনিবেশক রাষ্ট্রের মধ্যে মানব ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রবাহ নিশ্চিত করা। স্ফীত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য উপনিবেশক রাষ্ট্রযন্ত্র নানা

কৌশল ও তথাকথিত আদর্শের ঘেরাটোপ তৈরি করে তা উপনিবেশিতদের উপর প্রয়োগ করে। এই প্রক্রিয়ায় উভয় পক্ষের মধ্যে যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল ইউরোপীয় পুঁজিবাদ ও শিল্পের উন্নয়নের অবধারিত ফসল। ষোড়শ শতকে ইউরোপের শিল্পবিপ্লব ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে পণ্য উৎপাদন ও তা বিক্রির জন্য বিশ্বের নানা অঞ্চলে যে বাজার তৈরির প্রবণতা দেখা যায় তা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছিল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার বিরাট ভূমির রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার ও এ সকল ভূমি থেকে প্রাপ্ত পুঁজি ও পুঁজির সঞ্চালনের মাধ্যমে ইউরোপীয় পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছিল সর্বাধিক। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক ফল ছিল এ সকল অঞ্চলে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠা। আর আধুনিক সাম্রাজ্যবাদকে^{১৯} চিহ্নিত করা হয় পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর হিসেবে। সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ উপনিবেশ তথা আধুনিক ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের রমরমা রূপ দেখা যায়। রেলগাড়ি আর টেলিগ্রাফের প্রবর্তন গোটা ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ রাজধানী কলকাতা কেন্দ্রিক করে দেয়। এ সকল পরিবর্তনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ফলাফল ছিল দৃশ্যমান। পাশাপাশি নতুন শাসকশ্রেণি কর্তৃক এ অঞ্চলে সাংস্কৃতিক উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা খুব সচেতনভাবেই শুরু হয়েছিল। কেননা রাজনৈতিক ক্ষমতার দৃঢ়করণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন ছিল টেকসই প্রশাসন ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ। একই সাথে বিজিত অঞ্চলে বিজয়ীদের শাসনকে আইনসম্মত করা এবং শাসন ও শোষণের পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য যে পদ্ধতি প্রবর্তিত হলো, শাসকশ্রেণির ভাষায় তা ছিল “Civilizing Mission”^{২০} যাকে সভ্যতাকরণ প্রক্রিয়াও বলা যেতে পারে। ব্রিটিশ শাসকগণের দ্বারা প্রবর্তিত এই সভ্যতাকরণ প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক কেরি এ ওয়াট (Carey A. Watt) এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তার মতে, “For the British Raj in India the civilizing mission meant many things, including bringing the benefit of British culture to the subcontinent in the form of free trade and capitalism as well as law, order and good government.”^{২১} কেননা শাসকশ্রেণি উপনিবেশক ও উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য খুঁজে বের করেন, যেখানে সভ্যতার বিচারে স্থানীয় বা উপনিবেশিত জনগণ ছিল ব্রিটিশদের তুলনায় এবং বৃহৎ ক্ষেত্রে ইউরোপীয় জনগণের তুলনায় নিম্নমানসম্পন্ন সভ্যতার ধারক। ফলে পিছিয়ে পরা বা তুলনামূলক অনুন্নত ও নিম্ন মানসম্মত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য সভ্যতাকরণ প্রক্রিয়ার প্রয়োজনকে গুরুত্বপূর্ণ ও অবশ্যকরণীয় হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয়। তবে এই প্রক্রিয়াটি ছিল ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি আলাদা সংস্করণ যা উপনিবেশিক অঞ্চলের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। মূল উদ্দেশ্য ছিল এর মাধ্যমে উপনিবেশিতদেরকে এক ধরনের “নতুন ও উন্নত সংস্কৃতির” ঘেরাটোপে ফেলে রাষ্ট্র ও সমাজে অধীত সংস্কৃতিবাহী একটি সভ্য গোষ্ঠি তৈরি করা। ইউরোপীয় সংস্কৃতির বিস্তৃতি সাধনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে তারা ইংরেজি শিক্ষাকে বেছে নিয়েছিল। শাসকশ্রেণির এই প্রচেষ্টার ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে ব্রিটিশ ভূষণ ও চিন্তাধারা সম্বলিত এক শ্রেণির সচেতন নাগরিকের জন্ম হতে দেখা যায়, যারা ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষা সংস্কারক মেকলের (Thomas Babington Macaulay) কাক্ষিক্ষিত শ্রেণি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।^{২২} বাংলায় ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত স্থানীয় অধিবাসীর একটি বড় অংশ ভদ্রলোক অভিধা নিয়ে সমাজে এক নতুন শ্রেণির জন্ম দিয়েছিল। সরকারি উদ্যোগে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার ও মিশনারিদের প্রচেষ্টায় দেশীয় কায়দায় শিক্ষা প্রদানের চেষ্টার ফলে ভারতের বিভিন্ন অংশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিস্তার গ্রাম ও মফঃস্বল এলাকায় স্বল্প পরিষরে বিস্তার লাভ করে। শহর বা নগরকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ সভ্যতার

উপাদানগুলোর বিস্তৃতি ঘটতে থাকে বিধায় রাষ্ট্রের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জমিদার, ব্যবসায়ী ও বেনিয়া গোষ্ঠীর একটি বড় অংশ শহর ও নগরগুলোতে বসতি স্থাপন করতে থাকে। এতে করে একদিকে যেমন তারা বিনা ক্লেশে জমির খাজনা প্রদানসহ পেশা ও কর্মের সাথে সম্পর্কিত প্রশাসনিক প্রয়োজন মিটাতে এবং নগরে প্রবর্তিত আধুনিক নাগরিক সুবিধা লাভ করতো, অন্যদিকে তাদের সন্তানরা শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেতো। সংখ্যার দিক থেকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এই শ্রেণি খুব শক্তিশালী না হলেও সময়ের আবর্তে সমাজে তাদের ব্যাপক প্রভাব তৈরি হয়। এই শ্রেণির একটা বড় অংশ সরকারের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হওয়ার কারণে শাসক শ্রেণির সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। ফলে নাগরিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত সমস্যা ও তার সমাধানের ক্ষেত্রে এই শ্রেণির আগ্রহ ছিল দৃশ্যমান। ঢাকার নাগরিকদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। মূলত ইউরোপীয় প্রযুক্তিগত উন্নতি লব্ধ আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসার দ্বারা কলেরা ও প্লেগের ন্যায় মহামারি মোকাবেলা, পাকা রাস্তা নির্মাণ, পয়োগনিষ্কাশন ও বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থাসহ নগরের অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসকশ্রেণি যে আধুনিক নগরজীবনের ধারণা নিয়ে আসে তা নগরবাসীর মানস জগতে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করে। বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও শাসকগোষ্ঠীর প্রতি আড্ডাবহ শ্রেণি এ সকল ব্যবস্থাকে আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করে নিজেদের প্রতিবেশকে পরিবর্তনের বহুবিধ উদ্যোগ গ্রহণসহ শাসকদের আনীত ব্যবস্থাদি প্রয়োগে সহযোগিতা করেন। এ সকল ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ ও ত্রুটিমুক্ত ছিল না এবং তা সার্বজনীনও ছিল না। যার ফলস্বরূপ, একদিকে উন্নত নাগরিক সুবিধা লাভের আকাঙ্ক্ষা ও অন্যদিকে এই ব্যবস্থাদির দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠার প্রচেষ্টা ঢাকা নগরীর জন-জীবনকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত করে ফেলে। যদিও দরিদ্র ও শিক্ষার সুবিধাবঞ্চিত শহুরে অধিবাসী এই আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তথাপি এই প্রক্রিয়ার তাদের অনেককেই বাস্তবচ্যুত ও স্থানচ্যুত এমনকি জীবিকাহীন হতে হয়েছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে উনিশ শতকের ঢাকা ছিল বিভাগীয় কমিশনারের অধীনে পরিচালিত একটি বিভাগীয় সদর দপ্তর। ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতের বহু শহরের ন্যায় মুঘল সুবার রাজধানীর জৌলুশ ও শিল্পউৎপাদনকারীর মর্যাদা হারিয়ে ততদিনে ঢাকা পরিণত হয়েছিল একটি ছোট মফস্বল শহরে— যেখানে জেলা সদরের সিভিল স্টেশনকে কেন্দ্র করে শহরের আবর্তন হয়েছিল। পূর্ব বাংলার ধনী ও প্রভাবশালী জমিদার শ্রেণির বসবাস ছিল মূলত কলকাতায়। ঢাকায় বসবাস করতেন ছোট জমিদাররা। ব্রিটিশ শাসনাধীনে রেলপথ স্থাপন ও জলপথে স্টিমার সার্ভিস চালু করার মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের পারস্পারিক যোগাযোগ দ্রুততর হলে গ্রাম থেকে শহরে অভিগমন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক কারণে ও আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য এ সকল অভিগমন হলেও শিল্পকারখানার অভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল স্বাভাবিক। স্বাভাবিকভাবেই এ সময়ে ঢাকা নগর, গ্রাম ও শহরের যুগল চরিত্র নিয়ে গড়ে উঠেছিল। তবে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভদ্রলোকের সংখ্যার দিক থেকে কলকাতার পরই ঢাকার স্থান হওয়ায় উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথমার্ধ নাগাদ এটি মধ্যবিত্তের শহরে পরিণত হয়। কেননা ঢাকায় বসবাসকারীরা ছিল মূলত প্রশাসনিক ও অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত, যেমন— উকিল, শিক্ষক, ডাক্তার প্রভৃতি। এ সকল পেশাজীবীদের অর্থনৈতিক অবস্থাই তাদের জীবনমান ও সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণ করতো। ফলে দেখা যায়, অধিকতর সুযোগ-সুবিধা, কাঙ্ক্ষিত পেশা এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবন লাভের জন্য এই অভিগমন প্রক্রিয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী। স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাসকারী এই শ্রেণি সর্বদাই তাদের

কল্পনা ও বাস্তবতায় শহর ও গ্রামের এক ধরনের সম্মিলন ঘটাতে চাইতেন, যা শহরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে পরিচালিত করতো। কিন্তু চরিত্রগত দিক থেকে শহর ও গ্রামের মধ্যে পার্থক্য ও ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় এবং শ্রেণির ক্ষেত্রে শহরের সার্বজনীন রূপ কখনো ব্যক্তি মানসে একাকিত্বের অনুভূতি জাগ্রত করতো।^{২০} সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক ফ্রেন তঙ্কিস (Fran Tonkiss) এই ধরনের অনুভূতিকে নগর জীবনের অবশ্যম্ভাবী ফল বলে মন্তব্য করেন, যা সমাজবিজ্ঞানী ওয়াল্টার বেঞ্জামিন ‘Lonely and lost’ বলে আখ্যায়িত করেন এবং একইসাথে এই অবস্থাকে নগরের কোলাহলপূর্ণ জীবনে কাঙ্ক্ষিত অবস্থা বলে মন্তব্য করেন। এ সম্পর্কে মিশেল ডি কার্টেও (Michel de Certeau) তার বিখ্যাত *The practices of everyday life* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, নগর ব্যক্তি জীবনের বস্তুগত ও আদর্শিক দিককে এমন এক দ্বন্দ্বিক অবস্থায় উপনীত করে যার দ্বারা ব্যক্তি নগর জীবনে তার অবস্থানকে সুনির্দিষ্ট করতে সক্ষম হয় এবং ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা সামগ্রিকতাকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নগরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সমাজতাত্ত্বিকদের এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী নগরের রাজনৈতিক ও স্থানিক পরিবর্তন সমাজ বিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। ফলে তাদের মতে নগরে নতুন আগমনকারী ব্যক্তি এ সকল বস্তুগত ও আদর্শিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত হবে ও নিজেও এর অংশে পরিণত হবে। উনিশ-বিশ শতকের ঢাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন এর ব্যতিক্রম ছিল না। উপনিবেশিক বাতাবরণে ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে গঠিত সচেতন শ্রেণি তৈরির ব্রিটিশ প্রচেষ্টা অনেকটাই সফল হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন কলকাতা মিউনিসিপালিটির অধিকর্তা ও জাতীয়তাবাদী নেতা বিপিন চন্দ্রের মত প্রণিধানযোগ্য। তিনি কলকাতা শহরের নাগরিক সুবিধাদির ও স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ ও সচেতন নাগরিকের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয় করেন এবং এর সাফল্য ও ব্যর্থতাকে নাগরিক সচেতনতার উপর নির্ভরশীল বলে মনে করেন। তিনি এ ধরনের জ্ঞানকে “certainly much greater help to the development of man’s higher or spiritual life” বলে মনে করেন।^{২১} এ সময়ে ঢাকার উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত সচেতন নাগরিক একদিকে নগরে নিজেদের জন্য আধুনিক সুবিধা সম্বলিত ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ তৈরীতে ছিলেন অত্যন্ত আগ্রহী অন্যদিকে রাষ্ট্র ও সমাজে নিজেদের অবস্থান তৈরির ক্ষেত্রেও ছিলেন একইভাবে উৎসাহী। ফলে এ সকল বিষয় নিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের পাশাপাশি সমাজের অন্যান্য শ্রেণির সাথে সংঘাত ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সম্পর্কের ফলে যে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের জন্ম হয় তা হোমি ভাবার (Homi Bhaba) মতে “hybrid space” বা “third space”^{২২} হলেও ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের মতে এটি নগরে মিশ্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের জন্ম দেয় যেখানে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিক পরিচয় একই সাথে বিদ্যমান থাকে।^{২৩} গ্রামবাংলা প্রবেশিকা নামক একটি স্থানীয় পত্রিকা তৎকালীন গ্রামবাংলার পরিবেশ ও প্রতিবেশ সম্পর্কে একটি রিপোর্টে গ্রামের পয়োনিকশন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ পানির অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস, নোংরা পোষাক পরিধানকে ম্যালেরিয়া, গুটিবসন্তসহ নানা রোগের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন।^{২৪} এ ধরনের রিপোর্ট একদিকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিজ্ঞান দ্বারা কল্পনাশ্রিত সবুজ শ্যামল গ্রামকে অস্বাস্থ্যকর হিসেবে চিহ্নিত করা অন্যদিকে গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্নতা ও শহুরে পরিবেশে অভ্যস্ততার ইঙ্গিত দেয়। তাছাড়া ‘আধুনিক শহর মানেই স্বাস্থ্যসম্মত শহর’— এটিই ছিল তৎকালীন শহরের মূল ধারণা। ফলে শহরের নাগরিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য এবং নাগরিক সমস্যা সমাধানের জন্য আবেদন, নিবেদন ও দাবি-দাওয়া ছিল নিত্যনৈমিত্তিক।

তবে এ ধরনের সচেতনতা শ্রেণি বিভেদহীন, সার্বজনীন ও সমতাভিত্তিক ছিল না। যার ফলে দেখা যায়, একদিকে এই সচেতন শ্রেণি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতাকে সমালোচনা করে তার প্রতিকার চেয়েছে, আবার একই সমাজে বসবাসকারী নগরবাসীকে তার আর্থিক অবস্থা ও পেশাগত অবস্থান ও আধুনিকতা সাথে বেমানান হিসেবে আলাদা করার দাবি করেছে। সরকারি দলীল-পত্র ও ঢাকা প্রকাশ পত্রিকায় এ ধরনের বিষয়ের অবতারণা পাওয়া যায়। ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত ঢাকা প্রকাশ পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী, ঢাকা দিন দিন অস্বাস্থ্যকর শহরে পরিণত হয়ে পড়েছিল। শহরের জনসংখ্যা দিন দিন বাড়ছিল এবং এর ফলে খালি জায়গা ও অস্বাস্থ্যকর জায়গায় বাড়িঘর তৈরি হতে শুরু করে- যা শহরের পরিবেশকে বিম্লিত করেছিল। রিপোর্টে দাবি করা হয় যে শহরের প্রতি মহল্লায় কমপক্ষে দুই-তিন ঘর মুচি, চামার শ্রেণি রয়েছে। তারা যেখানে সেখানে জীবজন্তুর হাড়, পঁচা মাংস প্রভৃতি ফেলে রাখে যা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি করে।^{২৮} অন্যদিকে শহরের বিভিন্ন মহল্লায় ছড়িয়ে থাকা বারান্দাদের নাগরিক সমাজের স্বাস্থ্যগত ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে বলে মতামত দেয়া হয়। এই অবস্থা থেকে শহরের পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষার জন্য এই মুচি, চামার ও বারান্দা শ্রেণিকে শহরের প্রান্তে আলাদা জায়গায় স্থানান্তরের প্রস্তাব দেয়া হয়। ফলে দেখা যায়, সমাজে নব্য প্রতিষ্ঠিত এই ভদ্রলোক শ্রেণি আধুনিক জীবনকে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনের সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করেছেন, যেখানে অস্বাস্থ্যকর বলতে স্থান বা বস্তুর পাশাপাশি ব্যক্তি ও পেশাকেও চিহ্নিত করেন। আবার মিউনিসিপালিটি প্রদত্ত নাগরিক সুবিধা প্রদানের অপরিপূর্ণতা ও শহরের উচ্চবিত্তদের এলাকার সাথে সাধারণ এলাকার পার্থক্যকেও চিহ্নিত করেন এবং এর কঠোর সমালোচনা করেন। এমনকি ১৮৮৫ সালে যখন মিউনিসিপালিটির পরিচালনা পর্ষদে দেশীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনো এই অবস্থার খুব সামান্যই পরিবর্তন ঘটে। ফলে সচেতন নাগরিক সমাজে এ নিয়ে অভিযোগ ও হতাশার জন্ম হয়। এই ধরনের হতাশা এবং অভিযোগ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর চরিত্র উন্মোচনে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। কেননা, শাসকগোষ্ঠী কাগজে-কলমে ধর্ম-নিরপেক্ষতা, সমতা, ব্যক্তিগত যোগ্যতার কথা বললেও প্রকারান্তে তার কোনোটিই অনুসরণ করেনি। তারা স্থানীয়দের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি ছিল অনেকটাই শ্রদ্ধাহীন। ঢাকা প্রকাশের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৮৮২ সালে ঢাকায় উলাউরা (কলেরা) মহামারি দেখা দিলে নওয়াবপুরবাসী হিন্দু সম্প্রদায় প্রতিরাতে এই বিপদ থেকে রক্ষার জন্য নবাবপুরের রাস্তায় রাস্তায় কীর্তন শুরু করেন। এক সময়ে ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তার গাড়ি কীর্তনকারীদের মিছিলের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করলে হতাহতের ঘটনা ঘটে। এর বিচার দাবি করলে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে রাস্তায় কীর্তন নিষিদ্ধ করা হয়। শাসকগোষ্ঠীর এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে অত্যন্ত নিন্দনীয় ও গর্হিত কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।^{২৯} এ সকল উদাহরণ থেকে ধারণা করা যায়, আধুনিকতা নাগরিক জীবনে যে পরিবর্তনের সূচনা করে তার ফলে উপনিবেশিক আর উপনিবেশিতের মধ্যে এক ধরনের অন্তর্নিহিত সংঘাতের সূচনা হয় এবং শহরের স্থানিক ও প্রতিবেশিক পরিবর্তনের জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। আবার একই সাথে স্থানীয়গণ নিজেদের মধ্যকার বিভাজনকে ভিন্ন আঙ্গিকে সামনে নিয়ে আসে। এই বিভাজন শুধু আধুনিক সচেতন ও উচ্চপেশার আভরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, এটি সমাজে নারী-পুরুষের সমবন্টনের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছিল। নিঃসন্দেহে বলা যায়, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুফল ঢাকার নারী সমাজ লাভ করেছে বিভিন্ন সমাজ কল্যাণকামী ব্যক্তিবর্গ ও সমাজ সংস্কারক সংগঠনের একক ও যৌথ প্রচেষ্টায়। সমাজের হিন্দু মুসলিম উভয় ধর্মের নারীরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছে।

তবে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ভদ্রলোকের তুলনায় ভদ্রমহিলাদের সংখ্যা ছিল নামমাত্র। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এ সকল ভদ্রমহিলারা মূলত ঘরের জন্য মানানসই হবে- এটাই ছিল আদর্শ। এ প্রসঙ্গে সমাকালীন লেখিকা চারুশিলা মিত্র বলেন,

These days much is heard about the social reform, but in reality, nobody comes forward to dedicate his or her life for the development of society. [...]. Currently, we are engaged in political rhetoric, striving eagerly for the autonomous rule. Alas! the oppressions and problems which exist within our society and which call for urgent eradication are often neglected. Disunity among the Bengalis is thought to be their chief defect.³⁰

তবে স্বল্প পরিসরে হলেও এই পরিবর্তন ও প্রচেষ্টা নারীর ঘর ও বাইরের মধ্যে একটি মেলবন্ধন তৈরি করতে সাহায্য করেছে। সমাজ ও রাষ্ট্রে নিজেদেরকে দৃশ্যমান করার প্রক্রিয়াটি এ সময় থেকেই সূচিত হয়েছে। সমাজে বিদ্যমান নারীর প্রতি সহিংসতা, কুসংস্কার, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা ও সতীদাহ প্রথার ন্যায় অমানবিক কর্মকাণ্ডের খুব কমই বিলুপ্ত হয়েছিল।

উপসংহার

আলোচ্য প্রবন্ধে ব্রিটিশদের আমদানিকৃত ইউরোপীয় আধুনিকতা কিভাবে ঢাকার জন-জীবনে প্রভাব ফেলেছিল; এই প্রভাবের ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল এবং তারা এই নব্য আধুনিকতার কতটুকু গ্রহণ ও বর্জন করেছিল- তা মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও ঔপনিবেশিক পরিবেশে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকারের জায়গাগুলোকে আবিষ্কার ও অধিকার প্রয়োগ সহজসাধ্য ছিল না, তথাপি আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও প্রযুক্তির উন্নয়ন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নাগরিক মানসে যে পরিবর্তনের সূচনা করেছিল তার সুদূরপ্রসারী ফল আজও ঢাকার নাগরিক সমাজে বিদ্যমান রয়েছে। এইরূপ ফলাফল ঔপনিবেশিক শাসনে অবশ্যম্ভাবী হলেও নগর ও অঞ্চলভেদে ছিল ভিন্ন। তাই আলোচ্য সময়ে ভারতের অন্যান্য শহরের ন্যায় ঢাকার আধুনিকায়ন হলেও এর প্রভাব ঢাকার জনজীবনকে ভিন্নমাত্রায় প্রভাবিত করেছে।

তথ্যনির্দেশ

- ১ <https://www.worldhistory.org/urbanization>, Visited on August 10, 2023
- ২ V Gordon Childe, "The Urban Revolution" *The Town Planning Review*, Apr. 1950, vol. 21, No.1, Liverpool University Press, p. 4 (Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/40102108>).
- ৩ <https://www.britannica.com/topic/urban-revolution>
- ৪ প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক সীমানা ছিল উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সমতলভূমি, পূর্বে গারো ও লুসাই পর্বত, পশ্চিমে রাজমহল পর্বতমালা ও তৎসংলগ্ন অনুচ্চ মালভূমি ছিল প্রাচীন বাংলার সীমানা। (নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য, *বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস* শান্তি নিকেতন, ১৩৬০, পৃ. ৪; উৎস-মোঃ গোলাম মরতুজা "প্রাচীন বাংলার নগর সভ্যতার বিকাশ ও রূপরেখা", আব্দুল মুমিন চৌধুরী ও ফখরুল আলম (সম্পাদিত) *বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে নগর*" (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৬), পৃ. ১-২।
- ৫ শ্রীরাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, *বাঙ্গলার ইতিহাস*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৩০২ (বাংলা সন)।

- ৬ গোলাম মর্তুজা, পূর্বোক্ত, পৃ.১।
- ৭ গোলাম মর্তুজা, পূর্বোক্ত, পৃ.৪।
- ৮ Kenneth L. Gillion, *Ahmedabad A Study in Indian Urban History*, (University of California Press, 1968), p.1.
- ৯ অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের ভারতীয় শহর* (আনন্দ পাবলিশার্স : কলকাতা, ১৯৯৯), পৃ. ১২।
- ১০ শেখর ভৌমিক, অরিন্দম চক্রবর্তী (সম্পাদিত) *বাংলার শহর* (বাংলার শহর উপনিবেশিক পর্ব ১ আকাশদীপ : কলকাতা, ২০১৫), পৃ. ৩২।
- ১১ বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক অভিধান, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৫ (৬ষ্ঠ সংস্করণ), পৃ. ৬৫৬।
- ১২ বাংলা একাডেমি তদেব অভিধান, পৃ. ১০৭২।
- ১৩ কক্কনানন্দ ভিক্ষু, “পালি সাহিত্যে নগরবিন্যাস ও নগরজীবন”, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ৯।
- ১৪ আব্দুল মুমিন চৌধুরী ও ফখরুল আলম (সম্পাদিত), *বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে নগর*, পৃ. ১।
- ১৫ সুবিকাশ মুখোপাধ্যায়, “নগরায়ণ প্রক্রিয়ার উপাদান ও পরিমাপ-সূচক একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ” শেখর ভৌমিক, অরিন্দম চক্রবর্তী (সম্পাদিত) *বাংলার শহর*, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৩২।
- ১৬ Report on the administration of Bengal, Year 1875.
- ১৭ গোলাম রব্বানী, ‘Parks and Open Spaces in British Times’, in *ENVIRONMENT OF CAPITAL DHAKA Plants Wildlife Gardens Parks Open Spaces Air Water Earthquake*, the Celebration of 400 Years of Capital Dhaka Project, Asiatic Society of Bangladesh (Book Chapter), Dhaka, May 2010.
- ১৮ ফকরুল চৌধুরী (সম্পাদিত), *উপনিবেশবাদ ও উত্তর -ঔপনিবেশিক পাঠ*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১১ (২য় সংস্করণ), পৃ. ১২।
- ১৯ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদ হলো “[...] state policy, practice, or advocacy of extending power and dominion, especially by direct territorial acquisition or by gaining political and economic control of other areas”. <https://www.britannica.com/topic/imperialism>.
- ২০ বিভিন্ন ঐতিহাসিক civilizing mission- এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। হেরাল্ড ফিচার টাইন ও মিশেল ম্যান সম্পাদিত (Harald Fischer- Tine and Michel Mann (eds.) *Colonialism as Civilizing Mission: Cultural Ideology in British India* (London & New York: Anthem Press, 2004, p.1-26) গ্রন্থে মিশেল ম্যান এর “Torchbearers Upon the Path of Progress”: Britain’s Ideology of “Moral and Material Progress” in India” শিরোনামে লিখিত প্রবন্ধে Civilizing Mission এর সংজ্ঞাটি প্রনিধানযোগ্য। তার সংজ্ঞা ও আলোচনা অনুযায়ী, “At its core, the civilizing mission was about morally and materially ‘uplifting’, ‘improving’ and later ‘developing’ the supposedly ‘backward’ or ‘rude’ people of India to make them more civilized and the British (and Europeans generally) at the top.” Carey A. Watt and Mishel Mann (eds.), *Civilizing Missions in Colonial and Postcolonial South Asia: From Improvement to Development*, London-New York- Delhi: Anthem Press, 2011, p.1.
- ২১ Watt, *Civilizing Missions*, p.1.
- ২২ “We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English

in taste, in opinions, in morals, and in intellect. Source: English Education Act 1835 (2023, January 18), https://en.wikipedia.org/wiki/English_Education_Act_1835

- ২৩ Fran Tonkiss, *Space, the City and Social Theory: Social Relations and Urban forms*, (Cambridge : Polity Press, 2005), p. 114.
- ২৪ Bipin Chandra Pal, *The Calcutta Municipal Gazette*, ed. by Arun Kumar Roy, Kolkata, Information and Public Relation Department Kolkata municipal Corporation,, 2010, p. 18.
- ২৫ Homi k. Bhaba *The Location of Culture*, (London and New York, Routledge, 1994), p.2.
- ২৬ Cited by Tonkiss, *Space, the City and Social Theory* p. 120.
- ২৭ গ্রামবাংলা প্রবেশিকা, ৭/১৫, ডিসেম্বর ১৮৬৯.
- ২৮ ঢাকা প্রকাশ, ৪ জুন ১৮৬৩।
- ২৯ ঢাকা প্রকাশ, ৪ জুন ১৮৮২।
- ৩০ Ipsita Chanda, Jayeeta Bagchi (ed.) *Shaping the Discourse: Women's Writings in Bengali Periodicals, 1865-1947*, School of Women's Studies, Jadavpur University, 2014, p. 32

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯: ইসলামি নির্দেশনার আলোকে একটি পর্যালোচনা

মোহাম্মদ নুরুল আমিন*
মোহাম্মদ মোফাজ্জল হোসাইন রাসেল*

Abstract

Consumer rights are one of the principles of Islamic commercial law. Bangladesh government has already drafted a comprehensive law to protect consumer rights. The Act includes various remedial measures, preventive measures and penal measures. In this law, there is a system to eliminate all crimes committed at the stage of product production, sale and storage. Consumers in Bangladesh are already starting to reap the benefits of this law. Moreover, considering the country's majority Muslim population, this law needs to be reviewed from an Islamic perspective. Although there are various books, essays and articles related to consumer rights, no research has been conducted on the review of the 'Consumer Rights Protection Act 2009'. In this article, each section of the law has been analyzed and compared with Islamic guidelines. The successful implementation of the rules prescribed by Islam will play a helpful role in getting more benefits of this law. Making the majority Muslim population of Bangladesh aware of the issues of this law from an Islamic perspective and implementing the suggestions presented in the article at the policy-making level will play a positive role in protecting consumer rights.

চাবিশব্দ: ভোক্তা, পণ্য, সেবা, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসায়-বাণিজ্য

উপস্থাপনা

ভোক্তা অধিকার ইসলামি বাণিজ্যিক আইনের অন্যতম নীতি। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন রচনা করেছে। এ আইনে বিভিন্ন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ আইনে পণ্য উৎপাদন পর্যায়ে, বিক্রয় ও সংরক্ষণ পর্যায়ে সৃষ্ট সকল অপরাধ নির্মূলের ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশের ভোক্তারা ইতোমধ্যে এ আইনের সুফল পেতে শুরু করেছে। তদুপরি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী বিবেচনায় এ আইন ইসলামি দৃষ্টিকোণে পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। ভোক্তা অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, নিবন্ধ থাকলেও 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯' এর পর্যালোচনাপূর্বক কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়নি। এ প্রবন্ধে উক্ত আইনের প্রতিটি ধারা বিশ্লেষণপূর্বক ইসলামি নির্দেশনার সাথে তুলামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। ইসলাম নির্দেশিত বিধানাবলির সফল বাস্তবায়ন এ আইনের অধিকতর সুফল লাভে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ আইনের বাস্তবায়নে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম প্রশংসার দাবিদার।

* অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

* পিএইচডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

১. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ : সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ প্রণয়নের আগে সীমিতভাবে বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষিত হতো। ভোক্তা অধিকার আইন প্রণীত হওয়ার আগে কমবেশি ৪০টি আইন ও ধারা বিচ্ছিন্নভাবে ভোক্তা অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলো। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হলো- The Drug Act-1940, Essential Commodities Act-1957 (Act No.3,1957), The Pure Food Ordinance-1957, Essential Commodities (Storage Keeping and disposal) Order-1973, The Special Powers Act-1974, The Bangladesh Hotel and Restaurant Ordinance, 1982 and Bangladesh Standard and Testing Institute Ordinance, ১৯৮৫ ইত্যাদি। অবশেষে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ, ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বিধান করার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত ও কার্যকর আইন হিসেবে ‘ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯’ প্রণীত হয়। এ আইনের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে- “যেহেতু ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ, ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল।”^১

পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবসা হলেও এর পেছনে যে উদ্দেশ্য থাকে তা হলো ভোক্তার চাহিদা পূরণ। সুতরাং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ভোক্তার অধিকারের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ আইনের উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো হলো-

১.১. ভোক্তা পরিচিতি: (অধ্যায়-১) প্রতিটি আইনের একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ হলো বিভিন্ন পরিভাষার সংজ্ঞায়ন। তথা এ আইনের কোনো পরিভাষা দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, তার একটি সুনির্দিষ্ট বিবরণ। এ আইনের প্রথম অধ্যায়ের ২ নং ধারায় বিভিন্ন পরিভাষা সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে। যেমন- ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯’ অনুযায়ী “ভোক্তা হলেন এমন কোনো ব্যক্তি,- (ক) যিনি পুনঃবিক্রয় ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ব্যতীত- (অ) মূল্য পরিশোধে বা মূল্য পরিশোধের প্রতিশ্রুতিতে কোনো পণ্য ক্রয় করেন; (আ) আংশিক পরিশোধিত ও আংশিক প্রতিশ্রুত মূল্যের বিনিময়ে কোনো পণ্য ক্রয় করেন; বা (ই) প্রলম্বিত মেয়াদ বা কিস্তির ব্যবস্থায় মূল্য পরিশোধের প্রতিশ্রুতিতে কোনো পণ্য ক্রয় করেন; (খ) যিনি ক্রেতার সম্মতিতে দফা (ক) এর অধীন ক্রীত পণ্য ব্যবহার করেন; (গ) যিনি পণ্য ক্রয় করে তা, আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্থায়ী জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে, বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করেন; (ঘ) যিনি, (অ) মূল্য পরিশোধে বা মূল্য পরিশোধের প্রতিশ্রুতিতে কোনো সেবা ভাড়া বা অন্যভাবে গ্রহণ করেন; বা (আ) আংশিক পরিশোধিত ও আংশিক প্রতিশ্রুত মূল্যের বিনিময়ে কোনো সেবা ভাড়া বা অন্যভাবে গ্রহণ করেন; বা (ই) প্রলম্বিত মেয়াদ বা কিস্তির ব্যবস্থায় মূল্য পরিশোধের বিনিময়ে কোনো সেবা ভাড়া বা অন্যভাবে গ্রহণ করেন; বা (ঙ) যিনি সেবা গ্রহণকারীর সম্মতিতে দফা (ঘ) এর অধীন গৃহীত কোনো সেবার সুবিধা ভোগ করেন।”^২

১.২. জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ। (অধ্যায়-২) ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৩টি ধারায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ নামে ২৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিষদ গঠনের কথা বলা হয়েছে। এ পরিষদের অধীনে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন ও কার্যাবলি আলোচিত হয়েছে। জাতীয় ভোক্তা অধিকার পরিষদের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি হলো- ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা

প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালককে নির্দেশ প্রদান, বিভিন্ন প্রবিধানমালা প্রণয়ন, ভোক্তা-অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা, সরকারকে পরামর্শ প্রদান, গবেষণার ব্যবস্থা করা, মহাপরিচালক এবং অধিদপ্তরের কাজকর্ম তদারকি ও পর্যবেক্ষণ করা, জেলা কমিটি গঠন, উপজেলা কমিটি গঠন, ইউনিয়ন কমিটি গঠন এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে যেকোনো ইতিবাচক কার্যাবলি সম্পাদন।^৭ ইতোমধ্যে সরকার ২৯ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ, ১১ সদস্য বিশিষ্ট জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি, ১৮ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি, ২০ সদস্য বিশিষ্ট ইউনিয়ন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন করেছে।^৮

১.৩. ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠান। (অধ্যায়-৩) এ অধিদপ্তর দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

১.৪. জনসচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম। [ধারা ৮(ঙ)-৮(ছ)] এ আইনের ৮(ঙ) ধারানুসারে ভোক্তা অধিকার সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রচারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করার নির্দেশনা রয়েছে। ৮(চ) ধারানুসারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের সুফল ও ভোক্তা অধিকার বিরোধী কার্যের কুফল সম্পর্কে গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং ৮(ছ) ধারানুসারে ভোক্তা অধিকার সুরক্ষায় গবেষণা করার নির্দেশনা রয়েছে।

১.৫. গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির ক্ষমতা। (ধারা-২৪) (১) মহাপরিচালক অথবা সরকারের নিকট হতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার যদি এরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, (ক) কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ করেছেন; বা (খ) এই আইনের অধীন অপরাধ সংক্রান্ত কোনো বস্তু বা তা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো দলিল, কাগজপত্র বা কোনো প্রকার জিনিসপত্র কোনো স্থানে বা কোনো ব্যক্তির নিকট রক্ষিত আছে; তাহলে, উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার জন্য বা অপরাধ সংশ্লিষ্ট উক্ত বস্তু, দলিল, কাগজপত্র বা জিনিসপত্র যে স্থানে রক্ষিত আছে সে স্থান তল্লাশির জন্য পরোয়ানা জারি করতে পারবে।

১.৬. ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্যের জন্য দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি সাময়িকভাবে বন্ধের নির্দেশ। (ধারা-২৭) ধারা ২৭ অনুসারে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে মহাপরিচালক বা ক্ষেত্রমতে কোনো কর্মকর্তা কোনো দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ফ্যাক্টরী, কারখানা বা গুদামে ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কোনো পণ্য বিক্রয় বা উৎপাদিত হচ্ছে কিংবা গুদামজাত করে রাখা হয়েছে এইরূপ প্রতীয়মান হলে ঐ দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি সাময়িকভাবে বন্ধের নির্দেশ দিতে পারবেন। কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সাময়িকভাবে বন্ধ করা হলে অধিদপ্তর নিয়মিত শুনানি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তদন্ত করে ভোক্তা-অধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় গ্রহণ করে এবং প্রকৃতই এই আইনের কোনো বিধানের লঙ্ঘনের ফলে ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য হয়েছে কিনা তা সঠিকভাবে নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১.৭. মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর পণ্য সামগ্রী উৎপাদন, বিক্রয় ইত্যাদির উপর বিধি নিষেধ। (ধারা-২৯) কোনো পণ্য মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হলে, মহাপরিচালকের পরামর্শক্রমে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সমগ্র দেশে বা কোনো

নির্দিষ্ট এলাকায় এইরূপ পণ্যের উৎপাদন, আমদানি বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার বা প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত শর্তাধীনে ঐ সকল কার্যক্রম পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার বিষয়ে নির্দেশ জারি করতে পারবে।

১.৮ তদ্বাশির উদ্দেশ্যে যেকোনো স্থানে প্রবেশের ক্ষমতা ও নমুনা সংগ্রহ। এ আইনের ধারা ৩০ ও ৩১ অনুসারে ভোক্তা অধিকার লংঘন হওয়ার কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকলে সে স্থানে প্রবেশ ও সে স্থান থেকে নমুনা সংগ্রহের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে অধিদপ্তরকে।

১.৯ অপরাধের জন্য পণ্য বাজেয়াপ্ত করা। (ধারা-৩৩) এই আইনের কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে, যে পণ্য উপাদান, সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, উপকরণ, আধার, পাত্র, মোড়ক সহযোগে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সেইগুলি বাজেয়াপ্তযোগ্য হবে।

১.১০ ভেজাল পণ্য সরাসরি আটক ও নিষ্পত্তি। (ধারা-৩৬) এই আইনের অধীন অধীন গৃহীত কোনো অনুসন্ধানে, তদন্ত বা বিচার কার্যক্রমে যদি প্রতীয়মান হয়ে যে, কোনো পণ্য দৃশ্যতঃ ভেজাল এবং মানুষের খাদ্য হিসাবে ভক্ষণের অযোগ্য বা মানুষের জন্য ক্ষতিকর এবং অনুরূপ অভিযোগ প্রতিপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত হয় বা অস্বীকার না করা হয়, তাহা হলে উক্ত পণ্য সরাসরি আটক করে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবহার, হস্তান্তর, ধ্বংস বা অন্য কোনো প্রকারে বিলি বন্দোবস্ত করা যাবে।

১.১১ পণ্যের মোড়ক ব্যবহার না করার দণ্ড (ধারা-৩৭) কোনো ব্যক্তি কোনো আইন বা বিধি দ্বারা কোনো পণ্য মোড়কাক্রমে বিক্রয় করার এবং মোড়কের গায়ে সংশ্লিষ্ট পণ্যের ওজন, পরিমাণ, উপাদান, ব্যবহার-বিধি, সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য, উৎপাদনের তারিখ, প্যাকেটজাতকরণের তারিখ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করার বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করে থাকলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.১২ মূল্যের তালিকা প্রদর্শন না করার দণ্ড (ধারা-৩৮) কোনো ব্যক্তি কোনো আইন বা বিধি দ্বারা আরোপিত বাধ্যবাধকতা অমান্য করে তার দোকান বা প্রতিষ্ঠানে সহজে দৃশ্যমান কোনো স্থানে পণ্যের মূল্যের তালিকা লটকাইয়া প্রদর্শন না করে থাকলে অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

১.১৩ সেবার মূল্যের তালিকা সংরক্ষণ ও প্রদর্শন না করার দণ্ড (ধারা-৩৯) কোনো ব্যক্তি আইন বা বিধি দ্বারা আরোপিত বাধ্যবাধকতা অমান্য করে তার দোকান প্রতিষ্ঠানের সেবার মূল্যের তালিকা সংরক্ষণ না করলে এবং সংশ্লিষ্ট স্থানে বা সহজে দৃশ্যমান কোনো স্থানে উক্ত তালিকা লটকাইয়া প্রদর্শন না করলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.১৪ ধার্যকৃত মূল্যের অধিক মূল্যে পণ্য, ঔষধ বা সেবা বিক্রয় করার দণ্ড (ধারা-৪০) কোনো ব্যক্তি কোনো আইন বা বিধির অধীন নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে কোনো পণ্য ঔষধ বা

সেবা বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.১৫ ভেজাল পণ্য বা ঔষধ বিক্রয়ের দণ্ড (ধারা-৪১) কোনো ব্যক্তি জ্ঞাতসারে ভেজাল মিশ্রিত পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় করলে বা করতে প্রস্তাব করলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.১৬ খাদ্য পণ্য নিষিদ্ধ দ্রব্যের মিশ্রণের দণ্ড (ধারা-৪২) মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক কোনো দ্রব্য, কোনো খাদ্য পণ্যের সহিত যাহার মিশ্রণে কোনো আইন বা বিধির অধীন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি উক্তরূপ দ্রব্য কোনো খাদ্য পণ্যের সহিত মিশ্রিত করলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.১৭ অবৈধ প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণের দণ্ড (ধারা-৪৩) কোনো ব্যক্তি মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় এমন কোনো প্রক্রিয়ায়, যাহা কোনো আইন বিধির অধীন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কোনো পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণ করলে তিনি অনূর্ধ্ব দুই বছর কারাদণ্ড, বা এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.১৮ মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতা সাধারণকে প্রতারণিত করার দণ্ড (ধারা-৪৪) কোনো ব্যক্তি কোনো পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অসত্য বা মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতা সাধারণকে প্রতারণিত করলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.১৯ প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ না করার দণ্ড (ধারা-৪৫) কোনো ব্যক্তি প্রদত্ত মূল্যের বিনিময়ে প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ না করলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.২০ ওজন কারচুপির দণ্ড (ধারা-৪৬) কোনো ব্যক্তি কোনো পণ্য সরবরাহ বা বিক্রয়ের সময় ভোক্তাকে প্রতিশ্রুতি ওজন অপেক্ষা কম ওজনে উক্ত পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহ করলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.২১ বাটখারা বা ওজন পরিমাপক যন্ত্রে কারচুপির দণ্ড (ধারা-৪৭) কোনো পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তির দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ওজন পরিমাপের কার্যে ব্যবহৃত বাটখারা বা ওজন পরিমাপক যন্ত্র প্রকৃত ওজন অপেক্ষা অতিরিক্ত ওজন প্রদর্শনকারী হলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.২২ পরিমাপে কারচুপির দণ্ড (ধারা-৪৮) কোনো ব্যক্তি পণ্য সরবরাহ বা বিক্রয়ের সময় ভোক্তাকে প্রতিশ্রুত পরিমাপ অপেক্ষা কম পরিমাপে উক্ত পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহ করলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.২৩ দৈর্ঘ্য পরিমাপের কার্যে ব্যবহৃত পরিমাপক ফিতা বা অন্য কিছুতে কারচুপির দণ্ড (ধারা-৪৯) কোনো পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দৈর্ঘ্য

পরিমাপের কার্যে ব্যবহৃত পরিমাপক ফিতা বা কিছুতে কারচুপি করলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.২৪ পণ্যের নকল প্রস্তুত বা উৎপাদন করার দণ্ড (ধারা-৫০) কোনো ব্যক্তি কোনো পণ্যের নকল প্রস্তুত বা উৎপাদন করলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.২৫ মেয়াদ উত্তীর্ণ কোনো পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় করার দণ্ড (ধারা-৫১) কোনো ব্যক্তি মেয়াদ উত্তীর্ণ কোনো পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় করলে বা করতে প্রস্তুত করলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.২৬ সেবা গ্রহীতার জীবন বা নিরাপত্তা বিপন্নকারী কার্য করার দণ্ড (ধারা-৫২) কোনো ব্যক্তি, কোনো আইন বা বিধির অধীন নির্ধারিত বিধি-নিষেধ অমান্য করে সেবা গ্রহীতার জীবন বা নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে এমন কোনো কার্য করলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন বছর কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.২৭ অবহেলা, ইত্যাদি দ্বারা সেবা গ্রহীতার অর্থ, স্বাস্থ্য জীবনহানি, ইত্যাদির দণ্ড (ধারা-৫৩) কোনো সেবা প্রদানকারী অবহেলা, দায়িত্বহীনতা বা অসতর্কতা দ্বারা সেবা গ্রহীতার অর্থ, স্বাস্থ্য বা জীবনহানী ঘটালে তিনি অনূর্ধ্ব তিন বছর কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.২৮ মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা দায়েরের দণ্ড (ধারা-৫৪) কোনো ব্যক্তি, কোনো ব্যবসায়ী বা সেবা প্রদানকারীকে হয়রানি বা জনসমক্ষে হেয় করা বা তার ব্যবসায়িক ক্ষতি সাধনের অভিপ্রায়ে মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করলে, উক্ত ব্যক্তি অনূর্ধ্ব তিন বছর কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.২৯ অপরাধ পুনঃ সংঘটনের দণ্ড (ধারা-৫৫) এই আইনে উল্লিখিত কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তি যদি পুনরায় একই অপরাধ করেন তবে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ যে দণ্ড রয়েছে এর দ্বিগুণ দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১.৩০ দ্রুত এবং সংক্ষিপ্তভাবে বিচার (ধারা- ৫৭, ৫৮) এ আইনের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার করতে হবে। এ বিচার যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে করতে হবে।

১.৩১ বিচার পদ্ধতি (ধারা ৫৭-৬৪) এ আইনের পঞ্চম অধ্যায়ে বিচার পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে। এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ জামিনযোগ্য, আমলযোগ্য ও আপোষযোগ্য হবে এবং ১ম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার্য হবে। অপরাধের কারণ উদ্ভব হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে পরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট অভিযোগ দায়ের করতে হবে এবং অভিযোগ দায়েরের ৯০ দিনের মধ্যে অভিযোগপত্র ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দাখিল করা না হলে ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করবেন না। ম্যাজিস্ট্রেটের রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে ৬০ দিনের মধ্যে সেশন জজের আদালতে আপীল করা যাবে।

১.৩২ দেওয়ানি প্রতিকার (ধারা-৬৬-৬৮) এ আইনে ফৌজদারি কার্যক্রমের পাশাপাশি দেওয়ানি প্রতিকারেরও ব্যবস্থা রয়েছে। ভোক্তা চাইলে দেওয়ানি প্রতিকারও নিতে পারেন। ক্ষতিগ্রস্ত কোনো ভোক্তা ক্ষতির পরিমাণ আর্থিক মূল্যে নিরূপণযোগ্য হলে ক্ষতির অনধিক পাঁচগুণ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দাবী করে 'যুগ্ম জেলা জজ' আদালতে দেওয়ানি প্রকৃতির বা ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করতে পারবে। এবং যুগ্ম জেলা জজের রায় ও ডিক্রীর বিরুদ্ধে ৯০ দিনের মধ্যে সরাসরি সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আপীল দায়ের করা যাবে। আদালত ক্ষতিপূরণ প্রদান ছাড়াও ক্রটিপূর্ণ পণ্যের প্রতিস্থাপনের নির্দেশ এবং ক্রটিপূর্ণ পণ্য ফেরত নিয়ে পণ্যের মূল্য বাদীকে ফেরত প্রদানের নির্দেশ দিতে পারেন।

১.৩৩ অভিযোগ ও জরিমানার টাকা অভিযোগকারীর অংশ। (ধারা-৭৬) এই অধ্যাদেশের অধীন ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য সম্পর্কে যেকোনো ভোক্তা (অধিদপ্তরের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী ব্যতীত) মহাপরিচালক বা নিয়োজিত কোনো কর্মকর্তার নিকট অভিযোগ দায়ের পরবর্তী তদন্তে অভিযোগটি সঠিক প্রমাণিত হলে জরিমানা দণ্ড আরোপ ও জরিমানা অর্থ আদায় হলে উক্ত আদায়কৃত অর্থের ২৫ শতাংশ তাৎক্ষণিকভাবে অভিযোগকারীকে প্রদান করতে হবে।

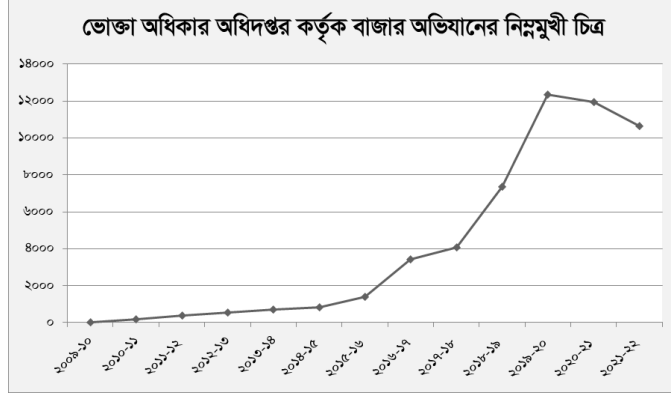
২. জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত চিত্র

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯-এর তৃতীয় অধ্যায়ের নির্দেশনা অনুসারে গঠিত জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ভোক্তা অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিভিন্ন বাজার অভিযান পরিচালনা, অভিযানে প্রাপ্ত অনিয়মের ভিত্তিতে দণ্ড আরোপ, নাগরিক কর্তৃক অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি করা, গণশুনানি, জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ অধিদপ্তরের কার্যক্রমসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো-

অর্থবছর	বাজার অভিযানের সংখ্যা	দণ্ডিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আদায়কৃত জরিমানার টাকার পরিমাণ
২০০৯-১০	৭	৫৪	১,৬৫,৫০০/-
২০১০-১১	১৭৪	১৫১২	১,৬৯,৬১,৩০০/-
২০১১-১২	৩৭১	২৬৫৫	২,৭১,৬৪,৩০০/-
২০১২-১৩	৫৪০	২৮৯৫	২,১৩,৬৯,৫০০/-
২০১৩-১৪	৭২১	২৮৪৪	১,৭৭,৩১,১০০/-
২০১৪-১৫	৮৪১	৩০২৪	২,০৩,৪০,৩৫০/-
২০১৫-১৬	১৩৯৪	৪৮৬৫	৩,২৩,৮২,০৫০/-
২০১৬-১৭	৩৪৩৭	৯৩০৬	৬,৮৭,০৯,৩০০/-
২০১৭-১৮	৪০৭৭	১১৭১৮	১৪,১৪,৭৮,২০০/-
২০১৮-১৯	৭৩৪৩	১৯২৩৪	১৫,৭২,৩৭,৮৫০/-
২০১৯-২০	১২৩৫১	২২২৪৪	১১,৯১,৪৭,২০০/-
২০২০-২১	১১৯৫৩	২২৯৯৬	১৩,৮৩,০৮,৩০০/-
২০২১-২২	১০৬২৫	২৫৬১৩	১৮,০৩,৬৪,৬০০/-

(জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এর ‘বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১’ ও ‘বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২’-এর আলোকে গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সারণি)

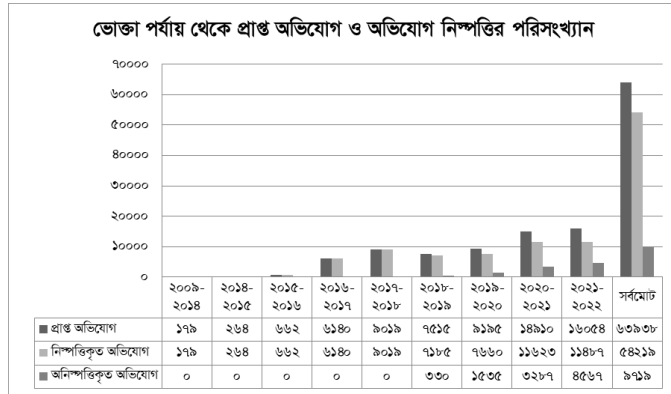
২০০৯ থেকে অদ্যাবধি ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বাজার অভিযান পরিচালনা এ অধিদপ্তরের একটি সফলতম কার্যক্রম। কিন্তু দেশের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ক্ষেত্রের বিস্তৃতি ও ভোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাজার অভিযানের নিম্নমুখী চিত্র লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে



চিত্রে উপস্থাপিত-

(জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এর ‘বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১’ ও ‘বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২’-এর আলোকে গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সারণি)

ভোক্তা পর্যায়ে থেকে বিভিন্ন অভিযোগ প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অন্যতম কার্যক্রম। নিম্নে অর্থবছর ভিত্তিক বিভিন্ন অভিযোগ প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির বিবরণ তুলে ধরা হলো-



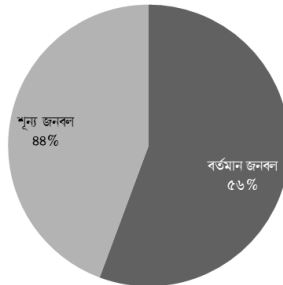
(জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এর ‘বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১’ ও ‘বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২’-এর আলোকে গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সারণি)

উপরিউক্ত সারণি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অধিদপ্তরের অনিস্পন্ন অভিযোগের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং ভোক্তা অধিকার সুরক্ষায় এ বিষয়ে আরো অধিক মনোনিবেশ করা প্রয়োজন।

ভেজাল প্রতিরোধে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের জনসচেতনতামূলক কর্মসূচির অংশ হিসেবে অধিদপ্তর গণশুনানী, সচেতনতামূলক সভা, মতবিনিময় সভা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন ও পোস্টার, প্যাম্পলেট, লিফলেট, স্টিকার, ক্যালেন্ডার ইত্যাদি বিতরণ করে থাকে। বিগত বছরসমূহের ধারাবাহিকতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে ৬৪ টি জেলা ও ৪৩২ টি উপজেলা পর্যায়ে মোট ৭৪০ টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে দেশব্যাপী ১০৭৫ টি মতবিনিময়/সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও জনসচেতনতা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৩ লক্ষ প্যাম্পলেট, ৪ লক্ষ লিফলেট এবং ৩০ হাজার ক্যালেন্ডার মুদ্রণ ও ভোক্তা-ব্যবসায়ী-অংশীজনের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।^৫

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের জনবল সংকট প্রকট। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়, ৮টি বিভাগীয় কার্যালয় এবং ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সমগ্র দেশের সকল ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠান দায়িত্বে নিয়োজিত সমগ্র দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী কোনো না কোনো প্রণেয় ভোক্তা, আবার একজন ব্যক্তি একাই অসংখ্য পণ্যের ভোক্তা। অর্থাৎ, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তৃত। এ বিশাল কর্মক্ষেত্র তদারকির জন্য ২০০৯ সালে অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার সময় এ সংস্থার জন্য ১জন মহাপরিচালক, ২ জন পরিচালক, ১১ জন উপপরিচালক ও ৮৬ জন সহকারী পরিচালকসহ সর্বমোট ২৪০ জনের জনবল কাঠামো অনুমোদন করে। সরকার ইতোমধ্যে এ সংস্থার বৃহৎ কর্মপরিধি বিবেচনায় সংস্থার কার্যক্রমে গতিশীলতা সৃষ্টিতে নতুন ১৪৮টি পদ সৃষ্টি করেছে।^৬ বর্তমানে এ সংস্থার জনবল ৩৮৮ জন। কিন্তু বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন ২১৬ জন এবং শূন্যপদ ১৭২টি। অপ্রতুল জনবল কাঠামো ও বরাদ্ধকৃত জনবল সংকট এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সুফল পেতে জনগণ ব্যর্থ হচ্ছে। প্রধান কার্যালয়ের কার্যক্রম আমরা প্রায়শই মিডিয়ায় লক্ষ্য করলেও জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কার্যক্রম এখনো যথাযথভাবে দৃশ্যমান নয়।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের জনবল পরিসংখ্যান



উপরিউক্ত পরিসংখ্যান দেখে দৃশ্যমান যে, অধিদপ্তরের বর্তমান ৪৪% পদ জনবল শূন্য রয়েছে। তাছাড়া অধিদপ্তরের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী মিলিয়ে মোট ২১৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন, কিন্তু এ ২১৬ জনই বাজারে অভিযান পরিচালনা করতে পারেন না। তাঁরা শুধু ওই ৮৫ জন কর্মকর্তার সহযোগী হয়ে কাজ করতে পারেন। অথচ সদরদপ্তরসহ ৮টি বিভাগের পাশাপাশি ৬৪টি জেলায় অফিস রয়েছে। সর্বোপরি দেশের ১৭ কোটি ভোক্তার অধিকার রক্ষার্থে কার্যক্রম পরিচালনা করায় এ স্বল্প জনবল কোনোভাবেই যথেষ্ট নয়। ইতোমধ্যে অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ৪৬৫ জন জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে দেওয়া হয়েছে। ভোক্তা অধিদপ্তরের জনবল সংকটের বিষয়ে কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সভাপতি গোলাম রহমান বলেন, দেশের জনগণের সরাসরি দেখভাল করার একমাত্র প্রতিষ্ঠান ভোক্তা অধিকার ও সংরক্ষণ অধিদপ্তর। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ খুবই ভোক্তাবান্ধব। কিন্তু জনবল সংকটের কারণে এই আইনের সুফল পাচ্ছে না ভোক্তা। তাই প্রতিষ্ঠানটির জনবল বাড়তে হবে। শুধু জনবল বাড়ালেই হবে না, ভোক্তার স্বার্থ রক্ষায় সারা দেশে আরো জোরালোভাবে অধিদপ্তরের কার্যক্রম চালাতে হবে।^৭

৩. ইসলামি দৃষ্টিকোণে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের পর্যালোচনা

ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, সেবা ও পণ্যের বিনিময় ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নির্ধারণ করেছে। এ নীতিমালায় ভোক্তার অধিকারের বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে উল্লিখিত বিষয়াদি ইসলামি নির্দেশনার আলোকে পর্যালোচনা করা হলো।

৩.১ ভোক্তা অধিকার সুরক্ষায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন: ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ২য় ও ৩য় অধ্যায়ে ‘জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ’, ‘জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি’, ‘উপজেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি’, ‘ইউনিয়ন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি’ এবং সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার নির্দেশনা রয়েছে। ইসলাম উৎপাদনকারী, বাজারজাতকারী, সেবাপ্রদানকারী, খুচরা বিক্রেতাসহ সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য বাজার তদারকি করতে নির্দেশনা দেয়। ইসলামি অর্থনীতিতে বাজারের সকল অসৎ প্রবণতা রোধকল্পে ‘আল-হিসাব’ ব্যবস্থাপনার দৃষ্টান্ত রয়েছে। মদিনায় মহানবি (সা.) বাজার পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) কখনো কখনো নিজেই বাজার পর্যবেক্ষণ করতেন,^৮ তবে এ কাজে তিনি সাঈদ ইবন আল আস বিন উমাইয়্যাকে নিযুক্ত করেছিলেন।^৯

৩.২ জনসচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম: ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা করতে ইসলাম উৎসাহিত করেছে এবং প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আদেশ করেছে। ইসলাম প্রতিটি ক্ষেত্রেই চিন্তা-গবেষণা করতে উৎসাহ দেয় এবং জনসচেতনতা তৈরি, শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমে প্রয়োজনে অভিজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করার নির্দেশনা রয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী, “জ্ঞানীদের নিকট জিজ্ঞাসা করো যদি তোমরা না জানো।”^{১০}

৩.৩ প্রেক্ষতার পরোয়ানা জারি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সাময়িক বন্ধ ঘোষণা: ইসলামি নির্দেশনা হলো আদালত অথবা ভোক্তা অধিকার সুরক্ষায় নিয়োজিত রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কোনো ভোক্তা কর্তৃক

অভিযোগ না পাওয়া সত্ত্বেও ভোক্তা অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ পরিলক্ষিত হলে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির মাধ্যমে আদালতে তলব ও বিচার কার্যক্রম শুরু করতে পারবেন; তবে লক্ষ্য রাখতে হবে কোনোভাবেই যেনো কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে অযথা হয়রানি করা না হয়। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কারো ক্ষতি করা যাবে না এবং কারো ক্ষতির কারণও হওয়া যাবে না।”^{১১}

এ হাদিস থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে কারো যেকোনো ধরনের অনিষ্ট সাধন করা ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। সুতরাং ভোক্তা অধিকার সুরক্ষায় যেমন গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার মাধ্যমে বিবাদীর অনিষ্ট অতি দ্রুত রোধ করা সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে নিরপেক্ষ ও সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কারো বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করতে হবে, যেনো কারো উপর অবিচার করা না হয়। এ সম্পর্কে ইবনু আবিদীন বলেন, “যদি কোনো বিশিষ্ট মর্যাদাবান লোক থেকে কোনো ধরনের পদস্বলন ঘটে, ছোট খাট ত্রুটি সংঘটিত হয়, তাহলে বিচারক প্রয়োজন মনে করলে তাকে আদালতে ডেকে এনে তার কৃত অপরাধ সম্পর্কে তাকে অবহিত করতে পারেন।”^{১২}

৩.৪ মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য অথবা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর পণ্য নিষিদ্ধ: ইসলাম মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয় অথবা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর যেকোনো পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মানুষের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর পণ্য সামগ্রী মানুষকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে। ইসলাম কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করাকে সমগ্র মানবজাতিকে হত্যার শামিল বলেছে। মহান আল্লাহ বলেন, “যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল।”^{১৩} বিচারক তায়ীরা শান্তি হিসেবে অপরাধীর কাজ-কারবার ও লেনদেনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে।^{১৪}

৩.৫ অপরাধের জন্য পণ্য বাজেয়াপ্ত করা ও ভেজাল পণ্য আটক: ইসলামি দৃষ্টিকোণে ভেজাল পণ্য বাজেয়াপ্ত করা ও ভেজাল পণ্য নষ্ট করে দেয়া জাযিয়। যেমন দুধে পানি মিশ্রিত করে ভেজাল দিলে তা মাটিতে ফেলা জাযিয় হবে। তদ্রূপ খারাপ সূতা দিয়ে কাপড় বুনলে তা ছিঁড়ে ফেলে ও আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া বৈধ।^{১৫} এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি (সা.) আমার গায়ে হলুদ রঙের দুটি বস্ত্র প্রত্যক্ষ করে বললেন, তোমার মা কি তোমাকে এ কাজে নির্দেশ দিয়েছেন? আমি বললাম, এ দু’টি ধুয়ে ফেলি? তিনি বললেন, বরং দুটিকেই পুড়ে ফেল।”^{১৬}

৩.৬ পণ্যের মোড়ক ব্যবহার না করার দণ্ড: উক্ত আইনে পণ্য মোড়কাক্রমে বিক্রয় করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যথাযথভাবে মোড়কের গায়ে সংশ্লিষ্ট পণ্যের ওজন, পরিমাণ, উপাদান, ব্যবহার-বিধি, সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য, উৎপাদনের তারিখ, প্যাকেটজাতকরণের তারিখ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকা। মূলত ব্যবসায়ীরা মেয়াদউত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয় করা, পণ্যের গুণগত মান না থাকা, উচ্চমূল্যে বিক্রয় ইত্যাদি নানাবিধ অসৎ উদ্দেশ্যে পণ্যের মোড়ক ব্যবহারে অনীহা পোষণ করে থাকে। ফলে এ ধরনের পণ্যে বিভিন্ন বিষয়ের অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। ইসলামি পরিভাষায় যাকে ‘গারার’ (الغرر) বলা হয়। পণ্যের মোড়ক না করার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো পণ্যের দোষ ত্রুটি গোপন করা। ইসলাম ব্যবসায় পণ্যের দোষ গোপন রাখতে নিষেধ করেছে। দোষ-ত্রুটি গোপন রেখে পণ্য বিক্রি হলেও

সে ব্যবসা বরকত উঠে যায়। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “হাকিম বিন হাযাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতার কথাবার্তা যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন হয়ে না যাবে, ততক্ষণ তাদের (চুক্তি ভঙ্গ করার) ইখতিয়ার থাকবে। যদি তারা দু'জনই সততা অবলম্বন করে ও পণ্যের দোষত্রুটি প্রকাশ করে, তাহলে তাদের দু'জনের এই ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি তারা দু'জনে মিথ্যার আশ্রয় নেয় ও দোষ গোপন করে তাহলে তাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত দূর হয়ে যাবে।”^{১৭}

৩.৭ পণ্য বা সেবার মূল্যের তালিকা সংরক্ষণ ও প্রদর্শন না করার দণ্ড: উক্ত আইনের ধারা ৩৮ ও ৩৯ এর বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য বা সেবার মূল্য তালিকা সংরক্ষণ ও প্রদর্শন না করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। বিক্রেতা মূলত একই পণ্য ভিন্ন ভিন্ন দামে বিক্রির অসৎ উদ্দেশ্যে পণ্য বা সেবার মূল্য তালিকা প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকে। এটা ভোক্তাদের সাথে স্পষ্টত প্রতারণার শামিল, ইসলামি দৃষ্টিকোণে যা নিষিদ্ধ। প্রতারণা-প্রবঞ্চনার আরবি প্রতিশব্দ আল-গাশশ الغش-এর মূল অর্থ কাউকে ধোঁকা দেয়া বা ঠকানো। আচার-আচরণ, লেনদেন, ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধোঁকা দেয়াকে বলে প্রতারণা। প্রতারণা করা হারাম। মহানবি (সা.) ইরশাদ করেছেন, “যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।”^{১৮}

৩.৮ ধার্যকৃত মূল্যের অধিক মূল্যে পণ্য, ঔষধ বা সেবা বিক্রয় করার দণ্ড: ইসলামি আইনে মূল্য নির্ধারণ বলতে পণ্যের এমন একটি নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ বোঝায় যাতে লভ্যাংশ থাকবে যেন পণ্যের মালিক ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, আবার উক্ত পণ্যের প্রতি মুখাপেক্ষী গোষ্ঠীর যেন ক্রয় করতে কষ্টসাধ্য না হয়। বিক্রেতা তার উৎপাদন খরচের সাথে আনুষঙ্গিক খরচ যোগ করে লভ্যাংশসহ পণ্য বিক্রয় করে। বর্তমান সমাজে অনেক সময় বিক্রেতা অধিক মুনাফার আশায় নিজ খেয়ালখুশিমতো পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে। ইসলাম বাজার ও দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক গতিতে চলতে দিতে ইচ্ছুক। বাজার ব্যবস্থা স্বাভাবিক গতিতে চললে পণ্যের মূল্যও স্বাভাবিকভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকে। তাই রাসুলুল্লাহ (সা.) পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেননি। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি (সা.)-এর যুগে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে লোকেরা এসে বললো : ইয়া রাসুলুল্লাহ ! আমাদের জন্য দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিন। তখন নবি (সা.) বললেন, “প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণকারী হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। তিনিই মূল্যবৃদ্ধি করেন, তিনিই সন্তা করেন। রিয়কদাতা তিনিই। আমি তো আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই এ অবস্থায় যে, তোমাদের কারো রক্ত বা ধন-সম্পদের ব্যাপারে কোনোরূপ অন্যায়-অবিচারের দাবি আমার উপর থাকবে না।”^{১৯} এ সম্পর্কে আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী বলেন, “উপরোক্ত হাদিসের অর্থ এ নয় যে, সর্বাবস্থায় দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ নিষিদ্ধ। যুলম করে যদি জনসাধারণের উপর এমন মূল্য চাপিয়ে দেয়া হয়, যাতে তারা সন্তুষ্ট নয় তবে এ ধরনের মূল্য নির্ধারণ হবে হারাম। একইসাথে জনগণের মাঝে ন্যায়বিচার কার্যকর করার জন্যে যদি দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়, যেমন, প্রচলিত দামে বিক্রয় করতে বিক্রেতাকে বাধ্য করা অথবা প্রচলিত মূল্যের চেয়ে বেশি নেয়া থেকে বাধা দেয়া হয় তবে তা শুধু জায়েয-ই নয়; বরং ওয়াজিবও বটে।^{২০} সর্বোপরি, মুসলিম সরকার জনগণের সার্বিক কল্যাণ (মাসলাহা) বিবেচনায় পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে পারে এবং বিক্রেতা বা সেবাদাতাগণ সরকার নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য থাকবে।

৩.৯ ভেজাল পণ্য বিক্রয় অথবা পণ্যে নিষিদ্ধ দ্রব্যের মিশ্রণ নিষিদ্ধ: বিক্রেতার অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো পণ্যে ভেজাল না দেওয়া। ভেজাল একটি গর্হিত অপরাধ। ভেজাল বলতে পণ্য সামগ্রীতে বর্জ্য পদার্থ বা বিষ মেশানোকেই বোঝায় না; বরং ব্যবসায়িক লেনদেন ক্রয়-বিক্রয়ে বস্তুর দোষত্রুটি গোপন করাও পণ্যের ভেজালের অন্তর্ভুক্ত। পণ্যের ওজনে কম দেওয়া, মিথ্যা তথ্য দেওয়া ভালোমানের পণ্যে নিম্নমানের পণ্য মিশ্রণ ও মেয়াদউত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি করাও খাদ্যে ভেজালের অন্তর্ভুক্ত। আর খাদ্যে সব ধরনের ভেজাল ইসলাম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা রাসুলুল্লাহ (সা.) (বাজারে) এক খাদ্যরাশির নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাতে নিজ হাত প্রবেশ করালেন। তিনি আঙুলে অনুভব করলেন যে, ভিতরের শস্য ভিজে আছে। বললেন, “ওহে ব্যবসায়ী! এ কী ব্যাপার?” ব্যবসায়ী বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! ওতে বৃষ্টি পড়েছে।’ তিনি বললেন, “ভিজাগুলোকে শস্যের উপরে রাখলে না কেন, যাতে মানুষে দেখতে পেত? (জেনে রেখো!) যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।”^{২১}

ভেজাল খাবার খেয়ে মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এবং অসুস্থ হয়ে কষ্ট পায়। আর মানুষকে কষ্ট দেওয়া হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, “আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের কৃত কোনো অন্যায় ছাড়াই কষ্ট দেয়, নিশ্চয় তারা বহন করবে অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপ।”^{২২} যারা খাদ্যে ভেজাল দিবে তারা অসাধু ব্যবসায়ী। তারা মহাপাপী। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী,

“ইসমাঈল ইবনু উবাইদ ইবনু রিফাআ (রা.) হতে পালক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (রিফাআ) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে ঈদের মাঠে রাওয়ানা হলেন। তিনি (রাসুলুল্লাহ সা.) লোকদের কেনা-বেচায় জড়িত দেখে বলেন, হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! তারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ডাকে সাড়া দিল এবং নিজেদের ঘাড়ও চোখ উঠিয়ে তার দিকে তাকালো। তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদের ফাসিক বা গুনাহগাররূপে উঠানো হবে, কিন্তু যেসব ব্যবসায়ী আল্লাহ তা’আলাকে ভয়করে, নির্ভুলভাবে কাজ করে এবং সততা ধারণ করে তারা এর ব্যতিক্রম।”^{২৩}

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল, প্রতারণা ও গুদামজাত করার কারণে সরকার ইচ্ছে করলে বিচারক বিক্রেতাকে অন্যদেশে সাময়িক ও চিরস্থায়ীভাবে বহিষ্কার করতে পারে। যাতে সমাজে কেউ ভেজাল প্রতারণা, চুরি করার সাহস না পায়।^{২৪}

৩.১০ অবৈধ প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণের দণ্ড: ইসলামি দৃষ্টিকোণে যেকোনো অবৈধ কার্য, অবৈধ উপায় গ্রহণ নিষিদ্ধ। যে সব পণ্য ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে অর্থাৎ যেসব পণ্য খাওয়া বা পান করা হারাম সেসব পণ্যের কারবার বর্জন করতে হবে। যথা—মদের ব্যবসা, দেহ ব্যবসা, ভাগ্য নির্ণয়ের ব্যবসা ইত্যাদি। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোনো জাতির উপর কোনো খাবার হারাম করেন, তখন তার মূল্যও হারাম করেন।”^{২৫} একই সাথে হালাল পণ্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনো অবৈধ প্রক্রিয়া অবলম্বন করাকেও ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। যেমন, শিশুশ্রম, জোরপূর্বক শ্রম, পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর শিল্প কারখানা নির্মাণ ইত্যাদি। ইসলাম আমাদেরকে যেকোনো অকল্যাণমূলক কাজে সহযোগিতা না করার নির্দেশনা দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমানলঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না।^{২৬} এছাড়াও জননিরাপত্তা এবং পরিবেশ দূষণের মাত্রা কমিয়ে আনতে আবাসিক

এলাকায় কামারশালা, শস্য মাড়াইয়ের চাতাল, রন্ধনশালা বা কল-কারখানা স্থাপন করতে মুসলমানদের অনুমতি দেয়া হয়নি।^{২৭}

৩.১১ মিথ্যা বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ: বর্তমান সময়ে বিজ্ঞাপন দাতা তার পণ্যের গুণগাণ প্রচার করে থাকে, অনেক সময় মিথ্যা গুণাগুণও বর্ণনা করে থাকে। কিন্তু তার পণ্যের দোষ-ত্রুটি থাকলেও তা গোপন রাখে। ইসলাম পণ্যের বিজ্ঞাপনে এ ধরনের প্রতারণা নিষিদ্ধ করেছে। মিথ্যা তথ্য বিজ্ঞাপনের একটি বড় সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। আইনে থাকলেও বাস্তবে এর উল্টো চিত্র। প্রায়শই বিজ্ঞাপনে মিথ্যা তথ্য প্রচার হয়ে থাকে। ইসলাম সর্বাবস্থায় মিথ্যা পরিহারের নির্দেশনা দেয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, “তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রণ করো না, জেনে-গুনে আর সত্য গোপন করো না।”^{২৮}

৩.১২ প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ না করা: এক্ষেত্রে ইসলামি নির্দেশনা হলো ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির ক্ষেত্রে অবশ্যই সাক্ষী রাখতে হবে। অথবা লেখার মাধ্যমে কোনো ডকুমেন্ট রাখতে হবে। বিশেষত, বাকীতে বা অগ্রিম কোনো ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে লিখিত প্রমাণ রাখা আবশ্যিক। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরস্পর ঋণের লেন-দেন করবে, তখন তা লিখে রাখবে।”^{২৯} বিক্রোতা যদি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ক্রেতার সাথে কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে তা অবশ্যই তাকে পূর্ণ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “হে মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর।”^{৩০}

৩.১৩ ওজন বা পরিমাপে কারচুপি নিষিদ্ধ: ইসলাম যেকোনো পণ্যের ওজন বা দৈর্ঘ্য-প্রস্থ পরিমাপে কারচুপি করাকে নিষিদ্ধ করেছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভোক্তা অধিকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মাপে পরিপূর্ণ পণ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। ইসলাম সকল ধরনের ব্যবসায় মাপে পরিপূর্ণ দিতে আদেশ করেছে। ইসলাম মাপে কম দেয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, “ধ্বংস যারা পরিমাপে কম দেয় তাদের জন্য। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়।”^{৩১} মহান আল্লাহ আরো বলেন, “আর লোকদেরকে তাদের প্রাপ্যবস্তু কম দিও না এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না।”^{৩২}

৩.১৪ মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা: ইসলামি আইনে মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা করা নিষিদ্ধ। ইসলাম মিথ্যা মামলার শাস্তির বিধান বিবাদির অবস্থা, মামলার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনায় নির্ধারণ করেছে। ১. যদি অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি কুখ্যাত অপরাধী বা সন্ত্রাসী হয়, তাহলে যেসব অপরাধ সচরাচর প্রমাণ করা কষ্টসাধ্য (যেমন চুরি, ডাকাতি, হত্যা, ছিনতাই, অপহরণ প্রভৃতি) সে সবার জন্য তাকে নিছক অভিযোগের ভিত্তিতে স্বীকারোক্তি লাভের উদ্দেশ্যে প্রহার করাও যেতে পারে,^{৩৩} বন্দী করেও রাখা যেতে পারে।^{৩৪} ২. যদি অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে জনসমাজে সুখ্যাত হয়, তাহলে তাকে কোনোভাবে নিছক অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোনোরূপ শাস্তি দেয়া যাবে না; বরং অভিযোগকারী যদি অভিযোগ প্রমাণিত করতে না পারে, তাকেই শাস্তি দেয়া হবে। যাতে কোনো অসৎ ব্যক্তি পবিত্র চরিত্রের লোকদের মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে।^{৩৫} ৩. যদি অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি সৎ কি অসৎ জানা না যায়, তা হলে তাকে বন্দী করে রাখা যাবে, যতক্ষণ না তার অবস্থা স্পষ্ট হবে।^{৩৬} ৪. যদি অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি সৎ কি না জানা নাই, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় করানোর জন্য

দুজন সাধারণ লোক কিংবা একজন ন্যায়বান লোকের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তবে কুখ্যাত অপরাধী ও সম্ভ্রাসীর ক্ষেত্রে বিচারক কিংবা শাসকের অবগতিই যথেষ্ট।^{৭৭} ৫. যে ব্যক্তি উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাউকে হয়রানি কিংবা অপমানিত করার জন্য কোনো মামলা দায়ের করে এবং বিচারকের কাছে যদি প্রমাণিত হয় যে, বাদি অসৎ উদ্দেশ্যে মামলা দায়ের করেছে, তাহলে বিচারক তাকে নীতি শিক্ষাদানমূলক যেকোনো শাস্তি দান করবেন। আর এ ধরনের শাস্তিসমূহের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ের শাস্তি হল কারাদণ্ড। এ ধরনের শাস্তির কারণ হল, যাতে সমাজে অসৎ ও মতলববাজ লোকদের এ ধরনের মামলা দায়েরের প্রবণতা বেড়ে না যায়।^{৭৮}

৩.১৫ ভোক্তা অধিকার সম্পর্কিত অপরাধের জন্য বিভিন্ন শাস্তির ইসলামি বিধান: ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯-এর অধীনের বিভিন্ন অপরাধের জন্য শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে। প্রথমত, কারাদণ্ডের শাস্তির ব্যাপারে ইসলামি নির্দেশনা হলো, ভোক্তা অধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে ইসলামের হুদুদ^{৭৯} তথা নির্ধারিত শাস্তি নেই, তবে তায়ীরা^{৮০} শাস্তির আওতায় কারাদণ্ড দেয়া যেতে পারে। কেননা ভোক্তা অধিকার লঙ্ঘন ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে, ইসলামি বিধি-বিধান দ্বারা নিষিদ্ধ কর্ম সংঘটনের শাস্তি হিসেবে তায়ীরা শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে অধিকাংশ আইনতত্ত্ববিদ একমত পোষণ করেছেন।^{৮১} সুতরাং তায়ীরা শাস্তির আওতায় কারাদণ্ডের শাস্তি দেয়া ছাড়াও বিচারক নির্বাসন, বয়কট, বেত্রাঘাতসহ যেকোনো শাস্তি দিতে পারেন। এ সম্পর্কে ড. আহমদ আলী বলেন, “তায়ীর হিসেবে অপরাধীদেরকে প্রয়োজনে বিভিন্ন মেয়াদে সশ্রম বা বিনা শ্রমে কারাদণ্ড দেয়া যেতে পারে। কখনো পরিস্থিতি এরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারে যে, অপরাধীকে বন্দী করে রাখা না হলে তার কার্যকলাপে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠতে পারে। এ ধরনের অপরাধীকে কারাগারে বন্দী করে রাখা হলে তাকে যেমন তার কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখা সম্ভব হবে, তেমনি সে সাথে এ আশাও করা যেতে পারে, কারাগার থেকে মুক্তির পর সে কারাজীবনের দুঃসহ কষ্টের কথা স্মরণ করে কোনো অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকবে।”^{৮২}

দ্বিতীয়ত, এ আইনে ভোক্তা দেওয়ানি প্রতিকার তথা ক্ষতির অর্থমূল্য পাওয়ার বিধান রয়েছে, অর্থাৎ ভোক্তা অধিকার বিনষ্টকারীর কাছ থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ নেওয়ার বিধান দিয়েছে। ইসলামি আইনে অর্থদণ্ডের শাস্তি দেয়ার বিষয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (রহ.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর দ্বিতীয় মত হলো, তায়ীর হিসেবে কোনো অপরাধের জন্য কাউকে আর্থিক দণ্ডে দণ্ডিত করা সঙ্গত নয়, কেননা এ বিষয়ে শরিয়তের নির্ভরযোগ্য কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও অধিকাংশ মালিকী মতাবলম্বী ইমামের মতে, অর্থ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা জাযিয়, যদি তাতে কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে।^{৮৩} ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) ও ইবনুল কাইয়িম (রহ.) প্রমুখের মতে, অর্থ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা জাযিয়। তাঁদের কথা হলো, অরক্ষিত সম্পদ কেউ যদি চুরি করে কিংবা এ ধরনের চুরি যাতে হদ্দ প্রয়োগ করা যায় না, তাতে দ্বিগুণ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা যায়।^{৮৪} এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে গাছে ঝুলন্ত ফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, “অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি যদি তা মুখের কাছে পেয়ে যায়, কোনো উপায়ে তা ছিঁড়ে নেয়নি, তা খেলে তাতে কোনো অপরাধ হবে না। আর যে তা কোনো জিনিসের সাহায্যে ছিঁড়ে নিয়ে খাবে, তাকে তার দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হবে এবং তাকে শাস্তিও ভোগ করতে হবে।”^{৮৫} তাছাড়া খুলাফা রাশিদুন যাকাত অনাদায়কারীদের থেকে তাদের সম্পদের একটি অংশও

জরিমানা হিসেবে নিয়ে নিতেন।^{৭৬} এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, অর্থ জরিমানা করা নিষিদ্ধ নয়। সর্বোপরি সাধারণ অবস্থায় অর্থ জরিমানার শাস্তি না দেয়াই হল মূল বিধান। কারণ কারো সম্পদ তার সম্মতি কিংবা আইনসম্মত পথ ছাড়া অন্য কোনোভাবে ভোগ করা কারো জন্য বৈধ নয়। তবে বিচারক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাযিরী শাস্তি হিসেবে অর্থদণ্ড আরোপ করতে পারে। তবে আরোপিত অর্থ অভিযোগকারীকে দেয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট শরয়ী নির্দেশনা পাওয়া যায় না।

তৃতীয়ত, এ আইনে ভোক্তা অধিকার লঙ্ঘনের কারণে প্রাণহানির মতো ঘটনার ক্ষেত্রেও শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এ বিধানের সাথে ইসলামি বিধানের বৈসাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। ইসলামি দৃষ্টিকোণে এ ধরনের হত্যাকে ‘কারণবশত হত্যা’ বলে। এটি এমন এক ধরনের হত্যা যাতে কোনো ব্যক্তির প্রয়োজনীয় সতর্কতার অভাবজনিত কাজের ফলে অন্য ব্যক্তির প্রাণনাশ হওয়া। এ ধরনের হত্যায় অপরাধীর হত্যা করার ইচ্ছা থাকে না; বরং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। যেমন, ভেজাল পণ্য খেয়ে কারো মৃত্যু হওয়া। এই প্রকার হত্যায় ইসলামি শাস্তি হলো, এ প্রকারের হত্যায় মৃত্যুদণ্ড হবে না এবং কাফফারাও ওয়াজিব হবে না। তবে দিয়াত ওয়াজিব হবে।^{৭৭} হত্যাকারীর পরিবার নিহতের পরিবারকে একশ উট বা এক হাজার দিনার অথবা দশ হাজার দিরহাম পরিমাণ সম্পদ প্রদান করবে। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “জীবনহানিতে দিয়াত হলো ১০০ উট।”^{৭৮} তবে উপরিউক্ত শাস্তির বিধানে নিহতের পরিবার ইচ্ছা করলে হত্যাকারীর পরিবারকে (অর্থ জরিমানা নিয়ে অথবা অর্থ জরিমানা ছাড়া) ক্ষমা করে দিতে পারে।

দ্রুত বিচার সম্পন্ন: উক্ত আইনের ৫৭ থেকে ৬৪ নং ধারায় অপরাধ সংঘটনের ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ আরোপ এবং অভিযোগ প্রাপ্তির পর দ্রুত বিচার নিষ্পন্ন করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ইসলাম অপরাধ সংঘটনের পর যথাশীঘ্র অভিযোগ আরোপ এবং দ্রুত বিচার কার্য সম্পন্ন করার ব্যাপারে সমর্থন করে। কেননা এতে অত্যাচারের শিকার ব্যক্তির ন্যায়বিচার পাওয়ার প্রতীক্ষার অবসান ঘটে এবং অত্যাচারীর ত্বরিত শাস্তি হয় এবং অত্যাচারও বন্ধ হয়। কিন্তু ত্বরিতগতি অবলম্বন অর্থ শুনানি, সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন, সাক্ষ্যগ্রহণ ইত্যাদি সীমিত করা বা এড়িয়ে যাওয়া নয়; বরং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার শর্তে বিচারক কোনো প্রকার গড়িমসি না করে যত দ্রুত বিচারকার্য শেষ করা যায় এটিই দ্রুত বিচার। শরিয়াহ আইনের দৃষ্টিতে বিচার দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করাই স্বাভাবিক অবস্থা বা সাধারণ নীতি। মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে লিখিত পত্রে ওমর (রা.) বলেন, “যার অপরাধ প্রমাণিত হয়নি (অভিযুক্ত), তার ব্যাপারটি দ্রুত দেখবে। কেননা তার বন্দিত্ব দীর্ঘায়িত হলে সে অধিকার বঞ্চিত হবে।”^{৭৯} দ্রুত বিচারকার্য সম্পন্ন করার ব্যাপারে ইয্যুদ্দীন ইব্ন আব্দুস সালাম বলেন, “বিচারক নিয়োগের উদ্দেশ্য হলো, জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং প্রকৃত হকদারকে তার অধিকার পৌঁছে দেয়া। তাই যত দ্রুত সম্ভব বিচারকার্য সম্পন্ন করা ও ত্বরিত পন্থা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক, যাতে প্রকৃত হকদারকে অধিকার প্রদান এবং জালিম ও অধিকার খর্বকারীর জুলুমের অবসান করা যায়।”^{৮০}

৩.১৬ অপরাধ পুনঃসংঘটনের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি : ইসলামি শরিয়ায় একই ব্যক্তি একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি করলে তাকে অতিরিক্ত শাস্তি প্রদানের বিধান রয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে অপরাধীকে অবহিত করা। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “জাবের (রা.) হতে

বর্ণিত, রাসুলল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি মদ পান করে, তাকে বেদ্রাঘাত কর। যদি চতুর্থবার পান করে, তবে তাকে হত্যা কর। তিনি বলেন, পরে অনুরূপ একজন ব্যক্তিকে রাসূল (সা.)-এর নিকট আনা হ'লে তিনি তাকে প্রহার করেন। কিন্তু হত্যা করেননি।”^{৫১}

সুপারিশমালা

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি কার্যকর আইন। এ আইনের বিধানাবলি ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করছে। তদুপরি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী বিবেচনায় এ আইনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংশোধন, সংযোজন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি বিবেচনায় নিম্নোক্ত সুপারিশ চিহ্নিত করা যায়।

- অনিস্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা শূন্য পর্যায়ে নিয়ে আসা।
- শাস্তির বিধান বাস্তবায়নে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি না করা।
- অভিযোগ দায়ের সময়সীমা যৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, কেননা ইসলামি দৃষ্টিকোণে সাক্ষ্য-প্রমাণ সাপেক্ষে যেকোনো সময়ই প্রতিকার পাওয়ার অধিকার রয়েছে ভোক্তার।
- পণ্যের ত্রুটি পরীক্ষার খরচ ত্রুটিপূর্ণ পণ্য বিক্রেতাকে বহন করার বিধান সংশোধন।
- বেসরকারী স্বাস্থ্য পরিসেবার ক্ষেত্রে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রতারিত হলে সরাসরি মামলা দায়ের বা প্রতিকারের বিধান সংযোজন।
- ভোক্তা অধিকার আইনের মাধ্যমে বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ বা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের অধিকার সংযোজন।
- নকল, ভেজাল বা ত্রুটিপূর্ণ পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎপাদনকারীর পাশাপাশি বিক্রেতাকে শাস্তির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা।
- ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণে ক্রেতা, বিক্রেতা, উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী, সংরক্ষণকারী সকলকে সচেতন করে তোলা।
- ভোক্তা অধিকার লঙ্ঘনের শরয়ী বিধান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি, বেসরকারি মিডিয়ায় আলোচনা, সভা ও সেমিনার করা।

উপসংহার

ইসলাম পণ্য ক্রয়, বিক্রয়, উৎপাদন, পরিবহন, সংরক্ষণসহ ব্যবসায়-বাণিজ্যের সকল স্তরে ক্রেতা ও বিক্রেতার অধিকার সুরক্ষায় সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। বাংলাদেশে ভোক্তা অধিকার সুরক্ষায় ২০০৯ সালে প্রণীত ‘ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯’ একটি তাৎপর্যপূর্ণ আইন। এ আইনের বিধানের আলোকে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর দেশব্যাপী ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অধিদপ্তরের নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা স্বত্ত্বেও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম প্রশংসার দাবিদার। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে এ আইনের বিষয়াদি ইসলামি দৃষ্টিকোণে সচেতন করা এবং নীতিনির্ধারক পর্যায়ে প্রবন্ধে উপস্থাপিত পরামর্শসমূহ বাস্তবায়ন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

তথ্যসূত্র :

- ১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৬ নং আইন) [এপ্রিল ৬, ২০০৯], প্রস্তাবনা
- ২ পূর্বোক্ত, ধারা নং : ২.৬
- ৩ পূর্বোক্ত, ধারা নং : ৮.ক-৮.খ
- ৪ জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরবার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ (ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ২০২২), পৃ. ৩
- ৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪
- ৬ পূর্বোক্ত
- ৭ আসাদ আল মাহমুদ, “ভোক্তা অধিদপ্তরে জনবল সংকট, ১২ বছরে অভিযোগ নিষ্পত্তি ৮৩ হাজার”, রাইজিংবিডি.কম, ১৫ মার্চ ২০২৩, অনলাইন ভার্সন- <https://www.risingbd.com/national/news/497062>, সংগ্রহের তারিখ, ২০-০৮-২০২৩
- ৮ আবুল হুসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আনু নিসাপুরী, আস সহিহ (বৈরুত : দারুল ইহইয়া আত তুরাছ আল আরাবী, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ৯৯, হাদিস নং : ১০২
- ৯ আতা শাহওয়ী, আল হিসবাহ ফিল ইসলাম (দারুল উরুবাহ প্রকাশনী, তা.বি), পৃ. ১৭
- ১০ فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (আল-কুরআন, ১৬ : ৪৩)
- ১১ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . إِيَّاهُ يَدِ إِبْنِ مَاجَاهُ، آسَ سُنَّان (মিশর : দার এহয়া কুতুবুল আরাবী, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৭৮৪, বাব: বাবুল হুকুরাতি ওয়ালজালবি, হাদিস নং : ২৩৪১]
- ১২ মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবদেদীন, রাব্দুল মুহতার (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৪১২ হি), খ. ৪, পৃ. ৬২
- ১৩ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا (আল কুরআন, ৫ : ৩২)
- ১৪ ড. আহমদ আলী, ইসলামের শান্তি আইন (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৫), পৃ. ৩২১
- ১৫ সম্পাদনা পরিষদ, আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়া (কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়া আল-শুয়ুন আল ইসলামিয়াহ, ১৯৯৫), খ. ১২, পৃ. ২৭২
- ۱۶ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ثَوْبَيْنِ مُعَصَّرَيْنِ فَقَالَ " أَلَمْ أَكْ أَمْرُكَ بِهَذَا " . قُلْتُ " بَلْ أَحْرَقَهُمَا " . (ইমাম মুসলিম, পূর্বোক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৬৪৭, হাদিস নং : ২০২৭/২৮)
- ۱۹ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَّامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَّامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بَوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِقَّ بَرَكُهُ بَيْعُهُمَا (ইমাম মুসলিম, পূর্বোক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১৬৪, হাদিস নং : ১৫৩২/৪৭)
- ১৮ عَنْ غَسَّانٍ فَلَيْسَ مِنِّي . (ইমাম মুসলিম, পূর্বোক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৯, হাদিস নং : ১০২)

- ১৯ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْ لَنَا، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّعْرُ، الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ بَلَاءًا فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيَّ بَلَاءًا فَقَالَ: وَالَّذِي نَبِئْتُكَ بِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ مَا أَكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِيتُنَا (আল কুরআন, ৩৩ : ৫৮)
- ২০ আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৬-২৮৭
- ২১ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَتَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَاءًا فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيَّ بَلَاءًا فَقَالَ: وَالَّذِي نَبِئْتُكَ بِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ مَا أَكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِيتُنَا (আল কুরআন, ৩৩ : ৫৮)
- ২২ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ فَقَالَ " يَا مَعْشَرَ النَّجَارِ " . فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَفَعُوا أَغْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ فَقَالَ . إِنَّ [আবু দ্বিসা মুহাম্মদ বিন দ্বিসা আত তিরমিযী, আস-সুনান (মিশর : শিরকাতু মাকতাবাতু মাতবাতু মুসতফা আল বালী আল হালী, ১৩৯৫৪ হি.), খ. ৩, পৃ. ৫০৭, হাদিস নং : ১১১০]
- ২৪ প্রফেসর ড. আবুল কালাম পাটওয়ারী, “মুনাফাখোরী মজুদদারী দ্রব্যমুল্যের উর্ধগতি ও ভেজাল প্রতিরোধ করণীয় : ইসলামী দৃষ্টিকোণ”, ইসলামী আইন ও বিচার, বর্ষ-৬, সংখ্যা-২১, জানুয়ারি-মার্চ ২০১০, পৃ. ৪৪-৪৫
- ২৫ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ [আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী বিন মুসা আবু বকর বায়হাকী, আস সুনানে কুবরা (বৈরুত : দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, ২০০৩), খ. ৬, পৃ. ২১, বাব: বাবু তাহরীমি বাইঈল খামরি ওলমাইমাতি ওলখিনজীর ও আসনাম, হাদিস নং : ১১০৫১]
- ২৬ (আল কুরআন, ৫ : ২) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
- ২৭ আল মাজাল্লাহ (দি অটোম্যান কোর্টস ম্যানুয়াল হানাফী), ক্রমিক নম্বর ২৪৩২ অনুচ্ছেদ ১২০০
- ২৮ (আল কুরআন, ২ : ৪২) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُوا لِلْحَقِّ غَافِلِينَ
- ২৯ (আল কুরআন, ২ : ২৮২) يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَدَايْنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
- ৩০ (আল কুরআন, ৫ : ১) يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَفْوَاقًا بِالْعُقُودِ
- ৩১ (আল কুরআন, ৮৩ : ১-৩) وَإِلَّا لِلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.
- ৩২ (আল কুরআন, ২৬ : ১৮৩) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
- ৩৩ সম্পাদনা পরিষদ, আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়া (কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়া আল-শুযূন আল ইসলামিয়াহ, ১৯৯৫), খ. ১৬, পৃ. ৯২
- ৩৪ কামাল উদ্দীন ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর শারহুল হিদায়া (বৈরুত : দারুল ফিকর, তাবি), খ. ৫, পৃ. ৩৫২
- ৩৫ ড. আহমদ আলী, ইসলামের শান্তি আইন (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯), পৃ. ৩২৭-৩২৮
- ৩৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৮

- ৩৭ সম্পাদনা পরিষদ, আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়া, পূর্বোক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৯৫
- ৩৮ ইব্রাহীম ইবনু ফারহন, *তাবছিরাতুল হুকাম* (বৈরুত : দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, তাবি), খ. ২, পৃ. ৩০০
- ৩৯ হুদুদ হলো কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি। আবু বকর মুহাম্মদ আস সারাখসী বলেন, “হুদুদ হলো কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত বিভিন্ন অপরাধের সুনির্ধারিত শাস্তিসমূহ।” [শামসুল আইম্মা মুহাম্মাদ ইব্ন আহমদ আস সারাখসী, *উসূল আল সারাখসী*, (হায়দারাবাদ, তাবি), খ. ৯, পৃ. ৩৬]
- ৪০ তায়ীর শব্দের অর্থ হলো বারণ করা ও ফিরিয়ে রাখা। শরিয়তের পরিভাষায় তায়ীর হলো- আল্লাহ বা মানুষের অধিকার সংশ্লিষ্ট যে সব অপরাধের জন্য শরিয়ত নির্দিষ্ট কোনো শাস্তি কিংবা কাফফারা নির্ধারণ করে দেয়নি সে সব অপরাধের শাস্তিকে তায়ীর বলে। [ইমাম ইবনুল হুমাম, পূর্বোক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪১২]
- ৪১ ড. আহমদ আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৩
- ৪২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৭
- ৪৩ মুহাম্মদ আমীন ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ তাবি), খ. ৪, পৃ. ৬১
- ৪৪ ইবনে তাইমিয়াহ, *আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ তাবি), খ. ৪, পৃ. ২১১-২১২
- ৪৫ *مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ حُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامُهُ مِثْلُهُ* [আবু দাউদ সূলায়মান বিন আশআস বিন ইসহাক আসসিজিস্তানি, *আস সুনান* (বৈরুত : মাকতাবা আসরীয়াহ, তা.বি.), খ. ৪, পৃ. ১৩৭, হাদিস নং : ৪৩৯০]
- ৪৬ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবু বকর বিন আইয়ুব বিন সাদ শামসুদ্দীন ইবনুল কাইয়িম জাওযিয়া, *আত-তুর্কুল হুকামিয়াহ* (দামেশক : মাকতাবাতু দারিল বয়ান, তাবি), পৃ. ২২৭
- ৪৭ ড. আহমদ আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৪
- ৪৮ *إِنَّ فِي النَّفْسِ الدَّيَّةَ مَائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ* [মুহাম্মদ বিন হিব্বান আহমদ বিন হিব্বান বিন মাআয বিন মা'বাদ, *আসসহীহ* (বৈরুত : মুয়াসসাআনতুর রিসালাহ, ১৯৮৮), খ. ১৪, পৃ. ৫০৭, হাদীস নং : ৬৫৫৯]
- ৪৯ মুহাম্মদ রাওয়াস কালআজী, *মাওসুআতু ফিকহি উমার ইবনিল খাতাব* (বৈরুত : দারুল নাফাইস, ১৯৮৯), পৃ. ৭২৬
- ৫০ ইয়যুদ্দীন ইবন অব্দুস সালাম, *কাওয়াইদুল আহকাম ফী মাসালিহিল আনাম* (বৈরুত : দারুল মাআরিফ, ১৯০০), খ. ২, পৃ. ৩৫
- ৫১ *مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ* - قَالَ: ثُمَّ أَنْى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ - بِزُجْلٍ قَدْ شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَضْرَنَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ (ইমাম তিরমিযী, পূর্বোক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৮, হাদিস নং : ১৪৪৪)

ইসলামি শরিয়তের সহজীকরণ নীতি ও তার প্রয়োগ পদ্ধতি: একটি পর্যালোচনা

মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ*
আবু তৈয়ব মোঃ নাজমুছছাকিব ভূঁইয়া**

Abstract

Islamic jurists have developed some important principles in the light of the Quran-Sunnah for the logical application of Islam in human life. One of these principles is at-Taisir (التيسير) or simplification. This is to adopt a relatively simple and convenient method by eliminating all the complications and difficulties in the servant's life according to the guidance of the Qur'an and Hadith. Since the Companions (ra.) onwards, the Hanafi, Shafi'i, Maliki, and Hanbali schools have relied on this principle to solve various issues. Applying this principle to solve various modern issues and problems demands extensive thought and research. This article aims to discuss the introduction, importance, authenticity, and application of the principle of simplification in Islam. This study follows a descriptive and analytical approach, which will serve as a path for Bengali speakers to understand and find solutions to the issues of Shari'ah.]

চাবিশব্দ: আত-তাইসির, আল-মাশাক্কাত, শরিয়াহ, ফিক্‌হ

ভূমিকা

মানুষের সার্বিক কল্যাণকামিতাই ইসলামি শরিয়তের মূল উদ্দেশ্য। ইসলামি শরিয়াতে মানবজীবনের সাথে সম্পৃক্ত সকল বিধি-বিধানকে, যা আমলের মাধ্যমে বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, ফিক্‌হ বা মাসায়েল হিসেবে গণ্য করা হয়। এসব বিধান নির্ণয়ে আলিমগণ কখনো কখনো সরাসরি মাসআলার বিধান বিদ্যমান এমন আয়াত বা হাদিসের ভাষ্যকে মূল মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আবার কখনো একাধিক আয়াত বা হাদিস গবেষণা করে তা থেকে কোনো একটি মূলনীতি গ্রহণ করেছেন। যার জ্ঞান না থাকলে আধুনিক ও সমসাময়িক বিষয়ে সমাধান বের করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। অর্থাৎ এটি এমন একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয় যা হতে এ বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত অংশসমূহের বিধান অবগত হওয়া যায় এবং ইসলামি অনুশাসনগুলো অতি অনায়াসে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এসব নীতির মাঝে “আত-তাইসির” বা সহজীকরণ নীতি অন্যতম; যাকে ইসলামি আইন বিশারদগণ “কাঠিন্য সহজায়ন আনে” (المشقة تجلب التيسير) বাক্যে ব্যক্ত করেছেন এবং এটিকে ফিক্‌হি মাসআলা নির্ণয়ের একটি অন্যতম নীতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মানুষের প্রাত্যহিক জীবন পরিচালনার পথে উদ্ভূত জটিল পরিস্থিতির নিরসনই হলো এই মূলনীতির উদ্দেশ্য। একজন মুকাল্লিফ (যার উপর শরিয়তের বিধানাবলি আরোপিত হয়) এ নীতির সক জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে শারঈ বিধান পালনে সাময়িক সমস্যা দূর করতে সক্ষম হবে। ইতোপূর্বে বাংলা ভাষায় “আত-তাইসির” বা সহজীকরণ নীতি বিষয়ে কোনো গবেষণা পাওয়া যায়

* এমফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

না; তাই এ বিষয়ে গবেষণার দাবি রাখে। আলোচ্য প্রবন্ধে ইসলামি শরিয়ার সহজীকরণ নীতি ও এর প্রয়োগ পদ্ধতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণার প্রকৃতি বিবেচনায় এ গবেষণাকর্মটিতে বিশ্লেষণাত্মক ও গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Research Method) অনুসরণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করে গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রত্যয় সংজ্ঞায়ন এবং প্রত্যয়সমূহ সম্পর্কিত কুরআন-হাদিস ও ফিকহের দিকনির্দেশনাসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। একই সাথে গবেষণায় উল্লিখিত সহজীকরণ নীতি ও এর প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে কুরআন-হাদিস ও ফিকহের আলোকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি (Descriptive Research Method) এবং ব্যাখ্যামূলক গবেষণা পদ্ধতি (Explanatory Research Method) অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়াও এ গবেষণাকর্মে তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের বিবেচনায় বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Content Analysis Method) এবং লাইব্রেরি পদ্ধতি (Library Method) অনুসরণ করা হয়েছে।

আত্-তাইসির বা সহজীকরণ নীতির পরিচিতি

“আত্-তাইসির” (التيسير) শব্দটি আরবি “اليسر” শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ- সহজ বা কঠিনের বিপরীত।^১ যেমন আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ “আমি আল-কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণ করার জন্য। সুতরাং উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?”^২ শব্দটি স্বচ্ছলতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়; যেমন আল-কুরআনে এসেছে, وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنُفِذَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ “আর যদি সে অভাবগ্রস্ত হয় তাহলে স্বচ্ছলতার প্রতীক্ষা করবে”^৩ আল-হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, إِنْ الدِّينَ يَسِرْ “নিশ্চয়ই ধর্ম তথা ইসলাম সহজ”^৪

পরিভাষায় “আত্-তাইসির” হলো، أَنَّهُ عَمَلٌ لِّإِجْهَادِ النَّفْسِ وَلَا يَثْقُلُ الْجِسْمَ وَهُوَ حَصُولُ شَيْءٍ، “এটি এমন কাজ যা আত্মাকে কষ্ট দেয়না এবং শরীরকে ভারাক্রান্ত করে না। বরং খুব সহজেই স্বঃতস্কৃতভাবে সেটি অর্জিত হয়”^৫ ডক্টর আব্দুর রাকিব সালেহ মহসিন আত্-তাইসিরের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন، بِنَاءُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَفَقْهُ الْقُدْرَةِ الْبَشَرِيَّةِ الْعَادِيَّةِ، “মানুষের স্বাভাবিক সামর্থ্য অনুযায়ী শার‘ঈ বিধি-বিধান নির্ণয় করা এবং জরুরি ও ব্যতিক্রম পরিস্থিতি বিবেচনা করে সহজ বিধান বের করা”^৬

মোদাকথা, আত্-তাইসির বা সহজীকরণ হলো, আল-কুরআন ও আল-হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী বান্দার আমলের মধ্যে সহজ ও সুবিধাজনক পদ্ধতি অবলম্বন করা এবং যাবতীয় জটিলতা ও কাঠিন্যতাকে দূরীভূত করা। এটি ইসলামি শরিয়তের একটি অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য।

আত্-তাইসির বা সহজীকরণ নীতির প্রামাণিকতা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও আল-হাদিসের পাশাপাশি ফিক্‌হী মূলনীতিতেও সহজীকরণ নীতির অনুকূলে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো-

ক. আল-কুরআন

(১) সংকীর্ণতা দূরীকরণের নির্দেশনা: এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে এসেছে,

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা আনয়ন করতে চান না, বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে ও তোমাদের উপর তার নিয়ামত পূর্ণ করতে চান, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর”।^৭

আল-কুরআনে আরও এসেছে,

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন, তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি”।^৮

উপর্যুক্ত আয়াতদ্বয়ে মহান আল্লাহ দ্বীন ও বান্দাহর জীবনে সংকীর্ণতা চান না মর্মে নির্দেশনা দেয়ার পাশাপাশি প্রথম আয়াতে বান্দাহকে পবিত্র করা ও তার নিয়ামত পূর্ণ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে উক্ত নির্দেশনাকে জোর দিয়েছেন।

(২) কষ্ট লাঘবের নির্দেশনা: মহান আল্লাহ বলেন,

لَيْسَ عَلَى الضُّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا
يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ .

“দুর্বল, রুগ্ন, ব্যাভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোনো অপরাধ নেই, যখন তারা মনের দিক থেকে পবিত্র হবে আল্লাহ ও রাসুলের সাথে। নেককারদের উপর অভিযোগের কোনো পথ নেই। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী দয়ালু”।^৯

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

إِنَّ الصَّنَا وَالْمَرْؤَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ.

“নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত, অতএব যে ব্যক্তি এই গৃহের (কা'বা) হজ্জ অথবা উমরা করে তার জন্য এতদুভয়ের প্রদক্ষিণ করা দৃষণীয় নয়, এবং কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করলে আল্লাহ গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞাত” ১০

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

“তোমাদের পক্ষে যা সহজ আল্লাহ তা'য়ালা তাই চান ও তোমাদের পক্ষে যা কষ্টকর তা তিনি চান না” ১১

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا.

“আল্লাহ তোমাদের সাথে লঘু ব্যবহার করতে চান, যেহেতু মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন” ১২

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ দুর্বল, রুগ্ন, তথা শার'ঈ বিধানাবলি পালনে অক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে কষ্ট লাঘব করে সহজীকরণের নীতি প্রদান করেছেন। শেষোক্ত আয়াতে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়েছে; যেখানে মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে মর্মে ইরশাদ করেছেন। যে সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল তাকে কঠিন বিধান দিয়ে কষ্ট দেয়া আল্লাহ তা'য়ালা নীতি পরিপন্থি।

খ. আল-হাদিস

(১) ইসলাম সহনশীল ধর্ম: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন,

بعثت بالحنفية السمحاء

“আমি একনিষ্ঠ সহনশীল ধর্ম নিয়ে প্রেরিত হয়েছি” ১৩

উক্ত হাদিস থেকে বুঝা যায়, ইসলাম এমন একটি সহনশীল ধর্ম, যার নিয়মাবলী পালন করা অত্যন্ত সহজ এবং মানুষের সাধের ভিতরে।

(২) সহজীকরণের নির্দেশনা: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا.

“তোমরা লোকদেরকে সুসংবাদ দিবে, ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়াবে না; সহজ করবে, কঠিন করবে না” ১৪

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও ইরশাদ করেছেন,

إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.

“তোমরা সহজকারীরূপে প্রেরিত হয়েছ কাঠিন্য আরোপকারী হিসেবে নয়”^{১৫}

রাসুলুল্লাহ (সা.) স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, ইসলামের বিষয়সমূহ সহজভাবে উপস্থাপন কর। কঠিন করার মাধ্যমে মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিও না। প্রথম হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের বিষয়ে মানব জাতিকে ঘৃণা বিদ্বেষ না ছড়িয়ে সুসংবাদ দেয়া ও এর বিধানাবলীকে কঠিনভাবে উপস্থাপন করে মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে না দিয়ে সহজভাবে উপস্থাপন করার নির্দেশ দিয়েছেন। দ্বিতীয় হাদিসে দাঈগণের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইসলামের দাঈগণ অত্যন্ত বিনয় ও সহনশীলতার সাথে ইসলামী শরিয়তের মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্যগুলো মানুষের সামনে উপস্থাপন করবে, যাতে করে মানুষ ইসলামী শরিয়তের উপর অবিচল থাকতে কোনো প্রকার অনীহা প্রকাশ না করে।

(৩) তুলনামূলক সহজ পন্থা বেছে নেয়া: আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً.

“রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দুটি বস্তুর মাঝে স্বাধীনতা দেয়া হলে তিনি সহজটি গ্রহণ করতেন যদি সেটি অবৈধ না হয়”^{১৬}

এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) স্বীয় আমলের মাধ্যমে উম্মতকে দুটি বস্তুর মধ্যে তুলনামূলক সহজটি আমলে নেয়ার শিক্ষা দিয়েছেন।

গ. ফিক্‌হি কায়দা থেকে প্রমাণ

নিম্নে কয়েকটি ফিক্‌হি কায়দা উল্লেখ করা হলো যেগুলো আত্-তাইসির বা সহজীকরণের পক্ষে প্রমাণ বহন করে।

(১) কাঠিন্য সহজায়ন আনে (المشقة تجلب التيسير):^{১৭}

আত্-তাইসির এর সাথে এ কায়দাটির সম্পৃক্ততা সুস্পষ্ট। ইসলামি শরিয়াহ মানবজীবনে কাঠিন্য চাপিয়ে দিতে চায় না বরং সব সময় বিভিন্ন জটিলতা ও প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে বিধান নির্ধারণ করে যাতে একজন ব্যক্তি খুব সহজেই তাঁর কর্তব্যটি পালন করতে পারে। আল-কুরআনে এসেছে, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ “তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর”^{১৮}

(২) অতি প্রয়োজন নিষিদ্ধ বিষয়কেও বৈধতা দেয় (الضرورات تبيح المحظورات):^{১৯}

উল্লিখিত কায়দাটি ইসলামি আইনে সহজীকরণের বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। অত্যধিক প্রয়োজন যা পূর্ণ না করলে ব্যক্তি মৃত্যুমুখে অথবা কাছাকাছি কোনো অবস্থায় পতিত হতে পারে, এ ধরনের ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়াহ সহজ বিধান নির্ধারণ করেছে। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের নির্দেশনা হলো,

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“তবে কেহ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় আহ্বার করতে বাধ্য হলে সেগুলি খাওয়া তার জন্য হারাম হবে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা’আলা ক্ষমাশীল ও দয়ালু”।^{২০}

(৩) পরিমাণের ভিত্তিতে অতি প্রয়োজনকে পরিমাপ করা হয় (الضرورات تقدر بقدرها):

উল্লেখিত নিয়মটি অত্যধিক প্রয়োজন অবৈধকে বৈধ করে সে বিষয়ে সতর্ক করে যে, বৈধতার বিষয়টি শুধুমাত্র প্রয়োজন পূর্ণ করার অনুমতি দেয় মাত্র, যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের উপর থেকে সাময়িক কষ্টকাঠিন্য দূর করবে। সুতরাং সে বিষয়ে তাকে প্রশস্ততা দেয় না অর্থাৎ যতটুকুর মাধ্যমে প্রয়োজন পূর্ণ হয় ততটুকু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। এর স্বপক্ষে ইমাম শাফি‘ঈ রহমাতুল্লাহ আলাইহির একটি উক্তি: (كل ما أحل من محرم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة ، “নিষিদ্ধ বিষয় হতে যা কিছু জায়েয তা শুধুমাত্র সেই নির্দিষ্ট অর্থে অনুমোদিত। যদি সেই বিষয় অপসারণ করা হয়, তাহলে তা আবার আসল নিষেধে ফিরে যায়।”^{২১} যেমন শরীরের কোনো ক্ষত স্থানে পট্টি ব্যবহার করলে ক্ষত স্থানের বাহিরে সুস্থ অংশে ব্যবহার করা যাবে না, যদি এমনটি হয় তবে পট্টির উপর মাসেহ বিপুল হবে না।

সহজীকরণের কারণ

একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে সহজীকরণ নীতিটি তখনই প্রয়োগ হবে যখন সে المشقة তথা কাঠিন্য বা অসুবিধার মুখোমুখি হবে। المشقة শব্দটি الشق হতে নির্গত যার অর্থ- কষ্ট, প্রচেষ্টা। যেমন, রাসুলুল্লাহ (সা.) এর বাণী كل أمرئ لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة “আমার উম্মাতের উপর কষ্টকর হয়ে যাবে -যদি একথা মনে না করতাম তাহলে আমার উম্মাতকে প্রত্যেক ওয়াক্ত সালাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম”।^{২২} পরিভাষায় “আল মাশাক্কা” হলো, تعب عنه عناء وتعب “এটি এমন একটি অসহনীয় কার্যভার যা ভীষণ কষ্ট ও ক্লান্তির কারণ হয়ে থাকে”।^{২৩} المشقة বা কাঠিন্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঐ কাঠিন্য যা শার‘ঈ বিধান পালনে প্রতিবন্ধক হয়। সাধারণ কষ্ট বা কাঠিন্য উদ্দেশ্য নয়। যেমন জিহাদের কষ্ট, হদের (শান্তি) কষ্ট, রাষ্ট্রদ্রোহী ও সন্ত্রাসীদেরকে হত্যার কষ্ট ইত্যাদি। অতএব বলা যায়, কোনো ব্যক্তি শরিয়াতের কোনো বিধান পালনে সমস্যার সম্মুখীন হলে উক্ত সমস্যাটিই শরিয়াতের বিধানটির সহজীকরণের কারণ বলে বিবেচিত হবে। ইসলামি আইন বিশারদগণ সহজীকরণের কয়েকটি বিশেষ কারণ উল্লেখ করেছেন।^{২৪} যেগুলো নিম্নরূপ:

ক. ভ্রমণ (السفر): এক্ষেত্রে সহজীকরণ হলো, চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতে দুই রাকাত আদায় করা বা কসর করা, দুই ওয়াক্তের নামাজকে একত্রে আদায় করা, রমাদান মাসে রোযা ভঙ্গ করে পরবর্তীতে আদায় করা, জুম‘আ ছেড়ে দেয়া, একদিন এক রাত পর্যন্ত মুকীম ব্যক্তি এবং তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মোযার উপর মাসেহ করা।

খ. অসুস্থতা (المرض): অসুস্থতার মাধ্যমে সহজীকরণ হলো- অজুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করা, ফরজ সালাত বসে আদায় করা, মসজিদে জামা‘আতে সালাত আদায় থেকে বিরত থাকা, জুম‘আর সালাত থেকে বিরত থাকা, রামাদানের রোযা ভঙ্গ করা, নিজের হজ্জ আদায়ে অন্যকে মনোনীত করা।

গ. জোর জবরদস্তি করা (الإكراه): এর দ্বারা ইচ্ছা ও পছন্দ পরিবর্তন করা হয়।

- ঘ. ভুলে যাওয়া (النسيان): যার মাধ্যমে কোন ফরজ রহিত হয়ে যায়। যেমন- কোনো ব্যক্তি জুম'আর সালাতের উপস্থিতির বিষয়টি ভুলে গেল, তখন সে যোহরের সালাত আদায় করবে।
- ঙ. অজ্ঞতা (الجهل): কোনো ব্যক্তি অজ্ঞতার কারণে কোনো একটি বিধান ছেড়ে দিল।
- চ. সাধারণ বিপর্যয় (عموم البلوى): যেমন- রাস্তাঘাটের ময়লা কাপড়ে লেগে থাকা অবস্থায় সালাত আদায়ের অনুমতি থাকা।
- ছ. অসম্পূর্ণতা (النقص): যার মাধ্যমে শিশু ও পাগল ব্যক্তির উপর শরিয়তের বিধান প্রবর্তিত হয়না। অনেক আমল যা পুরুষের জন্য জরুরী কিন্তু মহিলাদের জন্য জরুরী নয়। যেমন- জামা'আতে সালাত আদায় করা, জিহাদে উপস্থিত হওয়া।^{২৬}

আত-তাইসিরের ধরণ

ইসলামি শরিয়তে সহজীকরণ নীতির কয়েকটি ধরণ রয়েছে যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ক. দ্রুত আদায়ের সহজীকরণ (التيسير بالتعجيل):

কোনো ব্যক্তির আমলের সক্ষমতা থাকাবস্থায় তার উপর আরোপিত বিধানটি দ্রুত আদায়ের নির্দেশনা দিয়ে ইসলামি শরিয়াহ বিষয়টিকে সহজ করেছে, যেমন আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

“تَوَامِدُكُمْ فِي شَهْرِ رَمَادَانَ” “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সেই মাসে (রামাদান) উপস্থিত থাকে সে যেন সিয়াম পালন করে”।^{২৭} অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সক্ষম বা সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর রামাদানের সিয়াম ফরয করার সাথে সাথে দ্রুত আদায়ের নির্দেশনা দিয়েছেন।

খ. দেরিতে আদায়ের মাধ্যমে সহজীকরণ (التيسير بالتأجيل):

কোনো ব্যক্তির বিধান পালনে সাময়িক কোনো শার'ঈ প্রতিবন্ধকতা থাকলে বিধানটি পালনে প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে যেমন আল্লাহ তা'আলা সিয়াম পালনের নির্দেশনা দেয়ার পর পরই উল্লেখ করেছেন যে, “وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ” “এবং যে ব্যক্তি পীড়িত অথবা সফরে তার জন্য অপর কোনো দিন হতে গণনা করবে”।^{২৮} অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অসুস্থতা ও সফরকে উজর বা প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করে দিয়েছেন; যার দ্বারা বান্দা রামাদানের সাওম পরবর্তীতে বা প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ার পর আদায়ের সুযোগ পায়।

গ. রহিত করার মাধ্যমে সহজীকরণ (التيسير بالاسقاط):

বান্দার উপর থেকে কাঠিন্যের সময় আমল রহিত হয়ে যাবে। যেমন- যৌক্তিক উষর বা সমস্যার কারণে জুম'আর সালাত রহিত হয়ে যায়। অক্ষম ব্যক্তির উপর থেকে হজ্জের ফরয রহিত হয়ে যায়। অন্ধ, খোঁড়া, ল্যাংরা ও হাত কাটা ব্যক্তির উপর থেকে জিহাদের ফরয রহিত হয়ে যায়। হায়েয চলাকালে মহিলার ওপর সালাত আদায়ের ফরজ রহিত হয়ে যায়।

ঘ. হালকা বা হ্রাসকরণের মাধ্যমে সহজীকরণ (التيسير بالتخفيف):

মুসাফির ব্যক্তির সালাতে সংক্ষেপণ বা কসর করার অনুমোদন রয়েছে অর্থাৎ সফরের মাশাক্কা বা কষ্টের কারণে চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতকে দুই রাকাত আদায়ের বিধান দেয়া হয়েছে। অসুস্থ ব্যক্তি সালাত-কে সাধ্যমত বসে বা শুয়ে, ইশারার মাধ্যমে আদায়ের অনুমোদন রয়েছে। যেমন রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাহাবী ইমরান ইবন হুসাইনকে বললেন: **صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب** “তুমি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর, যদি সক্ষম না হও তবে বসে আদায় কর, যদি বসেও সক্ষম না হও তবে শুয়ে আদায় কর”।^{৯৬}

ঙ. পরিবর্তন বা বিকল্প আমলের মাধ্যমে সহজীকরণ (التيسير بالتبديل):

অসুস্থ ব্যক্তি অযু-গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করার অনুমতি রয়েছে। অসুস্থ ব্যক্তি সালাত দাঁড়িয়ে আদায়ের পরিবর্তে বসে আদায়ের অনুমতি রয়েছে। অত্যধিক বার্ধক্যের কারণে রামাদানের সাওম-এর পরিবর্তে ফিদিয়া বা মিসকিনকে খাদ্য দেয়ার মাধ্যমে আদায়ের অনুমতি রয়েছে।

চ. আগে বা পরে আদায়ের মাধ্যমে সহজীকরণ (التيسير بالتأخير أو التقديم):

হাজী ও মুসাফির ব্যক্তি এক ওয়াক্তের সালাতকে পূর্বের ওয়াক্তের সালাতের সাথে বা পরের ওয়াক্তের সালাতের সাথে আদায়ের অনুমতি রয়েছে। যাকাতুল ফিতরকে ঈদের দিনের পূর্বেই আদায় করার অনুমতি রয়েছে।

আত্-তাইসির বা সহজীকরণ নীতির প্রায়োগিক দৃষ্টান্ত

একজন মুসলমানের সামগ্রিক জীবনে আত্-তাইসির বা সহজীকরণ নীতির অনেকগুলো প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। বর্ণিত নীতির আলোকে কয়েকটি প্রয়োগ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

ক. শরীরের কোনো আক্রান্ত অংশে প্লাস্টার বা পট্টি থাকলে অযু-গোসলে করণীয়

ডান হাত ভাঙা ও প্লাস্টার করার কারণে অযু ও গোসলের বিধান মওকুফ হবে না। কারণ, তিনি বাম হাত ব্যবহার করতে পারেন, পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাম হাতের সহযোগিতা নিতে পারেন এবং পবিত্রতা অর্জনের জন্য ধোয়া ফরয এমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পানি পৌছাতে পারেন। প্লাস্টারকৃত অংশে হালকাভাবে মাসেহ করলেই চলবে এতে পবিত্রতার কোনো ক্ষতি হবে না। মাসেহ শুধু একবার করাই যথেষ্ট। ধৌত করার মত একাধিকবার নয়। এর পক্ষে শারঈ দলিল হচ্ছে, ফিক্‌হ শাস্ত্রের সাধারণ নীতি যার পক্ষে কুরআন-হাদিসের সাক্ষ্য রয়েছে। নীতিটি হলো, “কাঠিন্য সহজায়ন আনে” (المشقة تجلب التيسير)। এ প্রসঙ্গে দলীল: আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী-

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

“আল্লাহ কারো উপর এমন কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না যা তার সাধ্যাতীত”।^{৯৭}

শারঈ বিধান পালনে বান্দা যদি সক্ষমতা রাখে, কিন্তু এতে তার কিছু ক্ষতি সাধিত হয় এমন সক্ষমতাকে শরী‘আতে অনেক আমলের ক্ষেত্রে অক্ষমতা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। যেমন পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা, রোগ নিয়ে সাওম পালন করা, দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা ইত্যাদি।

সহীহ বুখারীতে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা.) ইরশাদ করেছেন:

إِنَّمَا بَعَثْتُمْ مِيسِرِينَ وَلَمْ تَبْعَثُوا مَعْسِرِينَ.

“তোমরা সহজকারীরূপে প্রেরিত হয়েছ, কাঠিন্য আরোপকারী হিসেবে নয়”।^{১১}

খ. ভীষণ ক্ষুধার মুহূর্তে হারাম খাবার বা মৃত প্রাণি খাওয়া

ইসলামি শরিয়াহ ভীষণ ক্ষুধার সময় হারাম খাবার ভক্ষণ করার অনুমতি দিয়েছে। অর্থাৎ ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং এমতাবস্থায় হালাল খাবার না পায় তাহলে সে হারাম খাবার ভক্ষণ করতে পারবে। যেমন- মৃত প্রাণী, শুকরের মাংস, এবং যে প্রাণী আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে জবেহ করা হয়েছে।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْقُطُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِسْقُ الْيَوْمِ.

“তোমাদের জন্য মৃত, রক্ত, শুকর মাংস, আল্লাহ ছাড়া অপরের নামে উৎসর্গীকৃত পশু, গলাটিপে মারা পশু, প্রহারে মৃত পশু, শৃংগাঘাতে মৃত পশু এবং হিংস্র জন্তুকে খাওয়া হারাম করা হয়েছে। তবে যা তোমরা যবেহ দ্বারা পবিত্র করেছ তা হালাল। আর যে সমস্ত পশুকে পূজার দেবীর উপর বলি দেয়া হয়েছে তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করাও তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে”।^{১২}

এ আয়াতের মধ্যে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, কোনো ব্যক্তি জীবন বাঁচানোর জন্য মৃত প্রাণী যা মূলত হারাম, তা সাময়িকভাবে তার জন্য হালাল।

এ প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا، نَزَلَ الْحَرَّةَ وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ نَاقَةً لِي ضَلَّتْ فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكْهَا . فَوَجَدَهَا فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا فَمَرَضَتْ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ انْحَرْهَا . فَأَبَى فَنَقَعَتْ فَقَالَتْ اسْلُخْهَا حَتَّى نَقِدَّ شَحْمَهَا وَلَحْمَهَا وَنَأْكُلَهُ . فَقَالَ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ " هَلْ عِنْدَكَ غَنَى يُغْنِيكَ " . قَالَ لَا . قَالَ " فَكُلُوهَا " . قَالَ فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ " هَلَّا كُنْتُ نَحَرْتُهَا " قَالَ اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ.

“জাবির ইনব সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি হাররা নামক স্থানে অবতরণ করে এবং তার সাথে ছিল তার পরিবার-পরিজন ও সন্তান-

সম্মতি। সে সময় জনৈক ব্যক্তি তাকে বলেন, আমার উট হারিয়ে গেছে, যদি তুমি সেটিকে পাও তবে বেঁধে রাখবে। সে ব্যক্তি সে উটকে পেল, কিন্তু তার মালিককে আর পেল না। হঠাৎ সে উটটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন তার স্ত্রী তাকে বলল, তুমি এটিকে নহর বা যবাহ কর। কিন্তু সে তা করতে অস্বীকার করে এবং পরে উটটি মারা যায়। এরপর তার স্ত্রী বলেন, তুমি চামড়া ছুলে ফেল, যাতে আমরা এর গোশত ও চর্বি খেতে পারি, (কারণ আমরা উপোস ও ক্ষুধার্ত)। তখন সে ব্যক্তি বললেন, (অপেক্ষা কর) যাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারি। তখন সে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তোমার নিকট এমন কিছু (খাবার) আছে কি, যা তোমাকে এ মৃত জন্তু খাওয়া থেকে অমুখাপেক্ষী করতে পারে? তখন সে বলল, আমার কাছে কিছুই নেই। তিনি বললেন, তবে তোমরা তা খেতে পারো। রাবী বললেন, এ সময় উটের মালিক সেখানে আসলে সে লোকটি তাকে ব্যাপারটি অবহিত করে। তখন উটের মালিক বললেন, তুমি তাকে কেন নহর করলে না? সে লোকটি বলল, তোমার কথা চিন্তা করে আমি লজ্জানুভব করি যে, বিনা অনুমতিতে সেটিকে কিভাবে যবেহ করবো?***

গ. পানির সন্ধান না পেলে তায়াম্মুম করা

ইসলামি শরিয়াহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে পবিত্রতা অর্জন করার জন্য অযু ও গোসলের বিধান আরোপ করেছে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জনের প্রয়োজন হলে অযু বা গোসলের মাধ্যমে তা অর্জন করতে পারবে। তবে পানি পাওয়া না গেলে অযু ও গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম** গোসলের অনুমতি দিয়েছে। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا.

“যদি তোমরা পবিত্রতার জন্য পানি না পাও তবে বিশুদ্ধ মাটির অন্বেষণ কর, তার দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ মুছে ফেল, নিশ্চই আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল”।^{৩৫}

ঘ. দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করা

জমহুর ফুকাহাগণ মত পোষণ করেছেন যে কোনো ব্যক্তি مشقة (মাশাক্বা) জটিল পরিস্থিতিতে দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করতে পারবে। যেমন ট্রাফিক পুলিশ, তিনি কর্তব্যরত অবস্থায় সালাতের সময় হলে দায়িত্বের কারণে সালাত আদায়ের সুযোগ না পেলে পরের ওয়াক্তে দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করতে পারবেন।^{৩৬} এ প্রসঙ্গে দলীল হিসাবে ইব্ন আব্বাস (রা.) এর হাদিসটি পেশ করা যায়,

عن ابن عباس قال جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يجر أمته.

“ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) শত্রুর ভয় ও বৃষ্টির কারণ ছাড়াই মদিনাতে যোহর ও আসর সালাত এবং মাগরিব ও ঈশার সালাত একত্রে আদায় করেছেন। ইবন আব্বাস (রা.) কে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তাঁর উম্মাত যেন অসুবিধায় না পড়ে সেজন্য তিনি এরূপ করতেন”।^{৭৭}

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন, দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করার ব্যাপারে ইমাম আহমদ (রহ.) এর মাযহাব সবচেয়ে প্রশস্ত, কেননা তার থেকে বক্তব্য উল্লেখ হয়েছে যে, কোনো সমস্যার কারণে বা কাজের অতিরিক্ত চাপের কারণে দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করা যাবে এবং তার বক্তব্যের স্বপক্ষে ইবনে আব্বাস (রা.) এর হাদিসটি উপস্থাপন করেন।^{৭৮}

৬. পুরুষ ডাক্তার দ্বারা মহিলার চিকিৎসা বা অপারেশন করা

ইসলামি শরিয়ার নির্দেশনা মোতাবেক একজন নারী মাহরাম ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সাথে পর্দা ছাড়া সাক্ষাৎ দিতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.

“মুমিনদেরকে বলো- তারা যেন দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য উত্তম পবিত্রতা রয়েছে। তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ অবহিত”।^{৭৯}

এ প্রেক্ষিতে একজন নারীর চিকিৎসার জন্য অভিজ্ঞ কোনো নারী ডাক্তার পাওয়া গেলে তার থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করা নিরাপদ ও জরুরি। তবে মহিলা ডাক্তারের অনুপস্থিতিতে পুরুষ ডাক্তার দিয়ে অপারেশন করানো যাবে। জরুরত বা প্রয়োজনের কারণে ইসলামি শরিয়াহ এর অনুমোদন দিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে কোনো কোনো ফকিহ রোগী দেখানোর সময় কাউকে সাথে রাখা, বিশেষ করে অপারেশনের সময় কোনো নার্স বা সহযোগী ডাক্তার সাথে থাকার শর্তারোপ করেছেন।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলামি শরিয়াহ এই বিষয়ে সমর্থন করেনা যে, কোনো ব্যক্তি ইসলামের বিধি-বিধান পালনে নিজের উপর কঠোরতা আরোপ করবে অর্থাৎ সক্ষমতার বাহিরে কোনো কিছু চাপিয়ে নিবে বা দিবে এবং ব্যক্তি নিজেকে কষ্ট দিয়ে শাস্তি দিবে বা ধ্বংস করে দিবে; বরং নিজের শরীর ও আত্মার হক আদায় করতে নির্দেশ দেয়। আর ইসলামি শরিয়ায় সহজীকরণ নীতি “তাইসীর” এটি এমন কাজ যা আত্মাকে কষ্ট দেয় না এবং শরীরকে ভারাক্রান্ত করে না। বরং খুব সহজেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেটি অর্জিত হয়। অতএব, সহজীকরণ নীতি বান্দার উপর থেকে শরয়ি বিধান পালনে যে কাঠিন্য বা কষ্ট আসে তা দূর করে দেয় এবং বিকল্প ব্যবস্থা করে। যেমন, হালাল খাদ্য না থাকা অবস্থায় মৃত প্রাণী বা হারাম খাদ্য গ্রহণ করা, পবিত্রতার জন্য পানি না পাওয়া অবস্থায় তায়াম্মুম করা, মহিলা ডাক্তারের অনুপস্থিতিতে মহিলা রোগী পুরুষ ডাক্তার থেকে চিকিৎসা নেয়া, হায়েয নেফাস ও সফরে সাওম ভঙ্গ করে পরবর্তীতে কাযা করা ইত্যাদি। তবে লক্ষণীয় যে, উক্ত বিকল্প আমলটি শুধুমাত্র সাময়িক সময়ের জন্য। অর্থাৎ মূল অবস্থা ফিরে আসলে মূল হুকুমও ফিরে আসবে। তাই ইসলামি আইনের এই মূলনীতির আলোকে সমাধানকৃত

বিষয়গুলো সকলেই আমলে নিয়ে আসলে আশা করা যায় একটি ইসলামি সুখী সমৃদ্ধিশালী সমাজ গড়ে উঠবে।

তথ্যসূত্র ও টিকা

- ১ জামাল উদ্দীন ইবন মুহাম্মদ ইবন মানযুর আল-ইফ্রিকী, *লিসানুল আরব* (বৈরুত: দারু ইহইয়াত তুরাসিল আরবি, ১৯৯৯ খৃ.), খ.৭, পৃ.১৬৬, মুহাম্মদ ইবন আবী বকর ইবন আব্দুল কাদের আল-রাজী, *মুখতারুস সিহাহ* (বৈরুত: মাকতাবাতু আল-লুবনান, তা. বি.), পৃ. ৩৪৩
- ২ আল-কুরআন, ৫৪: ১৭
- ৩ আল-কুরআন, ২: ২৮০
- ৪ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, *আস-সহীহ* (বৈরুত: দারু ইবন কাসীর, ১৯৮৭ খৃ.), অধ্যায়: আল-ইমান, পরিচ্ছেদ: আদীল ইউসবুন, খ. ১, পৃ. ২৩, হাদিস নং-৩৯
- ৫ ইবরাহিম ইবন মূসা আল-লাখমী আশ-শাভবী, *আল মুয়াফাকাতু ফি উসুলীশ শারীয়াহ* (বৈরুত: দারুল মাআরিফাহ, ১৩৯৯ হি.), খ.২, পৃ. ৫২, মান্না' আল-কাত্তান, *রফযুল হারাজ ফি শারিয়াতিল ইসলামিয়াহ* (সৌদি প্রকাশনা: ১৯৮৫ খৃ.), পৃ. ৪২
- ৬ ডক্টর আব্দুর রাকিব সালেহ মহসিন আশ-শামী, *ফিকহুত তাইসির ফি আল-শারিয়াতিল ইসলামিয়াহ* (কুয়েত: ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ-শুয়ুনিল ইসলামিয়াহ, ২০১৯) পৃ.১৫
- ৭ আল-কুরআন, ৫: ৬
- ৮ আল-কুরআন, ২২: ৭৮
- ৯ আল-কুরআন, ৯: ৯১
- ১০ আল-কুরআন, ২: ১৫৮
- ১১ আল-কুরআন, ২: ১৮৫
- ১২ আল-কুরআন, ৪: ২৮
- ১৩ আহমাদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ* (বৈরুত: দারু ইবন কাসীর, ১৯৮৭ খৃ.), খ. ৫, পৃ. ২৬৬
- ১৪ ইমাম আল-বুখারী, *আল-জামি আস-সহীহ*, অধ্যায়: জিহাদ ও সফর, হাদিস নং- ৪৩৭৫
- ১৫ ইমাম আল-বুখারী, *আল-জামি আস-সহীহ*, অধ্যায়: তাওহীদ, পরিচ্ছেদ: আচার ব্যবহার, খ. ১, পৃ. ২৬১, হাদিস নং-৬১২৮
- ১৬ ইমাম আল-বুখারী, *আল-জামি আস-সহীহ*, পরিচ্ছেদ: ফিল মানাকিব খ.৪, পৃ. ১৬৬, হাদিস নং ৩৫৬০, আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস ইবন ইসহাক ইবন বাশির আল-আযদী আস-

- সিজিস্তানী, *আস সুনান* (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল আসরিয়াহ, তা. বি), খ. ৫, পৃ. ১৪২, হাদিস নং-১৭৪
- ১৭ যাইনুদ্দীন ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন নুজাইম আল-মাসরী, *আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের* (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ ১৯৯৯খৃ.), পৃ.৬৪
- ১৮ আল-কুরআন, ৬৪:১৬
- ১৯ ইব্ন নুজাইম, *আল-আশবাহ ওয়ান-নাযায়ের*, পৃ.৭৩
- ২০ আল-কুরআন, ৫: ৩
- ২১ ইব্ন নুজাইম, *আল-আশবাহ ওয়ান-নাযায়ের*, পৃ.৭৩
- ২২ ইমাম শাফেয়ী, *আল-উম্ম*, খ.৪ পৃ.২৭৮
- ২৩ ইমাম বুখারী, *আল জামি আস-সহীহ*, অধ্যায়: জুমআ, পরিচ্ছেদ: আস-সিওয়াকু ফি ইয়াওমুল জুমআ, খ.২, পৃ. ৩৭, হাদিস নং- ৮৮৭
- ২৪ ইবরাহিম ইব্ন মুসা আল লাখমী আশ্ শাতবী, *আল-মুয়াফাকাতু ফি উসুলীশ শারীয়াহ*, (বৈরুত: দারুল মাদারিফাহ, ১৩৯৯ হি.), খ.২, পৃ. ৮
- ২৫ আব্দুর রহমান ইব্ন আবি বকর জালালুদ্দীন আস-সুয়ুতী, *আল আশবাহ ওয়া আন নাযায়ের*, (বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়াহ, ১৯৯০খৃ.), পৃ.৭৭
- ২৬ আব্দুর রহমান ইব্ন আবি বকর জালালুদ্দীন আস-সুয়ুতী, *আল আশবাহ ওয়া আন নাযায়ের*, (বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়াহ, ১৯৯০খৃ.), পৃ.৮০
- ২৭ আল-কুরআন, ২: ১৮৫
- ২৮ আল-কুরআন, ২: ১৮৫
- ২৯ ইমাম বুখারী, *আল জামে আস সহীহ*, অধ্যায়: সালাত, পরিচ্ছেদ: সালাত কসর করা, হাদিস নং- ১১১৭
- ৩০ আল-কুরআন, ২: ২৮৬
- ৩১ ইমাম আল-বুখারী, *আল জামি আস-সহীহ*, অধ্যায়: তাওহীদ, পরিচ্ছেদ: আচার ব্যবহার, খ. ১, পৃ. ২৬১, হাদিস নং-৬১২৮
- ৩২ আল-কুরআন, ৫: ৩
- ৩৩ আবু ডাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস ইব্ন ইসহাক ইব্ন বাশির আল-আযদী আস-সিজিস্তানী, *আস সুনান* (বৈরুত: আল মাকতাবাতুল আসরিয়াহ, তা.বি), অধ্যায়: কিতাবুল আতয়ীমাহ, পরিচ্ছেদ: ফিল মুত্তাররে ইলাল মাইতাহ, হাদিস নং-৩৮১৬

- ৩৪ তায়াম্মুম শব্দটি বাবে تفعل এর মাছদার, মূলবর্ণ (ي، م، م) مضاعف ثلاثي, অর্থ ইচ্ছা করা, নিয়ত করা। শরিয়াতের পরিভাষায় তায়াম্মুম হলো, قال صاحب قواعد الفقهية: التيمم هو مسح الوجه واليدين من صعيد طيب “পবিত্র মাটি দ্বারা চেহারা ও হস্তদ্বয় মাসেহ করা”।
- ৩৫ আল-কুরআন, ৪: ৪৩
- ৩৬ আলা উদ্দিন আবুল হাসান আলী ইব্ন সোলাইমান আল-মারদাবী আদ-দামেশকী, আল ইনসাফ ফি মাআরিফাতির রাজেহ মিনাল খেলাফ (বৈরুত: মাকতাবাতুস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়া, ১৯৫৬ খৃ.), খ. ২, পৃ. ৩২১
- ৩৭ মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আবুল হাসান আল-কুশাইরী আন-নায়সাবুরী, আস-সহীহ (বৈরুত: দারে-ইহইয়ায়ুত তুরাছ আল আরাবী, তা.বি), অধ্যায়: সালাতুল মুসাফিরিন ওয়া কাসরিহা, পরিচ্ছেদ: বাবুল জাময়ে বাইনাস সালাতাইন ফিল হাদার, খ.২, পৃ. ৩৩৪
- ৩৮ ইবনু তায়মিয়াহ, আল-মুওসুয়া আল-ফিকহিয়াহ, খ.২, পৃ. ৯
- ৩৯ আল-কুরআন, ২৪: ৩০

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিনোদন: ইসলামি দৃষ্টিকোণ

মোহাম্মদ রেজাউল হোসাইন*

Abstract

Sports competition and festival are one of the most discussed topics in the current world. There is no place in the world where sports competitions and festivals are not being held. All sports and entertainment which are forbidden in the eyes of Islam, it is also forbidden to organize sports competitions. On the other side, all the sports and entertainments are lawful, Islam has given some specific important conditions to be lawful to her competition. Any country or organization that fulfills these conditions can host the competition. Besides, Muslim players will be participating in the current sports competition in the current world, when there will be no restriction and lend to perform Islamic rules and the beauty of Islam spread across the world. The article has been followed mainly analyzing and reviewed methods. The article proves that, all sports and their competitions are not haram. Organizing halal sports competitions is also halal if certain conditions are met and it can play a special role in promoting and spreading Islam.

চাবিশব্দ: ক্রীড়া, বিনোদন, প্রতিযোগিতা, উৎসব, শরঈ পর্যালোচনা

ভূমিকা

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিনোদন ব্যস্তময় পৃথিবীর বিনোদনমুখী মানুষের নিকট পঞ্চেন্দ্রিয়ার ন্যায় প্রভাব বিস্তার করেছে। খেলাধুলা ও বিনোদন ছাড়া মানুষের জীবন যেন অর্থহীন হয়ে পড়েছে। সাধারণ খেলাধুলা থেকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা দেখতেই মানুষ বেশি পছন্দ করে। অপরদিকে খেলোয়াড়েরাও প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেন্ট গুলোতে অংশগ্রহণ করতে মুখিয়ে থাকে। এসব প্রতিযোগিতার আয়োজনে অংশগ্রহণ ও উপভোগ করতে গিয়ে প্রায় সকলেই কোনো না কোনোভাবে শিরক ও হারাম কাজে জড়িয়ে যাচ্ছে। ক্রীড়া ও বিনোদনকে কেন্দ্র করে অসংখ্য বই, প্রবন্ধ ও অন্যান্য লেখা রচিত হলেও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসবকে কেন্দ্র করে ইসলামের বিধিবিধান সম্বলিত তেমন কোনো বই বা প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় রচিত হয়নি। যা হয়েছে তাতে পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়নি। যার ফলে কোটি কোটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষ মনের অজান্তেই হারাম কাজ সমূহে জড়িয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আধুনিক বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের নিকট “ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিনোদন : ইসলামি দৃষ্টিকোণ” নামক প্রবন্ধ রচনা সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ।

গবেষণা পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য

“ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিনোদন : ইসলামি দৃষ্টিকোণ” শীর্ষক প্রবন্ধটিতে প্রধানত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এপদ্ধতি হলো লিখিত বা মুদ্রিত বিভিন্ন উপকরণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পাঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বা সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সবিস্তার জানা। উৎসগত শ্রেণি বিন্যাস তা মূলত দুই ধরনের। এর একটি হচ্ছে প্রাথমিক তথ্য

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

উপাত্ত; যা সরাসরি কুরআন ও হাদিস থেকে নেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সহায়ক উপকরণ; প্রবন্ধ সংশ্লিষ্ট বই, প্রবন্ধ, টেলিভিশন, নিউজ, পত্র- পত্রিকা, টেলিভিশন টকশো ইত্যাদি। ক্রীড়া ও বিনোদন সম্পর্কে ইসলামি দৃষ্টিকোণ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসবের আয়োজন, বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মুসলিম খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপভোগ সংক্রান্ত বিষয় সমূহে গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে শিরক, হারাম ও হালালের মাঝে সুদৃঢ় প্রাচীর স্থাপন করে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসবকে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কৌশল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যার ফলে প্রবন্ধটি মুসলিম সমাজে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও উপভোগের ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ইসলাম প্রচারেও বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিনোদন পরিচিতি

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা একটি যৌগিক শব্দ। ক্রীড়া শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হলো “খেলা, তামাশা, আমোদজনক অনুষ্ঠান”^১ আরবি প্রতিশব্দ হলো, “لعبة رياضية، رياضة”^২ প্রতিযোগিতা শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হলো, “প্রতিদ্বন্দ্বিতা; বিরোধ”^৩ আরবি প্রতিশব্দ হলো, “مباراة مبارات”^৪ “مباراة رياضية”^৫

বিনোদন শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হলো, “আনন্দদায়ক; দূরীকরণ”^৬ আরবি প্রতিশব্দ হলো, “لهو”^৭ তবে অত্র প্রবন্ধে বিনোদন শব্দ দ্বারা ক্রীড়া এবং এ সংক্রান্ত আনন্দ, উৎসব ও প্রতিযোগিতাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

পারিভাষিক অর্থে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হলো; নির্দিষ্ট এক বা একাধিক খেলাকে কেন্দ্র করে দুই বা ততোধিক মানুষের বা দলের সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জনের প্রচেষ্টা।

“প্রতিযোগিতা একটি ঘটনা বিশেষ যেখানে ব্যক্তিগত কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সেরা নির্ধারণকল্পে একে অপরের সাথে মোকাবিলা করে থাকে”^৮

মূলকথা হলো, নির্দিষ্ট একটি আয়োজনে এক বা একাধিক খেলাকে কেন্দ্র করে একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাকেই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বলে। যেমন: অলিম্পিক গেমস, ফুটবল বিশ্বকাপ, ক্রিকেট বিশ্বকাপ ইত্যাদি।

আধুনিক বিশ্বে প্রসিদ্ধ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

মানুষ মাত্রই ক্রীড়া ও বিনোদন প্রেমী। কেননা তার স্বভাব ও চরিত্রে এটির মিশ্রণ রয়েছে। ব্যস্তময় জীবনে বিনোদন হলো, উত্তপ্ত মরুভূমির একফোঁটা জল। তাই সুযোগ পেলেই মানুষ মন খুলে হাসতে চায়, খেলতে চায়, সময়টাকে উপভোগ করতে চায়। এ বিষয়টিকে মাথায় রেখে মানুষ অতীত থেকেই ক্রীড়া ও বিনোদন প্রেমী। তবে একসময় ক্রীড়া ও বিনোদন মানবজীবনে উপকারী বিষয় হলেও অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলনা। কিন্তু বর্তমানে এটি মানবজীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে। এমনকি বর্তমানে দেশে দেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নিয়মতান্ত্রিক রুটিন করে বছরের নির্দিষ্ট একটি সময়কে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য নির্ধারণ করেছে। আধুনিক বিশ্বে অলিম্পিক গেমস, কমনওয়েলথ গেমস, ফুটবল ও ক্রিকেট বিশ্বকাপ, ব্যাডমিন্টন, এশিয়ান গেমস, হকি, দাবা, হ্যান্ডবল ও সাতার প্রতিযোগিতাসহ অসংখ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে খেলাধুলা ও বিনোদন

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হালাল নাকি হারাম এ বিষয়টি জানার পূর্বে খেলাধুলা ও বিনোদন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোকপাত করা জরুরী। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে খেলাধুলা বৈধ হলেই প্রতিযোগিতার প্রশ্ন আসে। কোনো খেলা বৈধ এবং কোনো খেলা বৈধ নয় ইত্যাদি বিষয়ের সমাধান হলেই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিনোদন বিষয়ে আলোকপাত করা সম্ভব। ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হলো ইহকালীন শান্তি এবং পরকালীন মুক্তি। তাই মানুষের কল্যাণে ইসলামের সকল বিধিবিধান জীবনব্যাপি। পরকালে মুক্তির জন্য যেমনি ইবাদাতের প্রয়োজন, তেমনি শান্তি-সুখের জীবনের জন্য চাই আনন্দ ও বিনোদন। মানবজীবনে যতগুলো উপকারী কামনা ও বাসনা রয়েছে তার কোনোটিতেই ইসলাম বাঁধা প্রদান করেনি। তাই ইসলামকে বলা হয় “দীনুল ফিতরাহ” বা স্বভাবজাত ধর্ম।^{১৮} মানুষের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে ইসলাম যদি বাঁধা প্রদান করত তাহলে ইসলামের দৈনন্দিন বিধি-বিধান পালনে তা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

অর্থ : তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি।^{১৯}

খেলাধুলার প্রচলন পূর্বেও ছিল এবং বর্তমানেও আছে। পূর্বে মানুষ খেলাধুলা করত শারীরিক কসরত, যুদ্ধের প্রস্তুতি ও অবসর সময় উপভোগের জন্য। কিন্তু বর্তমানে এটি পরিণত হয়েছে বাণিজ্যিক ও পেশাকরণ হিসেবে। এ সম্পর্কে শাইখ মুহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ লিখেছেন,

খেলাধুলার প্রচলন পূর্বেও ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ের মতো এতটা বাণিজ্যিক, পেশাকরণ ও জীবনের টার্গেট হিসেবে ছিল না। থাকলেও সেটা ছিল সীমিত পরিসরে। আর বর্তমান বিশ্বের আধুনিকায়নের ব্যাপারে অবগত প্রতিটি মানুষ জানে যে, খেলাধুলা এখন কেবল নিছক বিনোদন নয়; বরং এটা এখনকার তরুণ-তরুণীদের জীবনের অংশ ও অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সাথে জড়িয়ে আছে রথী-মহারথীদের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্যিক সম্পর্ক, আছে নানারকম রাজনৈতিক ব্যাপার। এর মাধ্যমে জনগণকে বোকা বানিয়ে নির্বিঘ্নে শাসনকার্য পরিচালনারও বিশাল সম্পর্ক রয়েছে। খেলার ধরনেও এসেছে আমূল পরিবর্তন। যৌনতানির্ভর ও নারী-পুরুষ একসাথে খেলার মাত্রাও দিনদিন বাড়ছে। বিশ্বের সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা এসব খেলাকে বানিয়ে দিয়েছে তাদের নেশা। মিডিয়ার আলোতে অশিক্ষিত, বর্বর ও চরিত্রহীনদের দেখানো হচ্ছে হিরো ও সমাজের আইডল হিসেবে।^{২০}

যে সকল খেলাধুলা মানুষের উপকারের চেয়ে ক্ষতি করে বেশি। সে সকল খেলাধুলা চর্চা ও উপভোগ ইসলাম বৈধ করেনি। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمَنْ يَتَذَكَّرْ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لِّلرَّزْقَيْنِ

অর্থ: বল, আল্লাহর কাছে যা আছে তা তোমাদের ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসা অপেক্ষা উত্তম। আর আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।^{২১}

ইসলাম আলস্য ও দুর্বলতাকে পছন্দ করেনা; বরং উদ্যম ও খুশি-আনন্দকেই পছন্দ করে। তাই শরীয়াতের শিক্ষা হলো; ইসলামের সকল বিধিবিধানের উপর সংকীর্ণতা নিয়ে আমল করার

পরিবর্তে আনন্দের সাথে প্রফুল্লচিত্তে আমল করবে। আর শারীরিক ও আত্মিক সজীবতা নিয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনে মনযোগী হবে। এসকল বিষয়কে সামনে রেখে খেলাধুলা ও বিনোদনকে সকল প্রকার হারাম ও অশ্লীলতা হতে মুক্ত রেখে এবং ফরজ ইবাদাত সমূহ পালনের পাশাপাশি ইসলাম প্রচার ও প্রসারকে গুরুত্ব দিয়ে বৈধ করেছে।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিনোদনের শরঈ বিধান

যে সকল খেলাধুলাকে ইসলাম হারাম বা নিষিদ্ধ করেছে সে সকল খেলাধুলার প্রতিযোগিতা ও উৎসবকেও হারাম করেছে। আর যে সমস্ত খেলাধুলাকে হালাল করা হয়েছে তার প্রতিযোগিতাকেও হালাল বা বৈধ করা হয়েছে। কেননা রাসুল (সাঃ) সাহাবাদের সাথে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত,

أن رسول الله ﷺ سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفيا وأمدتها ثنية الوداع وبينهما ستة أميال وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وبينهما ميل

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) হাফইয়া হতে সানিয়াতুল বিদা নামক স্থান পর্যন্ত দূরত্বের মাঝে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ঘোড়াসমূহের ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। আর এ স্থান দু'টির মধ্যকার ব্যবধান হলো ছয় মাইল। আর প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়াসমূহের ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন 'সানিয়াতুল বিদা' হতে 'বানী যুরইক'-এর মসজিদ পর্যন্ত। এ জায়গা দু'টির মধ্যকার ব্যবধান হলো এক মাইল।^{১২}

এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, রাসুল (সাঃ) নিজে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করেছেন এবং অন্যকে উৎসাহিত করেছেন। এ ছাড়াও রাসুল (সাঃ) তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতার উৎসাহ দিতেন। সালমা ইবনু আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত,

مر النبي ﷺ على نفر من أسلم ينتضلون فقال النبي ﷺ ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ارموا وأنا مع بني فلان قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله ﷺ ما لكم لا ترمون قالوا كيف نرمي وأنت معهم قال النبي ﷺ ارموا فأنا معكم كلكم

সালমা ইবনু আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আসলাম গোত্রের একদল লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তারা তীরন্দাজীর প্রতিযোগিতা করছিল। তখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হে বনী ইসমাঈল! তোমরা তীরন্দাজী করে যাও। কেননা তোমাদের পূর্বপুরুষ তীরন্দাজ ছিলেন। সুতরাং তোমরাও তীরন্দাজী করে যাও। আর আমি অমুক গোত্রের লোকদের সঙ্গে আছি। রাবী বলেন, তাদের এক পক্ষ হাত চালনা হতে বিরত হয়ে গেল। তখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তোমাদের কী হল, তোমরা যে তীরন্দাজী করছ না? তখন তারা বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা কিভাবে তীর ছুঁড়তে পারি, অথচ আপনি তো তাদের সঙ্গে রয়েছেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা তীর ছুঁড়তে থাক, আমি তোমাদের সবার সঙ্গেই আছি।^{১৩}

এ ছাড়াও রাসুল (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন মর্মে হাদিসে উল্লেখ রয়েছে,

عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي ﷺ في سفر قالت: فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك السبقة

আমি তাঁর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করে তাঁকে ছাড়িয়ে আগে চলে গেলাম। পরবর্তী সময়ে আমি কিছুটা স্বাস্থ্যবান হয়ে যাওয়ার পর তাঁর সঙ্গে আবারও দৌড় প্রতিযোগিতা করি, কিন্তু এবার তিনি হারিয়ে দিয়ে বিজয়ী হন। এরপর রাসুল (সাঃ) আমাকে বলেন, ‘এ বিজয় সেই বিজয়ের বদলা।’^{১৪}

শারীরিক সুস্থতা ও হৃদয়ের সতেজতার জন্য খেলাধুলা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সূঠাম দেহ, সুন্দর ও বলিষ্ঠ মুমিন ইসলামের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি (রহঃ) বলেছেন, “যুদ্ধ বিষয়ক খেলা শুধু খেলা ছিল না; বরং তার মাঝে যুদ্ধের ময়দানে বীরত্ব প্রদর্শন এবং শত্রুর মোকাবিলা করার প্রশিক্ষণ ছিল।”^{১৫}

এছাড়াও বলিষ্ঠ দেহের মুসলিমের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: "المؤمن القوي، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍّ خيرٌ، أحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء، فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قَدَّرَ الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেন, দুর্বল মুমিন অপেক্ষা সবল মুমিন শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ আছে। তোমাকে যা উপকার দেবে সে বিষয়ে প্রলুব্ধ হও। আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো। অক্ষম অকর্মণ্য হয়ো না। কোনো অবাস্তিত বিষয়ে আক্রান্ত হলে বলোনা, যদি আমি এটা করতাম, তাহলে এটা এটা হতো; বরং বলবে আল্লাহর ফয়সালা; তিনি যা চান তা-ই করেন। কারণ যদি কথাটা শয়তানের কাজের পথ খুলে দেয়।^{১৬}

এছাড়াও রাসুল (সাঃ) এর সাহাবিগণ তরমুজ খাওয়ার প্রতিযোগিতা করতেন মর্মেও হাদিস পাওয়া যায়। বকর বিন আব্দুল্লাহ মাজানি (রহঃ) বলেন,

كان أصحاب النبي ﷺ يتبا دحون بالبطيخ فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال

নবি মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাহাবিগণ তরমুজ (যা তৎকালীন যুগে বিরল ও আকর্ষণীয় ফল ছিল) খাওয়ার প্রতিযোগিতা করতেন। আবার বাস্তব জীবনে তারা সুপুরুষও ছিলেন।^{১৭}

এ সকল হাদিস হতে প্রমাণিত হয় যে, বৈধ খেলাধুলার প্রতিযোগিতাও বৈধ। তবে অবশ্যই শর্ত সাপেক্ষ। ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলো তখনি হালাল হবে যখন তা নির্দিষ্ট শর্তানুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিনোদন বৈধকরণে ইসলামের শর্তাবলি

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিনোদনকে বৈধকরণে ইসলাম কিছু শর্তারোপ করেছে। যা নিচে উল্লেখ করা হলো।

৭.১ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কোনোভাবেই জুয়ার স্পর্শ থাকবেনা। কেননা আল্লাহ তা’য়ালা জুয়াকে হারাম করেছেন। কারণ জুয়া সামাজিক অনাচার এবং মারাত্মক অপরাধ। এ সকল জিনিস মানুষকে অনিয়ম ও অনৈতিক কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ এবং উৎসাহিত করে যেমনি সমাজকে করে ক্ষত বিক্ষত তেমনি যুব সমাজ হয় বিপথগামী। তাই এ সকল কাজ গুলোকে আল্লাহ তায়ালা শয়তানের কাজ বলে সন্যাসন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجُسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে মুমিনগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তিরসমূহ নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।^{১৮}

বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বাজিকরেরা নানান ভাবে বাজি ধরে। যেমন দুই পক্ষ বাজি ধরলো যে, “আমার দল A বিজয়ী হবে”। অপর পক্ষ বললো, “না আমার দল B বিজয় অর্জন করবে”। অতঃপর উভয়ে বাজি ধরলো যে, “ঠিক আছে, পাঁচ হাজার টাকা করে বাজি হোক”। যারা বিজয় অর্জন করবে তারা পাঁচ পাঁচ করে দশ হাজার টাকা বাজি জিতবে। এভাবে বাজি ধরাকে ইসলাম হারাম করেছে। যেমন: হযরত ওমর (রাঃ) বাজির কথা শুনে বাজির বস্ত্র হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন,

حدثنا إبراهيم بن المنذر ، قال : حدثني معن ، قال : حدثني ابن المنكر ، عن أبيه ، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير بن عبد الله، أن رجلين اقتمرا على ديكين على عهد عمر ، فأمر عمر بقتل الديكة ، فقال له رجل من الأنصار : أقتل أمة تسبح ؟ فتركها

রাবিয়া ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু হুদাইর ইবনু আবদুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, দু'জন ব্যক্তি উমর (রাঃ) এর শাসনকালে দু'টি মোরগ লড়াইয়ের বাজি ধরে। উমর (রাঃ) মোরগ হত্যার নির্দেশ দেন। আনসারদের থেকে এক ব্যক্তি তাকে বলল, আপনি কি এমন এক উম্মাতকে হত্যা করবেন, যারা আল্লাহর তাসবিহ করে? তাই তিনি তাঁর নির্দেশ প্রত্যাহার করেন।^{১৯}

অনেক সময় ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটি জুয়াকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়। অনেকগুলো প্রতিযোগী বা দলের কাছ হতে টাকা তুলে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর বিজয়ী বা বিজয়ী দল সকল টাকা-পয়সা নিজের করে নেয়। আবার বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দৃশ্যমান হয় যে, বাজিকরেরা নির্দিষ্ট কোনো খেলোয়াড় বা প্রতিযোগীর সাথে এ মর্মে চুক্তি করেন যে, “তুমি যদি গোল মিস করো, তুমি যদি একটি ‘ওয়াইড’ বা ‘নো’ বল কর অথবা তুমি যদি ইচ্ছে করে হেরে যাও তাহলে তোমাকে এত হাজার বা এত লক্ষ টাকা দেয়া হবে।” ইসলামের দৃষ্টিতে এটিও জুয়া। যারা মাঠে খেলা পরিচালনা করেন অনেক সময় তারাও জুয়াড়ীদের সাথে চুক্তি করে নির্দিষ্ট দল বা প্রতিযোগীর পক্ষে রায় প্রদান করেন। ইসলামের দৃষ্টিতে এটিও হারাম। আমাদের দেশে নানান ভাবে লটারি টানা হয়। যেমন- নিজের টাকা দিয়ে অনেকেই লটারি ধরল। অতঃপর তাদের মাঝ হতে বিজয়ী খোঁজা হল। অথবা লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারণ করল। এটিও এক ধরনের জুয়া। এ সকল জুয়া হতে ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে মুক্ত রাখতে না পারলে ইসলামের দৃষ্টিতে তা হারাম বলে বিবেচিত হবে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَزَاءً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

হে মুমিনগণ, তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করোনা, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা। আর তোমরা নিজেরা নিজদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু।^{২০}

৭.২ ইসলামের দৃষ্টিতে জাদু হারাম। এটি জ্যোতিষী, গণক বা জাদু বিদ্যায় পারদর্শীদের সাহায্য করা হোক অথবা অন্যকোনো ভাবে করা হোক, সকল অবস্থায় এটি হারাম। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কোনোভাবেই জাদুর সংস্পর্শ থাকতে পারবে না। অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে আবার কখনো খেলাধুলার মাঝে দর্শককে বৃন্দ করে রাখতে বা ক্রীড়া উপভোগকারীকে ধোঁকা দিতে জাদুর ব্যবহার হয়। ইসলাম জাদুর মাধ্যমে সকল কাজকেই হারাম করেছে। রাসুল (সাঃ) সাতটি ধ্বংসকারী কাজের মধ্যে জাদুকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) এর বর্ণনায় রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন,

اجتنبوا السبع الموبقات "قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

আবু হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে নবি (সাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ রাসুল! সেগুলো কী? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শরীক করা, যাদু করা, আল্লাহ তা'আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, শরীয়ত সম্মত কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করা, রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং সরল স্বভাব বা সতী-সাদ্বী মু'মিনাদের অপবাদ দেয়া।^{২১}

সুতরাং রাসুল (সাঃ) এর হাদিস হতে স্পষ্ট হয় যে, ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জাদুর মিশ্রণ থাকলে তা অবৈধ বলে গণ্য হবে। অনুষ্ঠানটি বৈধ করণে অবশ্যই প্রতিযোগিতাকে জাদুর সকল ধরনের প্রভাব হতে মুক্ত রাখতে হবে।

৭.৩ একবিংশ শতাব্দীর প্রায় সকল ক্রীড়া অনুষ্ঠান ও উৎসবের উদ্বোধন অথবা শেষ করা হয় গান-বাজনা ও অশ্লীল নৃত্যের মাধ্যমে। ইসলামের দৃষ্টিতে যা অত্যন্ত জঘন্য গর্হিত কাজ। রাসুল (সাঃ) এ সম্পর্কে বলেছেন,

عن أبي مالك الأشعر قال قال رسول الله (صلي): ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف

অর্থ : আবু মালেক আল-আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, অবশ্যই আমার পরে এমন কিছু লোক আসবে যারা যেনা, রেশম, নেশাদার দ্রব্য, গান বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে।^{২২}

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসব তখনি বৈধতা পাবে যখন তা গান-বাজনা, উন্মাদ নৃত্য ও সকল ধরনের অশ্লীলতা হতে মুক্ত থাকবে। কারণ ইসলাম সুস্থ বিনোদনকে সমর্থন প্রদান করে এবং গান বাজনা সহ সকল প্রকারের অশ্লীলতা কে নিন্দা করে।

৭.৪ বর্তমান ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসব মানেই দর্শক ও শ্রোতাদের মাঝে নারী পুরুষের অবাধ মিশ্রণ, অশ্লীল দেহ ভঙ্গি, পর্দা ও হিজাবের যেন চূড়ান্ত সীমালঙ্ঘন। অথচ ইসলাম এ বিষয়গুলোকে অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে সম্বোধন করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থ : যারা পছন্দ করে যে, মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার বিস্তৃতি ঘটুক তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে আছে ভয়াবহ শাস্তি। আল্লাহ জানেন আর তোমরা জান না।^{২৩}

রাসুল (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) কে সাথে নিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপভোগ করতেন। তবে তাঁরা ছিলেন সর্বোৎকৃষ্ট ক্রীড়া উপভোগকারী। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَرْنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبْشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَسْأَمُ فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهِ

আমি একদিন হাবশীদের খেলা দেখছিলাম। তারা মসজিদের আঙ্গিনায় খেলা খেলছিল। আমি খেলা দেখে ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত দেখছিলাম। তখন নবি (সাঃ) তাঁর চাদর দিয়ে আমাকে আড়াল করে রেখেছিলেন। তোমরা অনুমান কর যে, অল্প বয়স্কা মেয়েরা খেলাধুলা দেখতে কী পরিমাণ আগ্রহী।^{২৪}

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অশ্লীল পোশাক, দেহভঙ্গি, বেপর্দা ও নারী-পুরুষ মিশ্রণ অবস্থায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপভোগ করা হারাম। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বৈধ করতে হলে অবশ্যই পুরুষ-মহিলা মিশ্রণ বন্ধ করতে হবে এবং বেপর্দা, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা সহ সকল ধরনের গর্হিত কাজ থেকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে মুক্ত রাখতে হবে।

৭.৫ বর্তমান বিশ্বে যতগুলো ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, ক্রিকেট ব্যতীত প্রায় সব গুলোতেই সতর খোলা থাকে। যা কবিরাহ গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। অথচ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

يٰٓأَيُّهَا آدَمُ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤَرِّى سَوْءَئِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

হে বনী আদম, আমি তো তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবে এবং যা দেহের সৌন্দর্যস্বরূপ। আর তাকওয়ার পোশাক উত্তম। এগুলো আল্লাহর আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।^{২৫}

রাসুল (সাঃ) নারীদের পর্দা সম্পর্কে বলেন,

عن عبد الله، عن النبي ﷺ، قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, নারী জাতি হল আপাদমস্তক সতর। যখন সে বের হয়, তখন শয়তান তাকে চমৎকৃত করে তোলে।^{২৬}

পবিত্র কুরআনে নির্দেশ এসেছে,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَصْنَافِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

ইমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে।^{২৭}

কুরআন ও হাদিসের বর্ণনা হতে স্পষ্ট হয় যে, নারীদের সমস্ত দেহ সতর বা পর্দার অন্তর্ভুক্ত। পুরুষের সতর সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন,

عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال الفخذ عورة

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবি (সাঃ) বলেছেন, উরু ও একটি আভরণীয় অঙ্গ।^{২৮}

রাসূল (সাঃ) আরো বলেছেন,

أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد

আবু সাঈদ আল খুদরী(রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কোনো পুরুষ অপর পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না এবং কোনো মহিলা অপর মহিলার লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না; কোনো পুরুষ অপর পুরুষের সাথে এক কাপড়ের নিচে ঘুমাবে না এবং কোনো মহিলা অপর মহিলার সাথে একই কাপড়ের নিচে ঘুমাবে না।^{২৯}

রাসূল (সাঃ) এর হাদিস হতে প্রমাণিত হয় যে, পুরুষের সতর নাভি হতে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের সতর সমস্ত দেহ। যারা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করবেন তারা অবশ্যই খেলোয়াড় ও দর্শকসহ সকলের সতর ঢেকে পোশাক পড়ার ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। অন্যথায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটি ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধতা পাবে না।

৭.৬ ইসলামের দৃষ্টিতে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসব হালাল করতে হলে অবশ্যই সালাতের সময় প্রতিযোগিতা বন্ধ করে প্রত্যেকের সালাতের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এমনকি জুমার দিনে জুমার সময়ে অবশ্যই খেলাধুলা বন্ধ করতে হবে। কেননা সালাতের সময়ে সালাত আদায় ব্যতীত অন্যান্য সকল কাজ করা হারাম। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

হে মুমিনগণ, যখন জুমু'আর দিনে সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও। আর বেচাকেনা বর্জন কর। এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা জানতে।^{৩০}

সুতরাং খেলাধুলার মাঝে সালাতের জন্য নির্ধারিত সময় নির্দিষ্ট করে সকলকে সালাতের ব্যবস্থা করে না দিলে সে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসব অবৈধ বলে বিবেচিত হবে।

৭.৭ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসবের ব্যবস্থা করতে গেলে অবশ্যই ব্যয় সংকোচনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। কেননা যেখানে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ অনাহার বা অর্ধাহারে জীবন কাটাচ্ছে, সেখানে অধিক ব্যয়ে উৎসব পালন করা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ হবে না। আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে বলেছেন,

وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

অর্থ্যাৎ আর তোমরা অপচয় করোনা, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।^{৩১}

রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

إن الله كره لكم ثلاثا قليل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال

আল্লাহ্ তোমাদের তিনটি কাজ অপছন্দ করেন, অনর্থক কথাবার্তা বলা, সম্পদ নষ্ট করা এবং অত্যধিক সওয়াল করা।^{৩২}

সুতরাং ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসব পালনে অবশ্যই ব্যয় সংকোচন করতে হবে। অন্যথায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটি বৈধতা পাবেনা।

৭.৮ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসবের নির্দিষ্ট একটি উদ্দেশ্য থাকতে হবে। যার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ লাভবান হয়। বিশ্বের কাছে ইসলামের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি পায়। মুসলিম-অমুসলিম সবার ঘরে ইসলামের শান্তির বার্তা ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বের মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবন, আচার আচরণ ও সকল কাজে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টাসহ ইসলামের বিধি-বিধানের সৌন্দর্য প্রচার ও প্রসারে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া একান্ত কর্তব্য। পাশাপাশি মুসলিমদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসবটি সারা বিশ্বে এ বার্তা প্রদান করবে যে, শিরক ও সকল প্রকার হারাম কাজ হতে দূরে থেকেও অত্যন্ত শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার সাথে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসব আয়োজন করা সম্ভব। যা একজন প্রতিযোগীকে যেমনি পরিশ্রমী করে গড়ে তুলবে তেমনি শৃঙ্খলাবোধ, সচেতনতা, কর্তব্যপরায়ণতা ও ইসলামি বিধিবিধান পালনে যত্নশীল মানুষ হওয়ার নৈতিক শিক্ষা দিবে।

৭.৯ বর্তমান ক্রীড়া উৎসব গুলোকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বেই অসংখ্য প্রতিযোগী ও বিভিন্ন দল এবং দেশ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। যার ফলে তাদের রয়েছে নিজস্ব সমর্থক। যারা নিজেদের পছন্দের খেলোয়াড়, দল বা দেশকে সমর্থন করতে গিয়ে নানা অন্যায়, অশ্লীল ও গর্হিত কাজে জড়িয়ে পড়ে। যেমন: বিপক্ষ দল বা খেলোয়াড় ও দর্শককে কটাক্ষ করা, গালি দেয়া, উচ্চানি দেয়া, এমনকি ঝগড়া ও খুন করতে পর্যন্ত পিছুপা হয় না। অথচ ইসলাম এসব গর্হিত কাজকে হারাম করেছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

হে ইমানদারগণ, কোনো সম্প্রদায় যেন অপর কোনো সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর কোনো নারীও যেন অন্য নারীকে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না। ইমানের পর মন্দ নাম কতইনা নিকৃষ্ট! আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো যালিম।^{৩৩}

আবার পছন্দের খেলোয়াড়, দল বা দেশের হারে অনেক বিনোদন প্রেমি নেশা দ্রব্য গ্রহণ, মদ পান, মাতলামি এমনকি আত্মহত্যা পর্যন্ত করে থাকে। যা ইসলাম সম্পূর্ণরূপে হারাম করেছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوبَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

হে মুমিনগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। আর যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, নিশ্চয় সে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেবে। আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকত, তাহলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারত না; কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, পবিত্র করেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।^{৩৪}

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসবের কমিটি এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখবে এবং এমন ঘটনা এড়ানোর জন্য অবশ্যই সচেতনতা বৃদ্ধি করবে এবং মুসলিমরা যাতে এসব হারাম ও গর্হিত কাজ হতে নিজেদের রক্ষা করে এ ব্যাপারে অবশ্যই জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে। অন্যথায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসবটিকে ইসলাম বৈধতা প্রদান করবে না।

আধুনিক বিশ্বের প্রচলিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মুসলিমদের অংশগ্রহণ

আধুনিক বিশ্বে অসংখ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যার সাথে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার জড়িত। অনেকেই এগুলোকে নিজেদের ব্যবসা হিসেবে নিয়েছে। একে কেন্দ্র করেই কোটি কোটি মানুষের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। এর সাথে জড়িত রয়েছে মদ-জুয়া, যেনা ব্যভিচার এবং অশ্লীলতাসহ অসংখ্য পাপাচার ও গর্হিত কাজ। এ প্রতিযোগিতা ও উৎসবগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো অলিম্পিক গেমস, কমন-ওয়েলথ গেমস, ফুটবল ও ক্রিকেট বিশ্বকাপসহ অন্যান্য ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

এসব ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসবে মুসলিমরা অংশগ্রহণ করতে পারবে কিনা, এ বিষয়টি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

৮.১ যে সকল প্রতিযোগিতার সাথে শিরক, জাদু, জুয়া, যেনা, অশ্লীল নাচ-গান ও অন্যান্য হারাম কথা, কাজ ও উদ্দেশ্যের সম্পর্ক রয়েছে সে সকল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ মুসলিমদের জন্য হারাম। কেননা আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

হে মুমিনগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। আর যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, নিশ্চয় সে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেবে। আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকত, তাহলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারত না; কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, পবিত্র করেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।^{৩৫}

৮.২ এ সকল উৎসবগুলোতে অংশগ্রহণ করলেও যদি মুসলিমদের শিরক ও অন্যান্য কাজগুলোতে অংশগ্রহণের বাধ্যবাধকতা না থাকে এবং মুসলিমরা তাদের ফরজ বিধান সমূহ পালনে কোনো বাঁধার সম্মুখীন না হয় তাহলে উক্ত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠানে মুসলিমরা অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে ইসলাম ও ইসলামের দৈনন্দিন বিধান সমূহের সৌন্দর্য সারা বিশ্বের অমুসলিমদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়াই মূল উদ্দেশ্য হতে হবে। কিন্তু অনুষ্ঠানটি যদি শিরক ও অন্যান্য হারাম কাজের সাথে জড়িত থাকে এবং মুসলিম খেলোয়াড়, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যদি নিজেদের দৈনন্দিন ফরয ইবাদাত পালনে ব্যর্থ হয়, যেমন- সতর ঢাকা, সময় মত সালাত আদায়, পর্দা পালন এবং মুসলিম খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্য যদি ইসলামের সৌন্দর্য ছড়িয়ে

দেয়া না হয়ে নিজেদের খ্যাতি অর্জন, অর্থের প্রতি মোহ এবং হারাম কাজের প্রতি আকর্ষণ হয়, তাহলে আধুনিক বিশ্বের প্রচলিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসবে মুসলিমদের অংশগ্রহণ হারাম।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْغُلُونِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর।^{৩৬}

রাসুল (সাঃ) এ সম্পর্কে বলেছেন,

عن عطية السعدي، وكان من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس

আতিয়া আস- সায়াদী (রাঃ) বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনা, যতক্ষণ না সে গুনাহের কাজে নিমজ্জিত হওয়ার আশংকায় ঐ সব কাজও পরিত্যাগ করে যে সবে আপাতদৃষ্টিতে কোনো গুনাহ নেই।^{৩৭}

মুসলিম দেশে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ ক্রীড়া ও বিনোদনের মাঝে ক্ষুরধার শ্রোতের ন্যায় নিজেদেরকে ভাসিয়ে দিচ্ছে। এমন মানুষ খুজঁ পাওয়াই দুষ্কর যারা খেলাধুলা ও বিনোদন পছন্দ করেনা। সুতরাং সারা বিশ্বের অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের সুমহান সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সমূহ আয়োজন করা যেতে পারে। যেমন ভাবে কাতার ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২২ আয়োজন করেছে। যদিও উক্ত প্রতিযোগিতাটিতে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বৈধ করণের শর্ত সমূহ পালন করা হয়নি। তবু বৈশ্বিক এ আসরকে কেন্দ্র করে মুসলিম দেশ কাতার ইসলামের বিধিনিষেধ প্রয়োগ এবং ইসলাম প্রচার ও প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ফলে সারা বিশ্বের মুসলিম অমুসলিম মানুষের মাঝে ইসলামের সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। কাতার বিশ্বকাপ আয়োজকগণ প্রতিযোগিতা চলাকালিন মদ পান, ব্যভিচার, সমকামিতা ও অশ্লীলতা বন্ধ করেছে। এ সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা প্রতিবেদন করেছে,

ফিফা আয়োজিত ফুটবল বিশ্বকাপ, অলিম্পিক গেমস, কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়ান গেমসের মতো মেগা ইভেন্ট সব সময়ই একটা মিলন উৎসবের চেহারা নেয়। যেখানে সারা বিশ্ব থেকে ফুটবলার, কোচ, কোচিং স্টাফরা ছাড়াও এসে উপস্থিত হন অগণিত সমর্থক। প্রিয়দলের রঙে নিজেদের রাঙিয়ে পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুনে তারা রাঙিয়ে তোলেন চারপাশকে। তৈরি হয় উৎসবের মেজাজ। সেই উৎসবের অন্যতম অঙ্গ পার্টি, নাইট লাইফ, যৌনসুখ। কিন্তু আসন্ন কাতার বিশ্বকাপ ফুটবলকে ঘিরে দর্শকদের দেখা এইসব স্বপ্ন হয়ত স্বপ্ন থেকে যাবে। কারণ কাতার প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে সমস্ত রকম পার্টি নিষিদ্ধ। আর বিবাহ বহির্ভূত যৌনতায় লিপ্ত হলেই ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। ইউরোপ-আমেরিকার ফুটবলপ্রেমীদের জন্য কার্যত দুঃসংবাদই দিল কাতার প্রশাসন। সাধারণত খেলাধুলোকে ঘিরে পার্টি ও অবাধ মেলামেশা করা ইউরোপ বা আমেরিকার ক্রীড়ামোদিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আসন্ন কাতার বিশ্বকাপে এই সব বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে দর্শকদের। এতকাল বিশ্বকাপ ফুটবলকে

ঘিরে মাঠের খেলা উপভোগের পাশাপাশি মাঠের বাইরেও উদ্দাম জীবন উদযাপন করতে পেরেছেন দেশ-বিদেশের দর্শকরা। তবে ২১ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা কাতার বিশ্বকাপে এইসব বিষয় একেবারে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।^{৩৮}

বিশ্বকাপ চলাকালিন মদ পান, অ্যালকোহল, অবৈধ যৌন সম্পর্ক, সমকামিতা ও অন্যান্য অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ করে ইসলামের সুমহান আদর্শকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যার মাধ্যমে অমুসলিমদের মনে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জেগেছে এবং তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে যে, অশ্লীলতা ছাড়াও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন সম্ভব। কাতার কর্তৃপক্ষ বিশ্বকাপ চলাকালিন সময়ে কুরআন, হাদিসের কিতাব, ইসলামি বই, জায়নামাজ, হিজাব সহ অসংখ্য ইসলামিক উপকরণ বিলি করেছে। দেয়াল, বিলবোর্ড ও সরকারি বেসরকারি টেলিভিশনগুলোতে কুরআন-সুন্নাহের বাণী, টকশো ও ইসলামের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে ব্যাপক প্রচারণা চালিয়েছে। অমুসলিমদের জন্য সমস্ত মসজিদগুলো খুলে দেয়া হয়েছে, যাতে করে খুব কাছ থেকে ইসলামের সৌন্দর্য অনুভব করতে পারে। অমুসলিম নারীরা স্বাধীনভাবে দিনে-রাতে কাতারের রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। ফলে মুসলিমদের ব্যাপারে পশ্চিমা বিশ্বের জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ সহ সকল অপবাদ ও মিথ্যা প্রচারণার মূলোৎপাটন ঘটেছে। ফলে শতশত অমুসলিম ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এ সম্পর্কে ‘দৈনিক নয়াদিগন্ত’ পত্রিকা লিখেছে,

এক হিসেবে কাতারকে সৌভাগ্যবান রাষ্ট্র বললেই চলে। কেননা, ফিফা বিশ্বকাপের ৯২ বছরের ইতিহাসে এবারই প্রথম আরব-মুসলিম দেশ হিসেবে দেশটি বিশ্বকাপের আয়োজন করতে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়; এটি সর্বকালের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ও শীতকালে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ফুটবল বিশ্বকাপ। স্বাভাবিকভাবেই এই আসরকে উপলক্ষ্য করে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে নানা ধর্মের-বর্ণের দর্শক ও ভক্তরা আগমন করেন। আর সেই সুযোগটিই কাজে লাগাচ্ছে কাতার। দেশটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে- বিশ্বকাপ চলাকালে আগত অতিথিদের সামনে ইসলামের শিক্ষা ও পরিচিতি তুলে ধরতে কাজ করবে তারা। গত বৃহস্পতিবার আলজাজিরা জানায়, ইসলাম প্রচারের পুরো প্রকল্পটি দেখভাল করবে কাতারের আওকাফ ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়। এ উপলক্ষে দেশটি একটি বিশেষ প্যাভিলিয়ন চালু করেছে। আলজাজিরার ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, প্যাভিলিয়নে বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত ইসলাম ও আরব সংস্কৃতির পরিচিতিমূলক বই বিতরণ করা হবে। দর্শকদের সাথে তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলার জন্য থাকবেন সেই ভাষার দাঈ বা ইসলাম প্রচারক। বিশেষত উপসাগরীয় দেশ কাতারের ইতিহাস-ঐতিহ্য তুলে ধরা হবে দর্শনার্থীদের কাছে। এতে ভার্চুয়াল রিয়ালিটি বা ভিআর প্রযুক্তির সাহায্যে দেখানো হবে পবিত্র কাবাঘর, হাজরে আসওয়াদসহ মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ইসলামি স্থাপনা। এরই মধ্যে বিশ্বকাপের আয়োজন ঘিরে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত কাতার। এ উপলক্ষে নতুনভাবে সেজেছে দেশটি। আরব ও ইসলামি স্থাপত্যশৈলীকে ধারণ করে প্রস্তুত করা হয়েছে দৃষ্টিনন্দন ৮টি স্টেডিয়াম। রাজধানী দোহাসহ বিভিন্ন স্থানে সাঁটানো হয়েছে মহানবি সাঃ-এর হাদিস সম্বলিত ম্যুরাল। সামাজিক শিষ্টাচার নিয়ে মহানবি (সাঃ) এর প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণীগুলো লেখা হয়েছে আরবি ও ইংরেজি ভাষায়। অর্থপূর্ণ হাদিসগুলো চলার পথে দর্শক ও পাঠকদের মনে তৈরি করবে ভিন্নরকম অনুভূতি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এসব ছবি ব্যাপক প্রশংসিত হচ্ছে। কাতারের অভিনব এই আয়োজনের প্রশংসা করেছেন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব মুসলিম স্কলার্সের মহাসচিব ড. আলী আল-কারাহ দাগি। তিনি বলেছেন, ‘কাতার বিশ্বকাপ ঘিরে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ইসলামের সুমহান বার্তা ছড়িয়ে দিতে অভিনব উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।’^{৩৯}

সুতরাং কাতারের ন্যায় মুসলিম দেশগুলো যদি একমাত্র ইসলাম প্রচার ও ইসলামের বিধি-বিধান পালনের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করে তাহলে এটিকে অবৈধ বলার কোনো যৌক্তিকতা নেই। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

তুমি তোমরা রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহবান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রবই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াত প্রাপ্তদের তিনি খুব ভাল করেই জানেন।^{৪০}

এর পাশাপাশি আমরা এটিও জানি যে, আল্লাহ তায়ালা প্রথমেই মদকে হারাম করেননি, ধীরে ধীরে হারাম করেছেন।

সুতরাং ইসলামের সৌন্দর্য প্রচারের স্বার্থেই বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসমূহ মুসলিম দেশগুলোতে আয়োজন করা যেতে পারে। তবে এটি ছাড়া অন্যান্য কোনো উদ্দেশ্য থাকলে তা বৈধতা পাবেনা। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

বল, 'নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব'^{৪১}

উপসংহার

বর্তমানে বিশ্বে ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের সংখ্যাই বেশি। এমন কোনো মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যিনি ক্রীড়া ও বিনোদন পছন্দ করেন না। অধিকাংশ মানুষ তাঁর অবসর সময়টি খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে বা উপভোগ করে কাটাতে পছন্দ করেন। আবার কিছু মানুষ আছেন, যারা সকল ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকেই হারাম মনে করেন। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উৎসব ইসলামের সৌন্দর্য প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমনটা কাতার ফুটবল বিশ্বকাপ-২০২২-এ ঘটেছে। তবে এসব প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং প্রচলিত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে চাইলে মুসলিমদের নির্ধারিত কিছু শর্তাবলি পূরণ করা বাধ্যতামূলক। যা প্রবন্ধটিতে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলাম প্রচার ও প্রসারকে মূল উদ্দেশ্যের কেন্দ্র বিন্দুতে রেখে নতুন নতুন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করা যেতে পারে। যার ফলে অমুসলিমেরা ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে নতুন ভাবে জীবনকে সাজাতে পছন্দ করবে। তবে কোনোভাবেই যেন মূল উদ্দেশ্য ও নির্ধারিত শর্তাবলি থেকে বিচ্যুতি না ঘটে সেদিকে লক্ষ রাখা একান্ত কর্তব্য।

তথ্য নির্দেশিকা

- ১ শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সংসদ বাংলা অভিধান, পঞ্চম সংস্করণ (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০১৪), পৃ. ১৪৮
- ২ সম্পাদনা পরিষদ, বাংলা-আরবী অভিধান (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৫), পৃ. ২৮২
- ৩ মুস্তাফা পান্না, কিশোর বাংলা অভিধান (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০১৫), পৃ. ১৬৯
- ৪ বাংলা-আরবী অভিধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮২

- ৫ মুত্তাফা পান্না, *কিশোর বাংলা অভিধান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৬
- ৬ বাংলা-আরবী অভিধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪০
- ৭ Robert D Blagg, "Competition biotic interaction" *Britannica*, 2023, N.P
- ৮ শাইখ মুহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ, *মুমিনের বিনোদন*, অনুবাদ-আবদুন নুর সিরাজি (ঢাকা: মুহাম্মদ পাবলিকেশন, ২০২০), পৃ. ০৭
- ৯ আল-কুরআন, ২২: ৭৮
- ১০ শাইখ মুহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ, *মুমিনের বিনোদন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ০৮
- ১১ আল-কুরআন, ৬২: ১১
- ১২ আবু আবদুল্লাহ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী, *সহীহ বুখারী*, (ঢাকা: তাওহীদ পাবলিকেশন, ২০১২), সালাত অধ্যায়, হাদিস নং- ৪২০
- ১৩ পূর্বোক্ত, হাদিস নং ৩৩৭৩
- ১৪ ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস-সিজিস্তানী, *সুনান আবু দাউদ*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৬),
জিহাদ অধ্যায়, হাদিস নং ২৫৭০
- ১৫ *মুমিনের বিনোদন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭
- ১৬ ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুসাইরি আন-নিসাপুরি, *সহীহ মুসলিম*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১০), তাকদীর অধ্যায়, হাদিস নং ৬৫৩২
- ১৭ আবু আবদুল্লাহ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অনুবাদ-আম্মার মাহমুদ, (ঢাকা: পথিক প্রকাশন, ২০২১), ঠাট্টা-মশকারী অধ্যায়, হাদিস নং ২৬৬
- ১৮ আল-কুরআন, ৫: ১১৬
- ১৯ আল-আদাবুল মুফরাদ, পূর্বোক্ত, হাদিস নং ১২৮৮
- ২০ আল-কুরআন, ৪: ২৯
- ২১ সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, হাদিস নং ২৭৬৬
- ২২ সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, হাদিস নং ৫৫৯০
- ২৩ আল-কুরআন, ২৪: ১৯
- ২৪ সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, হাদিস নং ৫২৩৬
- ২৫ আল-কুরআন, ০৭: ২৬
- ২৬ ইমাম হাফিয মুহাম্মাদ বিন ঈসা সাওরাহ আত - তিরমিযী, *সুনান আত-তিরমিযী*, (ঢাকা: হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী, ২০১০), শিশুর দুধপান অধ্যায়, হাদিস নং ১১৭৩
- ২৭ আল-কুরআন, ২৪: ৩১
- ২৮ সুনান আত-তিরমিযী, পূর্বোক্ত, হাদিস নং ২৭৯৬
- ২৯ সহীহ মুসলিম, পূর্বোক্ত, হাদিস নং ৬৬১

- ৩০ আল-কুরআন, ৬২:০৯
৩১ আল-কুরআন, ০৬:১৪১
৩২ সহীহ বুখারী, পূর্বোক্ত, হাদিস নং ১৪৭৭
৩৩ আল-কুরআন, ৪৯:১১
৩৪ আল-কুরআন, ২৪:২১
৩৫ আল-কুরআন, ২৪:২১
৩৬ আল-কুরআন, ০৫:০২
৩৭ সুনান আত-তিরমিযী, পূর্বোক্ত, হাদিস নং ২৪৫১
৩৮ দৈনিক ইত্তেফাক, সংগ্রহ: ১৮,১১,২০২২
৩৯ দৈনিক নয়াদিগন্ত, সংগ্রহ: ১২,১১,২০২২
৪০ আল-কুরআন, ১৬:১২৫
৪১ আল-কুরআন, ০৬:১৬২

জমা প্রদানের তারিখ : ০৬.০৮.২০২৩

গৃহীত হবার তারিখ : ৩০.১০.২০২৩

জাপানের 'উকিইয়ো-এ' কাঠখোদাই চিত্রের ধারা: বিষয়বস্তু ও নান্দনিকতা

মোহাম্মদ রেজাউল সাদাত*

Abstract

Woodblock or woodcut print has become an important medium of art in contemporary time. Review of history reveals that the practice of woodblock printing medium began long time ago. Artists from different countries of the world have practiced various styles of woodcut printmaking art at different times. The Japanese ukiyo-e style of woodblock prints played a significant role in the realm of art. The ukiyo-e art style developed in Japanese art from the 17th to the 19th century AD. The traditional ukiyo-e style of woodcut prints appeared as an individual style breaking the shell of the ideals and characteristics of Western art. The ukiyo-e style of woodblock prints mainly emphasizes its technique, subject matter, aesthetics, and creativity of artists. The subject matters of this art style portray Japanese society, culture, history, nature, fauna, etc. while incorporating with it a combination of artists' aesthetic sense and oriental imagery. The present research paper attempts to analyze the content and aesthetic aspects of Japanese ukiyo-e style woodblock prints.

চাবিশব্দ: উকিইয়ো-এ, উডব্লক, ছাপচিত্র, কাৎসুশিকা হোকুসাই, কিতাগাওয়া উতামারো

ভূমিকা

ছাপচিত্র বা প্রিন্টমেকিং (Printmaking) এর যতগুলো মাধ্যমে সমকালে বিশ্বের শিল্পীরা চর্চা করছেন, তার মধ্যে কাঠখোদাই (Woodblock / Woodcut) ছাপচিত্র মাধ্যমটি বেশ পুরাতন। যদিও গুরুত্ব দিকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানা প্রয়োজনে মানুষ এই কাঠখোদাই মাধ্যমটির ব্যবহার শুরু করেছিল, তবে পরবর্তীতে কাঠখোদাই ছাপচিত্র মাধ্যমটি মূল ধারার একটি শিল্প মাধ্যম হিসেবে রূপ লাভ করে। কাঠখোদাই মাধ্যমটি ব্যবহার করে মুদ্রণ বা ছাপের প্রাচীনতম কয়েকটি নমুনার অন্যতম হল চীনের হীরকসূত্র (Diamond Sutra) (৮৬৮খ্রি.) নামক বইটি। যেটিতে চিত্রসহ লেখাও ছাপা হয়েছিল। তাছাড়া জাপান থেকে প্রাপ্ত কাঠখোদাই ছাপের প্রাচীন নিদর্শনটি হচ্ছে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর হিয়াকুমানধরণি সূত্র (Hyakumandarani sutra) (৭৭০ খ্রিষ্টাব্দ), যেটিতে বৌদ্ধের অনুচ্ছেদগুলোর লিখিত রূপ ছাপা হয়েছিল। কাঠখোদাই মাধ্যমটির প্রাচীনতম এই দুটি নমুনার বিষয়বস্তু যদি লক্ষ্য করি সেগুলোর মূল প্রেরণা ও উদ্দেশ্য প্রধানত ধর্মীয়। আর এই ধর্মীয় মতবাদগুলোকেই অনেকের মাঝে সহজে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই কাঠখোদাই মাধ্যমটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল। জাপানে কাঠখোদাই ছাপচিত্রের প্রাচীন ফর্ম বা রূপগুলো চীন দেশের কাঠখোদাই ছাপচিত্রের বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত ছাপা অনুষ্ঠানগুলোর সাথে একটি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য জাপানী সভ্যতা গড়ে উঠার পেছনে চীনের সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরোক্ষভাবে অনেকাংশেই প্রভাবিত করেছিল বলে ধারণা পাওয়া যায়। কারণ জাপানিরা চীনের বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, এমনকি সরকার ব্যবস্থাগুলোর অনুকরণ করে তাঁদের সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। জানা যায় সতের শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চীনে সামাজিক নৈরাজ্যকালের পরবর্তী সময়ে অনেক শিল্পী এবং লেখক

* সহকারী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১১০০, বাংলাদেশ

জাপানে পালিয়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবত তাঁদের সাথে রঙিন ছাপচিত্র বা প্রিন্ট শিল্পটি জাপানে নিয়ে এসেছিলেন এমনটা ধারণা করা হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে Marilyn Stokstad এবং Michael W. Cothren তাঁদের Art History গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, “they (Japanese) learned about Chinese literati painting from paintings and woodblock- printed painting manuals imported from China, and also from Chinese emigrant monks and merchants who lived in Japan.”^৫ জাপানের ঐতিহ্যবাহী কাঠখোদাই চিত্রশৈলী উকিইয়ো-এ ধারাটির বিকশিত হয়েছিল নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে। যদিও শুরুর দিকে চীনা ছাপচিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য পাশ্চাত্য কাঠখোদাই চিত্রধারা থেকেও তা স্বতন্ত্র ছিল। এর কারণ হিসেবে জাপানী কাঠখোদাই শিল্পীদের স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির প্রকাশের বিষয়টি সর্বাত্মে বিবেচনা করা যেতে পারে।

এই গবেষণাটির মূল লক্ষ্য হল প্রাচ্য দেশীয় শিল্পের আওতাভুক্ত জাপানের ‘উকিইয়ো-এ’ (Ukiyo-e) ধারার কাঠখোদাই চিত্রের বিষয়বস্তু ও নান্দনিক দিকগুলো তুলে ধরা। যার মধ্য দিয়ে উক্ত শিল্প ধারার শিল্পী ও তাঁদের শিল্পচিন্তা, ইতিহাস, শৈলীর গতি-প্রকৃতি, বিষয়বস্তুর মর্টিফ, প্রেক্ষাপট, করণ-কৌশলগত দিক প্রভৃতি বিষয়ের বিশ্লেষণধর্মী উপস্থাপন করা।

‘কাঠখোদাই ছাপচিত্র’ (Woodcut printmaking) মাধ্যমটি বর্তমান বাংলাদেশের চারুকলার অঙ্গনে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প মাধ্যম। যুগ যুগ ধরে বিশ্বশিল্পকলার ইতিহাসে নানাভাবে নানা প্রয়োজনে কাঠখোদাই শিল্পটির চর্চা হয়েছে এবং হচ্ছে। বাংলাদেশের শিল্পীরাও এই মাধ্যমটিতে ব্যাপকভাবে চর্চা করছেন তবে সেই অনুযায়ী উন্নয়ণ ততটা লক্ষ্য করা যায় না। এক্ষেত্রে শিল্পীদের বিশ্বশিল্প সম্পর্কে তাত্ত্বিক জ্ঞানের অভাব একটি কারণ হতে পারে বলে ধারণা করতে পারি। শিল্পকলা সম্পর্কে বিশদ আকারে জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্য দেশ ও অঞ্চলের শিল্পকলা সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা ও বুঝা দরকার বলে মনে হয়। সুতরাং জাপানের ‘উকিইয়ো-এ’ কাঠখোদাই চিত্রের ধারা : বিষয়বস্তু ও নান্দনিকতা শীর্ষক গবেষণার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বর্তমান গবেষণাকর্মটি গুণগত পদ্ধতি (qualitative method) অনুসরণ করা হয়েছে। সুতরাং প্রবন্ধটি বিশ্লেষণ ও বর্ণনামূলক। প্রবন্ধটিতে ব্যবহৃত প্রাথমিক ও দ্বৈতায়িক উৎস, তথ্য, এবং উপাদান হিসাবে বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, ক্যাটালগ, প্রামাণিক ওয়েবসাইট, আর্ট মিউজিয়ামের শিল্পকলা সম্পর্কিত ক্যাটালগে ছাপানো জাপানের ঐতিহ্যবাহী উকিইয়ো-এ ধারার শিল্পীদের কাঠখোদাই চিত্র। পাশাপাশি প্রবন্ধটি বিশ্লেষণের জন্য বিশ্বশিল্পকলার ইতিহাস, জাপানের কাঠখোদাই ছাপাই ছবি, প্রাচ্য শিল্প, ছাপচিত্র বিষয়ক বিভিন্ন পণ্ডিতদের লেখা গ্রন্থ, বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ, শিল্পকলা সম্পর্কিত ক্যাটালগ-সমূহ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাদানের সহায়তা নেয়া হয়েছে।

উকিইয়ো-এ (ukiyo-e) কাঠখোদাই চিত্র ধারার পরিচিতি

খ্রিস্টীয় সতের শতক থেকে জাপানে বিভিন্ন চিত্রশিল্পীরা ঐতিহ্যবাহী কানো এবং তোসা* পেইন্টিং স্কুলের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় এবং গৎবাঁধা বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ও বাস্তবসম্মত বিষয়বস্তুর পক্ষে প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ উকিইয়ো-এ (Ukiyo-e) ধারার সূত্রপাত হয়েছিল। সতের শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে উকিইয়ো-এ ধারাটি উচ্চতায় উঠা শুরু করে তবে, এ ধারাটির উৎকর্ষকাল আঠার এবং উনিশ শতকে ঘটেছিল এবং এটি এদো (বর্তমানে টোকিও) শহরে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করেছিল। সে সময় চিত্রিত ছাপাই ছবিগুলোকেই উকিইয়ো-এ (Ukiyo-e) বলা

হত। উকিইয়ো-এ শব্দটি জাপানী। উকিইয়ো-এ নামটি বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত মতবাদ। যার আক্ষরিক অর্থ ভাসমান বা ক্ষণস্থায়ী বিশ্বের চিত্র (Picture of the Floating world)। 'ক্ষণস্থায়ী বিশ্বের চিত্র' এই দর্শন বা চিন্তাটি হলো জাপানীরা তাঁদের ক্ষণস্থায়ী জীবনের জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্যগুলো বিশেষ করে আনন্দগুলোকে ছবির মাধ্যমে স্মরণীয় করে রাখা অর্থে। ইওয়াসা মাতাবেই (১৫৭৭-১৬৫০) উকিইয়ো-এ স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বলে জানা যায় ১২ উকিইয়ো-এ স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে জাপানের চিত্রকলার বিষয়বস্তুতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল। বিশেষকরে পূর্বের মধ্যযুগীয় অভিজাতদের কেন্দ্র করে যে চিত্রচর্চার প্রচলন ছিল তার থেকে বেরিয়ে এসে শিল্পীরা সমসাময়িক দৃশ্য ও চরিত্রগুলোকে চিত্রের বিষয়বস্তু হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছেন।

উকিইয়ো-এ (টশরুড়-ব) ধারায় দুই প্রকারের ছবি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যার একটি হাতে আঁকা চিত্র এবং অন্যগুলো কাঠের ব্লক থেকে ছাপা চিত্র। যে নকশা বা চিত্র খোদাইকৃত কাঠের ব্লক থেকে কাগজের উপর মুদ্রিত হয় তাকে উডব্লক প্রিন্ট, উডকাট বা কাঠখোদাই চিত্র বলা হয়ে থাকে। ১৬৬০ সালের দিকে, হিশিকাওয়া মোরোনোবু (Hishikawa Moronobu) (১৬২৫-১৬৯৪) প্রথম ক্ষণস্থায়ী বিশ্বের চিত্র (Picture of the Floating world) সৃষ্টির জন্য কাঠখোদাই মাধ্যমটি ব্যবহার করার ধারণা পেয়েছিলেন বলে জানা যায় ১৩ যেটি পরবর্তীতে জনপ্রিয় একটি শিল্পে পরিণত হয়। মোরোনোবুর বেশিরভাগ কাঠখোদাই চিত্রগুলো বিভিন্ন গ্রন্থে ও এ্যালবামে সংকলিত হয়েছে, যার বেশিরভাগ আদিরসাত্মক। মোরোনোবু ছাড়াও উকিইয়ো-এ (ukiyo-e) ধারায় বহু উল্লেখযোগ্য শিল্পীরা কাঠখোদাই মাধ্যমটির চর্চা করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, সুজুকি হারুনোবু (১৭২৫-১৭৭০), কিতাগাওয়া উতামারো (১৭৫৩-১৮০৬), তো সাই শারাকু (সক্রিয় ১৭৯৪-১৭৯৫), কাসুকাওয়া গুনশো (১৭২৬- ১৭৯২), কাৎসুশিকা হোকুসাই (১৭৬০-১৮৪৯), কুনিসাদা (১৭৮৬-১৮৬৫), উতাগাওয়া হিরোশিগে (১৭৯৭- ১৮৫৮) প্রমুখ। জাপানী কাঠখোদাই চিত্রের কৌশলটি শুরুর দিকে ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর ছাপানোর জন্যই ব্যবহৃত হতো। প্রাচীনকালে এশিয়া জুড়ে যে ধর্মচর্চার সংস্কৃতি ছিল তার একটি প্রভাব কাঠখোদাই ছাপাই চিত্রেও পড়েছিল। পরবর্তীতে কাঠখোদাই পদ্ধতিটির ব্যবহার করে নানা বৈচিত্র্যময় বিষয়ের চিত্র তৎকালীন উকিইয়ো-এ ধারার শিল্পীরা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের সৃষ্টি করা কাঠখোদাই চিত্রগুলোর বিষয়বস্তুতে তৎকালীন জাপানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানান দিক তুলে ধরার পাশাপাশি প্রকৃতির সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছিল, যা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের অন্যান্য অঞ্চলের শিল্পধারাগুলো থেকে একেবারেই স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ পেয়েছে। তবে প্রাচ্য শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলোই উকিইয়ো-এ ধারার কাঠখোদাই চিত্র শৈলীতে বেশি বিদ্যমান। উকিইয়ো-এ ধারার কাঠখোদাই ছাপাই ছবিগুলো মূলত গৃহস্থচিত্র, ছবির এ্যালবাম হিসেবে প্রকাশিত হতো। তবে স্বতন্ত্র বা একক ছবি আকারেও অনেক কাঠখোদাই চিত্র সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথম দিকের জাপানী কাঠখোদাই ছাপাই চিত্রগুলো সাদা-কালো (ব্ল্যাক-ও-বাই) রঙের ছিল। পরবর্তীতে সাদা-কালো রঙের প্রিন্টগুলোতে হাতের মাধ্যমে তুলি দিয়ে লাল, কমলা, সবুজাভ হলুদ, গোলাপি লাল প্রভৃতি রং করা হত। শিল্পী কিয়োনবু (১৬৬৪-১৭২৯) কাঠখোদাই প্রিন্টে প্রথম হাতের মাধ্যমে রং যুক্ত করেছে বলে মনে করা হয়। ১৪ জাপানে রঙিন প্রিন্ট এর শুরুর বছর সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না তবে ১৭৬৪ সালের দিকে সুজুকি হারুনোবু সম্পূর্ণ রঙিন প্রিন্টের বিকাশে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে জানা যায়। উকিইয়ো-ই রঙীন প্রিন্ট ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির শিল্পীদের সহযোগিতার মধ্যদিয়ে তৈরী হয়েছিল। সেটা হল চিত্রশিল্পী, খোদাইশিল্পী, মুদ্রণশিল্পী। চিত্রশিল্পী প্রথমে ড্রয়িং করেন এবং চিত্রটির কোন অংশে কি রং প্রয়োগ

করা হবে সেটা খোদাই ও মুদ্রণশিল্পীকে শিখিয়ে দেন। তার পরবর্তীতে খোদাইশিল্পী কাঠ খোদাইয়ের মাধ্যমে ব্লক তৈরি করেন, আর মুদ্রণশিল্পী প্রকৃত রং দিয়ে সেই ব্লকগুলো থেকে প্রিন্ট সৃষ্টি করেন।^{১৬} জাপানী কাঠখোদাই প্রিন্টগুলোকে সাধারণত আকার ও আকৃতি"

অনুযায়ী বিভিন্ন নামে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। যেমন- 'ওবান,আইগান, চুবান, হোসোবান, কোবান, হাশিরাবন, চু-তানজাকু, হাশিরা -এ প্রভৃতি।

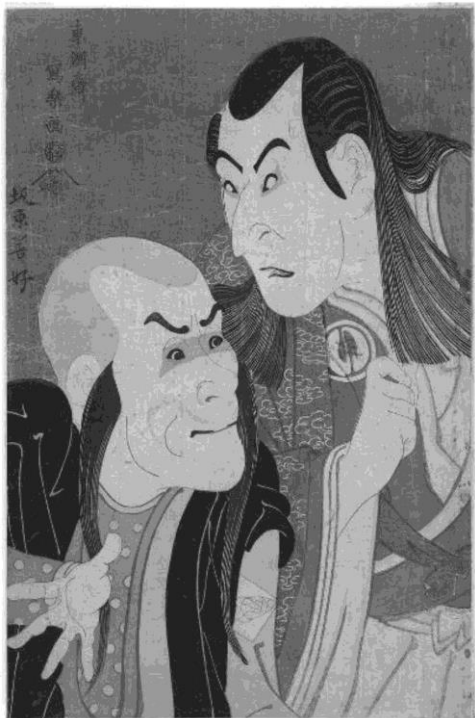
উকিইয়ো-এ চিত্রের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা

উকিইয়ো-এ রীতির চিত্রকরদের আঁকা ছবির বিষয়গুলো ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। শিল্পীদের প্রিয় বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল

সুন্দরী নারী, প্রেমের দৃশ্য, মানুষের দৈনন্দিন জীবন, গার্হস্থ্য জীবন, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি, দর্শনীয় স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি, ফুল, পাখি, মাছ, পোকা-মাকড়, নর্তকী, সুন্দরী গণিকা, গেইশা (জাপানের এক শ্রেণির বাইজি সম্প্রদায়), আদিরসাত্মক (শোঙ্গা) চিত্র, কাবুকি থিয়েটারের দৃশ্য, উল্লেখযোগ্য কাবুকি অভিনেতা, সামুরাই যোদ্ধা, সুমো কুস্তিগীর, নানা ধরনের লোকজ উৎসব প্রভৃতি। এসব বিষয়বস্তুর পুরোপুরি জাপানের সমাজ জীবন ও সংস্কৃতি থেকে নেওয়া। উকিইয়ো-এ রীতির শিল্পীরা আনন্দময় ও জাঁকজমকপূর্ণ মুহূর্তগুলোর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে রূপায়ণ করেছেন। কাঠখোদাই ছাপাই ছবিই ছিল তাঁদের প্রধান অনুষঙ্গ। সতের শতকের শেষের দিকে জাপানীদের উপর থিয়েটারের ব্যাপক প্রভাব ছিল। কাবুকি ১৮ অনেক জনপ্রিয় একটি বিনোদনের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। যার ফলে কাবুকি থিয়েটার উকিইয়ো-এ শিল্পীদের জন্য বিষয়বস্তুর প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে পরিনত হয়েছিল। সেসময় কাবুকি নাটকের বিজ্ঞাপন বা পোস্টারগুলো কাঠখোদাই মাধ্যমে সচিত্র ভাবে নির্মিত হত। এ প্রসঙ্গে সাতোকো শিমাজাকি তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন:

kabuki theaters had poster-size advertisements known as "street playbills" (tsuji banzuke) printed at the start of each season that contained not only lists of the actors and their roles in upcoming productions but also pictorial representations of anticipated highlights. These large, woodblock-printed sheets were posted in places where people tended to gather and linger, such as bathhouses, barber shops, and street corners. If you had money to spare, you may also have bought your own copy of a playbill from a street vendor passing through your neighborhood."

উকিইয়ো-এ রীতির শিল্পীরা কাবুকি থিয়েটারের পালাগুলোর জনপ্রিয় অভিনেতাদের চরিত্র, তাদের চুলের স্টাইল, পোশাকের নকশা থেকে শুরু করে দৈনিক অঙ্গ ভঙ্গির অভিব্যক্তি ও প্রতিকৃতি তাঁদের কাঠখোদাই ছাপাই চিত্রে তুলে ধরেছেন। লক্ষণীয় বিষয় হল শিল্পীরা কাবুকি অভিনেতাদের হুবহু বাস্তবধর্মী ভাবে আঁকেননি। চিত্রের সৌন্দর্যের প্রতি চিত্রশিল্পীদের এক ধরনের নিজস্ব আদর্শ বা ধারণা ছিল।^{১৭}



চিত্র-১

Toshusai Sharaku, Sawamura Yodogoro II and Bando Zenji as Kawatsura Hogen and Onisadobo in the Play "Koinyobo Somewake Tazuna", 1794, Woodblock print, 35.6cm x 22.9cm.



চিত্র-২

Torii Kiazonobu I, Kabuki Actor, Edo period, Woodblock print.

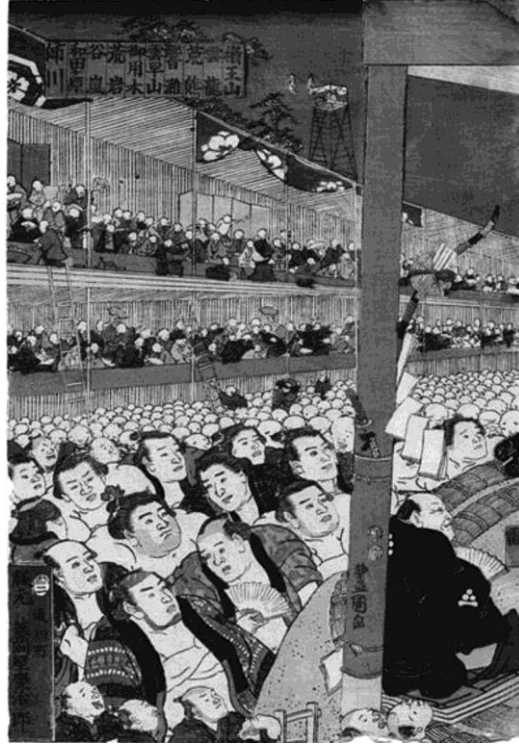
উদাহরণ স্বরূপ উকিইয়ো-এ রীতির উল্লেখযোগ্য শিল্পী শারাকুর (সক্রিয় ১৭৯৪-১৭৯৫ খ্রি.) প্রসঙ্গ এখানে তুলে ধরা যায়। তিনি প্রচুর কাবুকি অভিনেতার প্রতিকৃতি কাঠখোদাই মাধ্যমটিতে করেছেন। তাঁর এইসব কাঠখোদাই চিত্রগুলো তিনি এমনভাবে এঁকেছেন, যার সাথে বাস্তব চেহারার কোন মিল নেই। যেমন শারাকুর Sawamura Yodogoro II and Bandō Zenji as Kawatsura Hogen and Onisadobo in the Play "Koinyobo Somewake Tazuna", (১৭৯৪) নামক কাঠখোদাই চিত্রটি। (চিত্র-১) কাবুকি অভিনেতাদের চিত্রগুলোতে প্রাচ্যশিল্পের কল্পনাপ্রসূত বিষয়টি লক্ষণীয়। পাশাপাশি চিত্রের অভিনেতাদের চেহারাগুলোতে নানা রকম ভঙ্গি ও অভিব্যক্তির প্রকাশও রয়েছে। এছাড়াও চিত্রে মানব দেহগুলোতে অতিরঞ্জিত ভাব (Exaggerated expression), রেখার প্রাধান্য, পোশাকে মাত্রারিক্ত অলঙ্করণ (excessive ornamentation), এই বিষয়গুলো এসেছে। এই লক্ষণগুলো প্রাচ্যধারার চিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলোর আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। চীন ও জাপানের চিত্রে রেখার সাহায্যে কোন একটি আকৃতির বর্হিগঠন সৃষ্টির কারণ হিসেবে সৈয়দ আলী

আহসান তাঁর গ্রন্থে প্রাচীনকাল থেকে চীন জাপানে রেখার সাহায্যে হস্তলিখন বা ক্যালিগ্রাফি (Calligraphy) শিল্পের প্রভাব যে ছিল সেটিকে দেখিয়েছেন, ‘জাপানী এবং চীনা চিত্রকর্ম মূলত রেখাঙ্কনের একটি ধ্বনি-সায়ুজ্য। রেখার আচড়টি শিল্পকর্মের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একেই ইংরেজীতে বলে লিনিয়ার রিথম (Linear rhythm)। রেখার সাহায্যে তাঁরা একটি আকৃতির বর্হিগঠন যে-ভাবে নির্মাণ করেন পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পীরা তা কখনও করেন না।’^{২১} সুতরাং জাপানী হস্তলিখন বা ক্যালিগ্রাফি (Calligraphy) শিল্পের মতো উকিইয়ো-এ রীতির কাঠখোদাই চিত্রে যে রেখার ব্যবহার দেখতে পাই তার একটা সম্পর্ক রয়েছে বলে ধারণা করা যায়।



চিত্র-৩

Katsushika Hokusai, The Sumo Wrestlers Takanezuma Yoichiemon and Sendagawa Kichigoro, 1793, woodblock print.



চিত্র-৪

Utagawa Kunisada, Sumo Spectators, 1853, woodblock print.

শিল্পী শারাকু ছাড়াও উকিইয়ো-এ রীতির বেশিরভাগ শিল্পীই কাবুকি অভিনেতাদের নিয়ে কাঠখোদাই ছাপাই ছবি সৃষ্টি করেছেন। যেমন উদাহরণ হিসেবে শিল্পী কাৎসুকাওয়া শুনশোর The Actor Sakata Hangoro II and the Actor Matsumoto Koshiro IV, নামক কাঠখোদাই চিত্র

ও শিল্পী কিয়োনবুর Kabuki Actor (চিত্র-২) নামক কাঠখোদাই চিত্র দুটির কথা বলা যেতে পারে।

জাপানের ঐতিহ্যবাহী কুস্তি (সুমো) খেলাকে উপজীব্য করে উকিইয়ো-এ রীতির অনেক শিল্পীরা তাঁদের কাঠখোদাই চিত্র সৃষ্টি করেছেন। জাপানিদের কাছে সুমো কুস্তি খেলা শুধুমাত্র শক্তির কৃতিত্ব নয় বরং এটি তরুণদের অধ্যাত্মিকতা ও শারীরিক বিকাশের সাথে সম্পর্কিত বলে ধরা হয়। ২২ কুস্তি খেলায় যে সমস্ত উপকরণগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে বিস্তৃত্তার প্রতীক হিসেবেও দেখা হয়। কুস্তি খেলার উপর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাঠখোদাই চিত্র হল হোকুসাইয়ের Wrestlers Takaneyama Yoichiemon and Sendagawa Kichigoro, (১৭৯৩) (চিত্র-৩), উতাগাওয়া কুনিসাদার Sumo Spectators, (১৮৫৩) (চিত্র - ৮)।



চিত্র-৫

Hishikawa Moronobu
Five
Women, Ukiæo
woodblock print
21.9 cm x 29.2 cm.

উকিইয়ো-এ ধারায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে জাপানী বিভিন্ন শ্রেণির নারীদের চিত্র রূপায়ণ করেছেন। এসব কাঠখোদাই চিত্রে নারীদের দৈনন্দিন জীবন, গার্হস্থ্য জীবন, সাজ সজ্জার বিষয়গুলোর মধ্যে যেমন, মাতৃত্ব, নারীর কোমল রূপের সৌন্দর্য ইত্যাদি ছাড়াও জাপানের দেশীয় নিজস্ব সংস্কৃতির রূপ পাওয়া যায়। জেনরোক রাজবংশের সময় (১৬৮৮-১৭০৩খ্রি.) উকিইয়ো-এ রীতির প্রথম একজন উল্লেখযোগ্য শিল্পী হিশিকাওয়া মোরোনবু। উকিইয়ো-এ রীতির রঙ্গীন চিত্রকলা এবং প্রাচীন ছাপচিত্র দুটি মাধ্যমেরই বিকাশের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিল। তাঁর কাঠখোদাই চিত্রের বিষয়বস্তুতেও সুন্দরী নারী, জাপানের ঐতিহ্যবাহী ফুল দেখার উৎসব, নানা রীতিনীতি, আদিরসাত্মক বিষয়গুলো প্রধান্য পেয়েছে। ২৩ মোরোনবু কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাঠখোদাই চিত্র হল, Five Woman, (চিত্র-৫) Leaf from One Hundred Japanese Women। উকিইয়ো-এ (ukiæo-e) ধারার আরেকজন উল্লেখযোগ্য শিল্পী কিতাগাওয়া উতামারো (১৭৫৪-১৮০৬খ্রি.)। তাঁর প্রিন্টগুলোতেও জাপানী নারী চিত্ররূপ প্রবল আকারে এসেছে। তিনি জাপানী নারীদের প্রতিকৃতি, আবক্ষ দেহাংশ, গার্হস্থ্য জীবন প্রভৃতি উপজীব্য করে কাঠখোদাই চিত্র সৃষ্টি করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাঠখোদাই চিত্র হল, Seven Women Applying Make-

up Using a Mirror , (চিত্র-৬) A Young Girl Offering Tea to Another Woman , (চিত্র-৭)। উতামারোর এই চিত্রগুলোতে রূপের বৈশিষ্ট্য যা সুন্দর সেটাকেই চিত্রে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। যার ফলে তাঁর ছবিগুলোর পটভূমিতে খুব একটা মনোযোগ দিতে দেখা যায় না। নারীদের চিত্রগুলোতে প্রাচ্যশিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য অর্ধউন্মিলিত চোখ এর ব্যবহার লক্ষণীয়।



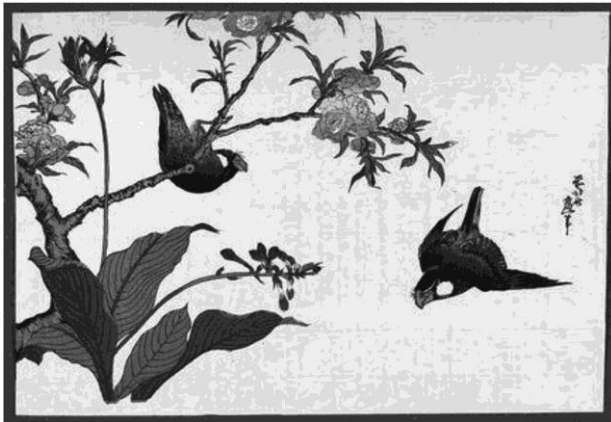
চিত্র-৬
কিতাগাওয়া উতামারো, Seven Women Applying Make-up Using a Mirror ১৭৯২-৯৩, কাঠখোদাই প্রিন্ট (নিশিকি-এ); কাগজে কালি এবং রং, ৩৭.৪ x ২৪.৭ সেমি।



চিত্র-৭
Kitagawa Utamaro, A Young Girl Offering Tea to Another Woman, 1792-1802 Color woodblock print; oban, 37.5 x 24.9 cm (1413/16913/16 in.)

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে জাপানের উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় জায়গাগুলোর উপর চিত্রিত ছাপাই ছবির ব্যাপক চাহিদা বেড়েছিল। উকিইয়ো-ই (Ukiyo-e) শিল্প ধারায় ভূদৃশ্য (Landscape) ও ঐতিহাসিক স্থানের ছাপাই ছবি সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দুজন শিল্পী হলেন কাৎসুশিকা হোকুসাই এবং উতাগাওয়া হিরোশিগে। হোকুসাই ঐতিহাসিক স্থানের ছাপাই ছবিরগুলো শুরুর পূর্বে কাবুকি মঞ্চ নাটক সম্পর্কিত প্রিন্ট ডিজাইন করতেন। তিনি বেশ দীর্ঘ একটা সময় জুড়ে ছাপচিত্র, গ্রন্থচিত্র, স্কেচ, পেইন্টিং ইত্যাদি বিষয়ে চর্চা করেছেন। হোকুসাই-এর উল্লেখযোগ্য কাঠখোদাই চিত্রের মধ্যে রয়েছে, লাইফ এ্যালাং দ্যা তোকাইদো রোড (১৮০২-১৮১০ খ্রি.)। এছাড়া সিরিজ স্কেচ বই হোকুসাই মান্সা (১৮১৪- ১৮৭৮ খ্রি.), পনের খণ্ডে সমাপ্ত, উল্লেখযোগ্য। ফুজি পর্বতের চিত্রগুলো বিশেষকরে সিরিজচিত্র থার্ডটি সিরিজ ভিউজ অফ মাউন্ট ফুজি (১৮২৯-১৮৩৩ খ্রি.) এবং হান্ড্রেড ভিউজ অফ মাউন্ট ফুজি গ্রন্থচিত্রগুলো (১৮৩৪-১৮৩৫ খ্রি.)। ২৪ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি

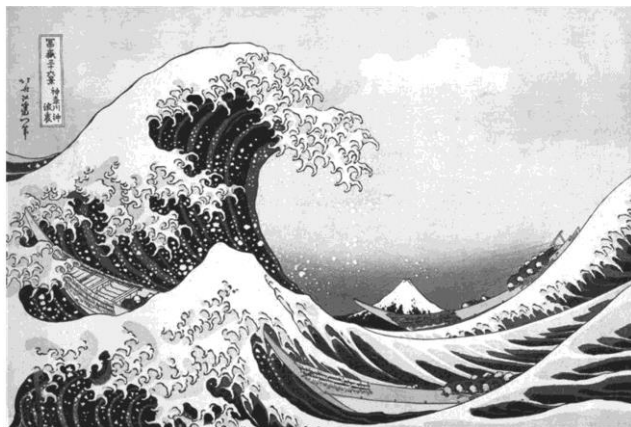
ছাড়াও হোকুসাই বৈচিত্র্যময় বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করেছেন, যেমন, মানুষের দৈনন্দিন জীবন, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি, ফুল ও পাখি, পোকা-মাকড় প্রভৃতি। (চিত্র-৮)



চিত্র-৮

Katsushika Hokusai,
Two Birds and Cherry
Tree, From
the series of 'Flowers
and Birds',
woodblock print.

উতাগাওয়া হিরোশিগে উল্লেখযোগ্য সিরিজ কাঠখোদাই চিত্রের মধ্যে রয়েছে দ্যা এনো হান্ড্রেড ভিউজ (চিত্র-১০), দ্যা ফুজি থার্ডটি সিক্স ভিউজ (১৮৫৮খ্রি.), এইট ভিউজ অফ লেক ওমি (১৮৩০ এর দশক) প্রভৃতি। হিরোশিগের এই সকল চিত্রে জাপানের প্রকৃতিতে ঋতুর বৈচিত্র্য রূপ, নদ-নদী, সমুদ্র, বন, পাহাড় ইত্যাদির মধ্যে এক প্রকার কাব্যিক দৃশ্যায়ন প্রকাশ পেয়েছে। যেখানে বাস্তবতার সাথে সৃজনশীলতা সংযোগ রয়েছে।

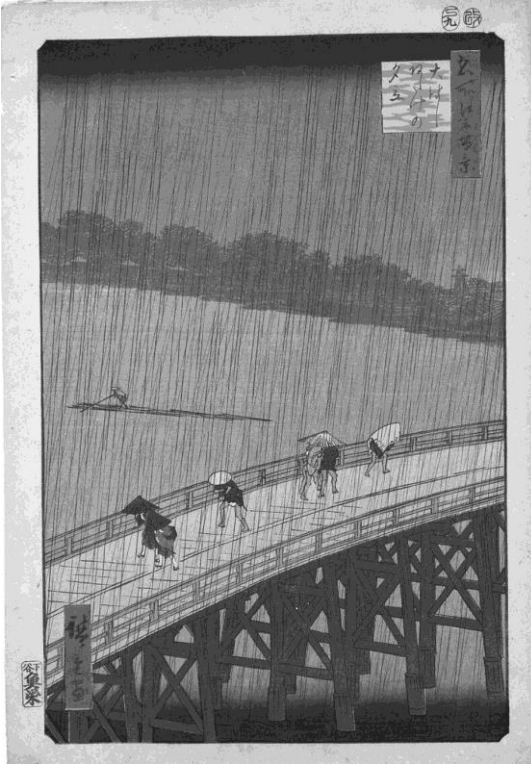


চিত্র-৯

Katsushika Hokusai, The
Great Wave off
Kanagawa from the
series Thirty-six Views
of Mount Fuji,
Woodblock print, c.
1829-1832.

হোকুসাই এবং হিরোশিগের কাঠখোদাই চিত্রে সৌন্দর্যের নিজস্ব আদর্শের পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতার বিষয়টিও দেখতে পাওয়া যায়। থার্ডটি সিক্স ভিউজ অফ মাউন্ট ফুজি শিরোনামে সিরিজ ছবিগুলোতে ফুজি পর্বতের বিশালত্বকে তিনি অনেকটা শক্তির প্রতীক হিসেবে দেখিয়েছেন। উক্ত সিরিজের প্রতিটি চিত্রে প্রকৃতিতে থাকা নানান বিষয়বস্তুর সাথে ফুজি পর্বতের একটা আধ্যাত্মিক

সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। বিশেষ করে হোকুসাই-এর থার্ডটি সিক্স ভিউজ অফ মাউন্ট ফুজি সিরিজ ছবি থেকে দ্যা গ্রেট ওয়েভ শিরোনামে চিত্রে (চিত্র-৯) দেখা যায় সমুদ্রে সুনামির মত উঁচু ঢেউগুলোকে অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয়েছে। এই উঁচু ঢেউগুলো আনেকটা ড্রাগনের পায়ের নখের মত চরিত্র ধারণ করেছে। এর মধ্যে ফুজি পর্বতের বিশালত্বকে আসন্ন বিপর্যয়ের মুহূর্তে আনেকটা আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতীক বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে জাপানের বিশিষ্ট লেখক Noritake Tsuda তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ‘হোকুসাইয়ের মাউন্ট ফুজি চিত্রে পাহাড়ের শৃঙ্গ, ঢেউয়ের চূড়া স্বর্গের দিকে টানছে বলে প্রতীয়মান হয়।’ ২৬ তাছাড়াও হোকুসাই উক্ত সিরিজের অন্য চিত্রগুলোতেও কর্মরত মানুষজন, বৌদ্ধধর্মীয় মন্দির, নদ-নদী, প্রকৃতি, পশুপাখি প্রভৃতির সাথে ফুজি পর্বতের একটা যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। উনিশ শতকের শেষের দিকে হোকুসাইয়ের ছাপচিত্র সমূহ পশ্চিমা বিশ্বে জনপ্রিয় হয়ে উঠে, এবং এই ধারাকে পশ্চিমা বিশ্বে Japonis সব বা Japonism নামে অভিহিত করতেন। ২৭



চিত্র-১০

উতাগাওয়া হিরোশিগে, সিরিজ দ্যা
এদো হান্ডেড ভিউজ এর সাডেন
সাওয়ার, কাঠখোদাই চিত্র

জাপানের সংস্কৃতিতে অনেক আগে থেকেই আধ্যাত্মিক চিন্তা ও বিশ্বাসের প্রচলন ছিল। জাপানে বৌদ্ধধর্ম চর্চা শুরু পূর্বে ‘শিন্টো’ (Shinto) নামক আধ্যাত্মিক একটি বিশ্বাসের চর্চা শুরু হয়েছিল। ‘শিন্টো’ শব্দের অর্থ ‘ঈশ্বরের পথ’। তাছাড়া বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহ্য হিসেবে খ্রিস্টীয় ১২ শতকে জাপানে ‘জেন’ (তবহ) বিশ্বাসের চর্চা শুরু হয়েছিল। খ্রিস্টীয় ১৪ থেকে ১৬ শতকে জাপানের

সংস্কৃতিতে 'জেন' এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। জেন মন্দিরগুলো ধর্মীয় ও ধর্ম নিরপেক্ষ সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বিশেষ করে জেন নীতি ও আদর্শ অনুসারে জেন মন্দিরের বাগানের নকশা, শিক্ষাকেন্দ্র, অস্ত্রোপক্ৰিয়া পরিচালনার কাজ সুসম্পন্ন হোত। এমনকি জাপানে চা খাওয়ার রীতিতেও এর প্রভাব পড়েছিল। জেন আদর্শ অনুসারীরা এবং জেন সন্ন্যাসীরা শিল্পকর্মও সৃষ্টি করেন। এসব শিল্পকর্মের বিষয় ও অভিব্যক্তি জেন আদর্শকেই ঈঙ্গিত করেছিল। ৩০ সূতরাং জেন বৌদ্ধ ঐতিহ্যের যে ধারণা ও আদর্শের অনুশীলন তারই কিছু প্রভাব উকিইয়ো-এ ধারার শিল্পীদের শিল্পচর্চায় পড়েছিল বলে ধারণা করা যায়।

উকিইয়ো-ই (Ukiæo-e) শিল্প ধারার শিল্পীদের জনপ্রিয় একটি বিষয় ছিল আদিরসাত্মক (Erotic) চিত্রগুলো। যেগুলো শোঙ্গা (Shunga) চিত্র নামে পরিচিত। শোঙ্গা শব্দটির আক্ষরিক অর্থ বসন্তের চিত্র (picture of spring)। বসন্ত শব্দটি প্রায়ই যৌনতা বোঝাতে ব্যবহৃত হত। ১ উকিইয়ো-ই ধারার বহু সংখ্যক শিল্পীরা শোঙ্গা বা আদিরসাত্মক (Erotic) চিত্ররূপটি নিয়েও প্রচুর সংখ্যক কাঠখোদাই ছাপাই মাধ্যমে চিত্র নির্মাণ করেছিলেন, এবং সেই সাথে শোঙ্গা অ্যালবাম ও চিত্র তৈরি করেছিলেন। যাদের মধ্যে রয়েছেন কিতাগাওয়া উতামারো, সুজুকি হারুনোবু, আন্দো হিরোশিগে, কাৎসুশিকা হোকুসাই, কেইসাই আইজেন প্রমুখ শিল্পীরা।

পাশ্চাত্যের শিল্পের আদর্শ যেমন প্রকৃতিতে থাকা বিষয়বস্তুর আদর্শ আকৃতি বা গঠনে নির্ধারিত হয়। সে তুলনায় জাপানী উকিইয়ো-ই প্রিন্টগুলোতে আদর্শ হিসেবে চিত্রে অনুভূতির বিষয়টির প্রাধান্য পেয়েছে। তাছাড়া উকিইয়ো-এ (Ukiæo-e) প্রিন্টগুলোতে শিল্পীরা কোন কিছুর যেমন, মানব দেহ, প্রতিকৃতি, পশু, পাখি, ফুল, পাহাড়, নদী প্রভৃতির আকৃতির বাইরের গঠন সৃষ্টি করতে রেখার ব্যবহার করেছেন। পাশ্চাত্য শিল্পশৈলীর সাথে জাপানের ঐতিহ্যবাহী উকিইয়ো-এ শিল্প শৈলীর প্রধানত আঙ্গিকগত ও করণ-কৌশলগত পার্থক্য রয়েছে। জাপানের শিল্পীরা প্রকৃতির হুবহু আনুকরণ না করে, বরং নিজের মনের বা কল্পনা মিশ্রিত চিত্রকল্প থেকে কাজ করেছেন। এটাই তাঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ উকিইয়ো-এ (ukiæo-e) কাঠখোদাই প্রিন্টগুলোতে দেখা যায় প্রকৃতি, মানুষজন, পশুপাখি প্রভৃতি চিত্র বাস্তবধর্মী ভাবে অঙ্কন করলেও পাশ্চাত্য শিল্পের মত অতটা নিয়মতান্ত্রিক শিল্প ব্যাকরণ মধ্যে না যেয়ে চিত্রে সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতার দিকটিতেই বেশি জোর দিয়েছেন বলা যায়। তাছাড়া করণ-কৌশলের দিকটিতে যদি লক্ষ্য করি, উকিইয়ো-এ কাঠখোদাই ছাপাই ছবিগুলো প্রিন্ট নেয়ার ক্ষেত্রে জলরং পদ্ধতি (water base) ব্যবহার করেছেন যা, পাশ্চাত্য তেলরং পদ্ধতির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রাচ্যধারার চিত্র পদ্ধতির সাথে 'জলরং' এর একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এই প্রসঙ্গে ড. আব্দুস সাত্তার তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: 'প্রাচ্যধারার চিত্রকর্মে ওয়াশ পদ্ধতি রঙের মাধুর্য সৃষ্টি করে এবং রহস্যময় অনুভূতি আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ৩২ জাপানের উকিইয়ো-এ কাঠখোদাই প্রিন্টগুলোতেও জলরং ব্যবহারের ফলে একটা শান্ত ও মাধুর্য ভাব চিত্রে পাওয়া যায়। পাশাপাশি চিত্রে মানব দেহ, মুখমণ্ডল, হাত ও পা প্রভৃতি অঙ্কনে গোলাকার এবং ডিম্ব আকৃতির ভাব রয়েছে। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসান বলেন: 'চীনা বা জাপানী শিল্পে যে কোনো বস্তুর গঠন নির্মাণের ক্ষেত্রে মৌলিক আকৃতি হিসেবে বৃত্ত এবং ডিম্বকেই আমরা পাই। একটি শরীরের যাকে বলে বোন স্ট্রাকচার বা কাঠামো, শিল্পীরা সেদিকে কখনও লক্ষ্য দেন নি। উকিইয়ো-ই রঙিন প্রিন্টগুলো সৃষ্টির পদ্ধতিতে শিল্পীরা এক প্রকার বারেন এর সাহায্যে হাতে ঘষে ছাপাই ছবি তৈরি করতেন। যার ফলে রঙীন ছবিগুলোতে বিভিন্ন অংশে নানা রকমের সূক্ষ্ম টেকচার ও উজ্জ্বলতা তৈরি করত।

উনিশ শতকের শেষের দিকে পাশ্চাত্যের বহু শিল্পী যেমন ভিনসেন্ট ভ্যান গগ থেকে শুরু করে পিকাসো, পল গগ্যু, এদগার দেগা, মেরি কাসাট, তুলস লোত্রেক প্রমুখরা উকিইয়ো-ই ধারার ছাপচিত্রগুলোর শৈলীর গঠন ও বিষয়বস্তু দ্বারা ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ই.এইচ. গমব্রিখ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, “The Impressionists found in their adventurous quest for new motifs and colour schemes was the Japanese colour- print. ৩৪

উনিশ শতকের প্রথমভাগকে সচরাচর উকিয়ো-এ (ukiyo-e) শৈলীর পতনের শুরু হিসাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। শিল্পী কাৎসুশিকা হোকুসাই ও শিল্পী আন্দো হিরোশিগে যারা উকিয়ো-এ (ukiyo-e) শৈলীতে শেষ দিকে উল্লেখযোগ্য কাঠখোদাই চিত্র নির্মাণ করেন। এটি বলা হয়ে থাকে ১৮৬৪ সালে জাপানে মেইজি রাজবংশের যুগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরে কাঠখোদাই (Woodblock) - এর ঐতিহ্য কমতে শুরু করে। তবে কেউ কেউ মেইজি যুগের শেষ দিকে এবং তাইশো (Taisho) রাজবংশের যুগের শুরুর সময়কে ঐতিহ্যবাহী কাঠখোদাই শিল্প সর্বোচ্চ শিখরে প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জন করেছিল বলে মনে করেন। বহিঃবিশ্বের সাথে জাপানের যোগাযোগ বৃদ্ধি, যেমন পাশ্চাত্য থেকে আধুনিক রঙ জাপানে প্রবেশ, তাছাড়া ছাপচিত্রের নতুন নতুন পদ্ধতির ও রূপের প্রবর্তনের ফলে ঐতিহ্যবাহী কাঠখোদাই তাঁর প্রাণবন্ততা হারাতে শুরু করে। ৩৫

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, শিল্প ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে মানব জাতির ইতিহাস। শিল্প ও সংস্কৃতি যুগ যুগ ধরে মানব সভ্যতা বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় নানা সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মধ্য দিয়ে উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু শিল্পধারার বিকাশ ঘটেছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, জাপানের উকিইয়ো-এ শিল্প ধারাটি। যা পৃথিবীর ছাপাই ছবির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। উকিইয়ো-এ ধারাটির কাঠখোদাই চিত্র অনেকটাই প্রাচ্য শিল্পের বৈশিষ্ট্য ও গঠনের উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হলেও, শিল্পীদের করণ-কৌশলগত দক্ষতা, নিজস্ব আদর্শ ও সৌন্দর্য, বিষয়বস্তুর নির্বাচন প্রভৃতি গুণের জন্য বিশ্বশিল্পকলায় জায়গা করে নিয়েছে। বিশ শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে বাংলাদেশে আধুনিক চারুকলা চর্চা শুরু হয়েছে। বলা যায় তখন থেকেই এদেশে কাঠখোদাই ছাপাই ছবির চর্চা শুরু। বর্তমানে বাংলাদেশের শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই শিল্প মাধ্যমটির ব্যাপক চর্চা হচ্ছে। তবে শুরু থেকেই প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাশ্চাত্য ধাঁচের কাঠখোদাই চিত্রচর্চা করানো হয়। আশা করা যায়, বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধটির মাধ্যমে বাংলাদেশের শিল্প শিক্ষার্থী, পাঠকদের জাপানের উকিইয়ো-এ ধারার কাঠখোদাই চিত্র সম্পর্কে জানতে ও সঠিক ধারণা পেতে সাহায্য করবে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

1. Lucy Mueller White, Printmaking as Therapy frameworks for freedom (London: Jessica Kingsley Publishers Ltd, 2002), pp. 32-33
2. Nara Printing Industry Association, <http://www.nara-inko.or.jp/history/>, Accessed on 7th August 2022

৩. Elaine Evans Dee and Thomas Michie, Sue Kim (Trans.), Japanese Woodblock Prints in the Collection of the Cooper-Hewitt Museum" (New York: Smithsonian Institution, 1979), p. 4
৪. Rebecca Satter, Japanese Woodblock Printing, (Honolulu: University of Hawaii Press, 2008), p.9
৫. Marilyn Stokstad and Michael W. Cothren Art History (London: Lauraence king publishing ltd., 2011, vol. 2, 4th ed.), p. 825
৬. 'তোসা' হল জাপানের প্রাচীন একটি চিত্রশৈলী। তোসা স্কুলটি খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফুজিওয়ানা নো সুনোতাক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যার ফলে তিনি তোসা সুনোতাক নামেও পরিচিতি লাভ করেন। এটি জাপানের মেইজি পুনঃ প্রতিষ্ঠা বা ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত ইম্পেরিয়াল ঘরানার ইয়ামাতো-এ চিত্রকলার নেতৃত্বানীয়া স্কুলে পরিণত হয়েছিল। উক্ত তোসা স্কুলটির গুরুদের সাধারণত 'তোসা' উপাধি দেয়া হত।

Penelope Mason, History of Japanese art, (new jersey: Pearson Education, inc, 2nd ed., 2005), p. 171
৭. Carl Zigrosser, The Book of Fine Prints, (New York: American Book – Stratford Press, Inc., 1958), p. 217
৮. Elaine Evans Dee and Thomas Michie, Sue Kim (Trans.), op. cit., p. 5
৯. Ian Chilvers (ed.), The Concise Oxford Dictionary of Art and Artists (New York: Oxford University Press, 1990), p. 478
১০. রশীদ আমিন, “ছাপচিত্র”, লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত, চারু ও কারু কলা, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), পৃ. ১৫০
১১. Rebecca Satter, op. cit., p.10
১২. Marcus B.Huish, Japan and Its Art, (London: The Fine Art Society, 1912, 3rd ed.), p.191
১৩. Carl Zigrosser, op. cit., p.217
১৪. Ibid, p. 220
১৫. Elaine Evans Dee and Thomas Michie, Sue Kim (Trans.), op. cit., p. 5
১৬. Noritake Tsuda, hand book of Japanese art,(Tokyo: Charles E. Tuttle Company, 1976), pp.234-35
১৭. Elaine Evans Dee and Thomas Michie, Sue Kim (Trans.), op. cit., (GE)
১৮. “কাবুকি”(Kabuki) হল জাপানের ধ্রুপদী নাটকের একটি রূপ বা শৈলী। কাবুকির পালাগুলো সাধারণত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কাবুকি নাটকের নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার, অভিনয় শিল্পীদের সাজ-পোশাক, সংগীত, ভাষা, উচ্চারণ ভঙ্গি প্রভৃতি। 'জাপানে সতের শতকের erro agit que go Yasuji Toita, Don Kenny (Trans.), KABUKI the Popular Theater, (New York: Walker and Company, 1970), p.104

১৯. Satoko Shimazaki, Edo kabuki in transition: from the worlds of the samurai to the vengeful female ghost/Satoko Shimazaki. (New York: Columbia University Press, 2016), p.2
২০. Noritake Tsuda, op. cit., p. 230
২১. সৈয়দ আলী আহসান, শিল্পবোধ ও শিল্প চৈতন্য, (ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০১৯, তৃতীয় সং.), পৃ. ১৭০
২২. Elaine Evans Dee and Thomas Michie, Sue Kim (Trans.), op. cit., p. 33
২৩. Noritake Tsuda, op. cit., p. 232
২৪. Andreas Marks, Japanese woodblock prints: artists, publishers, and masterworks, 1680-1900, (Tokyo: Tuttle Publishing, 2010), p. 90
২৫. Mita arts Catalogue: The Japanese print specialists, no- 35, (Tokyo: Mita Arts Gallery), pp.33-40
২৬. Noritake Tsuda, op. cit., p. 238
২৭. Marilyn Stokstad and Michael W. Cothren, Art History, (London: Lauraence king publishing ltd., 2011, volume two, 4th ed.), p. 828
২৮. Fred S. Kleiner, Gardner's Art through the Ages: A Global History, (Wadsworth: Cengage Learning, 2008, Enhanced 13th Ed.), p. 211
২৯. Ibid, p. 736
৩০. Ibid, pp. 736-737
৩১. <https://www.thehistoryofart.org/hokusai/shunga>, Accessed on 31st January 2023
৩২. ড. আব্দুস সাত্তার, পশ্চিমা শিল্পের আগ্রাসন ও পূর্ব-পশ্চিম দ্বন্দ্ব, (ঢাকা: আজমাইন পাবলিকেশন্স, ২০১৫), পৃ. ২৬
৩৩. সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬
৩৪. E.H.Gombrich, The Story of Art, (London: Phaidon Press, 2006, pocket ed.), p. 403 35. Rebecca Satter, op.cit, p. 12

গরার এর স্বরূপ ও আর্থিক লেনদেনের ওপর এর প্রভাব: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মো: আব্দুর রউফ*

Abstract

The theory of financial transactions in Islam is an integrated theory. Just as the Shariah clarified permissible financial transactions, it also clarified prohibited financial transactions. Shariah also mentioned the reasons for prohibition in prohibited financial transactions. Garar (غرر) is one of the reasons for the invalidity of financial transactions, the transaction is cancelled by its presence in it. Garar is something whose consequence is unknown and Garar transaction is a transaction that involves ignorance. I have dealt with research on the topic of Garar under the title: "Nature of Garar and its impact on financial transactions: a theoretical analysis". The aim of writing this article was to reveal the correct concept of Garar, and to establish the clear rule of Garar that invalidates financial transactions, so that those who know it can know the types of transactions that are forbidden due to Garar in all its forms. In this article, the definition and reality of Garar have been revealed, and the texts narrated in the Qur'an and Sunnah about Garar and its related matters have been mentioned, and the difference between effective Garar and ineffective Garar have been showed. Then I mentioned the categories of Garar, as I mentioned some of the Garar sales (بيع الغرر) that are forbidden, with a presentation of their details with examples and with an description of their rulings. In writing this article, I followed the library based method, the descriptive method, and the Analytical method. Through writing this article, I have reached many results that I mentioned in the appropriate place, the most prominent of which is: that Garar invalidates the transaction according to the conditions, and not all Garar invalidates the transaction. Among what I recommend in light of this article is that research should be done into contemporary financial transactions related to e-commerce and related to banks and financial institutions.

চাবিশব্দ: গরার, বাইতানি ফি বাইআহ, অজ্ঞতা, লেনদেন, জাহালাহ, বাইউল গরার, হাবালুল হাবালাহ

ভূমিকা

মহান আল্লাহ অন্যান্য সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করতে নিষেধ করেছেন। অন্যায় ও বাতিল পন্থায় সম্পদ ভোগের অর্থ হলো শারীআহ কর্তৃক নিষিদ্ধ ও হারামকৃত পন্থায় যেমন: সুদ, জুয়া, মাপে কম দেওয়া, জুলুম, চুরি, আত্মসাৎ, জবর দখল, প্রতারণা, হক মেরে দেওয়া, গণিকা ও গণক বৃত্তির মাধ্যমে উপার্জন, মদ ও গুকের বিক্রয় লব্ধ অর্থ গরার ইত্যাদি পন্থায় সম্পদ ভোগ করা। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে শারীআহর নীতি হলো- লেনদেনকারী উভয় পক্ষের ইচ্ছা-স্বাধীনতা অবাধ থাকা। তারা যে কোনো লেনদেন অবাধে করতে সক্ষম। তবে যেসব লেনদেন ও শর্ত থেকে শারীআহ নিষেধ করেছে সেটা করার স্বাধীনতা লেনদেনকারীর নেই। ইসলামি শারীআহ যেসব লেনদেন থেকে নিষেধ করেছে সেগুলোর অন্যতম হলো “বাইউল গরার”। গরার সংবলিত আর্থিক লেনদেনের নিষিদ্ধতা আল্লাহর হকের (অধিকারের) অন্তর্ভুক্ত। তাই কারো পক্ষে সেটাকে রহিত

* এমফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

করা বা উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। এমনকি লেনদেনকারী যদি খুশিমনে গরার মেনে নিয়ে লেনদেন করতে চায়, তবুও তা গ্রহণ যোগ্য হবে না। পাশাপাশি গরার হারাম করার সাথে বান্দার হকও জড়িত; কারণ বান্দার সম্পদকে নষ্ট হওয়া থেকে সংরক্ষণ করার জন্য আল্লাহ গরারকে হারাম করেছেন। গরার এমন মাসআলা-মাসাইল ও শরঈ বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত যে গুলো নিয়ে ইসলামের আইন ব্যাখ্যাকারী সম্প্রদায় তথা ফকীহগণ চুল-চেরা বিশ্লেষণ করেছেন। তার প্রকৃতি, স্বরূপ উদঘাটন ও বিভিন্ন আকদ তথা চুক্তিতে বিশেষ করে আর্থিক লেনদেনে তার প্রভাব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তারা ইসলামের কর্মগত বিধি-বিধান তথা ফিকহের বিভিন্ন অধ্যায়ে পূঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। আর্থিক লেনদেন মানব জীবনের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। এর মাধ্যমে মানুষ জীবন, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিশ্ব ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে থাকে। তবে স্বচ্ছ ও পবিত্র আর্থিক লেনদেনই কেবল পারে টেকসই উন্নয়ন অর্জন করতে। যাতে পবিত্রতা, স্বচ্ছতা ও বৈধতার আলোকে আর্থিক লেনদেন পরিচালিত হয়, সেজন্য যেসব বিষয় আর্থিক লেনদেনকে কলুষিত করে, অর্থ ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক গতিতে চলতে বাধাগ্রস্ত করে সেসব বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করে সে বিষয়ে যথাযথ বিশ্লেষণমূলক গবেষণা করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সচেতন করা সময়ের দাবী যেমন একদিক থেকে, অন্যদিক থেকে একজন মুসলিমকে পরকালীন জীবনকে সুখময় করার জন্য অবৈধ আর্থিক লেনদেন বর্জন করে চলতে হবে। যেহেতু গরার আর্থিক লেনদেনকে কলুষিত করে অর্থ ব্যবস্থায় সমস্যা তৈরি করে তাই বক্ষমান প্রবন্ধে গরার নিয়ে একটি স্বচ্ছ ধারণা তৈরির প্রয়াস চালান হয়েছে।

গবেষণার পদ্ধতি ও গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য:

যেহেতু গরার ইসলামি আইনে ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর সময় থেকে আলোচিত একটি বিষয় এবং এটি ইসলামের মৌলিক উৎস কুরআন-সুন্নাহ ও দ্বৈতীয় উৎস ইসলামি আইন বিশারদদের মূল্যবান আইনের কিতাবে আলোচিত হয়েছে সেহেতু গরার সম্পর্কে গবেষণাটি মূলত লাইব্রেরী পদ্ধতির (Library Method) উপর ভিত্তি করে পরিচালিত। তবে যেহেতু অত্র গবেষণা কর্মে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিস্তারিত বর্ণনা ও বিচার বিশ্লেষণের দাবী রাখে তাই পাশাপাশি বর্ণনামূলক (Descriptive Method) ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি (Analytical Method) অনুসরণ করা হয়েছে।

অত্র গবেষণার প্রধান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে গরার এর স্বরূপ ও প্রভাব উন্মোচন করে এ বিষয়ে একটি স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করা এবং আর্থিক লেনদেনকে বাতিলকারী গরার সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতিমালা বর্ণনা করা; যাতে করে এ সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তি গরার নিষিদ্ধ আর্থিক লেনদেনের বিভিন্ন রূপকে সহজে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়।

গরার এর পরিচিতি ও স্বরূপ:

আরবী ভাষায় গরার (غرر) শব্দের শাব্দিক অর্থ: খতার (خطر) তথা মৃত্যু বা ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হওয়া এবং নষ্ট হওয়ার আশংকা করা। বলা হয়: غرر بنفسه وماله: عرضها للهلكة। সে নিজেকে এবং তার সম্পদকে ধ্বংসে উপনীত করল। অতএব গরার (غرر) এর শাব্দিক অর্থ নিজেকে অথবা অর্থ-সম্পদকে ধ্বংসের সম্মুখীন করা।^১

ফকীহগণ غرر এর যে পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করেছেন তা শাস্ত্রিক অর্থ কেন্দ্রিক, যদিও এক্ষেত্রে তাদের উপস্থাপনা ও বর্ণনা ভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন।

হানাফী মাযহাবের নিকট গরার:

ইমাম সারাখসী বলেন: “গরার হলো পরিনাম আচ্ছাদিত বা লুকায়িত বিষয়।”^{২৬} **ইমাম কাসানী বলেন:** “গরার হলো এমন ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেন যেখানে প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি বরাবর অর্থাৎ সন্দেহপূর্ণ পর্যায়ের।”^{২৭} **বাবরতী বলেন:** “গরার হলো এমন জিনিস যার তথ্য আপনার থেকে গোপন করা হয়েছে।”^{২৮} **ইবনু আবেদীন বলেন:** “গরার হলো ক্রয়কৃত পণ্য প্রাপ্তিতে বিদ্যমান সন্দেহ।”^{২৯}

মালেকী মাযহাবের নিকট গরার:

ইমাম মালেক বলেন: “গরার হলো কোনো ব্যক্তির দাস পলায়ন করল অথবা প্রাণী হারিয়ে গেল, যেটার দাম ৫০ দিনার, তখন কেউ বলল: আমি ২০ দিনারে তা আপনার থেকে ক্রয় করলাম। যদি ক্রেতা তা পেয়ে যায় তাহলে বিক্রেতার ৩০ দিনার ক্ষতি হলো। আর যদি ক্রেতা তা না পায়, তাহলে তার ২০ দিনার ক্ষতি হলো।

তিনি বলেন: এখানে আরো একটি দোষ আছে, যদি জিনিসটি পাওয়া যায় তবুও প্রশ্ন থাকে, সেটাতে কোনো ঘাটতি বা বৃদ্ধি হলো কি না অথবা সেখানে কোনো দোষ-ত্রুটি সৃষ্টি হলো কি না? তাই এটা অনেক বড় ঝুঁকি।”^{৩০} **ইমাম মালেক আরো বলেন:** “আমাদের নিকট গরার ও ঝুঁকি হলো দাসী অথবা মাদী পশুর গর্ভের বাচ্চা ক্রয় করা; কারণ জানার উপায় নাই যে, তা আদৌ ভূমিষ্ট হবে না কি না। ভূমিষ্ট হলে তা সুন্দর হবে নাকি অসুন্দর, পূর্ণাঙ্গ হবে নাকি অপূর্ণাঙ্গ, ছেলে নাকি মেয়ে, তা জানা-বোঝা যায় না। আর এসব ক্ষেত্রে দামের তারতাম্য ঘটে। এরকম হলে এত দাম, ঐ রকম হলে অত দাম।”^{৩১} সুতরাং ইমাম মালেকের নিকট গরার (غرر) হলো এমন জিনিস যার প্রাপ্তি অজানা অথবা যার বৈশিষ্ট্য অজানা। **করাফী বলেন:** “গরার মূলত এমন জিনিস যার সম্পর্কে জানা যায় না যে, তা অর্জিত হবে নাকি না। যেমন: আকাশে উড়ন্ত পাখি, পানিতে অবস্থিত মাছ।”^{৩২} **আদ-দাসুকী বলেন:** “গরার(غرر) হলো এমন দুটি বিষয়ের মাঝে দ্বিধা যার একটি উদ্দেশ্য অনুপাতে এবং অন্যটি উদ্দেশ্যের বিপরীত।”^{৩৩}

শাফেঈ মাযহাবের নিকট গরার

শিরাজী বলেন: “গরার (غرر) হলো এমন বস্তু যার বিষয়টা লুক্কায়িত থাকে এবং যার পরিণাম সুপ্ত থাকে।”^{৩৪} **আর-রমানী বলেন:** “গরার এমন বস্তুকে বলে যা এমন দুটি বিষয়ের সম্ভাবনা রাখে যে দুটির বেশি ঝুঁকি পূর্ণতা অধিক সম্ভাব্য।”^{৩৫}

হাম্বলী মাযহাবের নিকট গরার

ইবনু তাইমিয়া বলেন: “গরার হলো পরিনাম অজ্ঞাত বস্তু।”^{৩৬} **ইবনুল কায়্যিম বলেন:** “গরার বলা হয় এমন জিনিসকে যা অর্জন হওয়া-না হওয়ার মাঝে দ্বিধাপূর্ণ থাকে। তিনি আরো বলেন: “গরার হলো এমন জিনিস যার পরিচয় লুক্কায়িত থাকে এবং যার প্রকৃতি অজ্ঞাত থাকে।”^{৩৭}

উপরের সংজ্ঞাগুলোর আলোকে আমরা বলতে পারি, গরার হলো এমন বস্তু যা অর্জিত হবে কিনা তা জানা যায় না এবং যা অপরিচিত ও অজ্ঞাত। যেমন, কেউ শিকারীকে বলল, আজকে আপনার

জালে বা ফাঁদে যত পশু-পাখি ধরা পড়বে অথবা আপনি আজকে যত পশু-পাখি শিকার করবেন, সেটা আমি ক্রয়-করলাম এত টাকার বিনিময়ে অথবা শিকারী বলল, আমি বিক্রয় করলাম এত টাকার বিনিময়ে। অথচ কেউ জানে না যে, আজ শিকার পাওয়া যাবে কি না, বিষয়টি সংশয়পূর্ণ ও অজ্ঞাত। অনুরূপ কোনো ডুবুরী যা কিছু সমুদ্র থেকে বের করবে সেটা বের করার আগেই ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হওয়া। এগুলো সব গরারপূর্ণ লেনদেন।

কুরআন-সুন্নাহ গরার এর বিধান:

প্রথমত: গরার বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য:

পবিত্র কুরআনে গরারের বিধান বা তার বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েলের বিষয়ে খাস নস বা বিশেষ বক্তব্য আসেনি। তবে পবিত্র কুরআনে মূলনীতি আকারে আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে এমন নস বা বক্তব্য এসেছে যা নিষিদ্ধ গরার ও তৎসংশ্লিষ্ট ফকীহদের বর্ণনাকৃত সকল হুকুমকে শামিল করে। আর সেই নস বা বক্তব্যটি হলো “বাতিল পছায় সম্পদ ভক্ষণ হারাম”। বাতিল পছায় সম্পদ ভক্ষণ থেকে নিষেধাজ্ঞা এসেছে সূরা বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে। মহান আল্লাহ বলেন: “তোমরা তোমাদের সম্পদকে বাতিল পছায় ভক্ষণ করোনা।”^{১৪}

মুফসিসরগণ বাতিল পছায় সম্পদ ভক্ষণের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতামত ও স্বরূপ উল্লেখ করলেও সকলে একমত যে, নিষিদ্ধ গরার বাতিল পছায় অন্তর্ভুক্ত।^{১৫}

ইবনে রজব হাম্বলী বাতিল পছায় সম্পদ ভক্ষণের বিভিন্ন ধরণ ও স্বরূপ উল্লেখ করতে গিয়ে সেখানে গরারকেও উল্লেখ করেছেন।^{১৬}

সুতরাং কুরআনে সরাসরি গরারের কথা না থাকলেও সে বিষয়ে কুরআনে পরোক্ষভাবে বক্তব্য রয়েছে।

দ্বিতীয়ত: গরার বিষয়ে সুন্নাহর নস (বক্তব্য):

১. ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রসূল (সা.) বাইউল গরার (গরার সম্বলিত ক্রয়-বিক্রয়) থেকে নিষেধ করেছেন।^{১৭}

২. আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (সা.) বাইউল গরার ও বাইউল হাছাত (কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়) থেকে নিষেধ করেছেন।^{১৮}

৩. আলী (রা.) বলেন: অচিরেই মানুষের উপর দাত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকার সময় আসবে। স্বচ্ছল ব্যক্তি তার হাতের সম্পদ দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে, অথচ তাকে এটার আদেশ দেওয়া হয়নি। মহান আল্লাহ বলেন: “তোমরা তোমাদের নিজেদের মধ্যে অনুগ্রহ ভুলে যেও না।”^{১৯} নিরুপায় হয়ে লোকেরা ক্রয়-বিক্রয় করবে অথচ নবী (সা.) নিরুপায়ের বিক্রয় হতে, বাইয়ে গরার থেকে এবং ফল উপযুক্ত হওয়ার আগে বিক্রয় করা হতে নিষেধ করেছেন।^{২০}

৪. ইমরান বিন হুসাইন বলেন, নবী (সা.) দোহনের পূর্বে পশুর বাটে থাকা দুধ বিক্রয় থেকে, চতুষ্পদ জন্তুর পেটে অবস্থিত জ্রন বিক্রয় থেকে, পানিতে অবস্থিত মাছ বিক্রয় থেকে, মাদামিন (গর্ভের বাচ্চা) ও মালাকিহ (পশুর পিঠস্থ বীর্য) বিক্রয় থেকে, হাবালুল হাবালাহ থেকে এবং বাইউল গরার থেকে নিষেধ করেছেন।^{২১}

৫. আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা পানির মধ্যে অবস্থিত মাছ ক্রয় করো না; কেননা তা গরার।^{২২}

গরার এর প্রকারভেদ:

গরার প্রধানত দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: লেনদেনের সীমাহতে বা শব্দে গরার: অর্থাৎ লেনদেনটা এমনভাবে সংঘটিত হয়েছে যে, তার শব্দের মাঝে গরার সৃষ্টি হয়েছে। এখানে লেনদেনকৃত পণ্যের মাঝে গরার নাই। যে শব্দ ব্যবহার করে লেনদেন করা হয়েছে তার মধ্যে গরার। যেমন কোনো বিক্রেতা ক্রেতাকে বলল, অমুক লোক যদি তোমার কাছে বিশ লক্ষ টাকায় ফ্ল্যাট বিক্রি করে তাহলে আমি তোমার কাছে ফ্ল্যাট বিশ লক্ষ টাকায় বিক্রি করলাম। এই ক্রয়-বিক্রয়টি বাইয়ে গরার; কেননা এটার পরিণাম লুক্কায়িত, অজ্ঞাত; কেননা ক্রেতা-বিক্রেতা কেউ জানে না যে, বাইটি সম্পন্ন হবে নাকি না? কেননা লেনদেনটিতে অর্জন হতে পারে এমন সম্ভাব্য বিষয়ের উপায় বুলন্ত রাখা হয়েছে।^{২৩}

এ প্রকারের কতিপয় উদাহরণ—

ক. বাইআতানে ফী বাইআহ (এক বিক্রয়ের মাঝে দুই বিক্রয়) এর অর্থ হলো: এমনভাবে আকদ হওয়া যে, এক বিক্রয়ের মাঝে দুই বিক্রয় উপস্থিত হয়। এ পদ্ধতিতে পণ্য একটি হতে পারে যেমন আমি আপনার কাছে এই গাড়িটি নগদে ১০ লক্ষ আর বাকিতে ১৫ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করলাম, আবার পণ্য দুটি হতে পারে, যেমন (আমি আপনার নিকট আমার বাড়িটি ২০ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করলাম এই শর্তে যে অমুক আমার কাছে তার গাড়িটি ১০ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করবে।) এ প্রকার লেনদেন হতে রসূল (সা.) নিষেধ করেছেন। আমার তার পিতা থেকে, তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা.) এক বিক্রয়ের মধ্যে দুই বিক্রয় থেকে, বিক্রয় ও কর্ষ থেকে, যে পণ্য (নষ্ট হলে) ক্ষতি পূরণ তার বিক্রেতার উপর বর্তায় না সে পণ্যের লাভ গহণ থেকে এবং যে পণ্য বিক্রেতার নিকটে নাই সেটা বিক্রয় করা হতে নিষেধ করেছেন।^{২৪}

একের মাঝে দুই বিক্রয় হতে বারণ করার ইল্লাত বা কারণ হলো গরার (পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞতা); কারণ যে তার বাড়ি বিক্রয় করে এই শর্তে যে, অমুক তার গাড়ি তার কাছে বিক্রয় করবে, সে জানে না এবং ক্রেতাও জানে না যে বিক্রয়টি সম্পন্ন হবে নাকি না; কারণ প্রথম বিক্রয় সম্পন্ন হওয়াটা দ্বিতীয় বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার উপর নির্ভরশীল। অনুরূপ যে ব্যক্তি একটি পণ্য নগদে ২০ লক্ষ আর বাকিতে ১৫ লক্ষ টাকা দিয়ে বিক্রয় করে, সে জানে না দুটির মাঝে কোনটি সম্পন্ন হবে। তাই উভয় অবস্থার মাঝে গরার বিদ্যমান, তথা বিক্রয় হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে গরার, অথবা নির্দিষ্ট করে কোন বিক্রয়টি হবে সেক্ষেত্রে গরার। আর এখানে এটা পরিষ্কার যে, গরার লেনদেনের শব্দের মাঝে বিদ্যমান, পণ্যের মাঝে নয়।^{২৫}

খ. বাইউল হাছাত (কংকর এর মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয়) এটার পদ্ধতি হলো: বিক্রেতা ক্রেতাকে বলবে: যখন আমি আপনার দিকে কংকর নিষ্ক্ষেপ করব তখনই আমার ও আপনার মাঝে বিক্রয় আবশ্যক হয়ে পড়বে।

এ ধরনের বিক্রয় থেকে শারীআতে নিষেধ এসেছে। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন: নবী (সা.) “বাইউল হাছাত ও বাইউল গরার থেকে নিষেধ করেছেন।”^{২৬}

হানাহী মায়হাবের ফকীহগণ বলেন: এ পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয়কে নিষেধের ইলুত বা কারণ দুটি:

১. অজ্ঞতা: কারণ পণ্য অনির্দিষ্ট।

২. মালিকানা হস্তান্তরকে অজ্ঞতার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।^{২৭}

গ. আল আকদুল মুআল্লাক (বুলন্ত লেনদেন)। এটার পদ্ধতি হলো: বিক্রেতা বলল: অমুক ব্যক্তি আমার কাছে তার বাড়ি বিক্রি করবে এ শর্তে আমি আপনার কাছে আমার বাড়ি ২০ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করলাম।

অধিকাংশ আলেমের নিকট, এ জাতীয় লেনদেন নিষিদ্ধ। কারণ তাদের নিকট ক্রয়-বিক্রয়কে বুলন্ত রাখা বৈধ নয়। তাছাড়া এ পদ্ধতিতে গরার আছে এবং এখানে লেনদেনকারীর সম্ভ্রুতি নিশ্চিত জানা যায় না। তবে ইবনে তাইমিয়া ক্রয়-বিক্রয় বুলন্ত রাখাকে বৈধ মনে করেন। তার মতে এখানে কোনো গরার নেই।^{২৮}

ঘ. আল আকদুল মুদাফ (কোনো কিছু সাথে সম্বন্ধকৃত লেনদেন) এটার পদ্ধতি হলো: বিক্রেতা ক্রেতাকে বলবে, আমি এত টাকায় আমার বাড়ি আপনার কাছে আগামী মাসের এক তারিখ থেকে বিক্রয় করলাম। তখন ক্রেতা বলবে, আমি ক্রয় করলাম। এ লেনদেনটিও অধিকাংশ আলেমের নিকট অশুদ্ধ; কারণ ক্রয়-বিক্রয়কে কোনো সময়ের সাথে সম্বন্ধ করা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। অতএব যখন লেনদেনকে ভবিষ্যত কালের দিকে সম্বন্ধ করা হবে তখন তা বাতিল হয়ে যাবে।^{২৯}

দ্বিতীয় প্রকার: লেনদেনকৃত পণ্যের মাঝে গরার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ প্রকারে পণ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা থাকে। অথচ ফকীহগণ একমত যে লেনদেন বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য লেনদেনের মাহাল্ল বা স্থান তথা পণ্য সম্পর্কে জানা থাকতে হবে। যদি মাহাল্ল অজ্ঞাত থাকে তাহলে লেনদেন গরার এর কারণে বাতিল হয়ে যাবে। তবে মাহাল্ল বা পণ্য সম্পর্কে যে জ্ঞান এর মাধ্যমে অজ্ঞতা দূর হবে সেটার নির্ধারণ নিয়ে ফকীহদের মাঝে বিতর্ক আছে।^{৩০}

এ প্রকারটি কয়েক ভাবে হতে পারে:

১. পণ্য এর বৈশিষ্ট্য বা ধরণ সম্পর্কে অজ্ঞতা

অধিকাংশ ফকীহ লেনদেন বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য পণ্যের ধরণ বা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করাকে শর্ত করেছেন; কারণ ধরণ সম্পর্কে অজ্ঞতা নিষিদ্ধ গরারে উপনীত করে।

এখানে এটা বলার সুযোগ নেই যে, “দূরের জিনিসের বিক্রয় যেমন দেখার শর্তে বিশুদ্ধ হয় তেমনি এখানে বৈশিষ্ট্য বা ধরণ সম্পর্কে অজ্ঞতা থাকলেও পরে তা দেখে জানার সুযোগ আছে, বিধায় এটাও বৈধ হওয়া উচিত।” কারণ দেখার মাধ্যমে নেওয়া-না নেওয়ার স্বাধীনতা কেবল ঐ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যেখানে পণ্য অদৃশ্য এবং লেনদেন বিশুদ্ধ হওয়ার সকল শর্ত পূরণ হওয়ার মাধ্যমে হয়েছে এবং সেখানে গরার নাই। কিন্তু যেখানে ধরন বা বৈশিষ্ট্য জানা সম্ভব সেখানে সেটা বর্জন করাটা প্রয়োজন ছাড়া গরার সৃষ্টি। অতএব লেনদেন বাতিল হয়ে যাবে। তবে যদি ধরণ বা বৈশিষ্ট্য জানা অসম্ভব হয়, তাহলে লেনদেন বিশুদ্ধ হবে কিন্তু লেনদেন চূড়ান্ত হবে পণ্য দেখার পর।^{৩১}

এর উদাহরণ: ইবনুল কায়্যিম বলেন: জমীনের মধ্যে অবস্থিত অদৃশ্য পণ্য বিক্রয়, যেমন: পেঁয়াজ, রসুন, গাজর, শালগম, মুলা, গুল ইত্যাদি। এগুলো জমীন থেকে তোলায় আগেই বিক্রয় জায়েয কিনা সে বিষয়ে ফকীহদের মতভেদ আছে:

প্রথম মত: এভাবে বিক্রয় অবৈধ; কারণ এটা অজ্ঞাত, অদৃশ্য। উপরের পাতা নিচের অংশকে বোঝায় না, এটা স্থূপকৃত পণ্য থেকে ভিন্ন। এদের মতে না তোলা পর্যন্ত বিক্রয় বৈধ নয়।

দ্বিতীয় মত: এভাবে বিক্রয় জায়েয। এটা অনেক ক্ষেত্রে মালিকদের রীতি। এ মতটি হলো মদীনাবাসীদের, ইমাম আহমাদও এক মতে এমনটি বলেছেন। এটা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ারও মত।

ইবনুল কায়্যিম বলেন: এটাই সঠিক; কারণ এটা থেকে নিষেধ করলে মানুষ বড় ধরনের ক্ষতি ও কষ্টে নিপতিত হবে, পাশাপাশি এতে ফসল নষ্ট হবে যেটা শারীআহ সমর্থন করে না। কারণ একই সাথে সব গুলো ওঠানো হলে সেগুলো নষ্টের সম্মুখীন হবে।

যদি বলা হয়: যতটুকু বিক্রয় করবে ততটুকু তুলবে, তার জবাবে বলা হবে, এটা অনেক কষ্ট সাধ্য যেটা সকলেই জানে। যদি বলে: জমীনে রেখে দাও নষ্ট হোক তবুও জমীনের মধ্যে থাকা অবস্থায় বিক্রয় করো না। তাকে বলা হবে, এটা শারীআহ সমর্থন করে না।^{৩২}

২. মূল্য বা পণ্য গ্রহণের সময় সম্পর্কে অজ্ঞতা:

যে লেনদেনে মূল্য বাকিতে পরিশোধ করা হবে, অথবা পণ্য পরবর্তীতে গ্রহণ করা হবে, সে লেনদেনে মূল্য বা পণ্য গ্রহণের নির্ধারিত সময় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা শর্ত। এ বিষয়ে ফকীদের মাঝে কোনো মতভেদ নেই। সময় সম্পর্কে অজ্ঞতা নিষিদ্ধ গরারের অন্তর্ভুক্ত। এটার উদাহরণ হলঃ বাইউ হাবালিল হাবালাহ (গর্ভের বাচ্চার বাচ্চা বিক্রয়) যেটা ইবনে উমরের হাদিসে এসেছে: তিনি বলেন: নবী (সা.) হাবালুল হাবালাহ বিক্রয় হতে নিষেধ করেছেন, এটা জাহিলীযুগের লোকের বিক্রয় পদ্ধতি ছিল, তাদের কেউ এমন ভাবে উট কিনত যে, তাকে সেটা দেওয়া হবে তখন যখন বর্তমান উটনি বাচ্চা দিবে অতঃপর যে বাচ্চা হবে সেই বাচ্চা বড় হয়ে যখন বাচ্চা দিবে।^{৩৩}

যেহেতু এখানে বিক্রয়ের সময় অজ্ঞাত তাই বিক্রয় বাতিল; কারণ উট প্রসবের সময় জানা অসম্ভব। তাছাড়া প্রথম উটনি যে বাচ্চা প্রসব করবে সে মারা যেতে পারে সুতরাং এখানে সময় ঝুলন্ত থাকে। এ লেনদেনে গরার আছে যা পণ্য সোপর্দ করতে বাধা সৃষ্টি করে, ফলে ক্রেতা বিক্রেতার মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে।^{৩৪}

৩. অস্তিত্বহীন জিনিস লেনদেন করা:

লেনদেনকৃত পণ্য যদি অস্তিত্বহীন হয় তাহলে সেটা গরার এবং এই গরারের প্রভাবে লেনদেন বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং যদি বিক্রয়কৃত পণ্য লেনদেনের সময় অস্তিত্বহীন থাকে এবং ভবিষ্যতে সেটার প্রাপ্তি অজ্ঞাত থাকে, পাওয়া যেতে পারে, আবার পাওয়া নাও যেতে পারে, তাহলে সে লেনদেন বাতিল। যেমন: উটনি যে বাচ্চা দিবে তা ক্রয়-বিক্রয় করা এবং ফল গাছে ধরার আগে তা ক্রয়-বিক্রয় করা। এটা গরার; কারণ উটনি বাচ্চা দিতেও পারে, আবার নাও দিতে পারে। গাছে ফল ধরতেও পারে, আবার নাও ধরতে পারে।

এটার মতোই ঐ পণ্য যা বিক্রয়ের সময় অস্তিত্বহীন ছিল তবে ভবিষ্যতে পাওয়া সম্ভব। এ ধরনের পণ্য লেনদেনের বিষয়ে দুইটি মত পরিলক্ষিত হয়:

প্রথম মত: সর্বসাধারণ ফকীহদের মত। তাদের মতে এ ধরনের লেনদেন বাতিল ও অবৈধ।

তাদের দলীল হলো: ঐ সকল হাদিস যেখানে গরার থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং যা বিক্রেতার কাছে বিদ্যমান নাই তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়মত: অস্তিত্বহীন বস্তুর লেনদেন তথা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। এ মতের প্রবক্তা হলেন ইবনু তাইমিয়া।^{৩৫}

ইবনে তাইমিয়ার দলীল হলো; মা'দুম (معدوم) বা অস্তিত্বহীন বস্তু বিক্রয় অবৈধ হওয়ার কোনো দলীল নাই। বরং কিছু জিনিস যা অস্তিত্বহীন তা বিক্রয় করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে, যেমনভাবে কিছু জিনিস বিক্রয় করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে অথচ তার অস্তিত্ব আছে বা যা বিদ্যমান। অথচ অস্তিত্বশীল বস্তু বিক্রয় নিষেধের কারণ অস্তিত্ব নয়। সুতরাং অস্তিত্বহীন জিনিস বিক্রয় থেকে নিষেধের ইল্লাত অস্তিত্বহীনতা না হওয়া আবশ্যিক বরং তার নিষেধের ইল্লাত বা কারণ অন্য কিছু হওয়া আবশ্যিক, আর সেটা হলো গরার।

দ্বিতীয় দলীল: বিধানদাতা কিছু জায়গায় অস্তিত্বহীন জিনিস বিক্রয়ের বৈধতা দিয়েছেন। যেমন: ফলের উপযুক্ততা প্রকাশ পাওয়ার পর ফল বিক্রয় বৈধ। আর এ ফল ক্রয় করার পর পরিপূর্ণ উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত গাছে বাকি রাখা হয় এবং এটা ক্রেতার হক, আর এর মাঝে অনেক ফল অন্তর্ভুক্ত হয় যা অস্তিত্বহীন এখনো গাছে ধরে নাই।^{৩৬}

পর্যালোচনা: নিঃসন্দেহে অস্তিত্বহীন জিনিস বিক্রয়কে শর্তহীন ভাবে বাতিল বলার পক্ষে দলীল নেই। বরং এটা এমন একটি মত যার সাথে সাংঘর্ষিক অবিসংবাদিত অনেক বিধান রয়েছে।^{৩৭}

তবে উত্তম হচ্ছে উভয় মতের মাঝে সমন্বয় করা। অর্থাৎ অস্তিত্বহীন বস্তু যা ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে কিনা সেটা অজ্ঞাত, সেটার লেনদেন অবৈধ। আর যে অস্তিত্বহীন বস্তু ভবিষ্যতে স্বভাবত নিশ্চিত পাওয়া যাবে, সেটা বিক্রয় বৈধ।

ইবনু রুশদ “বেদায়াতুল মুজতাহিদ” গ্রন্থে লিখেছেন: পণ্যের মাঝে গরার সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ভাবে যেমন:

১. আল জাহলু বি তা'ঈনিল মা'কুদি আলাইহি (الجهل بتعيين المعقود عليه) তথা পণ্য নির্ধারণে অজ্ঞতার কারণে গরার। অর্থাৎ বিভিন্ন দামের কিছু বইয়ের দিকে ইঙ্গিত করে বিক্রেতা বলল: আমি আপনার কাছে এগুলোর মধ্য থেকে একটি বই বিশ টাকায় বিক্রি করলাম।

২. আল জাহলু বি তা'ঈনিল আকদ (الجهل بتعيين العقد) তথা লেনদেন নির্ধারণে অজ্ঞতার কারণে গরার। অর্থাৎ নগদ লেনদেন নাকি কিস্তিতে লেনদেন তা জানা যায় না।

৩. আল জাহলু বি ওয়াছফিছ ছামানি ওয়াল মুছমানি (الجهل بوصف الثمن والمثمن) তথা পণ্যের বা মূল্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে গরার। অর্থাৎ যখন পণ্য বা মূল্য লেনদেনের মজলিস থেকে দূরে থাকে বা অনুপস্থিত থাকে।

৪. আল জাহলু বি কদরিহি (الجهل بقدره) তথা পণ্য বা মূল্যের পরিমাণ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে গরার।

৫. আল জাহলু বি আজালিহি ইন কানা হুনাকা আজাল (الجهل بأجله إن كان هناك أجل) তথা পণ্য বা মূল্যের যদি কোনো সময় সীমা থাকে তাহলে সময় সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে গরার। অর্থাৎ যেমন বলল: আমার রোগী সুস্থ হওয়া পর্যন্ত অথবা আমার ছেলে সফর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত অথচ ফিরে আসার বিষয়টি উভয়ের নিকট অজ্ঞাত।

৬. আল জাহলু বি উজুদিহি (الجهل بوجوده) তথা পণ্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে গরার। অর্থাৎ যেমন: গর্ভের মধ্যে বাচ্চা বিক্রয়।

৭. তাআযযুরুল কুদরাতি আলাইহি (تعذر القدرة عليه) তথা পণ্য ধরা-ছোয়ার বাইরে থাকার কারণে গরার। অর্থাৎ যেমন: আকাশের উড়ন্ত পাখি বিক্রয়।

৮. আল জাহলু বি সালামাতিহি (الجهل بسلامته) তথা পণ্য ভালো থাকার বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে গরার। অর্থাৎ যেমন: উপযুক্ত হওয়ার আগে ফল বিক্রয়।^{৩৮}

আর্থিক লেনদেনে গরার এর প্রভাব ও তার শর্ত:

ইবনুল কায়্যিম (র.) বলেন: সব গরার লেনদেন হারাম হওয়ার কারণ নয়, যদি গরার সামান্য পরিমাণ হয় অথবা যদি তা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব না হয় তাহলে সেটা লেনদেন বিশুদ্ধ হওয়া থেকে বাধা প্রদান করে না।^{৩৯}

অতএব প্রভাব বিস্তারকারী গরার হলো এমন গরার যা লেনদেনে থাকলে লেনদেন বিশুদ্ধ হয় না, যেমন গাছে ফল ধরার বা প্রকাশ পাওয়ার আগে তা বিক্রয় করা, বাইউল মুলামাসা, বাইউল মুনাবাযা ইত্যাদি। আবার কিছু গরার লেনদেনে থাকলেও লেনদেন বিশুদ্ধ হয়। সুতরাং লেনদেনে প্রভাব বিস্তারের জন্য গরারে কিছু শর্ত রয়েছে। যে সব শর্ত থাকলে গরার লেনদেনে প্রভাব ফেলে অর্থাৎ লেনদেনকে বাতিল করে, সে শর্তগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১ম শর্ত: গরার বেশি পরিমাণ হওয়া: লেনদেনে প্রভাব ফেলার জন্য গরারের শর্ত হলো তা বেশি পরিমাণ হওয়া। যদি গরার সামান্য পরিমাণ হয়, তাহলে লেনদেনের উপর তার কোনো প্রভাব থাকে না।

করাফী বলেন: “ক্রয়-বিক্রয়ে গরার এবং অজ্ঞতা তিন প্রকার: বেশি পরিমাণ গরার যা সর্ব সম্মতিতে নিষেধ, যেমন আকাশে উড়ন্ত পাখি। অল্প পরিমাণ গরার যা সর্বসম্মতিতে বৈধ, যেমন বাড়ির আসবাব পত্র ও জুঝা বা শীতবস্ত্রের মধ্যকার তুলা। মধ্যম শ্রেণীর গরার, এটাকে প্রথম প্রকারের সাথে যুক্ত করতে হবে নাকি দ্বিতীয় প্রকারের সাথে তা নিয়ে মতানৈক্য আছে।”^{৪০}

ইবনু রুশদ আল-হাফীদ বলেন: “ফকীহগণ একমত যে, পণ্যের মধ্যে বেশি গরার অবৈধ এবং সামান্য গরার বৈধ।”^{৪১}

ইমাম নাওয়াবী বলেন: “আলেমগণ এমন অনেক জিনিসের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন যেগুলোর গরার সামান্য। তন্মধ্যে সকল আলেম একমত, তুলা ভরা জুঝা বা শীতবস্ত্র

বিক্রয় বিশুদ্ধ যদিও ভরাটকৃত তুলা দেখা যায় না। তবে যদি শুধু জুব্বার মধ্যকার তুলা আলাদাভাবে বিক্রয় করা হয় তাহলে তা বিশুদ্ধ হবে না। অনুরূপ আলেমগণ একমত যে, একমাসের জন্য বাড়ি ভাড়া দেওয়া বৈধ অথচ মাস কখনো ত্রিশ দিনেও হয় আবার উনত্রিশ দিনেও হয়। একইভাবে আলেমগণ একমত যে, ভাড়া বা চার্জ প্রদানের বিনিময়ে গন গোসল খানায় প্রবেশ বৈধ অথচ পানি ব্যবহারে ক্ষেত্রে এবং গোসলখানায় অবস্থানের ক্ষেত্রে লোকদের অবস্থা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। আলেমগণ বলেছেন: গরার এর কারণে লেনদেন বাতিল হওয়া এবং গরার থাকা সত্ত্বেও লেনদেন বিশুদ্ধ হওয়ার ভিত্তি হলো যখন গরারপূর্ণ লেনদেন করার হাজাহ তথা প্রয়োজন দেখা দিবে এবং অস্বাভাবিক কষ্ট ছাড়া তা থেকে বেঁচে থাকা যায় না অথবা গরার যদি সামান্য হয় তাহলে লেনদেন বৈধ হবে অন্যথায় হবে না।”^{৪২}

আবুল ওয়ালিদ আল-বাজী গরারে কাছির তথা বেশি পরিমাণ গরার এর একটি নীতি ও মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন: বেশি পরিমাণ গরার (গরার কাছির) হলো এমন গরার যা লেনদেনের উপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে যে, লেনদেনকে গরার দ্বারা ভূষিত করে বলা হয় আকদে গরার তথা গরারমূলক চুক্তি বা লেনদেন।^{৪৩}

দ্বিতীয় শর্ত: লেনদেনের হাজাহ বা প্রয়োজন না থাকা: লেনদেনে প্রভাব ফেলার জন্য গরার এর শর্ত হলো, যে লেনদেনে গরার এর উপস্থিতি আছে সে লেনদেনের প্রতি জনগণের কোনো প্রয়োজন না থাকা। অর্থাৎ যদি উক্ত লেনদেনের প্রতি জনগণের প্রয়োজন বা অভাব থাকে তাহলে গরার লেনদেনে কোনো প্রভাব ফেলেতে পারবে না, বরং লেনদেন বিশুদ্ধ হবে।

হাজাহ বা প্রয়োজনের ব্যাখ্যা দিতে ইমাম সূয়ুতী বলেন: “হাজাহ বা প্রয়োজন হলো, মানুষ এমন অবস্থায় উপনীত হওয়া, যদি সেখানে সে নিষিদ্ধ বিষয় অবলম্বন না করে তাহলে সে প্রচণ্ড কষ্টে ও অসুবিধায় পতিত হবে, কিন্তু সে ধ্বংস হবে না।”^{৪৪} অর্থাৎ শারীআহ গ্রাহ্য কল্যাণ ও স্বার্থসমূহ থেকে কোনো স্বার্থ তার হাতছাড়া হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে আলেমগণ একটি কায়দা (قاعدة) বা নীতি উল্লেখ করেছেন: জনসাধারণের প্রয়োজনতথা হাজাহ আম্মাহকে জরুরাহ এর পর্যায়ভুক্ত ধরা হবে।^{৪৫} জরুরাহ (ضرورة) এমন অবস্থাকে বলে যেখানে মানুষ এমন পর্যায়ে উপনীত হয়, যদি সে উক্ত অবস্থায় নিষিদ্ধ বস্তু অবলম্বন না করে তাহলে তার জরুরি মাকাসেদ বিপন্ন হবে।^{৪৬} আর জরুরি মাকাসেদ এমন কতগুলি বিষয় যেগুলি দীন ও দুনিয়া প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য আবশ্যিক অর্থাৎ সে বিষয়গুলির প্রতি যদি লক্ষ্যনা রাখা হয়, তাহলে দুনিয়ার কল্যাণসমূহ ঠিক-ঠাক মত চলবে না বরং দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়বে অনাচার, মারামারি, প্রাণ নাশ এবং পরকালে নাজাত ও নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হতে হবে এবং প্রকাশ্য ক্ষতিতে নিপতিত হতে হবে। সেগুলো মোট পাঁচটি: দীন সংরক্ষণ, জীবনসংরক্ষণ, সম্পদসংরক্ষণ, বিবেক-বুদ্ধিসংরক্ষণ, বংশ ও সম্মান সংরক্ষণ।^{৪৭}

ইবনু তাইমিয়া বলেন: “মানুষেরা যে বিক্রয় ব্যবস্থার মুখাপেক্ষী, শারে’ (شارع) বা বিধানদাতা গরার এর কোনো প্রকারের কারণে তা হারাম করেন না, বরং তিনি মানুষের প্রয়োজনীয় বিক্রয় ব্যবস্থাকে বৈধতা দিয়েছেন।”^{৪৮}

আলেমদের উক্তি “জন সাধারণের প্রয়োজনকে জরুরাহ এর পর্যায়ভুক্ত ধরা হবে” এই নীতি প্রযোজ্য হওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই হাজাহ বা প্রয়োজন নিশ্চিত হতে হবে এবং গরার থেকে বের হওয়ার কোনো শারঈ উপায় থাকা যাবে না।

অতএব যখন জন সাধারণের হাজাহ বা প্রয়োজন দেখা দিবে এবং বিকল্প শারঈ উপায় থাকবে না, তখন হাজাহকে জরুরাহ এর পর্যায় ধরে নিষিদ্ধ গরার থাকা সত্ত্বেও লেনদেন সহিহ হবে। এর উদাহরণ হলো, হাদিসে এসেছে ইবনে উমার (রা.) বলেন: নবী (সা.) ফলের উপযুক্ততা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, তিনি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কে নিষেধ করেছেন।^{৪৯} এখানে ফলের উপযুক্ততা যেমন খেজুর হলুদ বা লাল হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ যখন খেজুর হলুদ হবে তখন তা বিক্রয় করা বৈধ। অথচ ঐ গাছের বা বাগানের অন্য গাছের কিছু খেজুর হয়ত এখনো উপযুক্ত কিংবা এখানো গাছেই ধরেনি, পরে ধরবে, তা সত্ত্বেও বিক্রয় সহিহ হবে। এখানে গরার থাকা সত্ত্বেও বিধানদাতা সর্ব সাধারণের প্রয়োজনে এটার বৈধতা দিয়েছেন।

ইমাম কাসানী বলেন: “খিয়ারের শর্ত তথা পণ্য নেওয়া-না নেওয়া অথবা দেওয়া-না দেওয়ার শর্তে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। অথচ কiyাসের দাবী বৈধ না হওয়া; কারণ বর্তমানে বিক্রয় সংঘটিত হচ্ছে না খিয়ারের শর্তথাকায়, খিয়ারের শর্ত লেনদেনের দাবীকে বাধাগ্রস্ত করছে, ফলে তা লেনদেনকে বিনষ্টকারী। ভবিষ্যতে কি হবে সেটা অনিশ্চিত। তা সত্ত্বেও এটা বৈধ, এ বিষয়ে নস বা দলীল থাকার কারণে। দলীলটি হলো, মুনকিয় ইবনে হিব্বান ব্যবসায়ে ধোঁকা খেতেন, তখন তার পরিবার তার বিষয়ে রসূল (সা.) এর নিকট অভিযোগ করলেন। ফলে নবী (সা.) তাকে বললেন: “তুমি যখন ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন বলবে, কোনো ধোঁকা গ্রহণযোগ্য নয়।”^{৫০}

অন্য বর্ণনায় এসেছে, “এরপর তুমি যেকোনো পণ্য ক্রয় করবে সেখানে তোমার তিন দিন খিয়ার তথা নেওয়া – না নেওয়ার স্বাধীনতা থাকবে।”^{৫১,৫২}

এখানে খিয়ারের শর্তের মধ্যে গরার থাকা সত্ত্বেও হাজাহ এর কারণে লেনদেনকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে।

আল বাজী বলেন: “অজ্ঞাত কাজ ও গরার এর মধ্যে জরুরাহর কারণে জুআল (সুনির্দিষ্ট অথবা অজ্ঞাত কাজের উপর সুনির্দিষ্ট পারিশ্রমিক প্রদান করার ঘোষণা। যেমন, যে আমার হারানো গরু খুজে দিবে তাকে ১০০০ টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হবে) কে বৈধতা দেওয়া হয়েছে।”^{৫৩}

ইমাম নাওয়াবী বলেন: মূলত বাইউল গরার বাতিল। কারণ আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী (সা.) বাইউল গরার থেকে নিষেধ করেছেন।^{৫৪} বাইউল গরার দ্বারা উদ্দেশ্য যার মধ্যে প্রকাশ্য এমন গরার বিদ্যমান যে গরার থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। তবে গরারপূর্ণ যে ক্রয়-বিক্রয়ের হাজাহ রয়েছে, এবং যে গরার থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব না, যেমন ভিত সম্পর্কে অজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও ভিতসহ বাড়ি বিক্রি বৈধ এবং গর্ভবতী দাসী বা পশু ক্রয় করা বৈধ অথচ সম্ভবনা আছে গর্ভের বাচ্চা এক বা একাধিক হওয়ার, পুরুষ বা নারী হওয়ার, পূর্ণাঙ্গ বা অপূর্ণাঙ্গ হওয়ার। অনুরূপ এমন ছাগী কেনা বৈধ যার বাটে দুধ আছে এবং এ জাতীয় আরো অন্যান্য জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করা সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ।^{৫৫}

ইবনু কুদামা পশুরন্তনে অবস্থিত দুধ বিক্রয়ের অবৈধতা সাব্যস্ত করার পর বলেন, তবে ধাত্রী মাতার দুধসন্তান প্রতিপালনের জন্য ক্রয়-বিক্রয় বৈধ; কারণ এটাতে হাজাহ বা প্রয়োজন রয়েছে।^{৫৬}

তৃতীয় শর্ত: বিনা কষ্টে ও বিনা অসুবিধায় গরার থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হওয়া। এটাও সর্বসম্মতিক্রমে শর্ত। যদি গরার থেকে কষ্ট ও অসুবিধায় পতিত হওয়া ছাড়া বেঁচে থাকা সম্ভব না হয়, তাহলে সেটাতে ছাড় রয়েছে। আলেমগণ এটার উদাহরণ দিয়ে থাকেন বাড়ির দেয়ালের ভিত দ্বারা এবং গর্ভবতী প্রাণীর গর্ভে যা আছে সেটা দ্বারা; কারণ মানুষ বাড়ি ক্রয় করে অথচ সে তার ভিত এবং বুনিয়াদ সম্পর্কে অবগত নয় এবং কিভাবে নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে সেটাও সে জানে না। অনুরূপ সে গর্ভবতী প্রাণী ক্রয় করে অথচ সে জানে না এ প্রাণীর গর্ভে কী আছে, ছেলে না মেয়ে, একাধিক নাকি একটি, জীবিত নাকি মৃত ইত্যাদি। এধরনের বিষয় জানা অসম্ভব, আমরা যদি এগুলো জানতে যায় তবে অবশ্যই কষ্ট ও অসুবিধায় পড়তে হবে।

এর আরো উদাহরণ যেটা ইবনে উমার (রা.) এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নবী (সা.) ফল উপযুক্ত হওয়ার পর ক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন^{৭৭} অথচ এ ফলের শেষ পরিস্থিতি অজ্ঞাত বরং এর মধ্যে কিছু ফল এখনো গাছেই ধরেনি এবং জানা যায় না যে, সেগুলো কিভাবে পরিপক্ব হবে।

চতুর্থ শর্ত: গরারটা মূল পণ্যের মধ্যে হওয়া। যদি মূল পণ্যের মধ্যে গরার থাকে তাহলে লেনদেন বিশুদ্ধ হবে না। তবে যদি পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো জিনিসের মাঝে গরার থাকে তাহলে লেনদেন বিশুদ্ধ হবে।

এ ক্ষেত্রে একটি ফিকহের কায়দা (قاعدة) বা নীতি আছে, “সংশ্লিষ্ট বা অনুগামী বিষয়ে যা ছাড় দেওয়া হয় তা মৌলিক বিষয়ে ছাড় দেওয়া হয় না।”^{৭৮}

এর উদাহরণ হলো:

১. যে ফল এখনো উপযুক্ত হয়নি তা স্বতন্ত্রভাবে বিক্রয় বৈধ নয়। কারণ নবী (সা.) ফল উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন; কিন্তু যদি তা গাছের সাথে একত্রে বিক্রয় করা হয় তবে সেটা জায়েয।

নবী (সা.) বলেন: পরাগায়ণের পরে যদি কেউ খেজুর গাছ ক্রয় করে, তাহলে সে ফল বিক্রেতাপাবে, তবে যদি ক্রেতা শর্ত করে তখন সে পাবে।^{৭৯}

ইবনু কুদামা বলেন: এ বিক্রয়ের বৈধতার ব্যাপারে সবাই একমত। তিনি বলেন: কারণ যখন সে গাছের সাথে ফল বিক্রি করবে তখন তা অনুগামী হয়ে বিক্রয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং তার মধ্যে গরার থাকার সম্ভাবনা কোনো ক্ষতি করবে না।^{৮০}

২. গর্ভের বাচ্চা বিক্রয় বৈধ নয়। ইবনে উমর (রা.) বলেন: “রসূল (সা.) হাবালুল হাবালাহ বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন, এটা ছিল জাহিলী যুগের লোকদের এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয়, কোনে লোক এমন ভাবে উট ক্রয় করত যে, উটের বাচ্চা হওয়ার পর সেই বাচ্চার পেটের বাচ্চা যখন বাচ্চা দিবে সেটা ক্রয় করত।”^{৮১}

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন: নবী (সা.) চতুস্পদ জন্তুর বাচ্চা প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তা ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।^{৮২}

ইবনে উমর (রা.) বলেন: নবী (সা.) মাজার (مجر) তথা ভ্রণ বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন।^{৮৩}

ইবনুল মুনযির, আল মাওয়ারদী, নাওয়াবী দ্রুণ বিক্রয় বাতিল হওয়ার বিষয়ে ইজমা' হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন; কারণ এটা গরার। তবে যদি গর্ভবতী প্রাণীকে বাচ্চার শর্ত ছাড়াই বিক্রি করে তাহলে বিক্রয় সহীহ হবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে বাচ্চা বিক্রয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।^{৬৪}

৩. বাটের মধ্যে অবস্থিত দুধ বিক্রয় বৈধ নয়। ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: রসূল (সা.) খাওয়ার উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রয় করতে, পশুর গায়ের পশম বিক্রয় করতে এবং বাটের দুধ বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।^{৬৫}

কেননা এর পরিমাণ অজানা। হতে পারে পরিপূর্ণ দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে তাতে ভরপুর দুধ আছে অথচ দুধ কম হতে পারে। তাছাড়া এখানে গুণাগুণ অজানা, হতে পারে দুধ ফ্রেশ অথবা নোংরা। আর এটা গরার। এভাবে বিক্রয়ের হাজাহ বা প্রয়োজন নেই। অতএব তা অবৈধ। কিন্তু যদি প্রাণীটাকে বিক্রয় করা হয়, তাহলে দুধ বিক্রয়ের ভিতরে ঢুকে যাবে। সেটাতে সমস্যা নেই।

ইমাম নাওয়াবী বলেন: “সকল মুসলিম একমত যে, দুগ্ধবতী প্রাণী বিক্রয় বৈধ, যদিও দুধের পরিমাণ অজানা; কারণ এখানে দুধ মূল পণ্য নয় বরং তা প্রাণী তথা মূল পণ্যের অনুগামী বা সংশ্লিষ্ট। আর এটার বৈধতার দলীল হলো- মুছাররাহ (মুছাররাহ এমন ছাগল যার বাটের দুধ কয়েকদিন বেধে রাখা হয়) এর হাদিস।”^{৬৬}

পঞ্চম শর্ত: গরার বিনিময়মূলক আর্থিক লেনদেনে হওয়া। এ শর্তটি করেছেন মালেকীরা এবং ইবনু তাইমিয়া। তারা মরে করেন, বিনিময় ভিত্তিক লেনদেনে গরার প্রভাব ফেলে। দানমূলক লেনদেনে গরার প্রভাব ফেলে না।^{৬৭}

করাফী বলেন: কোথায় গরার থেকে দূরে থাকতে হবে আর কোথায় থাকতে হবে না সেটা ইমাম মালেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন: যে লেনদেনে দর কষাকষি হয় এবং যে লেনদেনের মাধ্যমে মালের প্রবৃদ্ধি হয় এবং যার মাধ্যমে মাল উপার্জন উদ্দেশ্য থাকে সে লেনদেনে গরার থেকে দূরে থাকতে হবে। আর যেসব লেনদেনে এগুলো উদ্দেশ্য নয় সেখানে গরার থেকে দূরে থাকা জরুরী নয়।^{৬৮}

এর দলীল হিসেবে তারা উল্লেখ করেন আব্দুল্লাহ বিন আমরের (রা.) হাদিস, তিনি বলেন: “আমরা রসূল (সা.) এর নিকট ছিলাম, হাঠাৎ তার নিকট হাওয়ায়েন গোত্রের লোক আসল। তারা বলল: হে মুহাম্মাদ! আমরা একই শিকড়ের এবং আপনার স্বজন। আমাদের কী বিপদ হয়েছে তা আপনার অজানা নয়। আপনি আমাদের অনুগ্রহ করুন, আল্লাহ আপনার উপর অনুগ্রহ করবেন। নবী (সা.) বললেন: হয় তোমরা সম্পদ গ্রহণ করো, আর না হয় স্ত্রী-সন্তানদেরকে গ্রহণ করো। তারা বলল: আপনি আমাদের সম্পদ ও মর্যাদার মাঝে এখতিয়ার দিয়েছেন। আমরা আমাদের সম্মান-মর্যাদা তথা স্ত্রী ও সন্তানদেরকে গ্রহণ করলাম। রসূল (সা.) বললেন: আমার এবং বনী আব্দুল মোত্তালেব এর কাছে যারা আছে তাদেরকে তোমরা নিয়ে যাও।”^{৬৯}

গরার এর কারণে নিষিদ্ধ কতিপয় লেনদেন:

১. বাইউল মুলামাসা (পরস্পর স্পর্শের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়): এ ব্যাপারে কয়েকটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়:

১. বিক্রেতা ক্রেতাকে বলবে, তুমি যে কাপড়ই হাত দিয়ে ধরবে বা স্পর্শ করবে সেটা তোমাকে এত দামে অবশ্যই কিনতে হবে। এভাবে বিক্রয় বিসৃদ্ধ নয়; কেননা হতে পারে ক্রেতা এমন কাপড় স্পর্শ করল যার দাম ১০০ টাকা অথবা এমন কাপড় স্পর্শ করল যার দাম মাত্র ১০ টাকা। অতএব এখানে গরার এবং অজ্ঞতা আছে।^{৭০}

২. কাপড় বিক্রয় করা কেবল মাত্র স্পর্শ দ্বারা অর্থাৎ ক্রেতা খুলতে ও দেখতে পারবে না, শুধু হাত দ্বারা স্পর্শ করেই কিনবে। এটাও অবৈধ; কারণ এখানে অজ্ঞতা আছে। শুধু স্পর্শ করে পণ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় না।^{৭১}

৩. হাত দ্বারা ধরলেই ক্রয়-বিক্রয় আবশ্যিক হবে। নেওয়া-না নেওয়া স্বাধীনতা থাকবে না।^{৭২}

২. বাইউল মুনাবাযাহ (পরস্পর নিষ্ক্ষেপেরমাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়): এর কয়েকটি ব্যাখ্যা রয়েছে:

১. ক্রেতা বিক্রেতাকে বলবে, আপনি আমার দিকে যে কাপড়ই নিষ্ক্ষেপ করবেন সেটা আমি দশ টাকা দিয়ে ক্রয় করব। এ অবস্থায় বিক্রেতা যত সম্ভব দশ টাকার চেয়ে কমেরটা নিষ্ক্ষেপ করবে সুতরাং এখানে অজ্ঞতা রয়েছে। হতে পারে দশ টাকা সমমূল্যের কাপড় নিষ্ক্ষেপ করবে অথচ ক্রেতা ভাববে তার দিকে হয়ত একশত টাকা দামের কাপড় নিষ্ক্ষেপ করেছে।^{৭৩}

২. কাপড় বা পণ্য নিষ্ক্ষেপকে চূড়ান্ত বিক্রয় নির্ধারণ করা। অর্থাৎ বিক্রেতা ক্রেতাকে বলবে, যখনই আপনার কাছে কাপড় নিষ্ক্ষেপ করব তখন সেটার বিনিময়ে এত টাকা দিতে হবে। এটা অবৈধ; কারণ এখানে গরার আছে।^{৭৪}

৩. পরস্পর পরস্পরের দিকে কাপড় নিষ্ক্ষেপ করবে এবং এটাকে ক্রয়-বিক্রয় হিসেবে ধরবে। এটাও অবৈধ; কারণ এখানে অজ্ঞতা আছে।^{৭৫}

৪. কাপড় নিষ্ক্ষেপ করলে অবশ্য বিক্রয় সংঘটিত হবে। নেওয়া-না নেওয়ার স্বাধীনতা থাকবে না। এটাও অবৈধ; গরার এর কারণে।^{৭৬}

৩. বাইউল হাছাত (কংকর নিষ্ক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়): এর কয়েকটি রূপ হতে পারে:

১. বিক্রেতা ক্রেতাকে বলবে তুমি কংকর নিষ্ক্ষেপ করো, সেটা যে কোনো পণ্যের উপর পড়বে সেটাকে দশ টাকা দিয়ে বিক্রয় করব। ক্রেতা কংকর নিষ্ক্ষেপ করল। সেটা হতে পারে একটি খালি কৌটার উপর পতিত হল তখন তাকে সেটা দশ টাকা দিয়ে কিনতে হবে। আবার হতে পারে এমন পণ্যের উপর পড়ল যার দাম হাজার টাকা। সুতরাং এ ধরনের বিক্রয় নিষেধ; কারণ এতে অজ্ঞতা আছে।^{৭৭}

২. বিক্রেতা ক্রেতাকে বলবে, এই কংকরটি নিষ্ক্ষেপ করুন, সেটা জমিনের যতদূর পর্যন্ত পৌঁছাবে সে পর্যন্ত আপনাকে এত টাকার বিনিময়ে দিব। এটাও অবৈধ; কারণ এখানে অজ্ঞতা আছে, হতে পারে নিষ্ক্ষেপকারী শক্তিশালী অনেক দূরে পড়বে, অথবা দুর্বল অল্প দূরে পড়বে। আবার বাতাসের প্রভাব থাকতে পারে। অতএব এ ধরনের ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ; কারণ এতে গরার রয়েছে।^{৭৮}

৪. বাইউ হাবালিল হাবালাহ (গর্ভের বাচ্চার বাচ্চা বিক্রয়): ড. সলেহ ফাওয়ান বলেন এর দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে:

১. তারা জাহেলী যুগে ক্রয়-বিক্রয় করতো এবং পণ্য বা মূল্য প্রদানের সময় নির্ধারণ করত হাবালুল হাবালাহ পর্যন্ত। অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ বিক্রেতা বলত: আমি আপনার কাছে আমার বাড়ি বিক্রয় করলাম, আপনি মূল্য পরিশোধ করবেন যখন এই উটনি গর্ভবতী হয়ে বাচ্চা প্রসব করবে এবং ঐ বাচ্চা আবার গর্ভবতী হবে। এটা অবৈধ; কারণ এখানে সময় সম্পর্কে অজ্ঞতা আছে, হতে পারে উটনি গর্ভবতী হবে অথবা হবে না, আবার তার বাচ্চা গর্ভবতী হবে অথবা হবে না। আবার গর্ভবতী হলে কখন হবে সে বিষয়ে অজ্ঞতা ও গরার আছে।

২. গর্ভের গর্ভ বিক্রয়। বিক্রেতা বলবে আমি আপনার নিকট এ পশুর গর্ভে যে বাচ্চা আছে ঐ বাচ্চার গর্ভের বাচ্চা যেটা হবে সেটা বিক্রয় করলাম। এখানে অজ্ঞতা আরো বেশি; কারণ সে অস্তিত্বহীনের মধ্যে অস্তিত্বহীনকে বিক্রয় করল।^{৭৬}

৫. বাইউল মালাকিহ ওয়াল মাদামিন (বীর্ষ ও গর্ভের বাচ্চা বিক্রয়):

নবী (সা.) বাইউল মালাকিহ হতে নিষেধ করেছেন;^{৭৭} কারণ এর মাঝে অজ্ঞতা রয়েছে।

বাইউল মালাকিহ হলো: মা পশু ছাড়া শুধু তার গর্ভের বাচ্চা বিক্রয় করা। এটি বিক্রয় বৈধ নয়; কেননা এতে অজ্ঞতা রয়েছে। অর্থাৎ জানা যায় না গর্ভের বাচ্চা জীবিত নাকি মৃত, নর নাকি মাদী, সুস্থ নাকি অসুস্থ। সুতরাং এর মাঝে রয়েছে গরার, অজ্ঞতা ও অন্যায় ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ। তবে যদি গর্ভবতী পশু বিক্রয় করা হয় তাহলে সেটাতে নিষেধ নেই; কারণ এখানে গর্ভের বিক্রয় মায়ের বিক্রয়ের অনুষঙ্গী।

বাইউল মাদামিন হলো: পাঠা, ঘোড়া, উট ও ষাড়ের পিঠে বিদ্যমান বীর্ষ বিক্রয় করা। অর্থাৎ এক ঘন্টার জন্য বা একদিন বা একমাসের জন্য এ সব প্রাণীর পাল বিক্রি করা।

নবী (সা.) উটের পাল বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন।^{৭৮}

তবে বীর্ষ ব্যাংক থেকে যে বীর্ষ দ্বারা পশুর প্রজনন দেওয়া হয় সেটা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। কারণ সেটা সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার।^{৭৯}

৬. বাইআতানি ফি বাইআহ (এক বিক্রয়ের মাঝে দুই বিক্রয়):

নবী (সা.) এক বিক্রয়ের মধ্যে দুই বিক্রয় হতে নিষেধ করেছেন।^{৮০}

এটির কয়েকটি রূপ হতে পার:

১ম রূপ: আমি আপনার কাছে এ পণ্যটি বিক্রয় করব এ শর্তে যে, আপনি এ বাড়িটি আমার কাছে এত দামে বিক্রয় করবেন। ইমাম শাফেঈ এ লেনদেন সম্পর্কে স্পষ্ট ভাবে বলেছেন এটা অবৈধ; কারণ এখানে উভয় পন্যে মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকে যায়। কারণ যদি পণ্য দুটি স্বতন্ত্র ভাবে বিক্রয় করত তাহলে এখন যে দামে তারা একমত হয়েছে সে দামে তারা একমত হত না। ইমাম শাফেঈ এখানে মূল্য বা দাম সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্য এটাকে অবৈধ বলেছেন।^{৮১}

২য় রূপ: আমি আপনার নিকট এ পণ্যটি বিক্রয় করব এক দিনার দিয়ে আর ঐ পণ্যটি বিক্রয় করব দুই দিনারে এবং যে কোনো একটি বিক্রয় অনির্দিষ্ট ভাবে আবশ্যিক হবে। এ ধরনের লেনদেন সর্ব সম্মতভাবে অবৈধ; কারণ এখানে অজ্ঞতা রয়েছে।^{৮২}

৩য় রূপ: বিক্রেতা ক্রেতাকে বলবে, আমি এই কাপড়টি আপনার নিকট নগদে বিক্রি করব এত টাকায় আর বাকিতে বিক্রয় করব এত টাকায় এবং অনির্দিষ্ট ভাবে একটি বিক্রয় আবশ্যক হয় ক্রেতা বা বিক্রেতার মর্জি অনুযায়ী।

হুকুম: যদি এখানে ক্রয়-বিক্রয় আবশ্যক হয় অর্থাৎ না নেওয়ার স্বাধীনতা না থাকে, তাহলে সকলের ঐক্যমতে অবৈধ। তবে যদি যে কোনো একটিতে আবশ্যক না হয় তাহলে ইমাম মালেক বলেছেন বৈধ। আর আবু হানীফা ও শাফেঈ বলেছেন অবৈধ।^{৬৬}

৪র্থ রূপ: বিক্রেতা ক্রেতাকে বলবে, আমি আপনার কাছে এ পণ্যটি বাকিতে দশ হাজার টাকা বিক্রয় করলাম। ১ বছর পরে আপনি টাকা দিবেন, তবে আপনি এ পণ্যটি আমার কাছে নগদে ৮ হাজার টাকা বিক্রয় করবেন।

হুকুম: এটি অবৈধ; কারণ এখানে এমন জিনিস বিক্রয় করা হচ্ছে যা বিক্রেতার নিকট নাই। অথবা এটা বাইউল ঈ'না।^{৬৭}

৫ম রূপ: বিক্রেতা ক্রেতাকে বলবে, আমি আপনার নিকট এই দুটি কাপড়ের যে কোনো একটি এক দিনার বিক্রয় করব, তখন ক্রেতা ক্রয় করল অর্থাৎ যে কোনো একটিতে বিক্রয় আবশ্যক হল। আর ক্রেতার না নেওয়ার স্বাধীনতা অবশিষ্ট থাকল না।

হুকুম: যদি কাপড় ভিন্ন জাতীয় হয় তাহলে আবু হানীফা, মালেক ও শাফেঈ সকলের নিকট অবৈধ। আর যদি এক জাতীয় হয় তাহলে ইমাম মালেকের নিকট জায়েয, আবু হানীফা ও শাফেঈর নিকট জায়েয নয়।^{৬৮}

৭. বাইউল গায়িব (অনুপস্থিত জিনিস বিক্রয়):

যে পণ্য অনুপস্থিত অথবা উপস্থিত কিন্তু দেখা অসম্ভব সে পণ্যের যদি গুনাগুন উল্লেখ না করে এবং না দেখে বিক্রয় করা হয় তাহলে সে বিক্রয় বিশুদ্ধ কি-না সে বিষয়ে দুটি মতামত পাওয়া যায়:

১ম মত: এ বিক্রয় বিশুদ্ধ নয়। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। এটা শাফেঈ ও হাম্বলীদের মায়হাব।

২য় মত: এ বিক্রয় বিশুদ্ধ হবে, তবে যখন সে পণ্য দেখবে তখন তার নেওয়া-না নেওয়ার স্বাধীনতা থাকবে। এটা আবু হানীফার মত।^{৬৯}

পর্যালোচনা: এ বিক্রয় বিশুদ্ধ নয়। কারণ এখানে অজ্ঞতা রয়েছে ফলে এর মাধ্যমে ক্রেতা বিক্রেতার মাঝে দ্বন্দ্ব ও ঝগড়া সৃষ্টি হবে।

ফলাফল

অত্র গবেষণা প্রবন্ধের মাধ্যমে অনেকগুলো ফলাফল অর্জন হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নিচে প্রদত্ত হলো:

১. যেসব কারণে আর্থিক লেনদেন অবৈধ হয়ে থাকে, গরার সেগুলোর অন্যতম একটি কারণ।

২ . গরার হলো এমন জিনিস যেখানে অজ্ঞতা থাকে অথবা গরার হলো এমন জিনিস যার পরিণাম অজ্ঞাত ।

৩ . বাইউল গরার হলো অজ্ঞতাপূর্ণ বা পরিণাম জ্ঞানহীন ক্রয়-বিক্রয় ।

৪ . সব ধরনের গরার এর কারণে লেনদেন অবৈধ হয় না ।

৫ . যে গরার এর কারণে আর্থিক লেনদেন অবৈধ হয় তা হলো এমন গরার যা বেশি পরিমাণ ও নিশ্চয়োজনীয় হয়ে থাকে এবং যা কষ্ট ও অসুবিধা হওয়া ছাড়া বর্জন করা যায় এবং যা মৌলিকভাবে হয়ে থাকে ।

৬ . গরার নিষিদ্ধ অনেক আর্থিক লেনদেন উল্লেখ করে সেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে । যেমন উদাহরণ স্বরূপ: বাইউল গায়িবএবং সেগুলোর হুকুমের ক্ষেত্রে আলেমদের মতামত পর্যালোচনা করা হয়েছে ।

সুপারিশমালা

১ . বর্তমানে অনলাইনে ও ই-কমার্সে আর্থিক লেনদেন নানারূপে প্রকাশ পাচ্ছে । এসব লেনদেনের অনেকগুলোর পরিণাম না জানার কারণে বহু লেনদেনকারী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন । এদিক থেকে এসব লেনদেন গরারের সাথে সম্পৃক্ত । তাই অত্র প্রবন্ধে বিধৃত গরারের নীতিমালার আলোকে এসব লেনদেন নিয়ে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ক্রিপ্টোকারেন্সির কথা । অত্র প্রবন্ধের বিষয়বস্তু যেহেতু গরারের স্বরূপ উন্মোচন ও আর্থিক লেনদেনে এর প্রভাব বর্ণনা করা, তাই বিষয়বস্তুর সীমাবদ্ধতার কারণে এগুলো নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি ।

২ . ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আধুনিক অর্থনৈতিক লেনদেন অত্র প্রবন্ধে প্রদত্ত কায়দার আলোকে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন ।

উপসংহার

ইসলামি শারীআহ পুরোটাই মানব জাতির জন্য রহমত । ইসলাম যা কিছু নির্দেশ প্রদান করেছে সেগুলোতে রয়েছে মানব জাতির কল্যাণ । মানুষের কল্যাণ ও ভালোর জন্যই ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে । আর ইসলাম যা থেকে নিষেধ করেছে সেটা থেকে নিষেধ করেছে একমাত্র মানুষকে অকল্যাণ থেকে বাঁচানোর জন্য । যা থেকে ইসলাম নিষেধ করেছে অথবা ইসলাম যা মানুষের উপর হারাম করেছে সেটাতে মানুষের জন্য ক্ষতি ও অকল্যাণ নিহিত রয়েছে । ইসলাম মানুষের কল্যাণ বিধানের জন্য যেমন আর্থিক লেনদেনের বৈধতা দিয়েছে, তেমনি তাদেরকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করার জন্য কিছু আর্থিক লেনদেন থেকে নিষেধ করেছে । যেসব আর্থিক লেনদেন থেকে ইসলাম নিষেধ করেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো গরার ভিত্তিক লেনদেন । অত্র প্রবন্ধে গরার সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা দেওয়া হয়েছে এবং কোন গরারের কারণে লেনদেন বাতিল হবে, আর কোন গরারের কারণে বাতিল হবে না, সে সম্পর্কেও পরিষ্কার আলোচনা করা হয়েছে । এবং কতিপয় উদাহরণ উল্লেখ করে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করা হয়েছে । আল্লাহ যেন গরারসহ সকল বাতিল পন্থায় সম্পদ ভক্ষণ থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করেন ।

তথ্যসূত্র:

১. আল ফিরোযাবাদী, মাজদুদ্দীন আবু তাহের মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব, *আল কামুসুল মুহীত* (বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৮ম সংস্করণ, ২০০৫), পৃ: ৪৪৯
২. আছ হারাত্খী, মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বি আবু সাহল শামছুল আইম্মাহ, *আল মাভুত* (বৈরুত: দারুল মারিফা ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ১৩, পৃ: ৬৮
৩. কাসানী, আলাউদ্দীন আবু বকর বিন মাসউদ বিন আহমাদ হানাফী, *বাদায়েউস সনয়েঈ ফি তারতীবিশ শারঈ* (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি.) খ. ৫, পৃ: ১৬৩
৪. বাবরতী, মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মাহমুদ আকমাল উদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ ইবনু শাইখ শামসুদ্দীন ইবনে শাইখ জামালুদ্দীন আল-রুমী, *আল ইনায়্যা শারছুল হেদায়া* (দারুল ফিকর, সংস্করণ বি. তা. বি.), খ. ৬, পৃ. ৪১১
৫. ইবনু আবেদীন, মুহাম্মাদ আমীন বিন উমর বিন আব্দুল আজিজ আবেদীন, *হাশিআতু ইবনে আবেদীন* (বৈরুত: দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ, ১৯৯২ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৪৭
৬. মালেক বিন আনাস বিন মালেক বিন আমের আল আসবাহী আল মাদানী, *আল মুদাউওয়ানা* (দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৪ খ্রি.) খ. ৩, পৃ. ২৫৫
৭. মালেক বিন আনাস বিন আমের আল আসবাহী আল মাদানী, *মুয়াত্তা*, বিশ্লেষণ: বাশশার আওয়াদ মারুফ ও মাহমুদ খলীল (মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১২ হি.), খ. ২, পৃ. ৩৭২. আছার নং: ২৬৪৬
৮. আবুল আব্বাস আল করাফী, আনওয়ারুল বুরক ফি আনওয়ারিল ফুরুক, পূর্বোক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৬
৯. আদ দাসুকী, মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন আরাফাহ আল-মালেকী, *হাশিয়াতুদ দাসুকী আলাশ শারহিল কাবীরদারুল ফিকর*, সংস্করণ বি. (সংস্করণের বার উল্লেখ বিহীন), তা. বি. (তারিখ উল্লেখ বিহীন), খ. ৩, পৃ. ৫৫
১০. শিরাজী, ইবরাহীম বিন আলী বিন ইউসুফ আবু ইসহাক, *আল মুহাযযাব ফী ফিকহিল ইমামি আল-শাফেঈ* (দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, সংস্করণ বি., তা. বি.), খ. ২, পৃ. ১২
১১. আর রমালী, শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আবুল আব্বাস আহমাদ বিন হামযাহ, *নেহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ* (বৈরুত: দারুল ফিকর, শেষ সংস্করণ, ১৯৮৪ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৪০৫
১২. ইবনু তাইমিয়া, তাকী উদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু আব্দুল হালীম বিন আব্দুস সালাম বিন আব্দুল্লাহ বিন আবুল কাসেম বিন মুহাম্মাদ আল হাররানী আল হাম্বলী, *আল কাওয়ায়েদ আন নুরানিয়া*, বিশ্লেষণ: ড. আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-খালীল (রাজকীয় সৌদি আরব: দারুল ইবনুল জাওয়া, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি.), পৃ. ১৬৯
১৩. ইবনুল কায়্যিম, মুহাম্মাদ বিন আবু বকর বিন আইয়ুব বিন সা'দ শামসুদ্দীন, *যাদুল মাআদ ফী হাদঈ খাইরিল ইবাদ* (বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২৭তম সংস্করণ, ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৭২৮
১৪. ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [আল কুরআন, সূরা বাকারা, ২: ১৮৮।]
১৫. ড. আদ দরীর, আস সিদ্দিক মুহাম্মাদ আল আমীন, আল গরার ওয়া আছারহ ফিল 'উকুদী ফিল ফিকহিল ইসলামী (২য় সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৭৪।
১৬. ইবনু রজাব আল হাম্বলী, যাইনুদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আহমাদ বিন রজাব বিন আল হাসান আস সুলামী আল বাগদাদী আদ দিমাকশী, রাওয়ায়েউত তাফসীর, সংকলন ও বিন্যাস: আবু মুয়ায তারিক (সৌদি আরব: দারুল আছমা, ১ম সংস্করণ, ২০০১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৯৭

১৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» [আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবন মাজাহ, আস সুনান (মিশর: দার এহয়া কুতুবুল আরাবী, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৭৩৯, হাদিস নং: ২১৯৫।]
১৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» [মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন নিশাপুরী আল কুসাইরী, আস সহিহ (বৈরুত: দারু এহয়া তুরাসুল আরবী, তা.বি.), খ. ৩, পৃ. ১১৫৩, হাদিস নং: ১৫১৩/৪।]
১৯. ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْفُضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ (আল কুরআন, সূরা বাকারা, ২ : ২৩৭।)
২০. عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يُعْضُ الْمُسِيرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ، وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلَا تَتَّبِعُوا الْفُضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: ২৩৭] وَيُبَايِعُ الْمُضْطَرُّونَ «وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُثْرِكَ» [আবু দাউদ সূলায়মান বিন আশআস বিন ইসহাক আসসিজিস্তানী, আস সুনান (বৈরুত: মাকতাবা আসরীয়াহ, তা.বি.), খ. ৩, পৃ. ২৫৫৫, হাদিস নং: ৩৩৮২।]
২১. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحَصِينِ أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا فِي ضَرْعِ الْمَاشِيَةِ قَبْلَ أَنْ تَحْلِبَ، وَعَنْ بَيْعِ الْخَنِينِ فِي بَطُونِ الْأَنْعَامِ، وَعَنْ بَيْعِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ، وَعَنْ الْمِضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَحِبْلِ الْغُرَرِ» [আবু মুহাম্মাদ মাহমুদ বিন মুসা বিন আহমাদ বিন হুসাইন আল গাইতাবী আল হানাফী বাদরুদ্দীন, উমদাতুল ক্বারী শারহে সহীহুল বুখারী (বৈরুত: দারু এহয়া তুরাসুল আরবী, তা.বি.), খ. ১১, পৃ. ২৬৪।]
২২. عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِبْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «لَا تَتَّبِعُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ غَرَرٌ» [আবু বকর ইবনে আবু শাইবাহ, আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম বিন উসমান বিন খাওয়াসতি আল আবসী, আল কিতাবুল মুহান্নাফ ফিল আহাদিছি ওয়ালা আছার, বিশ্লেষণ: কামাল ইউসুফ আল-হুত (রিয়াদ: মাকতবাতুর রুশদ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৯ হি.), খ. ৪, পৃ. ৪৫২, হাদিস নং: ২২০৫০।]
২৩. ড. আদ-দরীর, আল গরার ওয়া আছারুহ ফিল 'উকুদী ফিল ফিকহিল ইসলামী, প্রগুক্ত, পৃ. ৭৬
২৪. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنْ رَجُلٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عَنْكَ» [আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বল বিন হিলাল বিন আসাদ আশ শায়বানী (ইমাম আহমাদ), বিশ্লেষণ: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের, মুসানাদে আহমাদ (কায়রো: দারুল হাদীস, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ১৯০, হাদিস নং: ৬৬২৮।]
২৫. ড. আদ দরীর, আল গরার ওয়া আছারুহ ফিল 'উকুদী ফিল ফিকহিল ইসলামী, প্রগুক্ত, পৃ. ১০২-১০৫
২৬. [ইমাম] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» [মুসলিম, আস সহীহ, পূর্বোক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১৫৩, হাদিস নং: ১৫১৩/৪।]
২৭. ড. আদ-দরীর, আল গরার ওয়া আছারুহ ফিল 'উকুদী ফিল ফিকহিল ইসলামী, প্রগুক্ত, পৃ. ১৩৪
২৮. ড. আল ওয়াবেল আব্দুল লতিফ বিন আব্দুল্লাহ, মাবাহিছ মুখতারাহ মিন ফিকহিল মুআমালাত (রাজকীয় সৌদি আরব: দারু তাযবা আল খাদরা, ২য় সংস্করণ, ১৪৩৮ হি.), পৃ. ২৪-২৫
২৯. ড. আদ দরীর, আল গরার ওয়া আছারুহ ফিল 'উকুদী ফিল ফিকহিল ইসলামী, প্রগুক্ত, পৃ. ১৪৩-১৪৮
৩০. ড. আদ দরীর, আল গরার ওয়া আছারুহ ফিল 'উকুদী ফিল ফিকহিল ইসলামী, প্রগুক্ত, পৃ. ১৫৭
৩১. ড. আদ দরীর, আল গরার ওয়া আছারুহ ফিল 'উকুদী ফিল ফিকহিল ইসলামী, প্রগুক্ত, পৃ. ১৮১

৩২. ইবনুল কায়্যিম, মুহাম্মাদ বিন আবু বকর বিন আইয়ুব বিন সা'দ শামসুদ্দীন, *ই'লামুল মুওয়াফ্ফিহীন আন রকিবল আলামিন* (বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৯৯১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৫১৪
৩৩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْخَبْلَةِ، وَكَانَ إِمَامٌ يَبِيعُ يَتْبَاعُهُ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُرُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ الثَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الْتِي فِي بَطْنِهَا» [ইমাম বুখারি, *আস সহিহ*, পূর্বোক্ত, খ. ৩, পৃ. ৭০, হাদিস নং : ২১৪৩।]
৩৪. ড. আদ দরীর, *আল গরার ওয়া আছারুহ ফিল 'উকুদী ফিল ফিকহিল ইসলামী*, প্রণেতা, পৃ. ২৭৮
৩৫. ড. আদ দরীর, *আল গরার ওয়া আছারুহ ফিল 'উকুদী ফিল ফিকহিল ইসলামী*, প্রণেতা, পৃ. ২৭৮
৩৬. ইবনু তাইমিয়া, তাকী উদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু আব্দুল হালীম বিন আব্দুস সালাম বিন আব্দুল্লাহ বিন আবুল কাসেম বিন মুহাম্মাদ আল হাররানী আল হামালী, *আল কিয়াস ফিশ শারঈল ইসলামী* (দারুল আফাক আল জাদীদাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ: ৩৯-৪১
৩৭. ড. আদ দরীর, *আল গরার ওয়া আছারুহ ফিল 'উকুদী ফিল ফিকহিল ইসলামী*, প্রণেতা, পৃ. ৩৫৭
৩৮. ইবনু রুশদ আল হাফীদ, মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন রুশদ আল কুরতুবী, বিশ্লেষণ: মাজেদ আল হামাবী, *বেদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নেহায়াতুল মুকতাহিদ* (বৈরুত: দারু ইবনু হাজম, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১১৯৮
৩৯. ইবনুল কায়্যিম, *যাদুল মাআ'দ ফী হাদঈ খাইরিল ইবাদ*, পূর্বোক্ত, খ. ৫, পৃ. ৭২৮
৪০. আবুল আব্বাস আল করাফী, শিহাবুদ্দীন আহমাদ বিন ইদ্রীস বিন আব্দুর রহমান আল মালেকী, *আনওয়াকুল বুরুক ফি আনওয়াইল ফুরুক* (আলামুল কুতুব, সংস্করণ বি., তা. বি.), খ. ৩, পৃ. ২৭১
৪১. ইবনু রুশদ আল হাফীদ, *বেদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নেহায়াতুল মুকতাহিদ*, পূর্বোক্ত, খ. ৩, পৃ. ১২১০
৪২. আন নাওয়াবী, আবু যাকারিয়া মহিউদ্দীন ইয়াহইয়া বিন শারায়, *আল মাজমু' শারহুল মুহাযযাব* (দারুল ফিকির, তা. বি.), খ. ৯, পৃ. ২৫৮
৪৩. *আল মাউসুআহ আল ফিকাহিয়া আল-কুয়াইতিয়া*, খ. ৩১, পৃ: ১৫১
৪৪. আস সুযতী, আব্দুর রহমান বিন আবু বকর জালালুদ্দীন, *আল আশবাহ ওয়ান নাজায়ের* (দারুল কুতুব আল ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ৮৫
৪৫. ড. দাওসারী, মুসলিম বিন মুহাম্মাদ বিন মাজেদ, *আল মুমতি' ফিল কাওয়াঈদ আল ফিকহিয়া* (রিয়াদ: দারু যিদনী, ১ম সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ: ১৯২
৪৬. ড. দাওসারী, *আল মুমতি' ফিল কাওয়াঈদ আল ফিকহিয়া* (পূর্বোক্ত) পৃ: ২০৪
৪৭. শাতেবী, আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন মুসা আল লাখমী আল গ্রানাডী আল মালেকী, *আল মুওয়াফাফাত ফী উসূলিশ শারীআহ* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ২য় সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ: ২২১
৪৮. ইবনু তাইমিয়া, তাকী উদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু আব্দুল হালীম বিন আব্দুস সালাম বিন আব্দুল্লাহ বিন আবুল কাসেম বিন মুহাম্মাদ আল হাররানী আল হামালী, *মাজমু'উল ফাতাওয়া*, বিশ্লেষণ: আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন কাসেম (আল- মদীনা আল মুনাওওয়ারাহ: মুজাম্মা আল মালিক ফাহাদ লি তিবাআতিল মুসহাফ আশ শারীফ, সংস্করণ বি., ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ২৯, পৃ. ২২৭
৪৯. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ [আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বুখারি (ইমাম বুখারি), *আস সহিহ* (মিশর: দারু তাওকুন নাজাত, ১৪২২ হি.), খ. ৩, পৃ. ৭৭, হাদিস নং : ২১৯৪।]

৫০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، إِذَا بَايَعَتْ فَقَالَ لَا خِلَافَةَ. [আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারি, আস সহিহ, পূর্বোক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৪, হাদিস নং: ৬৯৬৪।]
৫১. আহমাদ ইবনুল হুসাইন বিন আলী বিন মুসা আল খুসারাওজিরদী আল খুরাসানী আবু বকর আল বায়হাকী, বিশ্লেষণ: মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের আতা, আস সুনানুল কুবরা (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ৩য় সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৪৪৯, হাদিস নং: ১০৪৫৯
৫২. কাসানী, বাদায়েউস সনায়েঈ ফি তারতীবিশ শরাঈফ, পূর্বোক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৭৪
৫৩. আবুল ওয়ালিদ সুলাইমান বিন খালাফ বিন সা'দ বিন আইয়ুব বিন ওয়ারেছ আত তুজিবী আল কুরতুবী আল বাজী, আল মুনতাকা শারহুল মুয়াত্তা (কায়রো: দারুল কুতুব আল ইসলামী, ২য় সংস্করণ, তা. বি.) খ. ৫, পৃ. ১১২
৫৪. [ইমাম হুইরী, قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغُرَرِ».] [ইমাম মুসলিম, আস সহীহ, পূর্বোক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১৫৩, হাদিস নং: ১৫১৩/৪।]
৫৫. আন নাওয়াবী, আল মাজমু' শারহুল মুহাযযাব, পূর্বোক্ত, খ. ৯, পৃ. ২৫৮
৫৬. আবু মুহাম্মাদ মুওয়াফফাকুদ্দীন আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল মাকদিসী হাম্বলী, আল মুগনী (মাকতাবাতুল কাহিরা, সংস্করণ বি., ১৯৬৮ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৫৭
৫৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ التِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ إِبْتِغَاءَ نَحْلٍ بَعْدَ أَنْ تُؤْبَرَ، فَتَمْرُثُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» [ইমাম বুখারি, আস সহিহ, পূর্বোক্ত, খ. ৩, পৃ. ৭৭, হাদিস নং: ২১৯৪।]
৫৮. ড. দাওসারী, আল মুমতি ফিল কাওয়াঈদ আল ফিকহিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৩৭
৫৯. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ ابْتِغَاءَ نَحْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤْبَرَ، فَتَمْرُثُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» [ইমাম বুখারি, আস সহিহ, পূর্বোক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১৫, হাদিস নং: ২৩৭৯।]
৬০. ইবনে কুদামাহ, আল মুগনী, পূর্বোক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬৩
৬১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْخَبْلَةِ، وَكَانَ إِبْتِغَاءَ يَنْبِغُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الْبَيْتُ فِي بَطْنِهَا» [ইমাম বুখারি, আস সহিহ, পূর্বোক্ত, খ. ৩, পৃ. ৭০, হাদিস নং: ২১৪৩।]
৬২. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى يُنْصَعَ» [ইমাম ইবনে মাজাহ, আস সুনান, পূর্বোক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৪০, হাদিস নং: ২১৯৬।]
৬৩. [আহমাদ ইবনুল হুসাইন বিন আলী বিন মুসা আল খুসারাওজিরদী আল খুরাসানী আবু বকর আল-বায়হাকী, বিশ্লেষণ: আব্দুল মু'তী আমীন ক্বলআজী, আস সুনানুস সগীর (পাকিস্তান: জামেআতুত দিরাসাতিল ইসলামীয়া, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৯ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৭১, হাদিস নং: ১৯৬৭।]
৬৪. আল মাউসুআহ আল ফিকাহিয়া আল কুয়াইতিয়া, খ. ৩১, পৃ: ১৫২
৬৫. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ، وَلَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ، وَلَا لَبْنٍ فِي صَرْعٍ» [সুলাইমান বিন আহমাদ বিন আইয়ুব বিন মুতাইর আল লাখমী আশ শামী আবুল কাসিম আত তবারনী, বিশ্লেষণ: হামদী বিন আব্দুল মাজীদ আস সালাফী, আল মুজামুল কাবীর (কায়রো: মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়া, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১১, পৃ. ৩৩৮, হাদিস নং: ১১৯৩৫।]

৬৬. আন নাওয়াবী, আল মাজমু' শারহুল মুহাযযাব, পূর্বোক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩২৬
৬৭. আল-মাদুসুআহ আল ফিকহিয়া আল-কুয়াইতিয়া, খ. ৩১, পৃ: ১৫৪
৬৮. আবুল আক্বাস আল করাফী, আনওয়াক্বল বুরূক ফি আনওয়াইল ফুরূক, পূর্বোক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫১
৬৯. عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ وَفْدٌ هَوَازَنٌ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّا أَصْلٌ وَعَشِيرَةٌ، وَقَدْ نَزَلَ بَنَّا مِنَ الْبِلَاءِ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ، فَاثْمُنْ عَلَيْنَا مِنَ اللَّهِ عَلَيْكَ، فَقَالَ: «اخْتَارُوا مِنْ أَمْوَالِكُمْ أَوْ مِنْ نِسَائِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ»، فَقَالُوا: قَدْ خَيْرْتَنَا بَيْنَ أَحْسَابِنَا وَأَمْوَالِنَا بَلْ لَخْتَارُ نِسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ» আব্দুর রহমান আহমাদ বিন শুআইব আন নাসায়ি, আস সুনান (হালব : মাকতাবাতু মাতবাতু আল ইসলামিয়াহ, ১৪০৬ হি.), খ. ৬, পৃ. ২৬২, হাদিস নং : ৩৬৮৮।]
৭০. ইবনু উছাইমীন, মুহাম্মাদ বিন ছলেহ, আশ শারহুল মুমতি' দারু ইবনুল জাওবী, ১ম সংস্করণ, ১৪২২-১৪২৮ হি.), খ. ৮, পৃ. ১৫৯
৭১. ড. ছলেহ বিন ফাওয়ান আল ফাওয়ান, মিন ফিকহিল মুআমালাত (রিয়াদ: দারু কুনুযি ইশবিলিয়া, ২য় সংস্করণ, ২০১১ খ্রি.) পৃ. ৪০
৭২. ড. ছলেহ বিন ফাওয়ান আল ফাওয়ান, মিন ফিকহিল মুআমালাত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০
৭৩. ইবনু উছাইমীন, আশ-শারহুল মুমতি', পূর্বোক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৫৯
৭৪. ড. ছলেহ বিন ফাওয়ান আল ফাওয়ান, মিন ফিকহিল মুআমালাত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০
৭৫. ইবনু রুশদ আল হাফীদ, বেদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নেহায়াতুল মুকতাহিদ, পূর্বোক্ত, খ. ৩, পৃ. ১২০০
৭৬. ড. ছলেহ বিন ফাওয়ান আল ফাওয়ান, মিন ফিকহিল মুআমালাত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০
৭৭. ইবনু উছাইমীন, আশ শারহুল মুমতি', পূর্বোক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৫৯
৭৮. ইবনু উছাইমীন, আশ শারহুল মুমতি', পূর্বোক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৬০
৭৯. ড. ছলেহ বিন ফাওয়ান আল ফাওয়ান, মিন ফিকহিল মুআমালাত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২
৮০. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحَصِينِ أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِ الْمَاشِيَةِ قَبْلَ أَنْ تَحْلَبَ، وَعَنْ بَيْعِ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ الْأَنْعَامِ، وَعَنْ بَيْعِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ، وَعَنْ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبْلِ الْحَبْلَةِ» [ইমাম আইনী, উমদাতুল ক্বারী শারহে সহীছুল বুখারী, পূর্বোক্ত, খ. ১১, পৃ. ২৬৪।]
৮১. عَنْ إِمَامِ مُسْلِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ». [আস সহিহ, পূর্বোক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১৯৭, হাদিস নং : ১৫৬৫/৩৫।]
৮২. ড. ছলেহ বিন ফাওয়ান আল ফাওয়ান, মিন ফিকহিল মুআমালাত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১
৮৩. عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» [ইমাম আহমাদ, মুসানাদে আহমাদ, প্রণুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৯০, হাদিস নং: ৬৬২৮।]
৮৪. ইবনু রুশদ আল হাফীদ, বেদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নেহায়াতুল মুকতাহিদ, পূর্বোক্ত, খ. ৩, পৃ. ১২০৭-১২০৮
৮৫. ইবনু রুশদ আল হাফীদ, বেদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নেহায়াতুল মুকতাহিদ, পূর্বোক্ত, খ. ৩, পৃ. ১২০৮
৮৬. ইবনু রুশদ আল হাফীদ, বেদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নেহায়াতুল মুকতাহিদ, পূর্বোক্ত, খ. ৩, পৃ. ১২০৮
৮৭. ইবনু রুশদ আল হাফীদ, বেদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নেহায়াতুল মুকতাহিদ, পূর্বোক্ত, খ. ৩, পৃ. ১২০৮

৮৮. ইবনু রুশদ আল হাফীদ, বেদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নেহায়াতুল মুকতাছিদ, পূর্বোক্ত, খ. ৩, পৃ. ১২০৯

৮৯. ইবনু রুশদ আল হাফীদ, বেদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নেহায়াতুল মুকতাছিদ, পূর্বোক্ত, খ. ৩, পৃ. ১২১১

জমা প্রদানের তারিখ : ৩১.০৮.২০২৩

গৃহীত হবার তারিখ : ২৯.১১.২০২৩

পূর্ববাংলার ভূ-রাজনৈতিক ইতিহাস ও স্বাধিকার আন্দোলন: একটি কালো মেয়ের কথা

মোঃ আসাদুল্লাহিল গালিব*

Abstract

The economic, social and political reality after the partition of 1947 is marked as a very important issue in the history of Bangladesh. Tarashankar Bandyopadhyay's famous work of Bengali literature, *Ekti Kalo Mayer Katha* is an important novel written on the political history of East Bengal. In this article, I want to discuss the geo-political history of East Bengal and the Independence Movement in this novel. In particular, my discussion will include the history of economic, social and cultural discrimination against West Pakistani in East Bengal. Historical, descriptive, and analytical research methods have been used in writing this essay.

চাবিশব্দ: দ্বিজাতি, দেশভাগ, স্বাধিকার, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধ

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের বাঁক-বদলের যাত্রাপথে তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) সৃষ্টি-বৈভবে সমাজ ও সংস্কৃতির পাশাপাশি দেশ-কালের ইতিহাসকেও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। আমরা দেখি আয়ুষ্কালের শেষ রেখায় পৌঁছেও তাঁর সৃষ্টিশীল মনন সমাজ ও ইতিহাস চিহ্নায়নে সক্রিয় ছিল। তারশঙ্করের সর্বশেষ রচনা হচ্ছে দুটি উপন্যাসের সমষ্টি, নাম ‘১৯৭১’ (১৩৭৮বঙ্গাব্দ)-এর প্রথম উপন্যাসটি হচ্ছে *একটি কালো মেয়ের কথা* এবং দ্বিতীয়টি *সুতপার তপস্যা*। দু’টি উপন্যাসেই একাত্তর সালের আগে-পরে রাজনৈতিক কবলিত উভয় বাংলার জীবন্ত চিত্র স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, ‘১৯৭১’ শীর্ষক গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত *একটি কালো মেয়ের কথা* উপন্যাসটি বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসেবে যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করে। বিশেষত এটি মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবর্তকে উপলক্ষ্য করে লেখা প্রথম উপন্যাস হওয়ায় বাংলাদেশের স্বাধিকার আদায়ের ইতিহাস বিশ্লেষণে এর প্রাসঙ্গিকতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অসংখ্য উপন্যাস লিখিত হলেও, কালের বিচারে *একটি কালো মেয়ের কথা*র ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রচিত এ উপন্যাসের বিষয়ভাবনা ও চরিত্রায়নের মধ্য দিয়ে তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যে ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম তুলে ধরেছেন, তা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অন্যান্য উপন্যাস থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র। ফলে বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে এ উপন্যাসটি আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রে অবস্থান করে।

১৯৪৭ এর দেশভাগকে পূর্ব বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম একটি আলোচিত ঘটনা হিসেবে ইতিহাসে স্থান পেলেও, এই নতুন দেশ প্রাপ্তি পূর্ব বাংলার জনগণের জন্য সুখকর হয়নি।

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

কেননা কেবল ধর্মের ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব বাংলার একত্রে থাকার বিষয়টি এ অঞ্চলের জনগণের জন্য কল্যাণকর ছিল না। বিশেষত ভাষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানিদের থেকে বাঙালিদের যে স্বকীয়তা, তা ছিল হাজার বছর ধরে চর্চিত ও বিকশিত। কিন্তু দেশভাগের পর থেকেই এদেশের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকবর্গ কর্তৃক গুরুতর আঘাতের পাশাপাশি নানাবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য এ অঞ্চলের মানুষকে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি বিমুখ করে তোলে। ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ শীঘ্রই একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকে। এই প্রয়োজন থেকেই পূর্ব বাংলার জনগণ স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এবং দীর্ঘ লড়াই ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে তারা কাক্ষিত স্বাধিকার অর্জনে সমর্থ হয়। একজন সংবেদনশীল কথাসাহিত্যিক হিসেবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব বাংলার এই রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তকে গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন। তাঁর সেই অনুধাবনেরই শ্রেষ্ঠ প্রকাশ একটি কালো মেয়ের কথা উপন্যাস। একজন ইতিহাস অন্বেষী কথাসাহিত্যিক হিসেবে এ উপন্যাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব বাংলার ভূরাজনৈতিক ইতিহাস ও স্বাধিকার আন্দোলন নিয়ে যে অভিজ্ঞতা ও আত্মপোলক্লির পরিচয় দিয়েছেন— তা বর্ণন ও বিশ্লেষণই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

১.১ তারাশঙ্করের একটি কালো মেয়ের কথা ছাড়াও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকার নিয়ে প্রাথমিক পর্বে যে সকল উপন্যাস রচিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো— আনোয়ার পাশার (১৯২৮-১৯৭১) *রাইফেল রোটি আওরাত* (১৯৭৩), শওকত ওসমানের (১৯১৭-১৯৯৮) *জাহান্নাম হইতে বিদায়* (১৯৭১), নেকড়ে অরণ্য (১৯৭৩), দুই সৈনিক (১৯৭৩), শওকত আলীর (১৯৩৬-২০১৮) *যাত্রা* (১৯৭৬), সৈয়দ শামসুল হকের (১৯৩৫-২০১৬) *নীল দংশন* (১৯৮১), নিষিদ্ধ লোবান (১৯৮১), রশীদ হায়দারের (১৯৪১-২০২০) *খাঁচায়* (১৯৭৫), অন্ধ কথামালা (১৯৮১), নষ্ট জোছনা এ কোন অরণ্য (১৯৮২), সেলিনা হোসেনের (১৯৪৭-) *হাঙর নদী ছেনেড* (১৯৭৬), মাহমুদুল হকের (১৯৪০-২০০৮) *জীবন আমার বোন* (১৯৭৬), রশীদ করীমের (১৯২৫-২০১১) *আমার যত গ্লানি* (১৯৭৩), রাবেয়া খাতুনের (১৯৩৫-২০২১) *ফেরারী সূর্য* (১৯৭৪), আমজাদ হোসেনের (১৯৪২-২০১৮) *অবেলায় অসময়* (১৯৭৫), হুমায়ূন আহমেদের (১৯৪৮-২০১২) *শ্যামল ছায়া* (১৯৭৪), *নির্বাসন* (১৯৭৪), *আগুনের পরশমনি* (১৯৮৬) ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, এসকল উপন্যাসের বেশির ভাগই ছিল স্মৃতি ও শ্রুতি নির্ভর, যেখানে যুদ্ধোত্তর হতাশা এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কষ্টই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। সেই অর্থে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ উত্তাপের স্পর্শ এ পর্যায়ের উপন্যাসগুলোতে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ “শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়-আশায় আবিষ্কারের তাড়নায় উপন্যাস বেশি লেখা হয়নি। ...এসব উপন্যাস নৈর্ব্যক্তিকতা ও জাগর উৎপ্রেক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনসঞ্চারী বলে প্রতীয়মান হয়নি সর্বত্র। খণ্ডিতভাবে প্রথামাফিক প্রয়োজনে যুদ্ধের আটপৌরে ঘটনা বিধৃত হয়েছে; তাতে সংশ্লেষ কম, তীব্রতার প্রজ্জ্বলন নেই।”^২

এসবের বিপরীতে মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতির স্বাক্ষরবাহী উপন্যাস হিসেবে একটি *কালো মেয়ের কথা* উপযোগিতা অনন্য ও অসাধারণ। গবেষণার ঐতিহাসিক, বর্ণনাত্মক ও পাঠ-বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করে আলোচ্য উপন্যাসটির এই স্বকীয়তা ও অসাধারণত্ব আবিষ্কার করার চেষ্টা করা হয়েছে।

১.২ সাতচল্লিশ পরবর্তী পূর্ব বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক বাস্তবতার অন্যতম স্মারক হিসেবে *একটি কালো মেয়ের কথা*কে বহুবিধ কারণে ঐতিহাসিক টেক্সট হিসেবেও বিবেচনা করা যায়। একটি উপন্যাসকে ঐতিহাসিক টেক্সট হিসেবে তখন গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় যখন তা লেখকের মৌলিক সৃষ্টিকর্মকে ছাড়িয়ে ঐতিহাসিক দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই বৈশিষ্ট্যকে সামনে রেখে বিখ্যাত সাহিত্যিকদের দিকে তাকালে আমরা দেখি—

উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস ব্যাখ্যায় ডিকেন্স, থ্যাকারে ও শার্লট ব্রন্টের উপন্যাস মালাকে কার্ল মার্কসও বিশেষ মূল্যবান মনে করতেন এ কারণে যে, সম-সাময়িককালের রাজনীতিবিদ, ইতিহাসবিদ ও নৃতাত্ত্বিকদের রচনাতেও যেসব সামাজিক ও রাজনৈতিক সত্যের প্রকাশ ঘটেছিল, ঐ উপন্যাসিকবৃন্দ সেসব সত্যেরই উন্মোচন ঘটাতে পেরেছেন। ... বালজাক, ডিকেন্স, থ্যাকারে, শার্লট ব্রন্ট প্রমুখ উপন্যাসিক সমাজের বাস্তব তথ্যকে যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি দৃষ্টিক্ষেপ করেছেন বাস্তবের পটভূমিতে বিচরণকারী মানুষের অন্তর্লোকে। আর তাতেই তাঁরা ইতিহাস রচনা করতে না চেয়েও ইতিহাসকে অন্তর্গতভাবে তুলে ধরেছেন। °

উপর্যুক্ত বক্তব্যে এই যে, তাঁরা ইতিহাস রচনা করতে না চেয়েও ইতিহাসকে অন্তর্গতভাবে তুলে ধরেছেন— এই চেতনালোক তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যেও পরিলক্ষিত হয়। ফলত দেখা যায় ইতিহাস অবশ্যকালে তারাশঙ্কর তাঁর সৃষ্টিকর্মে সচেতনভাবেই প্রয়োগ করেছেন, যা *একটি কালো মেয়ের কথা*র অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। তারাশঙ্করের জীবনান্ভিজতা ও অভিজ্ঞান পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি— দেশ ও সমাজ সম্পর্কে সচেতনতা তাঁর জীবনে কতগুলি বিশিষ্ট ভাবধারার ভিত্তি রচনা করেছিল। ফলে তিনি উপন্যাস লিখেছেন ঠিকই কিন্তু ইতিহাসবিদ হিসেবে যে সকল দায় এবং দায়িত্ব অনুভব করতেন, তার যথাযথ মূল্যায়নে ছিলেন সত্যনিষ্ঠ ও যৌক্তিক। এ কারণে *একটি কালো মেয়ের কথা* নিছক মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা বিবৃতির আখ্যান নয়, বরং ঐতিহাসিক ঘটনার দলিল হিসেবেও গুরুত্ব লাভ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনাপর্ব এ উপন্যাসের কেন্দ্রে অবস্থান করলেও, ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস এই টেক্সটে নানা অনুসঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি ১৯৪৭-এ উপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটলে— ব্রিটিশ-রাজ বিদায় নিলে, ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের পত্তন ঘটে। এখন যে ভূখণ্ডের নাম বাংলাদেশ, তখন তার পরিচয় ঘটে পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে।

তবে দেশভাগের ফলে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হওয়া কোনো আকস্মিক প্রাপ্তির বিষয় নয়। ব্রিটিশদের রাজত্বকালে প্রায় দুইশত বছর ধরে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে যে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়েছিল তার স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। বলা যেতে পারে বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে বৃহত্তর ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ চরম আকার ধারণ করেছিল, যার পরিণতিতে দেখি ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাস। প্রত্যাশা ছিল ব্রিটিশ ভারতকে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিভক্ত করে যদি দুটো পৃথক রাষ্ট্রে স্বাধীনতা দেওয়া যায় তাহলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে উপমহাদেশের সংখ্যালঘু ও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয়নি, বরং বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঐতিহাসিক সেই ঘূর্ণাবর্তের বাড়বাড়ী, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, ও জাতিগত দ্বন্দ্ব পেরিয়ে পাকিস্তান প্রাপ্তি পূর্ববাংলার জন্য শেষতক সুখকর হয়নি বরং জন্ম হয়েছিল স্থায়ী বিষবৃক্ষের। আমরা দেখি—

প্রাক ১৯৪৭-এর বিভাগ-পূর্ব ভারতে যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল সেটা সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে হয়ে পড়েছিল বিকৃত। পাকিস্তান ছিল সাম্প্রদায়িক মুসলিম জাতীয়তাবাদের অপসৃষ্টি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পরপরই এর অন্তর্নিহিত স্ববিরোধিতা ও দুর্বলতা প্রকাশ পেতে শুরু করে। এক অদ্ভুত রাষ্ট্রকাঠামো, যার দুটো অংশ প্রায় বারশ মাইলের ভারতীয় ভূখণ্ড দ্বারা বিচ্ছিন্ন; তাকে কেবলমাত্র ইসলামী ধর্মীয় অনুভূতি দিয়ে বেশিদিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না।^৪

সে কারণে ধর্ম তথা দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে এই নতুন দেশ প্রাপ্তি, সেটি যে কত বড় ভুল এবং ভ্রান্তির বিষয় ছিল তা প্রমাণিত হয় বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। কাজেই মুসলমানিত্বের মোহ গায়ে মেখে পাকিস্তান নামে যে নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলো সেটি পূর্ব বাংলার জনগণের জন্য উপযুক্ত ছিল না। *একটি কালো মেয়ের কথা* উপন্যাসে এই ধর্মভিত্তিক দেশভাগের নিষ্ফলা প্রাপ্তি গুরুত্বের সঙ্গে চিহ্নিত হয়েছে। দেখা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে পূর্ব বাংলার মানুষের বিচ্ছিন্নতার বিষয়টি দেশভাগের পরপরই আভাসিত হতে থাকে। আমরা আগেই বলেছি দেশভাগ তথা পাকিস্তান সৃষ্টি কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। বরং ইতিহাসের অমোঘ পথ ধরেই জন্ম হয়েছিল পাকিস্তানের। কিন্তু কেন পূর্ব বঙ্গের বাঙালি মুসলমানগণ পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে সমর্থন দিয়েছিল এই জিজ্ঞাস্যের ও রয়েছে নানামাত্রিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ। কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে, কী কারণে পূর্ব বাংলার মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে একত্রে একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিল *একটি কালো মেয়ের কথা* তে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ঐতিহাসিক ঘটনার মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গগুলোও আবিষ্কার করতে সচেষ্ট থেকেছেন। ইতিহাসের এ পর্যায়ের প্রসঙ্গগুলো তুলে ধরার ক্ষেত্রে আলোচ্য উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র হাজী আব্বাসের স্মৃতিচারণ, তাঁর মনোভাবনা এবং পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিবৃত্তটুকু গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

১.৩ পূর্ব বাংলার মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল একটি পৃথক, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভূমি প্রাপ্তির। বিশেষত ব্রিটিশ রাজের শাসন শুরু হওয়ার পরপরই এ অংশের মানুষদের এই ইচ্ছাটুকু বেগবান হতে থাকে। পূর্ব বাংলার জনগণের এই ইচ্ছার ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল জমিদারদের শাসন-শোষণ, যাদের অধিকাংশেরই অবস্থান সবসময়ের জন্য ছিল কলকাতায়, ব্রিটিশরাজের এই বঙ্গের প্রতি অবহেলা, ব্রিটিশ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলগুলো থেকে অপেক্ষাকৃতভাবে অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা ইত্যাদি। আর তাই জমিদারতন্ত্র ও কলকাতাকেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণ এবং ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ এবং ১৯১১-এর বঙ্গভঙ্গ-রদের ইতিহাস পেরিয়ে, এ অঞ্চলের মানুষদের পৃথক আবাসভূমির বিষয়টি স্পষ্ট হতে থাকে। এমনতর নানাবিধ কারণে এ অংশের বাঙালি মুসলমানগণ পাকিস্তান আন্দোলনকে নির্দিষ্ট সমর্থন করেছিল। এই পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থনে যে মনস্তত্ত্বটি বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল ছিল তার স্পষ্ট পরিচয় মেলে আলোচ্য উপন্যাসের হাজী আব্বাস চরিত্রের মধ্যদিয়ে। দেশভাগ ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সাক্ষী হিসেবে এই হাজী আব্বাস আলোচ্য উপন্যাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়। পাকিস্তান আন্দোলন নিয়ে কথা বলার সময় হাজী আব্বাসের খেদোক্তি উচ্চারিত হয় এভাবে- “আমি তো পাকিস্তানের জন্য কম লড়াই করিনি। কম ক্ষেপিনি। সূতীর ঘোষ কায়স্থদের সঙ্গে আট পুরুষ আগের সেই ঝগড়াটা কি করে যে ১৯৪৭ সালের দাঙ্গার সময় দ্বিগুণ চারগুণ বেশি জোরে জ্বলে উঠল সে হিসেব আজও করে কূলকিনারা পাইনে তবে জ্বলে উঠেছিল।”^৫ এভাবে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে হিন্দুদের আধিপত্য-কেন্দ্রিক বিস্তার, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নিজস্ব সম্পদ ও ভূখণ্ডের আগ্রহ মূলমানদের পাকিস্তান আন্দোলনে সমর্থন জুগিয়েছিল। তবে শর্তজুড়ে দিয়ে কাঁটাতারের দেয়াল নির্মাণ করে কোনো অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ হয়তো মানচিত্রে

নতুন কোনো অবয়ব নির্ধারণ করে, কিন্তু সেই সব অঞ্চলের জনমানসের ভাষা, সংস্কৃতি, আবেগ ও সামাজিকতা ভিন্নতর দাবি প্রত্যাশা করে। ফলে অচিরেই পূর্ব বঙ্গের বাঙালি মুসলমানদের মোহভঙ্গ হতে থাকে। এক হতবিস্মল অবস্থার মধ্যে পতিত হয় এ অঞ্চলের মানুষ। নিদারুণ বেদনা ও স্বপ্নভঙ্গে তারা হতাশ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে এই হতাশার অন্যতম অনুঘটক হিসেবে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈরীনীতি। কেননা দেশভাগের পরপরই পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানিদের ভিন্ন রকম মনোভঙ্গি প্রকাশ পেতে থাকে। আলোচ্য উপন্যাসে পশ্চিম পাকিস্তানিদের এ মনস্তত্ত্ব তারাক্ষর নির্মোহভাবে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে আমরা দেখি পশ্চিম পাকিস্তানের লোভী ও আত্ম-সর্বস্ব শ্রেণিচরিত্রের প্রতিনিধিত্বকারী জাফরুল্লাহ খাঁ পূর্ব বাংলা সম্পর্কে তার অভিমত ব্যক্ত করছে এভাবে— “বহুত আরামের দেশ। বহুত মজা লুটবার দেশ। ...তকদীর খুলে যাবে, নসীব খুলে যাবে। পয়সা ওদেশে আছে।”^৬ একজন পশ্চিম পাকিস্তানির এ সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ববাংলা পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্য ছিল অর্থপ্রাপ্তির জায়গা, ফলে এই উপলব্ধি পূর্ব বাংলার মানুষদের যতটা হতাশ করেছিল, ঠিক ততটাই দৃঢ় প্রত্যয়ী করেছিল নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য— যার সর্বাত্মক অর্জনের নাম স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ।

২.১ একটি কালো মেয়ের কথা উপন্যাসে তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশ সৃষ্টির পশ্চাতে রাজনৈতিক বাস্তবতার পাশাপাশি এর ভৌগোলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণগুলোকেও গুরুত্বের সঙ্গে চিহ্নিত করেছেন। এ উপকরণগুলো পরবর্তী কালে কীভাবে আন্দোলন-সংগ্রামে প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে তা ঐতিহাসিক-বীক্ষণ সমেত উপস্থাপিত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে। এক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টিশীলসত্তা ও ইতিহাস-সংশ্লিষ্ট মনন যুগপৎ ক্রিয়াশীল থেকেছে। এ উপন্যাসে তিনি আখ্যানের আলোকে ইতিহাসকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে চরিত্রায়ন কৌশলকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন। ইতিহাসকে তুলে আনার ক্ষেত্রে এ উপন্যাসের মনসুর বা ডেভিড চরিত্রটি ঔপন্যাসিকের মুখপাত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। লেখক সূত্রধার হিসেবেও মাঝে মাঝে এ চরিত্রটিকে ব্যবহার করেছেন। মূলত মনসুর চরিত্রটির স্মৃতিচারণ ও বয়ানের মধ্য দিয়েই একটি কালো মেয়ের কথা উপন্যাসের মূল ঘটনাক্রম বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসে মনসুর হিন্দু, খ্রিষ্টান কিংবা মুসলমান হিসেবে নয় বরং মানুষ হিসেবে মানবিকতার ধ্বজা বহন করে। উপন্যাসের প্রবেশমুখেই মনসুর চরিত্রটির সঙ্গে পাঠকের পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটে। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় আশ্রয় নেয়ার সময় মনসুরকে কলকাতা পুলিশ কর্তৃক আটক হতে দেখা যায়। মূলত কলকাতা পুলিশের সঙ্গে কথোপকথনের সূত্রে মনসুরের বয়ান ও তার স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে আলোচ্য উপন্যাসের মূল ঘটনাক্রম উপস্থাপিত হয়। উল্লেখ্য যে, মনসুরের বক্তব্য ও অবলোকনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পশ্চিম পাকিস্তানে দীর্ঘদিন থাকার পর ভাগ্যের খোঁজে পূর্ববঙ্গে এসে এ অঞ্চলের মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে মনসুরের অভিমতসমূহ গুরুত্বের দাবি রাখে। এ দেশ সম্পর্কে মনসুরের নিম্নোক্ত অভিমতটুকু বেশ তাৎপর্যবাহী। কলকাতায় তার স্মৃতিচারণে সে জানাচ্ছে—

দেশটা বড্ড আপন মনে হয়েছিল। শান্তিশিষ্ট রোগা মাথায় খাটো মানুষগুলি; দেখতে বেশ একটু কালোই ; কিন্তু তবু কি সুন্দর! যারা লেখাপড়া শিখছে তারা ইম্পাতের ছুরির মতো ধারালো ঝকঝকে শানানো। সাধারণ মানুষেরা আরও আশ্চর্য। মাঝিমাঝি, চাষা-ভূষা, কামার-ছুতার—এরা ওই গাছের মত। তলায় ছায়া মেলে থাকে— ডালে ফুল ধরায়। ঝড়ে তুফানে ওদের বিক্রম দেখা যায়। ওরা সেকি লড়াই-ই করে।^৭

আসলে মনসুর চরিত্রটির এই দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ববাংলা সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র ধারণাকে স্পষ্ট করে, যা প্রতীকী তাৎপর্যমণ্ডিত। এই অঞ্চলের মানুষের ভাব-ভাষা-সংস্কৃতি, তাদের সাহচর্য, সুমিষ্ট মনোভাব, বন্ধুবৎসল আচরণ, সর্বোপরি এই অঞ্চলের মানুষের অঙ্কুরিত সারল্য যেমন অনেকের হাজার বছরের পথ হাঁটার ক্লান্তি মুছে দেয়, তেমনি এ অঞ্চলের মানুষের লড়াই করার মনোবৃত্তি তাদের স্বাধীনচেতা বৈশিষ্ট্যকে প্রতীকায়িত করে। পূর্ব বাংলার মানুষের এই বৈশিষ্ট্যই তাদের স্বাধিকার আদায়ের আয়ুধ হিসেবে কাজ করে।

২.২ এ উপন্যাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির বিশাল অর্জনকে সত্যনিষ্ঠভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই বিষয়টির ঐতিহাসিক সূত্র তুলে ধরার ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সাতচল্লিশ পরবর্তী বাস্তবতায় ভারত ও পাকিস্তান নামে যে ভূখণ্ডের প্রাপ্তিযোগ ঘটছে তার স্থানিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তুলনা প্রতিতুলনাও দেখিয়েছেন। দেশভাগের পর সৃষ্ট নতুন দেশ পাকিস্তান সম্পর্কে তারাশঙ্কর জানাচ্ছেন—

পাকিস্তান নতুন স্বাধীন দেশ। দুনিয়ায় তার খাতির অনেক। কায়েদে আজম জিন্না সাহেবের নামে সারা দুনিয়া টুপি খুলে মাথা নোয়ায়। ... সব দেশই তাকে টাকা যোগাচ্ছে— গম যোগাচ্ছে— কলকারখানার সরঞ্জাম যোগাচ্ছে— লড়াইয়ের সরঞ্জাম যোগাচ্ছে। গরীব একটা দেশ, তাকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। নয়া জমানা— নয়া জিন্দগী— নয়া মুক্ত। পাকিস্তান। বড় বড় শহর কিছুটা ভেঙেচুরে কিছুটা— পুরনো শহরের পাশে নতুন করে আরও বড় modern শহর তৈরি হচ্ছে। দশ-বিশতলা মোকাম। বড় বড় এরোডোম। বছরে বছরে নতুন কিসিমের হাওয়াই জাহাজ এসে নামছে এরোডোমে। কলকারখানা বসছে। পাটের কল— লোহার কারখানা—...মালিক সব খান সাহেবেরা, নবাবজাদা—পীরজাদা—জায়গীরদারেরা।^৮

উপন্যাসের এ বর্ণন থেকে দেশভাগ পরবর্তী পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের হাল হকিকত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব বাংলার জনগণকে নিদারুণভাবে ঠকাচ্ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিরা। অথচ পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে বাঙালি মুসলমানদের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির কিছুদিনের মধ্যেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গের জনগণ হতাশ হতে শুরু করে। তারা অচিরেই বুঝতে পারে পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর যাদের অধিকাংশই পশ্চিম পাকিস্তানি, তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের অবাধ শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। সেইসাথে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানীদের হীন মনোবৃত্তি এদেশের মানুষকে হতাশ ও ক্রুদ্ধ করে তুলতে থাকে। বিশেষত বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে বাঙালিদের ওপর জোর করে উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেয়ার চক্রান্তকে তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। সেক্ষেত্রে দেখা গেছে—“সরকার বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতিকে যতই নিজেদের পছন্দসই পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করেছে, সেটাকে ব্যর্থ করে দিয়ে বাঙালিদের চেতনা ততই প্রবল হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে, সর্বত্র।”^৯ ঠিক তখন থেকে শুরু হয় বাঙালি মুসলমানদের মোহমুক্তির পালা, বদরুদ্দীন উমর যাকে “বাঙালি মুসলমানদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন”— হিসেবে অভিহিত করেছেন। আলোচ্য উপন্যাসে পূর্ব বাংলার এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পরিচয় পাওয়া যায় মনসুর চরিত্রটির ঢাকায় অবস্থানের স্মৃতিচারণের সূত্রে।

৩.১ বাংলাদেশের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আদায়ের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের যে ভূমিকা তা নিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ অবলোকন ছিল। তাই আলোচ্য উপন্যাসে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ইতিহাসটিও গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, পূর্ব বাংলার স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগ্রামের নেতৃত্বে ছিল আওয়ামীলীগ। বাংলাদেশ সৃষ্টির ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক সত্য হলো- বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক স্বাধিকার আন্দোলন এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল এক। এ উপন্যাসে কথক মনসুরের স্ত্রী ছায়ার ব্যক্তিজীবনের সংশ্লেষে পূর্ব বাংলার এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পরিচয় পাওয়া যায়। ঢাকায় অবস্থান কালে মনসুর ও ছায়ার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সূত্রে এ দেশের সাংস্কৃতিক কর্মী, সাংবাদিক, ছাত্র-শিক্ষক থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী মহলের বিভিন্ন ঐতিহাসিক কর্মতৎপরতারও পরিচয় মেলে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়- সে সময় বিভিন্ন সংগঠন ও পত্রপত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলার মুক্তিকামী তরুণ ও বুদ্ধিজীবী লেখকশ্রেণি সংগঠিত হতে থাকে। আলোচ্য উপন্যাসে এই গোষ্ঠীর পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মনসুরের বয়ানে জানাচ্ছেন-

যেসব বাঙালি মুসলমান লেখকেরা East Pakistan-এ বাংলাদেশ নয়। জামান গড়ার স্বপ্ন দেখত দিগন্ত কাগজখানাছিল তাদের। Young men of East Pakistan- তাদের নতুন স্বপ্ন নতুন বিশ্বাস নতুন মন। ... কি হিন্দু কি কৃষ্ণ এ নিয়ে ক্ষেপে ওঠে না। বলতে পারেন এই আওয়ামী লীগওয়ালাদের দলকেউ লেখে কেউ ছবি আঁকে, কেউ কলেজে পড়ায় কেউ স্কুলে...এদের মধ্যে গানের দল আছে ড্রামা পার্টি আছে। এরা সব আশ্চর্য মানুষ।^{১০}

উপন্যাসে বর্ণিত এই লোকগুলোই ছিল বাংলাদেশের মুক্তিকামী শিক্ষিত শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্র। এই তরুণ-যুবসমাজ ও সচেতন গোষ্ঠীরাই পরবর্তী কালে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে নিজেদের অধিকার আদায়ের প্রক্ষেপে যে আন্দোলনটি গড়ে উঠছিল, সেটার সঙ্গে একীভূত হয়ে যাচ্ছিল। বিশেষ করে-

সরকারি কাজকর্মে তাঁরা বাংলার প্রতি অবহেলা এবং উর্দুর প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার স্বাক্ষর দেখতে পাচ্ছিলেন। যেমন- মানি অর্ডার ফর্মে, ডাকটিকিটে, মুদ্রায়, এক কথায় সরকারি কাজে ইংরেজির সঙ্গে উর্দু ব্যবহৃত হচ্ছিল কিন্তু বাংলা নয়। তদুপরি আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব, বাংলা ভাষার মধ্যে অচেনা এবং অপ্রচলিত আরবি ফারসি শব্দের ব্যবহারএসবও তারা মেনে নিতে পারছিলেন না। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে তাঁরা অর্থনৈতিক সুবিধাও পাচ্ছিলেন না। এমন কি, পাকিস্তানের প্রশাসনেও তাঁদের বলতে গেলে কোনো বক্তব্য ছিল না। এসবই তাঁদের ক্ষুব্ধ করেছিলো।^{১১}

এমনতর অসন্তুষ্টি ও বঞ্চনার ফলে বাঙালি জনগোষ্ঠী ধীরে ধীরে তাদের অন্যান্য অধিকার সম্পর্কেও সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করে।

৩.২ অবশ্য ততদিনে বাংলাদেশের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি তথা সর্ব ক্ষেত্রেই পশ্চিম পাকিস্তানীরা ভয়ানক ঔপনিবেশিক আচরণ শুরু করে দেয়। এ কারণে দিনে দিনে পূর্ব বাংলার মানুষদের মধ্যে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিটি জোরালো হতে থাকে। ফলে তাদের মধ্যে নিজস্ব একটি অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা তীব্র আকার ধারণ করে। এই দাবিকে সামনে রেখে অচিরেই আমরা দেখতে পাই পুরাতন মুসলিম লীগ ভেঙ্গে ১৯৪৯ সালে

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হতে। অন্যদিকে ১৯৫৩ সালে ফজলুল হক তার পুরাতন কৃষক প্রজাপার্টিকে কৃষক-শ্রমিক পার্টি নাম দিয়ে পুনর্গঠন করেন। বামপন্থী রাজনীতি যারা করতেন তারা যুবলীগ এবং গণতন্ত্রী দল নামে দুটো দল গঠন করেন। এই সকল রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া। পরবর্তী কালে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের প্রাক্কালে এ কে ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে এ সকল রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে গঠন করে ঐতিহাসিক যুক্তফ্রন্ট। এবং সে সময়ে যে নির্বাচনটি হয়েছিল সেখানে তথাকথিত পুরাতন মুসলিম লীগ দলটি রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। এবং মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগ। ১৯৫৪এর পরবর্তী বাস্তবতায় পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বিশেষ করে— ষাটের দশকের শেষদিকে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে একের পর এক প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যেতে থাকে। তারমধ্যে উনসত্তর, সত্তর, একাত্তর এই তিনটি বছরই বাঙালির মহাজাগরণ আর মহা সংগ্রামের বছর হিসেবে পরিগণিত হয়।^{১২} বাঙালির মহা রণন ও মহা জাগরণের এই যাত্রায় আওয়ামী লীগের প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার কাণ্ডারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান আর সত্তরের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতি সাধারণ মানুষের যে আস্থা তৈরি হয়, সেটি ১৯৭১-এ এসে স্বাধীনতা প্রাপ্তির নিমিত্তে বিশাল এক আবেদন তৈরি করে।

৪.১ একটি কালো মেয়ের কথা উপন্যাসের দীর্ঘ আখ্যানের কেন্দ্রে রয়েছে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয় যে, পাকিস্তানের জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক কর্মপন্থার পক্ষে রয়েছে। সে কারণেই এ নির্বাচনে মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামের মতো সাম্প্রদায়িক ও ধর্মভিত্তিক দলগুলোর নিদারুণ পরাজয় ঘটে। এই নির্বাচনের ফলাফলের মধ্য দিয়েই পূর্ব বাংলার মানুষের স্বাধিকার ও স্বভূমির বিষয়টি আদায়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছায়। কিন্তু নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জিতলেও তাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে ইয়াহিয়া খান ও তার দোসররা কালক্ষেপণ করতে থাকে। ফলে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে এদেশের মানুষ সর্বাত্মক এক সিদ্ধান্তের জন্য বঙ্গবন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকে। সারা বাংলার মানুষের এই প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে। এ মাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যবাহী ঘটনা হলো বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে উন্মুক্ত জনতার সামনে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দেন— “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।” সে পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর এ ঘোষণা এবং এরসঙ্গে সারা বাংলার মানুষের একীভূত হওয়ার বিষয়টি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যবাহী ঘটনা। আলোচ্য উপন্যাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মনসুরের বয়ানে বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণা এবং এর প্রতিক্রিয়ার স্বরূপটি তুলে ধরেছেন এভাবে— “পাকিস্তান সরকার অচল হয়ে গেছে। চাকা ঘুরছে না। ব্যবসা বন্ধ, বাণিজ্য বন্ধ; সব থেকে আশ্চর্য লাগল হাই কোর্টের জজ প্রেসিডেন্টের হুকুম মানেনি। সারা পাকিস্তানের মানুষের জীবন চলছে কিন্তু সরকার অচল হয়ে গেছে।”^{১৩} এ বয়ান থেকে স্পষ্ট হয় যে, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে বিশাল এক উদ্দীপনার দ্যোতক, যা পরবর্তী কালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাঙালিদের সাহস ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। ৭ই মার্চের পর আমরা দেখি ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী

ভুটোর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার নামে অস্ত্র মজুদ করতে থাকে। ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামীলীগ নেতাদের সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চালাতে থাকেন; কিন্তু ভুটো সাহেব ও তার উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের মাটিতে বাঙালি জনগণের সমস্যাকে চিরদিনের মতো নিশ্চিহ্ন করা। তারা পাক সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করতে থাকেন বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার দূরভিসন্ধি নিয়ে। এভাবেই আলোচনার নামে কাল ক্ষেপণের মধ্য দিয়ে অবশেষে ২৫শে মার্চ সেই ভয়াল রাত্রির আগমন ঘটে। সে রাতে বিভীষিকার কালো থাবা মেলে বাঙালি নিধনে তৎপর হয়ে উঠেছিল পাক হানাদার বাহিনী। সেই বিপর্যয়ের আখ্যান নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের একজন বিখ্যাত গবেষক ও ইতিহাসবিদ মন্তব্য করেন— “১৯৭০এর শরতে বঙ্গোপসাগরের জলোচ্ছ্বাসে ভোলা-হাতিয়া-সন্দ্বীপসহ পূর্ব- বাংলায় যে বিপর্যয় ঘটে, তার চেয়ে মৃত্যু ও দুর্গতির ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে নয়, মানুষ যে মানুষের প্রতি কীরকম অমানুষিক অত্যাচার চালাতে পারে তার এই নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত; পশ্চিম-পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর দ্বারা বাঙালির ওপর চলে একটি সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।”^{১৪}

৪.২ একটি কালো মেয়ের কথা উপন্যাসে ২৫শে মার্চের এই ক্ষতকে স্পর্শ করার মধ্য দিয়ে তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় যে আখ্যানকে তুলে ধরেন, তাতে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার নেপথ্যের ট্রাজেডি এক বিশেষ ইতিহাস হিসেবে উপস্থাপিত হয়। এই উপন্যাসে লেখক পাকবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ এবং ২৫মার্চ পরবর্তী দিনগুলোতে পলায়নরত বাঙালির যে যন্ত্রণাদাহ তুলে ধরেন, তাতে ১৯৭১সালের ভীতসন্ত্রস্ত, বিপদগ্রস্ত, বিধ্বস্ত মানুষের অসহায়ত্ব এক ভিন্নতর বাস্তবতাকে স্পর্শ করে। কথক মনসুরের ব্যক্তিজীবনের সেই অভিজ্ঞতাই প্রকাশ পায় এ উপন্যাসে। ঢাকা থেকে পালিয়ে যাবার প্রাক্কালে নির্মম সেই হত্যাকাণ্ড এবং ধ্বংসলীলার চিত্র বর্ণিত হয় মনসুরের কণ্ঠে—

বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে বাইরে। রাস্তার উপরে এখানে ওখানে ডেড বডি পড়ে আছে।... ঠিক ছিল না কোথায় চলেছি। পুরনো পৃথিবী, শান্ত পৃথিবী, বিশ্বাসের পৃথিবী, নিরাপদ পৃথিবী যাকে জানতাম সে পৃথিবীই যেন হারিয়ে গেছে।... অসংখ্য লোক বেশিরভাগ গরিব আর মধ্যবিত্ত, এরা দলে দলে ঢাকা ছেড়ে পালাচ্ছে।... ঢাকায় আর কিছুর নেই, ইউনিভার্সিটি কামান মর্টার দেগে ভেঙ্গে দিয়েছে। প্রফেসরদের কোয়ার্টারে কোয়ার্টারে হানা দিয়ে টেনে বের করে এনে গুলি করে মেরেছে। গার্লস হোস্টেল থেকে মেয়েদের ট্রাকে তুলে নিয়ে এসে তাদের চরম লাঞ্ছনা করে শেষে গুলি করে মেরেছে। বাঙালী পুলিশ বাঙালী ই-পি-আরদের ব্যারাকে হানা দিয়ে নির্বিচারে গুলি করে মেরেছে।^{১৫}

এই বীভৎস বর্ণনে পাকবাহিনীর নারকীয় হত্যাযজ্ঞের যে চিত্র উঠে এসেছে, তা ইতিহাসে বিরল। সেদিনের সে বাস্তবতায় এ ভূখণ্ডের মানুষ চিরচেনা পৃথিবীটাকে যেন হারিয়ে ফেলেছিল। বাংলার মানুষদের সেদিন পাড়ি দিতে হয়েছিল এক দুর্বিষহ সময়। সাধারণ মানুষের সেই নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হওয়ার দৃশ্য বেদনাত্মক ও মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে। একান্তরের সেই দিনগুলোতে সমগ্র বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সর্বস্ব হারানোর বিষয়টিকে লেখক তাঁর সৃষ্ট নাজমা চরিত্রের ব্যক্তি জীবনের সংকটের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। জঙ্গম সেই সময়ের নাজমা সম্পর্কে মনসুর জানাচ্ছে— “সামনে দেখলাম আশ্চর্য কালো মেয়ে! আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে; নরুণে চেরা লম্বা দুটি চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে দরদর ধারায়; মাথার রুখু করকরে চুলগুলো বিশৃঙ্খল হয়ে ছড়িয়ে আছে; কোলে একটা ঘুমন্ত শিশু। আমার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে।”^{১৬} ক্রন্দনরত এই আশ্চর্য কালো মেয়ে নাজমার বেদনার আখ্যানের মধ্য দিয়েই

প্রতীকায়িত হয়ে ওঠে একাত্তরের গোটা বাংলার মুখ। মূলত এই ভাষ্যকে সামনে রেখেই আলোচ্য উপন্যাসের নামকরণ হয়েছে *একটি কালো মেয়ের কথা*; যেখানে নাজমা ও গোটা বাংলাদেশ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। মনসুরের সঙ্গে পলায়নরত নাজমা চরিত্রটিই একটি কালো মেয়ের রূপকে যুদ্ধবিদগ্ধ হতবিস্ত্রল বাংলাদেশকে রূপকায়িত করে।

৪.৩ উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাক্রম উপস্থাপনে মনসুরের পাশাপাশি নাজমা চরিত্রটি যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করে। ২৫শে মার্চের ভয়াল রাতে অন্যান্যর মতো নাজমারও জীবন এলোমেলো হয়ে যায়। যে বস্তিতে নাজমা ও তার স্বামী সংসার পেতেছিল, সেখানে পাকহানাদার বাহিনী আক্রমণ চালালে নাজমার স্বামী নিহত হয়। ছোট্ট শিশুকে বুকে জড়িয়ে নাজমা নদীর ধারে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করে। পরবর্তীকালে নাজমা সাহায্যের আশায় মনসুরের সামনে উপস্থিত হয়। সেই ভয়াল পরিস্থিতিতে মনসুর পূর্বপরিচিত নাজমাকে এড়িয়ে যেতে পারে না। আলোচ্য উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা বর্ণনায় লেখক যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়েছেন, সে যাত্রায় মনসুর এবং নাজমা একই পথের পথিক হয়ে ওঠে। উপন্যাসে ঢাকা শহরের বাইরের মার্চ পরবর্তী বাস্তবতা মনসুর ও নাজমার যাত্রাপথের দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে বর্ণিত হতে থাকে। পাকবাহিনী ঢাকা শহরের বাইরে অন্যান্য অঞ্চলে যে আক্রমণ, অত্যাচার ও নির্যাতন চালায়, তার জন্তব বর্ণন পাওয়া যায় তাদের যাত্রাপথে। ঢাকা থেকে পালিয়ে ভারতের বর্ডারের কাছাকাছি যাওয়ার পূর্বে আর সকলের মতো তাদেরও আশ্রয় নিতে হয় গ্রামে। গ্রামে মনসুর ও নাজমা যার আশ্রয়াধীন ছিলো তিনি হলেন হাজী আব্বাস। আলোচ্য উপন্যাসে হাজী আব্বাস যেমন দেশভাগের রাজনৈতিক বাস্তবতার সাক্ষ্য বহন করেন, তেমনি মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে একজন দেশপ্রেমিক মানুষ হিসেবেও তিনি অন্যান্যদের ভরসার জায়গা হয়ে ওঠেন। উপন্যাসে হাজী আব্বাসকে কেন্দ্র করেই মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আওয়ামী লীগের অবদান ও কার্যক্রম প্রতীকায়িত হয়েছে। লেখক হাজী আব্বাসের সূত্রে যেমন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির কথা তুলে ধরেছেন, তেমনি তিনি মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তির কথাও বিন্মৃত হননি। উপন্যাসে হাজী আব্বাসের পরিচিতজনের মধ্যে তাহের নামে একজনের পরিচয় পাওয়া যায়— যে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তির সমর্থক এবং রাজাকার আল-বদরদের সহায়তাকারী হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করে। আসলে উপন্যাসটিতে তারাশঙ্কর নিছক মুক্তিযুদ্ধের বিজয় গাথাকে বর্ণনা করতে চাননি বরং মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীশক্তির প্রতিভূ চরিত্র এ তাহের সম্পর্কে হাজী আব্বাসের জবানিতে লেখক জানাচ্ছেন— “দিনের আলোয় বুড়ো কেউটে খরিসের মত গর্তের মধ্যে এই লোকটা চুপ মেরে গুটিয়ে পড়েছিল। মানুষের হাঁকডাকে সাড়া দিয়ে সে গর্জাতেও সাহস করেনি। এবার রাত্রি নেমে এসেছে। এবার সে বেরিয়ে এসেছে গর্ত থেকে। এখন ফণা তুলে গর্জাতে শুরু করেছে।”^{১৭} মুক্তিযুদ্ধের সেই দহনকালে সারা বাংলার মানুষ যখন দিগবিদগ্ধ ছুটে বেড়াচ্ছিল তখন এ ভূমির পাকিস্তানপন্থী দোসররা এভাবেই দেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে জামাতপন্থীরা যে ভূমিকা পালন করেছিল আবু তাহেরের তাণ্ডবের মধ্য দিয়ে সেটাই উঠে এসেছে। এই তাহেরের সহায়তায় একরাতে হাজী আব্বাসদের গ্রামটাকে তিনদিক দিয়ে ঘিরে আক্রমণ চালায় পাক-হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা। পালিয়ে যাওয়ার সময় অন্যান্যের সঙ্গে ধৃত হয় নাজমা ও মনসুর। যে পাকিস্তানী খান সেনার নেতৃত্বে গ্রামে আক্রমণ চলে তার নাম জাফরুল্লাহ, পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানকালে যার সঙ্গে মনসুরের পরিচয় ঘটেছিল। ফলে ধৃত হওয়ার পরপরই মনসুর পূর্ব পরিচয়ের সূত্রে কিছুটা স্বস্তি পেলেও, পূর্ব বাংলা এবং এদেশের মানুষ সম্পর্কে জাফরুল্লাহর মনোভাব দর্শনে সে ভীত হয়ে ওঠে। জাফরুল্লাহ জানায়— “গোটা

পূর্বপাকিস্তানের মাটি রক্তে ভিজ়ে যাবে। যারা এখান থেকে আমাদের উচ্ছেদ করতে চায়, যারা আমাদের তাড়তে চায় তাদের একজনকেও আমরা বাঁচিয়ে রাখবো না। এতটুকু একটা বাচ্চাকেও না।”^{১৮} এক ভয়ঙ্কর বাংলাদেশ বিদ্রোহী মনোভাব ও আক্রোশ উদ্গীরিত হতে থাকে এই পাকিস্তানী সেনার কণ্ঠ থেকে। পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের কোন দৃষ্টিতে দেখত জাফরুল্লাহর উপর্যুক্ত সংলাপ সেই ঐতিহাসিক সত্যকেই প্রকট করে তোলে। মনসুরের চোখের সামনেই জাফরুল্লাহ হত্যা করে নাজমার কোলের সন্তানকে এবং নাজমাকে ধর্ষণের মাধ্যমে সে এক জান্তব উল্লাসে মেতে ওঠে। নাজমাকে রক্ষা করতে না পারার অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে মনসুর। তবে হাজী আব্বাস এ অনাচারের প্রতিশোধ ঠিকই গ্রহণ করেন। প্রতিবাদী মুক্তিকামী তরুণদের সংগঠিত করে অকস্মাৎ আক্রমণে তিনি নির্মমভাবে হত্যা করেন জাফরুল্লাহ খাঁকে। আলোচ্য উপন্যাসে এই আক্রমণের মধ্য দিয়ে দৃশ্যত শুরু হয় পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার মানুষের দুর্বীর প্রতিরোধ। পূর্ব বাংলার অস্ত্র হাতে নেয়া এই যুবকদের ‘বাংলাদেশ জিন্দাবাদ’ চিৎকারের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ।

৪.৪ একটি কালো মেয়ের কথা উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের সম্ভাবনাকে সামনে রেখে শেষ হয়েছে। আর এ সম্ভাবনা ধ্বনিত হয় উপন্যাসের শেষাংশে মনসুরকে উদ্দেশ্য করে হাজী আব্বাসের সংলাপে— “ডেভিড সাহেব, তুমি নাজমারে নিয়ে যাও উপার বাংলায়। ইপার বাংলায় যখন বাংলাদেশের ঝাণ্ডা উড়বে তখন তারে তুমি নিয়ে এস এখানে।”^{১৯} হাজী আব্বাসের এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে অমিত এক সম্ভাবনা উচ্চারিত হয়। সেই সম্ভাবনাকে হৃদয়ে রেখে কলকাতা-পুলিশের সামনে মনসুর দৃষ্ট স্বরে বলে ওঠে— “ও একটি আশ্চর্য কালো মেয়ে— ওকে আমি ভালোবাসি। ওকে আমি আবার ওদেশে ফিরে নিয়ে যাব।”^{২০} মনসুরের এই স্বপ্নকে সামনে রেখে শেষ হয় একটি কালো মেয়ের কথা উপন্যাসটি। আর এই স্বপ্নকে সাক্ষী রেখে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই— আলোচ্য উপন্যাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একাত্তরের ঘটনাবলি কোনো কাল্পনিক প্রকল্প দ্বারা রচনা করেননি, বরং তিনি সত্যনিষ্ঠ উপার্জিত অভিজ্ঞতাকেই তাঁর বয়ানের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে “দেশ, সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই গুরুত্ব পেয়েছে। শুধু বহিঃস্থ দেখেই তিনি ক্ষান্ত হননি; বাস্তব সত্যকে তার গূঢ় তাৎপর্যসহ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এবং তার অন্তর্নিহিত সত্যও তাই তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছিল”^{২১}। ফলে তারাশঙ্কর তাঁর এ উপন্যাসে যে ‘অন্তর্নিহিত সত্য’কে উপলব্ধি করেছিলেন; পরবর্তী কালে সেই উপলব্ধিরই শ্রেষ্ঠ অর্জন হিসেবে আমরা স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে বিশ্ব মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখি। তাই একটি কালো মেয়ের কথা উপন্যাসটি নিছক কথাসাহিত্য হিসেবে নয়; বরং এই বাংলার ভূরাজনৈতিক ইতিহাস ও স্বাধিকার আদায়ের দলিল হিসেবেও মূল্যায়িত হওয়ার দাবি রাখে।

উপসংহার

একথা স্বীকার্য যে, “ঘটমান বর্তমানকে নিয়ে উপন্যাস রচনার ঝুঁকি থাকে। ওই ঝুঁকি ছিল তারাশঙ্করেরও। যাকে বলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তার ঘাটতি ছিল তাঁর। তবু নিজের সমকালের শ্রেষ্ঠ কথাকোবিদ তারাশঙ্কর ওই ঘাটতি সত্ত্বেও পিছপা হননি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ওই মহান যুদ্ধ অবলম্বনে উপন্যাস লিখতে।”^{২২} ফলে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ববাংলার স্বাধিকার আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের দহনকালে এদেশের সাধারণ মানুষের কষ্ট ও সীমাহীন দুর্ভোগের চিত্র তাঁর একটি কালো মেয়ের কথা উপন্যাসে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে যে বোধ ও বোধির পরিচয় দিয়েছেন— তাতে

তাঁর মানববাদী চেতনাই ভাষ্যর হয়ে ওঠে। আর তারশঙ্করের এই চেতনার উদ্ভাস ঘটেছে এ উপন্যাসের চরিত্র সৃজনে, তাদের বিকাশ ও অন্তর্ভাবনে। পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক বাস্তবতা এ উপন্যাসের মূল বৃত্ত হিসেবে উপস্থাপিত হলেও; লেখকের সৃষ্টিশীল মনন, আবেগময় কথাভাষ্য এবং সৃষ্ট চরিত্রসমূহকে ইতিহাসের ক্যানভাসে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তারশঙ্করের শেষপর্বের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যকর্ম হিসেবে একটি কালো মেয়ের কথা উপন্যাসটির সার্থকতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

তথ্যনির্দেশ:

১. নাজমা জেসমিন চৌধুরী, *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি* (ঢাকা: সংহতি, ১৯৮০) পৃ. ১৪৪
২. নূরউল করিম খসরু 'উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ', *বাংলাদেশের সাহিত্যের আলোচনা পর্যালোচনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (সম্পাদনা: প্রণব চৌধুরী), (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র, ২০০১), পৃ. ২৪৬
৩. যতীন সরকার, *সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা* (ঢাকা: বিভাস, ১৯৮৫) পৃ. ১৪৮
৪. সালাহউদ্দিন আহমদ, *বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯২), পৃ. ৮৮
৫. তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'একটি কালো মেয়ের কথা', *তারশঙ্কর রচনাবলী-বিংশ খণ্ড* (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, চৈত্র-১৩৮৯), পৃ. ২৩৮
৬. তদেব, পৃ. ১৯৫
৭. তদেব, পৃ. ১৯৮
৮. তদেব, পৃ. ১৯৪
৯. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* (ঢাকা: অবসর, ২০০৬) পৃ. ১৮৮
১০. তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৮
১১. গোলাম মুরশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৪
১২. রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের সাহিত্যে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৬) পৃ. ৫৮
১৩. তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১০
১৪. আব্দুর রউফ চৌধুরী, *স্বায়ত্তশাসন স্বাধিকার ও স্বাধীনতা* (ঢাকা: কথা প্রকাশ, বাংলাবাজার, ২০১০) পৃ. ১৫
১৫. তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'একটি কালো মেয়ের কথা', *তারশঙ্কর রচনাবলী-বিংশ খণ্ড* (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, চৈত্র-১৩৮৯), পৃ. ২২০
১৬. তদেব পৃ. ২২০
১৭. তদেব পৃ. ২২৯
১৮. তদেব পৃ. ২৪৫
১৯. তদেব পৃ. ২৪৭
২০. তদেব পৃ. ২৪৭
২১. ডক্টর মুক্তি চৌধুরী, *ঔপন্যাসিক তারশঙ্কর* (কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৭), পৃ. ১০৫
২২. ভীষ্মদেব চৌধুরী, *ভূমিকাংশ একটি কালো মেয়ের কথা* (ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০১২)

সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মসজিদের ভূমিকা: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি মূল্যায়ন

মোঃ ইব্রাহীম খলিল*

Abstract

Masjeed is the religious center of Muslims. Various types of Ibadah are performed here, but it is not only a place of formal Ibadah. It is purely a social hub. Prophet Muhammad used the masjeed as a social center. Here he launched various programs of education and training. He also ran the state from here. There are many masjeeds in Bangladesh, besides there are numerous social problems. It is possible to use the masjeed to solve all these problems, because the people of this country love the masjeed. They respect the Imam of Masjeed, try to obey their advice. In such a situation if we take effective step through Imams to make the people conscious about their duties and responsibilities, we can be much benefited. As a social center the masjeed can play a revolutionary role in Bangladesh.

চাবিশব্দ: মসজিদ, কুসংস্কার, সামাজিক কেন্দ্র, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাংস্কৃতিক প্রভাব

ভূমিকা

ইসলামের মূলভিত্তি পাঁচটি। (১) সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই ও মুহাম্মদ সা. আল্লাহর বান্দা ও রাসুল, (২) সালাত কায়েম করা, (৩) যাকাত আদায় করা, (৪) হজ পালন করা এবং (৫) রমযান মাসে সাওম পালন করা।^১ ইসলামের এ ভিত্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আনুষ্ঠানিক ও বাহ্যিক ভিত্তি সালাত। জামাআতের সাথে বা সম্মিলিতভাবে সালাত আদায়ের জন্য মসজিদ গড়ে তোলা হয়। একটি মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলামের অনুসারী।^২ এ দেশে অসংখ্য মসজিদ রয়েছে। মুগল আমল হতে ইন্দো-ইসলামিক রীতিতে নির্মিত মনোরম মসজিদগুলোর সংখ্যাধিক্যের কারণে এ দেশের রাজধানী ঢাকা ‘মসজিদের শহর’ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।^৩ সম্ভবত বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামেই মসজিদ রয়েছে। ধর্মীয় আবেগ থেকে মানুষ মসজিদ নির্মাণ করে। যে কারণে দেখা যায়, যে কোন এলাকার সবচেয়ে সুরম্য বসতবাড়ির চেয়েও মসজিদ ভবনটি সাধারণত উন্নত, পরিচ্ছন্ন ও সুরম্য হয়ে থাকে। অথচ প্রতিদিন পাঁচবেলা ফরয সালাত আদায় ব্যতীত দেশের অন্যতম সুন্দর এ ভবনগুলো অন্য কোন কাজে তেমন একটা ব্যবহৃত হয় না। প্রতিবেলা সালাতের প্রস্তুতি ও সালাত আদায়ের মোট সময় হিসেব করলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মসজিদ সর্বোচ্চ দশঘণ্টা ব্যবহৃত হয়। বাকি চৌদ্দঘণ্টা অব্যবহৃত থাকে। এর ফলে বাংলাদেশের মত অধিক জনসংখ্যার ক্ষুদ্র একটি দেশে শুধু পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ে মসজিদ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির অপার সম্ভাবনা ও সুষ্ঠু সমাজগঠনে এর কার্যকারিতা উপেক্ষিত হয়। অথচ মসজিদের দীর্ঘ ইতিহাসে এটি কখনোই নিছক আনুষ্ঠানিক ইবাদতের স্থান ছিল না। মসজিদে প্রতিদিন পাঁচবার জামাআতে সালাত আদায় কিংবা শুক্রবার জুমাআর সালাত আদায় মসজিদের সামাজিক

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

চরিত্রকে বিশেষভাবে নির্দেশ করে। রাসুলুল্লাহ সা. একে সামাজিক কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এখানে তিনি নিজের প্রধান সচিবালয় স্থাপন করেছেন। বিচার, বিয়ে, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, পরামর্শ সভা ইত্যাদি কাজ তিনি মসজিদে সম্পন্ন করেছেন। খুলাফায়ে রাশীদার মহান চার সদস্য মসজিদকে কেন্দ্র করে তাঁদের শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। গোড়া থেকে মসজিদ ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বাংলাদেশের মসজিদগুলো অদ্যাবধি সামাজিক কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারেনি। তাই এ দেশের প্রেক্ষাপটে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মসজিদের ভূমিকা মূল্যায়ন এবং এ ভূমিকা অনুসারে কর্মসূচি প্রণয়ন জরুরী। এ নিবন্ধে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশে মসজিদের ভূমিকা নিরূপণ এবং সে ভূমিকা পালনের কার্যকর পদ্ধতি অন্বেষণ করা হয়েছে।

মসজিদ পরিচিতি

মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর, ইসলাম প্রচারের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো। এটি মুসলিম সমাজের প্রাণকেন্দ্র। ইসলাম প্রচার, প্রসার, প্রতিষ্ঠা, মুসলিমদের প্রশিক্ষণ এবং আনুষ্ঠানিক সমন্বিত ইবাদাতের প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্র মসজিদ। সম্মিলিতভাবে সালাত আদায়ের আবশ্যিকতা হতে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহর রাসুল সা. মসজিদে সালাতের ইমাম বা নেতা হিসেবে সকলকে নিয়ে সালাত আদায় করেন আবার মসজিদ থেকেই রাষ্ট্র পরিচালনা, যুদ্ধের কৌশল নির্ধারণ, বিচার-আচার সম্পাদন এবং দেশে-বিদেশের খ্যাতিমান লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। মুসলিমদের শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নবীজীর মসজিদে প্রশিক্ষণ নিয়েই তাঁর সাহাবী রা.-গণ খুলাফায়ে রাশিদার স্বর্ণযুগ রচনা করেন। মসজিদ পরিণত হয় ইবাদাত, তালিম, দাওয়াত, প্রচার, ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে। মুসলিম সমাজ ও মসজিদ তাই এক ও অভিন্ন অস্তিত্বের স্মারক। দেহ ও প্রাণের যে সম্পর্ক, ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে মসজিদের সম্পর্কও তেমন। প্রাণহীন দেহ যেমন অসার, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার পরিপন্থী যে মসজিদ তাও ঠিক তদ্রূপ ইমারত মাত্র।^৪ মসজিদকে কেবল ইবাদাতের আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ করে রাখলে এটি সঠিকভাবে সক্রিয় হয় না। মসজিদের পরিপূর্ণ সুফল পেতে হলে একে আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় এবং শিক্ষা-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার আবশ্যিক।

আরবি মাসজিদুন বা মসজিদ (مسجد) শব্দের মূল হলো সাজদুন (سجد), এর অর্থ অবনত হওয়া, হেয় হওয়া, মাটির উপর কপাল ঠেকানো, অনুনয়-বিনয়ের সাথে অবনত হওয়া, ইবাদাতকালে কপাল ও নাক মাটির উপর রাখা^৫ আর মসজিদ অর্থ সাজদার স্থান। এটি ইসলামি উপসনালয় (ইবাদাত গাহ)-এর নাম। যেহেতু ইবাদাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুকন সাজদা, এজন্য এর গুরুত্ব ও সালাতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য প্রকাশ করার জন্য ইসলামে ইবাদাতের স্থান বুঝানোর জন্য মা'বাদ-এর স্থলে মসজিদ নাম গ্রহণ করা হয়েছে। তাই যে ঘরকে কেবল আল্লাহর ইবাদাতের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয় ইসলামের পরিভাষায় তাকে মসজিদ বলে।^৬ যেমন আল-কুরআনে আছে, “মসজিদসমূহ কেবল আল্লাহর জন্য। কাজেই সেখানে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।”^৭ আল-কুরআনে ২৮ বার মসজিদ শব্দটির উল্লেখ রয়েছে এবং এর দ্বারা অবকাঠামোগত মসজিদের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। এটি মসজিদের উচ্চতম মর্যাদা ও গুরুত্বোক্ত কুরআনী স্মারক।^৮

রাসুলুল্লাহ সা. মক্কায় অবস্থান কালে (৬১০-৬২২খ্রি) কখনও কাবার নিকট, কখনও বা আবু বকর রা.-এর নির্মিত বিশেষ একটি স্থানে সালাত আদায় করতেন। মক্কায় সালাত আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট কোন স্থান ছিলো না।^{১০} সালাতের সময় হলে অনেক সময় রাসুলুল্লাহ সা. মক্কার পার্বত্য উপত্যকায় চলে যেতেন। তাঁর সাথে হযরত আলী রা.-ও যেতেন। দুজনে সেখানে সালাত আদায় করে অপরাহ্নে ফিরে আসতেন।^{১১} এ সময় তিনি সাহাবীগণকে নিজগৃহে সালাত আদায় করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

স্থাপনা হিসেবে মসজিদ বাসগৃহের মতোই তৈরি ঘর। ঘর তৈরির প্রচলিত সরঞ্জাম যেমন মাটি, কাঠ, টিন, ইট, পাথর ইত্যাদি দিয়ে মসজিদ তৈরি হয়। এর আকৃতি সুনির্দিষ্ট নয় বরং স্থানীয় পরিবেশ ও ঐতিহ্য অনুসারে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। যে মসজিদগুলো আয়তাকার সেগুলো বেশি প্রশস্ত হয়। উমাইয়া আমল থেকে মসজিদে গম্বুজ যুক্ত হয়। প্রথম দিকে আযান দেয়ার জন্য মসজিদের পাশে উঁচু জায়গা বেছে নেয়া হতো, যাতে আযানের ধ্বনি দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পরে। পরবর্তীতে এটি মিনার হিসেবে গণ্য হয়। বর্তমানে মিনারে উঠে আযান দেয়ার প্রয়োজন না হলেও মসজিদের সৌন্দর্য ও ঐতিহ্য হিসেবে মিনার যুক্ত করা হয়। সালাত আদায়ের পাশাপাশি মসজিদগুলোতে আল-কুরআন ও আল-হাদিস শিক্ষাদান এবং চর্চারও ব্যবস্থা থাকে। মসজিদের সামনের দেয়ালটিতে কাবার দিক নির্দেশক মিহরাব থাকে। মিহরাবের ডান পার্শ্বে জুমুআর খুতবা দেয়ার জন্য মিম্বার থাকে। যিনি মসজিদের মুসল্লীগণের সালাত পরিচালনা করেন তাঁকে ইমাম বলা হয়। মসজিদ বা মসজিদ সংলগ্ন স্থানে তিনি ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহী শিক্ষার্থী বা সাধারণ মুসলিমদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব দিয়ে থাকেন। মসজিদে আযানের জন্য মুআযযিন নিযুক্ত থাকেন এবং মসজিদের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন মুতাওয়াল্লীও থাকেন। মুসলিম মিলাতের জন্য মসজিদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাকর স্থান।

মসজিদের মর্যাদা ও গুরুত্ব

ইসলামি জীবনদর্শন ও মুসলিম সমাজে মসজিদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয়-সামাজিক প্রতিষ্ঠান, পৃথিবীতে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় জায়গা।^{১২} ইসলামের বিভিন্ন অনুশাসন যথাযথভাবে প্রতিপালন ও প্রতিষ্ঠার জন্য মসজিদ অনিবার্য। ইসলামের সকল আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত হলো সালাত। এটি জামাআতে আদায় করার বিধান। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা সম্মিলিতভাবে সালাত আদায়ের বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন, “তোমরা সালাত কয়েম কর, যাকাত দাও এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।”^{১৩} জামাআতে সালাত আদায়ের জন্য মসজিদ আবশ্যিক। অনেকে কেবল জুমুআর সালাতের জন্য মসজিদের জামাআতে অংশগ্রহণ করেন। এটি সঠিক নয়। কারণ জুমুআর সালাত যেমনিভাবে মসজিদে গিয়ে আদায় করতে হয় তেমনি পাঁচ ওয়াক্তের ফরয সালাতও মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে আদায় করা কর্তব্য। মসজিদে জামাআতের গুরুত্ব এতই অধিক যে, যারা মসজিদের জামাআত পরিত্যাগ করে, হযরত রাসুলুল্লাহ সা. তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছেন।^{১৪} তিনি একাকি সালাত আদায় করার চেয়ে জামাআতে সালাত আদায় করাকে সাতাশ গুণ বেশি মর্যাদাসম্পন্ন বলে ঘোষণা করেছেন।^{১৫} অনিবার্য কারণ ছাড়া মসজিদ ব্যতীত ফরয সালাত আদায় করা উচিত নয়।

মসজিদে কী ধরনের কার্যক্রম চলে বা চলতে পারে এর একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় আল্লাহ তাআলার ঘোষণায়: “আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন ঘরগুলোতে তাঁর নাম সমুন্নত করতে ও তাঁর

নামের যিকর করতে। সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে সে সকল লোক, যাদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর যিকর হতে এবং সালাত কাযিম ও যাকাত দেয়া হতে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সে দিনকে যেদিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে; যাতে তারা যে কাজ করে সে জন্য আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের অধিক প্রদান করেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।”^{১৫}

মসজিদ তাই আল্লাহর নাম সমুন্নত রাখার কেন্দ্র। এখানে আল্লাহর যিকর হবে, সালাত ও যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা হবে। আল্লাহভীরু মুমিনরা এখানে সমবেত হবে, আল্লাহ তাদেরকে অপরিমিত জীবিকা ও উত্তম পুরস্কারে ধন্য করবেন। আল্লাহর নাম সমুন্নত রাখার অর্থ আল্লাহর আহকামকে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখা। মসজিদ সবসময় এ কাজে আঞ্জাম দিয়েছে, ভবিষ্যতেও দেবে। যখনই কোনো মসজিদ এ কাজ থেকে দূরে থাকবে, তখন সেটি নিছক ইবাদাতের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নকারী একটি জায়গা হবে।

মসজিদ মুসলিম সমাজের ভিত্তি ও কেন্দ্র। আল্লাহ তাআলা এ কারণে পৃথিবীতে প্রথম ঘর হিসেবে মসজিদ স্থাপন করেন। আল্লাহ বলেন, “মানুষের জন্য প্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা মক্কায় অবস্থিত। সে ঘর বরকতময় এবং বিশ্ববাসীর জন্য তাতে সঠিক পথের নির্দেশনা আছে।”^{১৬} মসজিদকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজ আবর্তিত হয়। এ কারণে মুসলিম জাতি পৃথিবীর যে প্রান্তেই গিয়েছে, সেটা বিজয়ী হিসেবে যাক অথবা বাণিজ্যিক কারণে; স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার সাথে সাথে তারা মসজিদ স্থাপন করেছে। মসজিদহীন মুসলিম সমাজ অসম্পূর্ণ এবং প্রায় অসম্ভব। পৃথিবীর পত্তন এবং আদম আলাইহিস সালামের পার্থিব জীবনের সূচনাতেও মসজিদ ছিল। মুসলিম সমাজের অস্তিত্ব, অবস্থিতি, স্থিতি, বিস্তৃতি, বিকাশ একান্তভাবে মসজিদনির্ভর। মুসলিম জীবনে পরিবারের পর মসজিদকে তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে গণ্য করা যায়। ইবাদাত, দাওয়াহ, তালিম, তারবিয়াত, হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদের রূপরেখা মসজিদে প্রণীত হয়। এখান থেকে মুসলিমদের সকল নির্দেশনা ও নির্দেশ ঘোষিত হয়। কর্মপদ্ধতি ঠিক করা হয়। মুসলিম সমাজের এ সকল তৎপরতার সাথে মসজিদ যুক্ত থাকার তাৎপর্য হলো মুসলিম সমাজ ও মসজিদ উভয়ের যথাযথ ভূমিকায় বিদ্যমান থাকার প্রমাণ।

মসজিদকে হিদায়াতের কেন্দ্রও বলা যায়। এখানে আবশ্যিকভাবে আল-কুরআন শেখানোর এবং কুরআনী জীবন যাপনের প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা থাকে। এখানে আল-হাদীসের দারস দেয়া হয়। ব্যক্তিজীবন ও সমাজে যখন যে সমস্যা তৈরি হয়, মসজিদে সেগুলোর সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ব্যক্তিগতভাবে কেউ অসুবিধায় পরলে মসজিদ কর্তৃপক্ষ সেগুলো দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। মসজিদ এমন ভূমিকায় ছিল বলেই মুসলিম জাতি উন্নতি ও সমৃদ্ধির শীর্ষচূড়ায় আরোহন করতে সক্ষম হয়েছিল।

একটি রাষ্ট্রের যেমন পরামর্শসভা থাকে, মসজিদ হলো মুসলিম সমাজের তেমন পরামর্শ সভা। গ্রাম থেকে রাজধানী পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে মসজিদ সহজাতভাবে এ ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ মসজিদে সাধারণভাবে সন্নিহিত অঞ্চলের সকল মুসলিম সমবেত হয়ে থাকে। যে কোনো বিষয়ে বা পরিস্থিতিতে সহজেই তাদের পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ করা সম্ভব হয়। মহানবী সা.-এর সময় মসজিদ ছিল সকল কর্মতৎপরতার কেন্দ্র। মদিনা কেন্দ্রিক ইসলামি সমাজের সকল কর্মপরিকল্পনা মসজিদে বসেই নির্ধারণ করা হত। খুলাফায়ে রাশিদিনের সময়কালেও এ ধারা অব্যাহত থাকে।

তারা রাষ্ট্র শাসনের সকল পর্যায়ে মসজিদে সমবেত মুসল্লিদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এভাবে মসজিদ শুরু থেকেই মুসলিমদের পবিত্র মিলনকেন্দ্র হিসেবে সমাদৃত ছিল। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের জন্য পাঁচবার মুসলিমরা মসজিদে উপস্থিত হয়। প্রতি শুক্রবার জামে মসজিদে জুমআর সালাত অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি ওয়াক্তের সালাতের চেয়ে জুমআর সালাতে বেশি মুসলিমের সমাবেশ ঘটে। হজ মওসুমে বিশ্বের সকল এলাকার মুসলিম মক্কা ও মদিনার মসজিদে সমবেত হয়। একজন অপরজনকে পরম মমতায় বুকে টেনে নেয়। রাসুল সা.-এর সময় হতে মসজিদে সালাতের প্রতিটি অধিবেশন মুসলিমদের ধর্মীয় একতা ও রাজনৈতিক সমস্যার একান্ত দিক নিদর্শন বলে বিবেচিত হত।^{১৭} প্রকৃত পক্ষে হযরত রাসুল-ই-আকরাম সা. ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে মসজিদ ছিলো একাধারে পার্লামেন্ট, সুপ্রীম কোর্ট, গবেষণাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়। মসজিদকে কেন্দ্র করেই জীবন বিকাশের ধারাগুলো চালু ছিল।^{১৮}

মসজিদ মুসলিম জাতির ঐক্য ও সংহতির প্রেরণা, ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় করার মাধ্যম এবং সাম্যের বাস্তব উদাহরণ। ইমাম ও মুয়াযযিন ব্যতীত মসজিদে কারো স্থান নির্দিষ্ট নয়। যে যখন আসবে সে জায়গা খালি থাকা সাপেক্ষে সামনের কাতার পুরো করে আসবে। কারো জন্য জায়গা খালি রাখা যাবে না। আবার কার পাশে কে দাঁড়াবে, কে দাঁড়াবে না সেটাও নির্ধারণ করা যাবে না। বরং রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, জ্ঞানী-মূর্খ, ছোট-বড়, মালিক-শ্রমিক নির্বিশেষে যে কেউ যে কারো পাশে দাঁড়াতে পারবে। মসজিদে একজন গরীব ব্যক্তি আমীরের পাশাপাশি বসে, দীনের ন্যায় বিচারের ছায়ায় আত্মাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে।^{১৯} পৃথিবীর আর কোনো জায়গায় মানবিক সমতার এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। দেখা যায় না ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এমন প্রশিক্ষণ। মসজিদে সালাতের জামাআত ঐক্যের জন্য একটি বিরাট প্রশিক্ষণ। শুক্রবারে জুমুআর সালাত এ ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বকে আরও বেশি সুদৃঢ় করে।^{২০}

মসজিদের সর্বজনীনতার আরেকটি দিল হলো, যে কোনো মুসলিম, যে কোনো সময় মসজিদে প্রবেশ করতে পারে। মসজিদে অবস্থান করতে পারে এবং কারো কাছে জবাবদিহিতা ব্যতীত ইবাদাত করতে পারে। নির্দিষ্ট সময়ে ফরয সালাত আদায়ের সময় ইমাম সালাত পরিচালনা করেন। কিন্তু অনেক সময় বহুবিধ বাস্তবসম্মত কারণে অনেকেই ইমামের সাথে সালাত আদায় করতে পারে না। তাছাড়া অনেক সওয়াবপূর্ণ নফল সালাতও রয়েছে। এ জাতীয় সালাত আদায় এবং তিলাওয়াত বা যিকরের জন্য মসজিদ সবসময় অব্যাহত। পৃথিবীতে বিদ্যমান ও অনুসারী রয়েছে এমন অধিকাংশ ধর্মের ক্ষেত্রে ধর্মালয়ে বা উপাসনালয়ে প্রবেশের অধিকার এমন অব্যাহত নয়। মসজিদ ব্যতীত প্রায় সকল উপাসনালয়ে ধর্মযাজক বা উপাসনালয়ের অধ্যক্ষের উপস্থিতি ও অনুমতি আবশ্যিক। অনেক ক্ষেত্রে কেবল ধর্মযাজক বা উপাসনালয়ের অধ্যক্ষের সাথে উপাসনালয়ে প্রবেশ করতে হয় এবং তার সাথেই বের হয়ে আসতে হয়। ইসলামের উদারনীতির এক অনুপম নজির পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও জুমুআ সালাত আদায়ের মসজিদগুলো।^{২১}

মসজিদে মুসলিমরা যে কেবল একসাথে পাশাপাশি দাঁড়ায় তাই না, বরং তারা একসাথে সালাত আদায় করে। একই তাকবীরে তাহরিমায় হাত বাঁধে, একসাথে রুকু করে, সিজদা করে। একই আদেশ ফলো করে তাশাহুদ শেষে সালাত শেষ করে। ইমাম রুকুতে গেলে বিনাপ্রশ্নে সবাই রুকু করে। সিজদা করা, তাসবীহ পড়া, তাশাহুদ পাঠ করা এবং সালাত শেষ করার ব্যাপারে ইমামের আনুগত্য করতে তারা দ্বিধা করে না। ভুল হলে ইমামকে সংশোধনের চেষ্টা করে। কোনো কারণে

ইমাম ভুল সংশোধন না করে সালাত শেষ করলে মুসল্লিও সেভাবেই সালাত শেষ করে। পরবর্তীতে পরামর্শ দিয়ে ও মত প্রকাশ করে বিষয়টি সুরাহা করে কিন্তু সালাত আদায়কালীন সময়ে কোনো বিশৃঙ্খলা ঘটায় না। সালাতে ইমামের অনুসরণের সাথে সেনাবাহিনী কর্তৃক সেনাপতির আদেশ মেনে চলার মিল পাওয়া যায়।^{২২} আদেশ পালনের ক্ষেত্রে এভাবে নিঃশর্ত অনুসরণ মুসলিমদেরকে ইমামের আনুগত্য করতে শেখায় যা তারা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারে। কেননা আল্লাহ বলেছেন, “তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসুলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যকার নেতার আনুগত্য কর।”^{২৩} পাশাপাশি একই কাজ অভিন্নভাবে দিনের পর দিন করতে করতে তাদের মধ্যে প্রবল মানসিক মিল প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়। তাদের মধ্যে আল্লাহ ঘোষিত ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “নিশ্চয় মুমিনগণ একে অপরের ভাই।”^{২৪}

মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার আরেকটি দিক এটি ব্যক্তি ও সমাজের ভেতর পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতার চেতনা শানিত করে। সকলের শরীর, মন ও পরিবেশ পবিত্র রাখার প্রেরণা দেয়। মসজিদে ইবাদাত সম্পাদন করা হয় বলে মসজিদকে নোংরা ও অপবিত্র রাখা যায় না। মসজিদেও অপবিত্র ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় প্রবেশ করা যায় না। পবিত্র পোশাকে পরিচ্ছন্ন শরীরে এখানে প্রবেশ করতে হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, “বনি আদম, তোমরা প্রত্যেকে মসজিদে প্রবেশের সময় তোমাদের পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর পোশাক পরিচ্ছন্ন গ্রহণ কর।”^{২৫} মসজিদ যে পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার প্রতি বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করে আল্লাহ তাআলাও তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। বলেছেন, “যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার ওপর রাখা হয়েছে— সেটিই তোমার দাঁড়বার যোগ্যস্থান। সেখানে রয়েছে এমন লোক যারা পবিত্রতাকে ভালবাসে।”^{২৬}

মসজিদে কেউ অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় যায় না, অপবিত্র অবস্থায় প্রবেশ করে না। মুসল্লিদের অসুবিধা হতে পারে বিবেচনা করে আল্লাহর রাসুল সা. মসজিদে পৈঁয়াজ ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু খেয়ে মসজিদে গমন করতে নিষেধ করেছেন।^{২৭} মসজিদের আলোচনায় কেবল দেহ পবিত্র করার কথা বলা হয় না বরং হিংসা, পরনিন্দা, ঈর্ষা, অহঙ্কার, পরশ্রীকাতরতা, চোগলখুরি, শত্রুতা, ষড়যন্ত্র, ঘৃণা, দ্বিচারিতা ইত্যাদি পাপাচার থেকে ব্যক্তির আত্মা ও কলবকে পবিত্র রাখার কথাও বলা হয়। এ কারণে দেহ ও পোশাক-পরিচ্ছদের যাবতীয় অপবিত্রতা ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে পবিত্র হয়ে এবং অন্তরকে কুফর, শিরক, দুশ্চরিত্রতা, হিংসা-লোভ-লালসা ইত্যাদি থেকে পবিত্র হয়ে মসজিদে প্রবেশ করা উচিত।^{২৮} কারণ আল্লাহর রাসুল সা. “পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক”^{২৯} বলে যে ঘোষণা দিয়েছেন তা কেবল বাহ্যিক পবিত্রতা নয়, বরং কুলবের পবিত্রতার বিষয়টিও এর অন্তর্ভুক্ত। ফলে ব্যক্তি দেহের মতো নিজের আত্মাকে কলুষতা মুক্ত রাখতে চায়। পরিচ্ছন্ন রাখতে চায় নিজের চারপাশের পরিবেশ। এভাবে দেহ, মন ও পরিবেশে মসজিদ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার আবেশ ছড়িয়ে একটি সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। এ কারণে মসজিদকে বলা হয় আদর্শিক যুদ্ধের অস্ত্রাগার (The armory of the Muslims in the ideological battle, is the Mosque.)।^{৩০}

মসজিদ সময়ানুবর্তিতার এক সুমহান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। আল্লাহ তাআলা সালাত আদায়ের সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। বলেছেন, “নিশ্চয় নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় করা মুমিনদের জন্য ফরয করা হয়েছে।”^{৩১} পূর্ব নির্ধারিত সময়ে প্রতিদিন পাঁচবার মসজিদে উপস্থিত হয়ে সালাত আদায়ের মাধ্যমে মুমিন ব্যক্তি সময়ানুবর্তিতার বাস্তব প্রশিক্ষণ লাভ করে। সালাতের ভেতরে যে সকল

আনুষ্ঠানিকতা সেখানেও মুসল্লিকে সময়ানুবর্তী হতে হয়। রুকু, সিজদা, তাশাহুদ, তাসবীহ পাঠে আবশ্যিক সময়ের বেশি সময় গ্রহণ করে না। ইমাম যখন রুকুতে যায়, মুসল্লিও রুকুতে যায়। সময়ের অপচয় করে বা এক কাজের সময় অন্য কাজ করে সালাত বিনষ্ট করে না। এখানে মুসলিম শৃঙ্খলার প্রশিক্ষণও লাভ করে। মসজিদে প্রবেশ করা, বসা, দাঁড়ানো, চলাফেরা করা, অবস্থান করা, সালাত আদায় করা, মসজিদ হতে বের হওয়া ইত্যাদি প্রতিটি কাজে তাকে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। মসজিদের উচ্চ মর্যাদার কারণে এখানে কেউ উচ্চস্বরে কথা বলতে পারে না। রাসুলুল্লাহ সা. মসজিদে উচ্চস্বরে শোরগোল করতে নিষেধ করেছেন।^{১২} এর ফলে স্থান-কাল-পাত্রভেদে কথা-বার্তা বলার ক্ষেত্রে মুসলিমরা সাবধান হতে পারে। কখনো অকারণ কথা বলে না, উচ্চস্বরে তো বলেই না। এভাবে মসজিদের প্রভাবে সকল ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করার ফলে মুসলিমরা শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। এর প্রভাব বাস্তব জীবনে ছড়িয়ে পরে। ফলে শৃঙ্খলাই মুসলিম জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়।

নির্দিষ্ট একটি এলাকার মুসলিমরা নিয়মিত নির্দিষ্ট একটি মসজিদে যায়। প্রতিদিন পাঁচবার যায় বলে প্রত্যেকে প্রত্যেককে চেনে। প্রতিদিনই কিছু কিছু কথা হয়, সালাম ও কুশল বিনিময় হয় বলে প্রত্যেকে প্রত্যেকের খোঁজ-খবর রাখতে পারে। কাউকে না দেখলে তার খোঁজ নিতে পারে। অসুস্থ বা বিপদগ্রস্থ হলে জানতে পারে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এতে তাদের ভেতর পারস্পারিক সহযোগিতা, সহানুভূতি ও মমত্ববোধের সুমহান সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় ভিত্তি লাভ করে। আচরণ, বসবাস ও অভ্যাসের সুন্দর সামাজিকীকরণ সম্পন্ন হয়। এ কারণেই বলা হয়, প্রকৃত সালাতের মূল চেতনা হলো সামাজিক (The spirit of all true prayer is social)।^{১৩} মিলে-মিশে থাকার, দুঃখ-ব্যথা-আনন্দ-সুখ শেয়ার করার মনোবৃত্তি তৈরি হয়। তাছাড়া প্রত্যেকে প্রত্যেককে চেনে এবং প্রত্যেকের খবর জানে বলে মসজিদভিত্তিক সমাজে আকস্মিক এসে কারো পক্ষে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো সহজ হয় না। কারণ মসজিদের সবাই একতাবদ্ধভাবে সন্দেহজনক ব্যক্তির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে পারে, বিপদজনক মনে করলে প্রতিরোধও করতে পারে। মসজিদ তাই মুসলিম জাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান। পাড়া বা মহল্লার ছোট মসজিদ সীমিত পরিসরে আর বায়তুল্লাহ কাবা বৃহত্তর পরিসরে মুসলিমদের জন্য এই মিলন ও নিরাপত্তার বার্তাই বহন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, “যখন কাবাঘরকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তা স্থল করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর।”^{১৪}

আল্লাহ তাআলার রহমত লাভের এক সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা মসজিদ। রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ নির্মাণ করে, জান্নাতের মধ্যে তার জন্য আল্লাহ একটি ঘর নির্মাণ করবেন।”^{১৫} তিনি আরও বলেছেন, সমাজের কিছু লোক যখন আল্লাহর ঘরসমূহের কোন একটি ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং তা নিয়ে পরস্পর আলোচনা করে তখন তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল হয়। আল্লাহর রহমত তাদের পরিবেষ্টন করে আর ফেরেশতাগণ তাদের ঘিরে রাখে। এমনকি আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মধ্যে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন। এভাবে মসজিদ মুসলিমদেরকে আল্লাহর রহমত লাভের যোগ্য করে তোলে।

মসজিদের মর্যাদা ও গুরুত্ব এতো বেশি যে এর রক্ষণাবেক্ষণ যে কেউ করতে পারে না। যে কেউ এর তত্ত্বাবধায়ক হতে পারে না। এর উচ্চমর্যাদা ও অনন্য গুরুত্বের জন্য আল্লাহ তা'আলা বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদেরকে মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন,

“মুশরিকরা আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে না যখন তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরির সাক্ষ্য দান করে। যারা আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে, সালাত কায়ম করে এবং যাকাত আদায় করে – কেবল তারাই আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। তারা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না।”^{৬৬}

মসজিদকে আল্লাহ মুমিনদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোনো কাজে মুমিনরা বিনাবাধায়, বিনাদ্বিধায় মসজিদে আসতে পারবে। এ ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা যাবে না। বাধা দেয়া যাবে না। মসজিদে আসতে বাধাদানকারীকে আল্লাহ তাআলা ‘বড় যালিম’ বলে অভিহিত করেছেন। বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলো ধ্বংস করতে তৎপর হয় তারচেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? অথচ ভীত ও বিনয়ী না হয়ে তাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করারই অধিকার ছিলো না! পৃথিবীতে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।”^{৬৭}

আয়াতে মসজিদের উচ্চ মর্যাদার আরেকটি দিকের ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। মসজিদ যে আর দশটা ঘরের মতো ঘর নয় এবং এখানে প্রবেশ করার সময়ও যে বিশেষ রীতি অনুসরণ করতে হয়, আল্লাহ তাআলার ঘোষণায় সেদিকটিও সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। আর সে রীতিটি হলো, মসজিদে আল্লাহ তাআলার ভয়ে ভীত এবং তাঁর দরবারে হাজির হওয়ার উপলব্ধিতে বিনীত অবস্থায় প্রবেশ করতে হয়। এখানে প্রবেশ করার সময় মুমিন ব্যক্তির মনে ‘আল্লাহর ঘরে’ প্রবেশের অনুভূতি প্রবল হয়ে ওঠে। ফলে সে ভীত ও বিনয়ী না হয়ে পারে না। যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, কেবল তাদের পক্ষেই এখানে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন সম্ভব।

মসজিদে গমন করা, মসজিদের সঙ্গে অন্তর সম্পৃক্ত করা এবং এক সালাত আদায় করার পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করা পূর্ণ ঈমানদারের নিদর্শন। যখন কোন মানব হৃদয় মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত হয়, আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য সে মসজিদে গমন করে সালাত, ইতিকাফ এবং সালাত আদায়কারীগণের অবস্থা জানার জন্য উদগ্রীব হয়, তখন তাকে মসজিদের অধিবাসী হিসেবে গণ্য করা হয়।^{৬৮} আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল সা. মসজিদের মর্যাদা, গুরুত্ব, মসজিদের প্রতি আল্লাহর ভালবাসা ও মনোযোগ সম্পর্কে যে কথাবার্তা বলেছেন তাতে মনে হয়, জান্নাতের উদ্যানসমূহের মধ্যে মসজিদও একটি উদ্যান। এ কারণে মসজিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ‘সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর’ (পরম পবিত্র আল্লাহ, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আল্লাহ মহান) পাঠ করতে হয়। মসজিদের মর্যাদা রক্ষার্থে মসজিদে প্রবেশ করার সময় পড়তে হয় ‘আল্লাহুম্মাফ তাহলি আবওয়াবা রাহমাতিক’ (হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন) এবং বের হওয়ার সময় পড়তে হয় ‘আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুক মিন ফাদলিক’ (হে আল্লাহ! আমি আপনার রহমত প্রার্থনা করি)।^{৬৯} মসজিদে প্রবেশ করার দুর্লভ সৌভাগ্য প্রদান করার জন্য মসজিদে প্রবেশ করে বসা বা কোনো কাজ শুরুর আগে কৃতজ্ঞতার প্রকাশ ঘটিয়ে দু রাকআত সালাত আদায় করতে হয়।^{৭০} যে ব্যক্তি মসজিদের নিকট থাকে, সে মসজিদের নৈকট্য দ্বারা বহুভাবে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পায়। ঘর হতে মসজিদে যাওয়ার পথে ব্যক্তি প্রতি পদক্ষেপের জন্য সওয়াব লাভ করে। মসজিদ এমন এক পবিত্রতম স্থান যা সব বয়সের মানুষের জন্য সবসময় আল্লাহর রহমত লাভের উপায় হিসেবে উন্মুক্ত থাকে।^{৭১}

মসজিদের সামাজিক গুরুত্বের একটি অন্যতম দিক হলো জুমুআর সালাত। আল্লাহ তাআলা জুমুআর দিন সকলকে এ সালাতে উপস্থিত হওয়ার সাধারণ নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন, “হে মুমিনগণ! জুমুআর দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর, ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর।”^{৪২} আরাফাতের সমাবেশের পর মুসলিমদের জন্য জুমুআর সালাতই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ। সাপ্তাহিক এ সমাবেশে মসজিদ সন্নিহিত অঞ্চলের মুসল্লিদের জন্য ইমাম প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। তাই নিছক অবহেলা করে যে ব্যক্তি জুমুআর সালাত পরিহার করে আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরের দ্বার রুদ্ধ করে দেন।^{৪৩} জুমুআর সময় দুআ কবুল হয়ে থাকে। অন্তরে সুগুণ বাসনাসমূহ পূরণ হয়। এ কারণে আল্লাহর নৈকট্য লাভের কাজিত ও প্রত্যাশিত সময়টি হলো জুমুআর দিন, যাতে অনেক কার্যাবলি সংঘটিত হয়েছে।^{৪৪}

জুমুআর সালাতের একটি অপরিহার্য অংশ খুৎবা প্রদান করা। হযরত রাসুলুল্লাহ সা. ও সাহাবীগণের খুৎবা ছিলো পরিপূর্ণাঙ্গ ও পর্যবেক্ষণ মূলক এবং দিক নির্দেশনামূলক। আল্লাহ তাআলার দিকে আহ্বান ও মানবপ্রেমে পরিপূর্ণ সে খুৎবায় উন্নত চরিত্র গঠন, আত্মশুদ্ধি, আহকাম পালনে একনিষ্ঠতা, দীন প্রচারে ভূমিকা পালন এবং জিহাদে অংশগ্রহণের কথাই বিভিন্নভাবে বিধৃত হতো। সমসাময়িককালে বাংলাদেশে গতানুগতিক খুৎবা প্রদান করা হয়, যাতে মীমাংসিত অনেক বিষয়ে অকারণ বিতর্ক তৈরি করা হয়। এমন বিষয়সমূহে কথা বলা হয়, যে ইস্যুগুলোতে কথা না বললেও কোনো ক্ষতি নেই। এভাবে মুসলিমদের দিক নির্দেশক খুৎবা বর্তমানে একটি সাধারণ ধর্মীয় বক্তৃতায় পরিণত হওয়ার কারণে খুৎবার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে।^{৪৫} মুসলিম উম্মাহর বাস্তব প্রয়োজন ও কর্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ের আলোচনা এবং ইবাদাত-বন্দেগী, লেন-দেন, শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি সকল পর্যায়ের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করাই হচ্ছে জুমুআর খুৎবার একমাত্র উদ্দেশ্য। হযরত মুহাম্মদ সা. সাহাবীগণ রা. তাবিঈন, তাবে তাবিঈন, সালফে সালিহীন সকলেই খুৎবাতে রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় কর্তব্যের আলোচনা পেশ করতেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে মুসলিম মিল্লাতের খুৎবায় প্রয়োজনীয় বিষয় পেশ করার রীতি বন্ধ হয়ে যায়। খুৎবা শুধু রসম-রিওয়াজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। মসজিদে পঠিত হয় গতানুগতিক খুৎবা।^{৪৬} অথচ জুমুআর খুৎবায় মুসলিম জাতির সকল বিষয়ই শিক্ষার সুযোগ থাকে। জুমুআর খুৎবার ভূমিকা খুবই তাৎপর্যবহ।

মুসলিম সমাজে, ইসলামি জীবন দর্শন, মূল্যবোধ ও চেতনায় এবং মুসলিম রাষ্ট্রে মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। হযরত রাসুলুল্লাহ সা. ২৩ বছর নবুওয়াতের জীবনের (৬১০-৬৩২খ্রি.) ১৩ বছর মক্কায় (৬১০-৬২২খ্রি.) এবং ১০ বছর (৬২২-৬৩২খ্রি.) মদিনায় অবস্থান করেন। মক্কার জীবনে তিনি মসজিদুল হারামের কর্তৃত্ব লাভ করতে পারেননি। সে স্থান ছিলো মুশরিকদের দখল। যে কাবা গৃহ আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য তৈরি সেখানে কাফিররা ৩৬০ টি দেব-দেবীর মূর্তি স্থাপন করে তাদের পূজা করত। তখনও হযরত রাসুলুল্লাহ সা. রাষ্ট্রীয় ক্ষতার অধিকারী হননি।^{৪৭} মুসলিমরা একই আল্লাহ তাআলার উপর বিশ্বাসী। মসজিদ হলো তাঁদের রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার মূল কেন্দ্র। তাই হযরত রাসুলুল্লাহ সা. ইসলামের দাওয়াত প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন।^{৪৮} মসজিদ যেহেতু মুসলিম জাতির সালাত, কিরাআত, যিকর, শিক্ষা-দীক্ষা, আকীদা এবং ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান-এজন্যই হযরত রাসুলুল্লাহ সা. মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে (৬২২খ্রি.)

মদিনায় কুবা পল্লীতে তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন।^{৪৯} কুবায় মসজিদ প্রতিষ্ঠার পর হযরত রাসুলুল্লাহ সা. সেখান থেকে মদিনায় পৌছেন। পথিমধ্যে বনু সালিমদের এলাকায় ১০০ জন সঙ্গীসহ জুমুআর সালাত আদায় করেন। মদিনাতে হযরত রাসুলুল্লাহ সা. মসজিদে নববী নির্মাণ করেন (৬২২খ্রি.)।^{৫০} আর এ মসজিদেই তিনি ধর্মপ্রচারসহ রাষ্ট্রীয় সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করতেন। ঐতিহাসিক হিট্রির মতে, মুসলিমদের মধ্যে মসজিদ সামাজিক সাম্যের বোধ এবং বিশ্বাসীদের চেতনার বিকাশ ঘটায় যা তাত্ত্বিকভাবে মুহাম্মদ সা.-এর ধর্মে রক্তসম্পর্ক প্রতিস্থাপন করেছিল। এভাবে সালাতের ময়দান ইসলামের প্রথম ড্রিল গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছিল।^{৫১}

ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় মূল্যের ভিত্তিতে তিনটি স্থানের গুরুত্ব বিশেষভাবে নিহিত রয়েছে। একটি মক্কার মসজিদুল হারাম, যার দিকে মুখ করে মুসলিমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করে থাকেন। সারা বিশ্বের মুসলিমরা হজের সময় এ স্থানে মিলিত হন। একইভাবে মদিনার মসজিদ যেখানে হযরত মুহাম্মদ সা. নূতন ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত রচনা করেছেন। আর এ কারণেই মসজিদে নববী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। আরেকটি হলো বায়তুল মুকাদ্দাস- যা পূর্ববর্তী নবীগণের আবাসস্থল এবং মুসলিম জাতির প্রথম কিবলা।^{৫২} ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মসজিদ কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। আর সালাত আদায়ের জন্য এটি বিশেষ স্থান। এ গুরুত্বের জন্যই একে মসজিদ বলা হয়েছে। এখানে সকলে একই ইমামের পেছনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সালাত আদায় করেন। সকলেই একজন ইমামকে অনুসরণ করেন গরীব-ধনী, প্রভু-ভৃত্য সকলেই মহারাজাধিরাজের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়।^{৫৩}

মসজিদের সামাজিক ব্যবহার

সমাজ সংস্কার মসজিদ নির্মাণের অন্যতম লক্ষ্য। মানব সমাজে প্রচলিত মানবসৃষ্ট মতবাদের মাধ্যমে যে কুসংস্কারসমূহ চালু হয়, তা সমাজের গতিশীলতার জন্য একটি বিরাট বাঁধা। মসজিদের শিক্ষার মাধ্যমে কুসংস্কার বিদূরিত করে সমাজে-প্রগতির ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব।^{৫৪}

মসজিদ মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল প্রশাসনিক কেন্দ্র। হযরত রাসুলুল্লাহ সা.- এর সম্পর্ক মসজিদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। এর কারণ শুধু ধর্মীয় নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিকও বটে। ইবাদতের কেন্দ্র ছাড়াও মসজিদ গণপ্রশাসনিক কেন্দ্র। বিচারালয় এবং মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবেও মসজিদ ব্যবহৃত হত এবং হতে পারে। আল্লাহর রাসুল হযরত মুহাম্মদ সা. স্বয়ং মসজিদে নববীতে মামলা-মুকাদ্দামা মীমাংসা করতেন। প্রাথমিক যুগে মসজিদই ছিলো শাসক ও জনগণের সাধারণ সভার স্থান। যুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনাও মসজিদেই হত। শাসন করা প্রশাসন, যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ে মসজিদেই বক্তব্য রাখতেন। বক্তারা এর পক্ষে শ্লোগানও দিতে পারতেন। হযরত রাসুলুল্লাহ সা.এর ইত্তিকাল (৬৩২ খ্রি) এবং খুলাফা রাশিদীনের শাসনামলের (৬৩২-৬৬১ খ্রি) অবসানের পর শাসকগণ শাসন কার্যকে স্ব-স্ব স্বার্থের কারণে নিজ নিজ প্রাসাদ চত্বরে নিয়ে যায়। মসজিদসমূহ তখন শুধু আনুষ্ঠানিক ইবাদতের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।^{৫৫}

মসজিদ ইসলাম প্রচার ও মুসলিম জাগরণের কেন্দ্র। হযরত রাসুলুল্লাহ সা. নিজেই মসজিদে নববীতে ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে হযরত আবুবকর রা. (মৃ. ১৩/৬৩৪) ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন। হযরত মুহাম্মদ সা.- এর ইত্তিকালের (৬৩২ খ্রি) পর খলীফাগণ ইমামের দায়িত্ব পালন করেছেন।^{৫৬} চার খলীফা হযরত আবু বকর, হযরত উমর,

হযরত উসমান ও হযরত আলী (৬৩২-৬৬১) শক্তিশালী রাজত্ব পরিচালনা করেছিলেন। আর তাঁদের সৈন্যবাহিনী ও কর্মচারীবৃন্দ পৃথিবীর সকল অংশেই খলীফাগণের অনুসৃত নীতির অনুসরণ করতেন। তাঁরা মসজিদে নববীতে জুমুআর দিনে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ পেশ করতেন এবং রাষ্ট্রের সকল বিষয়ের ব্যাপারেই মসজিদে আলোচনা করতেন। কুফায় রাজধানী স্থানান্তরের পরও চতুর্থ খলীফা হযরত আলী রা. মসজিদের সাথে শাসনকাজের এই সম্পৃক্ততা বজায় রাখেন এবং কুফার মসজিদে তাঁর দফতর স্থাপন করেন। চার খলীফার শাসনামলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সকল শাসক নাগরিকদের অভিযোগের জবাব এবং ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের হিসাব নিকাশ মসজিদেই দিতেন।

আব্বাহর রাসুল হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জীবদ্দশায় মুসলিমরা মদিনার দু-তিন মাইল উপকণ্ঠ হতে দৈনিক পাঁচওয়াক্ত সালাত মসজিদে নববীতে এসেই আদায় করতেন। খুলাফা রাশিদীনের যুগে (৬৩২-৬৬১ খ্রি) এ নিয়ম অনেকটাই চালু ছিল। পরবর্তী যুগে মুসলিমরা বিজয়ী বেশে যে দেশ, নগর বা শহরে প্রবেশ করতেন-সেখানে তাঁদের সর্বপ্রথম কর্তব্য ছিলো মসজিদ নির্মাণ করা। আব্বাহর রাসুল হযরত মুহাম্মদ সা.-এর স্থাপিত মদিনার মসজিদের অনুকরণে তাঁরা সেখানে জামে বা জুমুআ সালাত আদায়ের মসজিদ নির্মাণ করতেন। সে সময় মুসলিমদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে জামে মসজিদের সংখ্যা কম ছিল। তাছাড়া মুসলিমদেরকে সপ্তাহে অন্তত একবার স্থানীয় শাসনব্যবস্থার মূল কেন্দ্রে জুমুআ আদায়ের মাধ্যমে সমবেত করার রীতি অনুসৃত হতো। এ সময় মদিনার মসজিদে নববী ছাড়াও কুফা (প্রথম নির্মাণ ১৬/৬৩৭), বসরা (১৪/৬৩৫), ফুসতাত (২১-২২/৬৪১-৪২), কায়রোয়ান (৫৫-৫৬/৬৭৪-৭৫) প্রভৃতি স্থানে জুমুআ মসজিদ স্থাপন করা হয়েছিল।^{৫৭}

হযরত রাসুলুল্লাহ সা. মসজিদে নববীতে নিজে শিক্ষক ও প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়মিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। তাঁর নিকট শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী মসজিদে নববীর এ সকল শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণার্থীরাই মানব ইতিহাসের সবচেয়ে জ্ঞানী, বোদ্ধা, যোদ্ধা ও ইবাদাতকারী হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন। তাঁরাই বদলে দিয়েছেন ইতিহাসের ঝাঁক, ভিত্তি স্থাপন করেছেন বর্ণাঢ্য মুসলিম সভ্যতার। আব্বাহর রাসুলের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণেই আরবের উট, ঘোড়া ও মেষ পালকেরা রাখাল হতে এবং কেনা গোলাম ও বাঁদীরা দাসত্বের শৃঙ্খল হতে মুক্ত হয়ে সকলে বিশেষজ্ঞ আলিম, ফকীহ, বিশৃঙ্খ্যাত সেনাপতি ও শাসনকর্তায় রূপান্তরিত হয়েছিলেন।^{৫৮}

মুসলিম সমাজে মসজিদ হচ্ছে দীনী, ঈমানী, রাজনৈতিক, ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র ও শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান। মুসলমানদের অধিকাংশ ধর্ম ও সমাজ সংস্কারমূলক কর্মসূচী মসজিদের ভেতর থেকেই নেয়া হত। হযরত রাসুলুল্লাহ সা. এর যুগে, সাহাবা ও তাবিঈনের যুগে মসজিদ ছিলো বহুমাত্রিক ভূমিকার অধিকারী। আহলুস সুফফাদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয় মসজিদ চত্বরেই স্থাপন করা হয়েছিল। মসজিদ চত্বরকে ব্যবহার করা হয়েছিলো সেনা ছাউনি, পার্লামেন্ট ভবন এমনকি অস্ত্রাগার হিসেবে। মসজিদের সামনের যে জায়গাটি ‘মেহরাব’ বা অস্ত্রাগার বা অস্ত্রাখার স্থান নামে খ্যাত হওয়া থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। মসজিদের মত এ বহুমাত্রিক ভূমিকা পৃথিবীর কোন প্রতিষ্ঠানের নেই। মুসলিম উম্মাহ যতদিন মসজিদের এ গুরুত্বের স্বীকৃতি দিয়েছে, মসজিদ থেকে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে- ততদিন তাঁরা উন্নতির শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করেছেন। আর যখনই তাঁরা মসজিদের আদর্শ থেকে দূরে গেছে- তখনই অধঃপতনের শিকার হয়েছেন।^{৫৯}

আল্লাহর রাসুল হযরত মুহাম্মদ সা. যে সোনালী যুগের সূচনা করে সমগ্র বিশ্বকে আলোক উদ্ভাসিত করে তুলেছিলেন মসজিদই ছিলো তার উৎসমূল। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য-দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রে জীবনের সকল দিক ও বিভাগে এককালে যে সকল মুসলিম মনীষী, বিজ্ঞানী, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও পণ্ডিত সমগ্র বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং বর্তমান বিশ্বকে জ্ঞান সাধনার অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ রেখেছেন তাঁদের বুনিয়াদী জ্ঞানার্জন, প্রেরণা লাভ ও চরিত্র শিক্ষার ভিত্তি ছিলো এ পবিত্র মসজিদ।^{৬০} ইসলামি আদর্শকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, বাড়ি-ঘর যথা সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, তাঁদের থাকা-খাওয়া মসজিদেই হয়েছে। তাঁদের মন-মস্তিস্কের উন্নতির খোঁরাকে, সাহিত্য-সাধনা, আলোচনা মসজিদেই হয়েছে।^{৬১} “হিজরী প্রথম সন হইতে খলীফাগণের সুবর্ণ যুগের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই মসজিদই ইসলামের সর্বপ্রধান, বরং একমাত্র কর্মকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। দৈনিক ও সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য মুসলিমদিগের সেই সম্মেলন হইত, তাহা ব্যতীত সকল প্রকার শাসন-বিচার, শালিস-পঞ্চায়েত, সমর ও সন্ধি ইত্যাদি সংক্রান্ত আলোচনা ও পরামর্শ, বিদেশে দূত প্রেরণ বা বৈদেশিক রাজ-দূতগণের সাথে দেখা-সাক্ষাত, ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনা, উপদেশ ও পরামর্শ, এক কথায় জাতিগত, ধর্মগত, দেশগত সকল প্রকার আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা ও পরামর্শ এই আড়ম্বড়হীন মসজিদ প্রাঙ্গণ হইতে সম্পাদিত হইত।^{৬২}

তবে এটা সঠিক যে, বর্তমানে শাসনকাজের যে বিশাল ব্যাপ্তি ঘটেছে, প্রতিটি বিভাগের জন্য যে বিপুল পরিমাণ জনশক্তি নিযুক্ত হয়েছে, তাতে সবকিছু মসজিদ থেকে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সকল কাজ কোনো একটি মসজিদ থেকে পরিচালনার জন্য যে বিরাট মসজিদ প্রয়োজন, সেটি স্থাপন অযৌক্তিক। এ ক্ষেত্রে মসজিদ শাসনকাজ পরিচালনা ও রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের দিক নির্দেশনা দানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভূমিকা পালন করবে আর মসজিদের নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রশাসন, উৎপাদন, বিপণন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, গবেষণা, নির্মাণ, মুদ্রণসহ সকল ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনানীতি আল-কুরআন ও আল-হাদীসের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে, মসজিদ যাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। শাসনতান্ত্রিক বিষয়গুলো বাদ দিলে মসজিদ সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে এখনও অত্যন্ত তাৎপর্যবহ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশে মসজিদের ব্যবহার

বাংলাদেশে মসজিদ প্রধানত আনুষ্ঠানিক ইবাদাত অর্থাৎ সালাত আদায়ের স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিকট অতীতে সকল মসজিদে মক্তব প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং শিশুরা মক্তব থেকে আল-কুরআন তিলাওয়াতের বিশুদ্ধজ্ঞান লাভ করতো। বর্তমানে কিছু কিছু মসজিদে শিশু ও বয়স্কদের জন্য আল-কুরআন শেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে, সকল মসজিদে নেই। বাংলাদেশের অধিকাংশ মসজিদে কোনো পাঠাগার নেই। সব মসজিদেই নাজেরা তিলাওয়াতের জন্য নূরানী, হাফেজী ও উসমানী মুদ্রণের আল-কুরআন রয়েছে। কোথাও কোথাও তরজমাসহ আল-কুরআন রয়েছে। সরকারিভাবে বিলিকৃত সংক্ষিপ্ত তাফসীরও মসজিদগুলোতে রয়েছে। এর বাইরে প্রামাণ্য কিতাব মসজিদে তেমন দেখা যায় না। তাবলীগী নেসাবের ফাযায়েল গ্রন্থসমূহ, বেহেশতী জেওর, মোকসদুল মোমিনীন এবং হাদিস গ্রন্থসমূহের মধ্যে মিশকাত শরীফ। ইসলামি ফাউন্ডেশনের ‘মসজিদ পাঠাগার’ প্রকল্পভুক্ত মসজিদ ব্যতীত কোনো মসজিদে সে অর্থে জনগণের জন্য উন্মুক্ত কোনো পাঠাগার দেখা যায় না। বাংলাদেশে মসজিদসমূহকে বরং সালাত পরবর্তী সময় সকলের

নিকট থেকে দূরে রাখা হয়। মসজিদের পবিত্রতা ও সৌন্দর্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে মসজিদের মূল্যবান জিনিসপত্র সুরক্ষার জন্য মসজিদসমূহ তালা দিয়ে রাখা হয়। অথচ মসজিদ একটি বহুমুখী ইবাদাতকেন্দ্রীক ধর্মীয়-সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এর দ্বারা সামাজিক কাজসমূহ সফল ও সার্থকভাবে আঞ্জাম দেয়া সম্ভব। বাংলাদেশে মসজিদ হতে পরিপূর্ণ সুফল লাভের জন্য মসজিদের নিম্নরূপ ব্যবহার হতে পারে।

(১) সকল মসজিদে আবশ্যিকভাবে শিশুদের জন্য মক্তব চালু করা এবং মুসলিম শিশুদেরকে মক্তবে আসার ব্যাপারে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা। বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ শিশু কিভারগার্টেন নামক অপরিষর ও সংকীর্ণ স্থানে তাদের প্রথম পাঠ গ্রহণ করে। এতে তারা আড়ম্বর শেখে, বিলাসিতা শেখে, হয়তো কিছুটা শৃঙ্খলাও শেখে, কিন্তু মন ও মননকে পবিত্র করা, অন্যকে সাহায্য করা, অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার শিক্ষা থেকে তারা বঞ্চিত থাকে। সহযোগিতার পরিবর্তে প্রতিযোগিতা তাদেরকে ভাই ভাইয়ের পরিবর্তে শত্রুতার সম্পর্কে আবদ্ধ করে। অথচ মসজিদের পবিত্র প্রাঙ্গণে যদি এ সকল কোমলমতি শিশুর প্রাথমিক পাঠের ব্যবস্থা করা যেতো, তাহলে তারা যেমন পবিত্র পরিবেশে, খোলা-মেলা স্থানে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেতো, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ উন্নত নৈতিক শিক্ষা তাদেরকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রেক্ষাপট তৈরি করে দিতে সক্ষম হতো।

(২) মসজিদে নৈশ বিদ্যালয় চালু করা। যে সকল বয়স্ক মানুষ কোনো কারণে যথাসময়ে আল-কুরআন শিখতে পারেননি বা বাংলাভাষার অক্ষর জ্ঞান থেকেও বঞ্চিত হয়েছেন, তাদের জন্য মসজিদে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও নৈশবিদ্যালয় চালু করা যায়। আসর থেকে মাগরিব, মাগরিব থেকে ইশা এমনকি ইশার পরও এ বিদ্যালয় নিয়মিতভাবে চলতে পারে। এ জন্য আলাদা শিক্ষক নিয়োগেরও প্রয়োজন হয় না। সব মসজিদেই একাধিক ইমাম ও মুয়াজ্জিন থাকে। যুক্তিহীন সম্মানী প্রদান করে ইমাম ও মুয়াজ্জিনদেরকে মক্তব ও নৈশবিদ্যালয়ের দায়িত্ব দিলে তারা যেমন আর্থিকভাবে দুঃশিক্ষিত হবেন তেমনি সমাজও নিরক্ষরতার অভিধাপ থেকে মুক্ত হবে, পাবে একদল নৈতিক মানসম্পন্ন শিক্ষিত মানুষ।

(৩) মসজিদে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা যায়। এ জন্য আলাদা ভবন প্রয়োজন হয় না। মসজিদের দেয়ালে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শেলফ তৈরি করে অনেক প্রয়োজনীয় বই রাখা যায়। এরপর সেগুলো পাঠের জন্য মুসল্লিদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়। আল-কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা, পাঠচক্র, সীরাতে প্রতিযোগিতা, হাদিস প্রতিযোগিতা বা ইসলামি সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতার নিয়মিত আয়োজন করে সব বয়সের মানুষকে পাঠাগারমুখী করা সম্ভব। মসজিদ পাঠাগারে আল-কুরআন, আল-হাদিস ও ইসলামি সাহিত্য বিষয়ক বই থাকবে। এর পাঠকরা প্রামাণ্যভাবে ইসলাম জানার এবং মানার প্রেরণা বইগুলো থেকে পাবে।

(৪) মসজিদে অসমর্থ লোকদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি চালু করা যায়। সপ্তাহের একটি দিন বিশেষায়িত কোনো চিকিৎসক মসজিদ কমিটির ব্যবস্থাপনায় যদি অসমর্থ লোকদের স্বাস্থ্য পরামর্শ দেন এবং মসজিদ কমিটির উদ্যোগে তাদের চিকিৎসা সামগ্রীর ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে এ সকল অসমর্থ লোকেরাও কারণে-অকারণে মসজিদমুখী হবে। মসজিদ থেকে তারা জানতে পারবে, কাজ করা ফরয। অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সা.-এর অপছন্দনীয় বিষয়। তখন তারা নিজেদেরকে সংশোধন করে নেবে। কর্মমুখী হবে। তাছাড়া নিয়মিত মসজিদে আসার

কারণে নৈতিক দিক থেকেও সমৃদ্ধ হবে। ফলে চুরি, ছিনতাই, নেশাগ্রস্ততার মতো অপরাধ কমে যাবে।

(৫) মসজিদ থেকে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি পরিচালনা করা যায়। বাংলাদেশে প্রায় সর্বত্র মানুষ যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলে। পরিবেশ দূষিত হয়। বিশেষত শহরগুলোতে ময়লা-আবর্জনার কারণে সুস্থভাবে বেঁচে থাকাই কঠিন। প্রতিটি মসজিদ থেকে যদি মসজিদের আওতাভুক্ত অঞ্চল পরিচ্ছন্ন রাখার ঘোষণা দেয়া হয় এবং মসজিদের মুসল্লিদের নিয়ে ইমাম ও মুয়াজ্জিন এ কাজ শুরু করেন, তাহলে পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ে তোলা খুবই সম্ভব। কারণ মসজিদহীন গ্রাম, মহল্লা বা পাড়া বাংলাদেশে খুবই কম আছে। মসজিদগুলো নিজে পরিচ্ছন্ন, পবিত্র। এর পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার চেতনা সমাজে ছড়িয়ে দিলে আক্ষরিক অর্থেই সমাজ পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হবে।

(৬) সামাজিক বিচার-মীমাংসার ব্যবস্থা মসজিদে করা যায়। এমন পরিবার ও সমাজে এমন অসংখ্য সমস্যা রয়েছে যেগুলোর সমাধান সামাজিকভাবে করা সম্ভব। বরং সেগুলো কোর্ট-কাচারিতে না যাওয়াই ভালো। প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া, দাম্পত্য কলহ, ঋণ পরিশোধে অনীহা, উত্তরাধিকারীদের মধ্যে উত্তরাধিকার বণ্টনে অবিচার, বিবাহ, তালাক ইত্যাদি অনেক সমস্যার সমাধান মসজিদে করা গেলে ব্যক্তি ও পরিবারের জন্য তা কল্যাণকর হতে পারে। এতে কোর্ট-কাচারির অহেতুক ব্যয় এবং একজন অন্যজনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার যে মানসিকতা তা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। মসজিদের পবিত্র পরিবেশে যখন দু পক্ষ বসবে এবং একাধিক সেশনে ইমাম সাহেব বা সংশ্লিষ্টরা যখন আল্লাহ তাআলার কাছে জবাবদিহিতা, আখিরাতের আযাব ইত্যাদি বিষয়ে দু পক্ষকে বুঝাবে, তখন তাদের ভেতর ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জন্ম নেবে। এরপর যখন মীমাংসায় বসবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুন্দর সমাধান বের হয়ে আসবে। মসজিদে যারা সাক্ষ্য দেবে, তাদেরকেও বারবার মিথ্যা সাক্ষী দেয়ার ভয়ানক পরিণাম সম্পর্কে বারবার সচেতন করা হবে। দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে ভয়ানক আযাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। এরপর যখন তাদেরকে সাক্ষী দেয়ার জন্য আহ্বান করা হবে, অনেকেই মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া থেকে বিরত থাকবে।

(৭) সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ মসজিদে আয়োজন করা যায়। এতে অনেক অসামাজিক বিষয়সমূহ এমনিতেই দূর হয়ে যাবে। যেমন মসজিদে ওয়ালিমার আয়োজন করা যায়। এতে বিয়েকেন্দ্রীক ইসলামবিরোধী রীতি-নীতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে। মসজিদে কেউ গান-বাজনা বা নাচের আয়োজন কখনোই করতে পারবে না। যারা যৌতুক নিয়ে বিয়ে করতে আগ্রহী তাদেরকেও মসজিদে বিয়েতে আনা গেলে অনেক ক্ষেত্রে যৌতুক প্রবণতা কমে যেতে পারে।

(৮) বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মসজিদ ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষত যাকাত আদায় ও বণ্টনে। মসজিদের ইমাম সন্নিহিত অঞ্চলের সকলের অবস্থা জানেন। তিনি যদি দায়িত্ব নিয়ে সকলের সমন্বয়ে একটি যাকাত আদায় ও বণ্টন কমিটি গঠন করেন, সেটা গ্রহণযোগ্য হবে। কমিটি মহল্লার সকলের যাকাত আদায় করে একত্রিত করবে। এরপর তালিকা করে মহল্লার সবচেয়ে গরীব লোকদেরকে এমনভাবে যাকাত দেবে, যাতে পরের বছর তাদেরকে আর যাকাত নিতে আসতে না হয়। এভাবে কয়েক বছর চেষ্টা করলে মসজিদ সন্নিহিত এলাকাকে দারিদ্র্যমুক্ত করা সম্ভব। বাংলাদেশের প্রতিটি মসজিদ যদি এ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তাহলে গোটা বাংলাদেশ কেবল যাকাত কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্যমুক্ত হতে পারে। এর পাশাপাশি মসজিদ যদি সমবায় রীতিতে সঞ্চয়ের কেন্দ্রে পরিণত হয়, সেটাও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

(৯) মাদকাসক্তি, অনৈতিক কর্মকাণ্ড, হতাশা, আত্মহত্যা প্রবণতা, যৌতুক, নারী নির্যাতন, চুরি, ছিনতাই ইত্যাদি সামাজিক সমস্যাসমূহের সমাধান হিসেবে বাংলাদেশে মসজিদকে ব্যবহার করা যায়। মসজিদের ইমাম এবং পরিচালনা কমিটি এ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান করবে। সন্নিহিত অঞ্চলের সচেতন মুসল্লিদের নিয়ে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করবে। কমিটি বিভিন্ন সময় অভিযুক্ত ও আসক্তদের নিয়ে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালার আয়োজন করবে। সংশোধনের নিয়তে সুন্দর ব্যক্তিসম্পর্ক গড়ে তুলবে। অপরাধে জড়িত প্রত্যেককে এমন নিবিড় তত্ত্বাবধান ও ভালবাসায় পর্যবেক্ষণ করার ব্যবস্থা করতে হবে যে, তারা যেনো এরপর আর অপরাধে জড়িত না হতে পারে। একটি মসজিদের এলাকা সাধারণত অনেক বড় হয় না এবং একটি মহল্লায় অনেক লোক অপরাধের সাথে জড়িত থাকে না। অবশিষ্ট লোকেরা আন্তরিক হলে মসজিদকে ব্যবহার করে অল্প সংখ্যক অপরাধপ্রবণ লোকদেরকে সুপথে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

(১০) প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্যোগেও মসজিদ আশ্রয়কেন্দ্র হতে পারে। বিভিন্ন বিপর্যয় ও বিরূপ পরিস্থিতিতে লোকদের করণীয় কি হতে পারে সে সম্পর্কেও মসজিদ থেকে নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে। মসজিদের ইমাম এবং পরিচালনা কর্তৃপক্ষ যদি তাদের কার্যক্রম দ্বারা আস্থা তৈরি করতে পারেন, তাহলে ধর্মীয় আবেগ ও ভালবাসা থেকে মসজিদ সন্নিহিত মানুষেরা মসজিদের প্রতি অনুগত থাকবে। মসজিদের যে কোনো নির্দেশনাকে ভক্তি ও ভালবাসায় গ্রহণ করবে। মসজিদ যদি মানুষের বৈষয়িক বিপদ ও সমস্যা থেকে দূরে থেকে কেবল ধর্মীয় নসীহাত করতে থাকে, তাহলে মসজিদের সাথে মুমিনদের অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তৈরি হবে না। এ জন্য বাংলাদেশের মসজিদকে অবশ্যই মানুষের বিপদে, বিপর্যয়ে আশ্রয় হতে হবে। দিশেহারা অবস্থায় পথের নির্দেশনা দিতে হবে।

উপসংহার

বস্তুত প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত, জানাযা সালাত, সামষ্টিক কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ সালাত এবং অন্যান্য ষান্নাসিক বা বার্ষিক ইবাদাত যেমন তারাবীহ, লায়লাতুন নিসফি মিন শাবান, লায়লাতুল কদর, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাতসমূহ মসজিদে অনুষ্ঠিত হলেও কেবল এগুলোই মসজিদে অনুষ্ঠিতব্য কার্যক্রম নয় বরং এগুলো হলো মসজিদের বিপুল কার্যক্রমের অংশবিশেষ মাত্র। এ সালামগুলো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং অনিবার্য কিন্তু এগুলোর পাশাপাশি আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও অবশ্যস্বার্থী কার্যক্রম রয়েছে যেগুলো মসজিদে সম্পন্ন না হলে বা মসজিদকে কেন্দ্র করে সম্পন্ন না হলে মুসলিম উম্মাহ ‘আল্লাহর ঘর’ হিসেবে খ্যাত মসজিদের অভাবনীয় কল্যাণময়তা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। কেননা মসজিদ হলো আল্লাহ তা‘আলা প্রদত্ত ও আল্লাহর রাসুল সা. প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার অন্যতম মডেল। এখানে মুসলিমরা সমাজের সবরকম আচরণের প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বৃহত্তম সমাজে তা প্রয়োগ করবে। অক্ষরজ্ঞান, আনুগত্য, ভ্রাতৃত্ব, সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, সহযোগিতা, সহানুভূতি, সৌহার্দ, সাম্য, ঔদার্য ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষা যখন মসজিদ হতে গ্রহণ করা সম্ভব হবে এবং পরিবার ও সমাজে এ শিক্ষাসমূহ সার্থকভাবে প্রয়োগ করা শুরু হবে, মূলত তখনই মসজিদ সত্যিকারের সমাজকেন্দ্র হিসেবে স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠবে আর তাহলেই এই বিপুল আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা সার্থক হবে, সফল হবে।

তথ্যপঞ্জি

- ১ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী আল-জুফী (র), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, বুখারী শরীফ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মে ২০২২), খণ্ড ১, হাদিস নং ৭, পৃ. ১৬-১৭
- ২ বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর ৮৯.৬% ভাগ মুসলিম। *Bangladesh: An Overview (2008 Statistical Yearbook of Bangladesh)*, (Dhaka: Government of The People's Republic of Bangladesh, 28th Edition, March 2009), p. xvii
- ৩ আবদুল মমিন চৌধুরী, 'ঢাকা', সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাপিডিয়া* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০৩), খণ্ড ৪, পৃ. ১৯০
- ৪ ড. মুহাম্মদ মুত্তাফিজুর রহমান, *ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মসজিদের ভূমিকা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৭), পৃ. ৭
- ৫ বোরহান উদ্দীন, 'মাসজিদ/মসজিদ' সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও তৎকর্তৃক সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ১৯৯৫) খন্ড ১৮, পৃ. ৪৫৭
- ৬ বোরহান উদ্দীন, 'মাসজিদ/মসজিদ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৮
- ৭ আল-কুরআন, ৭২: ১৮
- ৮ মাওলানা আমিনুল ইসলাম, *তাকসীমে নূরুল কুরআন* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৮), খণ্ড-১ম, পৃ. ৪৬৪
- ৯ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মসজিদের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৪২৪/২০০৩), পৃ. ১০৫
- ১০ আবদুল মালিক বিন হিশাম, *সীরাতুন নববিয়াহ* (মিসর: দারুত তাকওয়া, ২০০৮), খণ্ড-১, পৃ. ১২৪
- ১১ মহানবী সা. বলেছেন, "আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় স্থান হলো মসজিদ এবং সবচেয়ে অপছন্দনীয় স্থান হলো বাজার।" ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী, সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত ও তৎকর্তৃক সম্পাদিত, *মুসলিম শরীফ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জানুয়ারি ২০১৫), খণ্ড-২, হাদিস নং ১৪০২, পৃ. ১৪৮
- ১২ আল-কুরআন, ২: ৪৩
- ১৩ আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন: "যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! আমার ইচ্ছা হয়, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে আদেশ দেই, তারপর সালাত কয়েমের নির্দেশ দেই, এরপর সালাতের আযান দেয়া হোক, তারপর এক ব্যক্তিকে লোকদের ইমামতি করার নির্দেশ দেই। এরপর আমি লোকদের কাছে যাই এবং (যারা সালামে শামিল হয়নি) তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেই।" আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী আল-জুফী (র), পূর্বোক্ত, খণ্ড ২, হাদিস নং ৬১৬, পৃ. ৫৯-৬০
- ১৪ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী আল-জুফী (র), *বুখারী শরীফ*, পূর্বোক্ত, খণ্ড ২, হাদিস নং ৬১৭, পৃ. ৬০
- ১৫ আল-কুরআন, ২৪: ৩৬-৩৮
- ১৬ আল-কুরআন, ৩: ৯৬
- ১৭ শিবলী নূ'মানী, *সীরাতুন নবী* (লাহোর: দারুল হাদিস, ২০০২), খণ্ড-৫, পৃ. ৩৬
- ১৮ মোহাম্মাদ আজরফ, *জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৪১১/১৯৯১), পৃ. ৮১
- ১৯ কাযী মুহাম্মদ সুলায়মান মানসূরপুরী, *রাহমাতুল্লিলি 'আলামীন* (লাহোর: মাকতাবাতে ইসলামিয়াহ, ২০০৬), খণ্ড-১, পৃ. ২৭৩
- ২০ অধ্যাপক নাজির আহমেদ ও ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস* (ঢাকা: আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৮৯), পৃ. ৭৪
- ২১ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশের মসজিদ* (ঢাকা: সুবর্ণ প্রকাশনী, ২০০১), পৃ. ১১
- ২২ আবদুল ওয়াহাব যুহরী, *ইসলাম কা নেযামে হায়াত* (লাহোর: কিতাব মঞ্জিল, ১৯৫৯), পৃ. ৪৩

- ২৩ আল-কুরআন, ৪: ৫৯
- ২৪ আল-কুরআন, ৪৯: ১০
- ২৫ আল-কুরআন, ৭: ৩১
- ২৬ আল-কুরআন, ৯: ১০৮
- ২৭ জাবির ইবন আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেন: “যে ব্যক্তি এইসব রসুন তরকারি খাবে, (কখনও বলেছেন) যে ব্যক্তি পেঁয়াজ, রসুন ও কুররাছ (গন্ধে ও স্বাদে পেঁয়াজের মতো সবজি বিশেষ) খাবে, সে যেন আমাদের মসজিদের কাছে না আসে। কেননা আদম সন্তান যাতে কষ্ট পায়, ফেরেশতারাও তাতে কষ্ট পায়।” ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী, সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত ও তৎকর্তৃক সম্পাদিত, মুসলিম শরীফ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জানুয়ারি ২০১৫), খণ্ড-২, হাদিস নং ১১৩৬, পৃ. ৫৯
- ২৮ মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.), আনু. মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দীন খান, মা’আরিফুল কুরআন (মদিনা মুনাওয়া: খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩/১৯৯২), পৃ. ৬১
- ২৯ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী, সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত ও তৎকর্তৃক সম্পাদিত, মুসলিম শরীফ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জানুয়ারি ২০১৫), খণ্ড-১, হাদিস নং ৪২৭, পৃ. ২৬৪
- ৩০ A.Z.M. Shamsul Alam, *The message of Tableg and Dawah* (Dhaka: Islamic foundation, 1993), p. 1042
- ৩১ আল-কুরআন, ৪: ১০৩
- ৩২ রাসুল্লাহ সা. বলেছেন, “সাবধান! তোমরা মসজিদের মধ্যে বাজারের মত হৈ হুল্লোড় করবে না।” ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী, সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত ও তৎকর্তৃক সম্পাদিত, মুসলিম শরীফ, পূর্বোক্ত, খণ্ড-২, হাদিস নং ৮৫২ পৃ. ৪০৯-৪১০
- ৩৩ Sir Muhammad Iqbal, *The Re-construction of religious Thought in Islam* (New Delhi: kitab bhavan, 1994) p. 92
- ৩৪ আল-কুরআন, ২: ১২৫
- ৩৫ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী, সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত ও তৎকর্তৃক সম্পাদিত, মুসলিম শরীফ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জানুয়ারি ২০১৫), খণ্ড-২, হাদিস নং ১০৭৩, পৃ. ৩৮
- ৩৬ আল-কুরআন, ৯: ১৭-১৮
- ৩৭ আল-কুরআন, ২: ১১৪
- ৩৮ শায়খ মুহাম্মদ বিন সালিম বীহানী, *ইসলাহে মু’আশারা আওর ইসলাম* (করাচী: জামি’আ উলুমুল ইসলামিয়াহ, ১৪১৪/১৯৯৪), পৃ. ৮৯
- ৩৯ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী, সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত ও তৎকর্তৃক সম্পাদিত, মুসলিম শরীফ, পূর্বোক্ত, খণ্ড-২, হাদিস নং ১৫২৫, পৃ. ১৮৭-৮৮
- ৪০ রাসুল্লাহ সা. বলেছেন, “তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন দু রাকাআত সালাত আদায় করে নেয়।” আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী আল-জুফী (র), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, বুখারী শরীফ, পূর্বোক্ত, খণ্ড ১, হাদিস নং ৪৩১, পৃ. ২৫০
- ৪১ মুফতী মুহাম্মদ শফী, *আদাবুল মাসজিদ* (চট্টগ্রাম: আশরাফিয়া কুতুবখানা), পৃ. ৬১
- ৪২ আল-কুরআন, ৬২: ৯
- ৪৩ আহমদ আবদুর রহমান তাহকীককৃত, *যাদুল মা’আদ* (মিসর: আলমাকতাবাতুত তাওফিকিয়াহ, তাবি), খণ্ড-১, পৃ. ১৬৫

- ৪৪ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা* (ঢাকা: গাওসিয়া পাবলিকেশন্স, তাবি), খণ্ড-২, পৃ. ২৮
- ৪৫ মুহাম্মদ সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ* (মিসর: দারুল ফাতহ লি ইংল্যান্ড 'আরাবী, ১৪১৯), খণ্ড-১, পৃ. ৩৭০
- ৪৬ অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক, *মানব সভ্যতায় মসজিদের অবদান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৪২৫/২০০৪), পৃ. ৭৪
- ৪৭ ড. মুস্তাফিজুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১
- ৪৮ শায়খ তুআহাল ওয়ালী, *আল-মসজিদু ফিল ইসলাম* (বৈরুত: দারুল 'ইলম লিল মালার্বিন, ১৯৮৮), পৃ. ১৫৯
- ৪৯ আবু মু'আয খালিদ বিন আবদুল 'আল, *আল-ইত্তেহাদুস সাজিদ বি আহকামিল মাসাজিদ*, (আন্দালুস: জামীআতু ইইইয়ায়িত তুরাসিল ইসলামিয়াহ, ২০০৭) পৃ. ১৯
- ৫০ আহমদ আবদুর রহমান তাহকীককৃত, *যাদুল মা'আদ*, পূর্বোক্ত, খণ্ড-১, পৃ. ৪৪
- ৫১ "It developed in them the sense of social equality and the consciousness of believers which the religion of Mohammad had theoretically substituted for blood relationship. The prayer ground thus became the first drill ground of Islam." Philip K. Hitti, *History of the Arabs* (London: Mecmillan education LTD, Tenth ed. 1970), p. 132
- ৫২ Abdul Kadar Tayob, *Islam a short introduction* (Oxford: 2006), p. 61-62
- ৫৩ Mufti Zafeeruddin, *Mosque in Islam* (New Delhi: Quzi publishers and distributors, 1996), p. 11
- ৫৪ এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামে মসজিদের ভূমিকা*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৪২৫/২০০৪), পৃ. ১০
- ৫৫ হারুনুর রশিদ, *রাজনীতি কোষ* (ঢাকা: মণ্ডলা ব্রাদার্স, ২০০৭), পৃ. ২৫৯
- ৫৬ Sir Thomas Arnold, *The caliphate*, (Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994), p. 35
- ৫৭ M. M. Picthal, *Cultural side of Islam*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1990), p. 167
- ৫৮ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *সীরাত বিশুকোষ*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৪২৩/২০০৬), খণ্ড-৫, পৃ. ৩৭০
- ৫৯ আবদুস সালাম রাহমানী, *তুযায়েনে মসজিদ* (দিল্লী: আদ-দারুল ইলমিয়াহ, ১৪১০/১৯৯০), পৃ. ৩-৪
- ৬০ অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক, *মানব সভ্যতায় মসজিদের অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯-১০
- ৬১ মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, *মসজিদ ও জীবন্ত মসজিদ* (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরি, ২০০৩), পৃ. ১৯
- ৬২ মোহাম্মাদ আকরাম খাঁ, *মুস্তফা চরিত*, (ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ. ৩৮৫-৮৬

উনিশ শতকে বাংলায় মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তার বিবর্তন

মোঃ কামাল হোসেন*

Abstract

The present article focuses on the pictures of the changing patterns of the Muslim thoughts that evolved over time in the 19th century Bengal. The thinking patterns of the Bengali Muslims evolved with the spirit of revolution against the British; however, it ended with a political compromise with the British. In the beginning, the Bengali Muslims revolted against the British colonial rule in an attempt to revive the spirit of Islamic ideologies. However, in the mid-nineteenth century a change occurred in the mind set of the Bengali Muslims and they moved forward with the spirit of a compromise with a view to establishing their rights. During this movement, the Bengali Muslims tried to adapt their ideologies and thinking patterns to the global politics. As a result, a great change occurred in the mindset of the 19th Bengali Muslim society from the global perspective. In this article, this change is seen as the rebirth of Islamic ideology in the thinking patterns of the Bengali Muslims.

চাবিশব্দ: নবজাগরণ, বৌদ্ধিক রূপান্তর, পুনরুত্থানবাদী, ভাবদ্বন্দ্ব, প্যান-ইসলাম

ভূমিকা

বাংলার ইতিহাসে উনিশ শতক নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এ শতককে বাংলার ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণও বলা হয়। উল্লেখ্য যে, আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাতেই প্রথম ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এ ব্রিটিশ শাসনের সূত্র ধরেই ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে বাংলাতেই প্রথম পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভিঘাত শুরু হয়। ব্রিটিশ শাসনে বুর্জোয়া অর্থনীতি ও আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে উনিশ শতকে বাংলায় যে পরিবর্তনের সূচনা হয়, তাকে সাধারণভাবে ‘নবজাগরণ’ বলা হয়ে থাকে। এ নবজাগরণের প্রভাবে বাঙালির জীবনযাত্রায় আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে। যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ইতিহাসবোধের বিস্তৃতির সাথে বাঙালি সমাজ ক্রমশ রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠে। মানবিকতাবোধ, অধিকার সচেতনতা ও স্বদেশপ্রেম বাঙালি মননকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করে। উনিশ শতকে বাঙালির জীবন ও মনোজগতে এ রূপান্তর তথা নবজাগরণকে অনেক পণ্ডিত বাংলার রেনেসাঁ হিসেবেও দেখেছেন। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার ও সুশোভন সরকার প্রমুখের মত প্রণিধানযোগ্য। তাঁরা উনিশ শতকে বাঙালির বৌদ্ধিক রূপান্তর বা নবজাগরণকে রেনেসাঁ বলে আখ্যায়িত করেছেন। যদুনাথ সরকারের মতে, “কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর ইউরোপের ইতালিতে যে রেনেসাঁ দেখা যায়, উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ ছিল তদাপেক্ষা ব্যাপক গভীর এবং অধিকতরও বৈপ্লবিক। এই নবজাগরণ ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি রেনেসাঁ।”^১ সুশোভন সরকার মনে করেন যে, পঞ্চদশ শতকে ইউরোপের নবজাগরণে ইটালি যে ভূমিকা নিয়েছিল উনিশ শতকের নবজাগরণের বাংলা সেইরূপ ভূমিকা নিয়েছিল। যুক্তি হিসেবে তাঁরা দেখান যে, ইউরোপীয় নবজাগরণ যেমন

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ইউরোপের অন্ধকার, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত করেছিল ঠিক তেমনি বাংলার নবজাগরণ ভারতবর্ষে অন্ধকার, জড়তা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে।^{১২} অবশ্য এ বিষয়ে মতভিন্নতাও রয়েছে।^{১৩} তবে আলোচ্য প্রবন্ধে বিষয়টি প্রাসঙ্গিক নয় বিধায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। তবে এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক থাকলেও এ কথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে, উনিশ শতকে পাশ্চাত্যের প্রভাবে বাংলায় এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়। এ পরিবর্তনের ফলে বাংলার রাজনীতিতেও নতুন আবহ ও ব্যঞ্জন তৈরি হয়। ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকে বাংলার জনসমষ্টি প্রধান দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল- হিন্দু ও মুসলিম। উনিশ শতকের পরিবর্তিত বাস্তবতায় হিন্দু সমাজ সহজেই নিজেদের খাপ খাইয়ে নেন। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি পাশ্চাত্য ধাঁচের নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির সাথেও তারা সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু মুসলিম সমাজের ক্ষেত্রে তা হয়নি। মুসলিম সম্প্রদায় অতীতে শাসক জাতি ছিল বিধায়, সেই মনোভাব বজায় রেখে বিধর্মী শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। শুধু তাই নয়, ধর্মাশ্রয়ী ফরায়াজসহ কতিপয় আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের হাত থেকে রাজক্ষমতা দখল করে নেয়া ইংরেজ শাসককূলের প্রতি তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে থাকে। এ সময় উত্তর ভারতে সূচিত তরিকায় মুহাম্মদি বা তথা ওয়াহাবি আন্দোলনের জিহাদি প্রবণতা বাংলার মুসলিম জনমতকে প্রভাবিত করে। ফলে ইংরেজ শাসন উচ্ছেদে তারা সশস্ত্র জিহাদি পন্থা অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এ অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। এ সময় মুসলিম সমাজে নগরবাসী ইংরেজি শিক্ষিত ও পেশাদার শ্রেণি থেকে আগত এক নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, নিজেদের সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে হলে প্রতিবেশী হিন্দুদের মতো পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ ছাড়াও ইংরেজ সরকারের সাথে সহযোগিতার রাজনীতি ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। তাই তাঁরা মুসলমান সমাজের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে উদ্যোগী হন। এর ফলে বাংলার মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপান্তর ঘটে। তারা যুদ্ধংদেহী নীতি পরিহার করে সরকারের প্রতি অনুগত ও সহযোগিতার রাজনীতি গ্রহণ করে। আলোচ্য প্রবন্ধটি উনিশ শতকে বাংলার মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার এ রূপান্তরের প্রকৃতি ও স্বরূপ অনুসন্ধানের একটি প্রয়াস। প্রবন্ধে প্রাথমিক উৎস ব্যবহারের পাশাপাশি উপাদান হিসেবে দ্বৈতায়িক উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রবন্ধটি মুখ্যত বর্ণনামূলক হলেও এতে জ্ঞাত বিষয়ের পর্যালোচনা এবং ক্ষেত্র বিশেষে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণের প্রয়াসও রয়েছে।

মুসলিম সমাজের উপর কোম্পানি শাসনের প্রভাব

বাংলায় শাসনতান্ত্রিকভাবে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা অনুশীলন শুরু হয় ১৭৬৫ সালে। তবে কার্যত কোম্পানির কর্তৃত্ব ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে যায়। কোম্পানি শাসন এদেশের রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিবর্তনের সূচনা করে। এতে বাংলার বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সনাতন অধিকার ও সুবিধাগুলো বাঁধগ্রস্ত হয়। তবে এক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের ওপর কোম্পানি শাসনের প্রভাব ছিল অন্যদের তুলনায় বেশি ক্ষতিকর। এর কারণ কোম্পানির কাছে রাজক্ষমতা হারানোর ফলে মুসলিম সমাজ তাদের কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি, অন্যদিকে কোম্পানি সরকারও মুসলমানদের কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে পারেনি। এ কারণে কোম্পানি সরকার ভবিষ্যৎ বিপদের ঝুঁকি এড়ানোর অভিপ্রায় নিয়ে শুরু থেকেই মুসলিম সমাজকে হীনবল করার সচেতন কর্মসূচি গ্রহণ

করে।^৪ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এদেশে দীর্ঘকাল মুসলিম শাসন বজায় থাকায় তুলনামূলক বিচারে মুসলমানরা সুবিধাভোগী ছিল। সেনাবাহিনী, রাজস্ব ও বিচার প্রশাসন এবং অন্যান্য শাসন বিভাগে মুসলমানদের প্রাধান্য তাদের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের উৎস বলে গণ্য হতো। কিন্তু কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠার পর তারা একে একে তাদের সমৃদ্ধির পূর্বোক্ত সূত্রসমূহ থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। কোম্পানি সরকারের নতুন ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতি, শিক্ষানীতি ও সরকারি চাকুরিতে নিয়োগনীতি মুসলিম সমাজের স্বার্থানুকূল না হওয়ায় তারা অর্থগণের এসব উৎসপথ হতে বঞ্চিত হন।

১৮৩৭ সালে কোম্পানি সরকার ফারসি স্থলে ইংরেজিকে রাজভাষা করে। এর ফলে মুসলমানদের দুর্দশা আরো চরম পর্যায়ে পৌঁছে। কিছুটা দারিদ্র্যের কারণে এবং কিছুটা জাত্যাভিমানের কারণে মুসলমান সমাজ সরকারের প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। এ অবস্থায় রাজকীয় ও দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি প্রবর্তনের ফলে সরকারি চাকুরিতে প্রবেশের সুযোগ মুসলমানদের জন্য প্রায় বন্ধই হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে ডব্লিউ হান্টার মন্তব্য করেছেন যে, চাকুরি ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে এমনভাবে বাদ দেয়া হয়েছে যে, কলকাতার অফিসগুলোতে চাপরাশী, কলম মেরামতকারী প্রভৃতি নিম্নতম পদে নিযুক্ত কতিপয় কর্মচারী ছাড়া অন্য কোনো পদে মুসলমান নেই বলেই চলে।^৫ Sh. A Rashid এর বর্ণিত তথ্যের আলোকে এম এ রহিম তাঁর গ্রন্থে কোম্পানি সরকারের আমলে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তাতে মুসলমানদের দূরবস্থার চিত্রটি প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে।^৬ উল্লেখ্য যে, সরকারি চাকুরিতে মুসলমানদের এ পশ্চাদপদতার কারণ যে, শুধু তাদের ইংরেজি শিক্ষার অভাব ছিল তা নয়, এর পিছনে সরকারের মুসলিম বিদ্বেষী নীতিও দায়ী ছিল। প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে জানা যায় যে, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই মুসলমানদের নিয়োগ না দিয়ে হিন্দুদের নিয়োগ প্রদান করা হতো। এমনকি চাকুরির বিজ্ঞাপনেও উল্লেখ থাকতো যে, কেবল হিন্দুরাই আবেদন করতে পারবেন। ১৮৬৯ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত দূরবীন নামক একটি ফারসি পত্রিকায় সরকারের এ নীতির সমালোচনা করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল।^৭ সরকারি চাকুরিসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রাধান্য দেয়ার পিছনে যে প্রধান কারণটি ছিল, তা হলো মুসলমানদের প্রতি সরকারের বিদ্বেষ ও তাঁদের আনুগত্য সম্পর্কে তাদের সংশয়। অন্যদিকে শুরু থেকেই হিন্দু সমাজ ব্রিটিশদের প্রতি তাদের অনুগত্য প্রকাশ করে এবং তাদের কর্মকাণ্ডে শাসকগোষ্ঠীর মনে এ ধারণা জন্মে যে, তারা ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অধিকতর বিশ্বস্ত। এমনকি কোম্পানি সরকারের মনে এ ধারণাও জন্মেছিল যে, যতদিন হিন্দু সমাজ ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত থাকবে, ততদিন মুসলমানগণ অসন্তুষ্ট হয়েও কোম্পানি সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না।^৮ আর এ কারণেই তাঁরা মুসলমানদের হীনবল করার বিপরীতে হিন্দু সম্প্রদায়কে শক্তিশালীকরণের যে নীতি গ্রহণ করেন, তাতে মুসলমান সম্প্রদায় একটি দারিদ্র্যক্লিষ্ট দুর্দশাগ্রস্ত জাতিতে পরিণত হয়। মুসলিম সমাজের সার্বিক দূরবস্থার চিত্র দেখে হান্টার মন্তব্য করেন যে, কোম্পানি শাসন পূর্ব যুগে বাংলার মুসলিম সমাজে অভাবগ্রস্ত লোকের সন্ধান পওয়া দুরূহ ছিল, আর পাঁচাত্তর বছরব্যাপী কোম্পানি শাসনের প্রভাবে তাদের মধ্যে সচ্ছল পরিবার পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে।^৯

কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজের প্রতিক্রিয়া: প্রাথমিক পর্যায়

ব্রিটিশ কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সাড়ে পাঁচশত বছরের রাজক্ষমতা ও রাজ্য হারিয়ে মুসলিম সমাজ একটি দিকভ্রান্তির মধ্যে পড়েছিল। অবশ্য অচিরেই মুসলমানরা এ দিকভ্রান্তি কাটিয়ে

তাদের হৃত রাজ্য হারানোর তথা অতীত গৌরব ফিরে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আঠারো শতকের কিছু প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এসব প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে ছিল ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬০-১৮০০ খ্রি.), শমসের গাজীর বিদ্রোহ (১৭৬৭-৬৮ খ্রি.), রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩ খ্রি.), বরিশালের বলাকী শাহের বিদ্রোহ (১৭৯২) এবং সিলেটের আগা মোহাম্মদ রেজা শাহের বিদ্রোহ ইত্যাদি।^{১০} এসব প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে ব্যাপকতা ও জনসম্পৃক্ততা বিবেচনায় ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্নে উদ্ভূত সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ফকির নেতা মজনু শাহ ও সন্ন্যাসী ভবানী পাঠকের নেতৃত্বে এ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। আঠারো শতকে পরিচালিত অন্যান্য প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোও প্রকৃতিগত দিক থেকে প্রায় একই রকম ছিল। এ সব আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল ভূমিতে অধিকার হারানোর প্রতিবাদ এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অর্থনৈতিক দোসর হিসেবে আবির্ভূত নতুন ভূমিজ পুঁজিপতি শ্রেণির অন্যায়-অন্যায় শোষণের বিরুদ্ধে। কোম্পানি সরকার তার দোসরদের রক্ষায় এগিয়ে এলে প্রতিরোধ আন্দোলনকারীদের সাথে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। আর এ সংঘাতে কোম্পানি সরকারের উন্নত রণকৌশল ও সামরিক প্রযুক্তির কাছে এসব দেশীয় প্রতিরোধের অবসান ঘটে।

মুসলিম রাজনীতির স্বরূপ ও ধারা : উনিশ শতকের প্রথমার্ধ

পুনশ্চ উল্লেখ্য যে, বাংলার ইতিহাসে উনিশ শতক যথেষ্ট গুরুত্বের দাবিদার। এ শতকে ইউরোপে নব নব চিন্তাধারা ও বিধিব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ঘটে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির মাধ্যমে এর ডেউ বাংলাকেও আন্দোলিত করেছিল। ফলে বাঙালির আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তা-চেতনার জগতেও পরিবর্তন সূচিত হয়। এ সময়ে বাঙালির একাংশ নিজেদেরকে এক স্বতন্ত্র বাঙালি জাতি হিসেবে ভাবতে শুরু করে। তবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও প্রগতিমন্ড নেতৃত্বের অভাবে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি মুসলমান সমাজে রাজনৈতিক চিন্তা ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। উল্লেখ্য যে, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ছিল সুন্নি আদর্শে বিশ্বাসী। ইতিহাসবিদদের অনেকেই মনে করেন যে, ঔপনিবেশ শাসন পূর্ব যুগে শিয়া মতাদর্শের অনুসারী নবাবদের শাসনামলে রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ হিসেবে রাষ্ট্র ও প্রশাসনে সুন্নিদের অংশীদারিত্ব ক্রমশ হ্রাস করা হয়। নবাবগণ বহিরাগত শিয়া ও অবাঙালি মাড়োয়ারী হিন্দুদের সাহায্যে সরকার পরিচালনার নীতি গ্রহণ করায় বাঙালি মুসলমানরা ক্রমশ সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং রাজনৈতিক সচেতনতাও হারিয়ে ফেলেন।^{১১} বাংলায় রাজপৃষ্ঠপোষকতায় যে বহিরাগত অবাঙালি মুসলিম অভিজাত শ্রেণি গড়ে ওঠেছিল, ইংরেজ শাসনের অভিঘাতে তাঁরাও ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে মুসলিম সমাজের নেতৃত্বে এক ধরনের শূন্যতা দেখা দেয়। ফলে বাংলায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপীয় ভাবধারাপৃষ্ঠ যে নতুন ধারার রাজনীতির সূচনা হয়, হিন্দু সমাজ এর মমার্থ উপলব্ধি করে এর সাথে যুক্ত হলেও উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে মুসলিম সমাজ সে রাজনীতির ধারা আত্মস্থ করতে ব্যর্থ হয়।

এক দিকে পুরনো অভিজাত শ্রেণির অবক্ষয়, অন্যদিকে উনিশ শতকের নতুন বাস্তবতার উপযোগী নতুন নেতৃত্ব বিকশিত না হওয়ায় বাঙালি মুসলিম সমাজের এ শূন্যতা পূরণ করেন সাধারণ মানুষ থেকে উঠে আসা কতিপয় ধর্মীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি। এঁরা হলেন হাজী শরীয়াতউল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০খ্রি.), দুদু মিয়া (১৮১৯-৬২ খ্রি.) এবং মীর নিসার আলী তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১ খ্রি.)

প্রমুখ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলিম সমাজে তাঁরাই নেতৃত্ব দেন। এদের মধ্যে হাজী শরীয়তউল্লাহ মুসলিম ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের তিন পুরোধা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব (১৭০৩-৯২ খ্রি.), শাহ ওয়ালীউল্লাহ (১৭০৩-৬২ খ্রি.) এবং সৈয়দ আহমদ বেরলভী (১৭৮৬-১৮৩১ খ্রি.) প্রমুখের ধর্মচিন্তা দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত ছিলেন। ফরিদপুরের এক সাধারণ পরিবারের সন্তান ছিলেন হাজী শরীয়তউল্লাহ। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন প্রবাহ অতিক্রান্ত হওয়ায় সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। মক্কায় সুদীর্ঘ সময় অবস্থান করে তিনি যে ধর্মীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জন করেছিলেন দেশে ফিরে তা দিয়ে এক সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁর সূচিত এ সংস্কার আন্দোলন “ফরায়েজি আন্দোলন” নামে পরিচিত।^{১২} শরীয়তউল্লাহর নেতৃত্বে পরিচালিত এ আন্দোলনের কালসীমা ছিল ১৮১৮-১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। প্রাথমিক পর্যায়ে এ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় সংস্কার। মুসলিম সমাজ থেকে অনৈসলামিক কুসংস্কার দূর করে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনায় উদ্বুদ্ধকরণ হাজী শরীয়তউল্লাহর সংস্কার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল। ফরিদপুর জেলা থেকে এ সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। তবে অসামান্য দ্রুততার সঙ্গে ঢাকা, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ (বর্তমান বরিশাল), ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা (বর্তমান কুমিল্লা), চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলাসমূহে এবং আসাম প্রদেশে এ আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। হাজী শরীয়তউল্লাহর ব্যক্তিত্ব ও মহৎ চারিত্রিক গুণাবলি দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে দুঃখ ও দুর্দশাগ্রস্ত বাঙালি মুসলমানরা তাঁর দলে যোগ দেন।

হাজী শরীয়তউল্লাহর কর্মকাণ্ডের মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ রাজনীতির যোগ ছিল না। তবে তিনি স্বজাতীয় মুসলমানদের কোম্পানি সরকারের সহযোগী ও দোসর নব্য জমিদারদের নিপীড়ন ও নির্যাতন থেকে রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকে মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নব্য জমিদারগণ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নয় এমন বহু অতিরিক্ত আবওয়াব (অবৈধ কর) কৃষকদের উপর চাপিয়ে দেয়।^{১৩} হাজী শরীয়তউল্লাহ এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং জমিদারদের এ সকল অবৈধ কর প্রদান না করার জন্য তাঁর শিষ্যদের নির্দেশ দেন। শুধু অত্যাচারী জমিদার নয়, ব্রিটিশ কোম্পানি শাসন সম্পর্কেও হাজী শরীয়তউল্লাহর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল। তিনি বাংলায় ব্রিটিশ শাসনকে মুসলমানদের আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য ক্ষতিকর বলে বিবেচনা করতেন। তাই হাজী শরীয়তউল্লাহও এ দেশকে “দারুল হরব” বলে ঘোষণা করেন।^{১৪} হানাফি আইনের অনুসরণে তিনি মত প্রকাশ করেন যে, বাংলায় যতদিন বৈধভাবে নিযুক্ত একজন মুসলিম শাসক দায়িত্ব গ্রহণ না করবেন অর্থাৎ এ দেশ “দারুল ইসলাম” না হবে, ততদিন এখানকার মুসলমানদের জুমআ ও ঈদের নামাজ পড়া সঙ্গত হবে না।

ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে শরীয়তউল্লাহর এ মনোভাব এবং বিশেষ করে জমিদারদের অন্যায় আচরণ ও শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান বাংলার জমিদারদের শক্তিত্ব করে তোলে। শরীয়তউল্লাহর প্রচারিত সাম্যের মতাদর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে বাংলার মুসলিম প্রজাসাধারণ এক মহাপরিবারের বন্ধনে আবদ্ধ হতে শুরু করলে আতঙ্কগ্রস্ত জমিদাররা নানা অজুহাতে তাঁর অনুসারীদের উপর অত্যাচার নিপীড়ন শুরু করেন। কোম্পানি সরকারও তাঁদের সাথে যোগ দেয়। শরীয়তউল্লাহ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলাসহ নানা নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ হয়রানি মোকাবিলা এবং শিষ্যদের রক্ষার জন্য হাজী শরীয়তউল্লাহ একটি নিজস্ব লাঠিয়াল বাহিনী গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।^{১৫} তবে এ বিষয়ে কার্যকর অগ্রগতি অর্জনের পূর্বেই ১৮৪০ সালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

হাজী শরীয়তউল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুহসিন উদ্দিন দুদু মিয়া (১৮১৯-৬২ খ্রি.) ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে ফরায়েজি আন্দোলন আরো ব্যাপক ও সংগঠিতরূপ লাভ করে। উল্লেখ্য যে, হাজী শরীয়তউল্লাহর জীবদ্দশায় পরিচালিত ফরায়েজি আন্দোলন ছিল মুখ্যত ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন। অত্যাচারী জমিদারদের প্ররোচনার কারণে দু'একটি সংঘর্ষ ব্যতীত কয়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে তাঁর আন্দোলনে কোনো সাংঘর্ষিক অবস্থা তৈরি হয়নি। কিন্তু দুদু মিয়ার সময়ে আন্দোলনে নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রসঙ্গের পাশাপাশি কিছু পরিমাণে হলেও রাজনৈতিক প্রসঙ্গও যুক্ত হয়। শুধু ধর্মীয় জীবনের পুনরুজ্জীবন নয়, অত্যাচারী হিন্দু জমিদার ও ইউরোপীয় খ্রিস্টান নীলকরদের নির্যাতনের হাত থেকে মুসলিম কৃষক প্রজাসাধারণকে রক্ষার জন্য দুদু মিয়া তাঁর সর্বশক্তি নিযুক্ত করেছিলেন। পিতার আর্থ-সামাজিক নীতি অনুসরণ করে দুদু মিয়া মানব কল্যাণে সমতা ও ভ্রাতৃত্বের ঘোষণা দেন এবং শ্রমের ওপর জমির মালিকানা নিহিত এ মতবাদ প্রচার করেন। তিনি অত্যাচারী জমিদারদের খাজনা প্রদান না করতে কৃষকদের উৎসাহিত করেন। দুদু মিয়ার এ ঘোষণা নির্যাতিত কৃষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের কৃষকরা ফরায়েজি আন্দোলনের সমর্থনে তাঁর চারপাশে ভিড় জমাতে থাকে। দুদু মিয়া তাঁর লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি স্বেচ্ছাসেবক লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলার পাশাপাশি ফরায়েজিদের নেতৃত্বে সনাতন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা (পঞ্চায়েত) পুনঃপ্রবর্তন করেন।^{১৬} দুদু মিয়ার তৎপরতায় ফরায়েজিগণ অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী হয়ে ওঠেন এবং অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শুরু করেন। ফলে জমিদার ও নীলকরদের সাথে ফরায়েজিদের সংঘাত শুরু হয়।

দুদু মিয়ার নেতৃত্বাধীন ফরায়েজি আন্দোলন নিজেদের স্বার্থ-পরিপন্থি হওয়ায় জমিদার ও নীলকররা এ আন্দোলনকে অকার্যকর করতে এক জোট হয়। ফরায়েজিদের উপর শুধু হামলা নয়, দুদু মিয়াসহ ফরায়েজি আন্দোলনের নেতাদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু মামলাও করা হয়। ফলে তাঁদের উপর পুলিশী হয়রানি ও নির্যাতন নেমে আসে। এমনকি দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করে মুসলিম শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়।^{১৭} তবে কোম্পানি সরকারের বিরুদ্ধে দুদু মিয়ার প্রত্যক্ষ তৎপরতার তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তাঁর সকল কার্যক্রম পরিচালিত হতো অত্যাচারী জমিদার, নীলকর ও তাঁদের সমর্থক-সহযোগীদের বিরুদ্ধে। আর জমিদার ও নীলকরদের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক ছিল কোম্পানি সরকার। এ বিবেচনায় দুদু মিয়ার তৎপরতাকে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী বলা যেতে পারে। কিন্তু তিনি সরাসরি কোম্পানি সরকার উৎখাত তৎপরতায় লিপ্ত ছিলেন এমনটা বলা যায় না। এতদসত্ত্বেও ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় সরকার দুদু মিয়াকে গ্রেপ্তার করে। কারণ সরকারের আশঙ্কা হয় যে, তিনি এ বিদ্রোহে যোগ দিলে তা সরকারের জন্য বড় রকমের হুমকির কারণ হবে। তাঁকে আলিপুর জেলে বন্দি করে রাখা হয়। ১৮৬১ সালে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। ১৮৬২ সালে ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়। দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গাজীউদ্দিন হায়দর (১৮৬২-৬৪ খ্রি.), আবদুল গফুর নয়া মিয়া (১৮৬৪-৮৩ খ্রি.) এবং সইদউদ্দিন আহমদ (১৮৮৩-১৯০৬ খ্রি.) পর্যায়ক্রমে ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তবে তাঁদের সময় এ আন্দোলনের গতি ক্রমশ মন্থর হয়ে পড়ে।

হাজী শরীয়তউল্লাহ যখন বাংলায় ফরায়েজি আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তাঁর সমকালে সৈয়দ আহমদ বেরলভী উত্তর ভারতে তরিকায়ে মুহাম্মদী নামক এক সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন।^{১৮} ব্রিটিশ সরকার ও তার সমর্থক ইতিহাসবিদগণ সৈয়দ আহমদ পরিচালিত এ আন্দোলনকে ওয়াহাবি

আন্দোলন নামে আখ্যায়িত করেন। ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে এ আন্দোলনটি শুরু হলেও পরে এটি জিহাদি রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। সৈয়দ আহমদ বেরলভী অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসক এবং তাঁদের এদেশীয় দোসরদের হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষার উদ্দেশ্যে জিহাদের ডাক দেন। অনেকেই বাংলায় পরিচালিত ফরায়েজি আন্দোলনকে তথাকথিত ওয়াহাবি আন্দোলনের সমার্থক বলে দাবি করেন। তবে এমত সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। মুসলিম সমাজে বিশুদ্ধ ধর্মীয় রীতিনীতির পুনঃপ্রবর্তন এ আন্দোলন দু'টির লক্ষ্য ছিল সত্য, তবে ফরায়েজিগণ ওয়াহাবিদের মতো বিপদজনক জিহাদি রাজনৈতিক মত পোষণ করতেন না। এদেশ থেকে কোম্পানি শাসন উৎখাতে তাঁদের কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মসূচিও ছিল না। বস্তুত এটি ছিল জমিদার, নীলকর ও তাদের দালালদের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার কৃষকদের শ্রেণি সংগ্রাম।^{১৯} অত্যাচারী জমিদার ও নীলকররা নিজেদের স্বার্থে ফরায়েজিদের একটি বিপদজনক সরকার বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রদর্শনের চেষ্টা করেছিলেন।

হাজী শরীয়তউল্লাহ যখন পূর্ব বাংলায় ফরায়েজি আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন সে সময়ই পশ্চিম বাংলায় আরেকটি আন্দোলন পরিচালিত হয় এবং এ আন্দোলনের নেতা ছিলেন মীর নিসার আলী তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১ খ্রি.)। পশ্চিম বাংলার বারাসত জেলার অধিবাসী কৃষক পরিবারের সন্তান তিতুমীর প্রথম জীবনে একজন মল্লযোদ্ধা ছিলেন। জীবনের এক পর্যায়ে মক্কায় হজ্ব করতে গিয়ে তিনি সৈয়দ আহমদ বেরলভীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৮২৭ সালে দেশে ফিরে এসে তিনি নিজ এলাকায় এক সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন।^{২০} প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর আন্দোলনেরও লক্ষ্য ছিল সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার। কিন্তু অচিরেই তাঁর কর্মপ্রয়াস বাংলার প্রজাকুলের উপর স্থানীয় জমিদার এবং ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচার প্রতিরোধ এবং ব্রিটিশ শাসন থেকে বাংলাকে মুক্ত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। এ নিয়ে স্থানীয় জমিদার ও নীলকরদের সাথে তাঁর বিরোধ ও সংঘাত শুরু হয়। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তিতুমীর এক মুজাহিদ বাহিনী গঠন করেন এবং তাঁর অনুসারী ও ভাগিনেয় গোলাম মাসুমকে এ বাহিনীর অধিনায়ক করা হয়। তিতুমীরের শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে জমিদারগণ তাঁর বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ সৃষ্টি এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোম্পানি সরকারকে সম্পৃক্ত করেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তিতুমীর ১৮৩১ সালে নারকেলবাড়িয়ায় এক দুর্ভেদ্য বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর তিতুমীর নিজেকে “বাদশাহ” বলে ঘোষণা দেন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার জমিদারদের নিকট রাজস্ব দাবি করেন। চব্বিশ পরগণা, নদীয়া ও ফরিদপুর জেলায় স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর তিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার পূর্বেই গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিন্কেসের নির্দেশে লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী ১৮৩১ সালের ১৪ নভেম্বর তিতুমীরের মুজাহিদদের উপর আক্রমণ চালায় এবং সহজেই তাদের পরাজিত করে। ইংরেজদের কামানের গোলাবর্ষণে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। বহুসংখ্যক অনুসারীসহ তিতুমীর এ যুদ্ধে শহীদ হন।^{২১}

কোম্পানি সরকারের কর্মকর্তা এবং হান্টারসহ ইউরোপীয় ইতিহাসবিদগণের অনেকই মনে করেন যে, তিতুমীরের আন্দোলনের পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। আর এ উদ্দেশ্যটি হলো ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করে মুসলিম শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। আজিজুর রহমান মল্লিক অবশ্য এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তিনি এ আন্দোলনকে ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন বলেই মনে করেন।^{২২} সুপ্রকাশ রায়সহ ভারতীয় অনেক মার্ক্সীয় ইতিহাসবিদ তিতুমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত

আন্দোলনকে জমিদার ও নীলকরদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে উৎপীড়িত কৃষকশ্রেণির সংগ্রাম বলে আখ্যায়িত করেন।^{২৩} সন্দেহ নেই তিভুমীরের আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য তাই ছিল। তবে পরবর্তীতে এ আন্দোলন রাজনৈতিক মাত্রা লাভ করে এবং মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়রোধ প্রয়াসের সাথে সাথে সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক অগ্রাসন প্রতিরোধ তৎপরতায় পর্যবসিত হয়।^{২৪}

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে উপর্যুক্ত দুটি আন্দোলন ছাড়াও বাংলায় সৈয়দ আহমদ বেরলভী পরিচালিত তরিকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলনের প্রভাবে ব্রিটিশ বিরোধী জিহাদি আন্দোলনও পরিচালিত হয়। শাহ আবদুল আজিজের শিষ্য সৈয়দ আহমদ বেরলভী ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের জন্য তাঁর আন্দোলন শুরু করেছিলেন। পরে তিনি ধর্ম রক্ষা ও ন্যায়ের জন্য মুসলমানদের ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে উদ্বুদ্ধ করেন।^{২৫} হজ্জ করতে মক্কায় গমনকালে সৈয়দ আহমদ কলকাতায় আসলে বাংলার বহু মুসলমান তাঁর কাছে দীক্ষা নেন এবং তাঁর জিহাদি তৎপরতায় যুক্ত হন। সৈয়দ আহমদ বেরলভীর শিষ্য মৌলবী এনায়েত আলীর পাটনায় অবস্থিত খানকাহ বাংলার জিহাদ আন্দোলনের রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল। বাংলাদেশ ও বিহার হতে স্বেচ্ছাসেবক ও অর্থ সংগ্রহ করে পাটনা কেন্দ্রের মাধ্যমে সুদূর পাঞ্জাব অঞ্চলে জিহাদের জন্য প্রেরণ করা হতো। ১৮৩১ সালে বালাকোটের যুদ্ধে সৈয়দ আহমদের শাহাদত বরণের পরও বাংলায় জিহাদিদের তৎপরতা কিছু পরিমাণে অব্যাহত ছিল।^{২৬}

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ইউরোপীয় ভাবধারাপুষ্ট আধুনিক রাজনৈতিক কর্মধারা দেখা যায় না। এসময় তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মূলত ধর্মভিত্তিক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে এসময় মুসলমানদের পরিচালিত আন্দোলনগুলো ছিল বিশেষভাবে আঞ্চলিক, সম্প্রদায়গত ও পেশাভিত্তিক। এসব আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত আলেম সমাজ। তাঁদের পরিচালিত আন্দোলনগুলোর মধ্যে ধর্মীয় পুনর্জাগরণের আকৃতি ছিল প্রধান। তবে এতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচি যুক্ত হওয়ায় এসব আন্দোলন মিশ্ররূপ ধারণ করে। এসব আন্দোলনে ধর্মীয় পুনর্জাগরণ প্রয়াস মুখ্য হওয়ায় বাংলার মুসলমানদের মধ্যে প্যান ইসলামিজমের ধারণার বীজ বপিত হয়। ঔপনিবেশিক কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে তাদের যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ছিল তাতে জিহাদি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ইংরেজ শক্তির উৎখাত করাকে তাঁদের কেউ কেউ ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। তবে উত্তর ভারতের মতো বাংলায় জিহাদি প্রবণতা এতটা প্রকট ছিল না। বস্তুত ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদি তৎপরতাকে যারা ধর্মীয় কর্তব্য বলে এ ধারায় মুসলমান সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের এ চিন্তা কোনোভাবেই বাস্তবসম্মত ছিল বলে মানা যায় না। কারণ ভারতে কোম্পানি সরকার তখন একটি প্রতিষ্ঠিত শক্তি। এ শক্তিকে বল প্রয়োগে বিতাড়িত করার সামর্থ্য তখন এদেশীয় মুসলমানদের ছিল না। তাই তাদের উচিত ছিল ইংরেজ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাসমূহ গ্রহণ করে প্রথমে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করা এবং এরপর নিজেদের সংগঠিত করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কবল থেকে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। কিন্তু তাঁরা এটি করতে ব্যর্থ হয়। বস্তুত এ সময় যারা মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব দেন যুগ বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিল অস্পষ্ট। চিন্তাধারায় তাঁরা ছিলেন রক্ষণশীল এবং অনেকাংশে পশ্চাদমুখী। তাঁরা অতীতের গৌরবময় স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। তাই ভবিষ্যতের ডাকে সাড়া দিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের জন্য উপযোগী করণীয় নির্ধারণে তাঁরা ব্যর্থ হন। ফরাসি

বিপ্লবের ফলে ইউরোপে যে নতুন আদর্শ, ভাবধারা ও জীবনবোধের জন্ম হয়েছিল, কোম্পানি শাসনের সূত্র ধরে উনিশ শতকের শুরু থেকে বাংলায় এর আগমন শুরু হয়। কিন্তু বাংলার মুসলিম সমাজে নেতারা এর মর্মার্থ ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পারায় এটি গ্রহণ না করে নিজেদের ঐতিহ্যশ্রয়ী হয়ে থাকেন। ফলে এর দ্বারা নিজ সম্প্রদায়ের অবস্থার কাক্ষিত উন্নতি বিধানে তাঁরা ব্যর্থ হন। তবে এ কথাও মনে রাখা উচিত যে, ফরায়েজি ও তরীকায়ে মুহাম্মদী আন্দোলনের নেতাগণ এদেশে নির্যাতিত সাধারণ মানুষের মনে অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যে অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, এর ফল হিসেবে এদেশে সাধারণ মানুষ কায়ুমী স্বার্থবাদী শক্তির বিরুদ্ধে পরবর্তীকালে লড়াই সংগ্রামে প্রেরণা পেয়েছে। যার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ১৮৫৯-৬০ সালে পরিচালিত নীল বিদ্রোহ এবং ১৮৭২-৭৩ সালে পরিচালিত পাবনার কৃষক বিদ্রোহ।

উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলিম সমাজ যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে তাঁদের করণীয় নির্ধারণে অনেকাংশে ব্যর্থ হলেও হিন্দু সমাজে তা হয়নি। তাঁরা ব্রিটিশদের প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য শুরু থেকে তৎপর ছিল। এজন্য ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজ অসহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে তাদের উৎখাতের জন্য যখন জিহাদি তৎপরতায় লিপ্ত, তখন হিন্দুরা ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন। কোম্পানি সরকার প্রদত্ত রাজনৈতিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ খ্রি.) ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে এ তৎপরতা দেখা যায়। স্বসমাজের প্রতি ইংরেজ সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিবাদ তাঁরা করেছেন, তবে তা কোনো সোচ্চার প্রতিবাদ বা সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের মাধ্যমে নয়, বরং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে। এ লক্ষ্যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই তাঁরা বাংলায় সংবাদপত্র প্রকাশ ও সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা শুরু করেন। ১৮৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘Zamindary Association’ (ভূম্যধিকারী সভা) ছিল এরূপ একটি সংগঠন। পরে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছিল ‘Landholders Society’। এটি ছিল প্রথম জনসংস্থা যেটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গঠিত হয়েছিল।^{২৭} ১৮৫১ সালে ‘British Indian Association’ নামে আর একটি নতুন সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ১৮৫৩ সালের সনদ আইনকে কেন্দ্র করে ভারতবাসীর রাজনৈতিক আন্দোলন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সক্রিয় হয়ে উঠে। নতুন সনদ প্রাপ্তিকে সামনে রেখে ভারতবাসীর অভাব-অভিযোগগুলোর প্রতি ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ ও আশু ফল লাভের উদ্দেশ্যে হিন্দু নেতৃবৃন্দ এ অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। এসব প্রতিষ্ঠানের এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাসহ কিছু সংবাদ মাধ্যমের প্রচেষ্টায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই উচ্চশিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে জাতীয়তাবোধের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু তখন পর্যন্ত বাঙালি মুসলিম সমাজে আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবধারাপুষ্ট রাজনৈতিক চিন্তা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার কোনো স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়নি।

মুসলিম রাজনীতি: উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ

ফরায়েজি ও তরীকায়ে মুহাম্মদী বা তথাকথিত ওয়াহাবি আন্দোলনের ফলে মুসলিম মানসে যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ^{২৮} একে আরো প্রবল করে তোলে। ব্যাপকতা ও সময়ের দিক বিবেচনায় এটি ছিল এক বিরাট প্রতিরোধ সংগ্রাম বা গণ বিদ্রোহ। বিদ্রোহীদের তৎপরতা ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের উপক্রম হয়। কিন্তু

নানাবিধ কারণে শেষ পর্যন্ত এ বিদ্রোহ সফল হয়নি। সরকার অত্যন্ত নির্মমভাবে এ বিদ্রোহ দমন করে। তবে এ বিদ্রোহের সূত্র ধরে ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান হয় এবং ব্রিটিশ রাজশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্রোহের পরবর্তী সময় বঙ্গ-ভারতীয় মুসলমান সমাজ অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ দুঃসময়ে পতিত হয়। এ বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় যোগদান করলেও সরকার এর জন্য মুখ্যত মুসলমানদের দায়ী করে। সরকার বিদ্রোহের সার্বিক দায়িত্ব মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর চাপিয়ে তাদের উপর নানা ধরনের উৎপীড়ন ও চরম বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করতে থাকে। এমনিতেই ঔপনিবেশিক শাসন ভারতীয় মুসলমানদের জন্য দুর্দশার কারণ হয়েছিল; নবতর পরিস্থিতিতে এ দুর্দশা চরম আকার ধারণ করে।

সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতা ও তৎপরবর্তীকালে মুসলমান সমাজের উপর সরকারি আক্রোশ ইত্যাদির ফলে মুসলিম মানস চেতনায় এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। এ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গ-ভারতীয় মুসলমান সমাজে নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে। এ নেতৃত্ব ছিল নগরবাসী ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভকারী উদার মনোভাবাপন্ন। উপরে বর্ণিত মুসলিম সমাজের দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ব্রিটিশ রাজশক্তির উৎখাত কোনোভাবেই মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব নয়। উল্লেখ্য যে, এতদিন মুসলিম সমাজের যে অংশটি জিহাদের মাধ্যমে ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের স্বপ্নে বিভোর ছিল, সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার ফলে তাঁদের সে স্বপ্নেরও সমাধি রচিত হয়েছিল। এরূপ একটি পরিস্থিতিতে মুসলিম সমাজের নতুন নেতৃত্ব জিহাদি তৎপরতা পরিহার করে নিজেদের স্বার্থে ইংরেজ সরকারের সাথে সহযোগিতার নীতি গ্রহণের ব্যাপারে মুসলিম সমাজকে উদ্বুদ্ধকরণের নীতি গ্রহণ করেন। তাঁরা ব্রিটিশ মানস থেকে মুসলিম সমাজ সম্পর্কে অনাস্থা ও সন্দেহ-সংশয় দূরীকরণেও প্রয়াসী হন। আর ব্রিটিশ সরকারও নতুন অনুগত মুসলমান নেতাদের সহযোগিতার মনোভাবকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে।^{৯৯}

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্তিত বাস্তবতায় যে সব মুসলিম নেতা মুসলমান সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ও রূপান্তরে প্রয়াস নিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন— মৌলভী আবদুর রউফ, নবাব আবদুল লতিফ (১৯২৮-৯৩ খ্রি.), সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮খ্রি.) প্রমুখ। তাঁরা সকলেই ব্রিটিশ অনুগত ছিলেন এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত থেকে মুসলিম সমাজের উন্নতি সাধন করাই ছিল তাঁদের জীবনের মূল লক্ষ্য। মৌলভী আবদুর রউফ ছিলেন কলকাতা মাদ্রাসার আরবি বিভাগের অধ্যাপক এবং দূরবীন পত্রিকার সম্পাদক। প্রধানত তাঁর উদ্যোগ এবং কলকাতা আদালতের কাজী-উল-কুজ্জত ফজলুর রহমান ও মুহম্মদ মজহার প্রমুখ কয়েকজন উৎসাহী মুসলিম নেতার প্রচেষ্টায় ১৮৫৫ সালের ৮ মে কলকাতায় আঞ্জুমান-ই-ইসলামি নামে একটি সংগঠন স্থাপিত হয়। এটি ছিল মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত প্রথম সংগঠন। এর আগে মুসলমানদের অনুরূপ কোনো সংগঠন ছিল না। তবে ইতঃপূর্বে প্রতিষ্ঠিত 'British Indian Association' এ কয়েকজন মুসলিম নেতা সম্পৃক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। এদের মধ্যে ফরিদপুরে একজন বিশিষ্ট জমিদার মীর মুহাম্মদ আলী এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতির পদ লাভ করেছিলেন।^{১০০} অবশ্য এ সংগঠনের কর্মসূচিতে মুসলিম স্বার্থ ও জনমতের প্রতিফলন না থাকায় এর প্রতি মুসলমানদের আগ্রহ হ্রাস পায়। এরূপ একটি পরিস্থিতিতে আঞ্জুমান-ই-ইসলামি নামে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। মুসলমানের মধ্যে ঐক্য বিধান ও তাদের কল্যাণ সাধন করা,

কোম্পানি সরকার ও মুসলমানদের মধ্যে সংহতি স্থাপন, ইসলাম ধর্মের উৎকর্ষ সাধন ও প্রচারে সচেষ্ট হওয়া ইত্যাদি এ সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল। মুসলিম সমাজ তাদের দাবি-দাওয়া পূরণে সরকারের কাছে বিধিসম্মত উপায়ে আবেদন করবে এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক কাজ থেকে বিরত থাকবে এটি ছিল এ সংগঠনের মূল নীতি।^{১১} সংগঠনটির মুখপত্র ছিল সাপ্তাহিক ফারসি পত্রিকা দূরবীন। এটি ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে মুসলিম জনমত সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার মুসলিম সমাজের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন নবাব আবদুল লতিফ।^{১২} তিনি কেবল একজন পদস্থ সরকারি কর্মকর্তাই ছিলেন না, তিনি প্রথম মুসলমান যিনি ১৮৬২ সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। ১৮৫৯-৬০ সালে বাঙালির জাতীয় চেতনা উন্মোচনে সহায়ক নীল বিদ্রোহের সময় তিনি নিপীড়িত নীল চাষীদের পক্ষাবলম্বন করেন। নীলকরদের অত্যাচার বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য সরকার কর্তৃক ১৮৬০ সালে “ইন্ডিগো কমিশন” গঠনের পিছনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বাংলার মুসলিমদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে আবদুল লতিফের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথম উপলব্ধি করেন যে, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে ব্যর্থতা, ইংরেজি শিক্ষা বর্জন এবং সরকারের সঙ্গে অসহযোগ নীতির কারণে মুসলমান জাতি সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। তিনি মুসলিমদের শিক্ষা ও বৈষয়িক উন্নতিকল্পে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এসব উদ্যোগের মধ্যে ছিল ব্রিটিশদের নতুন শাসন পদ্ধতির সুফল ভোগ করার জন্য মুসলিমদেরকে প্রস্তুত করা; ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতি তাদের মধ্যে আনুগত্যের ভাব সৃষ্টি করা এবং এভাবে মুসলিমদের প্রতি ইংরেজদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষিত মুসলিমগণ সরকারের উদ্দেশ্য, শক্তি ও কৌশল বুঝতে পারলে তাদের মধ্যে ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতি আনুগত্যের মনোভাব সৃষ্টি হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি শাসকশ্রেণির সঙ্গে যে কোনো ধরনের সংঘর্ষ পরিহার করার পক্ষে ছিলেন। তিনি মুসলিমদেরকে সরকার বিরোধী তৎপরতা ত্যাগ করে সরকারের প্রতি আনুগত্য থেকে রাজকৃপায় নিজেদের অবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট হওয়ার পরামর্শ দেন। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তরিকায়ে মুহাম্মদী ও ফরায়েজিরা ব্রিটিশ ভারতকে ‘দারুল হারব’ ঘোষণা দিয়ে মুসলিমদের মুক্তির জন্য ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। আবদুল লতিফ এ রাজনৈতিক তত্ত্বের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং এ তত্ত্বের অসারতা প্রমাণের জন্য মক্কার প্রধান মুফতিসহ সে সময়কার প্রখ্যাত কয়েকজন আলেমের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করেন। তাঁর আমন্ত্রণে মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী ১৮৭০ সালের ২৩ নভেম্বর কলকাতায় নবাব আবদুল লতিফ প্রতিষ্ঠিত Mohamedan Literary Society^{১৩}-এর এক সভায় ঘোষণা যে, ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষ “দার-উল-হারব” নয়, বরং “দার-উল-ইসলাম”। যেহেতু ভারতবর্ষে মুসলিম সমাজ নির্বিঘ্নে তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতে পারছে, তাই ভারতকে ‘দারুল হরব’ বলে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা মুসলমানদের জন্য ন্যায় বিরুদ্ধ ও ধর্মদ্রোহিতার শামিল বলে তিনি ঘোষণা দেন। আবদুল লতিফ নিজেও এ সভায় বক্তৃতা করেন এবং ওয়াহাবিদের জিহাদি তৎপরতার সমালোচনা করেন।^{১৪} এভাবে তিনি উনিশ শতকের মুসলিমদের প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন।

বাংলার মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণের আন্দোলনে সৈয়দ আমীর আলী এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।^{১৫} লন্ডন থেকে আইন বিষয়ে উচ্চাভিধারী আমীর আলী ছিলেন এক বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের অধিকারী। তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বঙ্গীয় আইন পরিষদ ও

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন। আমীর আলী নবাব আবদুল লতিফ অপেক্ষা বয়োঃকনিষ্ঠ ছিলেন, তবে চিন্তা চেতনায় তিনি ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ নবাব আবদুল লতিফ, এমনকি ভারতে মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণের আরেক অগ্রদূত ও আলীগড় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-৯৮খ্রি.) অপেক্ষা অগ্রসর। মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণে পূর্বসূরীদের মতো তিনিও ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব স্বীকার করতেন এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ তাঁর অন্যতম জীবন ব্রত ছিল। তবে মুসলমানদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রশ্নে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও নবাব আবদুল লতিফের সাথে তাঁর মতভিন্নতা দেখা যায়। নবাব আবদুল লতিফ মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে উদ্যম ছিলেন, তবে পাশ্চাত্যের উদার রাজনৈতিক মতবাদের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। মুসলমানদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিষয়টিও তিনি সমর্থন করতেন না। একই রকম মনোভাব পোষণ করতেন স্যার সৈয়দ আহমদ খানও। তিনি মনে করতেন, এ মুহূর্তে মুসলিম সমাজ প্রত্যক্ষ রাজনীতির মঞ্চে আসার জন্য প্রস্তুত নয়। তিনি মনে করতেন হিন্দুদের তুলনায় সর্বক্ষেত্রে পশ্চাদপদ মুসলমানরা এ মুহূর্তে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলে ব্রিটিশ সরকারের সাথে তাদের বিরোধ তৈরি হবে; যা প্রকারান্তরে তাদের জন্য ক্ষতির কারণ হবে। তাই তিনি প্রকাশ্য রাজনীতি পরিহার করে ব্রিটিশদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে তাদের অবস্থার উন্নতির উপর গুরুত্বারোপ করেন। আর এভাবেই মুসলমানদের ব্রিটিশদের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা যাবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।^{৩৬} অন্যদিকে সৈয়দ আমীর আলী মনে করতেন যে, ব্যক্তি বিশেষের উদ্যোগে কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস মুসলমান সমাজের সামগ্রিক উন্নতি নিশ্চিত করতে পারবে না। এজন্য প্রয়োজন কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ প্রয়াস চালানো।^{৩৭}

সৈয়দ আমীর আলী লক্ষ্য করেন যে, হিন্দু সমাজের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি, বাংলা সাহিত্য, সংবাদপত্র ও সাময়িকীর প্রভাবে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছে। এর প্রভাবে তারা নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার ও দাবি-দাওয়া আদায়ে ইতোমধ্যে সাংগঠনিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে সফল হয়েছে। ১৮৭৭ সালে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির নেতৃত্বে গঠিত 'Indian Association' ছিল তাদের রাজনৈতিক অগ্রগতির একটি বড় মাইলফলক। ভারতের রাজনৈতিক জীবনে পরিবর্তনের আভাসের পটভূমিতে হিন্দু সমাজের সক্রিয় রাজনৈতিক তৎপরতার বিপরীতে মুসলমানদের রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তাকে সৈয়দ আমীর আলী তাদের জন্য বিপদজনক বলে মনে করেছিলেন। তিনি মনে করেন যে, হিন্দু সমাজের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিপরীতে মুসলমানদের নিজস্ব স্বার্থ রক্ষা, তাদের দাবি-দাওয়া সরকারের কাছে উপস্থাপন, সংস্কারের জন্য প্রস্তাবনা এবং সাংবিধানিক সুবিধা গ্রহণের জন্য মুসলমানদের অবশ্যই রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হতে হবে।^{৩৮} আমীর আলী লন্ডনে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের সাথে সাক্ষাতের সময় মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার ভবিষ্যৎ বিপদ সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের কথা বলেছিলেন। তিনি সৈয়দ আহমদকে বলেছিল যে, হিন্দুদের মধ্যে যেরূপ রাজনৈতিক সংগঠনের ব্যবস্থা হচ্ছে, মুসলমানদের মধ্যে সেরূপ না হলে তারা হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রবল শ্রোতে নিমজ্জিত হয়ে পড়বে।^{৩৯} তবে সৈয়দ আহমদ তখন আমির আলীর সাথে একমত পোষণ করেননি। নবাব আবদুল লতিফও সৈয়দ আমীর আলীর উদ্যোগের বিরোধিতা করেন। এমনকি আবদুল লতিফ পাশ্চাত্য

পোশাক পরিধানকারী ও পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুরাগী শিয়া মতাবলম্বী আমীর আলীর বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলেন।^{৪০}

সমসাময়িক প্রধান দু'জন মুসলিম নেতার বিরোধিতা সত্ত্বেও সৈয়দ আমীর আলী মুসলমানদের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন। ১৮৭৭ সালে তিনি কলকাতায় 'National Muhamedan Association' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন স্থানে এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ১৮৮৩ সালে কলকাতা স্থ সংগঠনের নামকরণ করা হয় 'Central National Muhamedan Association'। ন্যায় ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মুসলমানদের কল্যাণ সাধন; মুসলমানদের রাজনৈতিক পূর্ণজাগরণে উজ্জীবিতকরণ; তাদের নৈতিক উন্নতি সাধন এবং সরকারের প্রতি আনুগত্যের নীতি অনুসরণ করে মুসলমানদের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি আদায় করা ইত্যাদি এ সংগঠনের মূল লক্ষ্য ছিল। অতীতের সুমহান ঐতিহ্য থেকে প্রেরণা লাভ করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সমকালীন যুগের প্রগতিশীল চিন্তাধারার সাথে এক রকমের সমঝোতা সাধন করাও এর অন্যতম ব্রত ছিল বলে সৈয়দ আমীর আলী নিজেই উল্লেখ করেছেন।^{৪১}

'Central National Muhamedan Association'-কে ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন বলে আখ্যায়িত করা হয়। কারণ এর পূর্বে মুসলিম জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের ন্যায় পাওনা ও অধিকার, রাজভক্তি এবং সরকারের কাছে প্রতিনিধিত্ব করার মতো কোনো যোগ্য রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না। ইতঃপূর্বে যে সব সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে সবার প্রধান লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটানো। কিন্তু আমীর আলীর প্রতিষ্ঠিত এ সংস্থাটি মুসলিম সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক জাগরণের পাশাপাশি মুসলমানদের রাজনৈতিকভাবে উজ্জীবিত ও সংগঠিত করার প্রয়াস নেয়। সংগঠনটি তার পরবর্তী ২৫ বছরের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মুসলমানদের আধুনিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধকরণ ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে মুসলমানদের অংশগ্রহণ উচিৎ কি-না এ নিয়ে মুসলিম নেতৃত্ব যখন তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত সে সময় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ শে ডিসেম্বর "সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস" নামে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করা হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাব পাক-ভারতীয় উপমহাদেশকে আন্দোলিত করে। বিশেষ করে ইতালি ও জার্মানির একত্রীকরণ ও আয়ারল্যান্ডের স্বদেশ (Home Rule) আন্দোলনের প্রভাবে ভারতীয় জনগণ জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উৎসাহিত হয়। এ ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তদানীন্তন বড়লাট ডাফরিনের অনুমতি নিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু সংখ্যক ভারতবাসীর সহায়তায় ইংরেজ সরকারের সাবেক সেক্রেটারি অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম ১৮৮৫ সালে সর্বভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন।^{৪২} ভারতবাসীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা এবং ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করা এ সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম দিকে কংগ্রেস ছিল ব্রিটিশ সরকারের অনুগত একটি উদারনৈতিক মধ্যপন্থি রাজনৈতিক দল। কংগ্রেসকে হিন্দু সংগঠন বলা যায় না। এটি ছিল একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল। হিন্দু-মুসলিম সকলের জন্যই এ দলটির দ্বার উন্মুক্ত ছিল। তবে জাতীয় কংগ্রেস মুসলমানদের বিশেষ করে বাংলার মুসলমানদের ব্যাপক সমর্থন লাভ করেনি। এর পশ্চাতে সৈয়দ আহমদ খানের প্রভাব ছিল বলে মনে করা হয়। উল্লেখ্য যে, স্যার সৈয়দ আহমদ খান ছিলেন কংগ্রেসের ঘোর বিরোধী। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস

প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত স্যার সৈয়দ আহমদ খানের বক্তব্য ও চিন্তনে উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। এমনকি ১৮৮৪ সালে ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাঁকে প্রদত্ত এক সংবর্ধনার জবাবে তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উপর জোর দিয়ে বক্তব্য দিয়েছিলেন। এসময় পর্যন্ত তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের এক জাতি বলেই মনে করতেন এবং সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি ত্যাগ করে তাঁদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।^{৪৩} কিন্তু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরই তাঁর মনোভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। তাঁর কংগ্রেস বিরোধিতার পশ্চাতে মুসলিম স্বার্থ চিন্তা মুখ্য ছিল বলে ধারণা করা যায়। বহুতর কংগ্রেস অসাম্প্রদায়িক সংগঠন হলেও এর মধ্যে হিন্দু স্বার্থ সংরক্ষণের মনোভাব প্রবল ছিল। কংগ্রেস কর্তৃক ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুকরণে নির্বাচন প্রথার উপর ভিত্তি করে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার দাবি ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ প্রদানের দাবি ইত্যাদিকে তিনি মুসলিম স্বার্থ পরিপন্থি বলে মনে করতেন। এ কারণে সৈয়দ আহমেদ খান মুসলমানদের কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাবধান করে দেন এবং তিনি ঘোষণা করলেন যে, হিন্দু-মুসলিম দু'টি পৃথক জাতি। তাদের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী। যেহেতু কংগ্রেস হিন্দু প্রধান সংস্থা, তাই এর মাধ্যমে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা হতে পারে না। তিনি কংগ্রেসের সাথে সব রকম সম্পর্ক ও সহযোগিতা ছেদ করেন।^{৪৪} তিনি কংগ্রেসের বিকল্প রাজনৈতিক সংস্থা হিসেবে 'United Indian Patriotic Association' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

কংগ্রেস সম্পর্কে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মনোভাব এবং মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা শুধু উত্তর ভারতে নয়, বাংলার মুসলমান নেতাদেরও প্রভাবিত করেছিল। ফলে মুসলিম সমাজের প্রধান দুই নেতা নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী উভয়েই বাংলার মুসলমানদের কংগ্রেসে অংশগ্রহণের বিরোধিতা করেন। ১৮৮৫ সালে যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় তখন প্রথম অধিবেশনে 'Central National Mohammedan Association' ক্ষীণ সমর্থন জানায়। পরের বছর 'Mohammedan Literary Society' ও 'Central National Mohammedan Association' কোনো প্রতিনিধি না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। তাঁদের এ অবস্থানের ফলে বাংলায় কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। ১৮৯৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশনে বাংলা থেকে ৩৯ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিল। ১৮৯৮ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ অধিবেশনে বাংলার মুসলিম সদস্যের সংখ্যা ছিল তেত্রিশ।^{৪৫} প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্যার সৈয়দ আহমদ পরিচালিত আলীগড় আন্দোলনের বিপরীত ধারায় মাওলানা আবুল কাশেম নানতুভীর নেতৃত্বে দেওবন্দ মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে একটি আন্দোলন ও মতবাদ গড়ে ওঠেছিল। বিশুদ্ধ ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে ঐক্যবোধ সৃষ্টি, ইসলামি চেতনার বিকাশ সাধন দেওবন্দ আন্দোলনের অনুসারীদের মূল লক্ষ্য ছিল। তাঁরা স্যার সৈয়দ আহমদের কার্যকলাপের বিরোধী ছিলেন। গুরুতর দিকে তাঁদের সাথে রাজনীতির প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। তবে প্রচণ্ড ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব থাকায় তারা কংগ্রেসের রাজনীতি সমর্থন করেন।^{৪৬} আলীগড় আন্দোলন অপেক্ষা মুসলিম সমাজে দেওবন্দ আন্দোলনের প্রভাব কম ছিল। বাস্তব রাজনৈতিক কর্মসূচি না থাকায় তাঁরা মুসলিম জনমতকে খুব বেশি প্রভাবিত করতে পারেনি। ফলে সৈয়দ আহমদ খান ও তাঁর অনুসারীদের মতামতই মুসলিম সমাজে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। তাই কংগ্রেস ভারত তথা বাংলার মুসলিম সমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি।

উনিশ শতকে শেষপাদে বঙ্গ-ভারতীয় রাজনীতির উপর্যুক্ত পটভূমিকায় বাঙালি মুসলিম সমাজে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও সাম্প্রদায়িক চেতনার বিস্তার ঘটতে শুরু করে। ১৮৮১ সালে প্যান ইসলামিজমের^{৪৭} প্রবক্তা সৈয়দ জামালউদ্দিন আফগানির (১৮৩৮-৯৭ খ্রি.) কলকাতা সফরের ফলে বাংলার মুসলিম সমাজ বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে বিশ্ব মুসলিমবাদের ধারণা শক্তিশালী হয়। এ সময় মুসলিম সম্পাদিত আখবारे এসলামীয়া, ইসলাম, আহমদী, সুধাকর, ইসলাম প্রচারক, মিহির ও সুধাকর এবং নূর আল ইমান ইত্যাদি সংবাদপত্র ও সাময়িকী মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ জাহতকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আলোচ্য সময়ে মুসলিম সমাজে একদল সাহিত্যসেবীর আবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে মুনশী মহম্মদ মেহেরউল্লা (১৮৬১-১৯০৭ খ্রি.), শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১ খ্রি.), পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন মাহমাদী (১৮৫৯-১৯১১ খ্রি.), মুনশী শেখ জমিরুদ্দিন (১৮৬৭-১৯৩৭ খ্রি.), মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩ খ্রি.), মুহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমেদ (১৮৬২-১৯৩৩ খ্রি.) প্রমুখ ছিলেন অন্যতম। তাঁরা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩ খ্রি.), ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-৫৯ খ্রি.), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪ খ্রি.), রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-৮৭ খ্রি.) প্রমুখ হিন্দু লেখকদের মুসলিম বিদ্রোহী লেখনীর বিপরীতে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। এর ফলে মুসলিম সমাজে সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা ক্রমান্বয়ে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী হয়ে ওঠেন। তবে মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২ খ্রি.), কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১ খ্রি.), ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৭৯০১৯৩১ খ্রি.) প্রমুখ হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের পক্ষে অবস্থান নেন। এ প্রসঙ্গে আরো একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন দেলোয়ার হোসেন আহমেদ (১৮৪০-১৯১৩ খ্রি.)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম প্রাজুয়েট দেলোয়ার হোসেন আহমেদ ছিলেন পুরোপুরি যুক্তিবাদী একজন মানুষ। তিনি বাংলার মুসলিম রাষ্ট্রচিন্তায় একটি ব্যতিক্রমধর্মী যুক্তিবাদী ও আমূল সংস্কারবাদী ধারার প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী দেলোয়ার হোসেন মনে করতেন রাষ্ট্রকে ধর্মের সঙ্গে একত্র করার ফলে মুসলিম সমাজের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে, মুসলিম সমাজের চিন্তার অভাবে মুসলমানরা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে নি। তাই মুসলমানদের স্বার্থে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় তাদের অধিকতর চেষ্টা করা উচিত। তবে তাঁর অগ্রগামী চিন্তাধারা সমকালীন রক্ষণশীল মুসলমান সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। ফলে বিশ শতকের সূচনালগ্নে মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারায় স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রবল আকার ধারণ করে। যার পরিণতি ১৯০৬ সালের সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা। মুসলিম সমাজে রক্ষণশীল ধারার প্রাধান্য মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যচেতনার পিছনে কাজ করেছিল সন্দেহ নেই; তবে এর পিছনে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের সামাজিক আচরণ ও ক্রিয়াকর্মের ভূমিকাও অস্বীকার করা যায় না। বস্তুত তুলনামূলকভাবে প্রাচুর্য হিন্দু সমাজের সংকীর্ণ স্বার্থবাদী মনোভাব মুসলিম সমাজের মনে স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনা তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। আর এ স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনাই ১৯৪৭ সালে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। এর বেশ ধরেই ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল।

উপসংহার

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, উনিশ শতকে ব্রিটিশ শাসিত বাংলার মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারায় নানা রূপান্তর ঘটে। বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় এ রূপান্তর ধারার তিনটি রূপ পরিলক্ষিত হয়।

প্রথম ধারটি হলো ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদী। বহুত বাংলায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা এবং কোম্পানি সরকারের গৃহীত আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক নীতির ফলে তৎকালীন মুসলিম অভিজাত শ্রেণির পতন ঘটে। ক্ষয়িষ্ণু এ অভিজাত শ্রেণি উনিশ শতকের শুরুতে নবতর পরিস্থিতিতে মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব প্রদানে ব্যর্থ হয়। ফলে মুসলিম রাজনৈতিক অঙ্গনে যে নেতৃত্ব শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তা পূরণে সাধারণ মানুষ থেকে ধর্মাশ্রয়ী নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে। হাজী শরীয়াতউল্লাহ, দুদু মিয়া, মীর নিসার আলী তিতুমীর ছিলেন এ ধারারই প্রতিনিধি। পাশ্চাত্য ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিল না এবং এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কোনো আগ্রহও ছিল না। চিন্তাধারায় তাঁরা ছিলেন পশ্চাদমুখী। ধর্মীয় পুনর্জাগরণের মধ্যেই তাঁরা মুসলিম সমাজের মুক্তি ও উন্নতির চিন্তা করেছেন। ফলে ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যেই মুখ্যত তাঁরা তাদের কর্মকাণ্ড সীমিত রেখেছেন। ক্রমাগতই তাঁদের কর্মকাণ্ডে কিছু আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি যুক্ত হলেও ব্রিটিশ বিরোধী নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক তৎপরতা কম ছিল। ঔপনিবেশিক কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে তাদের যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ছিল তাতে কিছুটা জিহাদি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এ প্রবণতা মুসলমানদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়েছিল। কেননা এটি মুসলমানদের ইংরেজ সরকার থেকে আরো বিচ্ছিন্ন করে ফেলে ছিল। ফলে তারা ইংরেজ সরকারের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্রমশ একটি চরম দুর্দশগ্রস্ত জাতিতে পরিণত হয়।

বাংলার মুসলিম সমাজের উপর্যুক্ত হতাশাজনক পরিস্থিতিতে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম মানস চেতনায় এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। এ সময় বঙ্গ-ভারতীয় মুসলমান সমাজে নগরবাসী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও উদার মনোভাবপন্ন এক নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে। এ নতুন নেতৃত্ব মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদি তৎপরতা পরিহার এবং সরকারের সাথে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মুসলমানদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রশ্নে তাঁদের মধ্যে শুরুতে মতভিন্নতা থাকলেও সৈয়দ আমীর আলী এ বিষয়ে অনেককে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হন। ফলে বাঙালি মুসলমান সমাজ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রায় এক দশক পূর্বে তাদের একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠন করতে সক্ষম হয়। তবে এ রাজনৈতিক সংগঠনটির মধ্যে কোনো বৈপ্লবিক তৎপরতা দেখা যায় না। বরং মুসলিম সমাজের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এটি আবেদন নিবেদনের রাজনীতি করে। আর এটিই ছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তার মূল ধারা।

উনিশ শতকের শেষ দিকে এসে মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তনে এসে স্বাভাব্যবাদী ও বিশ্ব মুসলিমবাদের প্রভাব প্রকটভাবে দেখা দেয়। উল্লেখ্য যে, বাস্তব কারণে দেরিতে হলেও মুসলমানরা যুগ বাস্তবতা উপলব্ধি করে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি সরকারের প্রদত্ত সুবিধাগুলো গ্রহণে এগিয়ে এসেছিলেন। ফল হিসেবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম সমাজে একটি আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। রাজনীতি, পেশাগত ও আর্থিক কর্মকাণ্ডে সুপ্রতিষ্ঠা লাভে এ শ্রেণিটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়। এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ পর্যন্ত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধে রূপান্তরিত হয়। এসময় নিজেদের “ভদ্রলোক” বলে মনে করা হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদের উপেক্ষার নীতি গ্রহণ করে। হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির এ অদ্ভুত ও বিকৃত আচরণ নবজাত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির এক বড় অংশকে বিক্ষুব্ধ ও জাত্যাভিমানী করে তোলে। এ অবস্থায় উনিশ শতকের শেষ দিকে হিন্দু সমাজে ধর্মীয় পুনর্জাগরণ দেখা দিলে হিন্দু সমাজে মুসলিম বিরোধী সাম্প্রদায়িক চেতনা বৃদ্ধি পায়। এর প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম সমাজের

বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের একটি বড় অংশ হিন্দু বিরোধী মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। এ সময় প্যান ইসলামিজম ভাবধারায়ও তাঁদের অনেকে অনুপ্রাণিত হন। ফলে বাংলায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থান ঘটে। এতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে অবনতি ঘটে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও সংঘটিত হয়। হিন্দু-মুসলিম এ বিভাজনের পিছনে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তিরও সচেতন প্রয়াস ছিল। বস্তুত তাদের চিরাচরিত ‘ভাগ কর ও শাসন কর’ নীতির স্বার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে তারা হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়কে পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে নিজেদের নিরাপদ রাখতে সক্ষম হয়।

সার্বিক আলোচনার শেষে বলা যায় যে, উনিশ শতকে বাংলার মুসলিম সমাজ রাজনৈতিক চিন্তা নানা ভাবদ্বন্দ্ব ও আন্দোলনের মধ্যে প্রবাহিত হয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলিম রাজনীতি ধর্মীয় পুনর্জাগরণের এবং কিছু পরিমাণে ব্রিটিশ বিরোধী জিহাদি তৎপরতার মধ্যে সীমিত ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে এসে নতুন নেতৃত্বে হাত ধরে ব্রিটিশ বিরোধী মুসলিম রাজনীতির সংগ্রামী ধারার অবসান ঘটানো হয় এবং নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি এ সময় থেকে আবেদন নিবেদনের রাজনীতি শুরু করে। এ শতকের শেষ দিকে মুসলিম রাজনীতির গতিধারা স্বাতন্ত্র্যবোধ ও প্যান ইসলামি ভাবাদর্শ ধারা প্রভাবিত হয়।

তথ্যসূত্র

- ১ Sir Jadunath Sarkar (ed.), *The History of Bengal* (Vol. II), (Delhi: B. R. Publishing Corporation, 2003). pp. 497- 498.
- ২ Susobhan Sarkar, *On Bengal Renaissance* (Calcutta: Papyrus, 1979), p. 14.
- ৩ ইতিহাসবিদ বিনয় ঘোষ তাঁর ‘বাংলার নবজাগৃতি’ গ্রন্থে উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণকে একটি মিথ্যাচার বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে, এটি একটি ঐতিহাসিক প্রতারণা। অরবিন্দ পোদ্দার, বরুণ দে, অশোক মিত্র এবং সুমিত সরকারও প্রায় অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। অরবিন্দ পোদ্দার উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণকে ‘একটি বিকৃত ও নীরস নবজাগরণ’ বলে মনে করেন।
- ৪ কোম্পানি সরকার ও মুসলমানদের মধ্যকার পারস্পরিক, সন্দেহ, অবিশ্বাস, বিদ্বেষমূলক সম্পর্ক ও কোম্পানি সরকারের মুসলিম স্বার্থ বিরোধী নীতি সম্পর্কে তথ্য রয়েছে- Clive’s Letter to Hastings, 28 November 1767, quoted in H Beveridge and Warren Hastings in Lower Bengal”, *Calcutta Review*, Vol. LXV, 1877; ১৮১৩ সালে সিলেক্ট কমিটির সামনে দেয়া স্যার জন ম্যালকমের বক্তব্যে; W W Hunter প্রণীত *The Indian Mussalmans*, (Calcutta: 1936) এবং আজিজুর রহমান মল্লিক প্রণীত *ব্রিটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান* (বাংলা অনু. দিলওয়ার হোসেন), (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২) ইত্যাদি গ্রন্থে।
- ৫ W W Hunter, *op.cit.*, p. 162.
- ৬ দ্রষ্টব্য : Sh. A Rashid, *Central National Mohammedan Association of Calcutta*, (Punjab: Punjab University, 1963), pp. 20-23; M A Rahim, *The Muslim Society and Politics in Bengal (A. D. 1757-1947, 2nd Ed.)*, (Dhaka: University of Dhaka, 2011), pp 57-60.
- ৭ M A Rahim, *op.cit.*, p. 56.
- ৮ এ প্রসঙ্গে সিলেক্ট কমিটির কাছে ১৮১৩ সালে কর্ণেল টমাস মনরোর দেয়া একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি স্পষ্ট করেই এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। উদ্ধৃতিটি দ্রষ্টব্য আজিজুর রহমান মল্লিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৩।

- ৯ W W Hunter, *op.cit.*, p. 175.
- ১০ এসব প্রতিরোধ আন্দোলন সম্পর্কে দ্রষ্টব্য সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন*, (ঢাকা, ১৯৮৩); রতন লাল চক্রবর্তী, “প্রতিরোধ আন্দোলন ও কৃষক বিদ্রোহ”, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, (প্রথম খণ্ড), (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩), পৃ. ১৮৩-২২৬।
- ১১ মুঈনুদ্দীন আহমেদ খান, “মুসলিম ধর্মসংস্কার আন্দোলন”, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, (দ্বিতীয় খণ্ড), (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩), পৃ. ২৩৮।
- ১২ ফরাজি আন্দোলন সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য Muin-Ud-Din ahmed Khan, *History of the Faraidi Movement*, (Karachi: Pakistan Historical Society, 1965).
- ১৩ ১৮৭২ সালে ফরিদপুরে কর্মরত একজন ম্যাজিস্ট্রেটের এক তদন্তে প্রকাশ পায় যে, কৃষকদের উপর জমিদারদের আরোপিত এরূপ অবৈধ করের সংখ্যা ২৩ এর কম ছিল না। http://bn.banglapedia.org/index.php?title=ফরায়জৌ_আন্দোলন
- ১৪ ব্রিটিশ ভারতকে প্রথম দারুল হরব হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন প্রখ্যাত আলেম শাহ আবদুল আজিজ রহ.। তিনি ছিলেন উপমহাদেশের বিখ্যাত আলেম শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবির (১৭০৩-৬২ খ্রি.) পুত্র। হাদিস শাস্ত্রের বিজ্ঞ পণ্ডিত এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন মুজাদ্দিদ বলে বিবেচিত শাহ আবদুল আজিজ ১৮০৫ সালে কোম্পানি সরকার কর্তৃক দিল্লি দখলের পর ভারতবর্ষকে ‘দারুল হরব’ বলে ফতোয়া দেন এবং এর আজাদীর জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা মুসলমানদের জন্য ফরজ বলে ঘোষণা করেন। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : John Kelsay, “Jihad”, in *Islamic Political Thought: An Introduction*, Gerhard Bowering (ed.), (Princeton University Press: 2015), p. 86-104.
- ১৫ M A Rahim, *op.cit.*, p. 87.
- ১৬ http://bn.banglapedia.org/index.php?title=ফরায়জৌ_আন্দোলন।
- ১৭ আজিজুর রহমান মল্লিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৭।
- ১৮ এ আন্দোলন সম্পর্কে দ্রষ্টব্য: Qeyamuddin Ahmad, *The Wahabi Movement in India*, Firma K. L. Mukhopadhyay, (Delhi: 1966); আবদুল মওদুদ, *ওয়াহাবী আন্দোলন*, সপ্তম মুদ্রণ, (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ২০১১)।
- ১৯ সালাহউদ্দীন আহমদ, *ইতিহাস ঐতিহ্য জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র*, (ঢাকা: প্রথমা, ২০১৩), পৃ. ৫৩।
- ২০ তিভুমীরের আন্দোলন সম্পর্কে দ্রষ্টব্য : Muin-Ud-Din Ahmed Khan, *Titu Mir and His Followers in British Indian records*, Barnamicil, (Dhaka: 1977).
- ২১ আজিজুর রহমান মল্লিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৮-১০০।
- ২২ ঐ, পৃ. ১০২।
- ২৩ *ইতিহাস ঐতিহ্য জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র*, পৃ. ৫৩।
- ২৪ “মুসলিম ধর্মসংস্কার আন্দোলন”, পৃ. ২৫৭।
- ২৫ I H Qureshi, *Muslim Community of the Indo-Pakistan Subcontinent 610-1947*, (The Hague: 1952), p. 198.
- ২৬ M A Rahim, *op.cit.*, p. 96-104

- ২৭ B.B. Majumdar, *Indian Political Association and Reform of Legislatures 1817-1917*, (Calcutta: 1965), p. 23.
- ২৮ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে সমকালীন ও আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। উৎস ও ঘটনাবলির বিবেচনায় কারও মতে এটি ছিল নিছক একটি সিপাহী বিদ্রোহ, কারও মতে জাতীয় সংগ্রাম এবং কেউ কেউ একে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে অভিহিত করেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : R C Majumdar, *The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857*, (Calcutta: 1957); রতন লাল চক্রবর্তী, *সিপাহী বিদ্রোহ ও বাংলাদেশ*, (বাংলা একাডেমী: ১৯৮৪)।
- ২৯ ইমরান হোসেন, *বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম*, বাংলা একাডেমী, (ঢাকা: ১৯৯৩), পৃ. ১৩১।
- ৩০ আ ফ সালাহউদ্দীন আহমদ, “উনিশ শতকে রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও কর্মকাণ্ড”, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)*, পৃ. ২৭৭।
- ৩১ ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা (প্রথম খণ্ড)*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃ. ১৩৮।
- ৩২ নবাব আবদুল লতিফের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা রয়েছে Enamul Haque সম্পাদিত *Nawab Bahadur Abdul Latif: His Writings and Related Documents*, (Dacca:1968). এবং M Mohar Ali, *Autobiography and other Writings of of Nawab Abdul Latif Khan Bahadur*, (Chittagong: 1968). নওয়াব বাহাদুর মৌলভী আব্দুল লতিফ খান, সি. আই. ই., *মুসলিম বাঙ্গালা : আমার যুগ*, আবু জাফর শামসুদ্দীন (অনু.), (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮) ইত্যাদি গ্রন্থে।
- ৩৩ মুসলিম সমাজে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ও সমকালীন চিন্তা ধারার অনুকূলে জনমত এবং শিক্ষিত মুসলিম, হিন্দু ও ইংরেজদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতির মনোভাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে নবাব আবদুল লতিফ ১৮৬৩ সালে কলকাতায় এ সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
- ৩৪ *Abstract of the Proceedings of the Mohamedan Literary Society of Calcutta held at the residence of Moulvi Abdu Latif Khan Bahadur on Wednesday the 23rd November 1870*, Enamul Haque (ed.), *op.cit.* p. 102.
- ৩৫ সৈয়দ আমীর আলীর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো- K K Aziz (সম্পাদিত) *Ameer Ali: His Life and Works*, (Lahore: 1968). এ গ্রন্থটি সৈয়দ আমীর আলী: জীবন ও কর্ম (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ২০০৮)-এ শিরোনামে বাংলায় অনুবাদ করেছেন মোহাম্মাদ মুহিবউল্লাহ ছিদ্দিকী।
- ৩৬ মোহাম্মাদ মুহিবউল্লাহ ছিদ্দিকী (অনু.), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৩।
- ৩৭ M A Rahim, *op.cit.*, p. 192.
- ৩৮ *Ibid.* p. 193.
- ৩৯ M A Rahim, *op.cit.*, p. 193
- ৪০ আ ফ সালাহউদ্দীন আহমদ, “উনিশ শতকে রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও কর্মকাণ্ড”, *পূর্বোক্ত* পৃ. ২৮৭।
- ৪১ M A Rahim, *op.cit.*, p. 193; আ ফ সালাহউদ্দীন আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯০।
- ৪২ Dufferin to Kimberly, 29 April 1886: Dufferin Papers, Vol. 19, No. 17; Mr. Abdur Rafay Khan, *Sir Sayyid Ahmed Khan's Political Ideas and Activities*, in the Proceedings of the Pakistan History Conference (second session), (Lahore: Pakistan Historical Society, 1952), p. 263.

- ৪৩ ইতিহাস ঐতিহ্য জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র, পৃ. ২৩২।
- ৪৪ Sir Sayed Ahmed Khan, *The Present State of Indian Politics*, (Allahabad: 1888), p. 37; মিহির ও সুধাকর, ২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ২৭ পৌষ ১৩০৭।
- ৪৫ Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengla 1884-1912*, (Dacca: 1974), p. 382, 388.
- ৪৬ Moin Shakir, *Khilafat to Partition 1919-1947*, (Delhi: 1970), p. 40
- ৪৭ “প্যান ইসলামিজম” হলো বিশ্ব মুসলিম সমাজের ঐক্যকেন্দ্রিক একটি রাজনৈতিক আন্দোলন। একে আরবিতে বলা হয় ‘আল-ওহদাতুল ইসলামিয়া।’ একজন খলিফার অধীনে সমগ্র মুসলিম জাহানকে একতাবদ্ধ করা ছিল এ আন্দোলনের মূল কথা। এ মতের অনুসারীরা মনে করতেন, একমাত্র খিলাফতের মাধ্যমে সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে একতাবদ্ধ করা যেতে পারে। খিলাফত একটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান এবং আল্লাহর হুকুমত প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাধ্যম। উনিশ শতকে প্যান ইসলামিজম চিন্তাধারার উদ্ভব হয় এবং এর উৎসভূমি ছিল উসমানী তুরস্ক। তবে প্যান-ইসলামবাদের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান প্রতিভূ হিসেবে বিবেচনা করা হয় সৈয়দ জামালুদ্দিন আল-আফগানিকে।

মধ্যযুগের বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে প্রস্তর খোদাইয়ে শিকল-ঘণ্টা শৈলীর অলঙ্করণ

মো. মিন্টু আলী বিশ্বাস*

Abstract

Abstract: In the Middle Ages, stone carvings occupied a prominent place in the decoration of Muslim architecture in Bengal. Chain and bell designs are among the most elaborate ornamental styles in stone carvings. Craftsmen have been able to give a variety of styles of stone-carving designs in this stone carving. Chain and bell designs were used in Muslim buildings as Bengal's own style. However, in most cases its modified style is used. The article in question is an attempt to highlight the decoration of chains and bell designs in the style of stone carving in medieval Bengal.

চাবিশব্দ: প্রস্তর খোদাই, শিকল-ঘণ্টা নকশা, প্রস্তর খোদাইয়ে শিকল-ঘণ্টা নকশা, শিকল-ঘণ্টা শৈলীর বিশ্লেষণ

সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি এবং এর প্রতি আকর্ষণ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সৃষ্টির সূচনালগ্ন হতে মানুষ নিজের প্রয়োজনে আবাস নির্মাণের তাগিদ অনুভব করেছিল। এই প্রয়োজনীয়তাবোধ ও ধর্মীয় কারণে সৃষ্টি হয় স্থাপত্যের। প্রাচীনযুগ হতেই স্থাপত্যের সঙ্গে অলঙ্করণের সম্পর্ক ছিল। ইট, পাথর, কাঠ, মাটি যে উপাদানেই স্থাপত্য নির্মিত হয়ে থাক না কেন “স্থাপত্যের দু’টি অংশ; একটি নির্মাণ, অপরটি অলঙ্করণ। একটি কাঠামো, অন্যটি সজ্জা।”^১ পৃথিবীর বিভিন্ন গোষ্ঠীর ন্যায় মুসলমানগণ যে স্থাপত্য নির্মাণ করেছিল তা ছিল অলঙ্করণ সমৃদ্ধ। ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ স্থাপত্য নির্মাণের উপাদান ও অলঙ্করণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।^২ বাংলায় মুসলমানদের আগমন এবং তাদের শাসনামলে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে অলঙ্করণ সমৃদ্ধ স্থাপত্য নির্মিত হয়েছিল। প্রাচীন বাংলার নির্মাণ পদ্ধতি ও উপাদান গৃহীত হলেও স্থানীয় ও বিদেশি নির্মাতা-কারিগরদের দীর্ঘ দিনের অনুশীলন-পরিশীলন ও গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলার মুসলিম স্থাপত্যশিল্পে অলঙ্করণ একটি নিজস্ব ধারায় গড়ে উঠেছিল। অলঙ্করণের মাধ্যম, বিষয়বস্তু ও মোটিফ প্রাক মুসলিম ধারা হতে গৃহীত হয়েছিল রূপান্তরিত হয়ে। আগত মুসলমানদের উন্নত শিল্প-চেতনা ফুটিয়ে তোলার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অলঙ্করণের ক্ষেত্রে যে সকল শৈলী মুসলমানগণ বাংলার স্থাপত্যে ব্যবহার করেছেন প্রস্তর খোদাই শৈলী প্রকরণ তার মধ্যে অন্যতম। তবে ইসলামের সম্প্রসারণের যুগে স্থাপত্য নির্মাণের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রভাব বাদ পড়েনি। তের শতকের শুরুতে বাংলায় মুসলমানদের আগমন এবং তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে স্থাপত্য নির্মাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছিল। যদিও বাংলার আর্দ্র আবহাওয়া এবং রাজনৈতিক পালা বদলের ফলে কয়েকটি ইমারত পরিবর্তন ও পরিবর্ধিত অবস্থায় টিকে আছে। মধ্যযুগে বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য রচনার ক্ষেত্রে প্রাথমিক লিখিত সূত্রের অপ্রতুলতার অভাব পূরণে স্থাপত্য নিদর্শন আকর উৎস হিসাবে বিবেচিত। মুসলমানগণ স্থাপত্য নির্মাণের ক্ষেত্রে স্থানীয় উপাদান, রীতি-নীতি,

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক ইতিহাস বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

কৌশল ও অলঙ্করণের উপর নির্ভরশীল হলেও তারা একটি নিজস্ব ধারা উপহার দিয়েছিল। নদী বিধৌত পলিমাটির দেশ বাংলায় স্থাপত্যের নির্মাণ উপাদান হিসাবে আগুনে পোড়ানো ইটের আধিক্য দেখা যায়। স্বল্প পরিসরে প্রস্তরের ব্যবহারও দেখা যায়। প্রাক-মুসলিম পর্বের ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারত হতে মুসলমানরা প্রস্তর সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে নিজেদের স্থাপত্যে ব্যবহার করেছেন সাবধানতা অবলম্বন করে। আবার শাসকগণ বাইরের দেশ থেকেও প্রস্তর আমদানি করতেন। ব্যবহৃত প্রস্তরের অধিকাংশই ভারতের রাজমহল থেকে সংগ্রহ করা হতো।^৩ স্থাপত্য নিদর্শন অলঙ্করণের ক্ষেত্রে মুসলমানগণ কৌশলের পরিবর্তন তেমন না করলেও মোটিফের (Motif) ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছিলেন। বিশেষ করে ধর্মীয় বিধি-নিষেধকে গুরুত্ব প্রদান করে স্থাপত্যকে অলঙ্কৃত করা হয়েছিল। মুসলমানগণ স্থাপত্য অলঙ্করণে প্রস্তর খোদাই, পোড়ামাটির ফলক, টাইলস, চিত্রকলা, মোজাইক এবং ইটের চাতুর্যপূর্ণ বিন্যাস ব্যবহার করেছিলেন। বাংলার মুসলিম স্থাপত্য অলঙ্করণে প্রস্তর খোদাই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। যদিও বাংলায় উৎস হিসাবে প্রস্তরের উপস্থিতি দেখা যায় না। শাসকগণ প্রাচীন বাংলার ইমারতে ব্যবহৃত প্রস্তর ও আমদানিকৃত প্রস্তর ইমারত অলঙ্করণে ব্যবহার করেছেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন ইমারতের প্রস্তর ব্যবহারের ক্ষেত্রে মুসলমানগণ অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করেছেন। দেবদেবী, জীবজন্তু সম্বলিত প্রস্তরের বিপরীত পিঠ তারা ব্যবহার করেছেন।^৪ স্থাপত্য অলঙ্করণের ক্ষেত্রে তাদের এ প্রচেষ্টা অভিনবত্বের সূচনা করেছিল। মূলত মুসলমানগণ স্থাপত্য অলঙ্করণের ক্ষেত্রে প্রস্তরের পরিকল্পিত ব্যবহার করেছিলেন। কাজেই প্রস্তর অলঙ্করণকে মুসলমানদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

প্রস্তর খোদাইয়ের ক্ষেত্রে মুসলমানেরা সৌন্দর্যবোধের সহজাত প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করেছে। বাংলার স্থাপত্যে প্রস্তর অলঙ্করণে যে শৈলী প্রকরণ মুসলিমগণ গড়ে তুলেছিল তা বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভিন্ন একটি ধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। প্রস্তর খোদাই শিল্পে মুসলমানদের মননশীলতা, ক্রটিবোধ এবং উন্নত সংস্কৃতির ছাপ ফুটে উঠেছে। পোড়ামাটির শিল্প ও প্রস্তর ভাস্কর্য এই ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ কাজ করে। প্রস্তর কারুকার্যে স্থানীয় শিল্পিগণের অংশগ্রহণের ফলে প্রস্তর খোদাই শৈলীতে দেশজ প্রভাব অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ফলে প্রাক-মুসলিম পর্বের অলঙ্করণ কৌশলের সাথে এই সময়ে অলঙ্করণ মোটিফেরও সংযোগ-সমন্বয় ঘটে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এমন বিষয়সমূহ পরিহারের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। সুন্দর ও অভিনব প্রস্তর শৈলীর যে প্রকরণ মুসলমানগণ বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে ফুটিয়ে তুলেছিল তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। ইমারতের গাভ্রালঙ্করণে, দরজা-জানালায়, স্তম্ভে, ভিত নির্মাণে, বুরুজে, কার্নিশে এবং শিলালিপিতে প্রস্তর শৈলীর ব্যবহার দেখা যায়।^৫ ধর্মীয় ইমারতে বিশেষ করে মসজিদের মিহরাবে ও সমাধিতে প্রস্তর অলঙ্করণ প্রাধান্য পেয়েছিল। স্থানীয় কারিগর ও বিদেশি কারিগরের সমন্বয়ে প্রস্তর অলঙ্করণের ক্ষেত্রে বাংলার স্থাপত্য সুনির্দিষ্ট একটি রূপ পরিগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রস্তর শৈলী প্রকরণ বিশ্লেষণে প্রত্ননিদর্শন পর্যবেক্ষণ ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রস্তর খণ্ড ও জাদুঘর পরিদর্শনে তথ্য সংগ্রহের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে প্রস্তর অলঙ্করণের শৈলী প্রকরণে শিকল ঘণ্টা নকশার বিভিন্ন দিক নিয়ে উপস্থাপন করা হলো-

মধ্যযুগে বাংলায় মুসলিম স্থাপত্যে প্রস্তর অলঙ্করণে শিকল ঘণ্টা নকশা পরিলক্ষিত হয়। সুলতানি আমলে স্থাপত্য অলঙ্করণে শিকল ঘণ্টা নকশা অধিক জনপ্রিয় হলেও মোগল আমলে প্রস্তর অলঙ্করণে শিকল ঘণ্টা নকশা দেখা যায় না।^৬ প্রাক-মুসলিম পর্বে ভারতীয় উপমহাদেশে স্থাপত্যে ব্যবহৃত

প্রস্তর স্তম্ভে, প্রস্তর ভাস্কর্যে ও প্রস্তর অলঙ্করণে শিকল ঘণ্টা নকশার উপস্থিতি দেখা যায়। ভারতের মধ্য প্রদেশের ছত্রপুর জেলার খাজুরাহো শহরে দশ শতকের একটি জৈন মন্দিরে ব্যবহৃত স্তম্ভে শিকল ঘণ্টা নকশা দেখা যায় (চিত্র: ১)।^৭ শিকল ঘণ্টা নকশার কারণে স্থাপনাটি ঘণ্টি মন্দির নামে খ্যাত। মন্দিরটি বর্তমানে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধীনে সংরক্ষিত ইমারত হিসাবে চিহ্নিত।



চিত্র ১: ঘণ্টি মন্দিরে ব্যবহৃত প্রস্তর স্তম্ভে শিকল ঘণ্টা নকশার দৃশ্য (উৎস: ওয়েবসাইট)।

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, দিনাজপুর জাদুঘর ও প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরসমূহে (পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতি, ময়মনসিংহ, খুলনা বিভাগীয় জাদুঘর) সংরক্ষিত প্রাক-মুসলিম প্রস্তর ভাস্কর্য ও স্তম্ভে শিকল ঘণ্টা নকশা পরিলক্ষিত হয় (চিত্র: ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০)।^৮ প্রাক-মুসলিম যুগের প্রস্তর ভাস্কর্যে যে শিকল ঘণ্টা নকশার অনুকৃতি দেখা যায় তা মূলত কোমরে পরিহিত গহনা। সৌন্দর্যবর্ধনের মানসে প্রস্তর ভাস্কর্যের কোমরে *বিছা* নামক গহনার ব্যবহার দেখা যায়।^৯ এই *বিছা* নামক গহনা দেখতে শিকল ঘণ্টা নকশার অনুরূপ বলে মনে হয়।



চিত্র ২: বিষ্ণু, আ. বার শতক, রাজশাহী, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর।



চিত্র ৩: সূর্য, আ. বার শতক, মান্দা, নওগাঁ, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর।



চিত্র ৪: মঞ্জুশ্রী, আ. দশ শতক, নোয়াখালী, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।



চিত্র ৫: অবলোকিতেশ্বর, আ. নয় শতক, মহাস্থানগড় জাদুঘর।



চিত্র ৬: সূর্য মূর্তি, খ্রিস্টীয় ছয়-সাত শতক, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট, খুলনা বিভাগীয় জাদুঘর।



চিত্র ৭: বিষ্ণুমূর্তি, আ. খ্রিস্টীয় দশ-নামুজা, এগার শতক কচুয়া, বাগেরহাট, খুলনা বিভাগীয় জাদুঘর।



চিত্র ৮: মানব মূর্তি, আ. খ্রিস্টীয় এগার-বার শতক, পাহাড়পুর, নওগাঁ, পাহাড়পুর জাদুঘর।



চিত্র ৯: বিষ্ণুমূর্তি, এগার শতক, লাকসাম, কুমিল্লা, ময়নামতি জাদুঘর।



চিত্র ১০: বিষ্ণু, আ. বার শতক, প্রাণ্ডিস্থান: অজ্ঞাত, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বানগড় হতে সংগৃহীত একটি কালো প্রস্তরের স্তম্ভে শিকল ঘণ্টা নকশা দেখা যায়।^{১০} অলঙ্কৃত স্তম্ভটি ৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে কম্বোজ বংশীয় রাজা কর্তৃক নির্মিত। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে স্তম্ভটি সংরক্ষিত আছে। স্তম্ভের নিচের বর্গাকার অংশের প্রতিপাশে এবং উপরের দিকে বহুভুজাকৃতির প্রতিটি শিরোভাগে একটি করে ঘণ্টা নকশা পরিলক্ষিত হয় (চিত্র: ১১)।



চিত্র ১১: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত প্রস্তর স্তম্ভে শিকল ঘণ্টা নকশা, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত বেলে পাথরে নির্মিত স্তম্ভে শিকল ঘণ্টা নকশা দেখা যায় (চিত্র: ১২)। শিকল ঘণ্টা নকশা অলঙ্কৃত এরূপ স্তম্ভ বাংলার অন্যান্য জাদুঘরেও পরিলক্ষিত হয়।^{১১} বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত প্রস্তর নির্মিত চৌকাঠ সদৃশ কাঠামোর সাথে সংযুক্ত অলঙ্কৃত স্তম্ভে শিকল ঘণ্টা নকশা দেখা যায় (চিত্র: ১৩)। চৌকাঠ সদৃশ অভিন্ন প্রয়োজনে নির্মিত প্রস্তরের সর্দলটি এগার-বার শতকের যা মাহীসন্তোষ হতে সংগ্রহ করা হয়েছে।^{১২} মূলত প্রাক-মুসলিম ধর্মীয় সংস্কৃতি হতে এই রীতি মুসলিম স্থাপত্যে এসেছে। বাংলার দেশজ শৈলী হিসাবে মধ্যযুগের মুসলিম স্থাপত্যে শিকল ঘণ্টা মোটিফ ব্যবহৃত হয়েছে।^{১৩} প্রাক-মুসলিম যুগের স্থাপত্যের স্তম্ভে ব্যবহৃত এ প্রকরণ ইসলাম ধর্ম দর্শনের সাথে সাংঘর্ষিক নয় বিধায় মুসলমানেরা সরাসরি গ্রহণ করেছেন।



চিত্র ১২: বেলে পাথরের স্তম্ভে শিকল নকশা, তের শতক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

চিত্র ১৩: পাথরের স্তম্ভে শিকল ঘণ্টা নকশা, বার শতক, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর।

হুগলি জেলার দ্বিবেণীতে অবস্থিত জাফর খান গাজীর মসজিদ ও সমাধিতে ব্যবহৃত প্রস্তরে শিকল ঘণ্টা নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (চিত্র: ১৪)।^{১৪} হুগলি জেলার ছোট পাণ্ডুয়াতে নির্মিত বারি মসজিদে ব্যবহৃত খর্বাকৃতির প্রস্তর স্তম্ভে শিকল ঘণ্টা নকশা দেখা যায় (চিত্র: ১৫)।^{১৫} স্থানীয় ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপনা হতে এ স্তম্ভসমূহ সংগৃহীত হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। আদিনা মসজিদে ব্যবহৃত প্রস্তর স্তম্ভ অলঙ্করণে শিকল ঘণ্টা নকশা ছাড়াও মিহরাবের প্যানেলে এই শৈলীর ব্যবহার করা হয়েছে।^{১৬} আদিনা মসজিদের অলঙ্করণে হিন্দু মোটিফের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মিহরাবে ব্যবহৃত শিকল ঘণ্টা নকশাতেও বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় (চিত্র: ১৬)।^{১৭} মুসলমানগণ তাদের ইমারত অলঙ্করণে শিকল ঘণ্টা নকশার ক্ষেত্রে বহুবিধ শৈলী উপহার দিয়েছিলেন। শিকলের ক্ষেত্রে মুসলমানগণ যেমন বিবিধ রীতির প্রয়োগ করেছিল, তেমনি প্রাক-মুসলিম যুগের ঘণ্টা নকশার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এনেছিলেন। প্রাক-মুসলিম যুগের শিকল ঘণ্টা নকশা সদৃশ প্রস্তর স্তম্ভ কয়েকটি মসজিদে প্রত্যক্ষ করা গেলেও প্রস্তর অলঙ্করণ সমৃদ্ধ মসজিদের মিহরাব, প্যানেল এবং সমাধি গাঙ্গে এর উপস্থিতি দেখা যায়।



চিত্র ১৪: শিকল ঘণ্টা নকশা, জাফর খান গাজীর সমাধি।



চিত্র ১৫: শিকল ঘণ্টা নকশা, বারি মসজিদ, ছোট পাণ্ডুয়া (উৎস: G. Michell, p. 52)



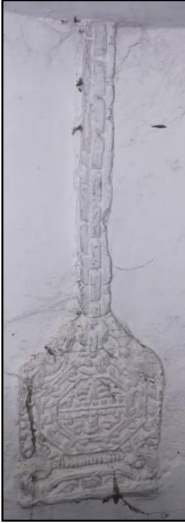
চিত্র ১৬: শিকল ঘন্টা নকশার অনুকৃতি, আদিনা মসজিদ।

নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও এর মোগরাপাড়ায় অবস্থিত গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের সমাধি সৌধে প্রস্তর অলঙ্করণে শিকল ঘন্টা সদৃশ নকশা পরিলক্ষিত হয় (চিত্র: ১৭)।^{১৬} জেমস ওয়াইজ তাঁর বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন যে, সমাধি সৌধের চারদিকের মধ্যবর্তী অংশ ত্রিখাঁজ খিলান দ্বারা সুশোভিত এবং খিলানের অভ্যন্তরে কারুকার্য খচিত শিকলে ঝুলন্ত ঘন্টা নকশায় অলঙ্কৃত।^{১৭} মূলত খিলানের দ্বিতীয় খাঁজের এক পার্শ্ব হতে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত একটি দণ্ডের মাঝখান থেকে দু'টি শিকল নিচের দিকে একটি প্রদীপকে ঝুলন্ত অবস্থায় ধরে আছে। প্রদীপের গায়ে লতা-পাতার নকশা শোভা পেয়েছে। প্রদীপকে ধরে রাখার জন্য নিচের দিকেও কাঠামো লক্ষ করা যায়। শিকলের শৈলী ঠিক রেখে প্রাক-মুসলিম পর্বের ঘন্টার স্থলে প্রদীপ আকৃতির নকশা মুসলমানগণ ব্যবহার করেছেন। শিকল আকৃতির নকশাটি বাংলার পাটের তৈরিকৃত শিকা সদৃশ নকশা হতে এসেছে। যদিও শিকলের শৈলী এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ঘন্টা নকশা প্রাক-মুসলিম পর্বের ঐতিহ্য বহন করে। প্রদীপ আলো প্রদান করবে এ উদ্দেশ্যে কারিগরগণ ঘন্টার পরিবর্তে প্রদীপ ব্যবহার করেছেন। আদিনা মসজিদের প্রস্তর অলঙ্করণে শিকলে ঝুলন্ত প্রদীপ নকশা দেখা যায়। বাংলায় পরবর্তী মুসলিম স্থাপত্যে প্রস্তর অলঙ্করণে ঝুলন্ত প্রদীপ নকশা জনপ্রিয় হয়েছিল।

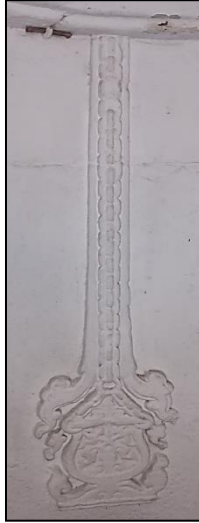


চিত্র ১৭: গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের সমাধি সৌধে শিকলে ঝুলন্ত প্রদীপ নকশা।

নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও এর জামপুর ইউনিয়নে অবস্থিত মোয়াজ্জমপুর মসজিদে প্রস্তর নির্মিত মিহরাবে শিকল ঘণ্টা নকশার ব্যবহার দেখা যায়।^{২০} সুলতান শামসউদ্দিন আহমদ শাহ কর্তৃক নির্মিত মসজিদটিতে সংস্কার কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় প্রস্তর কারুকার্য হারিয়ে যেতে বসেছে। উত্তর পাশের প্রস্তর নির্মিত মিহরাবটি টাইলস দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় মিহরাব ও দক্ষিণ পাশের মিহরাবও তার আদি অবয়ব হারাতে বসেছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবে ব্যবহৃত সংযুক্ত স্তম্ভে শিকল ঘণ্টা মোটিফ দেখা যায় (চিত্র: ১৮)। রং এর প্রলেপ ব্যবহারে শিকল ঘণ্টা নকশার শৈলী অনুধাবন করা কষ্টসাধ্য। কেন্দ্রীয় মিহরাবের অবতল অংশের মাঝখানে শিকল নকশা দেখা যায় এবং শিকলে যুক্ত অলঙ্কৃত বুলন্ত প্রদীপ দেখা যায় (চিত্র: ১৯)। বুলন্ত প্রদীপের গায়ে লতাপাতার নকশা শোভা পেয়েছে। শিকলের দুই দিকে বুলন্ত পাতা সদৃশ নকশা দেখা যায়। উত্তর দিকের অবতল মিহরাবের মধ্যবর্তী স্থলে কেন্দ্রীয় মিহরাবের ন্যায় শিকলে সংযুক্ত অষ্টভুজাকৃতির শিকল নকশা এবং শিকল নকশাকে বেষ্টিত করে লতাপাতার নকশা স্থান পেয়েছে (চিত্র: ২০)। অষ্টভুজাকার বুলন্ত শিকলের মাঝে বৃক্ষ সদৃশ পাতা নকশা দেখা যায়। শিকলে বুলন্ত নকশাটি দেখতে মেডেল সদৃশ বলে মনে হয়।



চিত্র ১৮: পার্শ্ববর্তী মিহরাবের অবতল অংশে শিকলে বুলন্ত ঘণ্টা সদৃশ নকশা, মোয়াজ্জমপুর মসজিদ।



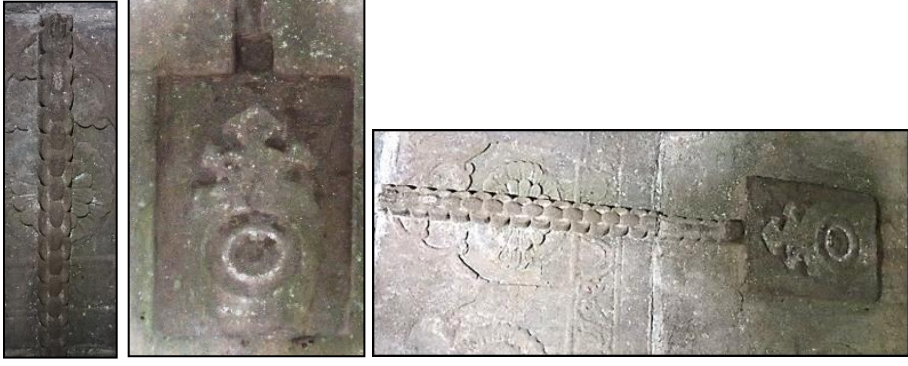
চিত্র ১৯: কেন্দ্রীয় মিহরাবের অবতল অংশে শিকলে বুলন্ত ঘণ্টা সদৃশ নকশা, মোয়াজ্জমপুর মসজিদ।



চিত্র ২০: কেন্দ্রীয় মিহরাবে সংযুক্ত কলামে শিকল ঘণ্টা নকশার দৃশ্য, মোয়াজ্জমপুর মসজিদ।

বাগেরহাট জেলায় মধ্যযুগে নির্মিত প্রায় সকল মসজিদে শিকল ঘণ্টার ন্যায় নকশা দেখা যায়। ষাট গম্বুজ মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহরাব ছাড়া সকল শিকল ঘণ্টা সদৃশ নকশা পোড়ামাটির ফলকে নির্মিত।^{২১} ষাট গম্বুজ মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অবতলাকৃতিতে প্রস্তর অলঙ্করণে নির্মিত। কেন্দ্রীয় মিহরাবের অবতল অংশের মাঝখানে শিকল নকশায় বুলন্ত আয়তাকার মেডেল সদৃশ নকশা দেখা যায় (চিত্র: ২১)। শিকলটি গোলাপ ফুলের মধ্যদিয়ে নিম্নে বুলে আছে। শিকল ঘণ্টা সদৃশ নকশার এরূপ শৈলী তেমন দেখা যায় না। শিকলে বুলন্ত আয়তাকার অংশের নিচের দিকে

ফুল নকশা এবং ফুলকে কেন্দ্র করে খিলান নকশা দেখা যায়। লবণাক্ততা এবং যথোপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে প্রস্তর নির্মিত মিহরাবটি আজ তার শৈলী হারাতে বসেছে।



চিত্র ২১: প্রস্তর নির্মিত মিহরাবের শিকলে ঘণ্টা সদৃশ নকশার দৃশ্য, ষাট গম্বুজ মসজিদ।

বর্তমান নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলার আলমপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত চৌঘাট মৌজায় মাহীসন্তোষ মসজিদ অবস্থিত। মসজিদটি বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর ও মসজিদ অঙ্গনে ভগ্নুর মসজিদের প্রস্তর খণ্ড দেখা যায়। বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত অবতল মিহরাবের মাঝখানে শিকল সংযুক্ত বুলন্ত প্রদীপ নকশা দেখা যায় (চিত্র: ২২)।^{২২} শিকলের উভয় পাশে দুইটি ভুট্টা দানা সদৃশ সারি বিদ্যমান এবং উভয় সারির মাথায় ফুল ও ভুট্টা সদৃশ নকশা শোভা পেয়েছে।^{২৩} শিকলের নিম্নাংশে খিলান আকৃতির তিন স্তর শিকলে প্রদীপটি ঝুলানো আছে। বুলন্ত প্রদীপের যে অংশ শিকলে আটকানো আছে তার বর্ধিতাংশে লতা-পাতার নকশা দেখা যায়। প্রদীপের গায়ে প্যাঁচানো লতা-পাতা ও ফুলের নকশা দ্বারা সজ্জিত। প্রদীপের নিম্নাংশে পাতা সংযুক্ত বৃক্ষ এবং বৃক্ষের উভয় পাশে একজন করে নারী সদৃশ অবয়ব কল্পনা করা যায় এবং নারীদ্বয় বৃক্ষের নিচে পা বুলিয়ে বসে আছে (চিত্র: ২৩)। বৃক্ষের লতা দুই দিকে প্রসারিত হয়ে পাতা এবং মাথায় ফুলের কুঁড়ি ধারণ করে আছে। প্রদীপের শীর্ষে সজ্জিত আতা ফলের বীজের নকশা শোভা পেয়েছে। মিহরাবে ব্যবহৃত শিকলে বুলন্ত প্রদীপ নকশাটির প্রস্তর শৈলীতে স্থানীয় প্রভাব অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে এবং ভগ্নুর মসজিদ অঙ্গনে প্রস্তরসমূহে শিকল সংযুক্ত প্রদীপ নকশা শোভা পেয়েছে (চিত্র: ২৪)।^{২৪} মসজিদের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মিহরাবে ব্যবহৃত প্রস্তরে শিকল ঘণ্টা নকশার শৈলী ছিল যা বর্তমানে দেখা যায় না।^{২৫}



চিত্র ২২: অবতল মিহরাবের প্রস্তর খোদাইয়ে শিকল ঘণ্টা সদৃশ নকশা, মাহীসন্তোষ মসজিদ।



চিত্র ২৩: বুলন্ত প্রদীপের নিম্নাংশের দৃশ্য, মাহীসন্তোষ মসজিদ।



চিত্র ২৪: মাহীসন্তোষ মসজিদের প্রস্তর ফলকের অলঙ্করণ।

হাট হাজারীতে অবস্থিত ফকির মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে প্রস্তর নির্মিত অবতল মিহরাবে শিকল ঘণ্টা সদৃশ নকশা দেখা যায় (চিত্র: ২৫)।^{২৬} কেন্দ্রীয় মিহরাবের অবতল অংশে শিকল থাকলেও ঘণ্টা অনুপস্থিত। মিহরাবের প্রস্তর অলঙ্করণের উপর সিমেন্ট বাণুর প্রলেপ এবং রং ব্যবহারের ফলে প্রস্তর কারুকর্ম অনুধাবন করা যায় না। অবতল মিহরাবের মাঝখানে শিকলে বুলন্ত আয়তাকার অংশে প্রদীপ সদৃশ নকশা শোভা পেয়েছে। যদিও বুলন্ত আয়তাকার অংশের অধিকাংশই টাইলস ও মোজাইকে ঢাকা পড়ে আছে।



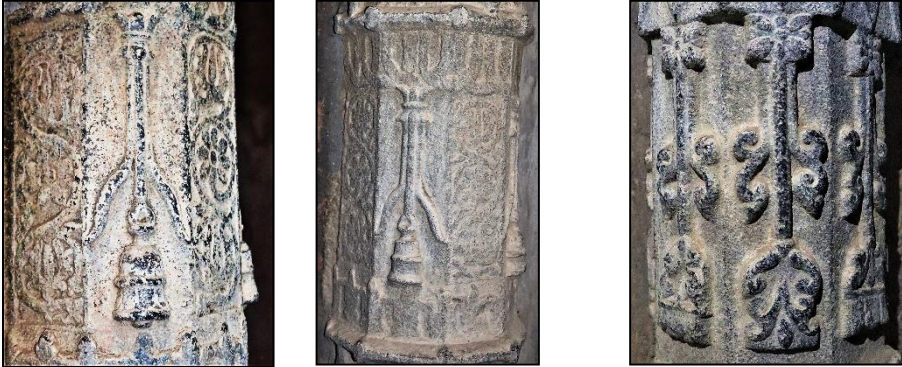
চিত্র ২৫: প্রস্তর নির্মিত মিহরাবে শিকলে ঘণ্টা সদৃশ নকশা, ফকির মসজিদ।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত দরসবাড়ি মসজিদে ব্যবহৃত প্রস্তর স্তম্ভে অলঙ্করণ দেখা যায়। মসজিদটির নির্মাণ রীতি ও অলঙ্করণ শৈলী বাংলার স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। মসজিদের অলঙ্করণে পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহার এবং শিকল ঘণ্টার নকশা দেখা যায়। মসজিদের ভিতরে ব্যবহৃত প্রস্তর স্তম্ভে শিকল ঘণ্টা নকশার অলঙ্করণ পরিলক্ষিত হয় (চিত্র: ২৬)। পূর্ববর্তী কোনো ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারত হতে শিকল ঘণ্টা নকশা সংযুক্ত স্তম্ভ সংগ্রহ করে মসজিদে ব্যবহার করা হতে পারে।



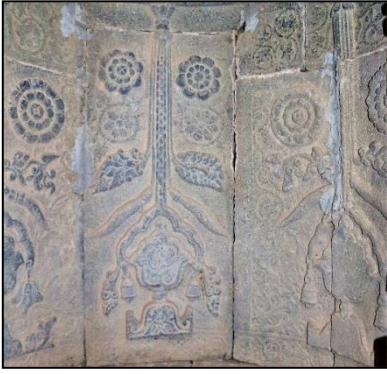
চিত্র ২৬: প্রস্তর স্তম্ভে শিকল ঘণ্টা নকশার অলঙ্করণ, দরসবাড়ি মসজিদ।

নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানার অন্তর্গত বন্দর শাহী মসজিদ/বাবা সালাহুর মসজিদ বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় উপনীত হয়েছে। প্রস্তর স্তম্ভ নির্ভর মসজিদটির প্রধান মিহরাবটি প্রস্তরে নির্মিত এবং মিহরাবের অবতল অংশে তিনটি শিকল ঘণ্টা সদৃশ নকশা শোভা পেয়েছে।^{২৭} মাঝখানের অংশে শিকল সংযুক্ত মেডেল আকৃতির বুলন্ত নকশা লক্ষণীয় এবং আয়তাকার মেডেলের মাঝখানে একটি ফুলের নকশা শোভা পেয়েছে। মাঝখানের শিকল ঘণ্টা নকশার উত্তরে অবস্থিত শিকলে বুলন্ত প্রদীপ নকশা দেখা যায় এবং দক্ষিণে অবস্থিত শিকলে ফুল, লতা-পাতার নকশাযুক্ত আয়তাকার মেডেল সদৃশ নকশা বুলন্ত অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়।



চিত্র ২৭: মিহরাব কলামে শিকল ঘণ্টা নকশা, খনিয়া দিঘি মসজিদ।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত খনিয়া দিঘি মসজিদ/রাজবিবি মসজিদের মিহরাব তিনটি প্রস্তর নির্মিত এবং প্রস্তর অলঙ্করণ দ্বারা সজ্জিত। কেন্দ্রীয় মিহরাবের সাথে সংযুক্ত খর্বা কৃতির কলামে বুলন্ত শিকল ঘণ্টা নকশা দেখা যায় (চিত্র: ২৭)। কলামে শিকল ঘণ্টা নকশা ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।^{২৮} প্রতি কলামে দু'টি করে মোট চারটি শিকল ঘণ্টা নকশা দেখা যায়। অবতল মিহরাবের ভিতরের অংশের প্রস্তর প্যানেলের অলঙ্করণে শিকল ঘণ্টা নকশার পরিবর্তে ফুল, লতা-পাতার সঙ্গে বুলন্ত প্রদীপ শোভা পেয়েছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবের উত্তর পার্শ্বস্থ মিহরাবের অবতল অংশের মধ্যভাগে তিনটি প্যানেলে বুলন্ত শিকলে প্রদীপ নকশা পরিলক্ষিত হয় (চিত্র: ২৮)। কেন্দ্রীয় মিহরাবে অলঙ্কৃত দণ্ডের দুই প্রান্তে বুলন্ত প্রদীপ নকশাটি দেখতে নিজের সদৃশ বলে মনে হয় এবং প্রদীপ নকশার দুই দিকে দু'টি ঘণ্টা শোভাবর্ধন করে আছে (চিত্র: ২৯)। শিকল ঘণ্টা নকশার পরিবর্তিত রূপ মুসলমানগণ এ মসজিদের মিহরাবের অবতল অংশের প্রস্তর অলঙ্করণে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।



চিত্র ২৮: পার্শ্ববর্তী মিহরাবে বুলন্ত শিকলে প্রদীপ নকশা, খনিয়া দিঘি মসজিদ।



চিত্র ২৯: কেন্দ্রীয় মিহরাবের অবতল অংশের প্রস্তর খোদাইয়ে শিকল ঘণ্টা নকশার রূপান্তরিত দৃশ্য, খনিয়া দিঘি মসজিদ।

প্রস্তর অলঙ্করণে শিকল ঘণ্টা নকশার বৈচিত্র্যময় সমাহার ছোট সোনা মসজিদে পরিলক্ষিত হয়। মধ্যযুগে বাংলায় নির্মিত প্রস্তর কারুকার্য সমৃদ্ধ ইমারতে শিকল ঘণ্টা সদৃশ নকশা সবচেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ করা যায় ছোট সোনা মসজিদে। মসজিদের বাইরের দেয়াল গায়ে, বুরুজে এবং ভিতরের দেয়াল ও মিহরাবে শিকল ঘণ্টা নকশার ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়।^{২৯} শিকল ঘণ্টা নকশায় বৈচিত্র্য এই মসজিদের প্রস্তর ফলকে ফুটিয়ে তোলার সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রাক মুসলিম যুগের শিকল ঘণ্টার প্রভাবে নির্মিত হলেও এই মসজিদের শিকল ঘণ্টা নকশায় মুসলমানগণ পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছেন। শিকল ঘণ্টা নকশার বহুবিধ শৈলীর মধ্যে যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমনি বৈসাদৃশ্যও বিদ্যমান। ছাঁচে অধিকাংশ নকশা প্রস্তুত করা হয়েছে। কয়েকটি প্যানেলের শিকল ঘণ্টা নকশার বিবরণের আলোকে মসজিদে ব্যবহৃত প্রস্তর ফলকে শিকল ঘণ্টা নকশার শৈলী প্রকরণ বিশ্লেষণ করা হলো। পূর্ব দেয়ালের বাইরের দিকে আঠারটি প্যানেলে শিকল ঘণ্টা সদৃশ নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।^{৩০} প্রধান প্রবেশপথের প্রতি পাশে তিনটি প্যানেলে শিকল ঘণ্টার

ন্যায় নকশা শোভা পেয়েছে। প্রবেশপথের প্যানেলের ছয়টি শিকল ঘণ্টা নকশায় মূলত দুই প্রকৃতির শৈলী ফুটে উঠেছে। উপরের দিকের দু'টি প্যানেলে শিকলের পরিবর্তে মাছ ধরার জালে ব্যবহৃত লোহার গুটিকা অথবা গলায় পরিহিত মালার গুটিকার সদৃশ কাঠামো একটির পর একটি সাজিয়ে নকশা তৈরি করা হয়েছে (চিত্র: ৩০)। বুলন্ত নকশাটির নিচে অলঙ্কৃত ঘণ্টা শোভা পেয়েছে। অলঙ্কৃত শিকল সদৃশ নকশার উভয় পাশে বুলন্ত পাতা দেখা যায়। বুলন্ত পাতা নকশা দেখতে পাখির আকৃতির ন্যায় মনে হয় (চিত্র: ৩১)। এর ঠিক নিচে উভয় পাশে স্থান পেয়েছে মরিচ সদৃশ নকশা।



চিত্র ৩০: কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের প্যানেলে শিকল ঘণ্টার ন্যায় নকশা, ছোট সোনা মসজিদ।



চিত্র ৩১: শিকল ঘণ্টা নকশার সাথে পাখি সদৃশ শৈলী, ছোট সোনা মসজিদ।

কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের নিম্নপার্শ্বস্থ প্যানেলে খিলান নকশার মাঝে শিকলে বুলন্ত প্রদীপ নকশা দেখা যায় (চিত্র: ৩২)।^{৩৩} প্রদীপের উভয় পাশে বুলন্ত ঘণ্টা নকশা পরিলক্ষিত হয়। শিকল নকশার উভয় পাশে পূর্ববর্তী প্যানেলের ন্যায় নকশা লক্ষণীয়। প্রবেশপথের প্যানেলে ব্যবহৃত শিকল ঘণ্টা নকশার অনুরূপ নকশা মসজিদের বাইরের দেয়ালে ও ভিতরের দেয়ালে একাধিক প্যানেলে শোভা পেয়েছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবের উত্তর পাশের অবতল মিহরাবের মাঝখানের প্যানেলে একই শিকল সংযুক্ত প্রদীপের বুলন্ত নকশা দেখা যায় (চিত্র: ৩৩)। অবতল মিহরাবের মাঝখানের প্যানেলের উভয় দিকের শিকল ঘণ্টা সদৃশ নকশার সাথে প্রধান প্রবেশপথের প্যানেলের উপরের দিকের ঘণ্টা নকশার শৈলীতে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। মধ্যবর্তী প্যানেলের উভয় পাশে চারটি করে মোট আটটি শিকল ঘণ্টার ন্যায় নকশা পরিলক্ষিত হয়। খিলান নকশার মধ্যবর্তী অংশ হতে নিচের দিকে শিকলে ঘণ্টার অনুকৃতি প্রস্তর খোদাইয়ে দেখা যায়।



চিত্র ৩২: কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের প্যানেলে শিকলে বুলন্ত প্রদীপ ও ঘণ্টা নকশা, ছোট সোনা মসজিদ।



চিত্র ৩৩: মিহরাবের অবতল অংশের প্যানেলে শিকলে বুলন্ত প্রদীপ ও ঘণ্টা নকশা, ছোট সোনা মসজিদ।



চিত্র ৩৪: ছোট সোনা মসজিদের দেয়ালের প্যানেলের প্রস্তর অলঙ্করণে শিকল ঘণ্টা নকশার অনুকৃতি।

প্রধান প্রবেশপথ এবং ডান দিকের পার্শ্ববর্তী প্রবেশপথের মাঝামাঝি ব্যবহৃত প্যানেলে খিলান নকশার মাঝখানে শিকল ঘণ্টা সদৃশ নকশার উত্তম ব্যবহার দেখা যায় (চিত্র: ৩৪)। ছোট সোনা মসজিদে ব্যবহৃত প্যানেলে প্রস্তর খোদাইয়ে সর্বোচ্চ শৈলী এই প্যানেলে ফুটে উঠেছে। প্রস্তর খোদাইয়ে লোহার শিকলের আকৃতি দেওয়া হয়েছে এই প্যানেলে ব্যবহৃত শিকল নকশায়। শিকলটি একটি সিংহের কীর্তি মুখ সদৃশ আকৃতি হতে বের হয়ে নিচের দিকে ঝুলে আছে (চিত্র: ৩৫)। কীর্তি মুখ সদৃশ নকশার উপরে অলঙ্কৃত মুকুট শোভা পেয়েছে। শিকলের উভয়পাশে গিটযুক্ত কাণ্ডের মাথায় বুলন্ত ভুট্টা দানা সদৃশ নকশা রয়েছে (চিত্র: ৩৬)। গিটযুক্ত কাণ্ডের উভয়পাশে প্যাঁচানো দাঁড়ি সদৃশ নকশার নিচের দিকে পাখি আকৃতির লতা-পাতা বুলন্ত অবস্থায় দেখা যায় (চিত্র: ৩৬)। শিকলের নিচের দিকে অলঙ্কৃত বুলন্ত ঘণ্টা সদৃশ নকশা পরিলক্ষিত হয়

(চিত্র: ৩৭)। প্রতীকী ঘণ্টা নকশার উভয়দিকে ভুট্টা দানা নকশায় পাখির ডানার আকৃতি ধারণ করেছে এবং নিচের দিকে মাঝখানে ভুট্টা দানা অথবা আতা ফলের বীজের নকশায় মোচাকৃতির শৈলী সৃষ্টি করেছে। ঘন্টার উপরের দিকে ফুলদানি হতে উথিত গুল্ম দেখতে ডানায়ুক্ত পিঁপড়ার সদৃশ (চিত্র: ৩৮)



চিত্র ৩৫: কীর্তিমুখ সদৃশ শৈলী, ছোট সোনা মসজিদ।



চিত্র ৩৬: পাখি ও ভুট্টা থোকান ন্যায় নকশা, ছোট সোনা মসজিদ।



চিত্র ৩৭: ঘন্টার ন্যায় শৈলী, ছোট সোনা মসজিদ।

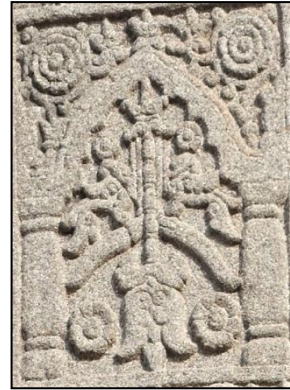
উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের দেয়ালের বাইরের দিকে নিচের সারিতে ব্যবহৃত প্রস্তর প্যানেলে শিকল ঘণ্টা নকশার একটি শৈলী এবং উপরের সারিতে ব্যবহৃত প্রস্তর প্যানেলে শিকল ঘণ্টা নকশায় আরেকটি শৈলী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নিচের দিকের প্যানেলে শিকলের পরিবর্তে ঢালাই আকৃতির অলঙ্করণ বিহীন নকশা দেখা যায় এবং উপরের দিকের প্যানেলে স্তম্ভযুক্ত খিলান নকশার মাঝে শিকল ঘণ্টা সদৃশ প্রতীকী নকশা প্রত্যক্ষ করা যায় (চিত্র: ৩৯, ৪০)।



চিত্র ৩৮: ফুলদানি হতে উথিত গুল্ম, ছোট সোনা মসজিদ।



চিত্র ৩৯: প্যানেলে শিকল ঘন্টার ন্যায় নকশা, ছোট সোনা মসজিদ।



চিত্র ৪০: প্যানেলে শিকল ঘন্টার ন্যায় নকশা, ছোট সোনা মসজিদ।

মসজিদের চার কোণে প্রস্তর নির্মিত বুরুজে শিকল ঘণ্টা নকশা দ্বারা সজ্জিত। বুরুজসমূহ চারটি অংশে বিভক্ত করে শিকলের পরিবর্তে কাণ্ড আকৃতির রূপ দেওয়া হয়েছে এবং কাণ্ডে ফুল, শস্যসহ ঘণ্টা সদৃশ নকশা খোদিত আছে (চিত্র: ৪১)। কেন্দ্রীয় মিহরাবে সংযুক্ত কলামে এবং মিহরাবের অবতল অংশেও শিকল ঘণ্টা সদৃশ নকশা দেখা যায়। ছোট সোনা মসজিদের প্রস্তর অলঙ্কৃত কেন্দ্রীয় মিহরাবটি The Royal Scottish Museum, Edinburgh এ সংরক্ষিত আছে।^{৩২} মসজিদের মিহরাব দেয়ালের অলঙ্করণে ব্যবহৃত প্যানেলে শিকল ঘণ্টার ন্যায় নকশা পরিলক্ষিত হয়। মূলত মধ্যযুগে বাংলায় প্রস্তর কারুকার্যে শিকল ঘণ্টা নকশা ব্যবহারের দিক দিয়ে ছোট সোনা মসজিদ অদ্বিতীয়।



চিত্র ৪১: বুরুজের প্রস্তর খোদাইয়ে শিকল ঘণ্টার ন্যায় নকশা, ছোট সোনা মসজিদ।

সুলতানি বাংলার স্থাপত্যকলার ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছে গোয়ালদি মসজিদ। মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহরাবটি প্রস্তরে নির্মিত। প্রস্তর কারুকার্যের অধিকাংশই বর্তমানে হারিয়ে যেতে বসেছে। আয়তাকার ফ্রেমে অবতল মিহরাবটি প্রস্তর অলঙ্করণ দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল। কেন্দ্রীয় মিহরাবের অবতল অংশে আলঙ্কারিক খিলান নকশার মাঝখান হতে বুলন্ত শিকা সদৃশ শিকলে অলঙ্কৃত প্রদীপ পরিলক্ষিত হয় (চিত্র: ৪২)।^{৩৩} শিকলের একটি অংশ নিচের দিকে এসে তিনটি ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। দুই প্রান্তের দুটি শিকল প্রদীপের আটকানো অংশের সঙ্গে যুক্ত আছে। শিকলের উপর দিক হতে দুটি আম আকৃতির নকশা বুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। প্রদীপের গায়ে প্রস্তর অলঙ্করণ পরিলক্ষিত হয়। প্রদীপের আংটা নিম্নমুখী হয়ে লতা-পাতার নকশায় বুলে আছে। বুলন্ত লতা-পাতার নকশার নিচের অংশ দেখতে অনেকটা হাঁস আকৃতির রূপ ধারণ করেছে বলে মনে হয়। প্রদীপের নিচের অংশ ঘণ্টা সদৃশ নকশায় অলঙ্কৃত যা প্রদীপ বসানোর জন্য ব্যবহৃত হতো।



চিত্র ৪২: বুলন্ত শিকা সদৃশ শিকলে অলঙ্কৃত প্রদীপ নকশা, গোয়ালদি মসজিদ, সোনারগাঁও।

দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলায় অবস্থিত সুরা মসজিদে প্রস্তর অলঙ্করণ পরিলক্ষিত হয়। কেন্দ্রীয় মিহরাবের প্রস্তর খোদাইয়ে অলঙ্করণ শৈলীর আধিক্য দেখা যায়। আয়তাকার অবতল মিহরাবে সংযুক্ত কলামে শিকল ঘণ্টা নকশা দেখা যায় (চিত্র: ৪৩)।^{৩৪} শিকলে বালু আকৃতির ঘণ্টার ন্যায় নকশা পরিলক্ষিত হয়। প্রাক মুসলিম যুগের প্রস্তর অলঙ্করণে ব্যবহৃত ঘণ্টার অনুরূপ আকৃতি ব্যবহার না করে মুসলমানগণ ঘণ্টার গায়ে নকশা করে প্রতীকী ঘণ্টা নকশার আকৃতি প্রদান করেছেন। মিহরাবের অবতল অংশে খিলান নকশার মাঝে শিকল ঘণ্টা নকশা দেখা যায় (চিত্র: ৪৪)। শিকল অংশ ঢালাইকৃত পাতা, শস্যসহ বুলন্ত গহনা আকৃতির নকশায় সজ্জিত। শিকলের পরিবর্তে খিলানের মাঝখান হতে মোচাকৃতির অথবা বল্লমের মাথা সদৃশ নকশা গোলাকার ও ত্রিভুজাকার নকশা সহযোগে নিম্নে গহনা সদৃশ ঝাড়বাতিকে ধরে আছে। ছোট সোনা মসজিদের ন্যায় ভুট্টা থোকার নকশাও দেখা যায়।



চিত্র ৪৩: মিহরাব কলামে শিকল ঘণ্টা সদৃশ নকশা, সুরা মসজিদ।



চিত্র ৪৪: মিহরাবের অবতল অংশের প্রস্তর কর্তনের দৃশ্য, সুরা মসজিদ।

মিহরাবে ব্যবহৃত কলাম দুটির পাশে আয়তাকার ফ্রেমে শিকল ঘণ্টা নকশার প্রতীকী নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্যানেলের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বকে বারটি আয়তাকার অংশে বিভক্ত করা হয়েছে জ্যামিতিক নকশা দ্বারা। উপরের অনুভূমিক প্যানেলে খিলান নকশার মাঝে চারটি প্রতীকী বুলন্ত শিকল ঘণ্টা সদৃশ নকশা দেখা যায়। প্রতিটি আয়তাকার অংশে খিলান নকশার মাঝে শিকল ঘণ্টা নকশায় পরিবর্তিত শৈলী পরিলক্ষিত হয়। বারটি আয়তাকার অংশে প্রতীকী শিকল ঘণ্টা নকশার প্রস্তর খোদাইয়ে একই রীতির প্রয়োগ হলেও শৈলীতে সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষণীয়। দক্ষিণ পাশের আয়তাকার প্যানেলের দণ্ডায়মান অংশের উপর হতে চতুর্থ আয়তাকার অংশের বুলন্ত নকশায় ঘণ্টার ব্যবহার দেখা যায়। খিলান নকশার মাঝে শিকলের পরিবর্তে পুঁতির মালা সদৃশ নকশার নিম্নে গহনা আকৃতির ঘণ্টা নকশা এবং এর উভয়পাশে পাতায়ুক্ত লতার মাথায় ঘণ্টা নকশা দেখা যায় (চিত্র: ৪৫)। অন্যান্য আয়তাকার অংশে কানের গহনা নকশার বিভিন্ন প্রকরণ শিকল ঘণ্টা নকশার পরিবর্তে এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (চিত্র: ৪৬)। এর কোনোটি মোচাকৃতির, কোনোটি শামুকের ন্যায়, কোনোটি ঘণ্টার ন্যায় নকশায় সজ্জিত। অবতল অংশের মাঝখানের বুলন্ত নকশাটি ঘণ্টার পরিবর্তিত রূপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে যা গহনা সদৃশ নকশায় অলঙ্কৃত এবং দেখতে উল্টানো ছাতার মতো মনে হয়। খিলান নকশার শীর্ষ হতে বল্লমের মাথার সদৃশ শৈলী নিম্নমুখী হয়ে উল্টানো ছাতার ন্যায় নকশাকে ধরে আছে।



চিত্র ৪৫: শিকল ঘণ্টার ন্যায় নকশা, সুরা মসজিদ।



চিত্র ৪৬: শিকল ঘণ্টা নকশার রূপান্তরিত শৈলী, সুরা মসজিদ।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বাম পাশে সিতাকুণ্ড উপজেলার কুমিরা ইউনিয়নে হাম্মাদিয়ার মসজিদ অবস্থিত। সুলতানি আমলে নির্মিত মসজিদটিতে প্রস্তরের কারুকার্যে বিভিন্ন নকশা পরিলক্ষিত হয়। রং এর প্রলেপ ব্যবহারের ফলে প্রস্তর খোদাই শৈলীর অলঙ্করণ অনেকটাই আজ ঢাকা পড়েছে। পশ্চিম দেয়ালে প্রস্তরে নির্মিত মিহরাব তিনটির মধ্যে দক্ষিণ দিকের মিহরাবটির প্রস্তর অলঙ্করণ টাইলস দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও উত্তর দিকের মিহরাবের অবতল অংশে শিকল ঘণ্টা নকশা দেখা যায় (চিত্র: ৪৭)। বুলন্ত শিকলের নিচের দিকে আয়তাকার মেডেল আকৃতির নকশা দেখা যায়। রং এর প্রলেপের কারণে শিকল ঘণ্টা সদৃশ নকশার প্রকৃত শৈলী অনুধাবন করা যায় না। কেন্দ্রীয় মিহরাবে ব্যবহৃত শিকল ঘণ্টা নকশা মিহরাবের অর্ধ গম্বুজের মধ্যবর্তী স্থান হতে নিচের দিকে বুলন্ত অবস্থায় বিদ্যমান। শিকলে বুলন্ত আয়তাকার অংশ অলঙ্করণ সমৃদ্ধ ছিল যা পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয়েছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবের শিকল ঘণ্টার ন্যায় উত্তর দিকের ক্ষুদ্র মিহরাবেও

শিকল ঘণ্টা দেখা যায়। কেন্দ্রীয় মিহরাবের শিকল ঘণ্টা নকশার উভয় পাশের প্রস্তর ফলকে খিলান নকশার মাঝে শিকলে প্রদীপ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায় (চিত্র: ৪৮)। ঝুলন্ত প্রদীপের নকশাটিতে রং এর প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দেওয়ার ফলে প্রকৃত শৈলী বোঝা যায় না। তবে শিকলে যে ঝুলন্ত প্রদীপ ছিল তা অস্পষ্ট হলেও অনুধাবন করা যায়।



চিত্র ৪৭, ৪৮: মিহরাবের অবতল অংশে শিকল ঘণ্টা সদৃশ নকশা, হাম্মাদিয়া মসজিদ।

মধ্যযুগে বাংলায় প্রস্তর অলঙ্করণ সমৃদ্ধ ইमारতের মধ্যে কুসুম্বা মসজিদ অন্যতম। প্রাক মুসলিম পর্বের প্রস্তর অলঙ্করণ শৈলীতে মুসলমানগণ পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল এই মসজিদের প্রস্তর অলঙ্করণে মোটিফ ব্যবহারের ক্ষেত্রে। দেশজ প্রভাবের সাথে এই মসজিদের অলঙ্করণে বৈচিত্র্যময় শৈলী যুক্ত হয়ে নান্দনিক ও মোহনীয় করে তুলেছে। মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহরাব, কেন্দ্রীয় মিহরাবের দক্ষিণ দিকের মিহরাব ও বাদশাহ-কা-তখত তথা দ্বিতল কক্ষের মিহরাবে সংযুক্ত কলামে শিকলে ঝুলন্ত ঘণ্টা সদৃশ নকশা পরিলক্ষিত হয় (চিত্র: ৪৯)। অলঙ্করণের ক্ষেত্রে কলামের কাণ্ডে শিকল নকশা ঠিক থাকলেও ঘণ্টা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মুসলমানগণ পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছেন। সুরা মসজিদের মিহরাব কলামের ন্যায় কুসুম্বা মসজিদের মিহরাব কলামে শিকল ঘণ্টা সদৃশ নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অলঙ্করণের দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে। পদ্ম পাঁপড়ির নকশা দ্বারা ঘণ্টা সদৃশ অংশ অলঙ্কৃত। মিহরাব তিনটির কলামে একই শৈলী দেখা গেলেও অলঙ্করণের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখা যায়। এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী শিকলে ঝুলন্ত অংশকে ঝাড়বাতির অনুকৃতি হিসাবে উল্লেখ করেছেন।^{৩৫}



চিত্র ৪৯: কুসুম্বা মসজিদের মিহরাব কলামে শিকলে বুলন্ত ঘণ্টা সদৃশ নকশা।

মিহরাবের অবতল অংশের মধ্যাংশে শিকল ঘণ্টা নকশার পরিবর্তিত শৈলী লক্ষ করা যায় (চিত্র: ৫০)।^{৩৬} কেন্দ্রীয় মিহরাব হতে দক্ষিণ পাশের মিহরাবের মধ্যাংশ পাঁচটি আয়তাকার অলঙ্কৃত প্রস্তরে গঠিত। অলঙ্কৃত পাঁচটি প্রস্তর ফলকে খোদাইকৃত নকশার বিষয়বস্তু একই হলেও শৈলী বিন্যাসে পার্থক্য রয়েছে। দক্ষিণ পাশের মিহরাবের অবতল অংশ, কলামের নিম্নাংশে এবং মিহরাবের আয়তাকার ফ্রেমের নিম্নে বুলন্ত বালু সদৃশ নকশা দেখা যায়। বালু আকৃতির নকশাটিকে গহনার সাথেও তুলনা করা যায়। বুলন্ত বালু সদৃশ অংশের নিম্ন এবং উপরাংশ দানা নকশা দ্বারা অলঙ্কৃত। পাঁচ সারি ভুট্টা দানার নকশা অর্ধ চন্দ্র আকৃতির অথবা উল্টানো অর্ধ বৃত্তাকার খিলান সদৃশ রূপ ধারণ করে আছে। এর দুই মাথা অলঙ্কৃত নকশায় প্যানেলের উপরাংশের সাথে সংযুক্ত আছে। ভুট্টা দানা আকৃতির পাঁচ সারির স্থলে তিন সারির নকশাও দেখা যায়। ভুট্টা দানা সদৃশ অংশের নিচে বালু আকৃতির নকশা বুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। বালু আকৃতির নকশাটি পাঁচ সারি ভুট্টা দানা সদৃশ নকশাতে গঠিত। ভুট্টা দানা সদৃশ সারির মধ্য সারি দেখতে তসবিহর পুঁতির ন্যায় মনে হয় (চিত্র: ৫১)। বালুর অনুকৃতির মাঝে ফুলদানি নকশা পাতা, ফুলসহ দেখা যায়। ফুলদানির মধ্যাংশ আনারস সদৃশ নকশায় অলঙ্কৃত। বালু আকৃতির নকশার নিম্নে ভুট্টা দানা সদৃশ নকশা দেখতে ঘণ্টা আকৃতির (চিত্র: ৫২)। ঘণ্টা আকৃতির নকশার মধ্যবর্তী অংশ ফুল, গহনা, ফুলদানি ও লতা-পাতায় অলঙ্কৃত।



চিত্র ৫০: মিহরাবের অবতল অংশের মধ্যাংশে শিকল ঘণ্টা নকশার পরিবর্তিত শৈলী।

চিত্র ৫১: মিহরাবের অবতল অংশের মধ্যাংশে তসবিহর ন্যায় বুলন্ত নকশা।

চিত্র ৫২: মিহরাবের অবতল অংশে বালু আকৃতির বুলন্ত নকশা।

কেন্দ্রীয় মিহরাবের অবতল অংশের মধ্যাংশে পাঁচটি অলঙ্কৃত প্যানেল তিনটি প্রস্তর খণ্ডে গঠিত। শিল্পিগণ প্রতিটি প্যানেলে শিকল ঘণ্টা নকশার পরিবর্তিত শৈলী ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁরা সফলও হয়েছেন। বহু খাঁজ বিশিষ্ট খিলান নকশার মধ্যবর্তী অংশ হতে শিকল ঘণ্টার পরিবর্তিত রূপ বুলন্ত অবস্থায় দেখা যায় (চিত্র: ৫৩)। শিকলের আকৃতি প্রদান করা হয়েছে কানে পরিহিত গহনা সদৃশ নকশা একটির পর একটি নিম্নমুখী সাজিয়ে। গহনা সদৃশ নকশাটি ঝিনুক আকৃতিতে নির্মিত। উপর দিক হতে তিনটি গহনা সদৃশ নকশার মাথায় ভুট্টা দানা সদৃশ নকশা দেখা যায়। ভুট্টা দানার নিম্নমুখী অংশের প্রতি পার্শ্বে তিনটি করে গহনা নকশা বুলন্ত অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। ভুট্টা দানা নকশার সংযুক্ত অংশ হতে নিচের দিকে গহনা আকৃতির নকশায় বুলন্ত ঘণ্টা সদৃশ অলঙ্করণ শোভা পেয়েছে। বুলন্ত ঘণ্টা সদৃশ নকশার নিচে একটি গহনা আকৃতির নকশা দেখা যায়। লতা-পাতার সমন্বয়ে অলঙ্করণ শৈলী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবের মধ্যাংশের নকশাটি দেখতে বুলন্ত ঝাড়বাতি সদৃশ বলেও মনে করা যেতে পারে। অলঙ্করণ শৈলীতে পরিবর্তন লক্ষ করা গেলেও এর উৎস হিসাবে শিকল ঘণ্টা নকশা কারিগরদের উৎসাহ প্রদান করেছিল।



চিত্র ৫৩: কেন্দ্রীয় মিহরাবের অবতল অংশের মধ্যাংশে শিকল ঘণ্টার ন্যায় নকশা, কুসুম্বা মসজিদ।

কেন্দ্রীয় মিহরাবের উত্তরে দ্বিতল কক্ষের নিচে প্রস্তর ফলকে শিকল ঘণ্টা আকৃতির নকশা দেখা যায়। ফুলের তিনটি করে পাঁপড়ি সাজিয়ে শিকলের আকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং নিচের দিকে ঘণ্টা সদৃশ নকশা বুলন্ত অবস্থায় খিলান নকশায় পরিশোভিত (চিত্র: ৫৪)। দ্বিতল কক্ষে ব্যবহৃত স্তম্ভের উপরের অংশের প্রস্তর ফ্রেমেও শিকল ঘণ্টা নকশার আদলে শৈলী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (চিত্র: ৫৫)। মসজিদের বাইরের দেয়াল গায়ে ব্যবহৃত প্রস্তর ফলকেও শিকল ঘণ্টা আকৃতির অলঙ্করণ পরিলক্ষিত হয় (চিত্র: ৫৬)।^{৩৭} বাইরের দেয়াল গাত্রের অলঙ্করণে প্রস্তর ফলকের শৈলীর সাথে কেন্দ্রীয় মিহরাবের অলঙ্করণ শৈলীর সাদৃশ্য রয়েছে। তবে প্রস্তর খোদাইয়ের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। বাইরের প্রস্তর খোদাই অনেকটাই ঢালাই প্রকৃতির এবং অগভীর। কেন্দ্রীয় মিহরাবের নকশায় ব্যবহৃত গহনা সদৃশ শিকলে ঘণ্টা আকৃতির অলঙ্করণ বাইরের দেয়ালের প্যানেলেরও দেখা

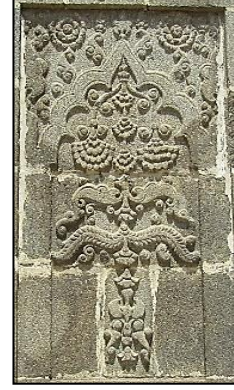
যায়। ভুট্টা দানা আকৃতির নকশায় এখানে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ভুট্টা থোকার নকশাটি দেখতে পাতা আকৃতির অথবা খেজুর থোকার ন্যায় মনে হয়।



চিত্র ৫৪: প্রস্তর প্যানেলে শিকল ঘণ্টার অনুকরণে খোদাই শৈলী, কুসুম্বা মসজিদ।



চিত্র ৫৫: প্রস্তর প্যানেলে শিকল ঘ্রার অনুকরণে খোদাই শৈলী, কুসুম্বা মসজিদ।



চিত্র ৬৬: প্রস্তর প্যানেলে শিকল ঘ্রার অনুকরণে খোদাই শৈলী, কুসুম্বা মসজিদ।

মধ্যযুগে বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে প্রস্তর খোদাইয়ে শিকল ঘণ্টা শৈলীর বিশেষণে যে সকল দিক গবেষণাতে খুঁজে পাওয়া যায়, তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

এক: শিকল ঘণ্টা শৈলীর অলঙ্করণ প্রাক মুসলিম আমলে বাংলাতে প্রস্তর খোদাইয়ে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাক মুসলিম আমলের আবিষ্কৃত প্রস্তর ভাস্কর্য, স্তম্ভ, সর্দল প্রভৃতিতে এই নকশার অলঙ্করণ পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন জাদুঘরে সংরক্ষিত প্রত্নবস্তু এর প্রমাণ বহন করে।

দুই: ইসলাম ধর্ম দর্শনের সাথে শিকল ঘণ্টা নকশা সাংঘর্ষিক নয় বিধায় মধ্যযুগে বাংলার মুসলিম ইমারতের অলঙ্করণে প্রস্তর খোদাই ও পোড়ামাটির শিল্পে জনপ্রিয় শৈলীতে পরিণত হয়েছিল। তবে শিকল ঘণ্টা নকশা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মুসলমানগণ বৈচিত্র্যময় শৈলী প্রস্তর খোদাইয়ে ফুটিয়ে তুলেছিল।

তিন: মধ্যযুগে বাংলার মুসলিম ইমারতের অলঙ্করণে শিকল ঘণ্টা নকশার উৎস প্রাক মুসলিম যুগের অলঙ্করণ শৈলী হতে আগত।^{৩৬} মুসলিমগণ কখনও সরাসরি আবার কখনও পরিবর্তন সাপেক্ষে প্রস্তর খোদাইয়ে শিকল ঘণ্টা নকশা ফুটিয়ে তুলেছিল। প্রাক মুসলিম যুগের শিকল ঘণ্টা সম্বলিত প্রস্তর স্তম্ভ সরাসরি ব্যবহৃত হলেও প্রস্তর ফলকের খোদাইয়ে কোথাও শিকল থাকলেও ঘণ্টা নেই, আবার ঘণ্টা থাকলেও শিকলের অনুকৃতিতে পরিবর্তন দেখা যায়।

চার: নদী বিধৌত পলি মাটির বাংলায় প্রস্তর পাওয়া যায় না বললেই চলে। মধ্যযুগে বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে ব্যবহৃত প্রস্তরের যোগান দিয়েছিল প্রাক ইসলামি যুগে বাংলার নির্মিত ভগ্ন ইমারত বিশেষ করে পড়ো মন্দির। জাফর খান গাজীর সমাধি ও মসজিদ, আদিনা মসজিদ, মাহীসন্তোষ মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, মান্দা মসজিদ শিলালিপি, শীতল মঠ (জয়পুরহাট) শিলালিপি, করোটিয়া মসজিদ (টাঙ্গাইল) শিলালিপি, চাটমোহর মসজিদ (পাবনা) শিলালিপি, গায়েবি দিঘি মসজিদ

(সিলেট) শিলালিপি প্রভৃতি এর প্রমাণ বহন করে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত দরসবাড়ি মসজিদে ব্যবহৃত প্রস্তর স্তম্ভে শিকল ঘণ্টা নকশার অলঙ্করণ পরিলক্ষিত হয়।

পাঁচ: শিকল ঘণ্টার ন্যায় নকশা মধ্যযুগে বাংলার মুসলিম ইমারতের অলঙ্করণে ব্যবহৃত হলেও মুসলমানগণ এক্ষেত্রে সৃজনশীলতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছে। শিকল এবং ঘণ্টা উভয়ের ক্ষেত্রে মুসলিমগণ নানাবিধ কৌশল ব্যবহার করে প্রস্তর খোদাইয়ে একটি স্বকীয় শৈলী উপহার দিয়েছে।

ছয়: শিকল ঘণ্টা নকশার উৎপত্তি বাংলার স্বকীয় শৈলী হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। প্রাক মুসলিম যুগের প্রস্তর স্তম্ভে এ শৈলীর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বাংলার মন্দির স্থাপত্যে পুজার লগ্ন বা সময় বোঝানোর নিমিত্তে কাঁসর ঘণ্টা ঝুলন্ত অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। এই কাঁসর ঘণ্টা মুসলিম আমলে পরিবর্তিত হয়ে প্রস্তর খোদাইয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং সোনালী আঁশের দেশ বাংলাতে পাটের তৈরি শিকার প্রভাবও শিকল ঘণ্টা নকশার শৈলীতে পড়েছিল বলে ধারণা করা যায় (চিত্র: ৬৭)। শিকার ন্যায় শিকল সদৃশ শৈলী গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের সমাধি সৌধে পরিলক্ষিত হয়।



চিত্র ৬৭: কাঁসর ঘণ্টা ও পাটের তৈরি শিকা (ওয়েব সাইড হতে সংগৃহীত)।

সাত: মধ্যযুগে বাংলাতে নির্মিত অধিকাংশ ইমারতের অলঙ্করণে শিকল ঘণ্টা সদৃশ নকশার অনুকৃতি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। পোড়ামাটির ফলকে এবং প্রস্তর খোদাইয়ে এ শৈলী অত্যন্ত নান্দনিকভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

আট: মুসলমানগণ শিকল ঘণ্টা নকশা সদৃশ শৈলী ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে ঘণ্টার পরিবর্তে প্রদীপের যে ব্যবহার করেছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মুসলিম ইমারত বিশেষ করে মসজিদ স্থাপত্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ মিহরাব এবং দেয়াল অলঙ্করণে প্রদীপ, ঝাড়বাতির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

নয়: মধ্যযুগে বাংলার মুসলিম ইমারতে প্রস্তর খোদাইয়ে শিকল ঘণ্টা নকশার অলঙ্করণে ইমারতসমূহ পর্যবেক্ষণে যথাযথ সংরক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রস্তর খোদাই শৈলীর উপর সিমেন্টের প্রলেপ, রং এর প্রলেপ প্রদানের ফলে প্রকৃত শৈলী অনুধাবন করা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। বাগেরহাট জেলা তথা বাংলার অন্যতম ইমারত ষাট গম্বুজের কেন্দ্রীয় মিহরাবটি প্রস্তর খোদাই শৈলী দ্বারা অলঙ্কৃত হলেও লবণাক্ততা এবং উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় আজ তা অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, প্রাক-মুসলিম যুগের ইমারতে বিশেষ করে প্রস্তর স্তম্ভে ব্যবহৃত শিকল ঘণ্টা নকশা মুসলমানগণ গ্রহণ করেছেন। অনেক সময় তাঁরা নির্মাণ উপাদান হিসাবে প্রাক-মুসলিম আমলের শিকল-ঘণ্টা যুক্ত স্তম্ভ সরাসরি স্থাপত্যে ব্যবহার করেছেন। প্রস্তর অলঙ্করণেও মুসলমানগণ সরাসরি শিকল ঘণ্টা নকশার ব্যবহার করেছেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে শিকল থাকলেও ঘণ্টার অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে প্রস্তর অলঙ্করণে শিকল ঘণ্টা নকশার অনুকরণে বৈচিত্র্যময় শৈলী কারিগরগণ উপহার দিতে সক্ষম হয়েছে যা মুসলমানদের নিজস্ব শিল্প শৈলী হিসাবেও আখ্যায়িত করা যায়। তবে শিকল ঘণ্টা নকশার অনুকরণে অনুরূপ শৈলী সৃষ্টিতে বাংলার দেশজ উপাদানসমূহের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। শিল্পিগণ প্রস্তর অলঙ্করণে গ্রাম বাংলায় পাটের তৈরি শিকার আদলে শিকল নকশা ব্যবহার করেছে। কখনও গহনা নকশার মাধ্যমে শিকলের আকৃতি প্রদান করা হয়েছে। আবার ফুলের পাপড়ি, পুঁতি নকশার মাধ্যমে শিকলের অনুকৃতি দান করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার লতা নকশার মাধ্যমেও শিকলকে ব্যবহার করা হয়েছে। বুলন্ত ঘণ্টার ক্ষেত্রেও মুসলমানগণ পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছে। কখনও ঘণ্টা, কখনও প্রদীপ, ঝাড়বাতি, মেডেল, লকেট, গহনা, বাল্ব, পুষ্প, লতা-পাতার অনুকৃতিতে রূপ দেওয়া হয়েছে। বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের অলঙ্করণে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোটিফ হিসাবে শিকল ঘণ্টা সদৃশ নকশাকে বিবেচনা করা যায়। এ. বি. এম. হোসেনের মন্তব্য এ ক্ষেত্রে যথার্থ বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন, “It is amazing how the chain was converted to different kinds of stems and the bell to pendants, buds, flowers and even to lanterns all executed differently, not a single one being the same with the other.”^{১৯}

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

- ১ মোশাররফ হোসেন, “ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের কতিপয় অলঙ্করণ: উৎস ও ক্রমবিকাশ”, আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ, ঢাকা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ২৪৭

- ২ মোহাম্মদ শামসুল হক, “ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাসে বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের অবস্থান”, আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ, ঢাকা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ২৯২
- ৩ Ahmed Hasan Dani, *Muslim Architecture in Bengal* (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1961), p.130
- ৪ বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য।
- ৫ Ahmed Hasan Dani, *op.cit.*, p.19
- ৬ Khoundkar Alamgir, “Bell and Chain Decoration in Sultanate Architecture of Bengal”, *Journal of Bengal Art*, Vol. 17, 2012, p. 9
- ৭ Ram P. B. Singh, *Cosmic Order and Cultural Astronomy, Sacred Cities of India* (UK: Cambridge Scholar Publishing, 2009), p. 58
- ৮ বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য।
- ৯ গহনার ব্যবহার ইতিহাস প্রাচীন। গহনা মানুষের সাজসজ্জায় ব্যবহৃত হয়। মানুষের দৈহিক সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে গহনা কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের জন্য পৃথক পৃথক গহনা ব্যবহার করা হয়। কোমরে নারীরা বিছা নামক গহনা সৌন্দর্য বর্ধনে পরিধান করতো। এটি শিকলের ন্যায় যা কোমরের চারদিকে জড়িয়ে ব্যবহার করা হতো।
- ১০ বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য।
- ১১ বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য।
- ১২ বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য।
- ১৩ Khoundkar Alamgir, “Indigenous and Extraneous Elements of Sultanate Architecture of Bengal”, *Journal of Bengal Art*, Vol. 4, 1999, p. 274
- ১৪ বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য; Khoundkar Alamgir, “Bell and Chain Decoration in Sultanate Architecture of Bengal”, *Journal of Bengal Art*, Vol. 17, 2012, p. 11
- ১৫ Ahmed Hasan Dani, *Op.Cit.*, p.48
- ১৬ Ahmed Hasan Dani, *Op.Cit.*, p.69
- ১৭ বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য।
- ১৮ Ahmed Hasan Dani, *Op.Cit.*, p.73
- ১৯ James Wise, “Notes on Sonargaon, Eastern Bengal”, *Journal of the Asiatic Society of Bengal (JASB)*, vol. XLIII, 1874, p. 82
- ২০ বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য।
- ২১ বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য।
- ২২ এ. বি. এম. হোসেন, “মাহিসত্তোষের মুসলিম নিদর্শন”, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৭৮
- ২৩ বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য।

- ২৪ A. K. M. Yaqub Ali, *Aspects of Society and Culture of the Varendra* (Rajshahi, Binodpur Bazar, 1998), p. 310
- ২৫ A. K. M. Yaqub Ali, *Ibid.*, p. 309
- ২৬ বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য; A. Karim, “Two Hi therto Unnoticed Sultani Mosque of Chittagong”, *Journal of the Asiatic Society of Pakistan (JASP)*, vol. III, 1967, p. 323
- ২৭ বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য।
- ২৮ বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য।
- ২৯ A. H. Dani, *op. cit.*, p. 139
- ৩০ A. H. Dani, *op. cit.*, p. 134
- ৩১ বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য।
- ৩২ S. M. Hasan, “A Mihrab from Bengal at the Royal Scottish Museum, Edinburgh”, *Journal of the Pakistan Historical Society*, vol. xv, part. iii, July 1967, pp. 174-179
- ৩৩ বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য।
- ৩৪ বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য।
- ৩৫ এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, “বাংলার মুসলিম স্থাপত্য অলঙ্করণের অনুপুঞ্জ বিশ্লেষণ (তের-ষোল শতক)”, আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক বক্তৃতামালা ১, ঢাকা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ২০১৬, পৃ. ২৯৩
- ৩৬ বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য।
- ৩৭ A. H. Dani, *op. cit.*, p. 164
- ৩৮ A. B. M. Husain (ed.), *Gawr-Lakhnawti: A Survey of Historical Monuments and Sites in Bangladesh* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1997), p. 129
- ৩৯ A. B. M. Husain, “Some observations on the stone and terracotta ornamentation of the sultanate architecture in Bengal”, *Journal of Bengal Art*, vol. 4, 1999, p. 268

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড: সংজ্ঞা, সংখ্যা ও স্বরূপ

শহীদ কাদের চৌধুরী*

Abstract

The killing of the intellectuals is one of the most crucial parts of the Liberation War and Bangladesh Genocide. Pakistan's military government systematically perpetrated the elite and intellectuals of Bengali society, given their role during the Pakistan period. Intellectuals, such as artists, writers, journalists, teachers, poets, and doctors, rigorously expressed their dissidence and protested military autocracy. Their participation in the cultural and political movements paved the way for the development of Bengali nationalism and the birth of Bangladesh, eventually making them the perpetrators' target group. Although we could not make the list of martyred intellectuals for a long time, of late, a struggle against memory has begun. The Ministry of Liberation War Affairs has defined the definition of martyred intellectuals of 1971 and prepared the list. The article critically discusses the definition and number of martyred intellectuals. It also reviews the official gazette of the People's Republic of Bangladesh on Martyr Intellectuals by analyzing the intellectuals' region, occupation and form of killing.

চাবিশব্দ: বুদ্ধিজীবী, মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা, আলবদর

ভূমিকা

পাকিস্তান আমলে এই ভূখণ্ডের জনগণ একের পর এক আন্দোলনে সক্রিয়হতে থাকেন। প্রাক-সাতচল্লিশ পর্বের পাকিস্তান আন্দোলন এবং পাকিস্তান আমলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনই ছিল না, সেটা ছিল এক বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনও। বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্পর্ক ছিল উভয়মুখী। রাজনৈতিক আন্দোলন যেমন বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক জগতকে প্রভাবিত করেছে তেমনি বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতির ঘরণার মানুষজন তৎকালীন রাজনীতির বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক পাটাতন তৈরি করে দেন। পাকিস্তান আমল জুড়ে বুদ্ধিজীবীদের ক্রমাগত সক্রিয়তা আমাদেরকে সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একান্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণ ছিল নানামাত্রিক, প্রতিবাদের ধরন ছিল সৃজনশীল। পাকিস্তান জাতীয়তাবাদ থেকে বের হয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদে প্রবেশ সহজ করে দিয়েছিলেন বুদ্ধিজীবীরাই। তারাই বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য এবং কাঠামোগত সহিংসতার কথা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাদের নানামুখী তৎপরতার ওপর দাঁড়িয়েই রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক দলেরা তাদের রাজনীতি নির্মাণ করেছিলেন।

বুদ্ধিজীবীদের এই সক্রিয়তাকে তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী স্বভাবতই ভালো চোখে দেখেনি। ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ যখন গণহত্যা (Genocide) শুরু হলো তখনও তাদের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর অন্যতম ছিল বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। ২৫ শে মার্চ রাতেই ঢাকা

* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষকসহ বহু বুদ্ধিজীবীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। অপারেশন সার্চলাইট পরবর্তী সময়ে বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই দেশত্যাগ করে গেলেও বহুজন নিজ নিজ কর্মস্থলে থেকে গিয়েছিলেন। জীবন হারাতে হতে পারে এই আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্নভাবে সাহায্য করার জন্য তারা দেশের অভ্যন্তরেই দিন কাটিয়েছিলেন। পাকিস্তানি বাহিনী তাদের দোসরদের সাথে নিয়ে পুরো নয়মাস ব্যাপী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা, হত্যার হুমকিসহ বিভিন্ন রকম শাস্তি প্রদান করেছে। বহু বুদ্ধিজীবীকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, নির্যাতন করে হত্যা করা হয়, অনেককে কর্মস্থলে হুমকি দেয়া, নানা মেয়াদে শাস্তিও প্রদান করা হয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বিজয়ের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে, যখন পরাজয় নিশ্চিত, তখন বুদ্ধিজীবীদের প্রতি তাদের চরম আক্রোশ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে। ১১ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বুদ্ধিজীবীদেরকে নিজ নিজ বাসা বা কর্মস্থল থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং এরপর নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। কারো কারো মৃতদেহ বিভিন্ন বধ্যভূমিতে পাওয়া গেলেও অনেকের দেহের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

বিজয়ের পর থেকে বুদ্ধিজীবীদের পূর্ণাঙ্গ কোনো তালিকা তৈরির প্রয়াস খুব একটা পরিলক্ষিত হয়নি। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে সেটা করা হলেও সেটা সংখ্যা ও বিবরণের দিক থেকে ছিল অপরিপূর্ণ। একেবারে মূলধারার কয়েকজন বুদ্ধিজীবী ব্যতীত প্রান্তিক অঞ্চলের যারা বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন তাদের নাম হারিয়ে যায়। কারো নাম উল্লিখিত হলেও তার কর্মকাণ্ডের বিবরণ পাওয়া যায়নি। অনেকসময় তাদের পুরো ঠিকানাও যোগাড় করা সম্ভব হয়নি। শহিদ বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞার বিস্তৃতি বা সীমাবদ্ধতাও তালিকাতে হেরফের ঘটায়; যেমন কোন পেশাজীবীদেরকে বুদ্ধিজীবী বলা হবে, কোন কাজের সাথে জড়িতদের বুদ্ধিজীবী বলা হবে সেটাও কখনো নির্দিষ্ট ছিল না। ফলে একান্তরের গণহত্যার অন্যতম লক্ষ্যবস্তু বুদ্ধিজীবীরা হলেও, তাদের তালিকা ও তাদের স্বতন্ত্র অবদান বিষয়ক একটা বড়ো শূন্যতা বাংলাদেশের জ্ঞানজগতে বিরাজ করছে। এই গবেষণা চেষ্টা করেছে সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার।

মিলেন কুণ্ডেরা লিখেছেন- the struggle of man against power is the struggle of man against forgetting.^১ আমরা পাঁচ দশকে বিস্মৃত হয়েছি আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আত্মত্যাগের করুণ ইতিহাস। সংগ্রামের গৌরবময় অধ্যায়। দেরিতে হলেও বিস্মৃতির বিরুদ্ধে স্মৃতির একটি সংগ্রাম শুরু হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে একান্তরের শহিদ বুদ্ধিজীবীদের সংজ্ঞা নির্ধারণ, তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।^২ স্বাধীনতার পাঁচ দশক পর রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পেলেন শহিদ বুদ্ধিজীবীরা। এই জ্যোতিস্মান মানুষগুলো ৫০ বছর আগে আমাদের চিন্তা ও কল্পনায় নতুন পথ দেখিয়েছিলেন। জনগণকে শাসকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর মন্ত্রটা বুদ্ধিজীবীরা গাঁথে দিয়েছিল দেশপ্রেমিকদের হৃদয়ে।

গবেষণা পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য

এই গবেষণার সাথে তিনটি প্রশ্ন জড়িত; এক, শহিদ বুদ্ধিজীবী কারা ও দুই, তাদের সংখ্যা কত এবং তিন, হত্যাকাণ্ডের স্বরূপ। প্রবন্ধে মানবিক বিদ্যায় ব্যবহৃত ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেকেন্ডারি সোর্সের জন্য এখন পর্যন্ত প্রকাশিত বই, গবেষণাপত্র ও সঞ্চলন ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সময় আঞ্চলিক ইতিহাসের অংশ হিসাবে বিভিন্ন এলাকায় স্মারক গ্রন্থে নিজ নিজ এলাকার বুদ্ধিজীবীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়। সেগুলোর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া,

বুদ্ধিজীবী কথাটির আক্ষরিক অর্থ দিয়ে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয় যিনি বা যারা বুদ্ধি দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। একভাবে বলা যায় যে কায়িক অথবা মানসিক শ্রমের আপেক্ষিক গুরুত্ব দিয়ে এক একটি নামকরণ করা হয়। কিন্তু সেভাবেও বুদ্ধিজীবী কথার অর্থ ঠিক হয় না। একজন উদ্যোক্তা, সরকারী কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী বুদ্ধি বা মানসিক শ্রম দিয়েই কাজ করেন, কিন্তু তাদের বুদ্ধিজীবী বলা হয় না। বুদ্ধিজীবী বলতে বোঝানো হয় সেইসব মানুষকে যারা বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করেন। লেখক, শিল্পী, গবেষক, শিক্ষক সবাইকে সাধারণকে এই কথিত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়। কিন্তু এরকম পেশায় থাকলেই কেউ বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার সঙ্গে যুক্ত হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আবার এইসব পেশায় যুক্ত না হয়েও কেউ সৃজনশীল বা মননশীল কাজে যুক্ত থাকতে পারেন। তাই বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা, মত গঠন, মতাদর্শ গঠন বা ভাঙন, শিল্পচর্চা এসব কাজ যে সবসময় জীবিকা তা নয়।

গ্রামসির মতে আজকের দিনে জ্ঞানচর্চার কাজে জড়িত যে কোনো ব্যক্তিমাত্রই বুদ্ধিজীবী। তিনি বুদ্ধিজীবীকে দুইভাবে ভাগ করেন: প্রথমত, ঐতিহ্যগত বুদ্ধিজীবী এবং জৈবিক বুদ্ধিজীবী।^৪

ঐতিহ্যগত বুদ্ধিজীবী শ্রেণিতে রয়েছে শিক্ষক, ধর্মপ্রচারক এবং প্রশাসক; তারা বংশপরম্পরায় একই ধরনের কাজ করে যান। জৈবিক বুদ্ধিজীবীরা স্বার্থ হাসিল, অধিক শক্তি অর্জন ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কাজে লাগানো হয়। তারা পুঁজিবাদী উদ্যোক্তা, শিল্প প্রযুক্তিবিদ, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ, নতুন সংস্কৃতি ও নতুন বৈধ ব্যবস্থা ইত্যাদির সংগঠক তৈরি করে। তারা সক্রিয়ভাবে সমাজের সঙ্গে যুক্ত, তারা অবিরামভাবে মানুষের মনের পরিবর্তন ও বাজার বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

পেশাজীবী এবং বুদ্ধিজীবীর মধ্যে একটি সুস্পষ্ট সীমারেখা রয়েছে। রাজা স্বদেশে পূজিত হন, বিদ্বান সর্বত্র-চানক্যের উদ্ধৃতি দিয়েই বিনয় ঘোষের বাংলার বিদ্বৎসমাজ গ্রন্থের সূচনা।^৫ যেখানে বিনয় ঘোষ বলার চেষ্টা করেছেন বিদ্বান হলেই বুদ্ধিজীবী হওয়া যায় না। বুদ্ধিজীবীতার প্রধান শর্তই হলো সামাজিক দায়ভারে সক্রিয় থাকা।

চিন্তাশীল নিজেকে নিজের মধ্যে রেখে দিতে পারেন, কিন্তু বুদ্ধিজীবী নিজেকে ছড়িয়ে দেন সমাজের বৃত্তে। মানুষ একজনকে চিহ্নিত করে, তার আচার-আচরণ, ভাবনা-চিন্তা, তার শিক্ষিত অভিযুক্ত, পরিশীলিত অভিজ্ঞান ইত্যাদি সবকিছুর ভিত্তিতে একজন 'বুদ্ধিজীবী' বলে। একটা প্রত্যাশা, ক্ষীণ হলেও থাকে তাদের মধ্যে যে ইনি সমাজের যে কোনও সংকটে সদর্থক ভূমিকা নেবেন। এই প্রত্যাশা একজন বুদ্ধিজীবীর কাছে দাবি করে 'অ্যাকশন' বা কর্ম। সামাজিক ঘটনাবলিতে কোনও শিক্ষিত ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া কী তার ওপর নির্ভর করে 'বুদ্ধিজীবীত্ব'-র মাত্রা। তিনি 'বুদ্ধিজীবী' কি না, এই উপাধি। কোনও কোনও অধ্যাপক যেমন বুদ্ধিজীবী হয়ে ওঠেন, তেমনই অসংখ্য অধ্যাপক শুধু শিক্ষকই থেকে যান। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিছকই শিক্ষক, হাতে গোনা কয়েকজন শুধুমাত্র 'চিন্তাশীল'। একই কথা কার্যকর হয় কোনও বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, বা ইঞ্জিনিয়ার বা শিল্পীর ক্ষেত্রে। ল্যাভয়শিয়র অতি বিশিষ্ট এক বিজ্ঞানী, কিন্তু লুই পাস্তুর বা ইভ কুরী 'বুদ্ধিজীবী চিকিৎসক' বা 'বুদ্ধিজীবী বিজ্ঞানী'।^৬

'বুদ্ধিজীবীযানা'-র বড় শর্ত সমাজ-সচেতনতা, বড় কাজ সমাজ সতর্কতা, এবং বুদ্ধিজীবীর কাছে তা দাবি করে যে কোনও পরিস্থিতিতে এবং সর্বদাই ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানো। অর্থাৎ অন্যায়কে প্রতিরোধ করা, এটাই তার রাজনৈতিক প্রতীতি। এবং এই কাজে তার একমাত্র সহায়ক হতে পারে তার প্রখরতর যুক্তিবোধ এবং প্রজ্ঞা। এই সূত্রে বলা হচ্ছে, একজন বুদ্ধিজীবী তিনিই, যিনি-^৭

১. is erudite, and develops abstract ideas and theories,
২. a professional who produces cultural capital, as in philosophy, literary criticism, sociology, philosophy, medicine science,
৩. an artist who writes, composes, paints etc.

নোয়াম চোমস্কি, এমন একটি মানুষের কাজের পরিধিকে চিহ্নিত করেন এইভাবে : The intellectuals are specialists in defamation, they are basically political

এডওয়ার্ড সাঈদও তার সিদ্ধান্তের গোড়া শক্ত করার জন্য নোয়াম চোমস্কি, আন্তোনিও গ্রামশি, মিশেল ফুকো, পিটার নোভিক, রাসেল জ্যাকোবাই, জাঁ পল সার্ত্র, জাঁ জেনে প্রমুখ পণ্ডিতের সাহায্য গ্রহণ করেন। সাঈদ বলছেন, বুদ্ধিজীবীর প্রকাশ ঘটে সরাসরি কাজের মধ্য দিয়ে।^{১৯৯৩} সালে সাঈদ রিথ বক্তৃতা প্রদান করেন; যেটার শিরোনাম ছিল, 'যিড় থৎব রহঃবষষবপঃধষৎ'. সাঈদ প্রথমেই বলেন, একজন বুদ্ধিজীবী সেই মানুষ সমাজে যার বিশেষ ভূমিকা আছে। তিনি কোন নামগোত্রহীন পেশাজীবী নন, যিনি সমাজের একজন সদস্য হিসেবে প্রতিদিন তার বাঁধাধরা কাজে যান আর আসেন।^{১০}

আর প্রশাসক/আমলা? তারা তো অন্য জগতের মানুষ। তারা তো জনগণের ছোঁয়া বাঁচিয়ে সংরক্ষিত এলাকায় বসবাস করেন। নিপীড়িত রাষ্ট্রযন্ত্রের তারা এক শক্ত খুঁটি। কাজেই সাদ্দদের সংজ্ঞানুযায়ী তারাও ‘বুদ্ধিজীবীভুক্ত’ হতে পারেন না। বিনয় ঘোষের সঙ্গেও গ্রামশির পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বিনয় ঘোষ মনে করেন, মহাবিদ্বান হয়েও কেউ যদি অগাধ জ্ঞানসমুদ্রে তলিয়ে থাকেন, তারা বুদ্ধিজীবী নন। গ্রামশির ‘ঐতিহ্যবাহী’ বুদ্ধিজীবীরা তো এ দলেরই।

অন্যদিকে সাজিদ মিশেল ফুকোর কথা উল্লেখ করে বলেন যে, ‘বুদ্ধিজীবীরা একটা শৃঙ্খলার মধ্যে কাজ করলেও তারা তাঁদের অভিজ্ঞতা যে কোনও দিকে পরিচালিত করতে পারেন।’ ফুকো বলেন, ‘বুদ্ধিজীবী ছাড়া আধুনিক ইতিহাসে কোনও বিপ্লব সংগঠিত হয়নি, তেমনই বুদ্ধিজীবী ছাড়া পৃথিবীতে প্রধান কোনও প্রতিবিপ্লবও সংঘটিত হয়নি।’ তাই ফুকো বুদ্ধিজীবীদের যে কোনও আন্দোলনের ‘মা-বাবা, অবশ্যই পুত্র-কন্যা, এমনকি ভাইপো- বোনপো বলে উল্লেখ করেন।’^{১০}

উনিশ শতকের প্রথমভাগে বাঙালি বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিকাশ শুরু হয়েছিল হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজকে কেন্দ্র করে। বিনয় ঘোষ এর মতে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা তখন প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত ছিলেন। প্রথম ভাগের নাম দেন তিনি এংৎথফরঃঃঃঃঃ বা ঐতিহ্যপন্থী, দ্বিতীয় ভাগের নাম অহমম্বরপরঃঃঃঃঃ বা পাশ্চাত্যপন্থী। তিনি দুটি গোষ্ঠীকেই চরমপন্থী বলে উল্লেখ করেছে। ঐতিহ্যবাদীরা

প্রাচীন দেশীয় ঐতিহ্যকে অনেকটা অন্ধের মত আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে, আর পাশ্চাত্যবাদীরা ইউরোপীয় জ্ঞানচর্চায় প্রলুব্ধ হয়ে দেশীয় ঐতিহ্যকে বাতিল করে দিতে চেয়েছেন।^{১৪}

আধুনিক রাষ্ট্রের গঠন প্রক্রিয়াতে বুদ্ধিজীবীরা নানাভাবে নির্ধারণকারী ভূমিকা পালন করে থাকেন। বাংলা অঞ্চলে, আধুনিক অর্থে বুদ্ধিজীবীদের সমাজের উদ্ভব ঘটে ব্রিটিশ উপনিবেশ আমলে। উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়াতে তারা যেমন ভূমিকা পালন করেছিলেন, তেমনি বিশ শতকের শুরুতে যখন উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন দানা বাধতে শুরু করে তখনও বুদ্ধিজীবী সমাজ নানাভাবে তাদের সক্রিয়তা প্রদান করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে পার্টিশনের মাধ্যমে ব্রিটিশ উপনিবেশের সমাপ্তি এবং ভারত ও পাকিস্তান দুটো রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। পাকিস্তান আন্দোলন থেকেই তৎকালীন পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবীদের জনপরিসরে লিগুতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে সবার লিগুতা এক ধরনের ছিল না।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ কালের মধ্যে জমিদারি প্রথার অবসান, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ এবং নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম হওয়ার কারণে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উল্লেখজনক পরিবর্তন ঘটে। জনগণের মন-মানসিকতায় পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। পাকিস্তান রাষ্ট্র যেমন একদিক থেকে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দমন-পীড়ন চালাতে থাকে, তেমনি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সে নিপীড়নের বিরুদ্ধে ক্রমাগত নিজেদের অবস্থান দৃঢ়ভাবে জানাতে থাকে। ক্রমাগত বিদ্রোহ-সংগ্রাম-আন্দোলন এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে রাজনৈতিক চেতনার স্ফূরণ ঘটায় তার প্রভাব স্পষ্ট হতে থাকে ধীরে ধীরে। এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠী বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের গণ্ডি থেকে বের হয়ে ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদে’ প্রবেশ করে। যেমন, বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের দ্বারা এই জাতীয়তাবোধের যে উন্মেষ ঘটেছিল, পরবর্তীতে সেটার অগ্রগতিতে মূল অবদান ছিল তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদেরই। উর্দু-ফারসি-আরবি শব্দ মিলিয়ে বাংলা ভাষাকে মুসলমানি চেহারা দেওয়ার চেষ্টা এবং আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রচলনের চেষ্টার বিরুদ্ধেও বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন সরব। এমনকি পাকিস্তান জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী অনেক কবিও ব্যঙ্গাত্মক কবিতার মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদক্ষেপের সমালোচনা করেছিলেন। আইয়ুব খানের সামরিক শাসন আমলে প্রথমে আঘাত আসে সংবাদপত্রের ওপর, শাসকচক্রের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে সাংবাদিকরা দমন-নিপীড়নের শিকার হয়েছেন, তবু ইত্তেফাক কিংবা সংবাদ ক্ষমতাসীনদের কাছে খুব একটা নতি স্বীকার করেনি।

তৎকালীন সামরিক শাসকচক্র বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির ওপর সর্বাধিক নোংরা আক্রমণ চালায়; পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান - এই দুই অঞ্চলের সংহতি বৃদ্ধির অজুহাতে রোমান হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্যের ওপর আসে সাম্প্রদায়িক আক্রমণ। তাঁকে চিহ্নিত করা হয় হিন্দু কবি এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে। এই ‘হিন্দুয়ানি’র অভিযোগ তুলে নজরুলের কবিতা থেকেও ‘হিন্দুয়ানি’ শব্দ বাদ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ছাত্রীদের কপালে টিপ দেওয়ার ওপর বিধিনিষেধ জারি করা হয়। কেউ টিপ দিয়ে গেলে তাকে কর্তৃপক্ষের হাতে হেনস্থা হতে হত। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীতে সামরিক সরকার আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করে যে, রবীন্দ্রনাথ আসলে পাকিস্তান আদর্শবিরোধী। প্রতিবাদস্বরূপ এগিয়ে আসেন বুদ্ধিজীবীরা। বিভিন্ন জায়গায় রবীন্দ্রজয়ন্তী কমিটি গঠন করে অনুষ্ঠান আয়োজন করা শুরু হয়। মেয়েরা কপালে টিপ দেওয়া শুরু করেন। রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সনজিদা

খাতুন, ওয়াহিদুল হকের উদ্যোগে গঠিত হয় 'ছায়ানট'। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বুদ্ধিজীবী মহলের এমন সাহসী প্রতিবাদ 'ধর্মনিরপেক্ষ পূর্ব বাংলার স্বাতন্ত্র্য চেতনা'র বিকাশে সাহায্য করেছিল তুমুলভাবে। ১৯৬৭ সালে মুসলিম লীগের খান এ সবুর পয়লা বৈশাখ ও রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপনকে বিদেশি সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বলে মন্তব্য করেন। তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনও এরকম মন্তব্য করেন এবং বলেন যে, পাকিস্তানি আদর্শের সঙ্গে না মিললে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হবে। তাদের পক্ষে তখন সক্রিয় হয়ে ওঠেন পাকিস্তানপন্থী বুদ্ধিজীবীরা। দৈনিক *আজাদ* তখন লিখেছিল, 'রবীন্দ্রনাথ বহু সঙ্গীতে মুসলিম তমুদ্দনকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া হিন্দু সংস্কৃতি জয়গান গাহিয়াছেন'।^{১৫} সেই সঙ্গে সরকারি সিদ্ধান্তের প্রশংসাও করেছিল। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে ১৮ জন বুদ্ধিজীবী তখন একসঙ্গে বিবৃতি দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীতে সামরিক সরকার আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করে যে, রবীন্দ্রনাথ আসলে পাকিস্তান আদর্শবিরোধী রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীতে সামরিক সরকার আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করে যে, রবীন্দ্রনাথ আসলে পাকিস্তান আদর্শবিরোধী ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জনাব হামদুর রহমান আরবি হরফে বাংলা ও উর্দু লেখার সুপারিশ করলে সেটারও প্রতিবাদ জানান বুদ্ধিজীবীরা। এই ঘটনাগুলোর প্রেক্ষিতে গবেষক মুনতাসীর মামুন বলেন, 'রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ঘটনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও এ সময় এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা পূর্ব বঙ্গবাসীর বাঙালিবোধকে তীব্র ও সংহত করে তোলে এবং এ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন সাংস্কৃতিক কর্মী এবং বুদ্ধিজীবীরা'।^{১৬} অনেকটা একই রকম মন্তব্য করেন গবেষক ও তাত্ত্বিক বদরুদ্দীন উমরও। তিনি বলেন, 'পাকিস্তান আমলে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের গোঁড়া পর্যন্ত এদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সুবিধাবাদী লোক থাকলেও তাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যেশোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অভাব ছিল না। সেটা না হলে সেই পর্যায়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন অগ্রসর হত না এবং স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বাঁধত না।' ^{১৭}

পাকিস্তান আমলে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মূলত তিনটা ধারার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। এক, পাকিস্তানবাদী ধারা, দুই, জাতীয়তাবাদী ধারা, এবং তিন, বামপন্থী ধারা। পাকিস্তানকালের সূচনাতে পাকিস্তানবাদী ধারাটা প্রবল ছিল, কিন্তু সময় যত গড়াতে থাকে এই ধারাটা জনগণ থেকে ততটা বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। এই ধারার বুদ্ধিজীবীরা আসলে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর পতাকাই বহন করে যাচ্ছিলেন। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী ধারার আন্দোলন এবং বামপন্থী আন্দোলন - দুটোই মূলত পাকিস্তানি শাসক চক্রের বিরুদ্ধেই যাচ্ছিল। তাই এর সাথে সক্রিয় সদস্যদের প্রতি শাসকদের তীব্র ক্ষোভ জমা হওয়াটা ছিল স্বাভাবিক। শাসকচক্র ঠিকই বুঝতে পেরেছিল যে, বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশে এই ঘটনাগুলো মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। বুদ্ধিজীবী কিংবা সে সময়কার সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর দিকে ইঙ্গিত দিয়ে পাকিস্তানি একজন জেনারেল লিখেছিলেন, 'যাটের দশকে এই সংগঠনগুলো পূর্ববাংলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষকে পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুলে।'

বাংলাদেশ পৃথিবীর একমাত্র দেশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে জাতীয় দিবস পালন করে। কিন্তু স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরেও বাংলাদেশে নির্ধারণ করা যায়নি একান্তরে কারা শহিদ বুদ্ধিজীবী ছিলেন। ছিল না রাষ্ট্রীয় কোন তালিকা। একান্তরে পাকিস্তানিরা যাদেরকে হত্যা করেছিলেন তারা নিজেদের কখনো বুদ্ধিজীবী দাবি করেননি। কিন্তু সত্যিকার বুদ্ধিজীবীর মতো আমাদের চিন্তা ও কল্পনা করেছেন। দেখিয়েছেন নতুন পথ, সংস্কৃতির সংগ্রামে, সংস্কৃতি কেন্দ্রিক রাজনীতিতে সক্রিয় থেকে শাসকের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন, মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

১৯৮৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর রশীদ হায়দারের সম্পাদনায় বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত শহিদ বুদ্ধিজীবী কোষগ্রন্থে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের একটি সংজ্ঞা বা মাপকাঠি বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক মনজুরে মওলা উল্লেখ করেছিলেন।^{১৮}

১. ‘শহিদ’ অর্থ ২৫-৩-১৯৭১ থেকে ৩১-০১-১৯৭২ এই সময়কালে যারা দখলদার পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কিম্বা তাদের সহযোগীদের হাতে নিহত কিম্বা ওই সময়ে নিখোঁজ হন এবং
২. বুদ্ধিজীবী অর্থ লেখক, বিজ্ঞানী, চিত্রশিল্পী, কণ্ঠশিল্পী, সকল পর্যায়ের শিক্ষক, গবেষক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, স্থপতি, ভাস্কর, সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী, চলচ্চিত্র ও নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সমাজসেবী ও সংস্কৃতিসেবী।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়াতে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের যে তালিকা প্রদান করা হয়েছে সেখানে বুদ্ধিজীবী হিসাবে যাদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে তাঁরা হলেন: শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানি, প্রকৌশলী আইনজীবী, শিল্পী, দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদগণ।^{১৯} এশিয়াটিক মুক্তিযুদ্ধের জ্ঞানকোষ প্রকাশ করেছেন সেখানে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড বা দিবস নিয়ে কোন ভুক্তি রাখা হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে ‘১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা’ শিরোনামে এমফিল গবেষণা করেছেন অধ্যাপক ড. খোদেজা খাতুন। তিনি তাঁর গবেষণার শুরুতে বুদ্ধিজীবী কারা তা সংজ্ঞায়িত করেছেন। ‘সাধারণ অর্থে বুদ্ধিজীবী বলতে অধ্যাপক, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক স্নাতকেত্তর পর্যায়ের ছাত্র সমাজকে বোঝানো হয়।’^{২০}

শহিদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা প্রণয়নের জন্য গঠিত জাতীয় কমিটি একটি নতুন সংজ্ঞা তৈরি করেছেন। নতুন সংজ্ঞা অনুযায়ী ‘যে সকল সাহিত্যিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, চিত্রশিল্পী, শিক্ষক, গবেষক, সাংবাদিক, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, স্থপতি, ভাস্কর, সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী, রাজনৈতিক, সমাজসেবী, সংস্কৃতিসেবী, চলচ্চিত্র, নাটক ও সংগীতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এবং পাকিস্তানী বাহিনী, কিংবা তাদের সহযোগীদের হাতে শহিদ কিংবা চিরতরে নিখোঁজ হয়েছেন, তাঁরা শহিদ বুদ্ধিজীবী’। সারা দেশের জন্য সময়কাল ২৫ মার্চ ১৯৭১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। তবে ঢাকা জেলার ক্ষেত্রে ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখ।^{২১}

সরকারিভাবে গেজেট করে দেওয়া এই সংজ্ঞার আলোকে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রেও বেশ কিছু জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারীরা মূলত পেশাজীবী, তাদের বুদ্ধিজীবী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ডাক্তারদের মধ্যে এমবিবিএস ছাড়া হোমিও, এলএমএফ কিংবা রেজিস্টার্ড ডাক্তাররা এই সংজ্ঞায় বুদ্ধিজীবী কিনা সেটা স্পষ্ট নয়। ‘বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন’ এই অবদান কিভাবে বিবেচনা করা হবে সেটাও স্পষ্ট নয়।

বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা

একাগুরে ঠিক কতজন বুদ্ধিজীবীদের পরিকল্পিত হত্যা করা হয়েছে তা সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পর গত পাঁচ দশক শহিদ বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা নিয়ে বেশ কিছু ভ্রান্ত তথ্য উপাত্ত

বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশিত হয়েছে। যেসব তথ্য উপাত্তের কোনো ভিত্তি নাই। সব শহিদ বুদ্ধিজীবীদের পরিচয় দূরের কথা তাঁদের প্রকৃত সংখ্যাই অদ্যাবদি নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। এই ঘাটতি স্বীকারের পরও জাতীয় জ্ঞানকোষ ‘বাংলাপিডিয়া’ কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্র উল্লেখ না করে শহিদ বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা ১১১১ বলে তথ্য দেন।^{২২} তথ্যসূত্র থেকে শহিদদের মোটামুটি একটা সংখ্যা দাঁড় করানো যায়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ৯৯১ জন শিক্ষাবিদ, ১৩ জন সাংবাদিক, ৪৯ জন চিকিৎসক, ৪২ জন আইনজীবী, ৯ জন সাহিত্যিক ও শিল্পী, ৫ জন প্রকৌশলী এবং অন্যান্য ২ জন।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জ্ঞানকোষ’ প্রকাশ করেছে। অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদদের সম্পাদনায় প্রকাশিত এই গ্রন্থে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড সংখ্যা ও সংজ্ঞার বিষয়ে কোন আলাপ করা হয়নি।^{২৩}

বাংলাদেশের প্রথম বিজয় দিবস উপলক্ষে সৈয়দ আলী আহসানের সম্পাদনায় ‘বাংলাদেশ’ শীর্ষক একটি স্মরণিকা বের করা হয়। স্মরণিকায় নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী ‘বঙ্গালী বুদ্ধিবৃত্তি ও বুদ্ধিজীবী দলন’ শীর্ষক প্রবন্ধে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের একটি তালিকা প্রকাশ করেন। তিনি প্রবন্ধে লিখেন, ‘এ ব্যাপারে বিভিন্ন শ্রেণীর শহিদ বুদ্ধিজীবীদের চূড়ান্ত সংখ্যা এখনও পাওয়া যায় নি। বিভিন্ন সূত্র থেকে এ যাবৎ মোটামুটি যে সংখ্যা পাওয়া গেছে নিম্নে পৃথকভাবে তার তালিকা প্রদত্ত হল।’^{২৪}

তালিকায় ৯৬৮ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ২৭০ জন মাধ্যমিক শিক্ষক, ৫৯ জন কলেজ শিক্ষক ও ৪১ জন আইনজীবীসহ ১০০৯ জনের জেলাওয়ারি তালিকা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু নাম ছিল না। তালিকায় এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ জন ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ জন সর্বমোট ২২ জন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের নামের তালিকা সংযোজন করেন। এরপর ৮ জন গণপরিষদ সদস্য, ১৩ জন সাংবাদিক, ৫০ জন চিকিৎসক ও ১৬ জন অন্যান্য শহিদ বুদ্ধিজীবীর নামসহ তালিকা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ ১৯৭২ সালে সরকারিভাবে প্রকাশিত এই স্মরণিকায় প্রবন্ধকার মোট ১১১৮ জন শহিদ বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে ১০৯ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষক ৯৬৮ জন ও আইনজীবী ৪১ জনের নাম তালিকায় ছিল না, শুধু সংখ্যা ছিল। এটাই শহিদ বুদ্ধিজীবীর সরকারি তালিকা হিসেবে কোন এক অজানা কারনে এতদিন বিবেচিত হয়ে আসছিল। তাই সবখানেই শহিদ বুদ্ধিজীবী মানে ১১১৮ সংখ্যাটিকে এতদিন প্রচার করা হয়েছিল।

আলী মো. আবু নাইম ও ফাহিমা কানিজ লাবার সম্পাদনায় শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে ২০১৯ সালে আগামী প্রকাশনী থেকে ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী কোষ’ প্রকাশ করা হয়।^{২৫} ভূমিকায় সম্পাদকরা লিখেন, ‘১৯৭২ সালে সদ্য স্বাধীন দেশের তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে ‘বাংলাদেশ’ নামে বাংলাদেশের পরিচিতিমূলক একটি বই প্রকাশ করা হয়। সেখানে বুদ্ধিজীবী হিসাবে ১০৭০ জনের নাম প্রকাশ করা হয়েছিল। এই ১০৭০ জনের মধ্যে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ জন শিক্ষক, কলেজ শিক্ষক ৫৯ জন, মাধ্যমিক শিক্ষক ২৭০ জন, প্রাথমিক শিক্ষক ৬৩৯ জন, সাংবাদিক ১৩ জন, ডাক্তার ৫০ জন এবং অন্যান্য ১৭ জন। ৪১ জন আইনজীবীর তথ্য এখানে এড়িয়ে যাওয়া হয়। ফলে শহিদ বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা নিয়ে একটি বড় বিভ্রান্তির জায়গা তৈরি হয়।

ডিসেম্বরের ২০২০ এর শেষের দিকে সুপা সাদিয়া ‘মুক্তিযুদ্ধে শত শহিদ বুদ্ধিজীবী’ নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে।^{১৬} এটিতেও আগামী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত শহিদ বুদ্ধিজীবী কোষের একই ভুল তথ্য প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ ১০৭০ জনের কথা উল্লেখ করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে ‘১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা’ শিরোনামে এমফিল গবেষণা করেছেন অধ্যাপক ড. খোদেদজা খাতুন। গবেষণাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছে সুবর্ণ। গ্রন্থের ২০২-২০৬ নং পাতায় মুক্তিযুদ্ধে পরিশিষ্ট-২ এ বাংলাদেশের প্রথম বিজয় দিবস উপলক্ষে সৈয়দ আলী আহসানের সম্পাদনায় ‘বাংলাদেশ’ শীর্ষক স্মরণিকার পৃষ্ঠা নং সহ তথ্যসূত্র উল্লেখ করে ৬১ জন আইনজীবী ও ২৩ জন স্কুল কলেজ শিক্ষকের একটি ভুল তালিকা প্রকাশ করেছেন।^{১৭} বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র ৮ম খণ্ডে পরিশিষ্ট-২ হিসেবে ৫৭৫-৫৭৮ পৃষ্ঠায় শহিদ বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের নামের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।^{১৮} তালিকার তথ্যসূত্র হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। স্মরণিকায় প্রকাশিত ৯৬৮ জন শিক্ষক ও ৪১ আইনজীবীর জেলাওয়ারি তালিকাটিও দলিলপত্রে সংযুক্ত করা হয়েছে। যদিও ছাপার ভুলের কারণে তালিকায় প্রদত্ত যোগফল মিলে না। এখানে ১০৯ জনের নাম পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ১৯৯১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ৯ পর্যায়ে ১৫২ জন শহিদ বুদ্ধিজীবীর নামে দুই টাকা মূল্যমানের স্মারক ডাক টিকেট প্রকাশ করেন।^{১৯} এখানে শহিদ বুদ্ধিজীবীর নাম, পিতামাতার নাম, জন্মস্থান, পেশা, জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। রেলওয়ের হিসাব সহকারি থেকে শুরু করে সরকারি অফিসের পিয়ন, পুলিশের সুবেদার, সৈনিক যে যেভাবে পরেছে আত্মীয়-স্বজনের নামে বুদ্ধিজীবী হিসেবে ডাক টিকেট প্রকাশ করে নিয়েছে।

১৯৮৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর রশীদ হায়দারের সম্পাদনায় বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয় ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী কোষগ্রন্থ’।^{২০} এখানে ১৭৫ জন শহিদ বুদ্ধিজীবীর তালিকা ও পরিচয় পাওয়া যায়। এই কোষগ্রন্থে বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞা তুলে ধরা হয়। তাদের সম্পর্কে জানতে পত্রিকায় তথ্য চেয়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। মোট ১৭৫ জন বুদ্ধিজীবীর তথ্য এতে প্রকাশ করা হয়।

এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় মুদ্রণের ভূমিকায় একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক আবু হেনা মোস্তফা কামাল লিখেন, ‘প্রায় সমস্ত প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জেলা প্রশাসন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, বার অ্যাসোসিয়েশন, মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, প্রেস ক্লাব ইত্যাদি জায়গায় যোগাযোগ করে ‘শহিদ বুদ্ধিজীবী কোষগ্রন্থ’র জন্য তিন শতাধিক নাম পেলেও আমাদের নীতিমালা অনুসারে অন্যান্য দুইশত নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।’^{২১}

দ্বিতীয় মুদ্রণে ৩২ জন নতুন শহিদ বুদ্ধিজীবীর তথ্য প্রকাশ করা হয়। সবমিলিয়ে শহিদ বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২০৭ জনে। তবে এখানে ডুপ্লিকেশন আছে। গভীরভাবে তালিকাটি পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। যেমন এস. এম ফজলুল হক সম্পর্কে প্রথম মুদ্রণে তথ্য আছে দ্বিতীয় মুদ্রণে নতুন করে সংযুক্ত ৩২ জনের তালিকায়ও তাঁর নামে আছে। ফলে ২০৭ সংখ্যাটি যথার্থ নাও হতে পারে।

১৯৮৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয় শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মারকগ্রন্থ।^{২২} এখানে ৩৮ জন শহিদ বুদ্ধিজীবীর তালিকা ও পরিচয় পাওয়া যায়। যাদের সবার নাম ও তথ্য ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত শহিদ বুদ্ধিজীবী কোষগ্রন্থে রয়েছে। রশীদ হায়দারের সম্পাদনায় বাংলা

একাডেমি থেকে ১০ খণ্ডে 'স্মৃতি : ১৯৭১' প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে ২৩৮ জন শহিদ বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। এম, এ রহীমের সম্পাদনায় বের হয়েছে হিস্ট্রি অব দি ইউভার্সিটি অব ঢাকা গ্রন্থটি। যেখানে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ জন শিক্ষক, ৩ জন অতিথি শিক্ষক ও একজন চিকিৎসকের তালিকা পাওয়া যায়। যেটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র ৮ম খণ্ডে পরিশিষ্ট-১ হিসেবে সংযুক্ত আছে।

শহিদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা প্রণয়নের জন্য গঠিত জাতীয় কমিটি ২৭ মে ২০২১ সালে ১৯১ জন শহিদ বুদ্ধিজীবীর প্রথম গেজেট প্রকাশ করেন। ২য় পর্যায়ে ২৩ মে ২০২২ সালে ১৪৩ জন শহিদ বুদ্ধিজীবীর নাম গেজেট আকারে প্রকাশ করে। কাজটি চলমান রয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত সরকারিভাবে স্বীকৃত শহিদ বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা ৩৩৪ জন।^{৩৩}

শহিদ বুদ্ধিজীবীর প্রকৃত সংখ্যা কত এটা নিয়ে এখন পর্যন্ত কোন গবেষণা হয়নি। তবে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় শহিদ বুদ্ধিজীবীর যে সংখ্যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেটাকে মানদণ্ড ধরলে শহিদ বুদ্ধিজীবীর প্রকৃত সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়ে যাবে। প্রকৃত অর্থে সংজ্ঞাটিকে আরো সুনির্দিষ্ট করলে একাত্তরে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের চিহ্নিত করার কাজটি আরো সহজ হত।

এছাড়াও বিভিন্ন পেশাজীবীদের নিয়ে আলাদা তালিকা প্রকাশ হয়েছে। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহিদ সাংবাদিক' শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে। যেখানে ১৩ জন শহিদ সাংবাদিকের বিস্তারিত তথ্য উঠে আসে।^{৩৪} বায়জীদ খুরশীদ রিয়াজ মুক্তিযুদ্ধের শহিদ চিকিৎসক জীবনকোষে ৬৮ জন চিকিৎসকের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।^{৩৫} বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশন তাদের ভবনে নির্মিত স্মৃতিফলকে প্রায় ৭০ জন চিকিৎসকের নাম উৎকীর্ণ করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শহিদ ৪ শিক্ষককে নিয়ে প্রকাশ করেছে আলাদা গ্রন্থ।^{৩৬} ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ জন শিক্ষক ও একজন আবাসিক চিকিৎসকে বিস্তারিত তথ্য নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।^{৩৭}

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের স্বরূপ

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বুদ্ধিজীবীরা নেমে এসে দাঁড়িয়েছিল কৃষক, শ্রমিকসহ সাধারণ জনতার পাশে। শিক্ষা ও বৌদ্ধিক চর্চার জায়গা থেকে বেরিয়ে তারা সামাজিক দায়বদ্ধতায় সক্রিয় হলেন।^{৩৮} যেটি ইতিহাসে বিরল ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্প্রতি শহিদ বুদ্ধিজীবীদের দুটি গেজেট প্রকাশ করেছেন। ২টি গেজেটে প্রাপ্ত ৩৩৪ জন শহিদ বুদ্ধিজীবীর তালিকা ও বিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই বুদ্ধিজীবীরা পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে প্রাণ হারিয়েছেন;^{৩৯} সবচেয়ে বেশি হারিয়েছেন ঢাকা জেলার বুদ্ধিজীবীরা। মোট শহিদ বুদ্ধিজীবীর ৫.১৫ শতাংশ এই জেলার। এরপরের অবস্থান চট্টগ্রাম জেলার ৪.৮৪ শতাংশ। এরপরেই রয়েছে রাজশাহী, রংপুর, খুলনা সহ অন্যান্য জেলার। সারণি ও ছবিতে বিভাগভিত্তিক বিভাজন তুলে ধরা হয়েছে। (সারণী -১, ও ছবি -১)। এতে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের বিস্তৃতি ধরা পড়ে। বাংলাদেশের প্রভাবশালী ও প্রচলিত সাহিত্যে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে কেবল কেন্দ্রের এবং পরিচিত মুখদের উপস্থিতি দেখা যায়। সে সময়ে যারা প্রতাপশালী ছিলেন তাদের কথাই বারবারে উঠে এসেছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় শহিদ বুদ্ধিজীবীদের যে গেজেটকৃত তালিকাগুলো

প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যায় কেন্দ্রের মধ্যে যেমন বুদ্ধিজীবীরা আক্রান্ত হচ্ছেন, তেমনি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বুদ্ধিজীবীরা আক্রান্ত হয়েছেন।

গেজেটকৃত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পঞ্চগড়, পটুয়াখালী, বরগুনা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী কোন বুদ্ধিজীবী পাওয়া যায়নি। বিভাগ হিসেবে সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়েছে ঢাকা বিভাগে। সেটি মোট সংখ্যার ২০ শতাংশ, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৮.৭৯ শতাংশ, রাজশাহীতে ১৩.৩৩ শতাংশ, খুলনা ১১.২১ শতাংশ, রংপুর ৯.৭ শতাংশ, সিলেট ৫.১৫ শতাংশ, বরিশাল ৩.৯৪ শতাংশ, ময়মনসিংহে ৪.৮৫ শতাংশ।

একাত্তরের শহিদ বুদ্ধিজীবীদের ৯.১৪ শতাংশের জন্মস্থান চিহ্নিত করা যায়নি। এছাড়া ৩.৮৯ শতাংশ শহিদ বুদ্ধিজীবীর আদি নিবাস বাংলাদেশে ছিল না। দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ ও ত্রিপুরাসহ নানাজায়গা থেকে তারা বাংলাদেশে স্থায়ী হয়েছেন।

শহিদ বুদ্ধিজীবীদের অনেককেই ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বড় শহরগুলোতে হত্যা করা হয়েছে। অনেককে হত্যা করা হয়েছে নিজের এলাকায়। হত্যার স্থানের দিকে নজর দিলে দেখা যায় ২৭.৮৭ শতাংশ বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়েছে ঢাকা জেলায়। যাদের অধিকাংশই মূলত ঢাকা শহরে বাস করতেন।

নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী কোন ধরনের তথ্যসূত্র উল্লেখ না করে ৯৬৮ জন শিক্ষাবিদ (বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া) ও আইনজীবীর জেলাওয়ারী তালিকা প্রকাশ করেছেন।^{৪০}

শহীদ শিক্ষাবিদ (বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া) ও আইন- জীবীদের জেলাওয়ারী তালিকা				
জেলা ও বিভাগ	শিক্ষাবিদ	আইনজীবী		
	প্রাথমিক	মাধ্যমিক	কলেজ	
ঢাকা	৩৭	৮	১০	৬
ফরিদপুর	২৭	১২	৪	২
টাঙ্গাইল	২০	৭	২	—
ময়মনসিংহ	৪৬	২৮	১	২
ঢাকা বিভাগ	১৩০	৫৫	১৭	১০
চট্টগ্রাম	৩৯	১৬	৭	১
পার্বত্য চট্টগ্রাম	৯	৪	১	১
সিলেট	১৯	৭	—	২
কুমিল্লা	৪৫	৩০	১	৪
নোয়াখালী	২৬	১৩	৪	২
চট্টগ্রাম বিভাগ	১০৮	৭৩	১৩	১০
খুলনা	৪৮	১৫	২	২
যশোর	৫৫	৩১	৫	৪
বরিশাল	৫০	২১	৪	—
পটুয়াখালী	৩	১	—	—
কুষ্টিয়া	২৮	১০	৪	—
খুলনা বিভাগ	১৮৪	৮১	১৫	৬
রাজশাহী	৩৯	৮	৩	৫
রংপুর	৪১	২২	১	৪
দিনাজপুর	৫০	১০	১	২
বগুড়া	১৪	১২	—	২
পাবনা	৪৩	৯	১	২
রাজশাহী বিভাগ	১৮৭	৬১	১৪	১৫
বাংলাদেশ	৬৩৯	২৭০	৫৯	৪১

(১) শহীদ শিক্ষাবিদদের মোট সংখ্যা ... ৯৬৮

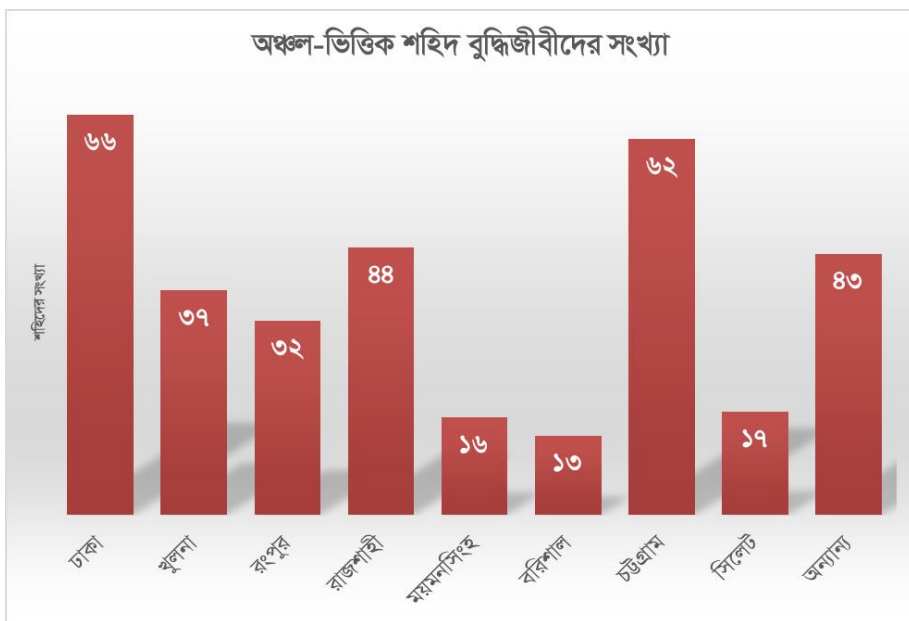
(২) শহীদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা ২১

মোট শিক্ষাবিদ ... ৯৮৯

সারণী-১ : বিভাগ ও পেশা অনুসারে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা

বিভাগ	শিক্ষক	চিকিৎসক	প্রকৌশলী	সাংবাদিক	আইনজীবী	কবি/ সাহিত্যিক/ শিক্ষাবিদ	সাংস্কৃতিক কর্মী	সরকারি/ বেসরকারি কর্তৃকর্ত/ কর্মচারি	রাজনীতিবিদ ও সামাজিক কর্মী	বিজ্ঞানী	মোট
ঢাকা	১৫	১৪	৫	৮	৫	৬	৫	৫	২	১	৬৬
তুলনা	৬	৪	৫	৩	৭	৫	২	২	৩		৩৭
রংপুর	৬	১০	৪	১	২	২	৩	২	২		৩২
রাজশাহী	৩	১২	৬	৫	৯	২	২	২	৩		৪৪
ময়মনসিংহ	১	৯	১		২	১		১	১		১৬
বরিশাল	৩	১	২		৩	১	২		১		১৩
চট্টগ্রাম	২৪	১৯	৩	৬	৩	১	২	৩	১		৬২
সিলেট	৬	৬	১		১	২	১				১৭
অন্যান্য	৯	১৫	৫	২	৮	২	১	১			৪৩
মোট	৭৩	৯০	৩২	২৫	৪০	২২	১৮	১৬	১৩	১	৩৩০

ছবি - ১- : অঞ্চল-ভিত্তিক শহিদ বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা



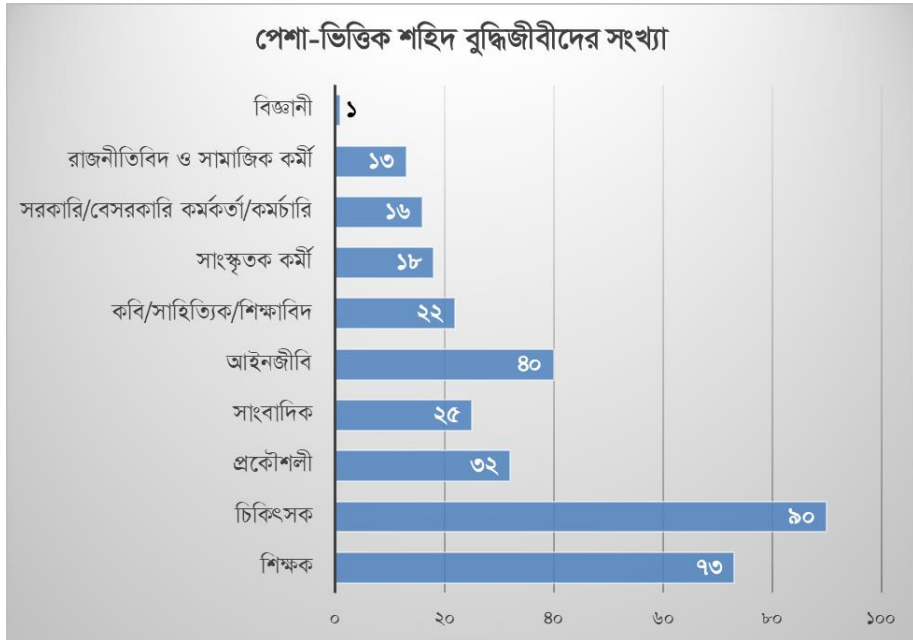
যে ৩৩০ জন শহিদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা ও বিবরণ তৈরি হয়েছে তাদের পেশা-ভিত্তিক বিভাজনে দেখা যাচ্ছে, সবচেয়ে বেশি শিকার হয়েছেন চিকিৎসক পেশায় যুক্ত বুদ্ধিজীবীরা। (ছবি ২) দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছেন শিক্ষকরা। একান্তরে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ২৭.২৭ শতাংশ চিকিৎসক। ২২.১২ শতাংশ শিক্ষক একান্তরে শহিদ বুদ্ধিজীবীর তালিকায় স্থান পেয়েছে। এরপর যথাক্রমে রয়েছেন সাংস্কৃতিক কর্মী, আইনজীবী, প্রকৌশলী, রাজনীতিবিদ ও সমাজকর্মী ও সাংবাদিক সহ অন্যান্যরা। যেহেতু পেশার বিচারে তুলনামূলকভাবে তৎকালে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি ছিল, সেহেতু হত্যার শিকার শিক্ষকের সংখ্যাটাও বেশি হতে পারে। তালিকার শতাংশের হিসেবে চিকিৎসকের সংজ্ঞা বেশি হওয়াটা মূলত অন্য কারনে। নতুন গেজেট হওয়ার পর আস্তে আস্তে এই সংখ্যাটি কমতে থাকবে। চিকিৎসকদের ওপর বিস্তারিত কাজ হওয়ায় তাদের প্রায় সকলকে গেজেটে অন্তর্ভুক্ত করা গেছে। কিন্তু সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিপুল সংখ্যক শহিদ বুদ্ধিজীবী শিক্ষক, সাংস্কৃতিকর্মী, সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদদের এখনো তালিকাভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। পূর্ণাঙ্গ

তালিকা প্রকাশের পর পেশাভিত্তিক এই বিশ্লেষণে শিক্ষকদের সংখ্যাটি বেশি হবে বলে সহজে অনুমেয়।

অবদানের বিবরণে দেখা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধে ও তার আগের নানা সংগ্রামে বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষকরা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতায় তাদের অবদানের কথা নানাভাবে উঠে এসেছে। অনেক স্থানে সংগঠক ও জনসাধারণকে প্রভাবিত করার জন্য শিক্ষকরা ক্রীড়ানক ছিলেন। ফলে, শিক্ষকদের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রোশও ছিল তুলনামূলক বেশি।

এরপরেই রয়েছেন চিকিৎসকরা। বিশেষ কারণে চিকিৎসকরা পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। প্রধানত, পেশাগত দায়িত্বের জায়গা থেকে অনেকেই কর্মস্থল ত্যাগ করেননি এবং দ্বিতীয়ত, মুক্তিযোদ্ধাদের গোপনে ও প্রকাশ্যে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করেছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করার জন্য তারা সহজে আলবদর-রাজাকারদের টার্গেটে পরিণত হয়েছিলেন। একইভাবে রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী, আইনজীবী, সাংস্কৃতিককর্মী, কবি ও সাহিত্যিকরা নিজস্ব জায়গা থেকে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

ছবি-২: পেশা-ভিত্তিক শহিদ বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা

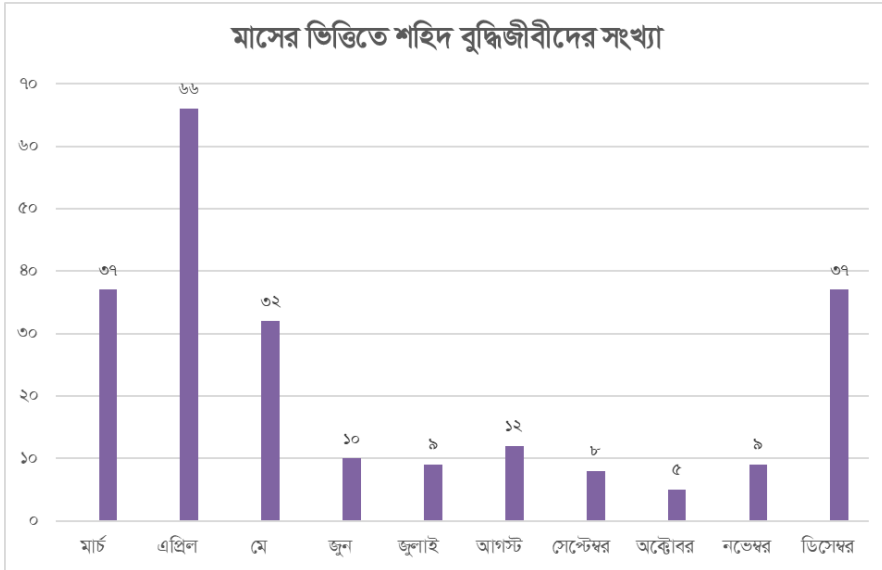


মুক্তিযুদ্ধের কোন সময়ে বুদ্ধিজীবীরা বিশেষ টার্গেট হয়েছিলেন, বা কখন তাঁরা হত্যার শিকার হয়েছিলেন। যেহেতু ১৪ ডিসেম্বরকে শহিদ বুদ্ধিজীবী হত্যা দিবস হিসেবে সরকারিভাবে উদযাপন করা হয় সেহেতু ধরে নেওয়া হয় যে, ডিসেম্বরে যুদ্ধের শেষ মুহূর্তে বুদ্ধিজীবীরা বেশি শহিদ হয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের গবেষণা দেখাচ্ছে যে, যুদ্ধের প্রায় নয় মাস জুড়েই পাকিস্তানিরা

বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে (ছবি-৩)। বরঞ্চ, মাসের হিসেবে এপ্রিল মাসে সর্বাধিক বুদ্ধিজীবী নিহত হয়েছেন।

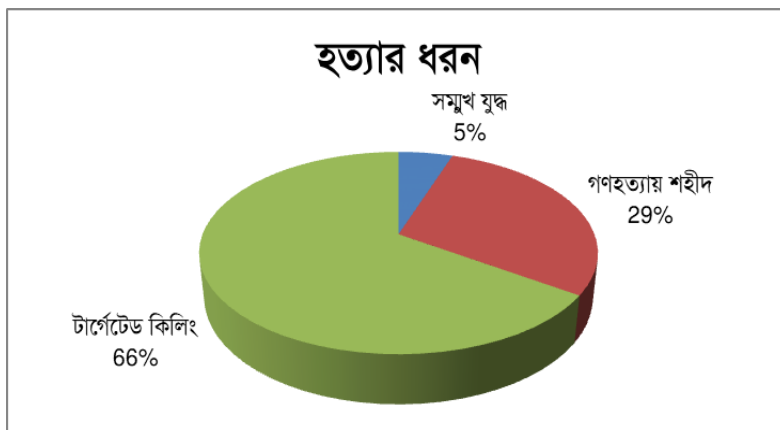
২৯ মার্চ নিজের বাড়ি থেকে পুত্রসহ তুলে নিয়ে যাওয়া হয় ভাষা আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জি. সি. দেবকে হত্যা করা হয় স্বাধীনতার প্রথম প্রহরে। ৪ এপ্রিল হত্যা করা হয় যোগেশ চন্দ্র ঘোষকে, ১৯ এপ্রিল হত্যা করা হয় চট্টগ্রামের রাউজানের নতুন চন্দ্র সিংহকে। ২টি গেজেটে অন্তর্ভুক্ত শহিদ বুদ্ধিজীবীদের হত্যার তারিখ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বুদ্ধিজীবীদের হত্যার যে নীল নকশা সেটি কেবল পরাজয়ের পূর্ব মুহূর্তের সিদ্ধান্ত ছিল না। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যার যে নীল নকশা তার একটি বিশেষ অংশ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা। এই মাস্টার প্ল্যানটা অপারেশন সার্চলাইট থেকে শুরু হয়ে শেষ অবধি চলমান ছিল। পরাজয় যখন নিশ্চিত তখন সমস্ত আক্রোশটা গিয়ে পড়ে যারা সংগ্রামের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করেছিল সেসব বুদ্ধিজীবীদের ওপর। ফলে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে এসে বুদ্ধিজীবী নিধন তীব্র আকার ধারণ করে। তালিকা করে হত্যা করা হয় শিক্ষক সাংবাদিক, চিকিৎসক ও লেখকদের। গেজেটকৃত ৭৩ জনের মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা যায়নি। যাদের মধ্যে অনেকেই যুদ্ধের নানা সময়ে নিখোঁজ হয়েছিলেন। এই বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়েছে এপ্রিল মাসে। এ সময়ে বাংলাদেশে গণহত্যার তীব্রতা সবচেয়ে বেশি। স্বভাবতই বুদ্ধিজীবীরাও বেশি হত্যার শিকার হয়েছেন। অপারেশন সার্চলাইট থেকে শুরু করে এপ্রিলের ৩০ তারিখ পর্যন্ত গেজেটকৃত বুদ্ধিজীবীদের ৩১.২১ শতাংশকে হত্যা করা হয়। জুন মাস থেকে এই হত্যার তীব্রতা নভেম্বর পর্যন্ত একটি স্থিতিশীল ছিল। ডিসেম্বরে এসে এটি আবার তীব্র হয়।

ছবি-৩: মাসের ভিত্তিতে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা



আমাদের গবেষণায় আমরা তিন ধরনের হত্যাকাণ্ড খুঁজে পেয়েছি : টার্গেটেড কিলিং, গণহত্যায় শহিদ এবং সম্মুখ যুদ্ধে হত্যা। যাদেরকে তালিকা করে এবং বিশেষভাবে চিহ্নিত করে হত্যা করা হয়েছে তাদেরকে টার্গেটেড কিলিং বর্গে রাখা হয়েছে। যারা বিভিন্ন গণহত্যা (মাস কিলিং)-এ শহিদ হয়েছেন তাঁদেরকে গণহত্যায় শহিদ বর্গে রাখা হয়েছে। এবং যারা মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে শহিদ হয়েছেন তাঁদেরকে সম্মুখ যুদ্ধের বর্গে রাখা হয়েছে। আমাদের গবেষণাতে দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ (প্রায় ৬৬%) শহিদ বুদ্ধিজীবী টার্গেটেড কিলিং এর শিকার হয়েছেন। আলবদর বা রাজাকাররা তাঁদের কর্মকাণ্ডের কারণে তাঁদেরকে চিহ্নিত করে ধরে নিয়ে গিয়েছে, নির্যাতন করেছে এবং পরিশেষে হত্যা করেছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আলবদররা তাঁদেরকে কখনো চিঠি পাঠিয়ে হুমকিও দিয়েছে। গণহত্যা/মাস কিলিং এর শিকার হয়েছেন প্রায় ২৯% বুদ্ধিজীবী। বিভিন্ন গণহত্যার ঘটনায় তাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন। পাশাপাশি সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন ৫% শহিদ বুদ্ধিজীবী।

ছবি - ৪: হত্যার ধরন



উপসংহার:

সরকারিভাবে শহিদ বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞাতে বিভিন্ন পেশাজীবী বর্গের কথা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে দিলেও সাথে আরো দুটো স্পষ্ট শর্ত রয়েছে: ১) উক্ত পেশার সাথে জড়িত ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এবং ২) অবদানের কারণে পাকিস্তানি ও তাদের সহযোগীদের হাতে নিহত হয়েছেন বা নিখোঁজ হয়েছেন। অর্থাৎ, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি (শুধু ঢাকা শহর ব্যতীত বাকী সারা দেশে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর্যন্ত প্রাণ হারানো উপরোক্ত বর্গে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের অবদানই নির্ধারণ করে দিবে তাঁরা শহিদ বুদ্ধিজীবী কী না। তবে বুদ্ধিজীবীদের অবদান যে সবসময় প্রত্যক্ষ থাকে না, পরোক্ষ অবদানও থাকে। যেমন একজন শিক্ষক একটা রাষ্ট্রের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও লেখক-সাংবাদিক শিল্পীদের মতো তার অবদান এতোটা প্রত্যক্ষ নয়। একই সাথে, একজন শিল্পী, সাহিত্যিক যেমন বিভিন্ন আন্দোলনে তাদের সৃজনশীলতা দিয়ে যুক্ত হতে পারেন,

একজন শিক্ষক বা গবেষকের যুক্ততা তেমন নাও হতে পারে। তার যুক্ততা পরোক্ষ হলেও দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীর মধ্যে সুস্পষ্ট তফাৎ রয়েছে। কিন্তু সরকারিভাবে গেজেটকৃত সংজ্ঞাতে এই বিভাজন রেখাটি স্পষ্ট নয়। সরকারি কর্মচারি, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা কোন যুক্তিতে বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞায় পড়ে না।

এটা স্পষ্ট যে, কেন্দ্রে অবস্থানকারীদের মধ্যে যারা বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁরা অনেক বেশি আলোচিত ছিলেন প্রান্তিক কোনো একজন কবি বা লেখক বা শিক্ষকের তুলনায়। ফলে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের সাথে নিযুক্ত কেন্দ্রের ব্যক্তির যত সহজে তালিকায় জায়গা পান, বা তাদের সম্পর্কে যত তথ্য সহজেই পাওয়া যায়, প্রান্তিক পর্যায়ের কোনো ব্যক্তির তথ্য ততটা সহজেই পাওয়া যায় না। মূলধারার পত্র-পত্রিকাতেও তাদের সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না।

বহু বুদ্ধিজীবী একাত্তরের নয়মাস তাদের কর্মস্থলেই ছিলেন। কিন্তু কর্মস্থলে থেকেও তারা নানা সৃজনশীল উপায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করা থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অবদান রাখতেন। অনেকেই তাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে খোদ পরিবারের কাছ থেকেও লুকিয়ে রেখেছিলেন। ১৪ ডিসেম্বর যারা প্রাণ হারান তাদের অনেকের কাহিনীও আমাদের ইতিহাস থেকে হারিয়ে গিয়েছে। আবার, অবদান বিষয়টা কেবল মুক্তিযুদ্ধের নয়মাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরঞ্চ দীর্ঘ তেইশ বছরের মুক্তিসংগ্রামে স্ব-স্ব ক্ষেত্র থেকে বুদ্ধিজীবীরা সক্রিয় থেকেছেন। বাঙালি জাতীয়তাবোধের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পাটাতন তৈরি হয়েছিল তাদের তৎপরতার মাধ্যমে। সেই তৎপরতার রূপ ও লক্ষণ নির্ণয় করা না গেলে তাদের অবদানের স্বরূপ বোঝা সম্ভব হবে না একটা জাতির উদ্ভবের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় সবার অংশগ্রহণ, অংশগ্রহণের ধরন ও উদ্দেশ্য সমান নাও হতে পারে। তাদের বিচিত্র তৎপরতাকে নির্ণয় করে কেবল যে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা, সংখ্যা ও স্বরূপ জানা যাবে তা নয়, বরঞ্চ এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মূল বিষয়টাকে আরোও পরিষ্কার করা যাবে।

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১. Milan Kundera, *The Book of Laughter and Forgetting*, New York: Penguin Books, 1980), p. 3
২. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় শহিদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা প্রণয়নের জন্য ১৯ নভেম্বর ২০২০ স্মারক নং- ৪৮.০০.০০০০.০০৪.৪০.৩৭.৪৯৯.১৭/৩৬৬ অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের ৩ জন সদস্য, ২ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ৬ জন গবেষকের সমন্বয়ে ১১ সদস্যের জাতীয় কমিটি গঠন করেন। লিংক- molwa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/molwa.portal.gov.bd/notification_circular/85453a67_f41a_44d5_b8a0_6d54717367bf/scan0039.pdf
৩. Jhon Middleton Murry, *The Evolution of an Intellectual*, (New York: Alfred A. Knopf, 1920) Forgotten Books 2019 সালে বইটি ক্ল্যাসিক্যাল রি-প্রিন্ট সিরিজে নতুন করে প্রকাশ করে।

৪. Antonio Gramsci Translated and Edited by Q. Hoare and G. N. Smith, *The Prison Notebooks*, (New York: International Publishers, 1971), p. 3-23
৫. বিনয় ঘোষ, *বাংলার বিদ্বৎসমাজ*, পঞ্চম সংস্করণ (কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ২০০৬)
৬. রথীন চক্রবর্তী, *বুদ্ধিজীবী চরিতনামা* (কলকাতা: নেতাজি রিসার্চ সেন্টার, ২০১৬), পৃ. ১১
৭. Thomas Sowell, *Knowledge and Decisions*, (New York : Basic Books, 1980), p. 52
৮. Noam Chomsky, *Understanding Power*, (Delhi: Penguin Books India, 2003), p. 206
৯. এডওয়ার্ড ডব্লিউ সান্দ্র, *রিপ্রেজেন্টেশনস অব দ্যা ইন্টেলেকচুয়াল* (দেবশীষ কুমার কুণ্ড অনুদিত), (ঢাকা: সংবেদ, ২০০৭), পৃ. ১৮
১০. এডওয়ার্ড ডব্লিউ সান্দ্র, *রিপ্রেজেন্টেশনস অব দ্যা ইন্টেলেকচুয়াল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২
১১. EWAN STEIN, 'Intellectuals and Political Change in the Modern Middle East and North Africa', *British Journal of Middle Eastern Studies*, Taylor & Francis, Ltd, 2014, (<https://www.jstor.org/stable/43917046>)
১২. গৌতম ভদ্র, *বুদ্ধিজীবী করে কয়*, আ-আল মামুন সম্পাদিত (রাজশাহী : ম্যাজিক লন্টন, ২০২১), পৃ. ৫৬
১৩. রথীন চক্রবর্তী, *বুদ্ধিজীবী চরিতনামা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮
১৪. বিনয় ঘোষ, *বাংলার বিদ্বৎসমাজ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০
১৫. bangla.bdnews24.com/arts/%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%AD%E0%A7%A7/51849
১৬. মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১* (ঢাকা: অনন্যা, ২০১৩), পৃ. ১৮
১৭. বদরুদ্দীন উমর, *বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদের সামাজিক খুঁটি বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা* (ঢাকা: সংস্কৃতি, ২০১৬)
১৮. রশীদ হায়দার সম্পাদিত, *শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষগ্রন্থ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫)
১৯. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩) লিংক- (bn.banglapedia.org/index.php/বুদ্ধিজীবী)
২০. খোদেজা খাতুন, *মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা* (সুবর্ণ: ঢাকা, ২০১৩), পৃ. ৮
২১. বাংলাদেশ গেজেট (ঢাকা: বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, ২৯ এপ্রিল ২০২১), গেজেটটির লিংক- dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/39819_12838.pdf
২২. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, পূর্বোক্ত
২৩. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে একটি কর্মসূচি হিসেবে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদদের সম্পাদনায় পাঁচ খণ্ডে ২০২১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জ্ঞানকোষ প্রকাশ করেছেন।

২৪. নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী, *বঙ্গালী বুদ্ধিবৃত্তি ও বুদ্ধিজীবী দলন*, 'সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত প্রথম বিজয় দিবস স্মরণিকা বাংলাদেশ' (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৭২)
২৫. আলী মো. আবু নাইম ও ফাহিমা কানিজ লাভা সম্পাদিত, *শহিদ বুদ্ধিজীবী কোষ* (ঢাকা: আগামী, ২০১৯)
২৬. সুপা সাদিয়া, *মুক্তিযুদ্ধে শত শহিদ বুদ্ধিজীবী*, (ঢাকা: অবসর, ২০২০)
২৭. খোদেজা খাতুন, *মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০২-২০৬
২৮. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, ৮ম খণ্ড (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২), পৃ. ৫৭৫-৫৭৮
২৯. বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ১৯৯১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে প্রকাশ করেছে নয়টি ডাকটিকিটের সিরিজ। এই নয়টি সিরিজে প্রকাশিত হয়েছে মোট ১৫২ জন শহীদ বুদ্ধিজীবীর ছবিসংবলিত আরক ডাকটিকিট। ডাকটিকিটের সঙ্গে এই বুদ্ধিজীবীদের জীবনবৃত্তান্ত সংবলিত নয়টি পুস্তিকাও বের করা হয়েছে। প্রতিটি ডাকটিকিটের মূল্যমান দুই টাকা। বাংলাদেশের ডাকটিকিটে প্রথমবারের মতো আমরা শহীদ বুদ্ধিজীবীদের পাই ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯১-এ প্রকাশিত তিনটি শিটলেটে (ডাকটিকিট সংযুক্ত পাতা)। প্রতিটি শিটলেটে ১০টি করে মোট ৩০টি ডাকটিকিট স্থান পায়। এরপর ১৯৯২ সালেই শুধু এই সিরিজের ডাকটিকিট বেরোয়নি। এ ছাড়া ১৯৯৩ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রতিবছরই এ ডাকটিকিটের সিরিজটি প্রকাশিত হয়েছে।
৩০. রশীদ হায়দার সম্পাদিত, *শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষগ্রন্থ*, পূর্বোক্ত
৩১. পূর্বোক্ত, *শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষগ্রন্থ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২
৩২. ভাষা ও সাহিত্য উপবিভাগ, *শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মারকগ্রন্থ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪)
৩৩. গেজেটগুলো মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এই লিংকে পাওয়া যায়-
https://molwa.gov.bd/sites/default/files/files/molwa.portal.gov.bd/miscellaneous_info/cd194028-ddc1_42b1_93c0_05b28c1de780/scan0342.pdf
৩৪. মো: শাহ আলমগীর সম্পাদিত, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহিদ সাংবাদিক*, (ঢাকা: বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ২০১৫) ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটে এই লিংকে বইটির পিডিএফ কপি পাওয়া যায়
http://pib.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pib.portal.gov.bd/page/6a218d81_b02c_4480_957a_5b527fa5c0c1/Shahid%20Sangbadik.pdf
৩৫. বায়জীদ খুরশীদ রিয়াজ, *মুক্তিযুদ্ধে শহীদ চিকিৎসক জীবনকোষ ষষ্ঠ মুদ্রণ* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০২১)
৩৬. আবদুল খালেক, *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ বুদ্ধিজীবী ও বধ্যভূমি* (ঢাকা: আগামী, ২০১৬)
৩৭. ড. এম অহিদুজ্জামান সম্পাদিত, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধিজীবী হত্যা ১৯৭১* (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ২০১৬)
৩৮. লতিকা মুখোপাধ্যায় গুহ সম্পাদিত, *বুদ্ধিজীবী ও নানা প্রশ্ন* (কলকাতা: আর বি এন্টারপ্রাইজ, কলকাতা, ২০২২), পৃ. ৭১

৩৯. দুটি গেজেটে ৩৩৪ জন শহিদ বুদ্ধিজীবীর নাম আছে। ৪ জনের নাম দুইবার করে রয়েছে।। তাই প্রকৃত হিসাব বুঝাতে ৩৩৪ এর স্থলে ৩৩০ জন বুদ্ধিজীবীকে বিবেচনা করা হয়েছে।
৪০. নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী, *বঙ্গালী বুদ্ধিবৃত্তি ও বুদ্ধিজীবী দলন*, সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত প্রথম বিজয় দিবস স্মরণিকা *বাংলাদেশ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮

জমা প্রদানের তারিখ : ২৩.০২.২০২৩

গৃহীত হবার তারিখ : ১৯.০৮.২০২৩

বন্ধনহীন গ্রন্থি : রবীন্দ্রনাটকের উত্তরকাঠামোবাদী বিনির্মাণসূত্র

শরীফ সিরাজ*

Abstract

Rabindranath Tagore (1861-1941) ends his plays without any traditional endings as we can say 'Endless Ending'. In other word- There is always an aftermath calculation is present in the denouements, actually it triggers to think the possible next phase of the drama as the last scenes of particular plays are too much engaging and full of possibilities to go beyond the stage. This force is originated from Tagore's belief, that's why philosophically, Tagore is more eastern than the west. With the sense of Freedom, Rabindranath practices his thoughts in than any other forms of writings more in the plays. If you have a deep understanding with the thoughts of Rabindranath, Post-structuralism, approaches of Deconstruction, Dialogic essence of Language, it could be visible that Tagore's plays are never outdated, always have possibility to touch any timeline and deconstruction of his plays is not sin but the inner strength of those remarkable plays. In this writing, as an author, I tried to find out those potentials through post-modern approaches.

চাবিশব্দ: যাত্রাপালা, সংশ্লেষণাত্মক নাট্যরীতি, উত্তরকাঠামোবাদ, বিনির্মাণসূত্র, বিমোক্ষণ, দ্বিবাচনিক

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের প্রায় প্রতিটি নাটকে পাঠশেষে একটি সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়। প্রতীচ্যের নাট্যভাবনায় যখন একটি নাটকের পরিণতি বিবেচনা করা হয় তখন মূলত নাটকের তিনটি ঐক্যের কাম্য পরিস্থিতি কল্পনা করা হয়। যবনিকাপতনের সঙ্গে সঙ্গে একটি ঘটনার আরাধ্য উপসংহার পেয়ে পাঠক-দর্শক-শ্রোতা সকলে নিশ্বাস ফেলে প্রাপ্তির; সেখানে দুঃখজাত অথবা সুখজাত পরিণতি পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটকে সেই পরিণতি একটি অতৃপ্ত ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ এমন একধরনের পরিণতি নিয়ে আসেন নাটকের শেষে যা আদতে শেষ নয় বরং অনন্ত সংঘটনার সম্ভাবনার গুরু; কার্যত তাঁর নাটকের গ্রন্থিমোচন হয়ে ওঠে নিরন্তর বন্ধনহীন গ্রন্থির সূচিমুখ। কিন্তু কোন বিশ্বাস থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে এমন আয়োজন করেন? এর মাধ্যমে কি তিনি তাঁর দার্শনিক বিশ্বাসের সাথে সংগতিপূর্ণ মুক্তির বার্তা ভবিষ্যতের দিকে ছড়িয়ে দেন নাকি নাটকের সংঘটনাসমূহকে কর্মীর মাধ্যমে ভবিষ্যতের পটে কার্যকর রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন? বর্তমান প্রবন্ধের অন্বেষিত সেই ইঙ্গিতের নিহিতার্থ ও তার কার্যকারিতার স্বরূপ উন্মোচন।

সন্দেহ নেই যে উনিশশতকের তাবৎ আলোয় উজ্জ্বল হয়ে বিশশতকের বাঙালিমানসের প্রকৃতি-নিরূপণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ছিলেন সতত-তৎপর। ধ্যান ও কর্মের সহযোগে^১ যে নতুনত্ব তিনি এনেছিলেন হাজার বছরের বাঙালির চেতনায়, প্রকাশভঙ্গিতে তদ্রূপ অভিনব শিল্পকৌশলও তিনি যুক্ত করেছিলেন তৎসাময়িক ক্রমগঠমান অধুনাতন বাংলার সাহিত্য-আঙ্গিকের ধারায়। বলা হয়ে থাকে উনিশ-বিশ শতক-ব্যাপ্ত সৃজনপরিক্রমায় তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্বদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

গড়ে তুলেছিলেন নিজ পারঙ্গমতায়। তবে পারঙ্গমতা তাঁর সৃজনে মূর্ত হয়ে উঠেছিলো সমকালীন অভিঘাতসমূহকে সাস্কীকৃত করেই^২। একটি সময়ের ঢেউ নির্ধারণ করে দেয় তার শিল্পভাষ-প্রকৃতি; রবীন্দ্রনাথের শিল্পও তার ব্যতিক্রম নয়। শিল্পসমালোচনার ভাষায় যাকে বলে ‘পরিপ্রেক্ষিত’ (Context), রবীন্দ্রনাথের সৃজনে তা সক্রিয় ছিল সর্বদাই। বিশেষত তাঁর নাটকসমূহে সেই ভাষিক-ঘাতের উপস্থিতি প্রমূর্ত।

সাহিত্যে বা সমাজকেন্দ্রিক চিন্তায় অথবা প্রকৃতিভাবনায় কিংবা বিশ্বরাজনীতির চিন্তনক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথের যে দার্শনিক অবস্থান তা অবশ্যই একটি বিন্দুতে মিলেছে, আর তা হলো ঔপনিষদিক মুক্তির আকাজক্ষা। বাল্যবয়স থেকে মৃত্যু-পূর্ববর্তী যে রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যায় তাঁর মানস একান্তভাবেই উপনিষদ সমন্বিত এক মিশ্রবীক্ষণে গ্রন্থিত। তাঁর রচিত প্রভিন্ন সাহিত্যিক রূপকল্পে সেই মুক্তির সুরই প্রকটভাবে অনুরণিত^৩। তন্মধ্যে তাঁর নাটকগুলোতে দ্বন্দ্বিক সংলাপের বিন্যাসে সেই মুক্তির বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বলাকা পর্বে এসে ‘কবি রবীন্দ্রনাথের সাথে যে কর্মী সত্তা এসে যোগ দিল’^৪ নাটকের অভ্যন্তরে সেই কর্মীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল বহুপূর্বেই। বঙ্গভঙ্গ কালে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক সক্রিয়তা যেমন এক কর্মী রবীন্দ্রনাথকে পরিচয় করিয়ে দেয় তেমনি ওইসময়ে রচিত তাঁর সাহিত্যগুলোতেও একজন কর্মী-কবির সন্ধান মেলে। ধ্যানকে কর্মের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা সম্ভব; এমন বিশ্বাস তাঁর প্রজাকল্যাণমূলক জমিদারি তৎপরতার মধ্যে যেমন প্রকাশ পেয়েছে বারংবার তেমনি শান্তিনিকেতনের ‘হলকর্ষণ উৎসব’সহ পার্শ্ববর্তী নাগরিকদের জীবনের কল্যাণের জন্য গৃহীত কর্মকাণ্ডের মধ্যেও দীপ্যমান থেকেছে^৫। ধ্যানের সঙ্গে কর্মের এই যে সম্পূরক সম্পর্ক বিদ্যমান, তা সাহিত্যের যে শাখায় রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন তা হলো তাঁর নাটক। নিজেই অভিনয় ও নির্দেশনার মতো কাজে পারদর্শিতা দেখিয়ে বাংলা নাটকের প্রচলিত ইয়োরোপীয় ধারায় এনেছিলেন অভিনবত্ব।

কার্যত রবীন্দ্রনাথ সমকাল-প্রচলিত বাংলা নাটকের চর্চায় নিয়ে এসেছিলেন নতুনত্ব; যদিও তৎকালীন বাংলা নাটকের মঞ্চে সেই নতুনত্ব অভিবাদনের সঙ্গে গৃহীত হয়নি^৬। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আপন দৃষ্টির সুদূরসঞ্চারী ক্ষমতাকে নিরন্তর করেননি কোনোভাবেই; বরং নাটক রচনা ও পরিবেশন করে গেছেন নিজের মনোলালিত শিল্পাদর্শের ভিত্তিতে। যে শিল্পাদর্শ রবীন্দ্রনাথকে মহীয়ান করেছে, স্বতন্ত্র করেছে বাংলা নাটকের হাজার বছরের ধারায়। নিজের লিখিত ‘রঙ্গমঞ্চ’ প্রবন্ধে তিনি যাত্রাপালার সাথেই একাত্মবোধ করেছেন বাংলা নাটকের প্রদর্শনরীতি ও আঙ্গিকভাবনার ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে তিনি এককাত্ম বোধ করেছেন আমাদের একান্ত দেশীয় নাট্য-আঙ্গিক যাত্রাপালার সঙ্গে^৭। অনেক জায়গায় তিনি নিজের নাটককেও উল্লেখ করেছেন পালা হিসেবে; যেমন— ‘রজকরবী’ নাটকটি যখন যক্ষপুত্রী নাম ত্যাগ করে নন্দিনী’ নামে আবির্ভূত হয়, তখন এর প্রদর্শনকালে তিনি অভিভাষণে বলেছিলেন—“আজ আপনাদের বারোয়ারি-সভায় আমার নন্দিনীর পালা অভিনয়।”^৮ তাঁর সম্বোধন এই ‘পালা’ শব্দটি যেন যাত্রাপালা শব্দটির-ই রাবীন্দ্রিক অপভ্রংশ। তাছাড়া নাটক প্রদর্শনের সময় মঞ্চ-দ্রব্যাদি (Props) নিয়ে বিলেতি আয়োজনের বাড়াবাড়ির বিরোধিতাও তিনি করেছেন; আয়োজন ব্যতিরেকে দর্শকেরা যে সেই বিষয়টি স্থায় কল্পনার সাহায্যে পূরণ করে নেন—এই যৌক্তিক বিষয়টি সামনে এনে নাটকের প্রপস কেন্দ্রিক ব্যয়বাহুল্যের বিরোধিতা করেছেন তিনি। নিজের নাটক পরিবেশনের সময়ও তিনি মঞ্চ এবং মঞ্চ-উপকরণ বা দ্রব্যাদি ব্যবহারে নিয়ত

পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে নিজস্ব নাট্যভাবনার প্রকাশ করেছেন^৯। রবীন্দ্রনাটক বিশ্লেষণ করে প্রধানত দুটি বিষয় এযাবৎ আলোচনার মূল হিসেবে ইন্দ্রিয়গোচর করেছেন সমালোচকগণ –

ক) রবীন্দ্রনাথের নাটকের দর্শন : সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো নাটকেও রবীন্দ্রনাথ প্রধানত সাংস্কৃতিক-সামাজিক- রাজনৈতিক বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে মুক্তির যে আনন্দ সেই দর্শনের-ই চর্চা করেছেন বলা যায়। কবিতায় আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে মানসী প্রতিমা গড়ে তোলার ভাববাদী প্রেরণা থেকে ‘সবুজের অভিযানের’ মাধ্যমে বস্তুবাদী ভাবনায় যে রবীন্দ্রনাথ উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, সে রবীন্দ্রনাথ কর্মের প্রত্যয়ে স্থিতিবিশ্বাসী এক যুগপুরুষ। ছোটগল্প-উপন্যাসের বিস্তীর্ণ পটে ভাব ও বস্তু বহুবিধ দ্বন্দ্বের আয়োজন করলেও তিনি যে কোনোভাবে মুক্তির আকাজক্ষার তীব্রতা দেখাতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু নাটক রচনায় এক ভিন্ন রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যায় যেখানে কোনো দ্বিধায় তিনি দুলাছেন না; স্পষ্টভাষায় দেখিয়ে দিচ্ছেন তাঁর অবস্থান। তাই প্রেমময় গীতলতায় হোক কিংবা সংকটের কাঠিন্যে হোক তিনি শ্রেয়োনীতিই বেছে নিয়েছেন, আর সেটি হলো উপনিষদ-নিষিদ্ধ মুক্তির অটল ভাবনা।

খ) নাটকের আঙ্গিক বিশিষ্টতা: প্রচলিত অঙ্ক বিভাজন বা দৃশ্য নির্মাণে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য ভঙ্গি কোনো কোনো নাটকে মানলেও তাঁর অপরাপর বিখ্যাত নাটকসমূহে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন ভারতের তথা বাংলার লোকনাট্যরীতি^{১০}। যেমন-রাজা, অচলায়তন, মুক্তধারা, রক্তকরবী ইত্যাদি। এসব নাটকে তিনি ঘটনা যেখানে ঘটেছে তার-ই উল্লেখ করেছেন মাত্র, কোনো দৃশ্য যোজনার প্রয়াস নেই, নেই কোনো অঙ্ক-বিন্যাসের আয়োজন। এতে করে একটি প্রাথমিক রীতি থেকে যেমন তিনি বেরিয়ে এসেছেন, তেমনি প্রচলিত নাটক প্রদর্শনে সজ্জাপ্রধান দৃশ্য নির্মাণের বাহুল্য প্রয়োজনকেও প্রকট করে তোলেননি। উপরন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা নাট্যস্বভাবী কাব্যগুলোর দৃশ্য বর্ণনার সঙ্গে এসেছে সাদৃশ্য; যা তাঁর নাট্যরীতিকে করেছে আরও যাত্রা-ঘনিষ্ঠ, তাঁকে দিয়েছে শ্রেষ্ঠ দেশীয় নাট্যরীতির নাট্যকারের স্বীকৃতি^{১১}।

মুক্তির আকাজক্ষাপ্রধান তাঁর নাটকসমূহে (বিসর্জন, রাজা, অচলায়তন, মুক্তধারা ও রক্তকরবী) পাওয়া যায় এমন একটি আঙ্গিক, পাওয়া যায় অন্বেষণের এমন কোনো সূত্র যা বাংলা নাটকের ধারায় স্বাভাবিক। নাটকে রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই এমন কোনো ভাবনা বা দর্শনকে তৎসাময়িক পরিবেশ- পরিস্থিতি অনুযায়ী সম্পৃক্ত করেছেন যা তাঁর নাটককে করেছে বিশিষ্ট। এই বিশিষ্টতাদর্শী নাট্য বিষয়কে রচনায় মূর্ত করতে গিয়ে তাঁকে ভাবতে হয়েছে এর আঙ্গিকরীতি নিয়ে; কল্পনা করতে হয়েছে তার মঞ্চ বা পরিবেশন পদ্ধতি নিয়েও। ফলত একপ্রকার সংশ্লেষণাত্মক নাট্যরীতি রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে বাংলা নাটকের ধারায় স্থান করে নিয়েছে। সে লক্ষ্যে তৎকালপ্রচলিত ইউরোপীয় নাট্যদর্শনের সঙ্গে দেশীয় নাট্যরীতির সংশ্লেষ কোনো প্রকার সংঘাত ছাড়াই (আত্মিক-প্রণোদনার জায়গা থেকে) তিনি ঘটিয়েছেন। একটি দর্শনপ্রভাবিত মুক্তির অবলম্বন তিনি দিয়েছেন নাট্য-আয়োজনে; সেক্ষেত্রে ইউরোপীয় প্রসেনিয়াম থিয়েটারের ধারণার সঙ্গে মুক্তমঞ্চলীন দেশীয় যাত্রাপালার পরিবেশনভাবনাকে নাট্যরচনাকালীন চিন্তার সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন।

তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাটকের অন্তর্নিহিত দার্শনিকভাষ্যের মধ্যে সমালোচকগণ প্রধানত মুক্তির দর্শনকেই মেনে নিয়েছেন এবং আঙ্গিক ভাবনায় বাংলার ঐতিহ্য সংশ্লিষ্ট যাত্রার আঙ্গিকের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সময়সাঁধন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সে-ব্যাপারে পোষণ করেছেন একমত। কিন্তু রবীন্দ্রনাটকের প্রচলিত কাঠামোবাদী সমালোচনা ও নির্দিষ্ট শুদ্ধতাবাদী পরিবেশন-চর্চার মধ্যে সেই

মুক্তির চর্চা কোথায়? কেমন এক শুদ্ধ পুরাণের আবরণে ঢেকে রাখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে। সেটি নাটকের আঙ্গিক ভাবনার দিক থেকে যেমন, তেমনি অভিনয়ের দিক থেকেও। যা কি না খোদ রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-পরিপন্থী। অথচ রবীন্দ্রনাট্যও এই কাঠামোর অন্তরালবর্তী চর্চা থেকে বের করে আনার প্রবণতা যে একেবারেই দেখা যায়নি তা নয়। শঙ্কু মিত্রের ‘বহুরূপী’থিয়েটারের চেষ্টায় বহু আগে থেকেই এত নতুনভাবে রবীন্দ্রনাথের নাটক পাওয়া গেছে যা রবীন্দ্র-দর্শনের অনুবর্তী। তাদের ‘রক্তকরবী’সহ একাধিক প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাটককে পাওয়া গেছে নতুনকালের স্বরবিন্যাসে। কিন্তু ফলাফলটা একেবারেই ভবিষ্যৎ নির্ধারণী হয়নি। সমকালেই হয়েছে সমালোচনা। একটি শুদ্ধ কাঠামোবাদ চিন্তার পরিপন্থী হয়েছে বলেই রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগের রূপ ধারণ করে নাট্যকার হিসেবে আবির্ভূত হতে পারেননি। মূল দ্বন্দ্বটা জমে উঠেছে এখানেই। কিন্তু কেন এমনটা হলো? এমন জিজ্ঞাসা তুলেছিলেন কবি ও গবেষক শঙ্কু ঘোষ তাঁর ‘কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক’ নামক বইতে। তিনি জিজ্ঞাসা রেখেছেন এভাবে:

“রবীন্দ্রনাটক অভিনয়ের বহুরূপীর ঐতিহাসিক সিদ্ধির পরেও ভাবতে হয়, দর্শক বা দলগুলির মধ্যে কতটা ছড়াতে পারল তাঁর চেতনার অন্তঃসার।”^{১২}

আমাদের জিজ্ঞাসাও অনুরূপ।

মুক্তির বার্তাবাহককে একটি সংকীর্ণ মূর্তির আকারে পুজোর মন্দিরে আবদ্ধ করলে যা হয়, বাংলাদেশের প্রচলিত রবীন্দ্র চর্চায় এসেছে সেরকমের বন্ধাত্ম। অথচ চরম রাষ্ট্রীয় নিষেধ সত্ত্বেও বাংলাদেশ-পূর্ববর্তী পাকিস্তানের অবরুদ্ধতায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যথার্থ মুক্তির জায়গা। উল্লেখ্য, ১৯৬১ সনে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিক পালনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক নতুন রূপে ঘটে রবীন্দ্রবোধন। যেন পারিপার্শ্বিক আটকাবন্ধায় এক মুক্তির বার্তাবাহক হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে তখন জাগিয়ে তোলা হয়েছিল; যার জাগ্রত স্বাক্ষর অক্ষয় হয়েছে পরবর্তীকালে ড. আনিসুজ্জামান সম্পাদিত ‘রবীন্দ্রনাথ’ (১৯৬৮) নামক সংকলন-স্মারক গ্রন্থে। কিন্তু স্বাধীনতার পর, এমন উদ্বোধনের ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথ আজ একটি শুদ্ধতাবাদী খোলসে আবৃত। আর সেইজন্যই রবীন্দ্রনাটকের যথাযথ রূপ এখনও পর্যন্ত হয়নি সঠিকভাবে উন্মোচন। অথচ রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্টভাবে তাঁর নাটকগুলোতে রেখে গেছেন তাঁর নির্দেশনা, দিয়ে রেখেছেন তাঁর যথাযথ ইঙ্গিত; যে ইঙ্গিত ধরে এগুলো এমন একজন রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যায়, যিনি নিজের মুক্তির দর্শনের জোরেই মুক্ত থাকতে চান, মুক্ত হতে চান কোনো একটি নির্দিষ্ট কাঠামোভুক্ত চর্চার ভার থেকে। নিত্য নতুন ভাবনার জাল ছিন্ন করে উত্তীর্ণ হতে চান নতুন উচ্চতায়^{১৩}। অথচ সেই অনুষ্ণগুলো আজ অধি চিহ্নিত হয়নি যথাযথ নিরীক্ষায়। আমাদের দৃষ্টি আজ রবীন্দ্রনাথের মুক্তিতে।

সমকালের পারিপার্শ্বিক প্রণোদনা যেমন রবীন্দ্রনাথের নাটকের বিষয় নির্বাচনে সক্রিয় থেকেছে তেমনি বিষয়নিষ্ঠ দর্শন তাঁর নাটকের আঙ্গিককে নির্দিষ্ট করেছে। আর সেই দার্শনিকতার বিচ্ছুরণ যখন নতুন আঙ্গিকের খোলামুখে ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে তখনই সঞ্চর ঘটেছে নতুন আবেদনের। যেন বক্তব্য একটি মুক্তির বার্তা নিয়ে ছড়িয়ে গেল এবং সেই বার্তা কোনদিকে কীভাবে ছড়িয়ে পড়ল তা জানার জন্য দর্শক বা পাঠকের মনে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলল নতুন করে। অনন্ত আকাঙ্ক্ষার শুরু হয় যেন রবীন্দ্রনাথের নাটকের যবনিকা পতনের সাথে সাথেই। অন্তত আলোচ্য নাটকগুলোর শেষ দৃশ্যের পর পরই যেন মন সতর্ক হয়ে ওঠে পরবর্তী ফলাফল জানার জন্য। অধুনাতর বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথের নাটকের এই সঞ্চরণ ক্ষমতাকে চিহ্নিত করা যেতে পারে

‘উত্তরকাঠামোবাদী বিনির্মাণসূত্র’ হিসেবে, যা একটি নাট্যকাঠামোর অভ্যন্তরে বিরাজ করে অশেষ কাঠামো কল্পনার সূত্রবিন্দু রূপে।

প্রামাণ্য বিষয়টি একটু সরল করে বলা যাক :

রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বেশি আলোচিত ও চর্চিত নাটকগুলো বিচিত্র বাণীভঙ্গিমায় সমৃদ্ধ। কিন্তু একটি ব্যাপারে মোটাদাগে নাটকগুলির মধ্যকার মিল খোঁজা সম্ভব যে, নাট্যকার প্রায় সব নাটকেই মুক্তির কথা বলেছেন। কখনও প্রচল সংস্কারের বন্ধন থেকে, কখনও সভ্যতার কুটিল ছোবল থেকে, কখনও ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে। এজন্য তিনি নাট্যিক দ্বন্দ্বের আয়োজন করেছেন এবং একধরনের ইতিবাচক সমাধানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। পক্ষ-বিপক্ষ শক্তির যুক্তি ও দর্শনের সমন্বয়ে তৈরি হওয়া সংলাপ থেকে একপ্রকারের সমঝোতামূলক, কখনও কখনও মানসলালিত স্বাপ্নিক প্রত্যয়ে স্থির থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করে নাটকে প্রদর্শন করেছেন বিস্ময়কর ‘সম্মুখিত্য’ (Sublimity)। কিন্তু বর্তমান নিবন্ধে আলোচ্য নাটকগুলোতে তিনি শুধু সম্মুখিত্যে পৌঁছে স্থির থাকতে পারেননি। তিনি চঞ্চল হয়ে ভবিষ্যতের পানে ছুটে চলতে চেয়েছেন। এজন্য নাটকের প্রথাগত মীমাংসিত দৃশ্যের আগেই দ্বন্দ্বিক চরিত্রগুলোকে ভবিষ্যতের দিকে বাহিত করেছেন। বিসর্জনের রঘুপতি অপর্ণার আহবানে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরকেন্দ্রিক ক্ষমতার পরাজয় শেষে নবলব্ধ বিশ্বাসে ভর করে কোথায় চলে যায়, অন্ধকারের রাজা আসেন আলোকে, আলোর মতো বিস্তৃতি পায় রাজার মাহাত্ম্য, রঞ্জন আত্মত্যাগ করে, ভেতরে ভেতরে ফেঁপে থাকা অস্থির রাজা নতুন আলোর উদ্ভাসনে নন্দিনীর হাত ধরে প্রান্তর অভিযুখী হয়, পঞ্চকের উচ্ছ্বাসে গুরুর সহমত প্রকাশে ভেঙে যায় সহস্র অযুত বছর ধরে গড়ে ওঠা অচলায়তনের সীমানা, মুক্ত জলের ধারা যন্ত্রের বন্ধন ভেঙে ছুটে চলে আপন গতিতে। আলোচনার এ পর্যায়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত^{৩৪} নাটকগুলোর শেষ দৃশ্যে আলোকসম্পাত করতে চাই।

বিসর্জন

পুত্রপ্রতিম জয়সিংহের আত্মদানের মাধ্যমে যখন ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠালিস্তু রঘুপতির আত্মিক উত্তরণ ঘটল তখন অপর্ণা পিতা বলে ডাকায় তার ভেতরে ক্রিয়াশীল হল পিতৃত্ববোধ। মানবিক আবেদনের এই যে উদ্বোধন তাতেই মন্দিরের মোহ কেটে গেল তার, দেবী হলো রাক্ষুসী, পাথরের দেবী-মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হলো অন্তরে। এবং কল্পনা করা অসম্ভব নয় যে অতঃপর রঘুপতি অপর্ণার ডাকে সাড়া দিয়ে মন্দির ছেড়ে চলে যেতে সক্ষম হলো। যবনিকা পতনের পূর্বমুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ অপর্ণার কণ্ঠে ইঙ্গিতপূর্ণ আহ্বান জুড়ে দেন রঘুপতির প্রতি— “পিতা, চলে এসো।”^{৩৫}

রাজা

ক্ষমতা-দম্ভী সকল রাজার পরাজয়ের পর আত্ম-উন্নীলন ঘটেছে রানি সুদর্শনার। সুরঙ্গমা-ঠাকুরদার মতো সেও রাজাকে এখন অনুভব করতে পারছে। আলোতে রাজার অস্তিত্ব দেখার ভ্রান্তি দূর হয়েছে তার, এখন অন্ধকার ঘরে বাক্যালাপ হচ্ছে তার রাজার সঙ্গে। রূপের কদর্য ভুলে রাজাকে সে মেনে নিয়েছে অনুপম হিসেবে। এখন দ্বন্দ্বের অবসান। কিন্তু রাজা বেরিয়ে আসতে চান আলোর দুয়ারে। রাজা বলেন— “এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম, এখানকার লীলা শেষ হল। এসো, এবার আমার সঙ্গে এসো, বাইরে চলে এসো, আলোয়।”^{৩৬}

অচলায়তন

স্থবিরকদের অচলায়তন ভেঙে দিয়েছেন গোঁসাই ও দাদাঠাকুর নামে পরিচিত অচলায়তনের গুরু। অচলসমান বিধিবাধ্যকতার আয়তনে তিনি মুক্তির বায়ু বইয়ে দিয়েছেন দর্ভকদল ও শোণপাংশুদের নিয়ে। নিজের ধ্যান বা দর্শন বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিয়ে নিজেই কর্মীরূপে কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। পঞ্চক, শোণপাংশু, দর্ভক প্রভৃতি, যারা অচলায়তনের বিবেচনায় অশুচি, তাদের গ্রহণ করেছেন কর্মী হিসেবে। আয়তনের পুরনো কাঠামো ভেঙে নতুন কাঠামো গড়ার নির্দেশনা দিয়ে নিজের কর্মীদের বলছেন— “আমাদের পঞ্চকদাদার সঙ্গে মিলে ভাঙা ভিতের উপর আবার গাঁথতে লেগে যেতে হবে।” দুইটি বিভক্ত দলকে একত্রিত হয়ে নতুন সৌধ গড়ার আহ্বান জানিয়ে বলছেন, “মেলো তোমরা দুই দলে, লাগো তোমাদের কাজে।”^{১৭}

মুক্তধারা

যুবরাজ অভিজিতির আত্মদানের মাধ্যমে বিভূতি নির্মিত বাঁধ ভেঙে যায়, উল্লসিত জলের ধারায় মিশে যায় যুবরাজ। সন্দেহ নেই যে, অন্তর্লালিত মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই অভিজিৎকে প্রণোদিত করেছিল আত্মদানে। ফলে দৃশ্যত অভিজিৎ অস্তিত্বলুপ্ত হয় কিন্তু গভীরার্থে সে মুক্ত জলের সাথে ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। ক্ষমতার কাঠামোতে থেকেও অভিজিতির এই যে নতুন কাঠামোভুক্তি তা একপ্রকার মুক্তির— ই নামান্তর। ফলত, হারিয়ে ফেলেও ভিন্নরূপে এ যেন অভিজিৎকে ফিরে পাওয়াই। তাই গণেশ যখন আফসোস করে বলছে, “যুবরাজকে আমরা খুঁজতে বেরিয়েছিলুম; তা হলে কি আর পাব না!” তখন ধনঞ্জয় মন্তব্য করছে— “চিরকালের মতো পেয়ে গেলি।”^{১৮}

রক্তকরবী

রঞ্জনের সর্বসম্পত্তি ভাঙনে-প্লাবনে যক্ষপুরীর মতো ভেতরে ভেতরে ভেঙে গেছেন স্বয়ং মকররাজ। সর্দারের দল যক্ষপুরীর বিধিকাঠামো আঁকড়ে ধরে রাজাকেও ভাবছে শত্রু। এই বন্ধনে বহুদিন যাবত হাঁসফাঁস করতে থাকা রাজা এই পর্যায়ে পেয়েছেন মুক্তির আলোকের সন্ধান। তিনি চিনতে পেরেছেন নন্দিনীর আলোকোপম মহিমা। তাই নিজেই বেরিয়ে যেতে চাইছেন স্বসৃষ্ট আবদ্ধতা থেকে। সেক্ষেত্রে সহযোগিতা চাইছেন নন্দিনীর। তাই নন্দিনী যখন জিজ্ঞেস করে “কোথায় যাব?”, তখন সে বলে, “আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারই হাতে হাত রেখে। বুঝতে পারছ না। সে লড়াই শুরু হয়েছে। এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেলো ওর কেতন। আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক সম্পূর্ণ মারুক, তাতেই আমার মুক্তি।” কর্মসত্তার মধ্যেই তিনি নিজের মুক্তি খুঁজে পেয়েছেন বলে যক্ষপুরী থেকে বের হতে চান, একজন কর্মীর তো অনেক দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালনের জন্যই তিনি আলোর শিখা হিসেবে পাশে চান নন্দিনীকে। তাই তাকে আহ্বান জানিয়ে বলেন— “এখনো অনেক ভাঙা বাকি। তুমিও তো আমার সঙ্গে যাবে নন্দিনী, প্রলয়পথে আমার দীপশিখা?” নাটকের অন্তিম সংবাদে ফাগুলালের কণ্ঠে জানা যায় রাজা পুরী ছেড়ে মৃত্যুমুখে মুক্তি কিনতে নন্দিনীর সাথে বেরিয়ে গেছেন পথে।^{১৯}

জিজ্ঞাসা হচ্ছে কেন এমন করেন রবীন্দ্রনাথ? নিজের মুক্তির দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করে নাটকের সবচেয়ে সক্রিয় (Active) চরিত্রগুলোকে বাইরে নিয়ে আসেন কেন? নিজের দর্শনকে প্রচার বা চর্চার জন্য? এই দর্শনে বিশ্বাসবদ্ধ চরিত্রগুলো অপরাজিত সত্তার সমুন্নতি দেখাবার জন্য? নাকি তিনি রেখে দেন কোনো যোগসূত্র ভবিষ্যতের সঙ্গে। তাই একটি ভবিষ্যতমুখী যাত্রার সূত্রপাত

ঘটান? এটা কি সেই রবীন্দ্রনাথের যাত্রা, যে রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যায় কবিতায়-গল্পে- উপন্যাসে কিংবা শেষ দিকে বিশ্বসংকটচিন্তক রবীন্দ্রনাথে?

এটা কি রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক প্রত্যয়ের মুক্তির পথে যাত্রা নাকি নাটকের আঙ্গিক ও পরিবেশন ভাবনায় প্রচলিত ধারা থেকে মুক্তি-অভিপ্রায়ী রবীন্দ্রনাথের একটি কাঠামো থেকে বের হয়ে ভিন্নকল্প-কাঠামোর দিকে যাত্রা? রবীন্দ্রনাথ কার্যত এই 'দ্বৈতে' 'অদ্বৈত'^{২০}, অর্থাৎ দুয়ের অভিন্ন কায়া নির্মাণ প্রয়াসী। ভেতরের ভাবকে সায়ুজ্যপূর্ণ আঙ্গিকে এনেই নিহিত এষণার প্রকাশকে করতে চান বেগবান। এই নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের যাত্রা তাই ভবিষ্যতমুখী। প্রবন্ধকার বলতে চান মুক্তিতে আস্থা ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ মুক্তির দর্শনে আস্থা রেখেছেন এবং আলোচ্য নাটকগুলোকে দিয়েছেন বন্ধনহীন গ্রন্থ।

মুক্তির দর্শনে আলোড়িত রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর রচনার প্রতিটি শাখায়ই দৃশ্যমান; কিন্তু পরস্পর বিরোধী সংলাপে ধীরে ধীরে 'দ্বিবাচনিক'^{২১} (Dialogic) রবীন্দ্রনাথের পরিচয় একমাত্র নাটকে পাওয়া যায়। ইতি-নেতির দ্বন্দ্ব প্রতিটি নাটকেই তিনি ইতিবাদী; কিন্তু আলোচনাত্মক পাঁচটি নাটকে রবীন্দ্রনাথ কর্মী ও শিল্পীসত্তা একযোগে প্রকাশিত।

যে মুক্তির দর্শনে তিনি আলোকিত, সেই প্রাণালোকে তিনি রাঙাতে চান শিল্পের বন্দ্যাদশাকেও। ফলে এই নাটকগুলোতে রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যায় প্রচলবন্ধনে কাহিনি সীমিত রেখেও ভবিষ্যতের সাংগঠনিক শক্তির বীজ তিনি উণ্ড রাখেন। কার্যত একটি প্রকল্পনা করা সঙ্গতভাবেই আবশ্যিক হয়ে যায় যে রঘুপতি ও অপর্ণা নিজেদের অবস্থানগত যে শক্তিমত্তার পরিচয় যে দ্বন্দ্ব রেখেছে এবং বিমোক্ষণ (Catharsis) লাভ করেছে তার রেশ চলমান হয়েছে ভবিষ্যৎপানে। একই ভাবে রাজা, রক্তকরবী, অচলায়তন, মুক্তধারা প্রভৃতি নাটকে। যে চেতনাবীজ তারা নাটকের ঘটনাসমূহে উণ্ড করেছে সেই চেতনা বিস্তৃত হতে থাকে ভবিষ্যতের পানে। ফলে উত্তরকাঠামো (Post-structure) প্রণয়নের সুযোগ তৈরি হয়ে যায়। ওই চরিত্রগুলো সংস্কারের পক্ষে বিপক্ষে যে অভিজ্ঞানে আন্দোলিত হয়েছে, যেন তা চলমান রাখার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাদের পথে নামিয়েছেন; যেন যে কোনো আমূল সংস্কারের বিপরীতে নাটকগুলো ভবিষ্যতপ্রবাহী ঐতিহ্য-শক্তি হিসেবে চিরকালীন মর্যাদা লাভে সমর্থ হয়।

দেশ-কাল-মৃত্তিকায় শেকড় প্রোথিত করে যে লৌকিক ঐতিহ্য গড়ে ওঠে তাতে তার অতীত ক্রিয়াশীল থাকে প্রণোদনা হিসেবে। সেই প্রণোদনাসূত্র থেকেই উত্তরকাল গ্রহণ করে সঞ্জীবনী সুধা। তবে সেই সুধাপানের পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেয় সমকাল। অতীতকে বিনির্মাণ করা যায় বর্তমানের ভাষায়; যদি সেই অতীত মানুষের জীবনের চিরকালীন প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত পাঁচটি নাটকের প্রসঙ্গ বিশ্ব-বিস্তৃত মানবপ্রবাহের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে চিরকালীন”^{২২}

এ-কারণেই একজন লেখকের রচনাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডি থেকে বের করে এনে চিরকালীন করে তোলা সম্ভব। লেখক তো তাঁর রচনার অন্তঃস্থিত বহুকৌণিক ব্যঞ্জনা বিস্তৃতপটে ছড়িয়ে দেবার আকাঙ্ক্ষা থেকেই নির্মাণ করে যান স্থায়ী শিল্প। উত্তরকালের পাঠক-সমালোচক ও চর্চাকারীদের কর্তব্য সেই বহুস্তরের সূত্র সন্ধান করে সমকালীন পাঠ নির্মাণ করা। অন্তত উত্তরকাঠামোবাদী বিনির্মাণ প্রয়াসী যারা তাদের অদ্বিতীয় অন্বেষণ তা-ই।^{২৩}লেখককে, লেখকের রচনাকে একটি আধিপত্যবাদী ধারণার খোলসে আটকে রাখার অধিকার নেই কারোর-ই। রচয়িতার প্রচলিত সত্তার

মৃত্যু হলেই সম্ভব নতুন জন্মপ্রাপ্তি; আর তাঁর সেই জন্মসূত্র তার রচনানিহিত স্বরের বহুস্তরিক ব্যঞ্জনা। নতুন কালের পাঠকই খুঁজে নেবে তার অস্বিষ্ট স্বর আর সেই স্বরের ভিত্তিতেই সে নতুনভাবে জন্ম দেবে লেখককে। তাঁর এই জন্ম হচ্ছে পুরনো সত্তার বন্ধন থেকে এক প্রকার মুক্তির নামান্তর।^{২৪}

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি মুক্তি পেয়েছেন? ভাবনালব্ধ বিষয়কে প্রকাশের ভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত করে তিনি যে নাট্য রচনা করেছেন, পরবর্তীকালে তার কি কোনো নতুন ভাষ্য রচিত হয়েছে? নাটকের মধ্যে তো সুযোগ রেখেছেন যথেষ্ট; উপরন্তু ক্রিয়াশীল চরিত্রগুলোকে একটি সিদ্ধান্তে মীমাংসিত করে উদ্বোধিত চিত্র নিয়ে নাটকের আঙিনা থেকে প্রান্তরের অভিমুখে চালিত করেছেন। তাঁর চেতনাবাহী চরিত্রগুলো কি তবে একটি নির্দিষ্ট কালখণ্ডে আটকে পড়েছেন যে বর্তমানের কোনো আদলে তার পরিচয় পাওয়া যায় না। সভ্যতার গূঢ়তম জিজ্ঞাসার সঙ্গে লড়াই করে বিজয়ীর বেশে তারা কি বর্তমানকে ছুঁবে না? ইতিহাস তো চিরকাল বর্তমানের সাথেই ধাবিত হয়। তবে সেই উদ্বোধিত চরিত্রগুলোর সমকালীন রূপান্তর, সমকালীন চর্চায় কোথায়? রবীন্দ্রনাথের দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা কি নাকচ করে দিচ্ছে বর্তমান কাল? যদি না দেয় তবে তার যথার্থ অনুশীলন হলো কবে, কোথায়? যদি না হয়ে থাকে তবে রবীন্দ্রনাথ এখন এই উত্তরাধুনিককালে কীভাবে বিবেচ্য?

বাংলাদেশের তথা ভারতীয় থিয়েটারগুলোতে যে সর্বদা মান্য-গুরুবাদী শুদ্ধতা রক্ষা করে রবীন্দ্রনাট্যের চর্চা করা হয়, তাতে কি সেই নাট্যমুক্তির চিন্তা পরিলক্ষিত হয়? কেন যে কোনো সময়ের পরিশ্রেক্ষিতে রচিত হয় না রবীন্দ্রনাট্যের নতুন টেক্সট, নতুন ভাষ্য? এই খোলস থেকে বেরিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথকে দিতে হবে মুক্তি, ‘বহুঙ্গামী’র পর যে চেষ্টা ইতোমধ্যেই পরিলক্ষিত হয়েছে হেইল্লাম কানহাইলালের ‘ডাকঘর’ নাটকের মধ্যে, বাংলাদেশের সৈয়দ জামিল আহমেদের ‘শ্যামার উড়াল’-এর মধ্যে, প্রাচ্যনাট্যের ‘রাজা ও অন্যান্য’ এবং মহাকাল নাট্য সম্প্রদায়ের ‘নিশিমন বিসর্জন’ প্রযোজনায়, কলকাতায় প্রয়াত ঋতুপর্ণ ঘোষের চলচ্চিত্রে, আধুনিক বাদ্যে রবীন্দ্র সঙ্গীতে।^{২৫} আর সেই মুক্তিদান-ই হবে মুক্তির দর্শনে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথের ললিত মুক্তি।

রবীন্দ্রনাথকে এভাবে ভাবতে গেলে আমাদের প্রধানত বাধা আসে কোথেকে? একটা ভাববাদী কাঠামোর ভেতরে রবীন্দ্রনাথকে আবদ্ধ রেখে দিয়েছি বলে? আমরা আটকে রাখার কে? শিল্পী সৃষ্টি করেন একপ্রকার মুক্তির প্রত্যাশাকে মূলীভূত রেখেই। তাহলে রবীন্দ্রনাথকে আমরা একটা স্থির কাঠামোয় বেঁধে রাখছি কেন? তাকে একটি নির্দিষ্ট চর্চা-কাঠামোয় আবদ্ধ করাটা তো তার স্বভাববিরোধী ব্যাপার এবং আমরা বহুকাল ধরে সেটাই করে চলেছি; ফলে শুদ্ধতার নির্বাণবোধ থেকে আমরা রবীন্দ্রনাথের নাটক দেখে যতটা আত্মার মুক্তি লাভ করছি; মুক্তি দিয়ে নিজেই ততটা পূজার জালে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের বিশেষ তাৎপর্যবহ নাটকগুলোকে প্রচলিত সমালোচনার ভাষ্যকাঠামোয় রূপক প্রতীকে ও সংকেতের বন্ধনে যেভাবে আবদ্ধ করা হয়েছে সেটাও একপ্রকারের বাধা^{২৬}; তত্ত্বকে নাটক নাট্যকারের অভিপ্রায়বশত অন্তরে ধরে রাখতে পারে। কিন্তু কোনো নাট্যকারই কি শুধু তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নাটক লেখেন? তিনি তো মাত্র নিজের মনের পটে ভেসে ওঠা দৃশ্যগুলোকে বা ভাবনাগুলোকে কথামালা বা সংলাপের ‘দ্বিবাচনিকতা’য় মূর্ত করে তোলেন^{২৭}। সেক্ষেত্রে তত্ত্ব বা মূল বিষয় যদি আয়োজনের আতিশয্যে ঢাকা পড়ে যায় তবে সমালোচকের কাজ সেই আব্রু সরিয়ে দিয়ে নতুন অর্থকে সম্পাদন করে নতুন প্রসঙ্গকে অন্তর্ভুক্ত করা^{২৮}। তাই রূপক কীভাবে হলো, বা কী সংকেত

কবি তার রচনার মাধ্যমে দিয়েছেন এবং বর্তমানকালের কোন প্রসঙ্গের সঙ্গে তার প্রাসঙ্গিকতা বিদ্যমান সেই সত্য আবিষ্কার করে নাটকের উৎকর্ষগুণ প্রধান করে নাটকের বর্তমানকালীন রূপ নির্দেশ করাই সমালোচক বা গবেষকের দায়িত্ব। নিহিত ভাবনার সাংকেতিক ব্যঞ্জনা পরিষ্কার করেই নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করা উচিত, নচেৎ নাট্যমাহাত্ম্য ঢাকা পড়ে যায় শিল্পীর মাহাত্ম্য আবিষ্কার করতে গিয়ে।

তাই আমাদের আজকে দাঁড়াতে হবে এমন একটি জায়গায় যেখানে একটি দ্বন্দ্বিক পদ্ধতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মনোলালিত ঈঙ্গাকে গুণগত পরিবর্তন সাধন করবে। সময়-সমাজের ধরন থেকেই উত্তরোত্তর রবীন্দ্রস্বর ঘনীভূত হবে, তার স্বরের মাত্রায় কালগত প্রণোদনা ঘটবে, তাঁর একস্তরিক বাক্য সময়ের প্রবহমানতায় লাভ করবে বহুস্বরের যোগ; গড়ে ওঠা পুরাণোপম ভক্তিবাদের দেহ ক্ষয় হয়ে বস্তুসংঘর্ষে লাভ করবে কালবাহিত গুণগত পরিণতি।

রবীন্দ্রনাথ সেটার সুযোগ-ই রেখে দিয়েছেন আলোচ্য নাটকগুলোতে। সভ্যতার প্রতিটি স্তরে যেমন ছিলো মত ও কর্মের দিক থেকে দুটি স্বতন্ত্র দলের দ্বন্দ্বপরায়ণ মানুষ, তেমনি নাটকগুলোতেও তিনি উপস্থিত করেছেন দ্বন্দ্বিক অবস্থানে দাঁড়ানো দুটি পক্ষকে। দ্বন্দ্বিক রূপের ক্রমবিকর্ষণে যখন কোনো পক্ষের প্রতিরোধ ভেঙে যায়, শক্তি বিবেচনার সাথে শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করে বিজিত পক্ষ জয়ীর পক্ষে হাল ধরে^{১৬}, তখন দুই প্রতিভূর মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়; উভয়েই পৌঁছে যায় নাটকের সমুন্নত লোকে, তখন নাটকের পর্দা নামে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এমন এক ইঙ্গিত রেখে দেন, দ্বন্দ্বিক দুই পক্ষের শক্তি সম্মিলিতভাবে এমন করে জড়ো করেন, যখন মনে হয় এখনই সম্ভব নতুন কিছু প্রতিষ্ঠা করা। জমে ওঠা শক্তিকে রবীন্দ্রনাথ চলমান (Active) দেখাতে চান; ফলে আপাত সমাপ্ত নাট্য-ঘটনার পরবর্তী অংশে কল্পনার ঝাঁক চলে আসে; আমরা দৃষ্টিহার্য ভাগ্যপীড়িত ওইদিপৌসের এরপর কী হবে জানতে চেয়ে যেমন সফোক্লিসকে দিয়ে আর দুটি নাটক লিখিয়ে ওইদিপৌসের মৃত্যু-পরবর্তী তার কৃত পাপের মোচন হতে দেখি; তেমনি আমরা রাজা আর নন্দিনীর পরবর্তী অংশ ভাবতে উন্মুখ হই।

অর্থাৎ আমরা ভর করছি ওই সূত্রের শক্তির ওপর যাদের তিনি শক্তসমর্থ ও দ্বন্দ্ব-উত্তীর্ণ বলে প্রমাণ করেছেন ইতোমধ্যে এবং একটি চলমান ভঙ্গিমায়ে কার্যকর রেখেছেন। 'বলাকা'র^{১৭} কবি এর মধ্যেই ইঙ্গিত দিয়েছেন সামনে চলার। সেই সামনে চলেই রবীন্দ্রনাথকে শুদ্ধতাবাদী অতীতচারী ঐতিহ্য থেকে মুক্তি দিতে হবে; মুক্তধারার মতো প্রবাহিত করতে হবে চেতনার স্রোত। বাঙালির ঐতিহ্যের একটি সংহত সূত্র মেনেই তৈরি করতে হবে তাঁর নাটকগুলোর নতুন পাঠ। পরিবেশনে সমকালের ছাপ দিয়েই তাকে করতে হবে সমকালীন। সমকালীন সংস্কৃতির বহুকোণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আনতে হবে প্রাসঙ্গিকতা। তাতেই হবে রবীন্দ্রনাটকের বিনির্মাণ, রচিত হবে উত্তরকালের নতুন কাঠামো।

উত্তরকাঠামোবাদী বিনির্মাণ সম্ভব বলেই আজকের দিনের বাঙালির চেতনাগত মূল দ্বন্দ্বের জায়গায় রঘুপতি হয়ে দাঁড়ায় ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক চরিত্র, অপর্ণা, সুরঙ্গমা, নন্দিনীর কণ্ঠস্বর প্রতিবাদের ভাষা হয়ে ঝরে অপরূদ্ধ নারীর কণ্ঠে, বিভিন্ন স্বাধীনচিন্তার লেখক ধর্মীয় অপঘাতে অনেকটা জয়সিংহের পরিণতি লাভ করেন; স্ত্রীর জ্ঞানান্ধতায় নীতির পক্ষে থেকেও গোবিন্দমাণিক্যের মতো নানা বাধাদীর্ঘ আজকের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রকগণ। তিস্তা নদীর বাঁধ-ভাবনা কিংবা বিশ্বের তাবৎ নদী রাজনীতির চিত্র ধরা পড়ে যায় মুক্তধারায়; সংস্কারের অচলায়তন তো বাংলাদেশের সর্বত্র দৃশ্যমান।

এখন কেন্দ্র আর প্রান্তের মিলনের জন্য একজন নন্দিনী আর মর্কটরাজের অপেক্ষা। অপেক্ষা যতদিন ফুরোবে না, ততদিন রবিনাটোর ভাঙন চলুক; নাটকের অন্তর্নিহিত মুক্তির বার্তাটা রবিপুজার শুদ্ধতাবোধ থেকে পৃথক হোক; সে আঙুন ছড়িয়ে পড়ুক সবখানে।

উত্তরাধুনিক দৃষ্টিতে আধুনিকতা ক্লাসিক, আর ক্লাসিক মানেই ফরমাল কাঠামোর প্রতি ঝোঁক। যে উপনিষদকে বুকে নিয়ে উনিশ-বিশ শতকের আধুনিকতায় রবীন্দ্রনাথ নবনির্মাণ করেছেন প্রাচীনকে, মুক্তির অন্তর্গত সুন্দর শিবের তুলনায় কাঠামোবদ্ধ ধ্যানকে ভেঙেছেন নাটকে, যিনি আধুনিকতাকে সময়ের মর্জি বলে বিশ্বাস করতেন, সেই রবীন্দ্রনাথকে পুনরায় উপনিষদিক শুদ্ধতায় কাঠামোর অন্তরালবর্তী করে পাঠ করা এবং নবপাঠের সম্ভাবনাকে নাকচ করার অহমিকাসিক্ত ভঙ্গিটি অন্ধতার আরেক নাম। সেই অন্ধতা থেকে রবীন্দ্রনাথ মুক্তি পান— আমাদের প্রত্যাশা এই।

তথ্যপঞ্জি ও টীকা

১. রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তার যে পরিচয় বাংলা শিল্পলোকে প্রতিষ্ঠিত, ‘গুরুদেব’, ‘কবিগুরু’ ইত্যাদি অভিধায় রবীন্দ্রনাথকে চিহ্নিত করার যে প্রচলপ্রবণতা পরিলক্ষিত, তাতেই তাঁর অভ্যন্তরীণ ধ্যানীসত্তার উপস্থিতি রয়েছে; অন্যত্র স্বদেশ, সংস্কৃতি বিষয়ক ভাবনা, সেই ভাবনাকে কর্মে প্রতিষ্ঠার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের কর্মীসত্তার বিচরণ লক্ষণীয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে সংযোগ, প্রজা হিতৈষণায় নিজের জমিদারিতে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি কিংবা নাট্য-সঙ্গীত-চিত্র চর্চায় অথবা শান্তিনিকেতনের মতো প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় কর্মীপুণের পরিচয় মেলে।
২. তৎকালীন সামাজিক-ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ভাবনা নিয়ে জনমানসে যে প্রত্যয়সমূহ সংস্কারের মতো শেকড় গেড়েছিল, তাঁর রচনাসমূহে সেই মূলীভূত সংস্কারের বিরুদ্ধে স্বরের প্রকাশ ও বিকাশ লক্ষণীয়। সেই সঙ্গে অবশ্যই ধর্তব্য রবীন্দ্র-সমকালে রবীন্দ্র সাহিত্যের বিরোধী মনোভাবের একটি প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর কার্যক্রম।
৩. “রবীন্দ্রনাথের উপরে উপনিষদের প্রভাব সর্বজনবিদিত। এ সত্য স্বতঃপ্রকাশ, কোনো প্রমাণ প্রয়োগের অপেক্ষা রাখে না। একেবারে প্রথমযুগের কাব্য-কবিতা-সঙ্গীত ও গদ্যরচনা হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের লেখা পর্যন্ত সব লেখার মধ্যেই এই সত্যের পরিচয় আছে। কোথাও একটু গূঢ়, কোথাও ঈষৎ রূপান্তরিত, কোথাও একেবারে স্পষ্ট।” - শশিভূষণ দাশগুপ্ত, উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্র-মানস (কলিকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১
৪. আবু সয়ীদ আইয়ুব, আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ (কলিকাতা: ছে'জ পাবলিশিং, ২০০৩), পৃ. ৮২
৫. সুদীপ্তা তরফদার, রবীন্দ্রনাটকের অন্যভাবন (কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ) পৃ. ১৭
৬. সবিস্তার আলাপসূত্র: হরীন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ও সাধারণ নাট্যশালা (কলিকাতা: টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট ১৯৮৩)
৭. “আমাদের দেশের যাত্রা ঐ জন্য আমার ভাল লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহজতার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে। বাক্যরস, যেটা আসল জিনিস সেইটেই অভিনয়ের সাহায্যে ফোয়ারার মত চারিদিকে দর্শকদের পুলকিত চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে।”- সবিস্তার আলাপসূত্র: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রঙ্গমঞ্চ, বিচিত্রপ্রবন্ধ, <https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/7660>
৮. ১৩৩১ বঙ্গাব্দে লিখিত এবং বৈশাখ ১৩৩২এর ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত অভিভাষণ। এটিই পরবর্তীকালে ‘রক্তকরবী’ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ‘প্রস্তাবনা’ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।
৯. সুদীপ্তা তরফদার, রবীন্দ্রনাটকে দেশীয় নাট্যরীতির সন্ধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

১০. রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন এমন কোনো গড়ন, যা পশ্চিমের অন্ধনবিশিষ্ট নয়, যার মধ্যে ধরা পড়বে আমাদের জীবন-যাপনের বিশেষ মুদ্রাটি।... রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভারত আবিষ্কারের পথ থেকে বুঝে নিয়েছিলেন আমাদের অন্তঃশীল এক দেশীয় স্বভাব, বারে বারেই তাঁকে ভিন্নতা বুঝে নিতে হচ্ছিল ইউরোপীয় আর ভারতীয় প্রকৃতির ইউরোপীয় আর ভারতীয় ইতিহাসের। এই ভিন্নতা থেকেই তিনি বুঝে নিতে চেয়েছিলেন গানে বা নাটকে ভারতের নিজস্ব আত্মপ্রকাশের ছাঁচটি,... এই ভাবনার অনুকূলেই এক দেশীয় নাট্যরীতি গড়ে নিতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর নাটকচর্চা এক পরোক্ষ ভারতচর্চা।”- শঙ্খ ঘোষ: ‘আরোপ আর উদ্ভাবন’ গ্রন্থভুক্ত ‘বহুপীঠ রবীন্দ্রনাথ’- শীর্ষক প্রবন্ধ, দ্বৈতীয়িক সূত্র: সুদীপ্তা তরফদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
১১. সবিস্তার আলাপসূত্র: শঙ্খ মিত্র: বাংলা থিয়েটার, *সম্মার্গ সপর্ষা* (কলকাতা: এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি. ১৪০৮)
১২. শঙ্খ ঘোষ: *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮৫) পৃ. ১১৭
১৩. শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়ের মুক্তি প্রসঙ্গে নির্দেশনামূলক মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন- “নবীনতার দিকে এগিয়ে যাবার জন্যই কখনো হয়তো ভেঙে দিতে হবে অভিনয়ের অতিমায়া, স্বাভাবিকের সর্বশ্রাসী দাবি, নইলে প্রায়ই আমরা থমকে দাঁড়াব কেবল শৌখিনতার বহিদুয়ারে! অন্তত রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় যে অভিনয়-রীতি ছিল তার ইঙ্গিত এই ভাঙার দিকে।” - শঙ্খ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯
১৪. নাটকগুলোর প্রকাশক্রম নিম্নরূপ:
বিসর্জন ১৮৯০(১২৯৭ বঙ্গাব্দ), *রাজা* ১৯১০(১৩১৭ বঙ্গাব্দ), *অচলায়তন* ১৯১১(১৩১৮ বঙ্গাব্দ), *মুক্তধারা* ১৯২২ (১৩২৯ বঙ্গাব্দ), *রক্তকরবী* ১৯২৬ (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)।
১৫. *বিসর্জন*, পঞ্চম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য।
১৬. *রাজা*, ২০ সংখ্যক দৃশ্য (অন্ধকার ঘর)।
১৭. *অচলায়তন*, ৬ সংখ্যক দৃশ্য (দর্ভকপল্লী)।
১৮. *মুক্তধারা* (কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৭৭
১৯. *রক্তকরবী* (কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১০৬, ১০৭ ও ১১১
২০. রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক চর্চিত ভারতীয় দর্শনবিশেষ (সীমার মাঝে অসীম)। যা পরবর্তীকালে নাট্যকার সেলিম আল দীন প্রমুখ বাংলাদেশের নাট্যকার-গবেষক ও শিল্পনির্দেশকগণ শিল্পের বিষয় ও আঙ্গিক ভাবনায় প্রয়োগ করেছেন। বহুত্বের সম্ভাবনা যেখানে একই আধারে ব্যঞ্জনাময়; অর্থাৎ বহু বা দ্বৈতের সঙ্গে যেখানে একত্ব বা অদ্বৈত কল্পনা করা হয়। রবীন্দ্রনাথের ‘বিসর্জন’ নাটক আলোচনা করতে গিয়ে আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর ‘পাহুজনের সখা’ গ্রন্থে প্রয়োগ দেখিয়েছেন এই তত্ত্বের। সবিস্তার আলাপসূত্র: আবু সয়ীদ আইয়ুব, *পাহুজনের সখা* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৪), পৃ. ১৪৭
২১. উপন্যাসের শিল্পরূপ নিয়ে বলতে গিয়ে রুশ শিল্পতাত্ত্বিক মিখাইল বাখতিন (১৮৯৫-১৯৭৫) কথিত শিল্পসূত্র-অন্বেষণ পদ্ধতি। ভাষামাত্রই একান্তরিক হতে পারে না। প্রত্যেক ভাষার প্রত্যেক শব্দের রয়েছে সাংগঠনিক উৎসভূমি। সেই উৎসের ও রয়েছে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত; তাই প্রত্যেক শব্দ বা যে কোনো মানুষের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলির রয়েছে একাধিক তাৎপর্যবাহী অর্থ। সেই হিসেবে তা বহুস্তরিক এবং দ্বিবাচনিক। [The term 'dialogic'... means that everything anybody ever says always exists in response to things that have been said before and in anticipation of things that will be said in response. In other words, we do not speak in a vacuum. All language (and the ideas which language contains and communicates) is dynamic, relational and engaged in a process of endless redescrptions of the world. - <http://en.wikipedia.org/wiki/Dialogic>]

২২. এতৎপ্রসঙ্গে বহুপূর্বে মুনীর চৌধুরী মূল্যবান মন্তব্য করেছিলেন। ‘মুক্তধারা’ নাটকের ভবিষ্যৎ তাৎপর্য নিয়ে তিনি লিখেছিলেন— “এসব দৃশ্যের আবেদন দেশকালের সঙ্গীর্ণ সীমা অতিক্রম করে বহু দেশের বহু চিত্তকে স্পর্শ করে। কৌতুকময় তীর্থক বাভঙ্গী বক্তব্যকে এমন একটা স্থিতিস্থাপকতা দান করেছে যে তার তাৎপর্য কালের ব্যবধান সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ বলে অনুভূত হয়। শিল্পীর বিদ্রূপের লক্ষ্য যেমন উত্তরকূট, তেমনি উত্তরকালের সমগোত্রীয় সকল রাষ্ট্রশক্তির কূটবুদ্ধিও বটে।” মুনীর চৌধুরী, *রবীন্দ্রনাথের নাটক : উপলব্ধির রূপান্তর রবীন্দ্রনাথ* (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৩২৮

২৩. এ প্রসঙ্গে উত্তরকাঠামোবাদী সমালোচক বা বিশ্লেষকের করণীয় সম্বন্ধে বিশ্বব্যাপ্ত নির্দেশনা নিম্নরূপ—

"A post-structuralist critic must be able to use a variety of perspectives to create a multifaceted interpretation of a text, even if these interpretations conflict with one another. It is particularly important to analyze how the meanings of a text shift in relation to certain variables, usually involving the identity of the reader (for example: class, racial, or sexual identity) - <http://en.wikipedia.org/wiki/Post-structuralism>

২৪. যেমন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর রবীন্দ্রনাটকের মার্কসবাদী বিশ্লেষণ। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *রবীন্দ্রনাটকে মুক্তির আকাজক্ষা ও বন্ধনের সত্য, প্রভাতসূর্য ভীষ্মদেব চৌধুরী সম্পাদিত* (ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০১১), পৃ. ৩০৫- ৩২৫

২৫. রবীন্দ্রনাথের এই সৃজনগুলোকে বর্তমানকালের শিল্পী ও শিল্প-নির্দেশকগণ গ্রহণ করেছেন ঐতিহ্য-সার (Assence of Heritage) হিসেবে। ঐতিহ্যের প্রসঙ্গগুলোকে বর্তমানে প্রাসঙ্গিক ভেবেই এর ভাষা বা ভঙ্গিমা বদলে দিয়ে নির্মাণ করেছেন নতুন করে। এ নিয়ে সমালোচনাও হয়েছে অনেক। অনেকে এটাকে নিয়েছেন ফিউশন বা মিশ্রণ হিসেবে। কিন্তু ফিউশনের মতো স্বল্পমাধ্যম্যে দেখলে এই নির্মাণকে ছোট করা হয়, অবজ্ঞা করা হয় নির্দেশক বা শিল্পীর আবিষ্কারকে। যেমন *নিশিমন বিসর্জন* নাটকের নির্দেশক মন্তব্য করেন:

“বিসর্জনের ধারণা যেকোন শিল্পীর জন্যই অতিক্রমণের উপায়। রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকের গল্প নাট্যমোদী দর্শকসমাজের কাছে অজ্ঞাত নয়। কিন্তু বিসর্জনের দর্শনে উদ্ভূত এক নাট্যকার যখন নতুন সম্ভাবনার গল্প রচনার অভিনিবেশ দেন তখন এটি শৈলীর দিক থেকে হয়ে ওঠে ইন্টারটেঞ্জুয়াল।”— আশিক রহমান লিয়ন, *নিশিমন বিসর্জন* নাটকের প্রচারপত্র।

২৬. যেমন প্রচলিত সমালোচনায় মঞ্জুশ্রী চৌধুরী তাঁর *রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩) বইতে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণায় রবীন্দ্রনাটককে বিচার করেছেন, আবার প্রতিষ্ঠানের বাইরে রবীন্দ্র-গবেষক প্রমথনাথ বিশী তাঁর *রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ* (কলিকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৬৬) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বিশেষ নাটকগুলোকে বলেছেন তত্ত্ব নাটক; আমাদের বিবেচনায় রবীন্দ্রনাট্যে এমন বিশেষণের অবলম্বন নাটকগুলোর নিহিত মাধ্যম্য উদঘাটনের পথে প্রাতিষ্ঠানিক বাধা।

২৭. সংলাপের দ্বন্দ্বিকতার (Dialectic) উর্ধ্বে অবস্থান ‘দ্বিবাচনিকতা’র (Dialogic)। রবীন্দ্রনাথ যখন দুটি ভিন্ন মতের (Thesis এবং Anti-thesis) দ্বন্দ্বপূর্ণ অবস্থিতি দেখিয়ে পরিশুদ্ধ কোনো পরিস্থিতি নির্মাণ করতে চান তখন তা ডায়ালেকটিক; কিন্তু আমরা যখন তাঁর ভাষার ভেতরের প্রণোদনা বা অন্তর্ভুক্তায়িত অর্থ বা নির্দেশনা বের করে আনতে চাই তখন তিনি হয়ে ওঠেন দ্বিবাচনিক (Dialogic)।

২৮. এখানেই অধুনাতর শিল্পসমালোচনা পদ্ধতি ‘বিনির্মাণ’ (Deconstruction) প্রসঙ্গ কার্যকর হবার সূত্র নিহিত। রোলাঁ বার্থ তাঁর ‘ডেথ অব দ্য অর্থ’ (১৯৬৭) প্রবন্ধে লেখকের মৃত্যু ঘটিয়ে নতুন নির্মাণের সূত্রে স্পষ্টভাবে বলতে চান— পাঠকের পাঠ-ই চূড়ান্ত। লেখক কোন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে রচনা করেছেন সেটা কোনো বিবেচ্য বিষয় নয় পাঠকের। পাঠক তার সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় কীভাবে লেখককে গ্রহণ করবে এবং কীভাবে তাকে পুনর্নির্মাণ করবে সেটা তার অর্থতিয়ায়ী। লেখক এখানে শুধুই পাণ্ডুলিপিকার (Scriptor) এবং উদ্ভূত পাঠক তার নতুন জন্মদানকারী। সেক্ষেত্রে এই পাঠকের মধ্যেই নতুন জন্মলাভ করবে লেখক। পাঠক-ই হয়ে উঠবে প্রাক্তনের উত্তর রূপকার।

২৯. রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য নাটকগুলোতে দ্বন্দ্ব অবতীর্ণ দুটি পক্ষের জয়ী ও বিজিত দলের একটি সারণি কল্পনা সম্ভব। যেমন:

নাটকের নাম	জয়ী	বিজিত
বিসর্জন	অপর্ণা, গোবিন্দমাণিক্য	রঘুপতি, গুণবতী
রাজা	রাজা	সুদর্শনা, কাঞ্চীরাজ প্রভৃতি
অচলায়তন	গুরু, পঞ্চক	মহাপঞ্চক প্রমুখ অচলায়তনবাসী
মুক্তধারা	অভিজিৎ	বিভূতি
রক্তকরবী	রঞ্জন, নন্দিনী, বিশু, ফাণ্ডলাল	মকররাজ, সর্দার প্রমুখ

নাটকগুলোতে উল্লিখিত দুটি দলেরই দ্বন্দ্ব প্রাধান্য পেয়ে নাট্যঘটনা এগিয়ে চলে, এক পর্যায়ে দ্বন্দ্ব শেষ হলে জয়ীর হাত ধরে বিজিত এগিয়ে যায় সামনের দিকে। যেমন- অপর্ণার হাত ধরে রঘুপতি, নন্দিনীর হাতে হাত মিলিয়ে মকররাজ, রাজার হাত ধরে সুদর্শনা।

৩০. ভবিষ্যৎপ্রবাহী রবীন্দ্রনাথের গতিদর্শন; যা বলাকা কাব্যকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। কালের প্রবন্ধনে স্থির থেকে চিহ্নের জড়তায় আটকে থাকা নয় বরং সামনের দিকে চলার প্রত্যয়ই এই দর্শনের মূল সূর। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়- ‘হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।’

জমা প্রদানের তারিখ : ১২.০৯.২০২৩

গৃহীত হবার তারিখ : ১৮.১১.২০২৩

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সম্মুখ সমর, গণহত্যা ও নির্যাতন: পরিপ্রেক্ষিত লক্ষ্মীপুর জেলা

শামছুল কবির*

Abstract

The main objective of the article is to find out the real scenario of the historical events of the liberation war of Bangladesh in 1971 in Lakshmipur district. This research also tries to find out the real facts of that historical events and the reasons behind the successful leadership of the sector commander during the war. As Lakshmipur is one of the significant districts in Bangladesh, the lack of attention of the academicians towards conducting research on the contribution of the district during the liberation war may lead the nation to the darkness of the history of the country. Therefore, the present research is justified towards contributing to the knowledge in the history of the liberation war of Bangladesh. The method applied in this research is descriptive. Moreover, the historical places were visited to find out the real scenario of those significant events stated in this article. This researcher finds that sixteen historical events of liberation war in Lakshmipur contributed a lot to change the history of the district and the Bangladesh as a whole. The article would be useful for the academicians, researchers, historians, students, and others as well.

চাবিশব্দ: মুক্তিযুদ্ধ, লক্ষ্মীপুর, পাকবাহিনী, রাজাকার, গণহত্যা, বাংলাদেশ

লক্ষ্মীপুর জেলা বাংলাদেশের ৬৪ জেলার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় লক্ষ্মীপুর জেলা নোয়াখালী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে নোয়াখালী জেলাকে ভাগ করে নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর নামে তিনটি জেলায় পরিণত করা হয়। লক্ষ্মীপুর জেলার মোট আয়তন ১৪৫৬ বর্গকিলোমিটার। বর্তমানে জেলাটি পাঁচটি উপজেলা নিয়ে গঠিত।^১ এ জেলা নদী বাহিত হওয়ায় মুক্তিযুদ্ধের সময় খুবই গুরুত্ব বহন করেছিল।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মহান মুক্তিযুদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ঘটনা। এই যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতকে বিভক্ত করে পাকিস্তান নামে আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম হয়। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে নানাবিধ বৈষম্য দেখা দেওয়ায় বাঙালির আশা ও স্বপ্ন ভেঙে পড়ে এবং এতদ্ব্যতীত জনগণের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তারই ফলশ্রুতিতে বাঙালি জাতির মধ্যে জাতীয়তাবোধের চেতনা এবং স্বাধীনতাবোধ জাগ্রত হয়। ফলে বাঙালি জাতির প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণে বাংলাদেশের মুক্তি ও স্বাধীনতার ডাক দেন।^২ তারই ফলশ্রুতিতে ২৫ মার্চ কালোরাত্রিতে পাকবাহিনীর বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের পরিপ্রেক্ষিতে ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

* অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়েই সমগ্র বাংলাদেশের ন্যায় লক্ষ্মীপুর জেলায়ও মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়।

উল্লেখ্য যে, মুক্তিযুদ্ধ সুচারু ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার সুবিধার্থে মুজিবনগর সরকার সমগ্র বাংলাদেশকে মোট ১১ টি সেক্টরে ভাগ করে এবং ২ নং সেক্টরের অধীনে লক্ষ্মীপুর জেলা অন্তর্ভুক্ত হয়।^{১০} এই সেক্টরের কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ (১৯৩৭ - ১৯৭৫) মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে এটিকে আরও ছয়টি সাব-সেক্টরে ভাগ করেন। সাব-সেক্টরগুলো ছিলো-১.গঙ্গাসাগর, আখাউড়া ও কসবা, ২. মন্দভাগ, ৩. শালদা নদী, ৪. মতিনগর, ৫. নির্ভয়পুর, ৬. রাজনগর।^{১১} উল্লেখ্য রাজনগর সাব-সেক্টরের অধীনে লক্ষ্মীপুর জেলা অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম (১৯৪৭ -) মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।^{১২} ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ মার্চের কালোরাত্রি তথা ২৬ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ঘোষণার ফলে ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম-এর নেতৃত্বে এই অঞ্চলের মুক্তিকামী জনগণ পাক-হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী (রাজাকার, আলবদর, আলশামস) এর বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রাম ও যুদ্ধ করে ১৯৭১ সালের ৫ ডিসেম্বর লক্ষ্মীপুর জেলাকে শত্রুমুক্ত করতে সক্ষম হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় লক্ষ্মীপুর জেলায় সংঘটিত উল্লেখযোগ্য ষোলটি যুদ্ধ, গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ অত্র প্রবন্ধে যথাসম্ভব সুনিপুণভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

মুক্তিযুদ্ধকালীন লক্ষ্মীপুর জেলায় সংঘটিত উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ, অপারেশন, গণহত্যা ও নির্যাতন ইত্যাদি ঘটনাবলি সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে গবেষণায় দুইটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

১. ঐতিহাসিক পদ্ধতি: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গ্রন্থাদি, পত্র-পত্রিকা, ব্যক্তিগত ডায়েরি, চিঠিপত্র, সরকারি দলিলপত্র ইত্যাদি।
২. পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি : লক্ষ্মীপুর জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, মুক্তিযোদ্ধা, সহযোদ্ধা, ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন স্থান, গণকবর, সমাধি, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি স্থান ও স্থাপনা অনুসন্ধান, সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি।

গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ্মীপুর জেলায় যারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন, মুক্তিকামী জনসাধারণের যুদ্ধকালীন অবস্থা, যুদ্ধের প্রামাণ্য চিত্র অনুসন্ধান ও উপস্থাপন ও যুদ্ধক্ষেত্র, বধ্যভূমি এবং গণকবরের স্থান চিহ্নিতকরণসহ প্রভৃতি ঘটনাবলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে লক্ষ্মীপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যার সঠিক এবং নির্ভুল ইতিহাস রচনা করে অবিকৃত ইতিহাস নব প্রজন্মের নিকট তুলে ধরাই আলোচ্য গবেষণার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

সাহিত্য পর্যালোচনা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রচুর লেখালেখি হয়েছে এবং বর্তমানেও এর উপর লেখা অব্যাহত রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতা হিসেবে লক্ষ্মীপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধ ও বিবিধ সম্পর্কে বিদ্যমান সাহিত্যের উপর পর্যালোচনা নিম্নে উপস্থাপিত হলো-

হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র* গ্রন্থটি তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঢাকা কর্তৃক ১৯৮২-৮৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র সংক্রান্ত লিখিত গ্রন্থের মধ্যে এই গ্রন্থটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য। উক্ত গ্রন্থটি ১৬ খণ্ডে বিভক্ত। এই গ্রন্থের ১ম ও ২য় খণ্ডে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম খণ্ডে মুজিবনগর সরকার, ৬ষ্ঠ খণ্ডে বাঙালি গণমাধ্যম, ৭ম খণ্ডে পাকিস্তানি দলিলপত্র, ৮ম খণ্ডে বিরোধীদের কর্মকাণ্ড, ৯ম, ১০ম ও ১১তম খণ্ডে সশস্ত্র সংগ্রাম, ১২তম ও ১৩তম খণ্ডে বিদেশিদের প্রতিক্রিয়া, ১৪তম, ১৫তম ও ১৬তম খণ্ডে বিশ্ব জনমত, সাক্ষাৎকার, ঘটনাপঞ্জি ও ছবিসহ অসংখ্য তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ম. নুরুল আলম রচিত *রামগতি দর্পণ* গ্রন্থটি রামগতি প্রকাশনী ১৯৯৮ সালে ঢাকায় প্রকাশ করে। লেখক উক্ত গ্রন্থে রামগতির বিভিন্ন দিক উল্লেখ করেছেন। যেমন রামগতির উপজেলার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। এমনকি একটি অধ্যায়ে রামগতির মুক্তিযুদ্ধের উপর সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেছেন। মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি লক্ষ্মীপুরের প্রেক্ষাপটে সামান্যই বলা যায়।

নাজিম উদ্দিন মাহমুদ রচিত *লক্ষ্মীপুর জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য* গ্রন্থটি গতিধারা ২০০৮ সালে ঢাকায় থেকে প্রকাশ করে। লেখক উক্ত গ্রন্থে লক্ষ্মীপুরের নামকরণ, ইতিহাস, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। একটি অধ্যায়ে লক্ষ্মীপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের উপর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন, যাহা খুবই অপ্রতুল।

মোঃ ফখরুল ইসলাম রচিত *বৃহত্তর নোয়াখালীর ইতিহাস* গ্রন্থটি আঞ্জুমান আরা বেগম ১৯৯৮ সালে নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিতে ভুলুয়া ও নোয়াখালীর নামকরণের ইতিহাস, বিভিন্ন সময়ের বাংলাদেশ ও নোয়াখালীর রাজনৈতিক ঘটনাবলী, নোয়াখালী সৃষ্টির ইতিহাস ও নোয়াখালীর সার্বিক বিষয়াদি বর্ণনা করা হয়। এবং উক্ত গ্রন্থটিতে লক্ষ্মীপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সংক্ষিপ্ত একটি অধ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

মুক্তিযুদ্ধের অনেক গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা, অহংকার, মহিমা ও বীরত্বগাঁথায় পরিপূর্ণ লক্ষ্মীপুর জেলা। ইতিমধ্যে বিভিন্ন লেখক ও গবেষকগণ মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় ও আঞ্চলিক বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন এবং গ্রন্থও রচনা করেছেন। তথাপি লক্ষ্মীপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তেমন কোন গবেষণা ও গ্রন্থ রচিত হয়নি বললেই চলে। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধে এ জেলার মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী মানুষের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। তবে এইসব ঘটনা, কীর্তিকথা ও কাহিনি আজও যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার তেমন কোন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়নি। এমনকি স্থানীয় পর্যায়ের নেতা-কর্মী, মুক্তিযোদ্ধা, জনসাধারণের অংশগ্রহণ ও বিভিন্ন সংগঠনের অংশগ্রহণ এইসব বিষয়াদির উপর সঠিক ও তথ্যনির্ভর পূর্ণাঙ্গ তেমন কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। ফলে লক্ষ্মীপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের সময় ঘটে

যাওয়া সংঘাত, সংঘর্ষ, যুদ্ধ, হতাহতের ঘটনাবলি উপর যথাসম্ভব তথ্যবহুল ও পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় লক্ষ্মীপুর জেলায় ঘটে যাওয়া যুদ্ধ, গণহত্যা ও নির্যাতনের তথ্যাদি যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সতর্কতার সাথে গ্রহণ করে উল্লেখযোগ্য মৌলটি যুদ্ধ ও গণহত্যার ঘটনাবলির বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হল।

মজুপুরে গণহত্যা ও নির্যাতন (২৩ এপ্রিল ১৯৭১)

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ মার্চ কালোরাত্রির পর থেকে পাকসেনারা বাংলাদেশের সর্বত্রই ব্যাপক হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করে। লক্ষ্মীপুর জেলা ঢাকা থেকে বেশ দূরবর্তী হওয়ায় সেখানে সেখানে যেতে সময় লাগে ফলে পাকবাহিনী লক্ষ্মীপুরে ঘাঁটি করার পূর্বে সদর উপজেলার মজুপুর গ্রামে ২৩ এপ্রিল (১৯৭১) অতর্কিত হামলা চালিয়ে বহু লোককে হত্যা করে ও কয়েকটি ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। মজুপুরে সংগ্রাম কমিটির কেন্দ্রীয় নেতা অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পাকবাহিনী সেখানে আক্রমণ চালায়। ভোর বেলা পাল বাড়ির বীরেন্দ্রপাল ও পার্বতীপাল প্রমুখকে হত্যা করে। তারা আরো দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে আনছার আলী, চৌধুরী মিয়া, তরিক আলী, হাছান আলী, হাজরা খাতুন, আবুল বাসার ও জাফর আহম্মদসহ অনেককে হত্যা করে। তাদের নির্মম অত্যাচারে অনেকে আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করে।^৬



চিত্র-১: মজুপুর গ্রামের গণহত্যা ও নির্যাতনস্থল- চিত্রে স্থানটি চিহ্নিত করছেন মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবুল কালাম (যুদ্ধকালীন আনসার)।

লতিফপুর গ্রামে গণহত্যা ও নির্যাতন (মে মাসের ১ম সপ্তাহ ১৯৭১)

পাকসেনা কর্তৃক লক্ষ্মীপুর জেলায় যে কয়েকটি গণহত্যা ও নির্যাতন হয়েছিল তন্মধ্যে লতিফপুর গ্রাম ছিল অন্যতম যা আজও বিজোগিত দুঃস্মৃতি বহন করে আছে। পাকসেনারা লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার লতিফপুর গ্রামে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসের প্রথম দিকে হামলা চালিয়ে প্রায় দেড়শ জন লোককে হত্যা করে। এমনকি এই অঞ্চলের অনেক ঘর-বাড়ি লুট ও অগ্নিসংযোগ করে। ঐদিন তারা চান্দিনা ও দেয়ানাথপুরসহ কিছু গ্রাম থেকে অনেক যুবতি ও কিশোরি মেয়ে ধরে নিয়ে যায়। দেয়ানাথপুর গ্রামের আহছান উল্লাহর গর্ভবতী স্ত্রী পাকসেনাদের ধর্ষণে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন।^৭



চিত্র-২: লতিফপুর গ্রামের গণহত্যা ও নির্যাতন স্থল- মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবুল কালাম স্মৃতিময় জায়গাটি চিহ্নিত করছেন।

মাদাম ব্রিজ অপারেশন (৮ মে ১৯৭১)

মুক্তিযুদ্ধের সময় মাদাম ব্রিজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মাদাম ব্রিজটি লক্ষ্মীপুর শহরের উপর অবস্থিত যা রায়পুর-নোয়াখালী সড়ককে যুক্ত করেছে। চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী ও চৌমুহনী হতে যে কোন মুহূর্তে পাক-হানাদার বাহিনী লক্ষ্মীপুরে প্রবেশ করে নিরীহ স্বাধীনতাকামী লোকজনকে হত্যা করতে পারে। ফলে মুক্তিযোদ্ধারা লক্ষ্মীপুরে পাকবাহিনীর আগমন ও নির্যাতন হতে মানুষকে রক্ষার জন্য একটি প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার বলে মনে করেন।^৮ ফলে তারা লক্ষ্মীপুর প্রবেশের প্রধান পথ রায়পুর-লক্ষ্মীপুর হতে চৌমুহনীগামী সড়কের মাদাম ব্রিজটি ডেটোনেটর ও বিস্ফোরক দিয়ে গুড়িয়ে দিতে আনুমানিক ৮ মে হাবিলদার আবদুল মতিন পাটওয়ারীর নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের সদস্য আবু তাহের, শহিদ মুনছুর আহমেদ

ও শহিদ নজরুল ইসলামসহ মুক্তিযোদ্ধারা সংগঠিত হয়ে রাতেই মাদাম ব্রিজের পাড়ে একত্রিত হয়ে আক্রমণ পরিচালনার জন্য তাঁরা খুব সাবধানে সাঁতার কেটে ব্রিজের নিচে ডেটোনিটর ও প্রয়োজনীয় বিস্ফোরক স্থাপন করেছিলেন এবং ব্রিজটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে সক্ষম হন।^{১০}

কিছুদিন পর পাকসেনারা পুনরায় ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ জুন লক্ষ্মীপুরে প্রবেশ করে মাদাম ব্রিজটি ভাঙা দেখে এবং অপর দিকে রামগতি রাস্তার অংশবিশেষ কাটা দেখে সামনে অগ্রসর হতে ব্যর্থ হয়ে ব্রিজের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থান গ্রহণ করে। পরবর্তীতে তারা রামগতি যাওয়ার রাস্তা মেরামত করতে থাকে। কিন্তু সন্ধ্যা নেমে আসলে পাকসেনারা রাতের খাবার তৈরি ও খাওয়া-দাওয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বিষয়টি জানতে পেরে দালালবাজারে আবদুল মালেক চৌধুরীর বাড়িতে এডভোকেট আখতারুজ্জামান, মাস্টার রফিকুল হায়দার চৌধুরী, সুবেদর লুৎফর রহমান, হাবিলদার আব্দুল মতিন ও কাজল কান্তি দাস প্রমুখ মুক্তিযোদ্ধাগণ এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে মাদাম ব্রিজ অপারেশনের সিদ্ধান্ত হয়।^{১১} হাবিলদার আব্দুল মতিনের নেতৃত্বে ২০ জন মুক্তিযোদ্ধা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মাদাম ব্রিজের দিকে অগ্রসর হন। ব্রিজের অল্প দূরে তাঁরা নাছির আহমেদ ভূঁইয়ার বাড়িতে আত্মগোপনে থেকে দেখতে পায় যে, পাকসেনারা কেউ ব্রিজ মেরামত করছে, কেউ নাস্তা খাচ্ছে, আবার কেউ বিশ্রাম নিচ্ছে। পরিকল্পনা মোতাবেক হাবিলদার আব্দুল মতিন পাটওয়ারীর নির্দেশে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ জুন মুক্তিযোদ্ধাগণ স্নানঘাট থেকে পাকবাহিনীর প্রায় ৬০ গজ দূরে অবস্থান নিয়ে পাহারা দিতে থাকেন। একটি এলএম জি, একটি এসএমজি, ৫টি চায়না রাইফেল ও অনেকগুলি রাইফেলে সজ্জিত মুক্তিবাহিনী সুযোগ বুঝে পাকসেনাদের উপর আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে কয়েকজন পাকসেনা প্রাণ হারায়। তবে পাকসেনার সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় এবং তাদের বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ ও অস্ত্র-শস্ত্র থাকায় আধ ঘণ্টার মধ্যে অভিযান শেষ করে মুক্তিযোদ্ধারা লক্ষ্মীপুর-বিজয়নগর রাস্তা ধরে দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে যায়। পরদিন সকালে পাকসেনারা এলাকার আশে-পাশের বাড়ি-ঘরে লুটপাট, অগ্নিসংযোগসহ নিরীহ লোকদের নির্যাতন ও অনেককে হত্যা করে এই আক্রমণের প্রতিশোধ গ্রহণ করে।^{১২}



চিত্র-৩: মাদাম ব্রিজ ধ্বংস- চিত্রে তা দেখাচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধা কাজল কান্তি দাস।

দালাল বাজারে আক্রমণ ও যুদ্ধ (২৬ মে ১৯৭১)

লক্ষ্মীপুর থেকে রায়পুরে যাওয়ার পথে দালাল বাজারে রাজাকারদের একটি শক্তিশালী ক্যাম্প ছিল এবং এর অল্প দূরত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের শক্ত ঘাঁটি ছিল। ফলে মুক্তিযোদ্ধাগণ রাজাকারদের দালাল বাজার ক্যাম্প আক্রমণের পরিকল্পনা করেন।^{১২} সেই মোতাবেক ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ মে সুবেদার ওয়ালী উল্লাহর নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী দালাল বাজার রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করেন। বিকেল চারটার দিকে উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই তুমুল যুদ্ধে ৩০ জন রাজাকার নিহত হয় ও বেশ কয়েকজন রাজাকার আহত হয় এবং ৬টি রাইফেল মুক্তিযোদ্ধাগণ হস্তগত করে।^{১৩} এক পর্যায়ে রাজাকাররা লক্ষ্মীপুরের বাগবাড়ির দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য দালাল বাজার গার্লস স্কুলে স্থাপিত রাজাকার ক্যাম্পে অবস্থানরত রাজাকার দলটি গ্রাম থেকে মানুষের গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি ইত্যাদি জোরপূর্বক ছিনিয়ে আনত। এমনকি ইচ্ছামত মহিলাদের ধরে এনে নির্যাতন করত। এরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতে মুক্তিযোদ্ধারা এ ক্যাম্প আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়।



চিত্র-৪: দালাল বাজার মুক্তিযোদ্ধা ঘাঁটি- চিত্রে স্মৃতি বিজড়িত স্থানটি নির্দেশ করছেন মুক্তিযোদ্ধা কমল বৈষ্ণব।

দালাল বাজারের পাশে মুক্তিযোদ্ধাদের শক্ত ঘাঁটি ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা এই ঘাঁটিতে যুদ্ধের কৌশল ঠিক করত। এমনকি এখান থেকে তারা বিভিন্ন স্থানে গিয়ে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করত। ফলে পাকবাহিনী ও রাজাকাররা এই ঘাঁটিতে আক্রমণের প্রস্তুতি নেওয়ার খবর মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট পৌছা মাত্রই ২৬ মে সুবেদার আব্দুল মতিন পাটওয়ারীর নেতৃত্বে তাঁরা খুব শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেন। ঐ দিন পাকবাহিনী ও তাদের সহযোগীরা আক্রমণের জন্য ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হলে তিনিসহ সুবেদার ওয়ালী উল্লাহের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা গুলিবর্ষণ করতে থাকে। শত্রুরাও পাল্টা গুলি চালালে উভয়পক্ষের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধ চলতে থাকে। এই যুদ্ধে কয়েকজন রাজাকার নিহত হয় এবং বেশ কয়েকজন পাকসেনা ও রাজাকার আহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তাঁরা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করায় ও যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় তাদের মনোবল ও সাহস আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

চন্দ্রগঞ্জে যুদ্ধ ও গণহত্যা (১৫ জুন ১৯৭১)

লক্ষ্মীপুর জেলার প্রবেশদ্বারে চন্দ্রগঞ্জ বাজার অবস্থিত। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে ভ্যান-বোঝাই পাকসেনাদের একটি দল ফেনী থেকে লক্ষ্মীপুরের দিকে আসতে থাকে। খবর পেয়ে সুবেদার লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে মাত্র ছয়জনের একটি দল চন্দ্রগঞ্জে নামক স্থানে পাকবাহিনীর উপর অতর্কিত হামলা চালায়। অনেকক্ষণ উভয়পক্ষের মধ্যে গোলাগুলির এক পর্যায়ে যুদ্ধ থেমে যায়। ২৩ জন পাকসেনা এ যুদ্ধে হতাহত হয় এবং তারা লক্ষ্মীপুরে প্রবেশ না করে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।^{১৪} কিছুদিন পর পাকসেনারা পুনরায় চন্দ্রগঞ্জে পৌঁছায় কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ সেখানে ছিলেন না। এরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতে ষাট বছরের জনৈক বৃদ্ধ ও তার এক ছেলে মিলে দু'জনে দুটি

রাইফেল নিয়ে একটি ইন্টার পাজার আড়াল থেকে পাকসেনাদের গাড়িতে গুলিবর্ষণ করে ৩ জনকে হত্যা করে। এক পর্যায়ে পাকসেনারা তাদের দেখতে পেয়ে পাল্টা গুলি চালালে ঐ বৃদ্ধ শাহাদাত বরণ করেন। কিন্তু ছেলেটি পাকসেনাদের ফাঁকি দিয়ে সেস্থান থেকে ত্যাগ করতে সক্ষম হয়।^{১৫} গোলাগুলি দেখতে পেয়ে সাধারণ মানুষ ভয়ে দিক বিদিক ছুটাছুটি করতে থাকে। ফলে পাকসেনারা চন্দ্রগঞ্জ বাজারের উত্তর পাশের কয়েকটি বাড়ি ঘিরে ফেলে এলো-পাতাড়ি গুলি চালায় এবং পরবর্তীতে তারা চন্দ্রগঞ্জ বাজার জ্বালিয়ে দিয়ে সেখান থেকে চলে যায়।^{১৬} উল্লেখ্য পাকসেনাদের তাণ্ডবলীলায় সেই দিন বদিউজ্জামান, সুলতান মাস্টার, মোহাম্মদ উল্লাহ, আবু তাহের, মো. জাকির আহমেদ, মোঃ নাছির আহমদ ও নূর জাহান বেগমসহ আরও বহু লোক নিহত হয়।^{১৭}



চিত্র-৫: চন্দ্রগঞ্জের যুদ্ধ ও গণহত্যার স্থল- চিত্রে স্থানটি নির্দেশ করছেন প্রত্যক্ষদর্শী বাচ্চু মিয়া।

রামগতি থানা অপারেশন (৬ জুলাই ১৯৭১)

লক্ষ্মীপুর জেলা সদর থেকে দক্ষিণে প্রায় ৪৫ কি.মি. দূরে মেঘনা নদীর তীরবর্তী বাজারের দক্ষিণ পাশে রামগতি থানা অবস্থিত। থানার পূর্ব পাশে ওয়াপদা বিল্ডিং ও রেস্ট হাউজে প্রায় ৪৫ জন মিলিশিয়া অবস্থান করত। অপর দিকে রামগতি থানায় পুলিশ ও রাজাকাররা অবস্থান করত।^{১৮} মুক্তিযোদ্ধাগণ রামগতি থানা ও মিলিশিয়া ক্যাম্প অপারেশনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৬ জুলাই কমান্ডার এম.এ. তাহের ও সুবেদার আব্দুল লতিফ আহমেদের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের দুইটি গ্রুপ ভাগ হয়ে থানার উত্তরে মাদ্রাসার পুকুর পাড়ে এবং মিলিশিয়া ক্যাম্পের পশ্চিমে অবস্থিত খাল পাড়ে অবস্থান নেয়। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ৬ জুলাই রাত ১১ টার দিকে মুক্তিযোদ্ধারা একযোগে থানা ও মিলিশিয়া ক্যাম্প আক্রমণ করে। রাজাকাররাও পাল্টা

আক্রমণ করে। উভয় পক্ষের মধ্যে ব্যাপক গোলাগুলি হয়। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের সাঁড়াশি অভিযানের কারণে মিলিশিয়া ও রাজাকাররা পরাস্ত হলে তারা থানা দখল করে নেন। শত্রুরা তাদের অবস্থান থেকে পলায়ন করে। থানা হাজত থেকে স্বাধীনতার পক্ষের দুই জন বন্দিকে উদ্ধার করা হয়। এ যুদ্ধে ৫ জন মিলিশিয়া ও ৩ জন রাজাকার নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাগণ শত্রুদের ফেলে যাওয়া ৬৭টি রাইফেল ও বন্দুক এবং প্রায় ৩ হাজার গোলাবারুদ হস্তগত করে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করেন।^{১৯}



চিত্র-৬: রামগতি থানা- চিত্রে স্থানটি দেখাচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার এম এ তাহের।

পানপাড়া অপারেশন (৬ আগস্ট ১৯৭১)

রামগঞ্জ থেকে প্রায় ১০ কি.মি. দক্ষিণে রামগঞ্জ-লক্ষ্মীপুর সড়কে পানপাড়া গ্রাম অবস্থিত। পানপাড়া থেকে আরেকটি রাস্তা পশ্চিম দিকে রায়পুরে গিয়েছে। পাকসেনারা পানপাড়া সড়ক দিয়ে প্রায় সময় লক্ষ্মীপুর থেকে রায়পুর যাতায়াত করত।



চিত্র-৭: পানপাড়া অপারেশন স্থল- চিত্রে স্থানটি দেখাচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবুল কালাম।

রেশন ও গোলাবারুদ নিয়ে পাকসেনাদের একটি গাড়ি লক্ষ্মীপুর হয়ে রায়পুর যাওয়ার খবর শুনে ৬ আগস্ট হাবিলদার তোফাজ্জলের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা পানপাড়ায় এ্যাম্বুশ করে শত্রুর জন্য অপেক্ষায় থাকে। এছাড়া দু'জন যোদ্ধাকে দিয়ে সড়কের ওপর এন্টি ট্যাংক মাইন বিছানো হয়। পাকবাহিনীর গাড়ি পানপাড়া সড়ক অতিক্রম করার সময় একটি বিকট শব্দ হয়। পাকসেনারা অবস্থা বুঝার পূর্বে মুক্তিযোদ্ধা হামদে রাক্বী ও তোফাজ্জল ফায়ার শুরু করে দেন। পাকবাহিনীও পাল্টা ফায়ার করতে থাকে। দীর্ঘক্ষণ উভয় পক্ষের মধ্যে ফায়ার চলে। শেষ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের মুখে পাকসেনারা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। এই অপারেশনে পাকসেনাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং দু'জন পাকসেনা নিহত হয়।^{২০}

রামগতি রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ (১৫ আগস্ট ১৯৭১)

লক্ষ্মীপুর সদর থেকে দক্ষিণে প্রায় ৪৫কিলোমিটার দূরে রামগতি উপজেলার অবস্থান। এখানে রাজাকারদের শক্তিশালী ক্যাম্প ছিল। উক্ত ক্যাম্প আক্রমণের জন্য ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট মুক্তিযোদ্ধারা রামগতির আন্ডার চরে একত্রিত হয় এবং মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার এম.এ তাহেরের নেতৃত্বে সুবেদার আব্দুল লতিফ, মো. আজাদ উদ্দিন, মোশাররফ হোসেন ও মো. নুরুল ইসলাম প্রমুখ পরামর্শ করে রামগতির সবকয়টি মিলিশিয়া ও রাজাকার ক্যাম্প একযোগে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন।^{২১} উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি জানিয়ে দেয়া, শত্রুদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করা ও জনগণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনা। সে দিনই মুক্তিযোদ্ধারা রামগতির রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে দখলে নেয়। এখান থেকে কিছু অস্ত্র উদ্ধারসহ কয়েকজন রাজাকারকে বন্দি করা হয়।^{২২} উল্লেখ্য এ অপারেশনে মুক্তিযোদ্ধা এম. এ তাহের, মোশাররফ হোসেন, মোঃ মফিজ উল্লাহ,

আজাদ উদ্দিন, ফেরদৌস মিয়া, মোঃ সফিক উদ্দিন ও ফজলুল করিম প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। এরূপ সাফল্য মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবলকে আরও দৃঢ় করে এবং পরবর্তীতে যুদ্ধগুলো সাহসিকতার সহিত মোকাবেলা করতে সক্ষম হন।



চিত্র-৮: রামগতি রাজাকার ক্যাম্প- চিত্রে স্থান নির্দেশনায় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার এম এ তাহের।

এল এম পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ও আলিয়া মাদ্রাসা অপারেশন (১ অক্টোবর ১৯৭১)

লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর উপজেলায় এল এম পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ও আলিয়া মাদ্রাসা অবস্থিত। একজন জেওসির নেতৃত্বে প্রায় ২০০ মিলিশিয়া ও পাকসেনা এল এম উচ্চ বিদ্যালয় ও আলিয়া মাদ্রাসায় অবস্থান করত। আলিয়া মাদ্রাসাটির পাশে রাজাকারদের একটি ক্যাম্প ছিল।^{২৩} হাবিলদার আব্দুল মতিন পাটওয়ারীর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা পাকসেনাদের পিটি ও প্যারেডের সময় ক্যাম্প আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১ অক্টোবর হাবিলদার আব্দুল মতিন ৩০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে ১০ জন করে তিনটি দলে বিভক্ত করে একটি দল নায়েক আলতাফ, ২য় দলটি নিজাম উদ্দিন পাঠান ও ৩য় দলটি হাবিলদার আবদুল মতিন পাটওয়ারীর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে অবস্থান নেন। কিন্তু ৩য় দলটি রাজাকারদের চোখে পড়ায় তারা সাথে সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের উপর গুলিবর্ষণ করলে একজন মুক্তিযোদ্ধা শাহাদত বরণ করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের অপর দুইটি দল একযোগে রাজাকার ও পাকবাহিনীর উপর পাল্টা গুলি চালায় এবং উপর্যুপরি গুলিবর্ষণে শত্রুদের কয়েকজন সৈন্য মারাত্মকভাবে আহত ও নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধাগণ নিজেদের নিরাপত্তার জন্য এক পর্যায়ে পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত নেন। এ অপারেশনে দুইজন রাজাকার এবং বিদ্যালয়ের মাঠ ও মাদ্রাসায় অবস্থানরত ৪ জন মিলিশিয়া সদস্য নিহত হয়।

রাজাকারদের দুইটি অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে।^{২৪} উল্লেখ্য এই অপারেশনে মুক্তিযোদ্ধা মোঃ নিজাম উদ্দিন পাঠান, মোঃ সিরাজ মিয়া, মোঃ আব্দুল খালেক, মোঃ আবুল কালাম, মোঃ বুল্লুল আমিন খলিফা, রফিক উল্যা, আব্দুল মতিন, জাকির হোসেন, ইমাম হোসেন, মোঃ আবুল হাসেম, ইসমাইল, আব্দুল গনি, মোঃ সামছুদ্দিন ও মোঃ রফিকুল ইসলামসহ প্রমুখ অংশ নিয়েছিলেন।^{২৫}



চিত্র-৯: এল এম পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়- চিত্রে স্থানটি নির্দেশ করছেন মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবুল কালাম।

চরসীতার জমিদার হাট রোডে গ্র্যামশ (১১ অক্টোবর ১৯৭১)

লক্ষ্মীপুর সদর থেকে দক্ষিণে ৩০ কি.মি. দূরে রামগতি (থানা) যাওয়ার পথে চরসীতায় জমিদার হাট বাজার অবস্থিত। পাকসেনা ও রাজাকাররা লক্ষ্মীপুর-রামগতি সড়কে প্রায় সময় যাতায়াত করত। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১০ অক্টোবর চেয়ারম্যান ইমান আলী পণ্ডিতের নিকট মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকাররা ও শান্তি কমিটির নেতাদের ১১ অক্টোবর শুক্রবার জমিদার হাট ইউনিয়ন পরিষদে গমনে আসার খবর পায়। কমান্ডার এম. এ. তাহের, সুবেদার আব্দুল লতিফ, শাহজাহান চৌধুরী, সোলায়মান গাজী ও নূর নবী পরামর্শ করে বাজারের উত্তর পাশে গ্র্যামশ বসায়। ১১ অক্টোবর জুমার নামাজের পর শান্তি কমিটির সভাপতি শামসুল আলম ও রাজাকাররা রিকশা যোগে জমিদার হাটের গ্র্যামশ অবস্থানে পৌঁছার সাথে সাথে কমান্ডার এম.এ. তাহের নির্দেশে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের উপর গুলিবর্ষণ করলে রাজাকার বাহিনী ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই অভিযানে ৩৪ জন রাজাকার নিহত হয়, অনেকে আহত হয় এবং অন্যরা পালিয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা এ অভিযান করে রাজাকারদের ২৭টি রাইফেল উদ্ধার করে। এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান গাজী গুরুতর আহত হন।^{২৬} উল্লেখ্য এ অপারেশনে মুক্তিযোদ্ধা এম এ তাহের, নূর নবী, সোলায়মান গাজী, শাহজাহান চৌধুরী, মোঃ সফিক উদ্দিন, মোঃ মফিজ উল্লাহ, নুরুল ইসলাম, খোরশেদ আলম ও মোঃ আজাদ উদ্দিন প্রমুখ অংশ নিয়েছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের এই সাফল্য পরবর্তী অভিযানগুলোর ক্ষেত্রে শক্তি, মনোবল ও সাহস যোগাতে সহায়ক হয়।



চিত্র-১০: চরসীতার জমিদার হাট রোডের এ্যাম্বুশ স্থল- স্মৃতিময় স্থানটি দেখাচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার এম এ তাহের।

লিয়াকত মেমোরিয়াল হাই স্কুল আক্রমণ (১৬ অক্টোবর-২৩ অক্টোবর ১৯৭১)

লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলায় লিয়াকত মেমোরিয়াল হাই স্কুল অবস্থিত। লক্ষ্মীপুর-রায়পুর রোড ছিল রাজাকার, আল-বদর ও পাকসেনাদের ট্রানজিড রোড। লিয়াকত মেমোরিয়াল হাই স্কুল ছিল পাকসেনা ও তাদের সহযোগীদের শক্ত ঘাঁটি। মুক্তিযোদ্ধারা এই ঘাঁটি আক্রমণের পরিকল্পনা তৈরি করে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ অক্টোবর লিয়াকত মেমোরিয়াল হাই স্কুল আক্রমণ করলে পাকসেনা ও তাদের সহযোগীরা পালিয়ে চৌমুহনী চলে যায়।^{২৭} এদিকে লক্ষ্মীপুরের পাকবাহিনীর প্রধান দালাল ননী চেয়ারম্যান এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। লুটতরাজ, ধর্ষণ, গণহত্যা ও অগ্নিসংযোগ করাসহ হানাদার বাহিনীকে মুক্তিবাহিনীর সন্ধান দেওয়াই ছিল তার পেশা। এরূপ কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিযোদ্ধারা তার বিরুদ্ধে অভিযান করার চিন্তা করেন। সেই মোতাবেক ২৩ অক্টোবর সাহসী যোদ্ধা সুবেদার ওয়ালি উল্লাহ মুক্তিযোদ্ধা জালালের প্লাটুন নিয়ে ননী চেয়ারম্যানের কুখ্যাত বাহিনীকে আক্রমণ করেন এবং দালাল ননী চেয়ারম্যানকে জীবিত অবস্থায় বন্দি করেন। খবরটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে কয়েক হাজার লোক সেখানে উপস্থিত হয়। উপস্থিত জনতার সামনে তাকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়। ক্ষুদ্র জনতা ননী চেয়ারম্যানের লাশ নিয়ে কয়েক ঘণ্টা ধরে গ্রামে গ্রামে ঘুরে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে।^{২৮} মুক্তিযোদ্ধাদের এই দুঃসাহসিক ভূমিকা মুক্তিকামী জনগণের শক্তিকে আরও বহুগুণে বৃদ্ধি করে।



চিত্র-১১: লিয়াকত মেমোরিয়াল হাই স্কুল- মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবুল কালাম ক্যাম্পটি নির্দেশ করছেন।

রামগঞ্জ থানা অপারেশন (২ ডিসেম্বর ১৯৭১)

রামগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত থানাটিতে পাকবাহিনী, মিলিশিয়া ও রাজাকারদের একটি শক্ত ঘাঁটি ছিল। এই ক্যাম্প থেকে পাকবাহিনী ও রাজাকাররা আশে পাশের গ্রামগুলোতে নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচার, নির্যাতন ও লুটপাট করত। ফলে মুক্তিযোদ্ধারা এই ক্যাম্পটি আক্রমণের পরিকল্পনা করে। মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সুবেদার আব্দুল মতিন পাটওয়ারীর নেতৃত্বে গ্রুপ কমান্ডার মোঃ সিরাজ উদ্দিন, গ্রুপ কমান্ডার মোঃ শাখাওয়াত হোসেন ও গ্রুপ কমান্ডার নবী নেওয়াজ চৌধুরী সম্মিলিতভাবে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিয়ে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের আনুমানিক ২ ডিসেম্বর রামগঞ্জ থানা আক্রমণ করেন। পাকবাহিনীও পাল্টা আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে পাকবাহিনী ও রাজাকারদের কয়েকজন সদস্য আহত হয় এবং উপায়ত্তর না দেখে তারা ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই অপারেশনে মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম, তাফাজ্জল হোসেন বাচ্চু, মোঃ শাহজাহান, কায়কোবাদ ও আব্দুল মান্নান মজুমদার প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।^{২৯}



চিত্র-১২: রামগঞ্জ থানা- চিত্রে স্থানটি দেখাচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবুল কালাম।

রায়পুর থানা অপারেশন (৩ ডিসেম্বর ১৯৭১)

রায়পুর উপজেলায় রায়পুর থানা অবস্থিত। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পরই পাকবাহিনী লক্ষ্মীপুর জেলায় প্রবেশ করে রায়পুর থানায় অবস্থান গ্রহণ করে এবং রাজাকারদের সহযোগিতায় এখানে শক্ত ঘাঁটি তৈরী করে। মুক্তিযোদ্ধারা এই ঘাঁটিতে কয়েকবার আক্রমণ চালালেও পাকবাহিনী পুনরায় অবস্থান নেয়। ফলে মুক্তিযোদ্ধারা এই ক্যাম্পটি আবারও আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। পরিকল্পনা মোতাবেক ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর হাবিলদার আব্দুল মতিন পাটওয়ারীর নেতৃত্বে বিএলএফ কমান্ডার মো. নিজাম উদ্দিন পাঠানসহ মুক্তিযোদ্ধা আবুল কালাম, আ ও ম সফিক উল্লাহ, মনির হোসেন, আবু নসর, নাসির খান, শহিদুল্লাহ বি এস সি, রফিক ব্যাপারী, শদু মিয়া, আবু তালেব ও মহসিন প্রমুখ রায়পুর থানা আক্রমণ করেন। মুক্তিযোদ্ধাগণ চতুর্মুখী আক্রমণ করে দীর্ঘক্ষণ গুলিবর্ষণ করতে থাকেন। কিন্তু থানার ভেতর থেকে কোন পাল্টা আক্রমণ না আসায় মুক্তিযোদ্ধাদের মনে সন্দেহ জাগে। ফলে দুই-তিন জন মুক্তিযোদ্ধা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে থানার ভিতরে ঢুকে কাউকে দেখতে না পেয়ে বাহিরে এসে কমান্ডারকে বিষয়টি জানালে মুক্তিযোদ্ধারা রায়পুর থানা দখল করে নেয়।^{৩০}



চিত্র-১৩: রায়পুর থানা- চিত্রে স্মৃতিময় ক্যাম্পটি নির্দেশ করছেন মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবুল কালাম।

লক্ষ্মীপুর থানা অপারেশন (৪ ডিসেম্বর ১৯৭১)

লক্ষ্মীপুর জেলা শহরে অবস্থিত থানায় দীর্ঘদিন ধরে পাকবাহিনী অবস্থান করছিল। মুক্তিযোদ্ধাগণ এই ক্যাম্পটি আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। সেই মোতাবেক মুক্তিযোদ্ধাগণ ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর থানার চতুর্দিক ঘেরাও করে ফাঁকা গুলি ছুড়েন এবং আক্রমণ করেন। কিন্তু তাদের আক্রমণের পূর্বেই অবস্থা বুঝে পাকবাহিনী ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং লক্ষ্মীপুর ত্যাগ করে পুরোপুরি চলে যায়। ফলে সহজেই লক্ষ্মীপুর থানা মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে এবং লক্ষ্মীপুর শত্রুমুক্ত হয়। উল্লেখ্য এ অপারেশনে মুক্তিযোদ্ধা কাজল কান্তি দাস, মোঃ আনোয়ারুল হক, এম আলাউদ্দিন, মোঃ ইসমাইল, রফিকুল হায়দার চৌধুরী, তোফায়েল আহম্মদ, মোঃ আবু তাহের, এ কে এম শাহজাহান কামাল, মোঃ শাহজাহান, আ ও ম সফিক উল্যাহ, নিজাম উদ্দিন, আ ন ম ফজলুল করিম, এ জেড শাহজাহান, খাজা আহমদ ও নায়েক আবুল হাসেম প্রমুখ অংশ নেন।^{৩৩}



চিত্র-১৪: লক্ষ্মীপুর থানা- চিত্রে স্থান নির্দেশ করছেন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোঃ আনোয়ারুল হক।

রামগতি মিলিশিয়া ক্যাম্প আক্রমণ (৫ ডিসেম্বর ১৯৭১)

রামগতি উপজেলার মেঘনা নদীর পাড়ে মিলিশিয়া ক্যাম্প অবস্থিত ছিল। সমগ্র বাংলাদেশে যখন পাক ও মিলিশিয়া বাহিনীর অবস্থান খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে তখন লক্ষ্মীপুর জেলায়ও এর প্রভাব পড়ে। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর রামগতি উপজেলার মুক্তিযোদ্ধারা খবর পায় যে নদী পথে পাক-মিলিশিয়ারা পালিয়ে যাচ্ছে। ফলে এম.এ তাহের, মোশাররফ হোসেন ও সুবেদার আব্দুল লতিফের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত রামগতিতে পৌঁছে দেখেন যে, পাক-মিলিশিয়ারা সাইক্লোন সেন্টার ও ক্যাম্প থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য দ্রুত নৌকায় উঠছে তা দেখা মাত্রই মুক্তিযোদ্ধাগণ তাদের উপর ফায়ার শুরু করেন। প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে মিলিশিয়ারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে কেউ বোটে, কেউ সাইক্লোন সেন্টারে অবস্থান নেয়। ফলে মুক্তিযোদ্ধাগণ তাদের অবরুদ্ধ করে ফেলে। নিরুপায় মিলিশিয়ারাও পাল্টা ফায়ার শুরু করে। এ সময় চট্টগ্রাম থেকে নদীপথে মিলিশিয়াদের উদ্ধারকারী দল আসলে তারা দ্রুত বোটে উঠে পালিয়ে যায়। এ আক্রমণে আসমত উল্লাহ খান নামক একজন মিলিশিয়া আহত অবস্থায় ধরা পড়ে। পরে তাকে রেডক্রসের কাছে হস্তান্তর করা হয়।^{৩২} রামগতি মিলিশিয়া ক্যাম্পটি মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে।



চিত্র-১৫: রামগতি মিলিশিয়া ক্যাম্প- চিত্রে ক্যাম্প নির্দেশক কমান্ডার এম এ তাহের।

হাজির হাট অপারেশন (৯ ডিসেম্বর ১৯৭১)

রামগতি উপজেলা এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা যে কয়েকটি অপারেশন পরিচালনা করেছিল তারমধ্যে চর জাঙ্গালিয়ার হাজির হাট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাজির হাট ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন গোড়াউন ও মসজিদ ক্যাম্পে মিলিশিয়া এবং রাজাকাররা একত্রে অবস্থান করত। পাকবাহিনীর শক্তি আন্তে আন্তে দুর্বল হতে থাকলে তারা মিলিশিয়া ক্যাম্প পরিত্যাগ করে গেলেও রাজাকাররা হাজির হাটের ক্যাম্পে অবস্থান করতে থাকে। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরের ৯ তারিখে কমান্ডার এম.এ তাহের, মোঃ সফিক উদ্দিন ও মোঃ শাহজাহানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা হাজির হাট রাজাকার ক্যাম্প ঘিরে ফেলে তাদের উপর গুলিবর্ষণ করতে থাকলে নিরুপায় রাজাকাররা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। ফলে হাজির হাট মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে আসে।^{৩৩} উল্লেখ্য এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা সফিক উদ্দিন, মোঃ নুরুল ইসলাম, মাস্টার মফিজ উল্লাহ, মাস্টার এ কে এম নুরুল আমিন, মোঃ আব্দুল্লাহ, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মোঃ নবী উল্লাহ, আলী আহম্মদ, শ্যামল কান্তি দাস, মোঃ হানিফ, মোমিন উল্লাহ, তোফায়েল আহম্মদ, জয়নাল আবেদীন, আব্দুর রাজ্জাক, সাহাব উদ্দিন, আব্দুল বারাকাত দুলাল, সফি উল্লা, কামাল উদ্দিন, সুবেদার জয়নাল আবেদীন, আব্দুল অদুদ ও মোঃ খোরশেদ আলম প্রমুখ অংশ নিয়েছিলেন।^{৩৪}



চিত্র-১৬: হাজির হাট মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প- কমান্ডার এম এ তাহের স্মৃতি বিজড়িত ক্যাম্পটি চিহ্নিত করছেন।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, সমগ্র বাংলাদেশের ন্যায় লক্ষ্মীপুর জেলার মুক্তিকামী জনগণ সর্বাঙ্গিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাগণকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করায় অসংখ্য রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, অপারেশন ও যুদ্ধের মাধ্যমে অত্র জেলাকে শত্রুমুক্ত করতে পেরেছিল। পাকসেনা ও তাদের সহযোগীদেরকে পরাজিত করে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর লক্ষ্মীপুর জেলা শত্রুমুক্ত ও স্বাধীন হয়, কিন্তু লক্ষ্মীপুর জেলায় কয়েকটি স্থানে পাকিস্তানি-বাহিনীর সহযোগী রাজাকারদের শক্ত অবস্থান থাকায় মুক্তিযোদ্ধাগণ তাদের বিরুদ্ধে অনেকগুলি অপারেশন চালিয়ে অবশেষে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর রামগঞ্জ এম ইউ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে অবস্থানরত রাজাকার বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাগণের সরাসরি এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও যুদ্ধ হয় এবং উভয়পক্ষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হলেও শেষ পর্যন্ত রাজাকারদের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চল পুরোপুরি শত্রুমুক্ত হয় এবং লক্ষ্মীপুর জেলা স্বাধীন হয়।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. মোহাম্মদ আমীন, 'জেলা, উপজেলা ও নদ নদীর নামকরণের ইতিহাস' (ঢাকা : গতিধারা প্রকাশনী, ২০১২), পৃ. ১৩২।
২. মো. আখতারুজ্জামান (সম্পা.), বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: প্রেক্ষাপট ও ঘটনা (ঢাকা : বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ২০০৯), পৃ. ৪৪।

৩. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, ১ম খণ্ড (ঢাকা : তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৪), পৃ. ৩-৪।
৪. খালেদ মোশাররফ, *মুক্তিযুদ্ধে ২ নম্বর সেক্টর ও কে ফোর্স* (ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন, ২০১৩), পৃ. ৭৪।
৫. পূর্বোক্ত।
৬. নাজিম উদ্দীন মাহমুদ, *লক্ষ্মীপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* (ঢাকা : গতিধারা প্রকাশনী, ২০১২), পৃ. ২৭।
৭. আসাদুজ্জামান আসাদ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও শরণার্থী শিবির* (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ. ১০৮।
৮. বাংলাদেশ সেনাবাহিনী-এরিয়া সদর দপ্তর কুমিল্লা (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ২য় খণ্ড (ঢাকা : এশিয়া পাবলিকেশনস, ২০০৮), পৃ. ৯৪৭।
৯. নুরুল হুদা আবুল মনসুর (সম্পা.), *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা: ২৯-৩০* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি), ২০০৮, পৃ. ২৪২; সাক্ষাৎকার: বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজল কান্তি দাস, পিতা- মৃত ক্ষিতিশ চন্দ্র দাস, লক্ষ্মীপুর পৌরসভা, জেলা- লক্ষ্মীপুর, তারিখ-২৬.১২.২০১৬।
১০. নাজিম উদ্দীন মাহমুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮।
১১. নুরুল হুদা আবুল মনসুর (সম্পা.), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪৮; সাক্ষাৎকার: বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজল কান্তি দাস, পিতা- মৃত ক্ষিতিশ চন্দ্র দাস, লক্ষ্মীপুর পৌরসভা, জেলা- লক্ষ্মীপুর, তারিখ-২৬.১২.২০১৬।
১২. নাজিম উদ্দীন মাহমুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০।
১৩. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৭।
১৪. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ৯ম খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৫-১৫৬।
১৫. নুরুল হুদা আবুল মনসুর (সম্পা.), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪০।
১৬. নাজিম উদ্দীন মাহমুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১।
১৭. সাক্ষাৎকার: বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ারুল হক, পিতা- আবিদ মিয়া, গ্রাম- বাগনগর, লক্ষ্মীপুর পৌরসভা, উপজেলা- লক্ষ্মীপুর, জেলা- লক্ষ্মীপুর, তারিখ-২৭.১২.২০১২।
১৮. বাংলাদেশ সেনাবাহিনী-এরিয়া সদর দপ্তর কুমিল্লা (সম্পা.), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৪৯।
১৯. ম. নুরুল আলম (সম্পা.), *রামগতি দর্পন*, (ঢাকা : রামগতি প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ. ১৬৩।
২০. বাংলাদেশ সেনাবাহিনী-এরিয়া সদর দপ্তর কুমিল্লা (সম্পা.), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৫০।
২১. সাক্ষাৎকার: মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার এম এ তাহের, পিতা- মৃত আব্দুল বারী, গ্রাম- চর জগবন্ধু, ইউনিয়ন-সাহেবের হাট, উপজেলা- কমলনগর, জেলা- লক্ষ্মীপুর, তারিখ-২৮.১২.২০১৬।
২২. নাজিম উদ্দীন মাহমুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫।
২৩. সাক্ষাৎকার: মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নিজাম উদ্দিন পাঠান, পিতা-মৃত আব্দুল কুদ্দুস পাঠান, গ্রাম- উত্তর রায়পুর, ইউনিয়ন- চর মোহনা, উপজেলা- রায়পুর, জেলা- লক্ষ্মীপুর, তারিখ-২৫.১২.২০১৬।
২৪. বাংলাদেশ সেনাবাহিনী- এরিয়া সদর দপ্তর কুমিল্লা (সম্পা.), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৫৬-৯৫৭।
২৫. সাক্ষাৎকার: মুক্তিযোদ্ধা নিজাম উদ্দিন পাঠান, *পূর্বোক্ত*, তারিখ-২৫.১২.২০১৬।
২৬. ম. নুরুল আলম (সম্পা.), *রামগতি দর্পণ* (ঢাকা : রামগতি প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ. ১৬৫-১৬৬।
২৭. নুরুল হুদা আবুল মনসুর (সম্পা.), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫০।

২৮. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), ১০ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮।
২৯. সাক্ষাৎকার: বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কালাম, পিতা- মৃত রেহান উদ্দিন, গ্রাম- দক্ষিণ কেরোয়া, রায়পুর- পৌরসভা, উপজেলা- রায়পুর জেলা- লক্ষ্মীপুর, তারিখ- ২৫.১২.২০১৬।
৩০. সাক্ষাৎকার: মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নিজাম উদ্দিন পাঠান, পিতা-মৃত আব্দুল কুদ্দুস পাঠান, গ্রাম- উত্তর রায়পুর, ইউনিয়ন- চর মোহনা, উপজেলা- রায়পুর, জেলা- লক্ষ্মীপুর, তারিখ-২৫.১২.২০১৬।
৩১. সাক্ষাৎকার: বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ারুল হক, পিতা- আবিদ মিয়া, গ্রাম- বাঞ্চানগর, লক্ষ্মীপুর পৌরসভা, উপজেলা- লক্ষ্মীপুর, জেলা- লক্ষ্মীপুর, তারিখ-২৭.১২.২০১২।
৩২. নাজিম উদ্দীন মাহমুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪; সাক্ষাৎকার: মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার এম এ তাহের, পিতা- মৃত আব্দুল বারী, গ্রাম- চর জগবন্ধু, ইউনিয়ন-সাহেবের হাট, উপজেলা- কমলনগর, জেলা- লক্ষ্মীপুর, তারিখ-২৮.১২.২০১৬।
৩৩. বাংলাদেশ সেনাবাহিনী- এরিয়া সদর দপ্তর কুমিল্লা (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬১।
৩৪. সাক্ষাৎকার: মুক্তিযোদ্ধা মোঃ সফিক উদ্দিন, পিতা- মৃত ওবায়দুল হক, গ্রাম-চর লরেন্স, ইউনিয়ন- চর লরেন্স, উপজেলা- কমলনগর, জেলা- লক্ষ্মীপুর, তারিখ- ০২.১২.২০১৬।

জমা প্রদানের তারিখ : ০১.০৪.২০২৩

গৃহীত হবার তারিখ : ৩০.১০.২০২৩

কারা-সংস্কৃতির স্বরূপ অনুসন্ধান: প্রেক্ষিত কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, টঙ্গী, গাজীপুর

সাবিনা শরমীন*
শ্যামলী শীল**

Abstract

The article aims to provide an overview of the nature of prison culture and to examine whether it is applicable to the culture of Child Development Centre (CDC) or not. CDC is a government institution where children are legally confined for various allegations such as murder, theft, fraud etc. for correction. To achieve the goal of the study both quantitative and qualitative research methods have been used as methodology. Intensive literature review has been done to reveal the nature of prison culture. Based on indepth interview, qualitative data have been collected from the incarcerated children who have been residing in the CDC, Tongi, Gazipur. Semi-structured questionnaire has been used for quantitative data. The data demonstrate that in CDC, like prison, children have to adapt the lifestyle of CDC. They must learn the norms and values of the CDC and bound to follow everything that are practiced in the CDC. So as a form of total institution, CDC has a distinctive culture which can be referred as prison culture.

চাবিশব্দ: কারা-সংস্কৃতি, দেশীয় উৎপত্তি তত্ত্ব, আমদানীকৃত তত্ত্ব, নিবাসী আচরণবিধি, স্বাতন্ত্র্যসূচক ভাষা

ভূমিকা

ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় অপরাধীর প্রভাব থেকে সমাজকে মুক্ত রাখতে এবং শাস্তির বিধান কার্যকর করতে আধুনিক বিশ্বে উদ্ভাবিত হয়েছে অপরাধীদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক আবাসস্থল; কারাগার বা জেলখানা, যাকে Goffman সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠান (Total Institution) বলে অভিহিত করেছেন।^১ রাষ্ট্রের ফৌজদারি আইন ভঙ্গ করলে বা আইন ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত হলে অপরাধীকে বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালত নির্দেশিত সময় পর্যন্ত পরিবার পরিজনহীন অবস্থায় কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপিত নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে অবস্থান করতে হয়। একটা সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকারী ব্যক্তিকে আত্মস্থ এবং চর্চা করতে হয় প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান যাকে বলা যায় সংস্কৃতি। মানুষ সৃষ্টিশীল প্রাণী। যেকোনো পরিবেশে অভিযোজনের ক্ষমতা তার রয়েছে। পরিবেশ উপযোগী জীবন ধারা তৈরি, চর্চা আর অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষ তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে। কারাগারে অবস্থানরত নিবাসীরাও (Inmate) প্রয়োজনের তাগিদে মূলধারার সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন এক সংস্কৃতির আবহ সৃষ্টি করে, অনুসরণ করে; যাকে বলা যায় কারা-সংস্কৃতি। কারাগার ব্যক্তিকে যে সব সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে তার প্রতিবাদ বা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে কারা সংস্কৃতি সৃষ্টি করে।

* অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

** সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

ইংরেজি Prison Culture বা Inmate Culture এর বাংলা পরিভাষা হিসেবে কারা-সংস্কৃতি বেশি মানানসই। মূলধারার সংস্কৃতি যেমন কে, কবে, কোথায় তৈরি করেছে অর্থাৎ এর উৎপত্তি সম্পর্কে জানা যায় না, তেমনি কারা-সংস্কৃতিও কীভাবে কখন সৃষ্টি হয়েছে তার লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় না। কারাগারে অবস্থানরত নিবাসীরা গতানুগতিক ধারায় বিদ্যমান সংস্কৃতির চর্চা করে। কারাগারে প্রবেশের প্রথমদিন থেকেই এই সংস্কৃতি শিখন প্রক্রিয়া শুরু হয় আর কারাগার থেকে মুক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত এর চর্চা চলতে থাকে। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশের জ্ঞানভাণ্ডারে খুব কম আলোচিত কারা-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আলোচনাকালে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের (টঙ্গী, গাজীপুর) মধ্যে চর্চাকৃত কারা-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বৈচিত্র্যময় রূপটি উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

কারা-সংস্কৃতির আদ্যোপান্ত অনুসন্ধান ও কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের বিদ্যমান সংস্কৃতির স্বরূপ উন্মোচন করতে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য নিয়ে বর্তমান গবেষণা পরিচালনা করা হয়:

- কারা-সংস্কৃতির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।
- কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে অনুসৃত ও চর্চাকৃত সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রলক্ষণ চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবচিত্র উপস্থাপন।

গবেষণার যৌক্তিকতা:

কারা-সংস্কৃতি সংক্রান্ত আলোচনা যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক উভয়দিক থেকেই এই বিষয় সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু এ বিষয় নিয়ে পূর্ববর্তী গবেষকদের গবেষণাকর্ম অনুসন্ধানে গবেষকবৃন্দের অনগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে সুস্পষ্টভাবে। বাংলাদেশের এ বিষয় নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোনো গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন গবেষক কারা ব্যবস্থাপনার অনুষঙ্গ হিসাবে সংক্ষিপ্ত পরিসরে অস্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন। কারা-সংস্কৃতি সম্পর্কে পঠন-পাঠনে পরবর্তী গবেষকদের আগ্রহী করে তুলতে এই প্রবন্ধে কারা-সংস্কৃতির বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দিক ও উপাদানসমূহ উন্মোচন করা হয়েছে। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের বিদ্যমান সংস্কৃতি সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তাকে কারা-সংস্কৃতির সাথে সূত্রাবদ্ধ করার মধ্যদিয়ে উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি:

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কারা-সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বকারী একটা রূপ চিত্রায়ণে যেসব তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে তা মূলত ২০১৪-১৫ সালে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, টঙ্গী, গাজীপুরে অবস্থানরত শিশু-কিশোরদের উপর পরিচালিত একটা নৃ-তাত্ত্বিক গবেষণাকর্ম থেকে প্রাপ্ত। এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে একবছর ধরে মাঠকর্ম চালানো হয়। লিখিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে নিবিড় সাক্ষাৎকারসহ অনানুষ্ঠানিকভাবে তাদের সাধারণ জীবনযাত্রা সম্পর্কিত তথ্য আলাপ-চারিতার ফাঁকে সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্য দিয়ে তাদের আচার-আচরণ, ভাবনা, বিশ্বাস ইত্যাদিকে বোঝার চেষ্টা করা হয়। সংগঠন অধ্যয়নে নৃ-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগে সীমাবদ্ধতা থাকলেও গবেষকের ঐকান্তিক চেষ্টা এবং তৎকালীন তত্ত্বাবধায়কের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় এই গবেষণাকর্মটি

সম্পাদিত হয়েছিল নৃ-বিজ্ঞানের পদ্ধতিগত দিক অনুসরণ করেই। উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন এর মাধ্যমে নির্বাচিত ১৫জন উত্তর দাতার কাছ থেকে নিবিড় সাক্ষাৎকার এর মাধ্যমে গুণবাচক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অন্যদিকে নিয়মতান্ত্রিক নমুনায়ন এর মাধ্যমে বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত ১৬৯ জন শিশু-কিশোরকে নির্বাচন করে লিখিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে সংখ্যাত্মক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

কারা-সংস্কৃতি নিয়ে পঠন-পাঠন:

ত্রয়োদশ শতকে ইংল্যান্ডে অপরাধীদের সংশোধন বা শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম কারা ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। তারই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে সংস্কারসহ কারা ব্যবস্থার বিস্তার ঘটে এবং ষোড়শ শতকে আধুনিক ধারার কারা ব্যবস্থাপনার সূত্রপাত ঘটে। কারা ব্যবস্থাপনা নিয়ে জ্ঞানকাণ্ডের বিভিন্ন শাখায় আলোচনার বিস্তৃতি ঘটলেও কারা-সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা, পঠন-পাঠন অতি সাম্প্রতিক। পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা মূলত কারা-সংস্কৃতি অধ্যয়নে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। কারা-সংস্কৃতি নিয়ে অধ্যয়ন বৈচিত্র্যময় হলেও সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞানকাণ্ডের বিভিন্ন শাখায় এটা অনেকটা উপেক্ষিত। এটা হতে পারে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে প্রাতিষ্ঠানিক বিধি নিষেধের বেড়াজালে গবেষণা কাজ সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা থেকে। সংস্কৃতি অধ্যয়নে বহুল ব্যবহৃত ও প্রচলিত গবেষণা পদ্ধতিসমূহ কারা-সংস্কৃতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় না। তবে আশার কথা দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত ও অনাদৃত কারা-সংস্কৃতি সাম্প্রতিক সময়ে তাত্ত্বিক বা গবেষকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এবং কারা-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক তাদের লেখনীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন।

মূলত ১৯৩৮ সালে Clemmer এর কারায়ণ (Prisonization) প্রত্যয় ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কারা-সংস্কৃতি অধ্যয়নের সূত্রপাত ঘটে।^২ এরই ধারাবাহিকতায় Sykes, Sykes এবং Messinger, Ward এবং Kassebaum প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী ও উল্লয়ন কর্মীরা কারাগারে অভিযোজন এবং সংস্কৃতির মূল উপাদানসমূহ কারা পরিবেশের উপর কী প্রভাব ফেলে তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন।^৩

কারা পরিবেশের সাথে অভিযোজন এবং এর মনোজাগতিক দিক নিয়ে আলোচনা, গবেষণা, পর্যালোচনা করেছেন Murray, Toch-সহ অনেকে।^৪ Crewe কারাগারের অমানবিক এবং মোড়কীকৃত দিকটি এবং এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন।^৫ Reimer প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ-এর মাধ্যমে কারা নেতৃত্বের ধরন এবং নেতা নির্বাচনে কারাগারের পরিবেশ এবং কারা পরিবেশ-এর উপর নেতার ক্ষমতা প্রয়োগের দিকটি তুলে ধরেছেন।^৬ অতি সাম্প্রতিকালে কারা-সংস্কৃতি আর গ্যাং সংস্কৃতির মেলবন্ধন সম্পর্কিত গবেষণায় Colvin, Irwin, Wooldredge, Stastray & Tyrnauer প্রমুখ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।^৭

সাধারণ অর্থে সংস্কৃতি হলো মানুষের সামাজিক জীবণাচরণ, মানুষের সামগ্রিক জীবনধারা প্রণালি। সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধ, আদর্শ, রীতি-নীতি, প্রথা, বিশ্বাস, ঐতিহ্য, অনুশাসন, অনুমোদন ইত্যাদির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে কোনো নির্দিষ্ট সমাজের সংস্কৃতি। সংস্কৃতি সম্পর্কিত এই ধারণা মূলত একটা প্রকৃত সংস্কৃতি বা আদর্শ সংস্কৃতিকে নির্দেশ করে। সংস্কৃতির এই আদর্শরূপ মূলধারার

জনগোষ্ঠীর জীবণাচরণের সাথে সম্পর্কিত, যেখানে মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলো সাবলিল ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়। সামাজিকীকরণের স্বাভাবিক ধারায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংস্কৃতির নিঃখ্যাসসমূহ মানুষ চেনন বা অবচেনন মনে আত্মস্থ করে, চর্চা করে, লালন করে। ধরে রাখে নিজস্ব স্বকীয়তা। কিন্তু যেখানে মানুষের জীবনধারা চার দেয়ালে বন্দী, যেখানে মানুষের দৈনন্দিন কার্যে কোনো স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে না; কঠোর বিধি-নিষেধ, সার্বক্ষণিক প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-কানুন আর কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে নিয়ন্ত্রিত সেই জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির রূপ-প্রকৃতি ভিন্ন হবে এটাই স্বাভাবিক। মূলধারার সংস্কৃতি থেকে পৃথক কোনো সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে চেনানোর জন্য নৃবিজ্ঞানীরা সেই সংস্কৃতির নাম দিয়েছেন উপসংস্কৃতি। কারা-সংস্কৃতি হচ্ছে এমনই এক উপসংস্কৃতি। কারা-সংস্কৃতি সম্পর্কে সংজ্ঞায়ন এর ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানী বা অপরাধ বিজ্ঞানীদের মধ্যে খুব একটা মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। যেমন- Cornelius বলেন,

Prison culture integrates knowledge, norms, values, mores and other common habits that have evolved naturally over time to form a framework which naturally influence those within it.^৮

অন্যদিকে, Theerathitiwong কারা-সংস্কৃতি সম্পর্কে বলেন,

Prison culture is a concept used to encapsulate the values, norms, and beliefs of prisoners. In their segregation from mainstream society, prisoners go through the process of prisonization in order to transition themselves into the environment, and prison culture becomes the prominent influence on prisoners' lives.^৯

দেখা যাচ্ছে যে কারা-সংস্কৃতি বলতে কারাগারে অবস্থানরত নিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনাচার, তাদের অনুসৃত রীতি-নীতি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, নেতৃত্ব, সামাজিক স্তরবিন্যাস কাঠামো ইত্যাদির সমন্বিত রূপকে বোঝায়।

তাত্ত্বিক কাঠামো:

সামাজিকীকরণ কৌশলকে মূলে রেখে অর্থ্যাৎ সামাজিকীকরণ সম্পর্কিত তত্ত্বসমূহকে মৌলিক ভিত্তি ধরে কারা-সংস্কৃতির তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মিত হয়েছে। কারা-সংস্কৃতি কারা পরিবেশ দ্বারা তৈরি কিংবা বাইরে থেকে উৎসারিত এমন বিতর্ক থেকে কারা-সংস্কৃতি অধ্যয়নের দেশীয় উৎপত্তি তত্ত্ব (Indigenous Origin or Endogenous Theory) এবং আমদানিকৃত মডেল/তত্ত্ব (Importation model), এ দু'ধরনের তাত্ত্বিক কাঠামো বা মডেল তৈরি হয়েছে এবং কারা-সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণাকারীরা এ মডেলকে তাদের গবেষণায় ব্যবহার করেছেন।

দেশীয় উৎপত্তি তত্ত্ব (Indigenous origin theory or deprivation model):

Clemmer ১৯৩৮ সালে কারায়ণ (Prisonization) প্রত্যয় প্রয়োগের মাধ্যমে এই তত্ত্বের প্রবক্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়। কারাগারে প্রবেশের সাথে সাথে নিবাসীর ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক অবস্থান ও ভূমিকার পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তিত পরিস্থিতি পরিবেশের সাথে অভিযোজন বা খাপ খাওয়ানোর বিষয়টি নিবাসীর জন্য তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারাগারে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সে কারা অভ্যন্তরে বিদ্যমান রীতি-নীতি আত্মস্থ করার কৌশল অবলম্বন করে। এই কৌশলকে বোঝানোর জন্য Clemmer ‘কারায়ণ’ প্রত্যয়টি ব্যবহার করে বলেন, “*prisonization*” as “*the taking on in greater or less degree of the folkways, mores, customs, and general culture of the penitentiary*”.^{১০} কারাগারে প্রবেশের সাথে সাথে স্বাভাবিক সামাজিকীকরণের মতো নিবাসীকে কারাগারের মধ্যকার প্রথা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, রীতি-নীতি শিখে নিতে হয় এবং সে অনুযায়ী আচরণ করতে হয়। কারাগারে অবস্থানের স্থায়িত্বের উপর এই শিখন প্রক্রিয়ার মাত্রাগত ভিন্নতা তৈরি হয়। কারাগারে অবস্থানের স্থায়ীত্বকাল দীর্ঘ হলে নিবাসীদের মূল্যবোধ, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা অনেক বেশি অসামাজিক বা সমাজবিরুদ্ধ (Anti-Social) হয়ে পড়ে। উদাহরণ হিসেবে তিনি নিবাসীদের ব্যবহৃত বিভিন্ন অপভাষা (Argot) প্রয়োগের বিষয়টি তুলে ধরেন। Clemmer এই কারায়ণ এর ধারণাকে সমর্থন করে Sykes^{১১} তার লেখনীর মাধ্যমে এটাকে আরও সমৃদ্ধ করেন। তিনি কারায়ণ এর সাথে বন্দিত্বের কষ্ট বা ব্যথা (Pain of imprisonment) প্রত্যয়টি যুক্ত করেছেন। কারাগারে প্রবেশের মধ্যদিয়ে ব্যক্তি সামাজিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকার হয়। এই বঞ্চনা, দুঃখ-কষ্ট লাঘবের উপায় হিসেবে বা অনেক সময় বঞ্চনার ক্ষতি পুষিয়ে নেবার জন্য কারা সংস্কৃতির সাথে উপযোজন ঘটায়, খাপ খাইয়ে নেয়। তাদের পারিবারিক বা সামাজিক ঐতিহ্যের বাইরে গিয়ে নতুন এক উপসংস্কৃতি তৈরি করে। Sykes বঞ্চনার কথা বলতে গিয়ে পাঁচ ধরনের ক্ষতি বা বঞ্চনার কথা বলেছেন যা কারাগারে প্রবেশের সাথে সাথে নিবাসী হারিয়ে ফেলে:

- স্বাধীনতা (Liberty)
- বস্তুগত দ্রব্য ও সেবা (Material goods and services)
- বিপরীত লিঙ্গীয় যৌন সম্পর্ক (Hetero sexual relationship)
- স্বায়ত্তশাসন হ্রাস (Autonomy)
- ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (Personal security)

কারাগারে আবদ্ধ থাকার ফলে নিবাসীরা যখন এই ক্ষতিসমূহের শিকার হয় তখন ক্ষতি পুষিয়ে নিতেও তারা তৎপর হয়। তখন এক বিশেষ ধরনের ভূমিকায় তারা অবতীর্ণ হয় যাকে Clemmer এবং Sykes অপভূমিকা বা Argot roles হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বস্তুগত দ্রব্য ও সেবা হারানোর ক্ষতিকে পুষিয়ে নিতে কারাগারের নিষিদ্ধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে চিহ্নিত করতে Marchant এবং Gorilla নামক যে দুটি অপভাষা ব্যবহার করা হয় উদাহরণ হিসেবে সেটা উল্লেখ করেছেন। Clemmer এবং Sykes এভাবে বিভিন্ন যুক্তি ও তথ্য দিয়ে দেখান যে, বন্দি জীবনের বঞ্চনা ও কষ্ট লাঘবের উপায় হিসেবে অপরাধের উপসংস্কৃতি বা কারা-সংস্কৃতির সৃষ্টি হয় এবং গতানুগতিক ধারায় তা চলতে থাকে। মোদাকথা কারাগার ব্যক্তির থেকে যেসব বিষয় কেড়ে

নেয় তারই প্রতিক্রিয়া হিসেবে কারা-সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে। এ মডেলকে তারা তাদের গবেষণায় ব্যবহার করেছেন।

আমদানিকৃত তত্ত্ব বা মডেল (Importation theory or model)

৬০ এর দশকে Clemmer এবং Sykes প্রদত্ত দেশীয় উৎপত্তি তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করে এর সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী তত্ত্বের অবতারণা করেন Irwin এবং Cressey। তারা তাদের আমদানিকৃত (Importation model) তত্ত্বের মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন যে, কোনো নিবাসী কারাগারে প্রবেশের সময় তার পূর্বের সামাজিক ও সংস্কৃতিক শিক্ষা পরিত্যাগ করে আসে না; বরং কারাপূর্ব মূল্যবোধ ও ধ্যান-ধারণা দ্বারা সে অন্যকে প্রভাবিত করে। কারাগারে অন্তরীণ হবার পর তাদের সেই দীর্ঘ দিনের শিক্ষণকৃত ও চর্চাকৃত আচরণ কারা-সংস্কৃতি বিনির্মাণে অবদান রাখে।^{১২} Clemmer এবং Sykes কে সমর্থন করে Schrag, Irwin এবং Cressy, Wellford, Thomas প্রমুখ তাত্ত্বিক দেশীয় উৎপত্তি তত্ত্বের কঠোর সমালোচনাপূর্বক আমদানিকৃত (Importation) তত্ত্বকে আরও বিস্তৃতি ঘটান। তারা দাবি করেন যে কারাগারে অভ্যন্তরীণ উপাদান নয় বরং কারাগারের বাইরের উপাদান; কারা-পূর্ব সামাজিকীকরণ এবং অভিজ্ঞতা দ্বারাই কারা-সংস্কৃতি প্রভাবিত হয়।^{১৩} এক্ষেত্রে তারা দুটি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন:

- নিবাসীর অতীত অভিজ্ঞতা (Past experience)
- নিবাসীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত দুর্ভাবনা (Future antilipation)

নিবাসীদের কারা পরিবেশের সাথে সম্পর্ক, সাড়া বা প্রতিক্রিয়া কীরূপ হবে তা নির্ভর করবে এ দুটি মৌলিক বিষয়ের উপর। এই মতবাদের নিরিখে কারা-সংস্কৃতির সাথে কারাগারে অন্তরীণ ব্যক্তির অভিযোজন নির্ধারণকারী উপাদানসমূহ হলো:

- সামাজিক শ্রেণি (Social class)
- কারাপূর্ব অপরাধ সম্পৃক্ততা (Preprison involvement in criminal behavior)
- মুক্ত সমাজে ব্যক্তির সাথে যোগাযোগের মাত্রা (Frequency of contact with individuals in the free society)
- কারা-পরবর্তী সম্ভাব্য জীবন সম্পর্কে ধারণা (Perception of their post prison life chances)

Irwin এবং Cressey বলেন, *Prisoners bring their own social, historical and personality traits with them to the prison environment and such aspects influence their subsequent behaviour in prison.*^{১৪}

মোট কথা, নিবাসীর জনবৈজ্ঞানিক (demographic) যেমন- লিঙ্গ এবং বয়স; সামাজিক (social) যেমন- শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য; মানসিক (Psychological) যেমন- বিষণ্ণতা, উদ্বিগ্নতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে কারাগারের আচরণের প্রকৃতি। এক্ষেত্রে Goffman দু'ধরনের

তাত্ত্বিক কাঠামোর প্রকৃতি সূত্রাবদ্ধ করেছেন এভাবে— *Inmates bring a culture with them to the institution, but after entrance to the institution they are stripped of this support by processes of mortification and dispossession aimed at managing the daily activities of a large number of persons in a small space with a small expenditure of resources.*^{১৫}

কারা-সংস্কৃতির উপাদানসমূহ (Elements of prison culture):

কারা-সংস্কৃতি কোনো স্থির বিষয় নয়। স্থান, কাল ও অবস্থান ভেদে এর ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। কারা-সংস্কৃতির তাত্ত্বিক ও গবেষকেরা তাদের নিজস্ব গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কারা-সংস্কৃতির উপাদানসমূহ নিম্নরূপে চিহ্নিত করেছেন:

Wooldredge^{১৬} কারা-সংস্কৃতির চারটি উপাদানের কথা বলেন:

- বিশ্বাস ব্যবস্থা (Belief system)
- স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা (Stratification system)
- বিনিময় অর্থব্যবস্থা (Barter economy)
- বিশেষ উপভাষা (Unique jargon).

Edger এবং Newel^{১৭} কারা সংস্কৃতির ছয়টি উপাদান নির্দেশ করেন, যাকে তারা Cultural web প্রত্যয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন:

- প্রতীক (Symbol)
- ক্ষমতা (Power)
- সাংগঠনিক কাঠামো (Organizational structure)
- নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Control system)
- রুটিন এবং প্রথা (Routine and rituals)
- শ্রুতিকথা এবং গল্প (Myth and story).

Clemmer এবং Sykes এর চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলে কারা-সংস্কৃতির দুটি মৌলিক উপাদান লক্ষ করা যায়:

- নিবাসী আচরণবিধি (Inmate codes)
- স্বাতন্ত্র্যসূচক ভাষা (Distinctive language)

বহুল ব্যবহৃত আচরণ বিধি হলো:

- নিরাপত্তা রক্ষীদের বিশ্বাস করো না (Do not trust guards)
- নিজেকে সামলাও (Maintain yourself)

- অন্য নিবাসীর সাথে ঝগড়া করো না (Donot quarrel with fellow inmates)
- অন্যের ব্যাপারে নাক গলাবে না (Do your own time by keeping your nose out of other people's business) ইত্যাদি।

Theerathitiwong নিবাসী আচরণবিধি (Inmate Codes) সম্পর্কিত আলোচনায় বলেন,

Prisoners commonly have to demonstrate that they belong to this culture by complying with the "inmate code" to ensure that their time in prison is peaceful and non-violent. This includes standing up for them to protect their honor, not betraying their fellow inmates by colluding with prison officers, or being compliant to the general rules and structures of the prison.^{১৩}

Sykes^{১৪} লেখনীর মাধ্যমে আরও যে উপাদানগুলো চিহ্নিত করেছেন:

- সমকামিতা (Homosexual relationship)
- জুয়া (Gambling)
- প্রতারণা (Fraud)
- হিংস্রতা (Violence)

Clemmer^{১৫} কারায়ণ এর ক্ষেত্রে চারটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন:

- নম্বর এর ভিত্তিতে পরিচিত (Referred to a number)
- নিম্নতর ভূমিকা গ্রহণ (Acceptance of an inferior role)
- নিয়ন্ত্রিত জীবন (Controlled life)
- ভিন্নতর বাথরুম অভ্যাস (Different bathroom habits).

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কারা-সংস্কৃতি ও কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের সংস্কৃতি:

শিশু আইন-২০১৩ অনুযায়ী আইনের সাথে সংঘর্ষে জড়িত বা সংস্পর্শে আসা শিশু বা অভিভাবক কর্তৃক প্রেরিত শিশুদের উন্নয়ন ও স্বভাবিক জীবনে একীভূত করার লক্ষ্যে শিশু (কিশোর/কিশোরী) উন্নয়ন কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহে আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু ও অভিভাবক কর্তৃক প্রেরিত শিশুদের কেইস ওয়ার্ক, গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে মানসিকতার উন্নয়ন, ডাইভারশন ইত্যাদি পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন করে কর্মক্ষম ও উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনে ৫ দশমিক ৩৪ একর জমিতে প্রাথমিকভাবে ২০০ বন্দি ধারণক্ষমতা সম্পন্ন কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র টঙ্গী, গাজীপুর প্রতিষ্ঠিত হয়। গবেষণা চলাকালীন সময়ে সেখানে ৪০০ শিশু-কিশোর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

টেবিল-১: এক নজরে টঙ্গী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র

তথ্যাদি	টঙ্গী
প্রতিষ্ঠা কাল	১৯৭৮
এরিয়া (একর)	৫.৩৪
প্রতিষ্ঠাকালীন অনুমোদিত ধারণ ক্ষমতা	২০০ (গবেষণাকালীণ সময় ৪০০)
অনুমোদিত কর্মকর্তা/কর্মচারী	৫৭
কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী	৩৭
শূন্য পদ	২০

সূত্র: এই টেবিলটি সিডিসি কর্তৃপক্ষ, দ্বারা প্রদর্শিত চার্টের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে (২০১৫)।

বাংলাদেশে কারাগার সংক্রান্ত আলোচনায় কারা ব্যবস্থাপনার বিষয়টি দৃশ্যমান। কারাগার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন আইনগত দিক ও সমস্যার উপর আলোকপাত করেছেন অনেক সমাজবিজ্ঞানী, অপরাধ বিজ্ঞানী, আইন বিষয়ে পারদর্শী বিশিষ্টজনেরা। Sarker, Sattar এবং Balagopal, Ferdousi, Khair এবং Khan, Sharmin and Islam, Sharmin, Dey প্রমুখেরা মূলত কারা ব্যবস্থাপনা ও এর দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করেছেন তাদের লেখনীর মাধ্যমে।^{২১} কারা-সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা বাংলাদেশের পেঞ্চাপটে বেশ দুর্লভ।

ফলাফল বিশ্লেষণ:

বাংলাদেশের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের দৈনন্দিন জীবন গতানুগতিকভাবে যে উপাদানগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয় তাকে আমরা সহজেই কারা-সংস্কৃতির আলোকে আলোচনা করতে পারি। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে অবস্থানরত শিশু-কিশোরদের জীবন-ভাবনা, আচার-আচরণ, বিশ্বাস, রীতি-নীতি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এবং নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে যে তথ্যগুলো সংগৃহীত হয়েছে তাদের মধ্যে কারা-সংস্কৃতির ঐতিহ্য পরিলক্ষিত হয়।

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র কারাগার থেকে উদ্দেশ্যগত ও পদ্ধতিগত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দর্শনে প্রতিষ্ঠিত হলেও এখানে আগত ও বসবাসরত শিশু-কিশোরদের বিবরণ ও দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ও বিধি-বিধান সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য মূলত কারা-সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে প্রকাশ করে। উন্নয়ন কেন্দ্রে আগত অভিভাবক, এমনকি এর আশেপাশের জনগন ও এটাকে বাচ্চাদের জেলখানা বা কারাগার হিসেবেই চেনে। কঠোর প্রশাসনিক ও প্রশাসনবহির্ভূত রীতি-নীতি প্রথা দ্বারা উন্নয়ন কেন্দ্রের দৈনন্দিন কার্যাবলি পরিচালিত হয়-যা মূলত কারা-সংস্কৃতির মৌল বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। তাই কারা-সংস্কৃতি ও কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের সংস্কৃতি একে অন্যের পরিপূরক। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের সংস্কৃতি কারা-সংস্কৃতিরই অন্য সংস্করণ, কারা-সংস্কৃতিরই ঐতিহ্যমণ্ডিত। কারা-সংস্কৃতির মৌল বিষয়গুলো গতানুগতিক ধারায় এখানে আগত শিশুদের শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মস্থ করতে হয়। কোন নিবাসী সেটা অনুসরণে শিথিলতা দেখালে তার জন্য বরাদ্দ থাকে সেই সংস্কৃতি নির্ধারিত শাস্তি। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশাসনিক নিয়ম অনুযায়ী আদালত কর্তৃক বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক প্রেরিত (৯-১৮) বছর বয়সের কোনো শিশু বা কিশোর উন্নয়ন-কেন্দ্রে আগমনের সাথে সাথে তার প্রাতিষ্ঠানিক রেজিস্ট্রেশন করা হয়। প্রত্যেক

শিশুর জন্য একটা করে ফাইল, যার মধ্যে তার মৌলিক তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধ থাকে। একজন সোশাল কেস ওয়ার্কার (Social case worker) এর তত্ত্বাবধানে তাকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। এভাবে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শেষে প্রেরণ করা হয় তার জন্য নির্ধারিত ডরমেটরি বা হাউজে। হাউজে প্রবেশের পরই শুরু হয় কারা-সংস্কৃতি শিখনের হাতেখড়ি। নির্ধারিত রুমে প্রবেশক্ষেপে হাউজ বড় ভাই নাম, পিতার নাম জিজ্ঞেস করতে করতে শুরু করে বেদম প্রহার। তারা প্রথমে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। এভাবেই শুরু হয় তার কারা-জীবন; কারা-সংস্কৃতি শিখন ও চর্চা। প্রথম দিন কিছু বুঝে উঠতে না পারলেও দু’-একদিনের মধ্যে তার কাছে সব স্পষ্ট হয়ে যায় এবং যতদিন উন্নয়ন কেন্দ্রে অবস্থান করে ততদিন এটা মেনে নেয়। প্রথম দিকে হোঁচট খেলে ও ধীরে ধীরে ছকে বাঁধা জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যায়। জন্ম থেকে অনুসৃত অভ্যাস ত্যাগ করে নতুন প্রেক্ষাপটে নতুন পরিবেশে, সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবনাচরণে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। কারা পরিবেশে, কারাগারের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কঠোর নিয়ম-কানুন, রুটিন এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধান মেনে চলতে হয়। কখন ঘুম থেকে উঠতে হবে, কখন ঘুমিয়ে পড়তে হবে, কখন কী খেতে হবে, কখন কতটুকু সময় খেলতে হবে, কবে কখন বাবা মায়ের সাথে কথা বা দেখা করতে পারবে সব বিধি নিষেধ দ্বারা পরিচালিত, যা নিম্নের টেবিলের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে:

টেবিল-২: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের দৈনিক রুটিন

সময়	কার্যকলাপের প্রকৃতি
৬.০০টা-৭.০০ টা	ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, নামাজ, ঘর পরিষ্কার, বিছানা গোছানো
৭.০০টা-৮.০০টা	শারীরিক ব্যায়াম
৮.০০টা-৯.০০টা	গোসল, প্রাতরাশ, সমাবেশের জন্য প্রস্তুত
৯.০০টা-৯.৩০ টা	সমাবেশে অংশগ্রহণ, স্কুলে গমন এবং ট্রেনিং এ অংশগ্রহণ
৯.৩০ টা-১২.৪৫টা	সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কৃষিকাজ এবং বাগান
১২.৪৫টা-২.০০টা	জোহরের নামাজ, দুপুরের খাবার গ্রহণ
২.০০টা-৪.৩০টা	সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কৃষি, বাগান এবং খেলাধুলা
২.০০টা-৪.৩০টা	সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কৃষি, বাগান এবং খেলাধুলা
৪.৩০টা-৫.০০টা	আসরের নামাজ
৫.০০টা-৫.৩০টা	হাউস অবস্থান এবং ইনডোর গেমসে
৫.৩০টা-৬.০০টা	মাগরিবের নামাজ/ দোয়া
৬.০০টা-১০.০০টা	পড়াশোনা, বাড়ির কাজ, এশার নামাজ ও টিভি দেখা

উৎস: এই টেবিলটি কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রদর্শিত চার্টের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে (২০১৫)।

এ প্রসঙ্গে Irwin^{২২} বলেন,

prison life is completely routinized and restricted,” over time “prisoners steadily lose their capacity to exert power and control their destiny....” He elaborates: “Months or years of getting up at a certain

time to certain signals, going about the day in a routine fashion, responding to certain commands, being among people who speak a certain way, and doing things repetitively inures prisoners to a deeply embedded set of unconscious habits and automatic responses”.

দীর্ঘ দিন ধরে এই রুটিন বা বিধি-বিধান মতো চলতে থাকলে একটা সময় তা স্বাভাবিক জীবনের অনূঙ্গ হয়ে যায়। বাংলাদেশের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের সংস্কৃতি যা কারা-সংস্কৃতির ঐতিহ্য মণ্ডিত। বিচার বিশ্লেষণ শেষে যে উপাদানগুলো বা প্রলক্ষণগুলো পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপে চিহ্নিত করা যায়:

খাদ্যাভ্যাস (Food habits):

উন্নয়ন কেন্দ্রে বসবাসরত শিশু-কিশোরদের খাদ্যাভ্যাস তাদের মুক্তজীবন থেকে ভিন্ন। তাদের নিজেদের পছন্দমত খাদ্য উপাদান নির্বাচন করার, নিজেদের সুবিধাজনক সময়ে খাদ্য গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। দিনের পর দিন একই রুটিন অনুযায়ী একই খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করতে হয় যা পারিবারিক আবহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। খাদ্যাভ্যাসের এই কঠোর রুটিন অনুসরণ করতে প্রথম প্রথম খুব অসুবিধা হলেও পরবর্তী সময়ে জীবনের তাগিদে তাতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। খাদ্য তালিকায় ভাত, সবজি ও ডালের উপস্থিতি বেশি লক্ষ করা যায়-যা শিশু কিশোরদের কাছে সবচেয়ে অপ্রিয়।

টেবিল-৩: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের সাপ্তাহিক খাদ্য তালিকা

বারের নাম	সকালের নাস্তা	দুপুরের খাবার	বিকালের নাস্তা	রাতের খাবার
শুক্রবার	ভাত ও ডাল	ভাত, সবজি, মুরগির মাংস ও ডাল	সিঙ্গারা	ভাত, সবজি ও ডাল
শনিবার	ভাত, সবজি ও আলু	ভাত, সবজি, পাঙ্গাস/রুই/তেলাপিয়া মাছ ও ডাল	মুড়ি-চানাচুর	ভাত, সবজি ও ডাল
রবিবার	ভাত ও ডাল	ভাত, সবজি, মুরগির মাংস ও ডাল	কলা	ভাত, সবজি ও ডাল
সোমবার	ভাত, সবজি ও আলু	ভাত, সবজি, ডিম ও ডাল	দুধ ও চিনি	ভাত, সবজি ও ডাল
মঙ্গলবার	খিচুড়ি	ভাত, সবজি, ডিম ও ডাল	বাটার বান ও ভাত	ভাত, সবজি ও ডাল
বুধবার	ভাত, সবজি ও আলু	ভাত, সবজি, ডিম ও ডাল	মুড়ি ও চানাচুর	ভাত, সবজি ও ডাল
বৃহস্পতিবার	ভাত ও ডাল	ভাত, সবজি, ডিম ও ডাল	বাটার বান ও ভাত	ভাত, সবজি ও দুধ

উৎস: এই টেবিলটি সিডিসি কর্তৃপক্ষ, প্রদর্শিত চার্টের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে (২০১৫)।

পোশাক-পরিচ্ছদ (Clothing):

যেকোনো সংস্কৃতির পরিচয় বহনকারী অন্যতম উপাদান হচ্ছে পরিধেয় কাপড় বা পোশাক। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের জন্য আছে বিশেষ পোশাক কোড, সাদা শার্ট ও নীল ট্রাউজার/ প্যান্ট। তবে চব্বিশ ঘণ্টা এই পোশাক পরিধান করতে হয় না। সকালের এসেম্বলি আর স্কুলের সময় অবশ্যই এটা পরিধান করতে হয়। নিবাসীদের পোশাক-আশাক বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শরীরের সাথে লাগসই নয়। কারো শার্টটা ছোট, কারোটা আবার বড়, কারো ছেঁড়া, কারোটা নতুন আবার কারোটার বোতাম নেই। এসব বিষয়ে তাদের কোন ক্রক্ষেপ ও নেই। এটা ই স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়। মূলত কেন্দ্রে সব নিবাসী নতুন ড্রেস পায় না। কেন্দ্র ছেড়ে যাওয়া নিবাসীদের ফেরতদানকৃত ড্রেস অনেককে পরতে হয়। বাড়ি থেকে পোশাক আনার বিধান রয়েছে। তবে সাধারণ নিরীহ নিবাসীর কোনো জামা-কাপড় নেতা গোছের অন্য কোনো নিবাসীর পছন্দ হলে বিপত্তি। সুমন নামের এক কিশোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বর্ণনা দিতে দিয়ে বলে, *কোনো অনুমতির তোয়াক্কা না করেই সেগুলো বড় ভাইদের দখলে চলে যায়।* তার এই অভিজ্ঞতার Sykes (১৯৫৮) বর্ণিত উপাদান-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ও চিকিৎসা ব্যবস্থা (Personal hygiene and health system):

কেন্দ্রে অবস্থানরত শিশু-কিশোররা নিজেদের শরীরের প্রতি যত্নশীল না হলেও ব্যবহার্য বিছানাপত্র ও থালাবাসন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি রাখতে বাধ্য। বড় ভাইদের নির্দেশনায় রোস্টার ডিউটির মাধ্যমে তাদের শোবার রুম, বাথরুম, বারান্দা পরিষ্কার করতে হয়। বাড়িতে এই বয়সী শিশু কিশোররা এসব কাজ না করলেও উন্নয়ন কেন্দ্রে তারা তা করতে বাধ্য। নতুন অবস্থায় সবাইকে এ কাজগুলো শিখতে হয় ও করতে হয়। নিবাসীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে তেমন নজর দেওয়া হয় না। অধিকাংশ নিবাসীর গায়ে ময়লা, চুল এলোমেলো, পোশাক ও ময়লা পাওয়া যায়। চুল বড় হলেই কাটার ব্যবস্থা হয় সমষ্টিগতভাবে। যখন বড় সংখ্যক নিবাসীর চুল বড় হয় তখন নাপিত ডেকে এক সাথে সবার চুল কেটে দেওয়া হয়। নখ কাটার জন্য একটা ব্রেড অর্ধেক করে তাতে সুতা বুুলিয়ে দেওয়া হয়। কাজ শেষে সেটা ফেরত দেওয়া অবধারিত। এর পেছনে অবশ্য তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি জড়িত। নিবাসীদের মধ্যে সাধারণ জ্বর-কাশি সর্দি দেখা গেলে একজন প্যারামেডিক্স এর মাধ্যমে চিকিৎসা দেওয়া হয়। নিবাসীদের মধ্যে ৭৯% উত্তরদাতা বিশ্বাস করে যেকোনো রোগেই তাদের প্যারাসিট্যামল বড়ি দেওয়া হয়। খুব বেশি অসুস্থ হলে নিকটস্থ সরকারি হাসপাতালে পুলিশ প্রহারায়ে প্রেরণ করা হয়। নিবাসীদের মধ্যে চর্মরোগের প্রাধান্য। চর্মরোগ থেকে উদ্ধার পেতে তারা ডেটল সাবান ব্যবহার করে, যা তাদের অভিভাবকরা সরবরাহ করে।

শিক্ষা ব্যবস্থা (Educational system):

উন্নয়ন কেন্দ্রের শিশু-কিশোররা দু'ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে পরিচিত: প্রাথমিক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা। বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। এখানে মাত্র তিনজন শিক্ষক দ্বারা পাঁচটি শ্রেণির শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। একজন শিক্ষক বিশেষ করে প্রধান শিক্ষক একই সময়ে তিনটি শ্রেণির কার্যক্রম পরিচালনা করেন। শিক্ষার মূল উপকরণ

বই, খাতা, চক আর ডাস্টার। বই, খাতা শিশুরা হাউজে নিতে পারে না। ক্লাশরুমের স্বল্পতা ও ক্লাশরুম কাঠামোগত আকারে খুব ছোট হওয়ায় বিকল্প রুটিন অনুসরণ করা হয়। প্রথম তলার শিশুদের ক্লাশ রবিবার হলে ২য় তলার শিশুদের ক্লাশ হয় সোমবার। এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই কোনো পরীক্ষা, নেই কোনো প্রমোশন। পঞ্চম শ্রেণি উর্ধ্ব শিশুদের জন্য আছে কম্পিউটার শিক্ষা। কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা তড়িৎ কৌশল, সেলাই, কাঠমিস্ত্রি ইত্যাদির সমন্বয়ে পরিচালিত। মূলত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মত কাঠামোবদ্ধ নয়; শুধু সময় পার করা মাত্র। তাও আবার পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। এর উপরের ক্লাশের ছেলেদের জন্য কার্যত পড়াশোনার কোনো ব্যবস্থা নেই। অথচ এখানে H.S.C লেভেল-এর কিশোরদের অবস্থান করতে হয়। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭৩% মনে করে এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত 'টাইম পাস'।

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও বন্টন ব্যবস্থা (Control and distribution system):

উন্নয়ন কেন্দ্রের বন্টন ব্যবস্থা যতটা না আইনসিদ্ধ (কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত) তার চেয়ে অনেক বেশি কারা-সংস্কৃতির ঐতিহ্য দ্বারা নির্ধারিত। শিশু-কিশোরদের মধ্যে খাবার বন্টন থেকে শুরু করে পোশাক বিতরণ, কর্ম বিভাজন, শাস্তি প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হাউজ বড় ভাই। কেন্দ্রের অবস্থানের স্থায়ীত্বকাল, অপরাধের ধরণ ও মাত্রা, কারাগারে প্রবেশের পুনরাবৃত্তি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পারিবারিক আর্থিক সক্ষমতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় প্রাপ্যতা। হাউজ বড় ভাই আর রুম বড় ভাইদের কায়িক কোনো পরিশ্রম করতে হয় না। সুমন (১৬) নামের এক কিশোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বর্ণনা দিতে দিয়ে বলে, হাউজ বড় ভাইয়ের নির্দেশ পালনে সবাই বাধ্য; কোনো ব্যত্যয় ঘটলে মুখোমুখি হতে হয় ভয়ংকর সব শাস্তির।

সাংগঠনিক কাঠামো ও স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা (Organizational structure and stratification system):

উন্নয়ন কেন্দ্রের ক্ষমতা কাঠামোতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও মর্যাদার দাবিদার 'হাউজ বড় ভাই'। সে একটা তলার নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী, বন্টন ব্যবস্থার মূল ক্রিড়ানক, টিভির রিমোট এর নিয়ন্ত্রক। দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রে অবস্থান, মারাত্মক অপরাধে অভিযুক্ত, শারীরিকভাবে শক্তিশালীরা হাউজ বড় ভাই হবার যোগ্যতা অর্জন করে। কেন্দ্রের প্রতিটি তলায় একজন করে হাউজ বড় ভাই থাকে। এর পরে আছে 'রুম বড় ভাই' একটা রুমের দায়িত্বে। দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে এদের ক্ষমতা ও মর্যাদার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। যেমন- টেলিভিশন এর রিমোট নিয়ন্ত্রণ করবে হাউজ বড় ভাই, তার বসার স্থান হলো চকি (খাট)। রুম বড় ভাইয়েরাও তার সাথে চকিতে বসার সুযোগ পায়। এদেরকে সবাই তাই 'চকি পাস' বলে আলাদাভাবে সমীহ করে। একই তলায় যারা একটু সিনিয়র তারা বসবে ড্রাম এর উপর; তাই তারা 'ড্রাম পাস'। বাকিরা বসবে খালি ফ্লোর-এ এরা হলো 'পাবলিক'। তেমনি জুতা/সেডেল ব্যহারের ক্ষেত্রেও আছে বিভিন্ন বাধা-নিষেধ। যারা সবসময় স্যাডেল ব্যবহার এর সুযোগ পায়, বিশেষ করে বাথরুমে প্রবেশের সময় তারা 'জুতা পাস'। যারা হাটার সময় চারটা টাইলস-এ পা দিতে পারবে তারা 'চারস্টিক পাস'। হাউজ বড় ভাই আর রুম বড় ভাইদের থালা-বাসন, বিছানা-পত্র ইত্যাদি পরিষ্কার, সংরক্ষণ ও গোছানোর কাজটি করে পাবলিকরা। ৭৫% উত্তরদাতা নিজেদের 'পাবলিক' মনে করে। তাদের মতে পাবলিকদের

কোনো মর্যাদা নেই। “রিপন ভাই এই কেন্দ্রের হর্তাকর্তা। তার নির্দেশ মাইনা মোদের চলতি হয়। না মানলে ভেদম মার খাতি হয়।” –তাদের এই বক্তব্য Edger এবং Newel (২০০৬) এর মতামতকে সমর্থন করে।

ধর্মীয় ব্যবস্থা (Religious system):

কেন্দ্রে অবস্থানরত ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বাধ্যতামূলক। প্রতিটি তলার প্রবেশ রুমটা মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিশোরদের মধ্য থেকে ইমাম নির্ধারিত হয়। নামাজ আদায়ের কঠোরতা নির্দেশক বাক্য হলো: বন্দুকের গুলি মিস হবোতো নামাজ মিস হবে না। তবে ‘হাউজ বড় ভাই’ এর নামাজ আদায় এর বিষয়টি ইচ্ছাধীন। করিম (১৭) নামক বড় ভাই মনে করে তার নামাজ না পড়ার রাইটস্ আছে। অন্যদিকে ইকবাল (১৭) নামের যে কিশোর ইমামতির দায়িত্ব পালন করে সে আবার খুনের আসামি। কিশোররা এটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আবার কানাঘুসা করে।

অপভাষা ও সংকেত (Jargon and symbol):

কারা-সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান অপভাষা ও সংকেত যা কেন্দ্রে অবস্থানরত শিশু-কিশোররা নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করে। আগেই বলেছি তারা চকি পাস, জুতা পাস, ডন ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহার করে নিজের ক্ষমতা, মর্যাদা নির্দেশক শব্দ হিসেবে। যেমন ‘সাগর’ নামের বড় ভাইকে তারা ‘ডন’ হিসেবে চিহ্নিত করে। কাউকে শাস্তি দিতে ‘গিটলী’ ব্যবহার করে। গামছা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ‘গিটলী’ বানানো হয়। গিটলী দিয়ে পিটালে লোহার মত লাগে। তাদের এই বক্তব্য Wooldredge (২০২০) বর্ণিত উপাদানএর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

হিংস্রতা, অনৈতিক ও অপরাধমূলক কার্যক্রম (Violence, unethical and criminal activities)

কারা-সংস্কৃতির ধারায় উন্নয়ন কেন্দ্রের কিশোরদের মধ্যে সমকামিতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে ‘বড় ভাই’ নিরীহ শিশুদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়, তাদের যৌন তাড়না-বাসনা চরিতার্থ করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ করা হয়। দু’একটা ক্ষেত্রে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে যৌন তাড়না পরিতৃপ্ত করে। কেন্দ্রের মধ্যে চর্চাকৃত হিংস্রতা দেখাতে গিয়ে রাকিম (১৭) নামের কিশোর তার গায়ের আঘাতের চিহ্ন দেখিয়ে বলে, “এখানে কেউ যদি একদিন থাকে তাহলে তার ১০ বছরের আয়ু কমে যাবে। নেতৃস্থানীয় বড় ভাইদের মধ্যে আবার মাদকদ্রব্য সেবনের ও প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কখনও তারা মাদকদ্রব্য বাইরে থেকে সংগ্রহ করে। আবার কখনও পচা দুধের সাথে প্যারাসিটেমল ট্যাবলেট মিশিয়ে নিজেরাই নেশা জাতীয় এক প্রকার মাদক তৈরি করে। মাদকদ্রব্য সংগ্রহ করতে হাউজ বড় ভাইকে টাকা দিতে হয়। যারা দিতে না পারে তাদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়।” এই ধরনের চর্চা Wooldredge (২০২০) এবং Sykes (১৯৫৮) উল্লিখিত উপাদানের সাথে সমর্থিত।

উপসংহার:

বাংলাদেশের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে কারা-সংস্কৃতির গতানুগতিক ধারা-ই বিরাজমান যা উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়েছে। শিশু-কিশোরদের অপরাধমূলক আচরণ বা চরিত্র সংশোধন এবং অপরাধের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সমাজকে মুক্ত রাখতে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের আবির্ভাব। কিন্তু নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ও তাত্ত্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, নামে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র হলেও বাংলাদেশের এ সর্বাঙ্গিক প্রতিষ্ঠানটি কারাগার হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। তাই কারা-সংস্কৃতি ও কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের আন্তঃসম্পর্ক নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করা দরকার। কারা-সংস্কৃতি অধ্যয়নের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের পরিবেশকে পর্যবেক্ষণ করলে এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দিকসমূহ উন্মোচিত হয়। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের বিদ্যমান সংস্কৃতি বহুলাংশেই কারাগারের সংস্কৃতির নির্ধারক; কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের সংস্কৃতি কারা-সংস্কৃতির প্রতিরূপ। কারা-সংস্কৃতি সম্পর্কিত ‘আমদানীকৃত মডেল’-এ Clemmer এবং Sky (১৯৫৮) যে সমস্ত উপাদানসমূহ উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে বিদ্যমান সংস্কৃতিতে তারই প্রতিফলন দেখতে পাই। ভিন্ন ভিন্ন আর্থ-সামাজিক পরিবেশ থেকে আগত হলেও শিশু-কিশোররা যখন কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রবেশ করে তখন থেকেই কেন্দ্রে অনুসৃত আচার-আচরণই তাদের অনুসরণ ও অনুকরণ করতে হয়।

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের সংস্কৃতি চরিত্র সংশোধনের পক্ষে সহায়ক নাকি অন্তরায় সেটা অনুধাবণ করা আবশ্যিক। এর জন্য বাংলাদেশের কারা-সংস্কৃতির অনুষঙ্গসমূহ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কারা ব্যবস্থাপনার সাথে কারা-সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারাগারের সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকলে নীতি নির্ধারণের সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারেন। কারা-সংস্কৃতি বা কারা পরিবেশ ও কারা ব্যবস্থাপনাকে প্রভাবিত করে। কারাগার থেকে জামিন পেয়ে অথবা একেবারে মুক্ত হয়ে আবার অপরাধমূলক কাজে যুক্ত হবে কি না তা অনেকটা নির্ভর করবে কারা অভ্যন্তরে অনুসৃত সংস্কৃতির উপর। কারাগারের মূল্যবোধ যদি অপরাধপ্রবণ হয় তাহলে কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর নিবাসীরা পুনরায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে পারে। বন্দি জীবন থেকে বের হবার পর অনেক সময় শিশু-কিশোররা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আর অনেক ক্ষেত্রেই তা প্রকাশ পায়। শিশু-কিশোরদের আচরণকে সঠিক করে তোলার জন্য পলিসি গ্রহণকালে কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতি বিবেচনায় নেওয়া দরকার। এতে করে বাস্তবচিহ্ন সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। বাংলাদেশে কারা-সংস্কৃতি সম্পর্কিত প্রায়োগিক জ্ঞান অন্বেষণ তাই যথেষ্ট গুরুত্ব বহনকারী ‘ডিসকোর্সে’ পরিণত হতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

১. Erving Goffman, “On the Characteristics of Total Institutions” in *The Prison: Studies in Institutional Organization and Change*, ed. D. Cressey (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1961), p. 312.
২. Donald Clemmer, "Leadership Phenomena in a Prison Community," *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 28, 1938, pp. 861-72.

৩. Gresham M. Sykes, *The Society of Captives* (New York: Princeton University Press, 1958), p. 5; Gresham M. Sykes and Sheldon L. Messinger, "The Inmate Social System," in *Theoretical Studies in Social Organization of the Prison*, ed. R. Cloward (New York: Social Science Research Council, 1960), pp. 5-19; David Andrew Ward, and Gene Girard Kassebaum, *Women's Prison: Sex and Social Structure* (Chicago: Aldine Publishing, 1965), p. 10.
৪. Henry A. Murray, *Explorations in Personality: A Clinical and Experimental Study of Fifty Men of College Age* (New York: Oxford Univ. Press, 1938), p. 480; Hans Toch, *Living in Prison: The ecology of survival* (New York: The Free Press, 1977), p.199.
৫. Ben Crewe, *The Prisoner Society: Power, Adaptation and Social Life in an English Prison* (Oxford, UK: Oxford Univ. Press, 2009), p. 149.
৬. Hans Reimer, "Socialization in the Prison Community," in *Proceedings of the American Prison Association* (New York: Am. Prison Assoc., 1937), pp. 151-55.
৭. Mark Colvin, *The Penitentiary in Crisis: From Accommodation to Riot in New Mexico* (Albany, NY: SUNY Press, 1992), p. 177; John Irwin, *Prisons in Turmoil* (Little Brown and Company, Boston, 1980), p. 112; John Wooldredge, "Prison Culture, Management, and In-Prison Violence," *Annual Review of Criminology*, Vol. 3 (2020), pp. 165-188; Charles Stastny and Gabrielle Tyrnauer, *Who Rules the Joint: The Changing Political Culture of Maximum-Security Prisons in America* (Lexington, MA: Lexington Books, 1982), p. 154.
৮. G. F. Cornelius, "Understanding Prison Culture is the Key to Inmate Management," *Corrections Today*, Vol. 54, no. 8 1992, pp. 138-142.
৯. Sitthana Theerathitwong, "Prison Culture," *The Encyclopedia of Corrections*, 2017, pp. 1-4.
১০. Donald Clemmer, *The Prison Community* (Chicago, IL: Holt, Rinehart and Winston, 1958), p. 299.
১১. Gresham M. Sykes, *op.cit.*, 1958), p. 63
১২. John Irwin and Donald R. Cressey, "Thieves, Convicts and the Inmate Culture," *Social Problems*, Vol.10, no. 2, 1962, pp. 142-155.
১৩. Clarence Schrag, "Some Foundations for a Theory of Correction," in *The Prison: Studies in Institutional Organization and Change*, ed. D. R. Cressey (New York: Rinehart & Winston, 1961), pp. 309-357; John Irwin and Donald R. Cressey, *op.cit.*, 1962, p.152; Charles Wellford, "Factors Associated with Adoption of the Inmate Code: A Study of Normative Socialization," *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, Vol. 58, no. 2, 1967, pp. 197-203; Charles W. Thomas, "Prisonization or Resocialization? A Study of External Factors Associated with the Impact of Imprisonment," *Journal of Research in Crime and Delinquency*, Vol. 10, no. 1, 1973, pp. 13-22.

১৪. John Irwin and Donald R. Cressey, *Social Problems*, op.cit., 1962, p.153.
১৫. Erving Goffman, "The Inmate World," in *The Prison: Studies in Institutional Organization and Change*, ed. D. Cressey (New York: Holt, Rinehart, and Winston, Inc., 1961), pp. 358-380.
১৬. John Wooldredge, *Annual Review of Criminology*, op.cit., 2020, p.171.
১৭. Kimmet Edgar and Tim Newell, *Restorative Justice in Prisons: A Guide to Making It Happen* (Winchester: Waterside Press, 2006), p. 41.
১৮. Sitthana Theerathitiwong, op.cit., 2017, p.1.
১৯. Gresham M. Sykes, op.cit., 1958, p. 84.
২০. Donald Clemmer, *Journal of Criminal Law and Criminology*, op.cit., 1938, p. 861-72.
২১. Abdul Hakim Sarker, *Juvenile Delinquency: Dhaka City Experience* (Dhaka: Human Nursery for Development, 2001); N. Sattar and G. Balagopal, *Traditional Means of Dealing with Children in Conflict with the Law with Specific Reference to Bangladesh: Bringing Juvenile Justice into Focus* (Dhaka: UNICEF, 1998); Nahid Ferdousi, "Deprived Children in the Development Centers," *The Daily Star*, April 21, 2015. <https://www.thedailystar.net/law-our-rights/deprived-children-the-development-centers-78343>; Sumaiya Khair and Sharfuddin Khan, *Shoshur Bari: Street Children in Conflict with the Law* (Dhaka: Save the Children UK, 2000); Sabina Sharmin and Nazmul Islam, "Juveniles in Development Center: A Case Study on Some Selected Prison Inmates in Bangladesh," *Jagannath University Journal of Social Sciences*, Vol. 2, no. 1-2, 2014, pp. 108-125; Sabina Sharmin, "Inside Child Development Center (CDC): Evidence from Bangladesh," *Bangladesh University Journal*, Vol. 3, no. 1, 2019, pp. 49-60; Shilpi R. Dey, "Children of the Tongi Child Development Centre (CDC): Their Experiences Before Detention," *The Dhaka University Studies*, Vol. 37, no. 1, 2021, pp. 255-275.
২২. John Irwin, op.cit., 1980, p. 166.

দিনাজপুরের সাঁওতাল নারীর আর্থ-সামাজিক জীবন: একটি পর্যালোচনা

সুফিয়া খাতুন*

Abstract

Dinajpur was an agriculture predomant district and was economically prosperous from ancient times. The economy of Dinajpur mainly depended upon agricultural goods. There were various agricultural goods among them Katharivog rice, Lichi, Wheat and Mangoes are the best of them. The Santal women of Dinajpur played an important role in the economic progress of this region with their labour and skill. They participated in rice mills, planting paddy and corn, weed eradication and processing of corn etc. They played their role directly in the agricultural activities. They took part in their activities along with male but their daily payment is relatively lower than male. The Santal Women were the main earning member and fulfil the basic needs of their families. They achieved skill in agriculture and as well as household activities. The Santal women of Biral (the Upazila of Dinajpur) earned money from their works and played a significant role in the maintenance of their families.

চাবিশব্দ: সাঁওতাল, ঠাকুরজিয়ো, হাঁসদা, উক্কী, সংস্কৃতি

ভূমিকা

ভৌগোলিক অবস্থানভেদে বাংলাদেশেবিভিন্ন ধর্মের, বর্ণের ও গোত্রের মানুষ বসবাস করে। তার মধ্যে কিছু লোক পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করে এবং বেশির ভাগ লোক সমতলে বসবাস করে। এদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি জেলায় অনেক আদিবাসী বসবাস করে। এসব আদিবাসীরা হলো-চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, পাংখুয়া, চাক, খ্যাং, খুমি এবং লুসাই। নৃতাত্ত্বিক বিচারে তারা মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর মানুষ হলেও পাহাড়ি নামেও পরিচিত। এছাড়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা প্রভৃতি এলাকায় বসবাস করে সাঁওতাল, ওরাও, মাহালি মুণ্ডা, মাল পাহাড়ি, মালো ইত্যাদি আদিবাসীর লোক। এসব গোষ্ঠী সমতলবাসী হিসেবেও পরিচিত। এদের মধ্যে বাংলাদেশের বড় জেলা দিনাজপুরে রয়েছে সবচেয়ে বেশি সাঁওতাল। কৃষিপ্রধান বাংলার অন্যতম জেলা দিনাজপুরের কৃষির উন্নয়নে সাঁওতাল নারীর ভূমিকা অগ্রগণ্য। এখানকার গম, চাল, ভুট্টা, লিচু, আম, প্রভৃতি খুবই বিখ্যাত। দিনাজপুরের বিশেষ বিশেষ কৃষিজপণ্য সমগ্র দেশে চাহিদাপূরণ করে। এসব কৃষিজপণ্য উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত থাকে শত শত শ্রমিক। যার একটি বড় অংশ সাঁওতাল নারী। তারা ধান, গম, ভুট্টা, সরিষা, তামাক, মরিচ, তিল প্রভৃতি কৃষিজপণ্য চাষ করে। তাছাড়া বাঁশ, বেত, শালপাতা দিয়ে নানারকম মাদুর, বাড় তৈরি করে নিত্য ব্যবহার্য প্রয়োজন মিটিয়ে হাটে-বাজারে বিক্রি করে। এই জেলার বিরল থানার সাঁওতাল নারীরা শ্রমিকের কাজ ও ঘরের কাজ দক্ষতার সাথেই করে। তারা পুরুষের পাশাপাশি কৃষিকাজে সমান সময় ব্যয় ও পরিশ্রম করেও একই মুজুরি পায় না। স্থানীয়ভাবে শ্রমিকের সব কাজ করার পরও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে তারা

* অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

আর্থিকভাবে স্বচ্ছল না। তাদের এই বৈষম্যমূলক আর্থ-সামাজিক জীবন তুলে ধরার তাগিদেই প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

দিনাজপুর জেলার বিরল থানার সাঁওতালদের সম্পর্কে আলোচনার জন্য *Eastern Bengal District Gazettes (1912)*, *Dinajpur, Survey and Settlement Report (1939-1940)*, ঐতিহাসিকও অন্যান্য গ্রন্থাদিতে বর্ণিত তথ্যাদি এবং বর্তমান সময়ের মাঠ পর্যায়ে ক্ষেত্র সমীক্ষার পর্যবেক্ষণ দ্বারা ইতিহাস গবেষণার বিশ্লেষণধর্মী ও বর্ণনামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রবন্ধটি বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিটি জেলা কোনো না কোনোভাবে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। কোনো অঞ্চল যেমন কুটিরশিল্প উৎপাদন করে শিল্পখাতের অর্থনীতির চাকাকে মজবুত করেছে। তেমনি দিনাজপুর জেলা উন্নত কৃষিজপণ্য উৎপাদন করে স্থানীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি তা রপ্তানি করে কৃষিখাতকে উন্নত করে অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রেখেছে। দিনাজপুরের একটি বিখ্যাত থানা বিরল স্থলবন্দরের জন্য সুপরিচিত। এছাড়া এখানকার লিচু, আম ও অন্যান্য কৃষিজপণ্য বিখ্যাত। এসব পণ্য উৎপাদনে সাঁওতাল নারীরা অনবদ্য ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের সাঁওতালদের সম্পর্কে বেশকিছু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে যেমন, আবদুস সাত্তার, *উপজাতীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য* (ঢাকা: শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৭৯) শিরোনামের মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এগ্রন্থে সাঁওতালদের পাশাপাশি সব উপজাতির পরিচয়, সমাজ সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। H.H Risley, *The Tribes and Castes of Bengal*, Vol-1& 2 (Calcutta: Bengal Secretariate Press, 1892) গ্রন্থটিতে সব ধরনের আদিবাসী জাতি ও অন্যান্য জাতি গোষ্ঠী সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে সাঁওতালদের সম্পর্কেও বর্ণনা করা হয়েছে। Mesbah Kamal & others (ed.) *Cultural Survey of Bangladesh Series-5, Indigenous Communities*, SANTAL, pp.352-375, (Dhaka: Bangladesh Asiatic Society, 2007), (Author, Mazharul Islam Toru) নামে একটি অধ্যায় সংযোজন করেছেন। এখানেও সার্বিকভাবে সাঁওতালদের সম্পর্কে একটি আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সেখানে দিনাজপুরের বিরল থানা সম্পর্কে বিশেষ কোন আলোচনা নেই। তাই দিনাজপুরের কৃষি উন্নয়নে এই উপজেলার সাঁওতাল নারীদের সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার উদ্দেশ্যে বর্তমান প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে প্রবন্ধটি রচনার উদ্দেশ্য হলো— আঠারো ও উনিশ শতকের বিরল অঞ্চলের কৃষি উন্নয়নে সাঁওতাল নারীরা জড়িত ছিল এবং আধুনিক যুগেও তারা কৃষিকাজে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে তার তুলনামূলক আলোচনা করা। আধুনিক যুগেও কৃষিজপণ্য উৎপাদনে সাঁওতাল নারীদের বিশেষ অবদান রয়েছে সেই বিষয়টিকে উপস্থাপন করা।

প্রবন্ধের মূল আলোচনার পূর্বে সাঁওতাল এবং দিনাজপুর এই দুটি বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা অত্যাবশ্যক। সাঁওতালদের জীবনযাপন, সমাজ সংস্কৃতি সাধারণ মানুষের জীবনধারণ ও সমাজ সংস্কৃতি থেকে অনেকটাই আলাদা। বহু বছর পূর্ব থেকে এদেশে বসবাসকৃত উপজাতীর নানা নামের এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোক এদেশে বসবাস করে আসছে। উপজাতী শব্দটি বলাকে তারা অসম্মান করা হয়, এই ধারণা পোষণ করে। তাদের সম্মান জানাতে আধুনিক যুগে

উপজাতী শব্দের পরিবর্তে আদিবাসী শব্দ ব্যবহার করা হয়। তাই বিভিন্ন গ্রন্থে তাদেরকে আদিবাসী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে মোট ২৯টি আদিবাসীর লোক বসবাস করে। এদের মধ্যে বেশি সংখ্যক বসবাস করে পার্বত্য চট্টগ্রামে। এছাড়া ময়মনসিংহ, সিলেট, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও দিনাজপুর জেলায় কিছু আদিবাসী বসবাস করে। দিনাজপুর জেলার সেতাবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, তেতুলিয়া, পাঁচগড় ও বিরল প্রভৃতি স্থানে বেশি সাঁওতাল বসবাস করে। বাংলাপিডিয়ায় উল্লেখ রয়েছে যে, বৃহত্তর রংপুর তথা দিনাজপুর অঞ্চলে এক লক্ষেরও বেশি সাঁওতাল বসবাস করে। আদিবাসীর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

A social group with territorial affiliation, endogamous, with no specialization of functions, ruled by tribal officers, hereditary or otherwise, united in language or dialect, recognizing social distance with other tribes or caetes, without any social obloquy attaching to them, as it does in the caste structure, following tribal traditions, beliefs and customs, illiberal of naturalization of ideas from alien sources, above all conscious of a homogeneity of ethnic and territorial integration.^১

অর্থাৎ একটি দেশের মূল জনগোষ্ঠী থেকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ভিন্নতর যারা তাদের ঐতিহ্য কৃষ্টি ও আইন দ্বারা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিচালিত তাদেরকে উপজাতি বলে।^২ এক কথায় বলা যায় যে, আদিবাসী এমন জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যারা আলাদা রাষ্ট্র গঠন করতে পারেনি কিন্তু নিজস্ব একটি আলাদা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে। মূলত রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে জাতি বা উপজাতি নির্দিষ্টকরণ হয়ে থাকে। বাংলাদেশ সংবিধানের ২৩, ক ধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা করিবেন।^৩ বর্তমানে দিনাজপুরে সাঁওতালদের সংখ্যা কত তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। কারণ ১৯৭৩ সালের আদমশুমারিতে তাদেরকে আলাদা করে গণনা করা হয়নি। ১৯৭৬ সালে দিনাজপুরের মিশনারির কর্মকর্তা উল্লেখ করেন যে, এখানে সাঁওতালের সংখ্যা ৮০ হাজার। এর তিন বছর পর দিনাজপুরের লুথারেন মিশনের রেভারেন্ড মি. বোর্ন রোরবি থানা ভিত্তিক জরিপের মাধ্যমে সাঁওতালদের যে সংখ্যা নিরূপণ করেন তা অনেকটা ভিন্ন। বোর্নের প্রতিবেদনে দিনাজপুরের ১৯টি থানায় সাঁওতালদের সংখ্যা ৪৩,১৯৬ জন।^৪ সময়ের সাথে তাদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়।

আলোচনার তাগিদেই দিনাজপুর জেলা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া প্রয়োজন। উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত সীমান্তবর্তী জেলা দিনাজপুর নানা কারণে সুপরিচিত। ঐতিহ্যবাহী এই জেলা গঠিত হয় ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে। জেলাটি ২৪°: ১৮' থেকে ২৬°: ১৮' উত্তর অক্ষ রেখার ভেতরে ৫,৩৭৪,০০০ বর্গমাইল নিয়ে অবস্থিত ছিল। দিনাজপুরে নানা ধর্মের, বর্ণের ও গোত্রের লোক বসবাস করে। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মানুষদের অবস্থান এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের আগমনে মিশ্রিত লোকাচারের মাধ্যমে জন্ম হয়েছে নতুন দর্শন, নতুন চিন্তা চেতনায় সমন্বিত এক সংস্কৃতি।^৫ বুকানন হ্যামিলটন ১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দে দিনাজপুর জরিপ করেছিলেন। তাঁর বর্ণনা মতে এই জেলার আয়তন ৫,৩৭৪ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ছিল তিরিশ লক্ষের বেশি।^৬ এছাড়া ৫৫ বছর পর ১৮৬৩ সালে মেজর শেরউইল এর তথ্যে জানা যায় এই জেলার আয়তন ৪,৫৮৬ বর্গমাইল। বাংলাদেশের সুসংগঠিতভাবে আদমশুমারি হয়েছিল ১৮৭২ সালে, সেই সময়ে এর জনসংখ্যা ছিল ১৪,৩৫,৩০৯ জন।^৭ ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী দিনাজপুরের জনসংখ্যা ৩১,০৯,৬২৮ (প্রায়) এবং শিক্ষার হার ৩২.৪।^৮ ২০১১ সালে এর জনসংখ্যা ৩১,০৯,০০০।

বর্তমানে ১৩টি থানা নিয়ে দিনাজপুর জেলার অবস্থান। এই জেলাটির প্রাচীন কাল থেকেই নানা কারণে ঐতিহ্য রয়েছে। যেমন-কয়লা খনি, পীট কয়লা, লৌহ খনি, কান্তজির মন্দির, প্রসিদ্ধ কাটারীভোগ চাল, গম, ভুট্টা, লিচু, টমেটো, আলু প্রভৃতি কারণে বিখ্যাত। উল্লেখ্য যে দিনাজপুরের ধান ও অন্যান্য কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই জেলায় বসবাসরত বিভিন্ন আদিবাসী নারী, যাদের মধ্যে সাঁওতাল অন্যতম।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দিনাজপুরে মুসলিম বসতি শুরু হয়েছিলই খতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে নদীয়া বিজয়ের মাধ্যমে।^৮ প্রয়োজনের তাগিদেই দিনাজপুর শহরটির যোগাযোগ ব্যবস্থা, নগরায়ণ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিসহ সর্বস্তরের বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটেছে। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পর দিনাজপুর জেলার কয়েকটি থানা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার বোদা, তেতুলিয়া, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় এই ৪টি থানা দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।^৯ স্বাধীনতার পূর্বে দিনাজপুর জেলাটি ২টি ভূ-খণ্ডে ভাগ হয়। পূর্ব অংশ পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুর জেলা এবং পশ্চিম অংশ ভারতের পশ্চিম দিনাজপুর নামে আলাদা হয়েছিল। বর্তমানে দিনাজপুর জেলার উত্তরে ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলা। দক্ষিণে জয়পুরহাট ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, পূর্বে নীলফামারী ও রংপুর এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ।^{১০} বর্তমান দিনাজপুরের আয়তন-৩,৪০০বর্গ কিলোমিটার। এই জেলায় বিখ্যাত কয়েকটি ঐতিহাসিক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল যেমন ৩৬ গ্রাম নিয়ে ৩৬ আন্দোলন, যেই আন্দোলনের প্রাণ শক্তি ছিল বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর লোক। ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন, ফরায়েজী ও ওহাবী আন্দোলন, নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং রায়ত ও তেভাগা আন্দোলন। এছাড়া ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এই জেলার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। ভারতের প্রতিবেশি জেলা হওয়ায় এই জেলা দিয়ে অনেক শরণার্থী ভারতে প্রবেশ করেছিল। প্রতিটি আন্দোলনেই দিনাজপুরের জনগণ সফল হয়েছিল। সব আন্দোলনেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিল এই অঞ্চলের নারীরা।

ভৌগোলিক ও কৌশলগতভাবে বিরল থানাটি ভারতের সীমান্তবর্তী হওয়ায় অর্থনৈতিকভাবে এটি আলাদা গুরুত্ব বহন করে। বর্তমানে এই থানায় মোট জনসংখ্যা ২৪৫৫২ জন তন্মধ্যে পুরুষ ১২৪০১ জন এবং মহিলা ১২২৫১ জন। দিনাজপুরে অভিবাসিত সাঁওতালদের মধ্যে বিরল থানায় সাঁওতাল গোষ্ঠীর লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশি।^{১১} তন্মধ্যে শতভাগ সাঁওতাল নারী কৃষিকাজের সাথে জড়িত। কৃষি জমিতে ধান রোপন, আগাছা পরিষ্কার, ধান কাটা, ভুট্টা ছড়ানো, লিচু তোলা প্রভৃতি কাজে সাঁওতাল নারীরা শ্রমিকহিসেবে কাজ করে। বিরল উপজেলার কৃষি উন্নয়নে সাঁওতাল নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে ভূমির মালিকগণ উল্লেখ করেছেন। কৃষিকাজে তাদের ভূমিকা থাকা স্বত্ত্বেও তারা অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার এবং শ্রমানুযায়ী পারিশ্রমিক পায় না। এই থানার বালান্দর, বোরহাননগর, ভান্ডারা, গোপালপুর বা বেতুড়ার, রেংটলীজ, বৈড়াগিপাড়া, কালিয়াগঞ্জ ও পলাশবাড়ী প্রভৃতি গ্রামে প্রায় একশত সাঁওতাল পরিবার কৃষিকাজের সাথে জড়িত রয়েছে এবং এদের বেশির ভাগই নারী। উল্লেখিত গ্রামের মধ্যে চারটি গ্রাম (বেতুড়া, ভান্ডারা, বোরহাননগর, গোপালপুর) ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় বেশিরভাগ সাঁওতাল পরিবারই অর্থনৈতিকভাবে অস্থগ্ৰস্ত। এঅঞ্চলে শিক্ষার হারও কম। প্রায় ৫০টি পরিবারের ৫ জন ছেলে মেয়েও গ্রাজুয়েট না। শিক্ষা গ্রহণের প্রতি অনেক পরিবারের আগ্রহও কম। স্কুলে যাওয়ার পরিবর্তে অনেক মেয়ে হাঁস (চিত্র-৬) ও শুকর লালনপালন করে এবং তা বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে। প্রত্যেক পরিবারের বড় ছোট সব বয়সের নারীরা কৃষিকাজের সাথে জড়িত।

সাঁওতালদের সমাজ কাঠামো

সাঁওতালদের সমাজ কাঠামো সাধারণ সমাজ থেকে আলাদা। তারা বিশ্বাস করে যে, আদি মানব ও মানবী পিলচু বুড়ো (হাডাম) ও পিলচু বুড়ির সাত জোড়া সন্তান থেকেই তাদের পূর্বপুরুষদের জন্ম। এজন্যই সাঁওতালরা সাতটি গোত্রে বিভক্ত। সাঁওতালদের ভাষায় এই গোত্রগুলো পানিস নামে পরিচিত। এরা মাছ, মুরগী, কাকড়া, শুকর ও খোরগোশের মাংস খায়। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের সবগুলো উপজাতীয় সমাজই গোষ্ঠী উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত। চাকমাদের গোষ্ঠী ২১ টি, উপগোষ্ঠী ১৫০টি এবং সাঁওতালদের গোষ্ঠী ১৩টি এবং উপগোষ্ঠী ১৫০ এর কাছাকাছি।^{১২} গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীসমূহ পূর্বপুরুষ, বাসস্থান, ফলমূল, গাছপালা ও জন্তু জানোয়ারের নামে পরিচিত। মূলত এসবই তাদের টোটেম বা জন্মান্তরচিহ্ন। সাঁওতালদের গোষ্ঠীগুলো হলো- হাঁসদা (হাঁস খাওয়া নিষেধ) মুররু (নীল গাভীর গেশত খাওয়া নিষেধ), কিসকু (মারাণ্ডি গোত্রের ছেলে মেয়েদের সাথে তাদের বিয়ে হয় না), হেমব্রম (শোল মাছ), মারান্ডি (চারাদান তোলা নিষিদ্ধ), সরেন (হরিণের গেশত), টুডু (জিথিংগা ফল), বাক্কে (আতপ চাল), বেসরা (গাভী), পাউরিয়া (কবুতর), চোড়ে (টিকটিকি)। হাঁসদা গোষ্ঠীর লোকের ধারণা তাদের জন্ম হয়েছে হাঁস থেকে। তাদের বংশগত পদবি হাঁসদা। ধর্মীয় বাধা হিসেবে তারা কখনও হাঁস খায় না^{১৩} এবং তাদের মধ্যে একই গোত্রে বিয়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এদের মধ্যে মহিলাদের উত্তরাধিকার সম্পত্তি নিয়ে সনাতন ধর্মের মতো নিয়ম রয়েছে। হাঁসদা গোত্রের মেয়েরা পিতার সম্পত্তিতে কোনো মালিকানা পায় না। পিতার মৃত্যুর পর পুত্ররাই সম্পত্তির ভাগ পায়। উল্লেখ্য যে সম্পত্তি ভাগের সময় পিতার অর্থ দিয়ে কেনা শুধুমাত্র একটি গাভী পায়। প্রতিটি গোষ্ঠী তাদের পদবীর এই বাধাগুলো মেনে চলে। সাঁওতালরা ফাল্গুন মাস থেকে বছর গণনা শুরু করে। তাদের সৃষ্টিকর্তার নাম ঠাকুরজিয়ো এবং তারা পরজন্মে বিশ্বাসী। ছেলে মেয়ে উভয়ই শরীরে উল্কী আঁকে।^{১৪} এদের স্থানীয় প্রশাসন ও সমাজ গঠন অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং সামাজিক অন্যায়ের বিচার খুব কঠিন। সাঁওতালদের কেউ অন্যায় করলে তাকে সমাজ থেকে বের করে দেয়া হয়। তাদের বিচার ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর। একটি উদাহরণের মাধ্যমে তাদের বিচারের চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে- সাঁওতালদের প্রতি গ্রামেই হাট বসে, ছেলে মেয়েরা উভয়ই হাটে যায়। বেশির ভাগ সময় স্থানীয় হাট-বাজারেই তাদের মন বিনিময় হয়। যদি কোনো ছেলে হাটের মধ্যে কোনো মেয়ের কপালে সিঁদুর দেয় ধরে নেয়া হয় তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। সাঁওতালদের প্রথা অনুসারে একবার সিঁদুর লাগালে তার আর বিয়ে হবে না। দুই পরিবারের কোনো অভিভাবক জানলে মেয়ে পক্ষ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি যোগ মাঁজিকে গোচরীভূত করে। পরবর্তীসময়ে এই তথ্য যোগ মাঁজি প্রধান মাঁজিকে জানায়। মাঁজি ছেলেকে ডাকেন এবং সব বিষয়ে জানতে চান। যদি ছেলে আগ্রহ দেখায় এবং গোত্র ঠিক থাকে তবে মাঝি তাদের বিয়ে পড়িয়ে দেন। কিন্তু যদি অন্য ঘটনা ঘটে বা যদি ছেলের খারাপ উদ্দেশ্য থাকে তবে তাকে গ্রাম থেকে বের করে দেয়া হয়।^{১৫} এক্ষেত্রে নারীকে অসম্মান করা হয় না।

বাংলাদেশে বসবাসরত সকল আদিবাসীর বিয়ে প্রায় একই ধাঁচের হয়। সাঁওতালদের বিয়ে সাধারণ হিন্দু বিয়ের রীতির মতো গায়ে হলুদ, আইবুড়ো ভাত খাওয়ানো, সিঁদুর দান প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলো হয়। তাদের সমাজে বাপলা বা কিরিঙ বেছ বা কণে কেনা, ঘরদি জাঁওয়ান বা ঘর জামাই, পুতত বেয়ান বা জোর করে সিঁদুর দেয়া, ত্রিওর বলংক বেয়ান বা স্বেচ্ছায় হরণ, সাক্সা, কিরিং জাঁওয়া বা বর কেণা গোলাত বা ছেলে মেয়ে বিনিময় পদ্ধতির বিবাহ প্রচলিত আছে।^{১৬} উল্লেখিত এই সাত প্রকার বিয়ের মধ্যে বাপলা বা কণে কেনা পদ্ধতি দিনাজপুরে প্রচলিত আছে। তবে একই পারিস বা

গোত্রের মধ্যে বিবাহের অনুমতি থাকলেও একই খুঁট বা উপগোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। তাদের সমাজে সবসময় কনের বাড়িতে বিয়ের দিন স্থির করা হয়। বিয়ের যতদিন বাকী থাকে, একটি কাপড় বা সুতায় ততগুলো গিট বেঁধে শালপাতার পাঁচটি বাটিতে হলুদ বাটা, দূর্বা ও আতপ চালের সাথে ঘটকের মাধ্যমে এক অপরের বাড়ীতে পাঠানো হয়। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো তাদের বিয়েতে মণ্ডব তৈরী করার উদ্দেশ্যে হাঁড়িয়া মদ উৎসর্গ করা হয়। এছাড়া নায়েক বা পুরোহিত মারাং বুরুর উদ্দেশ্যে দুটো সাদা মুরগী বলি দেন। মণ্ডব তৈরী হলে জগমাঝি মণ্ডপের মধ্যে গর্ত করেন। পাত্রের পিতা-মাতা কাচা হলুদ, পাঁচটি কড়ি, তিনটি দূর্বা, তিনটি আতপ চাল হলুদ বাটা দিয়ে মেখে একটি পুটলিতে বেঁধে গর্তটিতে রেখে দেন। এরপর গর্তটিতে একটি মহুয়া গাছ লাগিয়ে খড়ের কাছি দিয়ে তিন পাক জড়িয়ে গাছের গোড়া মাটি দিয়ে লেপে পাত্র ও পাত্রীর ছবি আলপনা দিয়ে আঁকা হয়। মণ্ডপের কাজ শেষ হলে বিশেষ আনন্দ উল্লাস করে সকলে হাড়িয়া বা মদ পান করে বিয়ের জন্য বরের বাড়ির পক্ষ থেকে কনের বাড়িতে যায়। পাত্রের মা একটি ডালায় আতপ চাল, ধান, দূর্বা, ডিম, তেল, সিঁদুর ও সুতা নিয়ে যান। পাত্রের কাকীমা একটি তলোয়ার ও পিসিমা তীর ধনুক নিয়ে যান।^{১৭} দুজন মেয়ে মাথায় করে সুতার ওপর শাড়ি দিয়ে ঢেকে কলসী নিয়ে যান। পানিতে তির ছুঁড়ে ও তলোয়ার দিয়ে কুপিয়ে দেওয়ার পর ঐ মেয়েরা কলসিতে জল তোলে। সাঁওতাল বিয়েতে অনেক মেয়ে একসাথে গান ধরে।^{১৮} ভগ্নীপতি পাত্রকে কোলে করে পাত্রকে গ্রামের রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দেন। বিয়ের সময় পাত্রের ভগ্নীপতিই তাঁকে কাঁধে নিয়ে দাঁড়ান। পাত্রীকে বড় ডালাস বা দেউড়ির ওপর বসিয়ে আনা হলে শুভদৃষ্টি হয় এবং পাত্র তাকে পাঁচবার সিঁদুর দান করে সমস্ত সিঁদুর তাকে মাখিয়ে দেন।^{১৯} সাঁওতালদের বিয়ের পদ্ধতিতে মন্ত্রোচ্চারণ করা হয় না, শুধু পাত্রী বিদায়ের সময় মাঝি পাত্রকে প্রথানুসারে কিছু কথা বলেন। সাঁওতালনারীরা ঐ কথাগুলোকেই মন্ত্র মনে করে অনুসরণ করে।

দিনাজপুরে উৎপাদিত কৃষিজ পণ্য

নদীবহুল বাংলার অর্থনীতির প্রধান নিয়ামক কৃষি। অসংখ্য নদ-নদী ও নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বাংলার মাটিকে উর্বর করে রেখেছে। প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে বিভিন্ন রকম কৃষিজ পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। আয়তনের দিক থেকে ছোট হলেও এদেশের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় বঙ্গের আবহাওয়ার তারতম্য রয়েছে এবং কৃষিজাত উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। উত্তর বঙ্গের সবচেয়ে বড় জেলা দিনাজপুরের প্রধান আয়ের উৎস কৃষি। কৃষি থেকে অর্থ আসে শতকরা ৬৩.৯০%।^{২০} এই জেলায় যত শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে তার অধিকাংশই কৃষিনির্ভর। মূলত কৃষিই এই জেলার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের চালিকা শক্তি। যদিও এখানে কয়েক রকম খনিজ সম্পদ রয়েছে। এই জেলার বিরল থানার কাটারি ভোগ চাল, কারোজিরা চাল, চিড়া, আম ও লিচুর জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। দেশের সিংহভাগ জেলার চালের যোগান দেয় দিনাজপুর জেলা। এজন্যই এই জেলাকে দেশের শস্যভাণ্ডার বলা হয়।^{২১} ধান প্রধান কৃষিপণ্য হওয়ায় এই জেলার প্রায় ২০০০ এর মতো চালের কল রয়েছে। যার মধ্যে ১০০টির মতো অটোমেটিক ও সেমি-অটোমেটিক কল আর বাকী সবগুলো চাতাল নির্ভর চালের কল। মাশিমপুরের বেদেনা লিচু বিখ্যাত। বর্তমানে এই লিচু বিদেশে রপ্তানী হয়।^{২২} দিনাজপুরের বসবাসরত সব আদিবাসীরাই এই জেলার কৃষি কাজে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তবে সাঁওতাল নারীরা অনেক বেশি অবদান রাখে কৃষিকাজে। এই জেলার সাঁওতাল পুরুষ অপেক্ষা নারীরাই বেশি কৃষিকাজের সাথে জড়িত। ধানের জমিতে, ভুট্টার জমিতে

ও লিচু ভাঙাসহ অন্যান্য কাজেও সাঁওতালনারীরা কাজ করে।^{২৩} বিরল কৃষি অফিসের তথ্য থেকে দেখা যায় বিরলে গত দুই অর্থ বছরে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি কৃষিজ ফসল উৎপাদিত হয়েছে।

সাল	মেট্রিকটন	উফশী ধান (রোপা আমন)	স্থানীয় (রোপা আমন)	(রোপা আমন) হাইব্রিড	উফশী (বারো ধান)	হাইব্রিড (বারো ধান)	উফশী আলু	স্থানীয় আলু	সরিষা	গম	ভুট্টা
২০২০-২১	আবাদকৃত জমি (হেক্টর)	২৭৭১৭	১০৫৭	৩৮	১৩৩১৫	১৪১০	৮২২০	৯০০	১৮০৭	৩২৮	১০৬২০
---	গড় ফলন (মে. টন)	২.৯৯	১.৯৫	৩.৯৭	৪.৩০	৪.৯২	২৫.৭৭	১১.৩	১.৩৫	৩.৩৯	১০.৬২
---	মোট উৎপাদন (মে.টন)	৮২৮৭৪	২০৬১	১৫১	৫৭২৫৫	৭৩৩১	২১১৮২৯	১০১৭০	২৪৩৯	১১১২	১১২৭৮৪
২০২১-২২	আবাদকৃত জমি (হেক্টর)	২৮৩১১	৫২০	১৬২	১৩৫২০	১৫৫০	৭৭৫৫	৬৩৩	১৮৩৫	১১৬	১০৩০৫
---	গড় ফলন (মে. টন)	২.৯৭	১.৯	৩.৮৮	৪.৩০	৪.৮৪	২৫.৬৫	১১.৮	১.৩৬	৩.৫	১০.৯৮
---	মোট উৎপাদন (মে.টন)	৮৪০৮৪	৯৮৮	৬২৮	৫৮১৩৬	৭৫০২	১৯৮৯১৬	৭৪৬৯	২৪৯৬	৪০৬	১১৩১৪৯

বিরল কৃষি অফিস- ১৫-০২-২০২৩

উপরের ছক থেকে দেখা যায় যে, এই অঞ্চলে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বোরো আমন ধানের (উফশী ও হাইব্রিডসহ) মোট উৎপাদন ৫৭২৫৫ মেট্রিক টন, রোপা আমন (উফশী, স্থানীয় ও হাইব্রিডসহ) ধান ৮২৮৭৪ মেট্রিক টন। গম উৎপাদন ১১১২ মেট্রিক টন এবং ভুট্টা ১১২৭৮৪ মেট্রিক টনউৎপন্ন হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে রোপা আপন ধান উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ২ হাজার মেট্রিক টন বেশি এবং রোপা আমন ধানের উৎপাদন বেড়েছে ১ হাজার মেট্রিক টন। আলুর উৎপাদন ১ হাজার মেট্রিক টন হ্রাস পায়। সরিষা ৪০ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পায়। ভুট্টা ৩৬৫ মেট্রিকটন বেশি উৎপাদন হয়েছে। শতশত বছর ধরে এখানকার এই সাঁওতাল নারীরা কৃষি জমিতে শ্রমিকের কাজ করে ফসলের উৎপাদন বাড়াতে সহায়তা করে আসছে।

কৃষিকাজে পুরুষ

দিনাজপুরেরবিরল থানাটির আয়তন ৩৫২.১৫ বর্গকিলোমিটার। থানাটি সৃষ্টি হয় ১৯০৫ সালে এবং ১৯৮৪ সালে তা উপজেলায় রূপান্তর হয়। বর্তমানে এই থানার মোট ২৩১৪৭৬ জন লোকের মধ্যে পুরুষ ৫১.৫৫%, মহিলা ৪৮.৪৫%।^{২৪} সাঁওতাল পুরুষদের মধ্যে খুব কম পুরুষই কৃষি জমিতে হাল চাষ করে। শিকারের প্রতি তাদের আগ্রহ খুব বেশি, তবে সুযোগ না থাকায় তারা শিকার করতে পারে না। বন জঙ্গল কমে যাওয়ায় শিকার না পাওয়ায় সাঁওতাল পুরুষেরা কুলি, মুজুর ও শ্রমিকের কাজ করে। সংখ্যায় খুবই কম পুরুষ এসব কাজে জড়িত। তবে খুব বেশি পুরুষকে কৃষি জমিতে কাজ করতে দেখা যায়নি। বিরল থানার কৃষি জমিতে ২০% পুরুষ কাজ করে। সাঁওতাল পুরুষরা নিয়মিত কাজ করে না এবং খুবই অলস জীবনযাপন করে। কৃষি আবাদকৃত ১০ একর জমিতে ১০০ জন শ্রমিক ধান রোপন করলে, সেখানে ২০ জনের বেশি পুরুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্টর। সাধারণত প্রতি একর জমিতে ২৫জন শ্রমিক কাজ করে তার মধ্যে ২০ জন সাঁওতাল নারী (চিত্র-১-৪) কাজ করে।^{২৫} ধনী কৃষক সব সময় তাদের জমিতে ধান রোপন ও আগাছা পরিষ্কারে সাঁওতাল নারী শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করে। বাস্তবে ক্ষেত্রসমীক্ষায় পুরুষের সংখ্যা কম পরিলক্ষিত হয়েছে।

কৃষিকাজে সাঁওতালনারী

বাংলাদেশের কৃষকশ্রেণির মধ্যে সকলের নিজের আবাদি জমি নেই। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম দেখিয়েছেন যে,

বাংলাদেশের কৃষকও চাষির ভূমির সংখ্যা বা ভূমির মালিকানার সংখ্যায় দেখা যায় ২৮ জনের শতকরা ১০ ভাগ জমি এবং ২৫ জনের শতকরা ৪০ ভাগ আবাদি জমি রয়েছে। তাছাড়া ১০ জন শতকরা ৫০ ভাগ জমির মালিক। মালিকই চাষী বা নিজের জমি নিজে চাষ করায় এমন কৃষকের সংখ্যা দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। এদেশে যারা বেশি জমির মালিক তারা কৃষি উৎপাদনের সাথে সরাসরি যুক্ত না তবে তারা জমি নিজেরা চাষ করে বুকিও গ্রহণ করেন না।^{২৬}

তাছাড়া আবাদী ভূমিহীন কৃষকগণ বর্গাদার হিসেবে জমি আবাদ করে। এছাড়া মালিক শ্রমিকের দ্বারা আবাদ করায়। এক্ষেত্রে অনেক আবাদী ব্যক্তি বা বর্গাদার মহাজনের ঋণের জালে সর্বহারা হন। দিনাজপুরের বিরল উপজেলায় আদিবাসীর সংখ্যা বেশি থাকায় আবাদী জমিতে কৃষি শ্রমিকের চিত্র অন্য উপজেলা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে কৃষি জমি কৃষক চাষ করলেও ধান রোপণ করে সাঁওতাল নারীরা।^{২৭} এই নারীদের বড় বড় দল রয়েছে। তারা প্রতি বিঘা জমিতে ধান রোপণের জন্য অনেক সময় চুক্তি করে। নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা নিয়ে তারা ধান রোপণ করে।^{২৮} শুধুমাত্র ধানের জমিতে নয় ভুট্টার জমিতে ভুট্টা উঠানোতে (চিত্র-৫) তারা অনেক বেশি পারদর্শী। এক্ষেত্রেও আদিবাসী নারী শ্রমিকের চাহিদা সাধারণ শ্রমিকের তুলনায় বেশি। প্রতি বিঘা জমিতে ভুট্টা উঠানোর তারা ৩০০০ থেকে ৩৫০০ টাকা পায়। সেই ক্ষেত্রে এই টাকাটা ৫ থেকে ৬ জন আদিবাসী শ্রমিকের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়।^{২৯}

এই থানার খুবই কম পরিবারের সাঁওতাল পুরুষ কাজ করে। পুরুষ মজুররা অন্য সব কাজ করলেও ধান রোপণের জমিতে নারীদেরকেই দেখা যায়। সাঁওতাল নারীরা পুরুষের তুলনায় কম মজুরিতে ধান রোপণ করে। আর কম খরচে জমির মালিক ধান রোপণের জন্য সাঁওতাল নারীদেরকেই গুরুত্ব দেয়। সাঁওতাল পুরুষেরা বাড়িতে থাকে আর নারীরা (চিত্র-২) ধান রোপণ করে। শুধুমাত্র ধান রোপণ নয় ভুট্টার জমি পরিচর্যা, পাকা ভুট্টা ভাঙ্গা এসব কাজে সাধারণ শ্রমিকের চেয়ে সাঁওতাল নারীরা বেশি কাজ করে। কারণ নিজেদের চাষের জমি নেই তাই জীবিকার তাগিদেই কাজ করতে হয়। বিভিন্ন জমির মালিকের সাথে কথা বলে দেখা যায় তাদের অগ্রহ সাঁওতাল নারী শ্রমিক নেয়ার ক্ষেত্রে কারণ তাদের অর্থ সাশ্রয় হয় নারী শ্রমিক দিয়ে কাজ করালে। তাদের শ্রমের মূল্য কম দেয়া যায়। কিন্তু পুরুষ শ্রমিকের ক্ষেত্রে তা সম্ভব না। ‘হামাক পাথার বাড়িত ধান গাড়ে সাঁওতালরা’^{৩০}। অর্থাৎ, জমিতে সাঁওতাল নারীরা ধান লাগায়। বাস্তব পর্যবেক্ষণেও জমিতে গিয়ে একই চিত্র লক্ষ করা যায়। মাঠে এক দল শ্রমিক ধান কাটছে কিন্তু সেখানে পুরুষের সংখ্যা কম। ১২ জন শ্রমিকের মধ্যে ২ জন পুরুষ বাকী সব সাঁওতাল নারী। বিষয়টি অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটাই বাস্তব। নারীরা স্থানীয় ভাষায় কথা বলছে আর নিজের মতো করে হাত চালিয়ে ধান কাটছে।

সাঁওতাল নারীরা বেশি শ্রম দিলেও তাদের শ্রমের মূল্য দেয়া হয় না। অনেকক্ষেত্রে একজন পুরুষ শ্রমিকের পারিশ্রমিক দিয়ে দুইজন সাঁওতাল নারী শ্রমিকের কাজ করানো হয়। উল্লেখ্য যে, একজন পুরুষের তুলনায় একজন সাঁওতাল নারী ধান বেশি রোপণ করতে পারে, আর এই কারণে তাদের কদর বেশি। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিকভাবে অনেক বড় বৈষম্যের শিকার সাঁওতাল নারীরা। নারী ও পুরুষ একই শ্রম ও সময় ব্যয় করেও শ্রমের কম মূল্য পায় সাঁওতাল নারী। তারা জমিতে পরিশ্রমের

পরও পর্যাপ্ত অর্থ পায় না। ভাঙুরা ইউনিয়নের ১০০ বিঘা জমির মালিক তানজিমুল, তিনি ধান, ভুট্টা ও অন্যান্য ফসল আবাদ করান। তিনি বলেন— স্থানীয় ভাষায় পাথার বাড়িতে অর্থাৎ ধানের জমিতে প্রতিটি নারী সারাদিন ধান রোপণের জন্য ৩০০ টাকা পায়। আর একজন পুরুষ ধান রোপন করলে ৫০০ টাকা পায়। শুধুমাত্র একদিনের কাজেই ২০০ টাকা পারিশ্রমিক বৈষম্য রয়েছে। চারটি গ্রামের ৪০টি সাঁওতাল পরিবারের মহিলার সাথে কথা বলে দেখা যায় প্রতিটি পরিবারেই রয়েছে নারী শ্রমিক। অন্য কোনো পেশায় তারা নেই। এসব মহিলারা সারাদিন পরিশ্রম করেও স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারে না। দৈন্য তাদের নিত্যদিনের সাথি, তাদের অনেক পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয় না। ধানের জমিতে হুঁদুরের গর্ত খুঁজে ধান বের করে, রাস্তার ধারে ঘুরে ঘুরে ধান সংগ্রহ করে এবং বিভিন্ন গ্রামেও ঘুরে বেড়ায়। পরিবারের সদস্যদের মৌলিক চাহিদা কোনোভাবে পূরণ হয় মাত্র কিন্তু আর্থিক দৈন্য লেগেই থাকে। সন্তানসহ কোনো পরিবারই স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারে না। চল্লিশটি সাঁওতাল পরিবারের সাক্ষাৎকার নিয়ে দেখা যায় পাঁচটি পরিবারের সন্তান লেখাপড়ার জন্য হাই স্কুলে যায় না।^{১১} অনেক পরিবারের মা শ্রমিকের কাজে যায় আর তাদের সন্তানকে স্কুলে না পাঠিয়ে বাড়ি পাহাড়ায় রেখে যায়। তবে সকল আদিবাসীর মধ্যে সাঁওতালরা সবচেয়ে বেশি অশিক্ষিত এবং তাদের মধ্যে এই বিষয়ে কোন আগ্রহ নেই।^{১২} সাক্ষাৎকারের সময় এই বিষয়ে প্রশ্ন করলে তারা কোনো উত্তর দেননি।

সাঁওতালদের কৃষিনির্ভর উৎসব

সাঁওতালনারীরা নিজেদের ঘর তৈরি করে তাদের নিজেদের সংগৃহীত ধানের খড় দিয়ে (চিত্র-৮)।^{১৩} তাদের বেশির ভাগ ঘর মাটি দিয়ে তৈরি এবং ঘরগুলো ছোট। সাঁওতালদের ঘরের আলাদা বৈশিষ্ট্য হলো— মাটির তৈরি এই ঘরগুলোতে জানালা থাকে না। জানালা থাকলেও তা অনেক বেশি উঁচু করে তৈরি করা হয় যাতে বাইরে থেকে কেউ উঁকি মেরে দেখতে না পারে। তারা তাদের মাটির ঘর খুব সুন্দর করে রঙ দিয়ে লেপে সাজিয়ে রাখে। এছাড়া ঘরের মাটির দেয়ালে দেবদেবীর ছবি (চিত্র-৭ ও ৮) ফুটিয়ে তোলে। দেবদেবীর চিত্রশোভিত মুখোশ ও হাতিয়ার। এসব চিত্র তাদের শিল্পমনের পরিচয় বহন করে। সাঁওতাল নারীরা যে প্রত্যেকেই একজন শিল্পী একথাও প্রমাণিত হয় তাদের শিল্পচাতুর্যের নেপুণ্য দেখলে। কাঠের চৌকি এবং বাঁশের মাচা বা খাটিয়া ছাড়া তাদের ঘরে খুব আসবাবপত্র থাকে না। সাঁওতাল নারীরা কৃষিকাজের সাথে জড়িত থাকায় ভালো ফসল উৎপাদনের জন্য তারা ‘রিনজা উৎসব’(চিত্র-১১) পালন করে। ফসল উৎপাদনের জন্য হালকর্ষণ, বীজবোনা, ফসলকাটা ইত্যাদির মহড়া তারা তাদের নৃত্য গীতের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলে।^{১৪} এইনাচে বিশ ত্রিশজন মেয়ে থাকে এবং পুরুষরা ঢোল ও অন্যযন্ত্রের মাধ্যমে সহায়তা করে। ঋতু বৈচিত্র্যকে কেন্দ্র করেও তাদের বিশেষ অনুষ্ঠান রয়েছে। বসন্ত ঋতুতে ‘বাহা উৎসব’ পালন করা তাদের সংস্কৃতির একটা বড় অংশ। এখানে নারীরা নাচের মূল শিল্পী এবং পুরুষরা তাদের দলের মাঝে বসে ঢাক ঢোল, মাদল ও বাঁশী বাজায়। তাদের অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র হলো— বেহালা, সারিন্দা, করতাল ইত্যাদি। সাঁওতাল নারীদের নাচের বৈশিষ্ট্য দেহবিক্ষেপ এবং অঙ্গসঞ্চালন। বৃত্তাকার বা প্রলম্বিত রেখার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয় অধিকাংশ নৃত্য। মূলত, তারা তিনটি বড় উৎসব পালন করে। সেগুলোকে বলে পৌষ, ফাগুয়া এবং চৈতি পর্ব। উল্লেখিত ফসল কাটার উৎসব হলো পৌষ এবং ফাগুয়া সনাতন ধর্মের হোলি উৎসবের মতো। চৈতি পর্বও একটি আনন্দ উৎসবের পর্ব।^{১৫} সাঁওতালরা উন্নত জীবনযাপন না করলেও সব উৎসবকে তারা সঠিকভাবেই পালন করে।

ভাষা প্রতিটি জাতি বা গোষ্ঠীর সংস্কৃতির একটি বড় অংশ। সাঁওতালদের ভাষা সাঁওতালী। তবে কুড়ুক, সাদরীও তাদের ভাষা। স্থানীয় বাংলা ভাষায় তারা কথা বলে। একই গোত্রের বা গোষ্ঠীর হলে তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সাঁওতালরা যদিও পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল পরগনা থেকে দলে দলে দিনাজপুরে এসেছিল।^{৩৬} দিনাজপুরের গেজেটিয়ার থেকে জানা যায় যে, তারা ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে সাঁওতালদের অনেক বড় বড় দল এখানে এসেছিল তবে পূর্বেও তারা এখানে অভিবাসিত হয়ে বসতি স্থাপন করেছিল। তাদের গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মুখে অল্প দাড়ি এবং গোফ কম। তাদের দৈহিক গঠনও শক্ত-সামর্থ্য। পশ্চিম বাংলার দামোদর তাদের কাছে পবিত্র নদী। তাদের পূর্বপুরুষরা ইতোপূর্বে বিহার ও পশ্চিম বাংলার দামোদর ও কাশাই নদী বিধৌত অঞ্চলের অধিবাসী ছিল।^{৩৭} তারা আজও শিক্ষা, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প এসব ক্ষেত্রে এগিয়ে আসেনি। তাদের মধ্যে মাহালীরা বাঁশের কাজ, লাঙ্গলের ফালা, ছুরি জিনিসগুলো তৈরি করে। এছাড়া তারা পাটি, মাদুর, পাটের তৈরি চট, ব্যাগ, বাঁশের চিরুনি ইত্যাদি তৈরি করে। তারা সাধারণ লোকের মতো ভাত, শাক-সবজি, মাছ, মাংস ছাড়াও ইঁদুর, শামুক, শুকর ইত্যাদি খায়। তাদের প্রিয় পানীয় পচানী বা হাড়িয়া। যদিও হাড়িয়া উত্তেজক পানীয় তবুও তারা প্রায়ই তা খায়। তারা প্রতিটি উৎসবে মহুয়ার রস পান করে।^{৩৮} সাঁওতাল মেয়েদের পোশাক মোটা শাড়ি বা ফতা কাপড়। তারা একখণ্ড ফতা কাপড় হাঁটুর নীচ পর্যন্ত কোমরে পেঁচায় এবং অন্য একখণ্ড বস্ত্র দিয়ে বক্ষদেশ ঢেকে উপর দিকে বাম কাঁধ দিয়ে পিঠের দিকে ঝুলিয়ে দেয়। সাঁওতাল রমণীদের প্রচলিত এই বেশভূষার পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য অনন্য। সাধারণ সমাজের বেশভূষার সঙ্গে এ রকম পোশাকের কোন সাদৃশ্য নেই। যদিও আধুনিক যুগে তাদের মধ্যে অনেকেই শাড়ি পরিধান করে।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, দিনাজপুর জেলার কৃষিজপণ্যের যে সুখ্যাতি রয়েছে তার পেছনে প্রত্যক্ষভাবে বিরল থানার অবদান রয়েছে। বিরলের ধান বা চাল, লিচু ও ভুট্টা চাষে সাঁওতাল নারীরা যুগের পর যুগ ধরে স্বল্প মজুরিতে শ্রম দিয়ে চলছে। তাদের অর্থনৈতিক বৈষম্যের সুস্পষ্ট কয়েকটি দিক রয়েছে: প্রথমত, তারা কৃষিকাজে যে শ্রম দেয় তার ন্যায্য মূল্য পায়না। জমির মালিকগণ অল্প টাকা দিয়ে ফসল ঘরে তুলতে পারলেই স্বার্থক। সাঁওতাল নারীকে বঞ্চিত করা হচ্ছে সেটা তাদের ভাবনার বিষয় না। উত্তরাধিকারসূত্রে ভূমির মালিক ও কারখানার মালিকগণ একই কাজ করছে। দ্বিতীয়ত, সরকার থেকে আদিবাসীর যে অনুদান দেওয়া হয় তার কোনটিই সাঁওতালরা শতভাগ ভোগ করতে পারে না। কারণ সর্বোচ্চ ওপরের ধাপ থেকে নিচের ধাপে পৌঁছানোর পর গ্রাম পর্যায়ে এসে খুবই স্বল্প পরিমাণ সাহায্য তাদের হাতে পৌঁছায়। সেই অর্থে তাদের সকলের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয় না। তৃতীয়ত, তাদের সবার নিজস্ব জমি না থাকায় তাঁরা কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক লোন বা অন্য কোনো সুবিধা পায় না। চতুর্থত, সাঁওতালরা শিক্ষিত না হওয়ায় কোঠার ভিত্তিতে চাকরির সুবিধা পায় না। কারণ তাদের মধ্যে শিক্ষিত লোক কম। মূলত, বিরল থানার প্রতিটি কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে সাঁওতাল নারীদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। তাদের এই অবদানের সঠিক মূল্যায়ন হয় না। যুগ যুগ ধরে তারা এই অর্থনৈতিক বৈষম্যের স্বীকার হচ্ছে।

উপসংহার

প্রাচীন সভ্যতার দিকে লক্ষ্য করলে পরিলক্ষিত হয় যে কৃষি কাজের সূচনা হয়েছিল নারীর হাতে এবং তার বিকাশ ঘটেছে নারীর কৃতিত্বেই। গবেষণার ক্ষেত্র সমীক্ষায় আমরা শুধু একটি উপজেলার চারটি গ্রামের কৃষিকাজে সাঁওতাল নারীর অবদানের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সাঁওতাল

নারীরা পুরুষের ন্যায় সমানভাবে সময় ব্যয় করেছে, একইভাবে ধান রোপন, আগাছা পরিষ্কার, ভুট্টা লাগানোসহ সব কাজই করেছে কিন্তু পারিশ্রমিক পায় পুরুষের তুলনায় কম। এমন অনেক উপজেলায় গ্রামের চিত্র হয়ত একই, নারীরা পুরুষের পাশাপাশি কৃষিকাজ, রাস্তাঘাট উন্নয়নসহ সকল কাজেই সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছে কিন্তু নারীরা তাদের সমমজুরি পায় না। কাগজ কলমে নারীর সম-অধিকার রয়েছে কিন্তু অনেক স্থানেই নারীরা আর্থিকভাবে বৈষম্যের শিকার। বিভিন্ন গ্রামের কৃষক, শ্রমিক বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের অবস্থান পূর্বের অবস্থা থেকে বর্তমানে কতটা উত্তরণ ঘটেছে এবং আদৌ ঘটেছে কি না তা বাস্তবে বলা সম্ভব না? আজও পুরুষ শ্রমিক দিন শেষে পাঁচশত টাকা দৈনিক মজুরি পাচ্ছে আর সাঁওতাল নারী পাচ্ছে তিনশত টাকা। সরকারের পক্ষ থেকে প্রদানকৃত কৃষি সংশ্লিষ্ট সব সুযোগ সুবিধা প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে গেলেও তা নির্দিষ্ট সুবিধাভোগীরাই ভোগ করে। এছাড়া বিভিন্ন সম্প্রদায় বা যাদের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়, অনেকে জানে না সরকারের পক্ষ থেকে তাদের কী কী সুবিধা রয়েছে? মোটকথা বিরল উপজেলার সাঁওতাল নারীরা অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত একটি সম্প্রদায়। যদি এই সাঁওতাল জনগোষ্ঠী কৃষিকাজে জড়িত না থাকে তাহলে এই অঞ্চলের কৃষিজপণ্য উৎপাদনের জন্য শ্রমিকের ঘাটতি হবে। কৃষিজপণ্য উৎপাদনের ব্যয় অনেক বেড়ে যাবে। কৃষিজমিতে উৎপাদিত সব ধরনের ফসল উৎপাদনের সাথে তারা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। তাছাড়া অনেক চা বাগানে, অটোচালের মিলে, জুট মিলে কাজ করে। সাঁওতাল নারীরা শুধু কৃষিকাজের সাথে জড়িত না, সংসারের কাজও নিজেরাই করে। নিজের গৃহে পশু/শুক্র (চিত্র-৯-১০) পালন করে। বেশির ভাগ পরিবারেই এই পশুর উপস্থিতি দেখা যায়। তারা দৈনন্দিন মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্যই কৃষি শ্রমিক ও কারখানার শ্রমিক হিসেবে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। আধুনিক যুগে চাহিদার প্রেক্ষাপটে তাদের শ্রমের ন্যায্য মূল্য পাওয়া তাদের অধিকার। একজন পুরুষ শ্রমিক যে মূল্য পায় সাঁওতাল নারীকে একই মূল্য দেয়া হলে তবেই অর্থনৈতিক বৈষম্য অনেকাংশে দূর হবে এবং তাদের জীবনযাত্রায় কিছুটা পরিবর্তন আসবে।

ছবিচিত্র



চিত্র. ১. সাঁওতাল নারীধান রোপণ করে স্বামী পাশে



চিত্র. ২. তিন জন নারীধান রোপনরত



চিত্র. ৩. তিন জন নারীধান রোপনরত



চিত্র. ৪. তেরো জন সাঁওতাল নারীধান রোপনরত



চিত্র. ৫. ভুট্টা ভাঙ্গে সাঁওতাল নারী



চিত্র. ৬. ফুল চলাকালীন সময়ে সাঁওতাল কন্যা মাঠে হাঁস নিয়ে



চিত্র. ৭. ঘরের দেয়ালে সংস্কৃতির অংশ প্রজাপতি আঁকা



চিত্র. ৮. দেবতাদের বিভিন্ন চিত্র



চিত্র.৯. সারাদিন ধান রোপনের পর নিজের পোষা শুকরের যত্ন



চিত্র.১০. শুকরের বড় পাল



চিত্র ১১. সাঁওতালদের আনন্দ উৎসব

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. D.N Majumder & T.N Madan, *An Introduction to Social Anthropology* (Bombay: Asia Publishing House, 1967), p. 241
২. W.W.W.bn, banglapedia.org
৩. Mazharul Islam Toru, Santal, Mesbah Kamal & others (ed.) *Cultural Survey of Bangladesh Series-5, Indigenous Communities* (Dhaka: Bangladesh Asiatic Society, 2007), p.352
৪. শরীফ উদ্দীন আহমদ(সম্পাদিত), *দিনাজপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ১৯৯৬), পৃ.৪
৫. F.W Strong, *Eastern Bengal District Gazetteers, Dinajpur* (Allahabad: The pioneer Press 1912), p. 30
৬. F. O. Bell, I.C.S, *Settlement Officer: Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Dinajpur, 1934-40*, (Alipore: Superintendent, Govt. Printing, Bengal Govt. Press 1941), P.7

৭. F.W Strong, *op.cit.*, p.1; বাংলাদেশ আদমশুমারী: ১৯৯১ (ঢাকা: ইউনিয়ন পরিসংখ্যান, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ডিসেম্বর, ১৯৯৩), পৃ.৩-৫
৮. Minhaj-ud-din Siraj, *Tabaqat-i-Nasiri*, (eng.tr.) Major H. G. Raverty, vol. 1, (Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1970) p. 550 ; Ghulam Hussain Salim, *Riyazu-Salatin (A History of Bengal)* Translated by Abdus Salam, (Delhi: Idarah-I-Adabiyat-I, 2009), pp. 62-65
৯. শরীফ উদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪-৫
১০. ধনঞ্জয় রায়, *বিশ শতকের দিনাজপুরের মন্বন্তর ও কৃষক আন্দোলন* (কোলকাতা: পুনশ্চ প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ৭
১১. বিরল থানাকুশি অফিস, ১৫-০২-২০২৩; F. W. Strong, *Eastern Bengal District Gazetteers, Dinajpur*, pp. 33 & 44
১২. নুরুল ইসলাম খান (সম্পাদক), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর দিনাজপুর* (ঢাকা, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৯১), পৃ. ৮৫-৮৬; আবদুস সাভার, *উপজাতীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য* (ঢাকা: শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৭৯), পৃ. ৩৩-৩৪
১৩. Mazrarul Islam Toru, *op.cit.*, p.354; সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*, ১০ম খণ্ড (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০০৩), পৃ. ১০৪
১৪. জাফর আহমাদ হানফী, *বাংলাদেশের উপজাতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি, বাংলাদেশের উপজাতীয় সংস্কৃতি*, ঐতিহ্য ও জীবনযাত্রা বিশেষ প্রদর্শনী ১৪০০ সাল, (ঢাকা: ১০০০, বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, ২৩ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৩-৭ ই জানুয়ারী ১৯৯৪), পৃ. ১
১৫. সাঁওতালদের বিচার ব্যবস্থা কঠিন। তাদের গ্রাম প্রধান মাঝি বা মাতবর। তাদের প্রতিটি ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে মাঝি অপরিহার্য। বিশেষ পরিস্থিতিতে যদি কোন গ্রামে তাদের জাতের মাঝি বা মাতবর না থাকে তাহলে অন্য গ্রামে তাদের জাতের মাতবর বা মাঝি থাকলে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য তাকে নিয়োগ করা হয়। তাকে বলা হয় হ্যাণ্ডি মাঝি। সাঁওতাল ভাষায় গ্রাম পঞ্চায়েতকে বলে মোরেহর। প্রতিটি গ্রামে মাঝিখান নামে একটি নির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে। সেই নির্দিষ্ট স্থানেই পঞ্চায়েত বসে এবং ছোটখাটো বিবাদ মীমাংসা হয়। H.H Risley, *The Tribes and Castes of Bengal*, Vol-1, 2 (Calcutta: Bengal Secretariate Press, 1892), pp. 234-235; নুরুল ইসলাম খান (সম্পাদক), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর দিনাজপুর*, পৃ. ৮৭
১৬. আবদুস সাভার, *উপজাতীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য*, (ঢাকা: শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৭৯), পৃ. ৩৯; বুদ্ধরায় হেম্বম-পুরুষ- (হিন্দু) ৫০ বছর, স্ত্রী-মালতী মাডরী, পেশা- শ্রমিক, গ্রাম- বেতুড়া, ইউনিয়ন-ভাণ্ডারা, থানা- বিরল, জেলা- দিনাজপুর, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান- মেড়াগাঁও, তারিখ- ৬-১-২০২৩
১৭. H.H Risley, *op.cit.*, pp. 227-228; সুমন হেম্বম, বয়স-২৫ বছর, সেলিনা কিছু খ্রিষ্টান, শ্রমিক, গ্রাম, বেতুড়া, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান, বেতুড়া, ৬-১-২০২৩
১৮. সাঁওতালদের বিয়েতে মেয়েরা দল ধরে গান গায়- কাতি দূরে কাতি দূরে নাইহারা, কাতি দূরে শ্বশুরা ঘর, ইন্ডে হনা গাং নাদি, উঙে হনা জাবো নাদি, তাহির মাঁঝে গো পুতা ওহরা নাহি হয়। অনুবাদ- কত দূরে কত দূরে কত দূরে শ্বশুর বাড়ী, এক দিকে গঙ্গা অন্য দিকে জাবো নদী মাঝখানে পুত্র তোমার শ্বশুর বাড়ী। সাক্ষাৎকার- ভয়তড় হেম্বম বয়স- ৪০ বছর, স্ত্রী. গোলাপী মাডরী হিন্দু, শ্রমিক, গ্রাম, বেতুড়া, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: তিনপাড়া, তারিখ-৭-১-২০২৩
১৯. H.H Risley, *op.cit.*, pp. 227-228; বিয়েতে সিঁদুর পরানোর সময় যা বলে সাঁওতালদের মধ্যে তা হলো- মা বাবা তেহেএং দ কাম্মার টটেকল তলাৎমেয়া সেদরারে কারকারেম চালাঃক্ আ জাং জাং দ জমমে। আর জেল্ জেল্ দ আঙুইমে। বুয়াঃকরে হাসোঃ করে। সুকরে দুকরে জুরীজতা বাড়ে তাঁহেঃকবিন। তেহেএং দ বাবা জাং জাং তরচ্ হঁ তরচএম কিরিএং কেদা। অনুবাদ-বৎস আজ থেকে তোমাকে এই বোঝা দেওয়া হলো। শিকারে গেলে তুমি অর্ধেক খাবে ও অর্ধেক আনবে। রোগে শোকে সুখে দুঃখে তোমরা সঙ্গী সাথীরূপে থাকবে। আজ তুমি অস্ত্রি ও ছাই উভয়ই কিনলে। সাক্ষাৎকার, মেরুটুডু (হিন্দু) বয়স-৪০ বছর, স্বামী-রবিণ মুর্মু, গ্রাম, বোরহাননগর, ৮-১-২০২৩

২০. মো: খোরশেদ আলী, অবসরপ্রাপ্ত (সরকারি) প্রাইমারী শিক্ষক, গ্রাম: পাকুড়া, পো: এম নগরবাড়ি, থানা: বিরল, জেলা: দিনাজপুর, সাক্ষাৎকার, তারিখ: ৮-১-২০২৩
২১. আব্দুল কুদ্দুস, প্রাক্তন মেম্বর, ৬ নং ভাওরা ইউনিয়ন, বিরল, দিনাজপুর, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান- পাকুড়া, তারিখ: ৯-১-২০২৩
২২. রেজোয়ান মেম্বর, ৬ নং ভাওরা ইউনিয়ন, বিরল, দিনাজপুর, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান-পাকুড়া, তারিখ: ১০-১-২০২৩
২৩. মোঃ মামুনুর রশীদ, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ৬ নং ভাওরা ইউনিয়ন, থানা-বিরল, জেলা: দিনাজপুর, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: ভাওরা, তারিখ: ৯-১-২০২৩
২৪. তানজিমুল ইসলাম, বয়স, ৪৮ বছর, পেশা: শিক্ষক, পাকুড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি এ, গ্রাম: বেতুড়া, থানা: বিরল, জেলা: দিনাজপুর, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: পাকুড়া, তারিখ: ১০-১-২০২৩
২৫. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আর্থনৈতিক ভূগোল, (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৫), পৃ.১৬১
২৬. মঙ্গল হেম্ম, স্ত্রী- তেরেজা টুটু-৩৫ বছর(সন্তান-২জন, রুবেল হেম্ম, ১০ বছর, থমাস হেম্ম, ৭ বছর, ফুলে যায় না), সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: মেড়াগাঁও, তারিখ: ৭-১-২০২৩
২৭. মোঃ রফিকুজ্জামান, বয়স: ৪৭ বছর, পেশা: অবসরপ্রাপ্ত বিডিআর (পুলিশ), বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: পাকুড়া, তারিখ: ৬-১-২০২৩
২৮. মাইদুল ইসলাম, বয়স: ২২ বছর, ছাত্র, হাজী দানেশ বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর, সাক্ষাৎকারের গ্রহণের স্থান: পাকুড়া, তারিখ: ১০-১-২০২৩
২৯. মোঃতানজিমুল ইসলাম, কৃষক, ২০ বিঘা জমিতে ভুট্টা এবং ৬০ বিঘা জমিতে ধান চাষ করান। সাক্ষাৎকারের গ্রহণের স্থান: বেতুড়া, তারিখ: ৯-১-২০২৩
৩০. অজয় হেম্ম হিন্দু, বয়স- ৩৮ বছর, স্ত্রী-শ্রামলী মাদরী, শ্রমিক, গ্রাম: বেতুড়া, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: তিনপাড়া, তারিখ: ৬-১-২০২৩
৩১. রবীন হেম্ম, বয়স- ৫০ বছর, স্ত্রী-সরুজ মণি মুরম, শ্রমিক, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: বেতুড়া, তারিখ: ৬-১-২০২৩
৩২. H.H Risley, *Op.cit.*, p. 333; Mazrarul Islam Toru, *op.cit.*, p.352
৩৩. আবদুস্ সাভার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫; লক্ষ্মী টুটু বয়স-৪০ বছর অবিবাহিত, গ্রাম: বেতুড়া, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: ভাওরা, তারিখ: ৬-১-২০২৩
৩৪. আবদুস্ সাভার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫; বাদল কিঙ্কু, বয়স- ৪২ বছর, এলিনা সরেন (খ্রিষ্টান), মেড়াগাঁও, বিরল। (প্রত্যেকটি সাক্ষাৎকার এখানে সংযুক্ত করা হয়নি। মাত্র ৪০ জন সাঁওতালের সাক্ষাৎকার উল্লেখ করা হয়েছে।)
৩৫. F.W Strong, *Eastern Bengal District Gazetteers, Dinajpur*, p. 30; F. O. Bell, I.C.S., Settlement Officer: *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Dinajpur*, p.14
৩৬. F.W Strong, *op.cit.*, pp. 33, 42
৩৭. নুরুল ইসলাম খান (সম্পাদক), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর দিনাজপুর*, পৃ. ৮৫-৮৬
৩৮. তদেব, পৃ. ৮৫

জমা প্রদানের তারিখ : ২৩.০২.২০২৩

গৃহীত হবার তারিখ : ০৮.০৮.২০২৩

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা: প্রান্তিক নারীর স্বতন্ত্র স্বর

সোনিয়া পারভীন*

Abstract

Hansuli Banker Upakatha is one of the greatest achievements and modern creations of Tarasankar Bandyopadhyay. Among the novels where he has picturized the social, cultural, political and economic reality of the people of ancient ethnic group, Hansuli Banker Upakatha is the most notable one. In this novel, the story of the end of feudalism and the rise of capitalism is a crisis in the life of lower class people. The uniqueness of this novel is the representation of life and culture of the marginalized people. The Kahar community is the central theme of this novel. The attitude of character and the reality of life women of this Kahar community is his own experience. Basically, in this research article, an attempt has been made to review the diverse lifestyles of marginalized female characters in the novel Hansuli Banker Upakatha through the use of narrative and text analytical methods.

চাবিশব্দ: হাঁসুলী বাঁক, রাঢ়-অঞ্চল, কাহার-সম্প্রদায়, সুচাঁদ, নীলকুঠি

ভূমিকা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কথাসিদ্ধি। তাঁর শিল্পসাহিত্যে প্রধানত রাঢ় অঞ্চলের মানুষের জীবন ও সংগ্রামের কথা উঠে এসেছে। তাঁর শিল্পীজীবনের শীর্ষসময়ে রচিত উপন্যাস হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (১৯৪৭)। এ উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে সামন্তবাদের অবসান ও পুঁজিবাদের উত্থানে সংকটাপন্ন নিম্নবর্গীয় জনজীবনের জীবনগাথা। লেখক এখানে বীরভূমের 'কাহার' নামে একটি আদিম সম্প্রদায়ের লোককাহিনি, লোকবিশ্বাস, লোকগীতি ও লোকসংস্কারকে পরম মমতায় তুলে ধরেছেন। ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে বহুমাত্রিক অনুষ্ণের অবতারণা করলেও কেন্দ্রে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে রেখেছেন 'কাহার নারী'কে। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রান্তিক নারী বলতে কাহার সমাজের নারীকে বোঝানো হয়েছে। যে সব নারীরা সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত নয় এবং সুবিধা বঞ্চিত তারাই মূলত প্রান্তিক নারী। রাঢ় বঙ্গের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে এই প্রান্তিক নারীর বসবাস। লেখক এই নারী চরিত্রগুলোর যাপিত জীবনে প্রবেশ করে তিনি তাদের প্রাণস্পন্দন স্পর্শ করেছেন। তাই হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাসের বিষয়ভাবনা, চরিত্র-চিত্রণ, ভাষা-সংলাপ, মিথ, ভাবনার পাশাপাশি নারী চরিত্রগুলো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার দাবি রাখে। ঔপন্যাসিক কাহার নারীকে কীভাবে চিরন্তন, স্বতন্ত্র ও প্রাণবান করে তুলেছেন সেটি বর্ণনাত্মক ও পাঠবিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে বিশ্লেষণের চেষ্টা চালানো হয়েছে আলোচ্য এ প্রবন্ধে।

জন্মসূত্রে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শৈশব-কৈশোরসহ যৌবনের বেশ কিছু সময় বীরভূম অঞ্চলে কাটিয়েছেন। জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নিজ গ্রাম লাভপুর থেকেই তিনি লক্ষ করেছেন বদলে যাওয়া গ্রাম; উঠতি পুঁজিতন্ত্রের সাথে ক্ষয়িধু সামন্তসমাজের অসম দ্বন্দ্ব। ফলে তাঁর কথাসাহিত্যের

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রধান অনুষ্ণ হয়ে ওঠে দেশ-কাল, সমাজের মাটি সংলগ্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। এই প্রান্তিক মানুষের সাথে তাঁর আত্মীয়ের সম্পর্ক, তাই এদের কথা তিনি লিখে রেখেছেন তাঁর গল্প ও উপন্যাসে। তাঁর *আমার সাহিত্য জীবন* নামক আত্মকথায় তিনি জোরের সাথে বলেছেন:

এদের সঙ্গে পরম সৌভাগ্যের ফলে একটি আত্মার আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। এমনই সে আত্মীয়তা যে, প্রবাসে থাকি- প্রতিষ্ঠা খানিক পেয়েছি, তবু সে আত্মীয়তা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। এ পাওয়া যে কি পাওয়া সে আমি জানি। তাই আমি এদের কথা লিখি। এদের কথা লিখবার অধিকার আমার কাছে। আমি ওদের জানি-ওদের আত্মার আত্মীয় আমি। উপকারী নয়, কৃতজ্ঞতা ভাজন নয়, ভালোবাসার জন।^১

লেখক জমিদার বংশের সন্তান হয়েও নিম্নস্তরের মানুষের জীবনে যে হৃদয়বিদারক কাহিনি তা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন তাঁর শিল্পকর্মে। এই অন্তর্জাগ্রত মানুষগুলোকে তিনি কখনও অশ্রদ্ধা করেননি, দূরত্বের চোখ দিয়ে দেখেননি। প্রান্তিক মানুষের প্রতি অনুরাগ ও আকর্ষণ থেকেই তিনি তাদের জীবনকে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছেন। ভারতীয় অসংখ্য আদিবাসীদের মধ্যে কাহার নৃগোষ্ঠী একটি ক্ষুদ্র শাখা। উপন্যাসিক আমার *কালের কথা* গ্রন্থে কাহারদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, “কাহার বলে কোনো নির্দিষ্ট জাতি বাংলাদেশে নেই। হরিজন যাদের বলি আমরা এদের মধ্যে যারা পালকি বয়ে থাকে তারাই বাংলাদেশে কাহার। ধরা যাক বাগদী সম্প্রদায়। বাগদীদের মধ্যে যারা পালকী বয় তারা বাগদী কাহার, যারা বয়না তারা গুধুই কাহার।”^২ *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাসে লেখক যে কাহার সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন, তারা তাঁর নিজ গ্রাম লাভপুরের মাইল দুয়েক দূরে বাঁশবাঁদি গ্রামের বাসিন্দা। উপন্যাসের শুরুতেই তাদের পরিচয় স্পষ্ট করেছেন উপন্যাসিক। “নদীর বেড়ের মধ্যে হাঁসুলী বাঁকে ঘন বাঁশবনে ঘেরা মোটামোট আড়াইশো বিঘা জমি নিয়ে মোজাবাঁশবাঁদি, লাট্‌ জাঙলের অন্তর্গত। বাঁশবাঁদির উত্তরেই সামান্য খানিকটা ধানচাষের মাঠ পার হয়ে জাঙল গ্রাম। বাঁশবাঁদি ছোট গ্রাম; দুটি পুকুরের চারি পাড়ে ঘর-তিরিশেক কাহারদের বসতি।”^৩

উপন্যাসে বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী বাঁশবাঁদি গ্রাম পুরোপুরি কাহারদের নয়। এটি জাঙল গ্রামের একটি পাড়া এখানে দুঘর কাহাররা বসবাস করে। বেহারা কাহার এবং আটপৌরে কাহার। *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাসে কাহার নারীদেরকে তিনি সজীব ও প্রাণবন্ত করে উপস্থাপন করেছেন। সুচাঁদ, বসন, পাখী, কালোশশী, সুবাসী, বাসিনী বউ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্র এই উপন্যাসের কাহিনিকে আরও বেগবান করেছে।

বাংলা সাহিত্যে ‘কল্লোল’ যুগে আবির্ভূত তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাকোবিদ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) এই তিনজন প্রখ্যাত ও শক্তিশালী সহিত্যিকের সাহিত্যকর্মে প্রান্তিক নারীর পরিচয় পাওয়া গেলেও তাদের সকলের প্রকাশভঙ্গি ও জগৎ আলাদা:

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা বিভূতিভূষণ জনজাতিগোষ্ঠীর নারীচরিত্র সৃষ্টিতে গোষ্ঠী-পরিচয়-চিহ্ন খুব বেশি ধরে রাখতে পারেননি। কুবেরের স্ত্রী মালা প্রেমিকা কপিলা-দুজনই নারী-হৃদয়ের কামনা-বাসনা নিয়ে মূর্ত হয়েছে, মাঝি সম্প্রদায়ের গোষ্ঠী-পরিচয় সেখানে নগণ্য। আবার বিভূতিভূষণের আরণ্যক-এ ভানুমতি আর কুস্তা দুজনই যথাক্রমে সম্প্রদায়বৃত্ত অতিক্রম করা এক মধুর প্রাণোচ্ছল তরুণী আর সংযত দুঃখিনী বিধবা।^৪

কিন্তু হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাসে লেখক বেছে নিয়েছেন ভিন্নধর্মী এক কাহার সমাজ, যে সমাজের কথা পূর্ববর্তী লেখকের দৃষ্টিগোচর হয়নি। বিশেষত কাহার সম্প্রদায়ের নারী চরিত্রগুলোকে তিনি যেভাবে সাবলীলভাবে গড়ে তুলেছেন, তা একান্তই দীর্ঘদিনের পরিচয় না থাকলে সম্ভব নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কল্পনার মিশ্রণে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলো হয়ে উঠেছে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। আমার কালের কথা (১৪০২) গ্রন্থে তিনি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। এ উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর একটি মন্তব্য স্মরণযোগ্য: ‘হাঁসুলী বাঁকে কাহাররা আছে তাদের জীবনযাত্রায় বা সামাজিক বাস্তবতায় আমি অতিরঞ্জন করিনি, কিন্তু বলব এর বৈচিত্র্যের যে উজ্জ্বলতা তা আমার কল্পনার অনুরঞ্জে।’^৭

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাসে কাহার সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পেশার মানুষের জীবন ও সংগ্রামের চিত্র তুলে এনেছেন। ‘এই উপন্যাসের নায়ক কোনো ব্যক্তিবিশেষ নহে, হাঁসুলী বাঁকের প্রাকৃতিক পরিবেশ, অধ্যাত্ম ভাবমণ্ডল ও এই উভয়ের বেষ্টন-রেখার সংহত একটি মানব সমাজ।’^৮ লেখক বনওয়ারী ও করালী চরিত্রকে কেন্দ্র করে সমগ্র কাহার জীবনের চিত্র উন্মোচন করেছেন। এখানে পুরোনো ক্ষয়িষ্ণুবেলার চরিত্র বনওয়ারী; বনওয়ারীর প্রতিদ্বন্দ্বী চলমান প্রবাহের সঙ্গে একাকার করালী। এই প্রধান দুটি চরিত্র ছাড়াও এ উপন্যাসে নারী চরিত্রসমূহের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম, হতাশা, দারিদ্র্য, পরকীয়া, ধর্ম, রীতি-নীতি প্রভৃতি বিষয়কে ঔপন্যাসিক শিল্পনৈপুণ্যে উপস্থাপন করেছেন। এখানে রয়েছে একটি মহাকব্যিক আখ্যান। ত্রিশ পরিচ্ছেদের সমন্বয়ে লিখিত এ উপন্যাসের শুরুতেই তিনি কাহার নারীর প্রসঙ্গকে নদীর সাথে তুলনা করে বর্ণনা করেছেন:

নদীর ভাবনা এখানে চার মাসের। আষাঢ় থেকে আশ্বিন। আষাঢ় থেমেই মা-মরা ছোট মেয়ের বয়স বেড়ে ওঠে। যৌবনে ভরে যায় তার শরীর। তারপর হঠাৎ একদিন সে হয়ে ওঠে ডাকিনী। কাহারদের এক-একটা ঝিউড়ী মেয়ে হঠাৎ যেমন এক-একদিন বাপ-মা-ভাই-ভাজের সঙ্গে ঝগড়া করে, পাড়া-পড়শীকে শাপ-শাপান্ত করে, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে গাঁয়ের পথে, চুল পড়ে এলিয়ে, গায়ের কাপড় যায় খসে, চোখে ছোট্টে আঙন, যে ফিরিয়ে আনতে যায় তাকে ছুঁড়ে মারে ইট পাটকেল পাথর, দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলে কূলে কালি ছিটিয়ে দিয়ে, তেমনি ভাবেই সেদিন ওই ভরা নদী অকস্মাৎ ওঠে ভেসে। তখন একেবারে সাক্ষাৎ ডাকিনী! ক্ষমা নাই-ঘেন্না নাই-দিগম্বরীর মতো হাঁক ছেড়ে, ডাক পেড়ে, শতমুখে কলকল খলখল শব্দ তুলে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোট্টে। গ্রাম বসতি মাঠ শাশান ভাগাড়, লোকের ঘরের লক্ষ্মীর আসন থেকে আঁষ্টাকুড়-যা সামনে পড়ে মাড়িয়ে তছনছ করে দিয়ে চলে যায়। সেও একদিন দুদিন। বড়জোর কালে-কস্মিনে চার-পাঁচ দিন পরেই আবার সম্মিলিত ফেরে। কাহারদের মেয়েও যেমন রাগ পড়লে এসে চুপ করে গাঁয়ের ধারে বসে থাকে, তারপর এক-পা, দু-পা করে এসে বাড়ির কানাচে গুয়ে গুনগুন করে কাঁদে কি গান করে, ঠিক ধরা যায় না....।^৯

উল্লিখিত বর্ণনা থেকে কাহার সমাজের যে নারীর সন্ধান আমরা পাই, সেটি আধুনিক সমাজের সাথে যেমানান বা বৈসাদৃশ্য মনে হয়। আমাদের চিন্তার বাইরেও যে বৈচিত্র্যে ভরা মানুষের অস্তিত্ব আছে সেটিই দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাসের প্রাণ এ উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলো। তারা কোন সভ্যতার সীমায় প্রবিষ্ট হয়নি। নিজস্ব জগতের বাইরে তারা কিছু ভাবতে পারে না। লেখকের ভাষায় তারা যেন কোপাই নদী। কোপাই নদীতে যেমন দুকূলপ্লাবী হড়পা বান আসে, এদের জীবনেও আসে তেমনি আবেগের উৎসার, প্রণয়াবেগের ধারায় তাদের জীবনে নেমে আসে রঙের খেলা। ঔপন্যাসিক উপন্যাসের নামকরণের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক রেখেছেন। কোপাই নদীর বাঁকটিকে

মেয়েদের গয়না হাঁসুলীর সাথে তুলনা করেছেন। হাঁসুলী লোকসমাজে ব্যবহৃত বহুল প্রচলিত অলঙ্কার। ঔপন্যাসিকের ভাষায়:

কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি যে বিখ্যাত বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক—অর্থাৎ যে বাঁকটায় অত্যন্ত অল্প-পরিসরের মধ্যে নদী মোড় ফিরেছে, সেখানে নদীর চেহারা হয়েছে ঠিক হাঁসুলী গয়নার মতো। বর্ষাকালে সবুজ মাটিকে বেড় দিয়ে পাহাড়িয়া কোপাইয়ের গিরিমাটি-গোলা জলভরা নদীর বাঁকটিকে দেখে মনে হয়, শ্যামলা মেয়ের গলায় সোনার হাঁসুলী; কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে জল যখন পরিস্কার সাদা হয়ে আসে—তখন মনে হয় রূপোর হাঁসুলী। এই জন্য বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক।^৮

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাসের নারীচরিত্রসমূহ লেখকের একটি বাস্তবিক পটভূমি থেকে সংগৃহীত হয়েছে। লেখক এখানে নিজের চরিত্রকে আড়ালে রেখে কথকের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। অসংখ্য চরিত্র নিয়ে তিনি এই এপিকধর্মী উপন্যাস রচনা করলেও কথক হিসেবে বেছে নিয়েছেন সুচাঁদ নামের একজন নারী চরিত্রকে। সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত হলেও প্রত্নপ্রতিমাতুল্য চরিত্র সুচাঁদই।^৯ সে মান্ধাতার আমলের প্রতীক। কাহার পল্লীর মুখপাত্র হিসেবে লেখক সুচাঁদকে নির্মাণ করেছেন। তার বধিরতার মাধ্যমে লেখক অতীতকে আঁকড়ে রাখা এবং বাস্তবতাকে অস্বীকার করার প্রবণতাকে তুলে ধরেছেন। তারাক্ষর তাঁর স্মৃতিকথায় বারবার বলেছেন, “ওই সুচাঁদ এবং আমি গল্প করেছি আর বিড়ি টেনেছি।”^{১০} তার মধ্য দিয়ে কাহার সংস্কৃতি কথা বলে। তাকে কাহার সমাজের সাংস্কৃতিক নেত্রী বলা যায়। সুচাঁদ চরিত্র সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:

অশীতিপর বৃদ্ধা সুচাঁদ দৈব শক্তির অধিকারিণী ও ব্যাখ্যাাত্রী; হাঁসুলী বাঁকের জন্মবৃগুস্ত, উহার অতীত কাহিনী, উহার কৈশোর ও প্রথম যৌবনের সমস্ত উদ্ভট কল্পনা ও অপ্রাকৃত অভিজ্ঞতা পারলৌকিক জগৎ হইতে অভ্যাসগত প্রতিটি ধ্বনি ও স্পর্শ, দেবতার রোষ ও প্রসাদের প্রতিটি নিদর্শন তাহার স্মৃতির ঐতিহাসিক আধারে অখণ্ড সমগ্রতায় ও প্রথম অনুভূতির গাঢ় বর্ণলেপে অবিস্মরণীয়ভাবে রক্ষিত।^{১১}

ঔপন্যাসিক কাহার নর-নারীর বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রেখেছেন সুচাঁদ চরিত্রের মাধ্যমে। এই চরিত্রেই উপন্যাসের মিথিক প্রবাহের কেন্দ্রবিন্দু। উপকথায় যে লোকবিশ্বাস ও পুরাণের কথা উঠে এসেছে, তার বর্ণনাকারী বুড়ি সুচাঁদ। সে রূপকথারও গল্প বলত। এসব রূপকথা লোকেয়ত জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রূপকথার কিছু অংশ সুচাঁদের বাকভঙ্গিমায় ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন: “এক আজার কন্যেকে যে বিয়ে করত সে-ই মরত। কন্যের নাক দিয়ে আঙুরের সুতোর মতো সরু হয়ে বের হত এক সাপ, বের হয়ে সে ফুলত, কেমে কেমে ফুলে সে হত রজগর। তারপরে সে ডংশাত আজকন্যের স্বামীকে।”^{১২} তার মধ্য দিয়ে কাহারদের ঐতিহ্যকে শেষ-অবধি বাঁচিয়ে রেখেছেন লেখক। সুচাঁদের জবানিতে লেখক জানিয়েছেন কত্তাবাবা, মা মনসা, বেলের ধর্মরাজ, মা-বাকুলের বুড়ি কালি প্রমুখ দেব-দেবীর প্রসঙ্গ। লোক বিশ্বাস ও ধর্মবোধ কীভাবে কাহার সমাজে প্রতিফলিত হয়েছে তার একটি দৃষ্টান্ত ঔপন্যাসিক সুচাঁদের জবানিতে তুলে ধরেছেন:

পাখি বললে-মরণ! ঢঙ দেখ! দোপরেবেলায় কাঁদতে বসল দেখ! সাপ আবার বাবা হয়!-হয় লো, হয়। বুড়ি কেঁদে উঠল। সুর করে কেঁদে কেঁদে বুড়ি বলে গেল-ও যে আমার বাবাঠাকুরের বাহন রে! ওর মাথায় চড়ে বাবাঠাকুর যে ‘ভোমন’ করেন। আমি যে নিজের চোখে দেখেছি রে! দহের মাথায় বাবাঠাকুরের শিমুলগাছের কোটরে সুখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন রে, আমি যে পরশু দেখেছি রে! এর পর আর অবিশ্বাসের কিছু থাকে না। বাবাঠাকুরের শিমুলগাছ, দহের মাথায় প্রাচীনতম বনম্পতি, তারই কোটরে এই আশ্চর্যজনক শিস-দেওয়া বিচিত্রবর্ণ বিষধর যখন থাকত, তখন বাবাঠাকুরের আশ্রিত, তাঁর বাহন-এতে আর সন্দেহ কোথায়!^{১৩}

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাসে Flash back রীতির মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক তিনটি কালের বর্ণনা করেছেন। নীলকুঠি সাহেবদের আমল থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ ও স্বাধীনতার প্রাক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত এর সময়সীমা। তিনি সুচাঁদ চরিত্রটিকে এই ইতিহাস ভাষ্যের কথক হিসেবে নির্মাণ করেছেন। বর্তমান কালের ভাঁজে ভাঁজে অতীতের অনুপ্রবেশের যে প্রবাহমানতা তা অতীতকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। কাহারপাড়ার আদ্যিকালের যত বিধান ছিল, সবই সুচাঁদের কাছে বলবৎ হয়েছে। অতীতকালের জন্য তার দীর্ঘশ্বাস, অতীতের স্মৃতি মনে করে সে কারণে অকারণে কাঁদে। ‘অতীতের রামায়ণের যুদ্ধ কাহিনির সঙ্গে, সুচাঁদের বর্ণনায় অবলীলায় মিলে যায় তাদের গোষ্ঠীর উপকথা-বান গোঁসাইয়ের যুদ্ধের কথা।’^{১৪} কীভাবে নীলকুঠি সাহেব-মেমরা হারিয়ে গেল, চৌধুরীরা জাঙল বাঁশবাঁদির মালিক হল, সে বর্ণনাও সুচাঁদের জবানিতে পাওয়া যায়:

নীলকুঠি সব জায়গায় যেমন ভাবে উঠেছে এখানেও তেমন ভাবেই উঠেছে, তবে কোপাইয়ের বান আর কুঠি-ওঠা ঘটেছে একসঙ্গে। যে সময় কুঠিয়াল সাহেবদের খারাপ সময় চলছিল, কারবার উঠিয়ে দেবার কথা হচ্ছিল, সেই সময় হঠাৎ একদিন রাত্রে কোপাই ভাসল। তেমন ভাসা কোপাই নাকি কখনও ভাসে নাই। সে বান কুঠি-বাড়ি পর্যন্ত ডুবিয়ে দিয়েছিল। লোকে বলে, সাহেব-মেম সেই বানে ভেসে গিয়েছিল। কিন্তু সুচাঁদপিসি যে কথা বললে, সেইটাই আসল কথা। সেই কথাটাই বিশ্বাস করে বনওয়ারী। ওই কর্তার কথা অমান্য করতে গিয়েই সাহেব মহাশয় মেমকে নিয়ে তলিয়ে গেল ঘুরনচাকির মধ্যে পড়ে। নইলে সাহেব-মেম-যারা সাত সমুদ্র পার হয়ে ভাসতে ভাসতে আসে, তারা কোপাইয়ের বানে মরে যাবে? কর্তার লীলা, কর্তার ছলনা সব। চৌধুরীকর্তা দেবতার দয়ায় শুধু যথের ধনই পেলেন না, সাহেব কোম্পানির তামাম সম্পত্তিও পেয়ে গেলেন জলের দামে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।^{১৫}

এই স্মৃতিকাতরতার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। কন্যা বসন ও নাতনি পাখি থাকার পরেও সে নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নেয়। বনওয়ারীর সাথে মাঠে কৃষি কাজ করে আবার কখনও মোষডহরির বিলে ঘাস কাটে। শ্রমসাধ্য কষ্টকর জীবন সংগ্রাম করে কোনমতে তার লজ্জা নিবারণ হয়; কিন্তু সর্বদা ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় না। এরকম পরিস্থিতিতেও সে হাঁসুলী বাঁকের উপকথাকে বাঁচিয়ে রাখে। গল্প বলে জীবিকা নির্বাহ করে সে। তার গল্পের সবটা কেউ শোনে না। কেউ শোনে গোড়াটা (অতীত), কেউ শোনে মাঝখানটা (বর্তমান), কেউবা শোনে শেষটা (ভবিষ্যৎ)। ঔপন্যাসিক আলোচ্য উপন্যাসে একে একে পাখি, গোপালীবালা, বনওয়ারী চরিত্রের মৃত্যু দেখালেও লেখক সুচাঁদকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। উপকথা জীবনকাহিনির শেষ পরিণতিও সুচাঁদের জবানিতে বলেছেন:

সুচাঁদ গাছতলায় বসে বলে যায় হাঁসুলী বাঁকের উপকথা। শ্রোতারা কেউ শোনে গোড়াটা, কেউ মাঝখানটা, কেউ-বা শেষটা। অর্থাৎ খানিকটা শোনে, তারপর উঠে চলে যায়। বুড়ি আপনমনেই বলে যায়। গল্প শেষ করে বলে-বাবা, ছেলেবেলায় শুনেছি, হিয়ের জিনিস যা-তা মাথায় রাখলে উকুন খায়, মাটিতে রাখলে পিপড়ে ধরে, হাতে রাখলে নখের দাগ বসে, ঘামের ছোপ লাগে। তাই হিয়েতে রেখেছি। হিয়ের জিনিস নিয়ে হিয়েতে যদি কেউ রাখত-তবে থাকত। তা কেউ তো নিলে না, রাখলে না। আমার সাথে সাথেই এ উপকথার শেষ। তবে পার তো নিকে রেখে।^{১৬}

সুচাঁদের এই জবানি থেকেই হয়তো লেখক কথাগুলো হৃদয়ে ধারণ করে লিখে রেখেছেন। আলোচ্য উপন্যাসের ক্লাসিক চরিত্র হিসেবে তিনি সুচাঁদকে নির্মাণ করেছেন।

উপন্যাসের কাহিনি বর্ণনায় লেখক কথকভঙ্গি গ্রহণ করলেও অধিকাংশ ঘটনা তিনি বনওয়ারীর জবানিতে বর্ণনা করেছেন। উপন্যাসের দ্বন্দ্ব নারী ও নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে। পরম ও বনওয়ারীর

দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে রয়েছে কালোশশী চরিত্রটি। আবার পাখিকে কেন্দ্র করে নয়ান ও করালীর মধ্যে বিবাদ, সুবাসীকে কেন্দ্র করেও বনওয়ারী ও করালীর মধ্যে লড়াই, এসব যেন তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাহার নারীদের এই রঙের খেলায় লেখক তাদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন করে নির্মাণ করেছেন।

কালোশশী হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাসের এক নজরকাড়া চরিত্র। আটপৌরে পাড়ার ডাকাত পরম কাহারের বউ সে। আদিম জৈবতার সমস্ত উপাদান দিয়ে ঔপন্যাসিক তাকে নির্মাণ করেছেন। তার রূপ দেখে দেবতারাও বুঝি পাগল হয়ে থাকে। সে এই উপন্যাসের একটি প্রভাবান্বিত চরিত্র। যতদিন বেঁচে ছিল সে বনওয়ারীকে প্রভাবিত করেছে। মৃত্যুর পরও তার প্রভাব বিন্দুমাত্র কমেনি। পরম ও বনওয়ারীর মধ্যে সংঘাত তৈরি হয়েছে এ কালোশশীকে ঘিরেই। ঔপন্যাসিক কাহার সমাজের নারীদের যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র করে নির্মাণ করেছেন, তারই পূর্ণ রূপ পাওয়া যায় কালোশশীর মধ্যে। পরম যখন জেলখানায় ছিল তখন চন্দনপুরের বড় বাবুদের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে কালোশশীর। টিকে থাকার পাশাপাশি এটি ছিল তার প্রতিবাদও। লোক জানাজানি হলে, উঁচু গলায় সে পরম কে বলেছে—‘বেশ করেছি, তোর খুশি তু সনজে বেলা জাঙলে যেথা খুশি যাস, আমারও যা খুশি তাই আমি করি।’^{১৭} কালোশশীর স্বাধীনচেতা মনোভাব আধুনিক নারী সত্তার প্রতিনিধিত্ব করেছে। যেখানে কালোশশী সমাজের রীতি-নীতি অমান্য করে পরমের স্ত্রী হয়েও বনওয়ারীকে ভালোবেসেছে। বনওয়ারীর কাছে বারবার সে ধরা দিয়েছে প্রেমিকারূপে:

কালোশশী হেসে উঠল। অদ্ভুত মেয়ে! সাক্ষাৎ ডাকিনী! কামরূপের ডাকিনীর মতো যেমন সাহস তেমনি মোহিনী। বনওয়ারী গেল না বলে কালোশশীই বেরিয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। চোখ দুটি টলটল করছে। ভয় পেলে বনওয়ারী। সম্ভবত কালোশশী মদ খেয়েছে। এখন তাকে কোন বিশ্বাস নেই। অগত্যা সে ইঙ্গিতে আসতে নিষেধ করে নিজেই এগিয়ে গেল।—কি বলছ? কালোশশী তার হাত ধরে বললে—দেখা নাই যে।^{১৮}

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাসে লেখক চিরায়ত মানবিক প্রেমকে সহজ ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন- যা শেষ পর্যন্ত যৌনতায় পর্যবসিত হয়েছে। প্রেমের মায়াবী রূপ, নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতা সবই দেখতে পাওয়া যায়। কালোশশী পরমের স্ত্রী হলেও বনওয়ারীর সাথে তার পরকীয়া প্রেমের চিত্র অঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক। কালোশশী চরিত্রটি কাহার সমাজের রহস্যময়ী চরিত্র। তাকে ঘিরে কাহার সমাজের কৌতূহলের শেষ নাই। অনেক দুর্নাম ও কলঙ্ক থাকা সত্ত্বেও কালোশশীর প্রতি দুর্মর আকর্ষণ অনুভব করে বনওয়ারী। ‘কালোশশীর মধ্যে নেশা আছে, সে নেশার ঘোর কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। ক্ষিদের সময় মুখের অন্ন ছেড়ে উঠে আসা যায়, কিন্তু কালোশশীর কাছে গিয়ে মাতাল না হয়ে ফিরে আসা যায় না।’^{১৯}

কালোশশীও কাহার সম্প্রদায়ের কুসংস্কার ও রীতি-নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। বিশেষত কত্তাবাবার প্রতি তার বিশেষ ভক্তি দেখা যায়। পরমের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও কত্তার পুজোয় গোপনে সে বলি পাঠিয়েছে। লেখক এদিকে যেমন কালোশশীর ধর্মীয় বিশ্বাসকে আদিমতার প্রেক্ষণবিন্দু হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, অন্যদিকে স্বাধীন প্রেমের প্রত্যাশায় বিভোর কালোশশীকে নিয়তির পথে ধাবিত করেছেন। কর্তাবাবার দহে গোখুড়ে সাপের কামড়ে মৃত্যু হয় কালোশশীর। সুচাঁদের স্মৃতিভাষ্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে কালোশশীর মৃত্যুত্তীর্ণ ভালোবাসার কথা:

হঠাৎ কালোবউয়ের ভয়ার্ত চিৎকারে কোপাইয়ের স্তব্ধ গর্তভূমি যেন বৃকের উপর খুনীর বাকমকানি দেখে উঠল। ওটা কি? শিকড়ের তলা থেকে আকাশের বিদ্যুতের মতো ঐক-বৈকে মাথা তুলে দাঁড়াল, ওটা

কি? চাঁদের আলোয় বলমল করছে কোপাইয়ের জল বালি। তীরের জঙ্গলের কোল পর্যন্ত ঘাস নড়ছে দেখা যাচ্ছে, বালির মধ্যে ঝিকমিক করছে বালুর কণা, দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কালোবউকে দেখা যাচ্ছে না কেন? সে কই? কালোবউ কোথায় গেল? বনওয়ারী চারিদিকে চেয়ে দেখে চাপা চিৎকারে ডাকলে—কালেশশী!^{২০}

বাসিনী বউ হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাসের আরেকটি নারী চরিত্র। এই চরিত্রটি উপন্যাসে নয়ান্নের মাতৃরূপে আবির্ভূত। নিঃস্ব, রিক্তনারী বাসিনী, স্বামী সংসার নেই—একমাত্র পুত্র নয়ান্ন অসুস্থ। নয়ান্নের মায়ের সঙ্গে বনওয়ারীর যে প্রণয় ছিল সুচাঁদ তার সাক্ষী বহন করে। ‘নয়ান্নের মায়ের সঙ্গে তোর গুজু-গুজু আর কেউ না জানুক আমি জানি।’^{২১} বনওয়ারী সে সময় বাসিনী বউয়ের সাথে প্রতারণা করলেও তার যৌবনের সম্পর্ক কখনও ঘোচেনি। কোপাই নদীর পাগলামির মত এক রহস্যময়ী আবেদন নিয়ে বেঁচে থাকে সে। উপন্যাসিকের ভাষায়:

বিশ বছরের সন্তানের জননী নয়ান্নের মা। তার চোখের দিকে বনওয়ারী চেয়ে দেখে চঞ্চল হয়ে উঠল। নয়ান্নের মা বললে—মনে আছে? পায়ে ধরেছিলে লদীর ধারে সুচাঁদ পিসি বলে গেল।... বাসিনীবউ, আমি তো তোমার অসম্মান করি নাই ভাই। বাসিনীবউ তার হাত চেপে ধরেছে। চোখ জ্বলছে। ভয় পেলে বনওয়ারী। বাসিনীবউ ভয়ংকরী হয়ে উঠেছে।^{২২}

নয়ান্নের স্ত্রী পাখি নয়ান্নকে ছেড়ে করালীকে বিয়ে করায় বাসিনী বউ ক্রোধদীপ্ত হয়ে উঠে। বিশেষ করে বনওয়ারীর উপর তার যথেষ্ট ক্ষোভ জমা হয়। কারণ বনওয়ারী বিবাহিত পাখিকে আবার করালীর সাথে বিয়ে দেয়। কাহার নারীরা একাধিক বিয়ে করতে পারে তবে সেটি ছাড়াছাড়ি হবার পর। নয়ান্নের সাথে ছাড়াছাড়ি না হয়ে পাখি করালীকে বিয়ে করে। যার প্রেক্ষিতে তীব্র কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে বাসিনী। তার খর-জিহ্বায় যাকে পারে তাকে আক্রমণ করে। বনওয়ারী, পাখি ও করালীর বিরুদ্ধে তার অভিযোগ:

একজনের ঘর ভেঙে দিয়ে আর একজনের ঘর গড়ার নাম মাতব্বরী? শতুর, চিরকালের শতুর ওই কোশকৈঁধেরা এই ঘরভাঙাদের বাড়ির। এই বাড়ি ছিল একদিন মাতব্বরের বাড়ি, এই বাড়ির উঠানে উবু হয়ে বসে লোকের বাপ-ঠাকুরের হাঁটুতে পাছায় কড়া পড়েছে। তারপর অনাথা ছেলের কোলে উড়ে এসে জুড়ে বসল।^{২৩}

বাসিনী বউ চরিত্রটি তীব্র বেদনা ও হাহাকার দিয়ে মুড়িয়ে নির্মাণ করেছেন উপন্যাসিক। একটি জনগোষ্ঠীর সব হারানোর কাহিনি হাঁসুলী বাঁকের উপকথা—বাসিনী বউ উপন্যাসের এই মূল সুরটির সাথে মিশে আছে। উপন্যাসের শেষে বাসিনী বউয়ের মৃত্যু তারাক্ষরের রচনাশৈলীর উচ্চস্তরে পরিচয় বহন করে। তার ভয়ঙ্কর মৃত্যুকে বিকৃত ও বীভৎস নবান্নের ফল হিসেবে ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক। মুখে বলা জবানিতে তার মৃত্যুর দৃশ্য উঠে আসে— ‘নয়ান্নের মা মরেছে। সে মরণ তার ভীষণ। অন্তত নসু তাই বললে—নবান্নের দিন, অগ্রহায়ণের শেষ মাসে গিয়েছে নবান্ন। নয়ান্নের মা জাঙলে সদগোপ মহাশয়দের চার বাড়িতে আকণ্ঠ এঁটোকাঁটার প্রসাদ খেয়ে দম বন্ধ হয়ে হাঁস-ফাঁস করে মারা গিয়েছে।’^{২৪}

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাসে কাহার নারীর প্রেম ও পরিণয়কে শৈল্পিকভাবে উপস্থাপন করেছেন উপন্যাসিক। নর-নারীর প্রেম ও ভালোবাসাকে তারা বলে অঙ (রঙ)। এই প্রেমের টানে লোকলজ্জাকে উপেক্ষা করে তারা ঘর ছাড়তেও দ্বিধাবোধ করে না। কাহার তরুণীরা বানভাসা কোপাইয়ের মতো ক্ষীণ হয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে আসে। কখনও কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায়। করালীর মা এক মিস্ত্রিকে ভালোবেসে চিরকালের জন্য ছেড়েছে কাহার সমাজ। আবার নীলকুঠির সাহেবদের সাথেও কাহার কন্যাদের প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নীল কুঠি সাহেবরা

শেষের সাথে সাথে চিরকাল কাহার তরুণীদের ব্যবহার করেছে। বসন্ত চিরকাল বাবুদের ছেলেদের ভালোবেসে শরীর দিয়েছে। তাদের সন্তান পেটে ধরেছে কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি। বসন্তের কন্যা পাখী সেই ভালোবাসার ফল। বসন্তের চেহারা ও গায়ের রঙ নিয়ে সামাজের মানুষ নানা কথা বলেছে। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসের একটি বর্ণনা লক্ষণীয়:

সেই আমল থেকে কাহারদের কয়েকটা ঘরে রূপ এসে বাসা বেঁধেছে। পরম কাহারদের গুটিটার রঙই সেই আমল থেকে ধবধবে ফরসা। সুচাঁদপিসির কর্তাবাবা অর্থাৎ বাবার বাবার রঙ একেবারে সাহেবের মত ছিল। সুচাঁদপিসির রঙও ফরসা। মেয়ে বসন্ত খুব ফরসা নয়। কিন্তু ওর মেয়ে পাখী তো একেবারে ‘হলুদমাণি’ পাখি; চৌধুরী-বাড়ির কর্তার ছেলে অকালে মরে গেল মদ খেয়ে, নইলে যুবতী পাখীর এখনকার মুখের সঙ্গে তার মুখের আশ্চর্য মিল দেখা যেত। তেমনিই বড় বড় চোখ, তেমনিই সুডৌল নাক, চুলের সামনেটা পর্যন্ত তেমনিই ডেউ-খেলানো।^{২৫}

আলোচ্য উপন্যাসে বসন্ত চরিত্রটি অত্যন্ত কোমল স্বভাবের। ‘বসন বাইরের দিকে চোখ ঝলসে দেয় না বটে কিন্তু ভিতর থেকে এক স্নিগ্ধ সুস্থির আলো বিকীর্ণ করে।’^{২৬} প্রেমের স্মৃতি আজীবন তার আচার ব্যবহারকে প্রভাবিত করেছে। সময়ের সাথে রঙ ঘুচে যায় চৌধুরী। সে আবার বিয়ে করে। তবুও বসন তাদের বাড়িতে যায়, কাজকর্ম করে কিন্তু মজুরী নেয় না। এখানে বসন্তের চরিত্রের মানবিক দিকটি ফুটে ওঠে। চৌধুরী সাহেবের মৃত্যুর পর বিধবার মত থেকে সে তার বাকি জীবন কাটিয়ে দিয়েছে। সমকালীন সমাজবাস্তবতার বিপরীতে বিকশিত হয়েছে তার স্নেহাঙ্গুর রূপ। কন্যা পাখী করালীকে ভালোবেসে নয়ান্নের ঘর ছেড়ে এসে উঠেছিল বসনের কাছে। পাখীর অকপটে সমস্ত কথা তার মাকে বলে দেয়। বসন শুধু তার মা’ই নয় যেন তার পরাণের সখী। করালী ও পাখীর মিলিত হওয়ার ব্যাপারে বসনের স্নেহ প্রশ্রয় ছিল। যা তার মাতৃমনের পরিচায়ক। ‘বসন কখনও মেয়েকে তিরস্কার করে না। সে তার চুল বেঁধে মুখ মুছিয়ে দেয়। ঠাট্টা করে বলে— ভালো হয়েছে কি না করালীকে শুধাস। এই মায়ের অপমান সে করতে পারে, না তাকে দুঃখ দিতে পারে?’^{২৭}

উপন্যাসিক বসনকে মানবিক মানুষরূপে নির্মাণ করেছেন। তারাশঙ্কর এই শ্রেণির নারী চরিত্রকে তার ‘কবি’ উপন্যাসে এনেছেন। কিন্তু সেই নারী হাঁসুলী বাঁকের বসনের মতো নয়। সে অত্যন্ত ব্যক্তিত্বময়ী নারী। শুধু নামটিতেই তিনি মিল রেখেছেন।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা গণমানুষের কথা। এ উপন্যাসে চঞ্চল ও জীবন্তরূপে পাখী চরিত্রকে নির্মাণ করেছেন লেখক। নতুন প্রজন্মের মেয়ে সে। কাহার সমাজের বিধি নিষেধ তার কাছে বাধাস্বরূপ। নয়ান্নের বিবাহিত বউ হওয়া সত্ত্বেও কোনো ছাড়বিড় না করে করালীর সাথে ঘর বেঁধেছে-সে। ব্যক্তিগত প্রেমকে প্রাধান্য দেবার এই সাহস পাখিকে স্বতন্ত্র করেছে। পাখীর ভাষ্যে: ‘যার সঙ্গে মেলে মন, সে আমার আপনজন।— ইয়ের আবার শাসনই বা কি মাতব্বরই বা কি! ওই হেঁপো উগীর ঘরে আমি থাকব না, পালিয়ে এসেছি আজ ছমাস। এখন একজনার সাথে আমার মনে অঙ ধরল, আমি তার ঘরে এলাম। একি লতুন নাকি কাহারদের ঘরে?’^{২৮} পাখী করালীর সহধর্মিণী। করালী তার মনের মানুষ। তার মধ্যে কাহার সমাজের বিভিন্ন বিধি নিষেধের বিরুদ্ধাচারণের সাহস লেখক উপস্থাপন করেছেন। পাখীর মা বসন্ত রঙের নেশায় গভীর রাতে একাই চৌধুরীদের বাড়িতে চলাচল করতো। পাখীর শরীরে সেই চৌধুরীদের রক্ত। সুচাঁদের ধারণা সেজন্য পাখীর রঙের নেশা আরও ভয়ঙ্কর হওয়া স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে পাখীর প্রবাদটিও তাৎপর্যপূর্ণ:

করালীর নেশায় পাগল হয়েছে পাখী। সেই নেশায় অন্যায়কে ন্যায়, ন্যায়কে অন্যায় দেখছে বজ্জাত বেজাত। পাখীর হঠাৎ ফোঁস করে উঠল- হারামজাদী, আমার শরীলে নয় চৌধুরীদের অভ্র আছে, তাতেই না হয় আমার নেশা বেশি। কিন্তুক তোর প্যাটের মেয়ের নেশা কেনে আজও ছাড়লো না শুনি? বলি, তোর বসন্তের শরীরে কার অভ্র আছে তা বল? শুনি।^{৯৯}

আঠারো বছর বয়স পাখীর। পাখী যেন পাখিই। দুরন্তপনার কারণে লেখক পাখীকে ‘তালচুড়ুই’এর সাথে তুলনা করেছেন। করালী বৈভবে সে গর্ববোধ করলেও তার মধ্যে বিনয়বোধের অভাব ছিল না। বনওয়ারীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে সে। কারণ বনওয়ারীর কারণে তার প্রেম পূর্ণতা পেয়েছে। পাখী চরিত্রের মধ্যে ঔপন্যাসিক আধুনিকতার স্বরূপ দেখিয়েছেন। কাহারদের কত্তাবাবাকে নিয়ে তার মনে নানা প্রশ্নের উপস্থিতি ছিল। তারা চন্দ্রবোড়া সাপটিকে কত্তাবাবার বাহন মনে করতো। কিন্তু এটি পাখীর বিশ্বাস বহির্ভূত ছিল। সে ভাবতো সাপ কখনো বাবা হয় না। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও করালীর কোঠাবাড়ি নির্মাণের সময়ও পাখীর মধ্যে যুক্তিবোধ সঞ্চারণ করেছেন লেখক। ‘পাখী তাকে নিবৃত্ত করতে পারে কোঠাঘর তোলার সম্বল থেকে। কিন্তু পাখীও ক্ষেপেছে কোঠাঘরের জন্যে। যেমন একালের ছেলে, তেমনি একালের মেয়ে। পাখী বলে-চল্লনপুরের বাউরিরা কোঠাঘর করেছে-হারু বাউরি, শম্ভু বাউরি, কানাই বাউরি।’^{১০০}

উপন্যাসের শেষে পাখীর ভয়াবহ পরিণতি দেখিয়েছেন লেখক। কাহার মেয়েরা সতীনের ঘর করে না। স্ত্রী রেখে থাকতে পুরুষ যদি আবার বিয়ে করে তাহলে শাঁখা নোয়া ছুড়ে ফেলে দিয়ে স্বামীকে গাল দিয়ে তারা বেরিয়ে যায়। করালী যখন পাখী থাকা সত্ত্বেও সুবাসীকে ঘরে তোলে তখন পাখী কাহারদের অন্য নারীর মত বেরিয়ে যায় না, সে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠে। এখানেই পাখী স্বতন্ত্র। পাখী প্রথমে নিজে আত্মহত্যা করতে চায়, কিন্তু হঠাৎ ঠিক করে সে একা কেন মরবে, করালীকেও মারবে। একটি কাটারি নিয়ে করালীর মাথায় আঘাত করে, করালী প্রাণে বেঁচে যায়, রক্তমাখা কাপড় নিয়ে পাখী বাঁশবাদিতে গিয়ে আত্মহত্যা করে। পাখী ও করালীর উন্মত্ত প্রেমে নয়ানের মার অভিশাপ সত্য বলে পরিণত হয়-তাই পাখীর মৃত্যু বিধি নির্দিষ্ট বলেই এটি কোনো ট্রাজিক রস বহন করে আনে না।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্রগুলো প্রায় সবাই উত্তরাধিকারহীন-সন্তান নেই কারো। এমন সন্তানহীন, নম্রভাব গোপালীবালা চরিত্রটি বনওয়ারীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী। মেনে নেওয়া ও মানিয়ে নেওয়ার মাঝে যে শান্তি, তারই প্রতীক গোপালীবালা। তার লক্ষ্মীমন্ত স্বভাবের প্রকাশ ঘটে বনওয়ারীর গো-সম্পদ প্রতিপালন, দুধ-দোয়ানো এবং সামাজিক রীতি-নীতি মান্য করার মধ্য দিয়ে। নিঃসঙ্গ এক নারী গোপালীবালা কখনো কারো সাথে উচ্চস্বরে কথা বলে না। ‘গেরস্তরা বলছে বেজায় জল দিচ্ছি দুধে। জল একটুকুন কমিয়ো কাকী। ...বনওয়ারীর বউ বড় ভালোমানুষ, সে ঘাড় নেড়ে বললে-জল তো সেই এক মাপেই দিই মা। বেশি তো দিই না।’^{১০১}

সমস্ত উপন্যাস জুড়ে ঔপন্যাসিক আদিবাসী কাহার জনগোষ্ঠীর নানা উপকথা তুলে ধরেছেন। এই আদিবাসী নারীরা কৃষিকাজের সাথেও সম্পৃক্ত ছিল। গোপালী সংসারের কাজের পাশাপাশি স্বামী বনওয়ারীকে কৃষি কাজে সাহায্য করেছে। সে পথে ঘাটে গোবর দেখলে তা কুড়িয়ে নিয়ে জমির মধ্যে ছড়িয়ে দিত। বনওয়ারীকে স্বামী বলে স্বীকার করা ছাড়া অন্য পুরুষের প্রতি তার কোন আকর্ষণ নেই। সুবাসীকে বিয়ে করতে যাবার আগে বনওয়ারীকে সে আপত্তি জানায়নি। বরং তাকে যাতে তাড়িয়ে না দেয়, সেজন্য অনুরোধ করেছে। কিন্তু সুবাসীকে বিয়ে করার হ’মাস পরে গোপালী

সংসার ছেড়ে চলে যায়। গোপালীর মৃত্যুর পর নসুবালার জবানিতে তার চরিত্রকে আরও স্পষ্ট করেছেন ঔপন্যাসিক। ‘গোপালীকাকী, আমার মাটির মানুষ, সোনার পিতিমে গো! মুখে বরত আমি, কথা শুনে পরান জুড়াত, হাতে ছিল কোপাইয়ের ঠাণ্ডা পরশ, বুলিয়ে দিলে রঙ্গ জুড়িয়ে যেত। আঃ, কোথা গেলি মা গো-পাড়ার নক্ষ্মী মা রে!’^{৩২} তার মৃত্যুকে লেখক কৃষিলক্ষ্মী অনুপূর্ণার বিসর্জনের সঙ্গে একীভূত করেছেন। কাহার সামাজের প্রাণ-প্রতিমারূপে সে রয়ে গেছে কাহার সামাজের সবার মনে।

সুবাসীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক খল চরিত্র নির্মাণের একটি বিশেষ দিক উপস্থাপন করেছেন। রমণের শালিকার কন্যা অর্থাৎ কালোশশী বোনবি, বিধবা মেয়ে সুবাসী। কালোশশীর রঙ ছিল কালো, সুবাসীর রঙ মাজা, উজ্জ্বল। বিধবা সুবাসী ছিল এক সন্তানের জননী। সন্তানটি মারা যাবার পর সে মায়ের বাড়িতে চলে আসে; এবং নতুন করে বিয়ে করার জন্য অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু মা মারা যাবার পর রমণের বাড়িতে এসে বসবাস করে। সেখান থেকেই বনওয়ারী সুবাসীর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়। কালো বউয়ের অতৃপ্তি যেন সুবাসীতে পূর্ণতা পায়। ‘মেয়েটা অবিকল কালোশশী-তেমনি বিলাসিনী, তেমনি চণ্ড, তেমনি হাসি, তেমনি ঢলে পড়া, মধ্যে মধ্যে বনওয়ারীর মন খাপ্পা হয়ে ওঠে।’^{৩৩}

সুবাসী অনেকটা কালোশশীর ছায়া বলে মনে হলেও ক্রমে তার চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। সুবাসীর রূপে মুগ্ধ হয়ে এবং সন্তান লাভের কথা চিন্তা করে বনওয়ারী সুবাসীকে বিয়ে করলেও ক্রমেই বনওয়ারী লক্ষ করে তার আচরণের কোন শ্রী নেই। সমাজের রীতি-নীতি না মানা অদ্ভুত স্বভাব তার। সুবাসী চরিত্রের মধ্য দিয়ে তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় আটপৌরেদের স্বভাব ও লোভাতুর আকাজক্ষার বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। শুধু ভালো-মন্দ খাওয়া নয়, ভালো পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান ও ভালোভাবে জীবন কাটানোর লোভ রয়েছে সুবাসীর মধ্যে। লোভ-ই সুবাসীকে নিয়ে গিয়েছে করালীর সংসারে। বনওয়ারীর চিকিৎসা খরচের অজুহাতে গরু-বাছুর বিক্রি করে সেই টাকাকড়ি সব নিয়ে তাকে ফেলে গভীর রাতে অদৃশ্য হয়ে যায় সুবাসী। নসুবালার জবানিতে এ কীর্তিকলাপের কথা বর্ণনা করেছেন ঔপন্যাসিক:

বনওয়ারী কয়েকদিন তখন শয্যাশায়ী, এখন-তখন অবস্থা, সেই সময় একদিন সকালে দেখা গেল, সুবাসী নাই। সুবাসী তার আগের দিন বনওয়ারীর চিকিৎসার খরচের অজুহাতে গরু-বাছুরগুলি বিক্রি করেছিল। সেও টাকাকড়ি সব নিয়ে বনওয়ারীকে ফেলে গভীর রাতে অদৃশ্য হল। দুপুর নাগাদ খবর এল, সুবাসী চন্ননপুরে-করালীর বাসায়। বনওয়ারীকে ‘মামা’ বলত করালী। সম্পর্ক বাছলে না-ছি-ছি-ছি! রোগা মানুষ বনওয়ারী, মেয়েটি চলে গেলে তার কি হবে, সে কথায়ও একবার ভাবলে না।^{৩৪}

কাহার পল্লীর আদিম উপাদান সুবাসীর মধ্যে স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। সুবাসীকে দিয়ে যে কোনো কল্যান সম্ভব নয়, সেটি বনওয়ারী আগেই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু কালোশশীর প্রতি নিবিড় আসক্তি এবং কালোশশী ও গোপালীবালার অতৃপ্ত প্রেতের ভয় তার এতই তীব্র ছিল, যে কারণে সে সুবাসীকে ত্যাগ করতে পারেনি। এটি সুবাসী জানত বলেই তার দুর্বলতাকে ব্যবহার করেছে। তবে এটি কাহারপাড়ার নতুন কিছু নয়, হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় এটি পুরাতন নিয়ম।

আলোচ্য উপন্যাসে প্রান্তিক নারী চরিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি তিনি একটি ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্র নির্মাণ করেছেন। এই চরিত্র হিসেবে দেখিয়েছেন নসুবালার চরিত্রটিকে। যে দেহের গঠনে পুরুষ হলেও নারীর মত তার চলাচল। নারীদের মনোগত বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে তার ভাষায়। তাছাড়া নারীদের

মত তার কলহ করার ভঙ্গিও রয়েছে। নারীর মত চলার কারণে মনের অজান্তে নসুরাম হয়ে ওঠে নসুবালা। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাসে নসুবালা মানুষটি সম্পর্কে লেখক বলেন:

নসুবালা করালীর পিসতুতো ভাই। আসল নাম নসুরাম। অদ্ভুত চরিত্র নসুরামের। ভাবে ভঙ্গিতে কথায় বার্তায় একেবারে মেয়েদের মতো। মাথায় মেয়েদের মতো চুল, তাতে সে খোঁপা বাঁধে, নাকে নাকছবি পরে, কানে মাকড়ি পরে, হাতে পরে কাঁচের চুড়ি লাল রুলি, মেয়েদের মতো শাড়ি পরে। মেয়েদের সঙ্গে গোবর কুড়ায়, কাঠ ভাঙে, ঘর নিকায়, চন্ননপুরে দুধের জোগান দিতে যায়, মজুরনী খাটতে যায়। কণ্ঠস্বরটি অতি মিষ্ট-গান গায়, নাচে। গান আর নাচ—এই তার সবচেয়ে বড় নেশা।^{৩৫}

এই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে চিরন্তন মাতৃত্ববোধ জেগে ওঠে। পরম মাতৃ-মমতায় সে রুগুণ বনওয়ারীর সেবা করে লেখক নসুবালা সম্পর্কে সব কথা হয়তো আলোচ্য উপন্যাসে বলতে পারেননি, তাই নতুন করে শুকসারী-কথা নামে লিখেছেন আরেকটি উপন্যাস। এই উপন্যাসে তিনি নসুবালা চরিত্রটিকে ‘ভাদুর মা’ হিসেবে দেখিয়েছেন। উপন্যাসিকের ভাষায়:

নসুবালা আদৌ মেয়ে নয়, সে পুরুষ, বাল্যবধি মেয়েসুলভ বেশাবাস, আচার-আচরণে সে নসু থেকে নসুবালা হয়ে গিয়েছিল। ভাদু কে? এক জমিদার কন্যা কৃষ্ণকে ভালোবেসে জীবন দিয়েছিল, সেই থেকে মানবী ভাদু পূজা পেয়ে আসছে। জমিদার কন্যা ভাদু দেবী হয়ে গিয়েছে। এই ভাদুর মা নসুবালা।^{৩৬}

তৎকালীন সময়ে রাঢ়বঙ্গে ভাদুর গল্প বেশ জনপ্রিয় ছিল। তারাক্ষর এ গল্পের অনুপ্রেরণায় শুকসারী-কথা উপন্যাসে নসুবালাকে নির্মাণ করেছেন স্বকীয় চেতনায়। যেখানে নসুবালা নারীবেশী পুরুষ হলেও হাঁসুলী বাঁকের কর্তাবাবা কেন্দ্রিক সংস্কার ভেঙে নিজেকে যুক্ত করেছে মাতৃপূজায়। পরিবর্তনশীল কালপ্রবাহে নসুবালা ভাদুর মা-তে পরিণত হয়েছে।

তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাসে কাহারপাড়ার প্রান্তিক নারীদের জীবন ও সংগ্রামের বৃত্তান্ত রচনা করেছেন নন্দন চিন্তা ও ভাষার ওজস্বিতা দিয়ে। এখানে তিনি প্রতিটি নারী চরিত্রকে নিজস্ব গণ্ডি থেকে মুক্ত করে চিরন্তন ও মানবিক মানুষে পরিণত করেছেন। তাঁর নির্মিত নারীরা যৌনতা ও উদ্ভাসিতার প্রতীক। এ উপন্যাসে সমাজ পর্বান্তরের মুহূর্তে প্রান্তজনের সংগ্রামরত কণ্ঠস্বর উচ্চারণের পাশাপাশি লেখকের ভাষিক-বৈচিত্র্য ও শিল্পগুণ উপন্যাসটিকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। উপন্যাসিক বক্ষ্যমাণ এ উপন্যাসে নারীর জৈবিক কামনা বাসনার পাশাপাশি নিম্নবর্গের নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান এবং শ্রেণিগত পরিচয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই একটি বিশিষ্ট জনগোষ্ঠীকে নিয়ে উপন্যাস রচিত হয়েছে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে এক ধ্রুপদী নিদর্শন।

তথ্যনির্দেশ

- ১ উদ্ধৃত, উপাসনা ঘোষ, “তারাক্ষরের উপকথা”, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত তারাক্ষর অধ্বষা (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৭), পৃ. ১২৪
- ২ উদ্ধৃত, মো: সেলিম ভূঞা, তারাক্ষরের উপন্যাস: কৌম জীবনের রূপায়ণ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১০), পৃ. ১৮
- ৩ তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়, “হাঁসুলী বাঁকের উপকথা” তারাক্ষরের রচনাবলী (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, সপ্তম খণ্ড, ১৪১৮) পৃ. ১৩৭
- ৪ সুমিতা চক্রবর্তী, “হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : চিরায়ত জীবন” মোস্তফা মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ সম্পাদিত তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় ও হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (একুশে বইমেলা: নান্দনিক, ২০১০), পৃ. ১৬৩-১৬৪
- ৫ উদ্ধৃত, বেগম আক্তার কামাল, “হাঁসুলী বাঁকের উপকথা-র উপন্যাসায়ন”, তদেব, পৃ. ১৫

- ৬ শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্য উপন্যাসের ধারা (ঢাকা: বিভাস, ২০২০), পৃ. ৫৯৬
- ৭ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯
- ৮ তদেব, পৃ. ১৩৭
- ৯ উদ্ধৃত, ভীষ্মদেব চৌধুরী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমাজ ও রাজনীতি (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), পৃ. ২১০
- ১০ উদ্ধৃত, অচিন্ত্য বিশ্বাস, সমর্থ পঞ্চম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (কলকাতা: রত্নাবলী, ২০০৮), পৃ. ২৫৩
- ১১ শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯৫
- ১২ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭২
- ১৩ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭
- ১৪ উপাসনা ঘোষ, “তারাশঙ্করের উপকথা”, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮
- ১৫ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০
- ১৬ তদেব, পৃ. ৪০৬
- ১৭ তদেব, পৃ. ২৯৯
- ১৮ তদেব, পৃ. ২৪৪
- ১৯ তদেব, পৃ. ২১৮
- ২০ তদেব, পৃ. ২৯৬
- ২১ তদেব, পৃ. ২২৩
- ২২ তদেব, পৃ. ২২৩-২২৪
- ২৩ তদেব, পৃ. ২০৯
- ২৪ তদেব, পৃ. ৩৯৮
- ২৫ তদেব, পৃ. ১৫০
- ২৬ ক্ষেত্র গুপ্ত, ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর (ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০১১), পৃ. ৯৯
- ২৭ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩
- ২৮ তদেব, পৃ. ২০৪
- ২৯ তদেব, পৃ. ১৬৮
- ৩০ তদেব, পৃ. ৩০৩
- ৩১ তদেব, পৃ. ২৩৭
- ৩২ তদেব, পৃ. ৩৬৮
- ৩৩ তদেব, পৃ. ৩৩০
- ৩৪ তদেব, পৃ. ৪০০
- ৩৫ তদেব, পৃ. ১৬৫
- ৩৬ মাহমুদা খাতুন, “তারাশঙ্করের নারী চরিত্র: বিষাদ ও বেদনা”, ভীষ্মদেব চৌধুরী সম্পাদিত তারাশঙ্কর স্মারকগ্রন্থ (ঢাকা: নবযুগ, ২০০১), পৃ. ৮৩-৮৪